

12 Cuk-1405213-4-242549

2

0.73 0.0

4

[Faint, mostly illegible handwritten text and markings, possibly including the word "KROK" and other scribbles.]

॥ 'বেঙ্গল'এর শারদীয় সাহিত্য সম্ভার ॥

প্রবোধ কুমার সান্যালের

দেবতাত্রা হিম্মালয়

১ম খণ্ড (১১খ)

২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ)

আনন্দকিশোর মুন্সার

ভেলকি থোক ভেরজ

৩য় খণ্ড : ৬

রাঘব বোয়াল

৩০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সুবোধ

উপনগর ৩০০ ॥

আয়

সীতা দেবীর

শান্তা

সহায়দা ৩০০ ॥

অলখ-বে

বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের

বিজন ত

গোধূলির রঙ ৩০০ ॥

রাণী পা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রবোধকুমা

শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য় খণ্ড : ৫০০ ॥

নতর

রমাপদ চৌধুরীর

নরেন্দ্রনাথ

মুক্তবন্ধ ৩০০ ॥

আয়ুবর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবোধ

প্রাগতিহাসিক ৪র্থ খণ্ড : ৩০০ ॥

শ্রেষ্ঠগল্প

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সৈয়দ মু

নিকষিত হেম ৩০০ ॥

চতুরঙ্গ

জাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

বাংলা ছোট গল্পের

অভিজাত সংকলন

শতবার্ষিক শতগল্প

১১

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি

॥ কলিকাতা : বারো ॥

সাহিত্যের খবর

বর্ষ ১৩৭৭

সংখ্যা ১১

প্রাবণ ১৩৭০

তার কেন্দ্র	রবীন্দ্রনাথ	১
রায় অপপ্রয়োগ	মণীন্দ্রকুমার ঘোষ	২
দেব বস্ত্র কবিতা	রঞ্জিত সিংহ	৩
জনাথের প্রবন্ধ	জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়	২১
দ্বীপ 'রবিবার'	গৌতম গুপ্ত	২৬
চলে গেছে	সমর গোস্বামী	৩১
বিদেশে	চারু দত্ত	৩২
রীক্ষের সঙ্গীত	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	৪১
দ্র-গ্রন্থপঞ্জী	পুলিনবিহারী সেন	৫১
তন বই		৬১

নিবন্ধমালা

সাহিত্যের খবর-এর বর্ষারম্ভ আশ্বিন হইতে। তবে যে কোন সময়ে
হক হওয়া যায়। গ্রাহক চাঁদা সড়াক বার্ষিক ৬০০ ন. প. বার্ষাসিক
১০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—বেঙ্গল
বলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড—বঙ্কিম চ্যাট্জে স্ট্রীট কলিকাতা—১২।

সম্পাদক—মন্মোহন বসু

অনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
১১, জীম ঘোষ সেন, নবীন সম্বন্ধী প্রেস, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

॥ অক্সফোর্ডীয় সাহিত্য সঙ্ঘার ॥

স্ববোধকুমার চক্রবর্তীর

ভূতভঙ্গা

২য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

আম্র চাঁদ

৩'০০ ॥

মণিপদ্ম

২য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্বাভাভোর

২য় মুদ্রণ ২'০০ ॥

মৃগভৃষণ

৩'০০ ॥

মাংথুর

২য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

কুশানু

২য় মুদ্রণ ৬'০০ ॥

মহাকাশ

২য় মুদ্রণ ৩'৫০ ॥

নীলাঞ্জলি

২য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

রমাণন্দ চৌধুরীর

মুক্তবন্দ

৩'০০ ॥

নীলকণ্ঠের

হরেকান্তকাম্য

২য় মুদ্রণ ২'৫০ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প

৩য় মুদ্রণ ৫'০০ ॥

প্রাচীনগ্রন্থের উপাখ্যান

২য় মুদ্রণ ২'০০ ॥

জীবন্ত

২য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের

সীমাহীন মণ্ডলোৎসব

৩'০০ ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

কল্যাণকৃতির দেশে

২য় মুদ্রণ ৩'৫০ ॥

বিক্রমাদিত্যের

দেশে দেশে

২য় মুদ্রণ ৩'০০ ॥

খুশী দত্ত ওরাজা

২য় মুদ্রণ ১'৭৫ ॥

বৃন্দের ইয়োয়োপ

৪'০০ ॥

নারায়ণ সান্তালের

বল্লীক

৪'০০ ॥

দীপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

আবুত্বের সঙ্গে

২'৫০ ॥

অম্মামী

৪'০০ ॥

জীবন মৃত্যু

২য় মুদ্রণ ২'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ধারো

সাহিত্যের খবর

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০ম অধ্যায়	সংস্করণ ১ম	আবিস্কার
খোলো হে আকাশ (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ		
জাতীয় সংহতি সাধ	কেনর ভূমিকা		
	(ভট্টম দর্শনশাস্ত্রী আশীষক)		
ওরালা	জরানন্দ		
ঐশ্বর্যের হৃদয়বন্দন	ভট্টম দর্শনশাস্ত্রী আশীষক		
শ্রীনাথ	নন্দগোপাল শেখর		
বাংলায় কালিদাস-চর্চা	ঐশ্বর্যকান্ত শেখর		
অন্তরীক্ষেয় সঙ্গীত	অমিয়নাথ শেখর		
নাগা ভীষ্মের কাহিনী	বিক্রম চট্টোপাধ্যায়		
আধুনিক কবিতার ধারা	ভবানীশঙ্কর শেখর		
গ্রাম নৈবিক রবীন্দ্রনাথ	অরুণকুমার শেখর		
গল্প নয় কল্পনাও নয়	গুরুদাস বসু		
জটিলত্ব ও নব্যবাদের রাজনীতি-চর্চা	ধর্মেন্দ্রনাথ শেখর		
মধুসূদনের মনেট : একটি শব্দীক্ষা	শক্তিচন্দ্র শেখর		
কলেজ স্ট্রীটের দেবতা	কুমারেশ্বর শেখর		
দেশে-বিদেশে	চাঁক দত্ত		
পূর্ববীতে বাঁধা জুটি গান	ভোলালাল শেখর		
মনের কথা ও "ধেনো" উপন্যাস	ডাঃ হরপ্রসাদ দত্ত		
প্রতিভার অগম্যতা	ভবানী শেখর		
নতুন বই			

নিবন্ধাবলী

সাহিত্যের খবর-এর বর্ষাবৃত্ত আশ্বিন হইতে। তবে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক চাঁদা মাসিক বাবিন ৬.০০ ন. প. মাসিক ৩.০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—১৪, বক্স চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

সম্পাদক—মহোদয় বসু

শ্রীজ্ঞান শেখর শাস্ত্রী কর্তৃক ১৪, বক্স চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

১৪, ভীন গোল্ডেন, দ্বিতীয় মেলা, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

তঁার অক্ষুণ্ণ কল্যাণ আমাদের পাঠের হৃদয়



“কঠোর শ্রম ও বৈষয়ের দ্বারা
কি লাভ করা যায় তার জ্ঞান যদি
কোন উদাহরণের প্রয়োজন হয়
আমি সুলেখা ওয়ার্কস
লিমিটেডের নাম উল্লেখ করবো।
ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান
আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি
সম্বিত এক বিরাট কারখানায়
পরিণত হয়েছে। বিদেশে-

প্রস্তুত সবচেয়ে মেরা কালির যে গুণগত উৎকর্ষ সুলেখা সেই গুণের
অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মূদ্রা সংরক্ষণে
সাহায্য করছে। আজকে তাঁদের এই রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে
আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।”

বিধানচন্দ্র রায়

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ

সাহিত্যের খবর

বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা-৩ ॥ প্রকাশ্য ১৯৩৯

যুক্ত করো ভয়	রবীন্দ্রনাথ	
উপস্থাপনের পুনর্বিচার	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২
শরৎচন্দ্রের নব যুগায়ন	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	১০
এখনো গেল না আধার	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	১২
দূরতর দীপ	দেবতোষ বসু	২১
সবিনয় নিবেদন : শরৎচন্দ্র উপস্থাপন		
ও পুনরুক্তি	পদ্মব সেনগুপ্ত	১
সাহিত্যের রীতি ও শরৎচন্দ্রের আত্মকথা	নমিতা সেন	৩৬
দেশেনিদে	চাক দত্ত	৪৬
অন্তরীক্ষের সঙ্গীত	জমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	৫৫
শরৎচন্দ্র কি দ্বিতীয় জেপীর উপস্থাপনিক	নারায়ণ চৌধুরী	৬১
নতুন বই		৬৭

নিবন্ধাবলী

সাহিত্যের খবর-এর বর্ধারস্ত আখিন হইতে। তবে যে কোর সময়ের গ্রাহক হওয়া যায়! গ্রাহক চাঁদা সত্যক বার্ষিক ৬.০০ ন. প. বার্ষিক ৩.০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—বেঙ্গল পাবলিশার্স আইভিটেট লিনিটেড—১৪, বহির্বাট্টাট্টে প্লট, কলিকাতা—১২।

সম্পাদক—অমোজ খান

সহকারী সম্পাদক—কুতুব ১৪, বহির্বাট্টাট্টে প্লট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত।
১১, ভান সেন সেন, মহান সনসত্তী প্রেস, কলিকাতা : হইতে মুদ্রিত।

সেই সকল পরস্কার-বিরোধী প্রণেতা একত্র সম্মিলিত প্রস্তুত

সিবে কালি শুকায় না ;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায় ।

রাঙের যথেষ্ট গভীরতা ; তবু
অবোধে লেখা এগিয়ে চলে ।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না ;
অমূল্য কলম পরিষ্কার রাখে ।

সুলেখা কালি

অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গোয়াল অর্জন করেছে ।



সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বম্বে • মাদ্রাস

756.3
019.87

সাহিত্যের খবর

বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ২ ॥ তারিখ ১৩৬৩

সাহিত্যিকের সাধনা	বনফুল	১
প্রবোধচন্দ্রিকা	স্বর্গীর করণ	২
বাংলায় কালিদাস-চর্চা	অমলেন্দু ঘোষ	৩
জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চা	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	২৬
দেশে-বিদেশে	চারু দত্ত	৩৩
অন্তরীক্ষের সঙ্গীত	অমিররতন মুখোপাধ্যায়	৪০
পথ চলে গেছে	সমর সোম	৪৫
ভাষার প্রশ্ন ও বুদ্ধিবাদী ব্যবস্থা	নির্মল বসু	৬১
নতুন বই		৩৭

নিরসামঞ্জী

সাহিত্যের খবর-এর বর্ষাবস্ত আধুনিক হইতে। তবে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক তাঁদা সভাক বার্ষিক ৬.০০ ন. প. বার্ষিক ৩.০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। তাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—বেঙ্গল পাবলিশার্স আইভিটে লিমিটেড—১৪, বার্লিং চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা—১২।

সম্পাদক—অরুণাচল বসু

প্রবন্ধগ্রন্থ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৪, বার্লিং চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত

১১, জীম বোম বেগ, নবীন বসু কর্তৃক প্রকাশিত ১৩, কলিকাতা—১২ হইতে মুদ্রিত।

॥ বেঙ্গল-এর অভুলনীয় গ্রন্থসম্ভার ॥

নীরেজনাথ চক্রবর্তীর

আজব জীবিকা ৩'০০ ॥ জীবন-মুখ্য (২য় মুঃ) ২'৫০ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

অখণ্ড জগৎ (৩য় মুঃ) ৩'০০ ॥ জর্জ বার্নার্ড শ (২য় মুঃ) ৮'৫০ ॥

বিমল দত্তের

কাশ্মীর প্রিন্সেস অগাধ সমুদ্রে মৃত্যুর মাঝে জীবন-যুদ্ধ (৩য় মুঃ) ৪'০০ ॥

রাধি দাসের

তেজেশচন্দ্র সেনের

মা (৩য় মুঃ) ২'৭৫ ॥ হারানো ছেলে (কিশোর উপন্যাস) ১'২৫ ॥

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শাদা-কানো ৩'০০ ॥ সেই আশ্চর্য রাত ২'০০ ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের

রণজিৎকুমার সেনের

মীনাশ্রমের সন্তানোৎসব ৩'০০ ॥ দ্বৈত সঙ্গীত ৪'০০ ॥

কর্ণাদ শূপ্তের

অজিত মুখোপাধ্যায়ের

অবরোধ ২'৫০ ॥ অমৃত মন্ত্র ৪'০০ ॥

দীপেন রাহার

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কাঁচা মাটি পাকা পথ ৪'৫০ ॥ দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ ৬'৫০ ॥

বেঙ্গলের অনুরাগী কিশোর সাহিত্য

বাণভট্টের

নমিতা বহুর

লালুভূমু (৩য় মুঃ) ৩'০০ ॥ পিকনিক ২'০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

খুলী দরওয়াজা (২য় মুঃ) ১'৭৫ ॥ প্রাণী ও প্রকৃতি ১'৫০ ॥

চাক্রচন্দ্র চক্রবর্তীর (জরাসন্ধ)

বেবতীভূষণ ঘোষের

রং চং ১'০০ ॥ সবুজ তিয়া ১'৭৫ ॥

দেবদাস দাশগুপ্তের

পরভূত প্রকৃতি (ভারত সরকার পুরস্কৃত) ১'০০ ॥ প্রাণের কথা ১'০০ ॥

ননীগোপাল গোস্বামীর

সপ্ত প্রকাশিত

জীবে প্রেম করে যেই জন

১'২৫ ॥

আমাদের উৎসব

১'০০ ॥ মাটির গাড়া এই ধরলী (২য় মুঃ) ১'০০ ॥

আশা দেবীর

অমরেন্দ্র সেনের

মুক্তি নদীর তেউ (৪র্থ মুঃ) ১'০০ ॥ ডাক ত্রিকিট ১'২৫ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা : বারো ॥

JUST OUT
Prof. SUNITIKUMAR CHATTERJI'S
Languages & Literatures of Modern India

Rupees Eighteen Only

প্রকাশের প্রতীক্ষায়
 সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
 বৈদেশিকী (দ্বিতীয় খণ্ড)

রূপা এণ্ড কোং-এর সহযোগিতায় বোম্বাইস পাণ্ডেবরমাকের
 নোবস-প্রাইজ-পাওয়া উপঢান্স

ডাঃ জিভাগো

অমরদাস : দীপক চৌধুরী

॥ বেঙ্গল পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

শ্রীমদ্রজনরায়ণ রায়ের নবতম গ্রন্থ

বহুলাংশে

প্রকাশিত "জটায়ু জালে" নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সপ্তম ও সত্যনিষ্ঠ রচনা, কেদার-বন্দরীর বহু পুরাতন পথ এই গ্রন্থে নূতন আলোকসম্পাতে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত হিমালয়-ভ্রমণ সাহিত্যে অতুলনীয় সংযোজন
 ১০ খানি আলোকচিত্রশোভিত প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার বই—মূল্য ৬.৫০ টাকা
 ॥ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই ॥

এই গ্রন্থে গবেষণাচর্য বাগল রচিত হইল।

যিহ্মাসাগর-পল্লিচর—দুই টাকা

বহুধারা স্তম্ভ রচিত

ভূহিন মেহু ভল্লভানে—৩

স্ববোধকুমার চক্রবর্তী রচিত

স্বম্যানি স্বীকৃত্য—দাত টাকা

ব্রহ্মস্রোত বন্দোপাধ্যায় রচিত

শব্দ-পল্লিচর—দাড়ে তিন টাকা

নির্মলকুমার বহু রচিত

গান্ধীচরিত—তিন টাকা

আলেক্সান্দার—আড়াই টাকা

কুমারস্বয়ং রচিত

শ্রীমদ্রায় সাই—দুই টাকা

প্রবোধকুমার চক্রবর্তী রচিত

হর্ষচরিত ১০, কুমারস্বয়ং ৫,

দশকুমার চরিত ৪,

বনমূল রচিত

মুগম্বা—তিন টাকা

তারাম্বর বন্দোপাধ্যায় রচিত

জাহ্নবীচরিত—চার টাকা

রজন পাবলিশিং হাউস ৫৭, ইন্ড বিখাস রোড, কলিকাতা-৩৭

সাহিত্যের খবর

বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ৪ ॥ পৌষ ১৩৩৯

আত্মন	জাতীয় সংগীত	১
খৃষ্টান মিশনারী ও ভারত ইতিহাস	দুর্গারি ঘোষ	২
বাংলায় কালিদাস-চর্চা	অনন্দের ঘোষ	৭
জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চা	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	২১
পথ চলে গেছে	সমর সোম	৩৩
চেক কবি মাথা	শিবপ্রসাদ বিশ্বাস	৪৮
চীনা বর্ষরত্নের বিরুদ্ধে কবিকর্তৃ	সত্যপ্রিয় ঘোষ	৫৬
শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত গ্রন্থ	হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	৫৭
অন্তরীক্ষের সঙ্গীত	অমিরতন মুখোপাধ্যায়	৫৮
নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন	রাধা বসু	৬৬
দেশে-বিদেশে	চাক্রদত্ত	৭০
নতুন বই		৭৫

নিয়মাবলী

সাহিত্যের খবর-এর বর্ষারম্ভ আধিন হইতে। তবে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক চাঁদা মতাক বার্ষিক ৬০০ ন. প. বায়াদিক ৩০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—বঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—১৪, বাইম চাটুজ্জ ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২।

সম্পাদক—অরোজ বসু

শ্রীলক্ষ্মণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৪, বঙ্গল চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
১৭, ভীম বোদ লেন, নবী সন্ন্যস্তী প্রেস, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

ମି. ଡି. ସାହୁ : ୧୦, ଡାକ୍ତରୀୟା ଗେ ଡିପ୍, ବାଲିକାତା-୧ ଗୋଷ୍ଠ : ୧୫-୧୦-୧୯୯୨

সাহিত্যের খবর



বর্ষ ১০ ॥

সংখ্যা ৬ ॥

ফাল্গুন ১৩৩৯

শান্তির প্রস্তাব	রবীন্দ্রনাথ	১
জীবনানন্দ দাশের কবিতা	রঞ্জিত সিংহ	২
রাধাপ্রেমের অলৌকিকত্ব	চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়	১৬
জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চার দ্বিতীয় পর্যায়	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	২৩
দেশে-বিদেশে	চারু দত্ত	৪৬
পথ চলে গেছে	সমর সোম	৫৩
নতুন বই		৭৫

নিয়মাবলী

সাহিত্যের খবর-এর বর্ষারম্ভ আধ্বিন হইতে। তবে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক চাঁদা মজার বার্ষিক ৬.০০ ন. প. বার্ষিক ৩.০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—বঙ্কিম চাটুজে স্ট্রিট কলিকাতা—১২।

২

সম্পাদক—অরোজ রত্ন

শতাধিক যথোপাধ্যায় কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত

১১, ভীম ঘোষ লেন, নবীন সরস্বতী প্রেস, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

প্রকাশের প্রতীক্ষায়

DR. SUNTIKUMAR CHATTERJEE

Languages & Literatures of Modern India

রূপা এণ্ড কোং-এর সহযোগিতায়

বোম্বাই পাবলিশিং হাউস

নোবিস-গ্রাইজ-পাওরা উপগ্রাম

ডাঃ জিত্তাগো

প্রবাসী: নীপক চৌধুরী

॥ বেঙ্গল পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

শ্রীমতীন্দ্রনাথ রায়ের নবতম গ্রন্থ

“বহুকালে”

‘প্রবাসীতে “এটার খালে” নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সর্বম ৩০ ভাগের ১৮তম; দেওয়ান-

বদরীদ বহু পুরাতন পথ এই গ্রন্থে নূতন আলোকনন্দ্যে উজ্জলতর হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত হিমালয়-ভ্রমণ দাহিত্যে

অতুলনীয় সংবোধন

১০ খানি আলোকচিত্রশোভিত প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার বই—মূল্য ৬.৫০ টাকা

১ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই ॥

যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত

বিজ্ঞানসাগর-পরিচয়—দুই টাকা

বহুধারা ও গুপ্ত রচিত

ভুহীন মেরু অভ্রম্বালে—৩

হুমায়ূন চন্দ্রবর্তী রচিত

রম্যাপি বীজ্য—মাত্র টাকা

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

শঙ্কর-পান্ডিত্য—নাড়ে তিন টাকা

নির্মলকুমার বসু রচিত

সাক্ষীচরিত—তিন টাকা

হুশীল রায় রচিত

জাতিসংঘ সংগ্ৰহ—আড়াই টাকা

—কুমারেশ ঘোষ রচিত

বদি গদি পাই—দুই টাকা

প্রবোধেন্দুসুন্দর চাকুরী অনুদিত

বর্ষচরিত ১০, কুমারসম্ভব ৫

দশকুমার চরিত ৪

বনকুমার রচিত

মুগ্ধা—তিন টাকা

ভারতবর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

জলসংগ্রহ—চার টাকা

রাজেন্দ্র পাবলিশিং হাউস ৫, ইন্ড বিথিন রোড, কলিকাতা-৩৬

সাহিত্যের খবর

বর্ষ ১০ ॥

সংখ্যা ১২ ॥

মূল্য ১০ পূ.

ভাবাশিল্প	রবীন্দ্রনাথ	১
বাকশিল্পী রবীন্দ্রনাথ	বিলয়ক নাট্যাল	২
পঞ্চ'চলে গেছে	সমর সোহ	১০
অন্তরীক্ষের সঙ্গীত	অমিররতন মুখোপাধ্যায়	২২
দেবে-বিদেশে	চাঁক দত্ত	১০
সমর সেনের কবিতা	রঞ্জিত সিংহ	১১
জীবনের অভ্যাজ্য স্মৃতি	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৫০
পুষ্পবাণবিলাস	অমলেন্দু ঘোষ	১৩
রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী	পুণ্ডিতবিহারী সেন	১১
নতুন বই		৬২

প্রিয়স্বামী

সাহিত্যের খবর-এর বর্গীকৃত আশ্বিন হইতে। তখন যে কোন মাসের গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক চাঁদা মতাক বাধিক ৬০০ ন. প. বাধ্যনিক ৩০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—বঙ্গবাণী প্রকাশন আর্টস্টেট লিমিটেড—বঙ্গিম চারুকলা প্রীট প্রকাশনা—১২।

সম্পাদক—দ্রষ্টব্য

পঞ্জীকৃত প্রকাশনায় বর্ষিক ১২, বঙ্গিম চারুকলা প্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

১৭. ভিন্ন প্রকারের, নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হইতে পারে।

॥ অবিস্মরণীয় সাহিত্য সত্তার ॥

স্ববোধকুমার চক্রবর্তীর

ভুলভঙ্গা

২য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

আর তাঁদ

৩'০০ ॥

মনিপদ্ম

২য় মুদ্রণ ৫'০০ ॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্বাভ্যন্তর

২য় মুদ্রণ ২'০০ ॥

মুগভৃঙ্গ

৩'০০ ॥

মাধুর

২য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

নরোজকুমার রায়চৌধুরীর

কুশান্ন

২য় মুদ্রণ ৬'০০ ॥

মহাকাশ

২য় মুদ্রণ ৩'৫০ ॥

নীলাঞ্জল

২য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

রমাপদ চৌধুরীর

নীলকণ্ঠের

মুক্তবন্ধ

৩'০০ ॥

হরেকৃষ্ণকামনা

২য় মুদ্রণ ২'৫০ ॥

নানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প

৩য় মুঃ ৫'০০ ॥

প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান

২য় মুদ্রণ ২'০০ ॥

জীবন্ত

২য় মুঃ ৪'০০ ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সীমাস্তরের অষ্টলোক

৩'০০ ॥

কল্পলীলাবৃত্তির দেশে

২য় মুদ্রণ ৩'৫০ ॥

বিক্রমাদিত্যের

দেশে দেশে

২য় মুঃ ৩'০০ ॥

খুলী দত্ত ওরাজ

২য় মুঃ ১'৭৫ ॥

নুহের ইয়োদশ

৪'০০ ॥

নারায়ণ গাঙ্গুলের

নীয়েন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

স্বামীক

৪'০০ ॥

ভাস্করবর সত্বে

২'০০ ॥

মহাশয়ী

৪'০০ ॥

জীবন মুহূর্ত

২য় মুদ্রণ ২'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশিংস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

খোলো হে আকাশ

রবীন্দ্রনাথ

খোলো, খোলো হে আকাশ, শুধু তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাঁড় সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিলো আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলায় পাখি জনশূন্য এ ঘোর প্রান্তরে
ল'য়ে তার ভীকু দীপশিখা।

দিগন্তের কোন্ পায়ে চলে খোলো আমার ক্ষণিকা ॥
খোলো, খোলো হে আকাশ, শুধু তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের গালায় মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে দগন্তের
আধিনে গোধূলি আলো, সেথা হতে নাগে পৃথ্বী'পরে
আবণের সারাফ-যুধিকা ;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা ॥

[ক্ষণিকা, পৃথ্বী]

কবির বস্তু আদ্য সকল হয়েছে। যিহানবলে বলীমান মানব আর মহাকাশ পরিক্রমা-বহু
মর্ত পৃথিবীতে ফিরে আসতে গেরেছে। মহাকাশচারী মানব যদ্যকাম মহাশূন্য থেকে নীলাত
পৃথিবীর নাক্ষত্র বর্তুলমূর্তি প্রত্যক্ষ করে-এসেছে। সজ্জার অবস্থায় পৃথিবীর ব্যাপ্যাকরণের
বাহিরে গির আবার মাধ্যাকর্ষণের জগতে ফিরে এসে মানব কালজয়ী কীর্তি স্থাপনা করেছে।
সোবিয়েৎ মহাকাশচারী যুরি গাগারিন (১২ই এপ্রিল, ১৯৬১), ঘেরম্যান টিউ (৬ই আগষ্ট,
১৯৬১), মার্কিন মহাকাশচারী জন গ্লেন (২০শে নভেম্বর, ১৯৬২), কট কাপেটান (২৪শে মে,
১৯৬২) মহাকাশ ভ্রমণে প্রভাববর্তন করেন। তারপর সোবিয়েৎ মহাকাশচারী আন্টিন
নিকোলিয়েভ (১১ই আগষ্ট, ১৯৬২) ও পাভেল পোপোভিচ (১২ই আগষ্ট, ১৯৬২) একযোগে চুই
বভ্র মহাকাশযানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। বিজ্ঞানের স্বাভাবিক দক্ষতা আর মহাকাশের
শুধু নীল যবনিকা উদোচনে উজ্জ্বল হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে মহাকাশ ভ্রমণ সভ্যতার ইতিহাসে
শ্রমণীয়তম ঘটনা। আর কবির নক্ষত্র বাস্তব রূপসমূহ করেছে। আমরা অভিভাব্যমান,
আমাদের স্বীবনকালে এবং রবীন্দ্রনাথের বর্তমানকালে এই বিজ্ঞান সংঘটিত হয়েছে। স. সা. ৩

জাতীয় সংহতি সাধনে লেখকের ভূমিকা

ডক্টর নবোদয়ী রানাকৃষ্ণ

আমাদের আন্দোলনের বিষয় হল জাতীয় সংহতি সাধনে লেখকের ভূমিকা। সাম্প্রতিক নির্বাচনকালে কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ মানুষের উপর নাস্তাদায়িকতা, জাতি-বিচার ও ভাষাগত অস্বত্তার প্রভাব কত দূরপ্রসারী, তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। আমাদের দেশের বিপদ বাহির থেকে নয়, তেভর থেকেই। আমাদের শত্রু আমাদের থেকে দূরে নেই, তারা আমাদের মধ্যেই আছে ও দেশের অভ্যন্তরেই আছে। আমাদের দেশকে যদি আধুনিক সভ্য দেশে পরিণত হতে হয়, তবে এই সবের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

ভাষাগত মতভিভেদের ক্ষেত্রে সাহিত্য আকাদেমি তার যথান্যয় করছে। আকাদেমি লেখকদের একত্র করছে, অনুবাদে সাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। শিল্প-উদ্যোগের ফলেও কিছু পরিমাণ সংহতি সাধিত হচ্ছে। আমাদের প্রধান প্রধান নগর—মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী—চরিত্রে বহুভাষী। এইসব নগরের লোকেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান-পবেষণাগার—এগুলিও বিভিন্ন প্রাচ্যেয় মাংসকে কাছাকাছি নিয়ে আসছে ও পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করছে। কিন্তু এইসব হ'ল ছোটখাট ব্যাপার।

বহু মীম্বতে এক বহন আবদ্ধ করার মতো বিশাল উদ্দেশ্য অণুগ্রহী থাকা প্রয়োজন— যাতে করে তারা অনুভব করে যে তারা এক মহৎ সমগ্রতার অংশ। ভাষাগত রেধারেবি ও অস্ববিধা আমরা জনগণ কাটিয়ে উঠছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা, ধর্মীয় আচরণের প্রতি আমাদের গুরুত্ব আরোপ-প্রবণতা—এইগুলিকে অতিক্রম করা আমো কঠিন কর্ম। আমরা নিজেদের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ 'নেকুলার' রাষ্ট্র বলে থাকি; তার অর্থ এই নয় যে, আমরা কোনো ধর্মমত বিশ্বাস কবি না বা ধর্মের প্রতি আমরা উদাসীন। এ কথা'র একমাত্র অর্থ হল আমরা রাষ্ট্রকে কোনো বিশেষ ধর্মমতের সঙ্গে এক কবে দেখি না এবং সকল ধর্মমতকেই আমরা শ্রদ্ধা কবি ও তাদের আজপ্রকাশ ও প্রসারের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি।

ধর্মমত খাই হোক না কেন, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মমত পালন ও প্রচার করার স্বাধীনতা রয়েছে। মতফল না সে-দ্বারা তত্ত্ব, নৌজ্ঞানের দীপা লক্ষ্যে করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। এই হল আমাদের দেশের ঐতিহ্য। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি স্বাধীনতার পরবর্তীকালের আবিষ্কার নয়।

আমাদের দেশে ধর্ম বলতে বুঝিয়েছে একটি মানসিক অবস্থা, মতের সঙ্গে একটি সম্পর্ক, জীবনধারণের একটি প্রথা। একজনকে ধর্মতাবাপন্ন বলা হয়েছে এই কারণে নয় যে দর্শনচিন্তায় নিমগ্ন, বা কিছু ধর্মোচিত গান গায়, অথবা মন্দির বা গির্জায় যায়। তাকেই বলা হবে মতাবতারের ধর্মতাবাপন্ন মানুষ, যদি সে নিজেকে নোতুন করে গড়ে তোলে, তার আপন প্রকৃতির মধ্যে এক রূপান্তর ঘটে, এবং বলতে পারে সে তার আপন মতের মধ্যে মতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আমরা এই কথা বলে শুরু করেছি—‘এহু ব্রহ্মসি’। বুদ্ধদেব বলেছেন ‘বোধি’ প্রতিষ্ঠা মাত্রের মধ্যেই আছে। বৌদ্ধ আমাদের বলেছেন, ‘আমি ও আমার পিতা এক, আমি মত, আমি পথ, আমিই জীবন’। ইসলামের সন্ত বহু ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন কারণ তাঁরা বলেছেন, ‘আমিই মত’। পরমেশ্বর মুহাম্মদ বলেছেন, ‘যদি তুমি নিজেকে জানো, তবে তুমি আল্লাহকে জানো’।

সুতরাং আপনারা দেখছেন যে, ছাতিময় মানস-অবস্থানরূপে, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের অপ্রতিষ্ঠারূপে, দিব্যতাবাবদ অবস্থানরূপে ধর্মের এই উচ্চতম ধারণা প্রায় সকল ধর্মেই বর্তমান। এখন আমরা মতের সঙ্গে এই সম্পর্ক ও মিলনের কথা ব্যক্ত করতে প্রয়াস করি, তখন আমরা উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি। আমরা বলেছি যে এই অভিজ্ঞতার পরম নির্ধান যুক্তি বা ভাবের পরমরূপে ধরা পড়ে না। এইনয় বিষয়ের উপযোগী ভাষাও প্রকাশবাহন বা যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।

আপনারা আরো দেখবেন, মতের সঙ্গে সম্পর্ক নানা বিচিত্র প্রকাশের অধীন, এবং ধর্মও এক ধরনের জীবন-যাত্রা। আমরা সকলের প্রতি এই উদার জীবনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি। একজন মতাবতারের মানসিক ব্যক্তি মানুষকে মানুষে প্রভেদ করে না। ‘নিদোষং হি মম ব্রহ্ম’—ব্রহ্ম নিদোষ, তা নয়, তা মানুষকে মানুষকে কোনো পার্থক্য রচনা করে না। বুদ্ধদেব পর্যন্ত আমরা মানুষকে নানাপ্রকারের অভ্যাসের অধীন করে রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত যদিও আমরা নিজেদের একদরবাদী বা অন্যদরবাদী বলা

তথাপি আমরা ঈশ্বর-অবিশ্বাসী। আমরা তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা বিশ্বাস করি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা তা অস্বীকার করি।

সুতরাং ধর্মকে বাপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে, তাকে এমন এক অর্থে গ্রহণ করতে হবে যা আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত, যে ঐতিহ্য ইহুদী, খ্রীষ্টান, পার্শী ও অন্যান্যদের এই ভারতবর্ষে আসতে, উপনিষিষ্ট হতে ও ভারতকে আপন ভূমি বলে গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়েছে এবং নিজ নিজ অধিকার ও বিশ্বাস অনুযায়ী চলবার স্বাধীনতা দিয়েছে। আমরা কখনো আমাদের বিশ্বাস, মতবাদ অথবা জীবনযাত্রা বহিরাগত উপনিষিষ্টদের উপর লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করি নি। এই আদর্শ থেকে যদি বা কখনো বিচ্যুতি ঘটেছে, সেইসব বিচ্যুতি এই মূলগত নীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে, সকল ধর্মগত ও বিশ্বাসের প্রতি আমরা আতিথ্যপরায়ণ।

অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, সংখ্যালঘু ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার,—এইগুলি আমাদের যথার্থ ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত নয়। আমরা এই সবকে প্রত্যাশ দিই নি, তা নয়, কিন্তু যদি দিয়েও থাকি, তাহলে আমরা আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েই তা করেছি।

জাতি-বিচার আর একটি বিষয়—যা এখানে আলোচনার যোগ্য। একদা জাতিভেদ আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয়েছিল। যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষ প্রথম মিলিত হয়েছিল, তখন আমরা এমন-এক বিধান প্রবর্তিত করেছিলাম যার দ্বারা আমরা বহিরাগতদের বিভাজিত বা নিশ্চিহ্ন করিনি, অথবা তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করি নি। বিবরণ রাষ্ট্রে তাদের একটা ঠাঁই করে দিয়েছিলাম। সেদিন জাতিভেদে ক্ষে যে যৌক্তিকতাই থাকুক না কেন, আজ তার স্বপক্ষে কিছুই বলার নেই।

সকল সম্প্রদায় ও ধর্মের বহু মানুষই এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রাচীনকাল থেকে বলে আসছেন। নানক, কবীর, রামানন্ড রামানন্দ প্রভৃতি একেশ্বর-বাদীরা পুরষ ব্রহ্মের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা সবাই আমাদের বলেছেন আমরা যা করছি তা ভ্রান্ত্যম্বাদিত নয়। অসংখ্যবার আমাদের বলা হয়েছে, আমরা সবাই মুক্ত ওদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করি, আমাদের কর্মের ফলেই পুনর্জন্ম হয়।

এই জগৎ ‘এক বর্ণ’—গুরুতে তা ছিল এক জাতি। ‘কর্ম ক্রিয়া বিভেদেন চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্’। কর্ম ও ক্রিয়ার দ্বারাই জাতিগত বিভেদ সৃষ্ট হয়েছিল। সুতরাং আমাদের মূলে কিরে যেতে হয় যে, আমরা সবাই

মুক্ত শুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করি, আমাদের কর্মপ্রয়াস ও সাধনার ফলেই পুনর্জন্ম ঘটে।

পতিত মানুষের গ্রন্থ উল্লেখ গাই ছান্দোগ্য উপনিষদে। সেখানে বসে হয়েছে, “তারা পতিত যারা হত্যা, চৌর্য, ব্যাভিচার ও মত্ততা দোষহীন। ‘পতিত’ শব্দটি ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্যবহৃত হয়েছে। নীতি-মাণকাঠি মানুষে মানুষে ভেদ-বিচারের একমাত্র ভিত্তি। আমাদের এই মূলগত ভিত্তিতে কিবে যেতে হবে, আর জাতি-সংস্কারের এই একমাত্র পথ।

দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে জাতি-ভেদ আর সামাজিক কুপ্রথা নয়। তা এখন রাজনৈতিক কুপ্রথা ও শাসনক্ষেত্রজ কুপ্রথায় পরিণত হয়েছে। আমরা ভোট চাই এবং ভোটদাতাদের পছন্দানুযায়ী প্রার্থী খাড়া করি। যদি নির্বাচন-ক্ষেত্রটি নাদার গোষ্ঠী-অধ্যুষিত তাহলে আমরা একজন নাদারকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করাই। যদি তা হরিজন-অধ্যুষিত হয়, তবে একজন হরিজনকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করাই। যদি তা কান্দি-অধ্যুষিত হয়, তবে একজন কান্দিকে দাঁড় করাই। আমরা এই কাজ করছি। সুতরাং এটা খুবই দরকার যে রাজনীতিকেরা যতটা সম্ভব আমরা এই সংকীর্ণ জলাভূমি থেকে মুক্ত করব।

যে কথা বলে শুরু করেছিলেন—আমাদের বিপদ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ। বিচ্ছিন্নতা, সংঘর্ষ, অসংহতির সকল উৎস আমাদের মধ্যেই বর্তমান। তাই যতদিন না আমরা আমাদের প্রকৃতি, কাজকর্ম, ব্যবহার বদলাতে পারছি, ততদিন এই সব অন্ত্যায়কে সরানো যাবে না। আমি বলতে চাই মানব-প্রকৃতি অমড় নয়। তা বহুল পরিমাণে ষাটসহ ও পরিবর্তনশীল। পাশাণ-যুগ থেকে আমাদের অগ্রগতি শুরু হয়েছে, আজ আমরা একালে এসে উপনীত হয়েছি। যে যুগেই আমরা আর পরিবর্তিত হবো না, সেই যুগেই আমাদের মৃত্যু। সুতরাং আমাদের উচিত আধুনিক কালের চাহিদা বিচার ও তদনুযায়ী আমাদেরকে আধুনিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত করে কালোপযোগী করে তোলা।

লেখকরা রচনা-মাধ্যমে তাঁদের পাঠকদের সামনে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতটি তুলে ধরতে পারেন। আপনারা নিজের ও আপনাদের জ্যেষ্ঠ বা পাঠকদের সঙ্গে একটি সংযোগ সাধন করুন। আর যদি আপনাদের আদর্শ মহৎ ও সত্য হয়, তাহলে আপনি সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই মহতের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে পারবেন। সুতরাং যখন আমরা জাতীয় সংহতি সাধনের সমস্তর মুশোমুখি দাঁড়িয়েছি, তখন লেখকদের দায়িত্ব স্পষ্টরূপে বলে গহণ করা যেতে পারে। আমি বিশ্বাস করি লেখকেরা সত্য আশাদর্শ প্রচারে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত

করবেন ; মন্তভামুক্ত চিন্তা ও মতার্থ অল্পভূতি প্রচারে আত্মনিয়োগ করবেন ।
যদি আপনারা এই কাজ করতে সমর্থ হন, তাহলেই দেশগঠনে ও নোতুন
পৃথিবী-গঠনে আপনাদের মতামত ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে করা যাবে ।

দুই ২য় এপ্রিল, ১৯৬২, নয়াদিল্লীতে জাতীয় সংসদে সাধন সংশ্লিষ্ট লেখকদের বৈঠকে
এসব ভাষণের বক্তৃত্ত্ববাদ ।—স. সা. প.

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত হ'ল

প্রবোধকুমার গান্ধাতের

রাশিয়ার ডায়েরী

রিপোর্টারের চক্ষু নয়, দৃষ্টব্য দৃষ্টির ক্লাস্তিকর তালিকা নয়, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত
ভ্রমণ নয়—এই গ্রন্থ একজন পরিব্রাজকের স্বচ্ছন্দ বিহারের ইতিবৃত্ত ।
তিনি যাদের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা হ'লেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী,
অগ্রান্ত্র মন্ত্রী, রজারয়ের কর্তৃপক্ষ, কলেকটিভ ফার্মের ডাইরেক্টর, সাহিত্যকর্মী,
নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, অধ্যাপক, সম্পাদক, বৈজ্ঞানিক, গ্রন্থ-
প্রকাশক, কারখানার কর্মী, আদালতের হাকিম, পুলিশের কর্মচারী,
ব্যাঙ্কের কর্মী, পথের ঝাড়ুদার, ধোপা, নাপিত, মুচি, রেলকর্মী, গায়ক-
গায়িকা, কবি ও ঔপন্যাসিক, হোটেলের বি-চাকর, বিমানচালক,
বাড়ীওয়ালার, দোকানদার, চাষী ও ফড়ে, গির্জার পুরোহিত ও মন্দিরের
ইমাম,—তাঁর আলাপ-আলোচনা সকল শ্রেণীর মধ্যে ঘুরেছে । এই বিরাট
গ্রন্থ সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবন-মহাকাব্যের মতো । বিগত ৪৫ বৎসরের
মধ্যে বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি । এই গ্রন্থে
একই মূদ্রে কল সাম্রাজ্য তথা সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাস, ভূগোল,
পুরাতত্ত্ব, সমাজ-ব্যবস্থা, নাস্ত্যবাদ, নিরীশ্বরবাদের জন্মবৃত্তান্ত, জন-জীবনের
কথা ও কাহিনী, লেনিনের নব-সভ্যতার প্রবর্তন, বলশেভিক আন্দোলনের
লক্ষ লক্ষ মরহত্যা ও আত্মবলিদানের লোগহর্ষক কাহিনী, স্ট্যালিন আন্দোলনের
ভয়াবহ উৎপীড়ন ও মরহত্যা, বরোয়া দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ ইতিহাস,
পাশ্চাত্য জগতের প্রতিটি জাতির শক্ততা, লেনিনের last testament
ট্রটস্কির বিরুদ্ধে স্ট্যালিনের চক্রান্ত,—এই সকল ইতিহাসের পুনরুদ্ধার
এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ।

ইতালিয়ান আর্ট পেপারে ১৭৯ খানা একরঙা ও ১৫ খানা বহুবর্ণ
চিত্রাবলী এই স্মৃতিগ্রন্থের অত্যন্তম প্রধান আকর্ষণ । দাম পঁচিশ টাকা ।

বেঙ্গল পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২

ওয়ারী

জগন্নাথ

কোলকাতা শহরে একটা ভ্রাম্যমাণ জাত আছে। তার নাম 'ওয়ারী'। আগরওয়ারী, বুন্দুনেওয়ারীদের কথা বলছি না। তাঁরা থাকেন বড়বাগানের উপর তলায়। এরা থাকে ফুটপাথে। 'থাকে' বলাটা ঠিক হল না, ঘুরে বেড়ায়। শহরের দৈনন্দিন জীবনের সহযাত্রী। সেই জীবনযাত্রার উপকরণ যেমন বেড়েছে, তার সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে উঠেছে ওয়ারীর দল।

ভোরবেলা গৃহস্থের ঘুম ভাঙবার আগেই অলিতে-গলিতে দেখা দেবে সাইকেল-আরোহী 'কাগজ-ওয়ারী'। ডাকাডাকি নেই, কড়ানাদা নেই, জানালার ফাঁক দিয়ে কখনো বা রাস্তা থেকেই দোঁড়নার বারান্দার ছুঁড়ে দিয়ে যাবে সন্তোষ যন্ত্রজাত টাটকা ও গরম একখানা ভাঁজ-করা দৈনিক কাগজ। কেমন একটা গৌন্দা গন্ধ মাখান তার গায়ে। তার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সরবে দার প্রবেশ তার নাম 'দুধওয়ারী'। বাইরে দীন ভিতরে শানদালো বালতি-বাহী বিহার-নন্দন। 'দুধ' নামক সেই কালচে খেতবর্ণ অতি তরল বস্তুটি শুধু শিশু ভোলাবার অণুখ্য নয়, এঁ সত্তা পাটভাঙা কাগজখানার সঙ্গেও তার সম্পর্ক। ওরই সহযোগে তৈরী হবে একটি জাঁতিগোত্রহীন মিশ্রণ, যার ধুমারিত পেয়লাটি হাতে না থাকলে টাটকা খবরকে মনে হবে বাসী, রাজনৈতিক বক্তৃতার সব ভাত মাঠে মারা যাবে, নারীঘটিত মামলার মনোহর রিপোর্ট নেহে বা মনে কোনো তাপ সঞ্চার করবে না।

বেলা যেমন বাড়বে, তার সঙ্গে শুরু হবে নানা পণ্যের পনরী মাথাট বিচিত্র ভাঙ্গী-ওয়ারীদের ভিড় মিহি ও বাজগাই, নানা চুরের মিশ্রণ। ক্রোটের দিনে বোম্বাই হুকারে পাড়া কাঁপিয়ে এগিরে যাবে 'বোম্বাই আ-আ-ম'; বর্ষার শোনা যাবে 'ছাতা সাগাবে;.....'র সুরেলা আশ্রান। শীত পড়লেই 'নলেন ও-উ-উ-ড' আর জরনগরের মোয়া.....' এবং তারই পেছনে ফল-ওয়ারীর পেশোয়ারী গর্জন—'বেদানা আ-আ-ম'। 'শিশি-বোতল-কাগজ-বিক্রি'র কর্কশ কর্তৃ গলির মোড়ে গিলিয়ে যেতে না যেতেই বেজে উঠবে 'শীল-কাটাবে'র কোমল নিখাদ। সন্ধ্যাহের ক্রান্ত বেলায় সব কলরব যখন শান্ত, গলিপথ জনবিরল, নিরুদ্ভূত পাড়া জাগিয়ে দিয়ে যাবে বেজে যাবে গুন-উদাসী 'বাসনওয়ারী'র কঁামর। চৈত্র সন্ধ্যার যাতাল হাওয়ার এক কালক মিষ্টি গুড় ছড়িয়ে দিয়ে আবছায়া অন্ধকারে গিলিয়ে যাবে 'বে-ল কুল'। হুরে যেন

তার 'চোখ গেল'র চমক। রাজি যখন গভীর হবে দু'র মোড় থেকে ভেসে আসবে 'কুলপি-বরফের' তন্দ্রাজড়িত গভীর কণ্ঠ, তার সঙ্গে নেশার আমেজ।

মাইকের রাজস্ব শুরু হবার আগে পাড়ায় পাড়ায় কেরি-করে-ফেরা এই ওয়ালাদের স্ত্রীলাপই কোলকাতার নগর-সঙ্গীত। দিন দিন এরা হঠে যাচ্ছে। দ্রুত-বর্ধমান আধুনিকতার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। যাদের কাছে এদের আবেদন, বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থর শুনিয়ে যাদের মনে এরা দোলা দিত, সেই গৃহলক্ষীর দল এখন গ্রহের অবরোধ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। প্রাক্টিকের ব্যাগ বাগিয়ে কিংবা শান্তিনিকেতনী লম্বা খলে কাঁধে ঝুলিয়ে ছুটতে ছুটতে বাস ধরে হানা দিচ্ছেন নিউ মার্কেট আর হকার্স কর্ণারের সুসজ্জিত পণ্য-শালায়। তারবাহী 'হকার' অর্থাৎ সেই পুরনো দিনের ওয়ালার দিকে তাদের আর মজর পড়ে না। জানালা-পথে কোমল কণ্ঠের সাগ্রহ আহ্বান শুনে একদা যে-গ্রহ-প্রান্তে সে বেনাতি বিছিয়ে বসত, আজ তার রুদ্ধবার থেকে ডেকে ডেকে ফিরে যায়। কেউ সাড়া দেয় না। তাই একে একে তারা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

যশোর জেলার সেই কুঁজো লোকটা যার মুখে 'চাই চীন! সিন্দুর-উ-উর' শুনে শুনে এ পাড়ার মেয়ে বৌরা শাশুড়ী হল, তাকে আর দেখা যায় না। সিন্দুরের কদর চলে গেছে। তার জায়গায় এসেছে সুদৃশ্য শিশিভরা কুমকুম, যার যোগান দেয় ঘনিহারী দোকানদার। 'চুড়ি চা-আ আ-ই' বলে ইমন কল্যাণের তান তুলতে যে গোলগাল হিন্দুস্থানী চুড়িওয়ালী, ভাঙা ভাঙা বাংলায় মিষ্টি কথার তুবড়ি ছুটিয়ে একমুহুরে মা ও মেয়ের দুহাত ভরে পুরিয়ে যেত রং বেরং-এর কাঁচের চুড়ি, সেও কোথায় হারিয়ে গেছে। চুড়ি আর কেউ চায় না। চাইলেও চলে যায় চীনাবাজারে কিংবা হগ-মার্কেটে দিল্লী-ওয়ালার দোকানে।

শহরের মানুষ আজ বহিমুখী। একদিন হয়তো আসবে যখন সে আর ঘর বাঁধবে না। বাড়ি ভেঙে ভেঙে ফ্যাট উঠেছে। সেদিন ফ্যাট ভেঙে উঠবে হোটেল। সেদিন ওয়ালাদের মাথাং চড়ে নানা পণ্যের বোঝা গ্রহস্থের ঘারে ঘারে ফিরবে না। গলির মোড়ে মোড়ে উঠবে না সেই পরিচিত কণ্ঠের অন্তরঙ্গ আহ্বান। তেমন দিন যদি আসে, কোলকাতার রাস্তার স্থর চলে গিয়ে থাকবে শুধু শব্দ। দোকানদার আর খরিদদার এই ছুপফ নিয়ে যে দেওয়া-নেওয়ার জগৎ তার ভিতরকার সখ্যের স্বত্রটুকু চলে যাবে, তার জায়গায় দেখা দেবে স্বার্থের সংঘাত আর লাভ-ক্ষতির টানাটানি।

শ্রীধর্মের দুর্ভাবনা

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

গ্রামের নাম ঘোষপাড়া। অনেক কাল ধরে অনেক ঘর গোয়ালাদেরই বাস। অল্প জাতির মধ্যে ঘোষা-নাপিত কামার-কুমোর আছে ছ'চার বর, আর ছ'ঘর আছে বামুন। বামুন ছ'ঘর গোয়ালাদের আশ্রয় করেই ছিল, তাঁদের বিবাহ-শ্রাদ্ধ, পূজা-অর্চা, পাল-পার্বণ, দান-ব্রতকে অবলম্বন করেই তাঁদের পরিবার পালনও কোনো রকমে চলে যেত।

আগে ঘোষপাড়া মোটামুটি অবস্থাপন্ন গ্রাম ছিল। মোটা খেতে মোটা পরতে কারো কোন কষ্ট ছিল না, ধর্ম-কর্ম পাল-পার্বণেও খরচ-পাতি কমতে কারোর কার্পণ্য ছিল না।

কিন্তু ঘোষদের অবস্থা এখন ক্রমেই পড়ে আসছে। দুই-ছ'ঘর বামনাও এখন আর সংসার চলে না, কেউ তাই মন দিয়েছে খেত-খামারের দিকে, কেউ বুকেছে ব্যবসারে—কেউ ছুটেছে শহরের দিকে অনিশ্চিত উদ্দেশে।

বামুন ছ'ঘরেরও তাই দ্রবস্থার সীমা। যারা আশপাশের গাঁয়ে গিয়ে একটু আধটু লেখাপড়া শিখতে পেরেছে তারা ছুটছাট চলে গেছে এতদিক সেদিক; কোনও লেখাপড়াই শিখতে পারেনি বটুক আচাষি; অতএব ঘোষপাড়ার ধর্মকর্ম পাল-পার্বণের ভার শেষ পর্যন্ত তার দ্বন্ধেই স্তম্ভ হয়েছিল।

কিন্তু বটুক ঠাকুরকে নিয়ে কিছুদিন ধরে একটা আপত্তির গুত্তর দেখা দিয়েছে ঘোষপাড়ার গোয়ালাদের ভিতরে। মেয়েদের মধ্যেও এখন কণাটা চানু হয়ে গেছে যে বটুক ঠাকুর তুল ময় পড়ান।

এ নিয়ে প্রথম একটু আলোড়ন দেখা দিয়েছিল জগাই ঘোষের বাড়ি। লক্ষ্মীপূজার রাতে জগাই ঘোষের লেখাপড়া-জানা ভাগে বলল, মায়া, তুমি করলে লক্ষ্মীপূজা, আর তোমার পুরুতর্ভাকু প্রথম থেকে শেষপর্বৎ ময় পড়ল 'নমঃ শ্রীগণপত্যয়ে নমঃ'! ব্যাপারটা কি হ'ল?

জগাই ঘোষ ভাগের কথাটা প্রথমে তেমন আমল দিল না, নোড়ুন ইংরেজি পড়া ছেলেমানুষ, ওরা আর মন্ত্রের কথা কি বুঝবে। তবু মনে খটকা যখন একবার লাগিয়ে দিয়েছে তখন ভো ভোর একেবারে চুপ করে বসে থাকে বামুন না! যাইল পাঁচেক দূরের গাঁয়ে থাকেন চিন্তামণি সর্বাঙ্গ, প্রকাণ্ড পণ্ডিত।

ঘটিতে হাঁটতে তাঁর কাছে গিয়ে জগাই বোব যেদিন শুনে এল যে গণপতি হলেন গণেশ, তখন মনটা তাঁর একেবারে বাচ্ছেতাই হয়ে রইল।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল শিবু গোয়ালার বাড়ি। শিবুর মেঝো মেয়ে, বাপের বাড়ি এসেছে বেড়াতে; শস্তুরবাড়িতে সে উপোসী থেকে ক'রে দেবী সন্তটার ব্রত। ব্রতকথা শুনবার জন্তে পুরোহিত ডাকতে বলায় শিবু ডেকে নিয়ে এল বটুক ঠাকুরকে। বটুক ঠাকুর এসে শিবুর মেয়েকে খা ব্রতের মন্ত্র পড়াল তা শুনে মেয়ে ত চটেমটে লাল। মন্ত্রপাঠের শেষে সে ঠাকুরকে গিয়ে এগিয়ে প্রণামও করল না, চাল-ডাল-ছন লকার ভোজ্য পাত্রটিও তার হাতে দিল না, গ্যাট হয়ে ব'লে থেকে সে বলল, এ মন্ত্র আমার ব্রতের মন্ত্রই নয়; আমি এতদিন মন্ত্র শুনছি, মন্ত্র শুনলেই আমি ঠিক বুঝতে পারি। মা উঠলেন বিষম রেগে। একি অনাচ্ছিষ্ট কথা, পুরুতঠাকুর তুল মন্ত্র পড়াতে যাবেন কেন?

শিবু গোয়ালার শিম-বরবাট গাছে মাচা দিচ্ছিল পশ্চিমের ভিড়ায়, শিবুর স্ত্রী নাতনীকে পাঠিয়ে ডেকে আনাল শিবুকে। শিবু গোয়ালার আসতে শিবুর মৃত্যুধু কিস্ কিস্ ক'রে বলল, ঠিকই বলেছেন শেখঠাকুর বি, আমি তো অনেকদিন পঞ্চমী ব্রত করেছে; পুরুতঠাকুর যে সন্তটার মন্ত্র ব'লে ঠাকুরবিকে শুনিয়ে দিলেন সেই পঞ্চমীব্রতের মন্ত্র।

শ্রুতি শিবু প্রথমে খানিকটা কি করি কি করি করতে লাগল, তারপরে চট করে ঠিকান্বিত বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটাকে সামলে নিল; মেয়েকে ডেকে বলল,— অ চন্দনা, ওরে তোর দেশে সন্তটার এক মন্ত্র, আমার দেশে আর এক মন্ত্র। সব দেশ কি এক মন্ত্র হয় রে পাগলী? আমার বাড়িতে আমার মন্ত্র শোন, তোর শস্তুরবাড়ি গিয়ে আবার অগ্র মন্ত্র শুনিস্।

মেয়ে চন্দনার মন ওঠে না কিছুতেই, তবু বাপের কথা অবহেলা করতে পারে না। উঠে গিয়ে প্রণাম একটা করল বটুক ঠাকুরের পায়ে; ভোজ্যপাত্রটা আর হাতে হাতে না দিয়ে মাটিতে রেখে দিয়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

যাবার বেলায় বটুক ঠাকুর মন্তব্য ক'রে গেলেন, তোর মেঝো মেয়েটি তো বড় জেদী রে শিবু!

এব যা হোক না হয় অল্পের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু জিনিসটা অত্যন্ত ঘোরান হয়ে উঠল হেমন্ত ঘোষের মেয়ের বিয়েতে। বিয়ের লগ্ন একেবারে শেষ রাত্রে। তখনও বরপক্ষের পুরোহিত এসে পৌঁছন নি, তাঁর আর একপ্রায়ে

আর একটা বিয়ে আছে, সেইটো নিয়ে তিনি আনবেন। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা চলে না,—আর দেরী করলে যে শুধু লগ্ন থাকবে না তা নয়, রাতই যে থাকবে না। অতএব বরের বাপ উদ্দেশ্যে নিজের পুরোহিতকে ঘোড়া ছিঁচকে বলে গাল পেড়ে হেমন্ত ঘোষকে বলল, আপনার পুরুত দিয়েই ময়দা তাজাতাড়ি পড়িয়ে দিন, তারপর আমি ঐ বামুনের পোকে ছুঁবিয়ের দক্ষিণে একেবারে ভাল করে খাইয়ে দেব।

আর গতান্তরও তো নেই কিছু, অতএব বরকে বাসর থেকে এনে ছাদনাতলার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে ঘর থেকে নিয়ে আসা হ'ল এবং বরের চারদিকে পুরো নাতপাক দোরান হ'ল। তারপর বটুক ঠাকুরকেই পুরুত বনিয়ে বিয়ের ময়দা আরম্ভ হয়ে গেল।

বটুক ঠাকুর নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য খুব জোরের জোরেই ময়দা আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু উপস্থিত যারা তারা লক্ষ্য করছে, বিয়ের ময়দা পড়তে হয় বেশির ভাগই কতাদাতাকে ও বরকে; কিন্তু বটুক ঠাকুর অপর কাউকে তেমন কোন যোগ না দিয়ে নিজেই গড়গড় করে পানিকটা ময়দা আউড়ে যাচ্ছেন।

বটুক ঠাকুর বেশি দূর অগ্রসর না হ'তেই দূর থেকে একটা শব্দ শোনা গেল,—আরে বামুন মশাই থামুন—করছেন কি আপনি?

সবাই তাকিয়ে দেখল, নামাবলী কাঁধে লম্বা লম্বা পা কেলে এক বামুনঠাকুর হৃদয়ঙ্গম হয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে বরের পিতা ত আস্ত ফেপে উঠে দাঁড়ালেন, এসো ঠাকুর, তোমার ছুঁঘরের দক্ষিণাটা আমি খাইয়ে দিচ্ছি একেবারে। সব শুন হয়ে উঠেছে এখন, একবারে ভদ্রলোকের জাতমান নিয়ে চানচানি! আমার মন্ত্র পড়াতে বারণ করা হচ্ছে? তুমি আর এগোবে না এই বাসরের দিকে বলে দিচ্ছি তোমাকে ঠাকুর—

ঠাকুরও ফেপে গিয়ে এগিয়ে বলেন, এগোব না তো কি? বিয়ের বাসরে ব'সে ব'সে সব আদরের মন্ত্র পড়া হচ্ছে—তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনব নাকি?

—এ্যা, শ্রীহরের মন্তর? আসন থেকে একেবারে লাফিয়ে ওঠে হেমন্ত ঘোষ।

বরের বাপ চোখ দুটো চপকগাছ করে বলেন, কি সরলশাস্ত্র—একেবারে শ্রীহরের মন্তর?

ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলেন, শ্রীহরের মন্ত্র নয় কি? এঁষে বলছেন 'কুরুক্ষেত্রো গয়া গঙ্গা প্রভাসঃ পুরুষাণি চ—

বাধা দিয়ে বটুক ঠাকুর বলেন, পরের টুকু তো আর শোনেন নি মশাই,
'শ্রাদ্ধকালে ভবস্থিহ' বলি নি তো—বলেছি 'বিবাহকালে ভবস্থিহ'।

— আরও ক্ষেপে গিয়ে ব্রাহ্মণ ঠাকুর আরও এগিয়ে এসে বলেন, খুব তো চাল
চলেছেন মশাই! বলি কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা—এরা সব বিবাহকালে আনবেই
বা কেন? ছা ছা ছা—ব্রাহ্মণের মুখে একেবারে কানি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণকুলে যত ইচ্ছা কানি পড়ে পড়ুক, এখন উপায় কি? শ্রাদ্ধমন্ত্র
পড়েই যে বিবাহ অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, এখন প্রতিবিধান কি?

কেউ কেউ বলে উঠল, আপনিই ঠাকুর শীগগির আসনে বসে পড়ুন, রাত
যে পুইয়ে গেল—শীগগির বিয়ের মন্ত্রটা সেয়ে ফেলুন।

ব্রাহ্মণ ঠাকুর বললেন, মুখের কথাতেই তো আর শাস্ত হয় না মশাই!
এতক্ষণ কি করতে কি হয়েছে আমি তো কিছুই জানি না—সব কিছুই তো
বিহিত করতে হবে!

বরের বাপ দাঁত কড়মড় ক'রে বলে উঠল, বিহিতটা ঠাকুর আজ তোমাকে
আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এতদোর লোকের জাত বায় যে। এখন আর
ফণিমাটি না ক'রে কি করতে হবে তাই বল।

— ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলেন, বাটপট বরকনে তুলে নাও— নিয়ে যাও আবার ঐ
ছাদনাতলায়, তারপরে বাটপট আবার সাতবার উল্টোপাক ঘুরিয়ে নাও—
একজনে জিজ্ঞাস করল—কেন?

— বলি মশাই অশুভ ঘিরেটাকে আগে তো নাকচ ক'রে নিতে হবে, তবে
ভো আবার শুদ্ধ বিয়ে।

অপরে বলল, ঐ করতে করতে তো রাতটুকুই পুইয়ে যাবে!

ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলেন, আজ তবে তাড়াতাড়ি ঐ উল্টোপাকই ঘুরিয়ে রাখা
যাক, কাল-পরশু আবার একটা লগ দেখে বিয়ে করিয়ে দেওয়া যাবে।

প্রাসের বুড়ো কালু ঘোষ, কালু-ঘোষ দাঁড়িয়ে দাল, শোন ঠাকুর, মাথার
চুল দেখ সব পেকে নাদা হয়ে গেছে, শান্তোর আমরাত জানি। এই স্বজের
আলো এসে না পড়লে আর দিনের দোষ লাগে না; পূর্বদিকে আমরা মোটা
ত্রেপল দিয়ে দিছি যাতে বিয়ের বাগরে স্বজের আলো এসে না পড়ে, যা করতে
হয় আজই ঠাকুর করতে হবে, গরিব হেন্তা ঘোষকে ধনেপ্রানে মারলে
চলবে না।

শেইভাবে ক'রেই তাড়াতাড়ি সব অহুর্দান হয়ে গেল, কোমণ্ড বরকনে
জাতমান রক্ষা পেল।

কিন্তু এর পরে তো আর বটুক ঠাকুরকে দিয়ে গ্রামের ধর্মকর্ম চলে না। ঘোষেরা একদিন সন্ধ্যায় জমায়তে হল বিষ্ঠ, ঘোষের পুরনো চণ্ডীমণ্ডপে। পূজা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন, কিন্তু এখনও ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটি পড়ে রয়েছে।

হট্টলা-পট্টলা হ'ল অনেক, তর্ক-বিতর্কও অনেক চলল; কিন্তু যে কথাটি সবাই প্রায় একমত তা হ'ল এই, পূজা-অর্চা পাল-পার্বণে তাদের অবহেলা দেখা দিয়েছে; দেবদ্বিজের তাদের ভক্তি নেই বলে ভাল ব্রাহ্মণও আর গায়ে নেই; এবং এইসব কারণের জটাই তাদের অবস্থাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে—আর গ্রামও তাই লক্ষ্মীহীন হয়ে উঠেছে।

সবাই একমত হয়ে ঠিক করল, ভাল ক'রে যত্ন পড়ে পূজা-অর্চা করতে পারলে এমন একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ গ্রামে যোগাড় করতেই হবে। এর জন্য যা চান্দা লাগে সাধ্যানুসারে সবাই তা দিতে প্রস্তুত। বটুক ঠাকুরকে নিয়ে ধর্মকর্ম চালানতে থাকলে তাদের দিন দিন অবনতি একেবারে অবশ্যজ্ঞানী দেবতারাই সব ক্ষেপে উঠবেন।

আরও হয়ে গেল খোঁজ খোঁজ, এ গ্রামে ও গ্রামে সে গ্রামে।

কিন্তু দেবতারাই যেন গ্রামবাসীর কথা শুনলো, তাঁরাই—যেন পাঠিয়ে দিলেন লোক। ঘোষণাডায় একদিন এগে উপস্থিত হলেন দু'জন লোক, একজন গেরুয়া-পরা প্রৌঢ় সন্ন্যাসী—আর একজন সাদা কাপড়পরা নেড়ামাথা ব্রহ্মচারী। এঁরা এনেছেন 'বার্ধর্ঘ্যমঠ' থেকে, হিন্দুধর্মকে সংস্কার ক'রে তার আদলরূপে প্রতিষ্ঠা করাই এঁদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী বেরিয়ে পড়েছেন সব শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে। গ্রামবাসী তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল। তাঁরা গ্রামে সভা করলেন, বক্তৃতা করলেন, তাঁদের কথাবার্তা শুনে ও তাঁদের ভক্তিমিষ্ঠা দেখে গ্রামবাসীদের বড় ভাল লাগল। গ্রামবাসীগণ তাঁদের কাছে জানাল তাদের ভালভাবে পূজা-অর্চা পাল-পার্বণ করবার ক্ষমতা একটি স্বল্পাঙ্গণের প্রয়োজনের কথা। সব শুনে এবং গ্রামবাসী সকলের আন্তরিক আগ্রহ দেখে প্রৌঢ় সন্ন্যাসী সন্তোষে স্বল্প ব্রহ্মচারীকে বললেন, তুমি এখানে এদের মধ্যে থেকে যাও স্বল্প। যে পর্বন্ত আসি কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা না করতে পারি সে পর্বন্ত তোমাকেই এদের সব ধর্মকর্ম চালিয়ে যেতে হবে।

রাজি হলেন স্বল্প ব্রহ্মচারী। গ্রামবাসীরা তো মহা খুশী। কেউ পরম আগ্রহে তাঁকে থাকবার স্থান দিল, কেউ দিল আহারের ব্যবস্থা ক'রে। স্বল্প ব্রহ্মচারীর অঙ্গ বয়স, কিন্তু সংস্কৃত লোক, মোটাশুটি শাস্ত্রের সমস্ত কিছু শিখিত

আছে, মেজাজও ভাল। স্বল্প ব্রহ্মচারী ভাগবত পাঠ করেন, মহাভারত পাঠ করেন, গীতা পাঠ করেন, শুনে শুনে গ্রামবাসীদের মন ভক্তিতে গদগদ হয়। গ্রামবাসীদের নিয়ে তিনি একদিন করলেন বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখে তো গ্রামবাসী সন্তুষ্ট।

কিন্তু ইচ্ছামত যজ্ঞ-পাঠ করলে তো চলবে না, গ্রামবাসীর দেবদেবীর পূজা-অর্চা, পাল-পার্বণের অনুষ্ঠান, বিবাহ-শ্রাদ্ধ-ব্রত সবই যে করাতে হবে। অনভ্যস্ত হলেও ব্রহ্মচারী পূজাবিধি ব্রতবিধি শ্রাদ্ধ বিবাহাদির সব বই কিনলেন, আন্তে আন্তে সব ব্যাপারেই হাত দিতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু প্রথম গোলযোগ দেখা দিল বিষ্ট ঘোষের বাড়ি মনসাপূজায়। পূজার বই দেখে ব্রহ্মচারী ঠাকুর মন্ত্র বিস্তৃতভাবে উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু সর্বনাশ বাঁধিয়ে দিয়েছেন যে গোড়াতেই। পূজার আরম্ভেই তিনি বাঁ হাত দিয়ে চং চং করে বেশ খানিকটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। মনসাপূজার ঘণ্টাবাজান যে একেবারে নিষিদ্ধ। তাতে যে শুধু পূজার ফল হয় না তা নয়, মনসাদেবী যে ভীষণভাবে কেপে যান, তাঁর মদের সাপগুলো যে ফৌস্ ফৌস্ করে ছড়িয়ে পড়ে মনস্ত গ্রায়ে।

ব্রহ্মচারী প্রথম ঘণ্টা বাজানার সময়েই মেয়েরা ভুল ধরে ফেলেছে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর মুখের উপরে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় নি; কিন্তু পূজার শেষে আবার তিনি যখন খুব করে ঘণ্টা নাড়তে শুরু করলেন তখন উপস্থিত ছিল বিষ্ট, ঘোষের বুড়ী গিসি; বুড়ী তো ঘণ্টার শব্দ শুনে তাঁর হাতের লাঠিটা ভুলে দিচ্ছিল আর কি পুরুতের মাথাগ এক বাড়ি। পাশের লোকেরা বাধা দিতে বুড়ী চেষ্টা করে উঠে বলল, কোথা থেকে তোরা ধরে নিয়ে এসেছিস্ এমন আবাগা বাঘুনের পুঁত, সব গাঁয়ের লোক কি তোরিা লাগ দিয়ে দংশাবি নাকি রে?

ব্রহ্মচারী একান্ত অপ্রস্তুত হয়ে আত্মনায় ফেরেন। বুড়ীর অসম্ভব চোচামেচিতে সব পাড়াটা অমঙ্গল আশঙ্কায় থন্দম্ করতে থাকে।

বেশিদিন যেতে না যেতে আবার আর এক কাণ্ড। লক্ষ্মণ ঘোষের বাড়ি প্রতিষ্ঠিত নীলকণ্ঠ শিব। অতি পুরাতন শিব, কালো পাথরের মূর্তি, জাগ্রত দেবতা; বিপদে পড়লে ভিন্ গাঁয়ের লোক এনও কত কি মানত করে যায়।

প্রতি মাসের শেষ সোমবারে তাঁর পূজা। শিবপূজা হয়ে গেলে পর শিবের আসনের সামনে যে ত্রিকোণযন্ত্র রয়েছে তাতে গৌরীপূজা করতে হয়। একটি পুরনো ভাঙা মন্দির, পূজার সময়ে মন্দিরের ছায়া বন্ধ করে বসবার রীতি, পূজা হয়ে গেলে দর্শন-স্পর্শপ্রার্থীদের জন্ত দ্বার খুলে দিতে হয়।

পূজা-অঙ্ঘে মন্দিরের দ্বার খুলতেই লক্ষণ ঘোষ চেয়ে দেখে, একবারে মায়াবাক কাণ্ড, সর্বশেষে পুরুভ শিবের মাথায় বসিয়ে রেখেছে এক লাল জবাফুল। খালাভরা এত মাদাফুল থাকতে দিনকাণা থকত কিনা নীলকণ্ঠ শিবের মাথায় বসাতে গেল লালজবা? লালজবা তো ছিল শিবপূজার পরে গোঁরীপূজার জন্ত। এতো দেখা যাচ্ছে একেবারে ডান-বাঁ-জানবজিত বামুন ধ'রে নিয়ে এসেছে তারা। মুখে কটকট ক'রে মল্ল আর বকবক ক'রে বক্তৃতা আওড়ালেই পূজারী ব্রাহ্মণ হ'ল? পোড়াকপালে দেশের মাছুষের বা কাণ্ড, মুখের কথায় ভুলে গিয়ে শেখে বেড়াল দিয়ে দোতে মই দেওয়াবার ব্যবস্থা করেছে রে!

সর্বনাশ কি যে-সে সর্বনাশ,—নীলকণ্ঠ শিবকে যে লালফুল ছোঁয়াতেই মৌই ছোঁয়ালে যে বংশজঙ্ঘ লোককে নীলকণ্ঠ শিবের হাতের ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লাল লাল রক্ত বের ক'রে দেন। কি উপায় এখন হবে? ভয়ে এবং ক্রোধে লক্ষণ ঘোষ থরথর ক'রে বাঁপছে, দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে চোঁচিয়ে ব্রহ্মচারীকে বলল, এ আশাণা বামুন, বেরিয়ে এস, তোমাকে খার পূজো করতে হবে না, ছ'একটা গাটীগোটী খাবার আগে বেরোও বলছি—

লক্ষণ ঘোষের সেই ভৈরব মূর্তি দেখে ব্রহ্মচারী তো একেবারে হতভম্ব, আর কথাটি বলবার সাহস না পেয়ে সে গুটি গুটি বেরিয়ে পড়ল মন্দির থেকে, মন্দিরের বাইরে আসতেই লক্ষণ ঘোষের বিধবা বোন এগিয়ে বলল, নীলকণ্ঠ শিবের মাথায় তুমি লাল জবা দিয়ে রেপেছ ঠাকুর, তুমি কি বামুন? ডেলে নও?

পরের গোমসারেই লক্ষণ ঘোষ ডাকে আবার বটুক ঠাকুরকে, বলে, বাবা ভুল মন্ত্র পড়াও আর শুক মন্ত্র পড়াও—অনাচার তো কর না কিছ; এ মোড়ন বিটকেল বামুন যে আমার বংশনাশ ক'রে ছাড়বে। লক্ষণ ঘোষ পড়াব না যোগাড় করল, গোময়-গোমূত্রাদি পুষ্পগব্য এবং বট-অম্বু-ভূম্মাদি গুরুকথায় যোগাড় করল, তারপরে সেই সব দিয়ে বটুক ঠাকুরের দ্বারায় নীলকণ্ঠ শিবকে শতদৌত করিয়ে ছাড়ল।

স্বল ব্রহ্মচারীও বুঝতে পারলেন, এ গায়ের ধর্মকর্ম পূজা-অর্চা তাঁকে দিয়ে চলবে না, এখন মানে মানে স'রে পড়তে পারলেই ভাল।

মোক্ষম-কাণ্ড ঘটে গেল কাটিকী অমাবস্তার রাত্রে।

কাটিকমাস পড়তে না পড়তেই মাঠঘাটের জল টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেল ঘরে ঘরে জলের ধুম। প্রভিবৎসরই এ-সময়টার ঠিক-এমনি ক'বে জল

নেগে যায়। খুচরা চিকিৎসায় তো এর প্রতিকার হবার নয়, তাই পাইকারী ব্যবস্থা করতে হয়। পাইকারী ব্যবস্থা হ'ল গ্রামবানী গিলে জরকালীর পূজা। অমাবস্তার নিশ্চত রাতে করতে হয় পূজা, গ্রামের একপ্রান্তে, কোনো ভিটেঘাটায় বসে। দেবীর প্রতিমা কালী-প্রতিমাই, কিন্তু তফৎ এই, জরকালীর তিন পা। পূজায় ঢাক ঢোলের বাজনা চলে না, শুধু কঁাসার ঘণ্টা। ছেলেমেয়েদের বা অল্পবয়সের বউদের পূজায় উপস্থিত থাকতে বারণ, উপস্থিত থাকে শুধু গ্রামের প্রতিনিধিত্বানীয়া বুড়োবুড়ীরা। খুটিয়ে খুটিয়ে পূজাবিধি সবই জেনে নিয়েছে ব্রহ্মচারী বুড়োবুড়ীদের কাছ থেকে, কোন্ ফুল লাগে—না লাগে—তা-ও।

পূজা আরম্ভ হয়ে গেছে কঁাসার ঘণ্টা বাজিয়ে নিতাই ঘোষের ছাড়া ভিটায় প্রকাণ্ড শিমূল গাছটার নীচে। না, আজকের ঠাকুরের তুল হচ্ছে না কিছু, নগাই সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

পূজা হয়ে গেছে। দক্ষিণার মন্ত্রও পড়া হয়ে গেছে—এমন সময় আবার হঠাৎ ‘হেঁই রে রে রে’—ক’রে প্রায় সমস্বরে টেঁচিয়ে উঠল সব বুড়োবুড়ী, কি সর্বনাশ—দেখ আবার ক’রে ফেলল সর্বনাশা বামুন, জরকালীকে কিনা আবার একেবারে সামনা-সামনি প্রণাম ক’রে ফেলল! তাঁ যে করতে নেই তা তো গ্রামের পাঁচষছরের ছেলেমেয়েরাও জানে। জরকালীকে যে প্রণাম করতে হয় পিছন ফিরে ভূমিষ্ঠ হয়ে, আর তারপরে উঠে দাঁড়িয়েই সেই ভূমিতে হারতে হয় তিন তিনটি লাগি, তারপরে আর ফিরে তাকাতে নেই, চলে যেতে হয় বার বার ঘরে। সামনা-সামনি প্রণাম করলে কি আর রক্ষা আছে, গাঁ-জুছ সব লোকের যে লেগে যাবে হাড়কাঁপুনি জর! নিকুংশে ঠাকুর সারা গ্রামকে যে নির্বংশ ক’রে ছাড়বে। ‘ধর খালার বামুনকে, ধর’—বলে হাতের কাছের লম্বা মোটা একখানা আঁক নিয়েই ভাড়া ক’রে যায় নিতাই ঘোষ—জ্বল ব্রহ্মচারী প্রাণ নিয়ে জল ছিঁড়ে চৌচা দৌড়। অমাবস্তার আর যেটুকু অন্ধকার বাকি ছিল তার ভিতরেই তিনি পালিয়ে গেলেন ঘোষণাড়া গ্রাম থেকে—আর ফিরলেন না।

পরের দিন মন্ধ্যাবেলায় শ্রীধর্ম নিজে গালো হাত দিয়ে বসেছিলেন সেই ঘোষণাড়ার খালপাড়ের বড় শিরীষ গাছটার নীচে, ব’সে ব’সে সারা মন্ধ্যা ভাবছিলেন, এই যে মন্ডট—এর সমাধান কি!

শিলার

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কাগজে দেখলাম, ভারত সরকার দুঃসাহসিক ভাঁকাত্তি, খুন, জালিয়াতি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্ফুটিত বদমাইসিয় কাহিনী আন্দানি ও উৎপাদন বন্ধের কথা ভাবছেন। শুধু বইয়ের ক্ষেত্রে না, সিনেমার ক্ষেত্রেও তাঁদের এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে শুনছি। তাঁদের ধারণা, অল্পবয়স্ক ও অপরিণত বুদ্ধি ছেলেরা এসব থেকে নানা রকম দুষ্কৃতির কল-কৌশল শেখে, নানা উপায় উপকরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় এবং যথাকালে নেগুলে। প্রয়োগ করে সমাজের শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিপর্যয় করে। কাজেই সমাজে রোমাঞ্চকর সাহিত্য ও সিনেমার প্রচলন থাকা উচিত নয়, এই হল তাঁদের স্ফুটিত সিদ্ধান্ত।

গান্ধী একদা সাদক নিবারণের উপায় হিসাবে ডালগাছ কাটার উপদেশ দিয়েছিলেন। দেখছি গান্ধীশিষ্যেরা শাস্তি-শৃঙ্খলা রাখার জন্তে প্রায় একই রকম রাস্তা নিতে চলেছেন। আসলে বই পড়ে বা সিনেমা দেখে কেউ ভাঁকাত্তির পাঠ নেয়, কিংবা খুন-খারাপি ও জাদ-জালিয়াতির বিচার্য পোক্ত হয়, এটা অভিনব আবিষ্কার। সমাজে উচ্চাকাঙ্ক্ষানুযায়ী শিক্ষিত যুবকরা যদি দলে দলে বেকার বসে থাকে এবং তাদের কর্মশক্তি ও ভাবাবেগ যদি দ্রুত পথে পরিচালিত হবার সুযোগ না পায়, তাহলে তাদের একদল যে হয় বাউঙুলে লম্বীছাড়া এবং আর এক দল যে হয় চোর-ছোঁচোর ভাঁকাত্তি এবং খুনে, এই বাস্তব সত্যটা এখনো ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়, এটাই আশ্চর্য।

একথা কেউ বলবেন না এবং আমিও বলি না যে আমাদের যুবকরা গতাই মাধু ও সংপ্রকৃতির। কিন্তু তা যে তারা হয় নি সিনেমা ও সাহিত্যের মাধ্যমে পরিবেষিত রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রভাবে, একথা মানতে পারি না, যেমন পারি না যে প্রেম-করা বিড়াটাও ছেলে-মেয়েরা নতুন এবং সিনেমা থেকেই শিখছে। যে যুগে সিনেমা ছিল না এবং তথাকথিত রোমাঞ্চকর সাহিত্যও নষ্ট হয়নি, সে যুগেও প্রেম ছিল, চুড়ি, জুয়াচুরি, খুন, কোনটাই অভাব ছিল না। অর্থাৎ এই জিনিষগুলো কারোকে হাতে ধরে শেখাতে হয় না। বিশেষ বয়সে অনুকূল আবেষ্টনী পেলে এগুলো আপনি ফোটে। সমাজ স্ফুটন ও

সংশ্লিষ্টাঙ্গ হলে এবং জীবন ও জীবিকার সংক্ষেপে সচেতন হলে, এই সব প্রবৃত্তি আপনা থেকেই মাহুষের সংযত হয়।

আর যদি সাহিত্যকেই এজগ্রে দায়ী করতে হয়, তাহলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রচারও কি সমান বিপজ্জনক নয়? রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে কি নেই? হত্যা, হরণ, ধর্ষণ, ব্যভিচার, পশ্চাচার, দ্বুত্ততা...কোন জিনিষটার অভাব আছে? পুরানো ভাষ্কর্য ও খোদিত চিত্রে এমন কোন পদার্থ নেই, যা মাহুষের ঘণ্যতম কুপ্রবৃত্তিকে উজ্জীবিত না করে? কালিদাসের কাব্যে, জয়দেবের কাব্যে, মঙ্গল কবিতা, নাথগাথা, পদাবলী ও ভারতচন্দ্রে নিশ্চয় আপাদমস্তক উঁচু মানবাত্মিক নীতি প্রচারিত হয়নি! কিন্তু স্ননীতি ও সদাচারের নামে কৈ এসবের ত প্রচার রহিতের কথা ভাবা হচ্ছে না! তাহলে খিলার বা রোমাঞ্চকর সাহিত্য শুধু একালের জিনিষ বলেই ভার বিরুদ্ধে সরকারী বিরূপতার খড়া উত্তত হয়েছে!

অর্থাৎ আমি রোমাঞ্চকর সাহিত্যের একজন ভক্ত পাঠক। দীর্ঘ দিনের সাহিত্য-জীবনে আমি নিজে অবশ্য কখনো খুন, রাহাজানি বা লুণ্ঠতরাজের গল্প লিখিনি। চোর-ডাকাত বা খুনীর চেয়ে গোয়েন্দার বুদ্ধি বেশী হতেই হবে এবং সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী গোয়েন্দা শেষ পর্যন্ত সব রহস্যের অন্তর্ভেদ করবেনই, এ আমার ভাবতে ভালো লাগে না। চোর-ডাকাত—ও খুনী—নামধেয় ভদ্রলোকরা বুদ্ধির পাল্লায় কারো চেয়ে কম, এ কুসংস্কার আমার নেই। হয়ত নেই কারোরই। -গোয়েন্দা কাহিনীকে কেউ তাই সত্য সম্ভাব্য বলে বিশ্বাস করেন না। তবু সবাই তা পড়েন কেন? আমিই বা কেন পড়ি? তার কারণ এমন অনাবিল গল্পরস আর কোন জাতীয় বইয়ে পাওয়া যায়? পাতার পর পাতা রহস্যের জাল টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে, অবশেষে তাকে উদ্ঘাটিত করে দেওয়ার এমন চমকপ্রদ কৌশল আর কোন শ্রেণীর সাহিত্যে পাই?

ছনিয়ার সেরা গল্পকার ও নভেল লিখিয়েরা অনেক ভারী-ভারী কথা, অনেক দাসী-দাসী তত্ত্ব মাহুষকে বুঝিয়েছেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। মহৎসাহিত্য রূপে তাঁদের রচনা স্মরণীয় হয়েছে, ভাবী কালেও হবে। কিন্তু ভরা পেটে অর্ধমিস্রীলিত নোত্রে অদ্ভুত, আজগুবি ও অসম্ভবের শ্রোতে ভাসতে ভাসতে সমস্ত জানাশোনার বাইরে চলে যাওয়া যায় কি সে সব বই হাতে নিয়ে? তা পড়ার জগ্রে করতে হয় রীতিমতো কসরৎ। তা হতে পারে অধ্যয়ন, কিন্তু চিত্ত বিনোদন তা নয় নিশ্চয়। চিত্ত বিনোদন হয় একমাত্র সেই জিনিষে, যা কোতুক ও কোতুহলকে ওস্কায়, অথচ নাথাকে বিব্রত

করে না, একঘাশ চিন্তা ও যুক্তি-তর্কের জঞ্জাল তার ওপর চাপিয়ে দিবে।
সেদিক থেকে ভূতের গল্প ও রোমাঞ্চকর রোমান্সের কি ভুলনা আছে ?

এলান পো, এডগার ওয়ালেন্স, অ্যাগাথা ক্রিস্টি, যার কথাই বলুন, সবগণ্যে
উপভোগ করতে পারি। পারি পাঁচকড়ি দে, স্লয়েন ভটচাখি, দীনেন্দ্র রায়,
শশধর দত্তকে। এমন জন্ম-জন্মাট গল্প কাঁদার শক্তি কেন নেই আমার, ঐ বাক্যে
প্রজ্ঞা বলে, অর্থাৎ যুক্তি-তর্ক তব্ব-তথ্য কেন এসে ভীড় করে আমার কলয়ের
মুখে কোন কিছু লিখতে বসলেই, তা ভেবে অনেক হুঃখ পেয়েছি কম বরসে।
আজ আর হুঃখ নেই। বুঝেছি, আমি থিলার লোক হবার জন্মে না, পাঠক
হবার জন্মেই জন্মেছি। তবে স্বপ্নের কথা যে আমার দলে আরো অনেকে
আছেন। একজন দুনিয়া-বিখ্যাত আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে এই রকম
বই ধার নিতেন। প্রচণ্ড মস্তিষ্কজীবী আর একজন রাজনীতিককেও দেখেছি
নিবিষ্ট চিতে এই রকম বই নিয়ে বৃন্দ হয়ে থাকতে। এথেকে আমার ধারণা যে
মননশীল ও কমিষ্ট মানুষের রিক্রিয়েশন হিসাবে থিলার পর্যন্ত বন্ধু। এমন
বন্ধু আর নেই।

যুক্তি হচ্ছে যে বই হিসাবে ছাপা হয় বলেই অনেকে এদের ভুল করেন।
নাহিত্য বলে এবং সাহিত্যের মতোই কোন স্থিতিশীল, মহৎ বা প্রাণবন্ত নয়
এদের কাছে আশা করেন, আর তানা পেয়ে হন হতাশ। বেগে যান
কোমর বেঁধে এদের ফুঁসা কীর্তন করতে। আসলে যেন রাখতে হবে এরা
সাহিত্য নয়। সাহিত্য-পরিবারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ, এমন কি
কিছু নয় বললেও থালা যেতে পারে। এরা থিলার অর্থাৎ তমকাদার এবং
রহস্যসন্ধানী মানুষের রসের খোরাক এরা। চায়-না আছে বলেই যেমন
ভক্তগোব প্রাণী নয়, তেমনি দুটো মলাটের মাঝখানে কডকগুলো ছাপা পুঠা
আছে বলেই, থিলার নাহিত্য নয়। পণ্ডে ব্যাকরণ ও পাঠ্যগণিত লিখা
হয়েছে, মোক্তার দর্পণ এবং হোমিওপ্যাথী সঙ্গ, তাই বলে কি তা কাব্য ?
স্বর করে ঝাঝা দাঁদের মলম আর তানসেনগুনি কোঁচি করে, তাদের সেই
স্বরেনা বিজ্ঞাপন কি গান ? তবে মশায় ?

আসলে সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, সে বোধ আমাদের নিভান্ত ঝাপসা
বলেই, মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা উভলা হই এবং আমাদের হিসাব
মতো যা সংসাহিত্য নয়, তার গলা টিপতে যাই। এ চেপ্টা আগেও হয়েছে,
এখনো হচ্ছে। কিন্তু থিলার সরল না। মানুষের মন যে চায় অলীক

অদ্ভুত নিয়ে খেলা করতে ! বীভৎস, ভরাবহ ও রোমাঞ্চকরতার নেশা আছে যে তার রক্তের মধ্যে ! তাই করুনার অবাধ আকাশে ফিলারের গাখীরা চিরদিন উড়বে। নিষেধাজ্ঞার লোহার খাঁচায় তাদের আটকাবে কে? তালগাছ কেটে যেমন মাদক বন্ধ করা যায়নি, আইন হাঁকিদে তেমন ফিলার বন্ধ করা যাবে না। তবে ভয় নেই, ও থেকে ডাকাতির হাতেখড়ি লাভ করবে না কেউ ! তা যদি করত, তাহলে লেখক না হয়ে আমি ডাকাতই হতাম এবং হয়ত বিনোবা হয়ে ব্যস্ত পড়তেন আমার উদ্ধার কিসে হবে, সেই কথা ভেবে !

॥ বেঙ্গল'এর বই মনেই বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই ॥

ভারপ্রাপ্ত বন্দোপাধ্যায়ের

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা (৭ম মুঃ) ৮.০০ ॥

বিচারক আমার সাহিত্য জীবন রাইকমল

১ম মুঃ ২.৫০ ॥ ২য় মুঃ ৪.০০ ॥ ৩য় মুঃ ২.৫০ ॥

মলোজ বস্তুর

সোভিয়েতের দেশে দেশে (৩য় মুঃ) ৬.০০ ॥

মৌলিক

মানুষ নামক জন্তু

খজোত

৭ম মুঃ ৪.০০ ॥

৩য় মুঃ ৩.০০ ॥

২য় মুঃ ২.০০ ॥

সতীনাথ ভাট্টার

টোড়াই-চরিত্র মানস ১ম চরণ : ৫.০০ ॥ ২য় চরণ : ৩.৫০ ॥

পত্রলেখার বাবা

সংকট

সত্যি প্রসঙ্গ-কাহিনী

৪.০০ ॥

২য় মুঃ ৩.৫০ ॥

৩য় মুঃ ৩.৫০ ॥

সমরেশ বস্তুর

সপ্তদাগর

বাঘিনী

(২য় মুঃ) ৬.০০ ॥

(২য় মুঃ) ৭.০০ ॥

এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছেন পঙ্কিল অক্ষকায়ের মধ্যে যে মল্লং প্রাণ-লেখক এই উপজ্ঞাসে। যারা নাধারণ-গুলি দিগ্ভ্রান্ত হয়ে নতুন যুগের আলো অথচ বিচিত্র সেই সব নবনারীর সম্মান করছিল, মহৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্ভার আত্মীয় সংস্রবাতময় জীবন-আলেখ্য। আলোয় লেখক তাদের দেখেছেন।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

বাংলায় কালিদাস-চর্চা

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

[মেঘদূত]

কাহিনী পরিচয় [সংক্ষেপে] ॥ কাব্যের নায়ক বিরহী যক্ষ যক্ষরাজ কুবেরের অনুচর। তরুণ যক্ষের ঘরে নব-পরীক্ষিতা বধু। তরুণীপ্রিয়ার প্রথম প্রেমের মোহে যক্ষের সারা দেহমন-প্রাণ আচ্ছন্ন। মনের এই অবস্থায় কাজ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই একদিন অবহেলা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর যায় কোথায়! যক্ষপতি দিলেন অভিশাপ : একবৎসর কাল তুমি প্রিয়া-বিরহ-যাতনা ভোগ করবে রামগিরি পর্বতে থেকে ॥

অভিশপ্ত বিরহী যক্ষ রামগিরি পর্বতে বসে প্রিয়ার জন্তে ভেবে ভেবে ক্রমেই শীর্ণ হয়ে পড়েছে। হাতের বালা শীর্ণ মণিবন্ধ থেকে খসে পড়ছে। মন পড়ে রয়েছে সেই অলকায়, যেখানে প্রিয়া তাঁরই আশায় বসে বসে দিন গুণছেন। এমন সময় আষাঢ়ের প্রথম মেঘকে দেখে যক্ষের খেয়াল হোল, এই যে মেঘ চলেছে পূর্ব থেকে উত্তরে, এর কাছেই তো বলে দেওয়া যায়, আমার প্রিয়ার কাছে সংবাদটুকু পৌঁছে দিবার জন্তে। দীর্ঘ বিরহ-যাতনাক্রিষ্ট যক্ষ একবারও চিন্তা করলো না, মেঘ তার প্রিয়ার কাছে কিভাবে সংবাদ পৌঁছে দেবে। যক্ষ আর কালবিলম্ব না করে অনেক অল্পনয় বিনয় করে মেঘকে বলতে লাগলো যক্ষপতীর আবাস অলকা-পুরীতে যাবার পথ। যক্ষ বললে মেঘকে : এই কৈলাসের কোলেই তুমি দেখবে অলকধাম, আর, ওখানেই প্রিয়া আমার বিরহে দারুণ যাতনা ভোগ করছে ; তাকে তুমি আমার সংবাদ পৌঁছে দাও।

এইভাবে কবি তাঁর নায়ক যক্ষের মুখে মেঘের কাছে অলকাপুরীতে যাবার পথের বর্ণনা দিয়ে মেঘকে পথ চিনিয়া নিয়ে পৌঁছে দিল অলকাপুরীতে।

এরপর উত্তরমেঘ। উত্তরমেঘে কবি তাঁর নায়ক যক্ষের মুখে প্রথমে অলকা ও অলকবাসিনীদের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, পরে তাঁর কাব্যের নায়িকা বিরহিনী যক্ষ-প্রিয়ার কথা আরম্ভ করেছেন। সব শেষে বিরহী যক্ষ বলছে

মেঘের কাছে অলুন্নয় করে : বন্ধুত্বের খাতিরেই হোক, আর এই বিরহ-
বিধুরের প্রতি অলুকম্পা করেই হোক, হে জলধর, আমার এই দৌত্যকাৰ্য্যটুকু
তোমার অযোগ্য হোলোও, কাজটি আগে করে দিয়ে তার পরে তুমি বর্ষার
অভিধানে যাও, যেখানে খুশি যাও। আমি বলছি, এতে তোমার ভালো হবে।
বন্ধু, প্রেয়সী সৌদামিনীর সঙ্গে কখনও তোমার তিলেকের বিচ্ছেদ যন্ত্রণাও
ভোগ করতে হবে না। —[নরেন্দ্র দেব অলুন্নয়নে]।

এইখানেই কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্য শেষ করেছেন। অনেকে মনে
• করেন : মেঘদূতের বিরহী যক্ষ কালিদাস স্বয়ং। উজ্জয়িনী প্রবাস কালে
প্রিয়তমার বিচ্ছেদে কাতর কালিদাস প্রিয়াসঙ্গলাভাকাজক্ষায় আকুল অবস্থায়
এই কাব্য রচনায় অলুপ্রাণিত হন। এসব অলুমানের কোন সঠিক প্রমাণ
নেই। কালিদাসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও নানা জনশ্রুতি ও গাল-গল্প
ছাড়া কিছু আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে, কালিদাস যে উজ্জয়িনীতে
কিছুকাল ছিলেন একথা সর্ববাদিসম্মত।

আলুয়ঙ্গিক তথ্যপরিচয় ॥ কালিদাসের ‘মেঘদূত’ শ্রব্যাকাব্য। সংস্কৃত
অলংকার শাস্ত্র অলুযায়ী ‘মেঘদূত’ খণ্ডকাব্য। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
ম্যাক্সমুলার প্রমুখ প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিদ্বজ্জনদের কাছে মেঘদূত একখানি
মহাকাব্য,—কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।

সমগ্র মেঘদূত পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ—এই দুই সর্গে বিভক্ত। বাংলা
অলুবাদগুলিতে সাধারণত পূর্বমেঘ অংশে ৬৪ শ্লোক এবং উত্তরমেঘ অংশে ৫৪
শ্লোকের অলুবাদ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রমাণ করেছেন, মেঘদূত কাব্যখানি সংস্কৃত
‘দূত’ ও ‘সন্দেশ’ কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং প্রাচীনতম। অধ্যাপক
চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি মেঘদূতের অলুকরণে
জড়পদার্থকে দূত করে পরবর্তিকালে রচিত ‘চেতদূত’ ‘মনদূত’, ‘পবনদূত’
‘হৃদয়দূত’ ‘শিলাদূত’ ‘পদাঙ্কদূত’ ‘বাতদূত’ ‘চন্দ্রদূত’ ‘তুলসীদূত’ ‘নেমীদূত’
প্রভৃতি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার প্রাণীকে দূত করে রচিত
‘হংসদূত’ ‘পিকদূত’ ‘শুক সন্দেশ’, ‘চকোর সন্দেশ’ ‘ময়ূরসন্দেশ’ ‘ভ্রমরদূত’
‘ভৃগুসন্দেশ’ ‘কোকিল সন্দেশ’ ‘পাখ্যদূত’ প্রভৃতি কাব্যের কথাও আমরা জানি।
মহাভারতে দময়ন্তীর হংসদূত প্রেরণ, রামায়ণে রামকর্তৃক অলুমানকে সীতার
কাছে দূতরূপে প্রেরণ, কিংবা বৌদ্ধজাতকের ‘কামবিলাপ জাতক’—
আখ্যায়িকাগুলি, কালিদাসকে মেঘদূত রচনায় অলুপ্রেরিত করেছিল বলে

অনেকে মনে করেন। রামায়ণের নিকট কালিদাসের ঋণ সমর্থন করেছেন মল্লিনাথ, বল্লভদেব এবং দক্ষিণাবর্তনাথ। এমন কথাও অনেকে বলেছেন : বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম কালিদাসের সমসাময়িক কবি—যমককাব্য রচয়িতা, ঘটকপরের কাছে কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যের জন্তে ঋণী। এই সমস্ত প্রমাণ তর্কসাপেক্ষ। তবে, মোটামুটি ভাবে সঁকলেই যা স্বীকার করে নিয়েছেন, তা এই যে, মেঘদূতের জন্তে, বাণ্মীকির কাছে কালিদাসের ঋণ আদৌ অস্বীকার করা যায় না।

যাই হোক, এতো গেল তথ্যের কথা। রসের কথাও অন্তত সংক্ষেপে না বললে ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি :

“মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য আর কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। পৃথিবীর সাংবাৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বঁধা পড়িয়াছে। বর্ষায় আমাদের মন—অভ্যন্ত ও পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাহিরের দিকে যাইতে যায়। পূর্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাজক্ষাকে উদ্বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন। আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়—এই হইল পূর্বমেঘ। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে—সে আমাদের চারিদিকে একটি পরম নিভৃত আবেষ্টন রচনা করিয়া ‘জননান্তর সৌন্দর্য্যনি’ মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্যালোকের মধ্যে কোন একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্ত মনকে উতলা করিয়া তোলে। পূর্বমেঘে বহু বিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তর মেঘে সেই একের সহিত অনন্তের সন্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম!”

—[বিচিত্র প্রবন্ধ]

অনুবাদ-বিচারের সুবিধার জন্তে আমি প্রত্যেক অনুবাদকের ২টি মাত্র শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছি—একটি পূর্বমেঘের ১ম শ্লোক, এবং অপরটি উত্তরমেঘের ১ম শ্লোক। পাঠকদের সুবিধার জন্তে আমি ঐ শ্লোক দুটির মূল সংস্কৃত রচনা প্রথমেই উপস্থিত করলাম। এ থেকে বোঝা যাবে, একই রচনা অনুবাদকদের মনকে কেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নাড়া দিয়েছে—এবং অনুবাদকেরা তাঁদের আপন আপন গ্রহণ ও ধারণশক্তি/অনুসারে তা আবার ভাষান্তরে প্রকাশ করেছেন।—

পূর্বমেঘ

কশিৎ কাস্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভতুঃ ।
যক্ষশক্রে জনকতনয়ান্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুণু বসতিং রামগির্ঘ্যাশ্রমেষু ॥

উত্তরমেঘ

বিদ্যুতস্তুং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবন্তদমভংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্থাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈবিশেষৈঃ ॥

দুই ॥ গ্রন্থপঞ্জী ও অনুবাদের নমুনা

১৮৫০ [১২৫৭]

মেঘদূত কাব্য | কবির ভগবৎ কালিদাস কৃত | শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি
কর্তৃক সংশোধনপূর্বক | শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে |
শ্রীলালমোহন গুহ ও শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের দ্বারা | স্থললীত সাধুভাষায় অনুবাদিত
হইয়া | ১২৫৭ সাল তাং ৪ ভাদ্র, মূল্য ১ তঙ্কা । পৃ. ১৩৬ [কলিকাতা,
চিত্তভানু বন্ধে যন্ত্রিত হইল । এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি জোড়াসাঁকো
দয়ে হাট্টার পূর্বদিকস্থ গলিতে ৬৩২নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ।]

অনুবাদের নমুনা ['ভাষা']—

পূর্বমেঘ

কুবেরানুচর কোন যক্ষ নিজ স্বামীর আদিষ্ট কর্মের অকরণ প্রযুক্ত ক্রোধাবিষ্ট
প্রভুর অতিহৃদারুণ গুরুতর শাপদ্বারা নিজ কাস্তা বিচ্ছেদানল দহনে স্বীয়
মাহাত্ম্য রহিত হইয়া জনক তনয়া সীতার স্নান দ্বারা পবিত্র জল এবং অতি
স্নগীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষ মণ্ডলী মণ্ডিত, যে সকল আশ্রম যাহাতে রামগিরি
নামক পর্বত আছেন সেই অতি মনোহর স্থানে সংবৎসর বাস করিয়াছিলেন ॥১

উত্তরমেঘ

হে মেঘ সেই অলকানন্দ মধ্য তোমার সদৃশ সৌভাগ্যযুক্ত যে দেবগৃহসকল
তদর্শনে তুমি জ্বালা হইবে, যে সকল প্রাসাদ চক্লু স্ফোভিত বিদ্যুতজ্বালাতুল্য
কামিনীগণযুক্ত হইয়াছে, এবং ইন্দ্রচাপ সদৃশ নানা চিত্রাঙ্কিত হইয়াছে, ও স্নিগ্ধ
গম্ভীর ঘনঘোষসম সঙ্গীতকালীন মুরজ বাণযুক্ত হইয়াছে, তথা মেঘ গর্ভস্থনীর
সদৃশ প্রদীপ্ত চন্দ্রকাস্তাদি মণিযুক্ত হইয়াছে, এবং তৎ সদৃশ উচ্চতর ॥১

১৮৬০ [১২৬৭]

মেঘদূত | শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত | ১৮৬০ ।

[দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যকর্ম এই মেঘদূত অল্পবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সনে । পরে, বাংলা ১৩১৪ সালে প্রকাশিত 'নবরত্নমালা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় । ১৩২৭ সালে শান্তিনিকেতন থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'কাব্যমালা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, পৃষ্ঠা ৬৬-২৪ ।

সম্প্রতি, কলিকাতা, ধ্রুপদী প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীশ্রীশীল রায়ের সম্পাদনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের অনূদিত 'মেঘদূত' কাব্যখানির একটি সচিত্র ও সঠিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । প্রকাশকাল : ১২৬০, বাংলা ১৩৬৭ অগ্রহায়ণ । পৃষ্ঠাঙ্ক : ভূমিকা ৫ + অল্পবাদ ৩২ + পাঠান্তর ইত্যাদি ১১ । শিল্পী মনীন্দ্র গুপ্ত অঙ্কিত যক্ষপত্নীর একখানি বহরঙা চিত্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের একখানি আলোকচিত্রসহ ।]

পূর্বমেঘ

অল্পবাদের নমুনা :—

কুবেরের অল্পচর কোন যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল স্নেহে ত্যজি কর্ম কাজ ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
“বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ !”
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি !
রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জ্ঞানকীর স্নানে ।
ভাবনায় গুণে তার অঙ্গ সমুদায়,
হস্ত হ'তে খসি পড়ে স্বর্ণের বলয় ।
আষাঢ়ের আগমনের দেখা দিল পরে
দিব্য এক মেঘ উঠি পর্বত উপরে ;
দেখিতে হইল আর এমনি মতন—
করী যেন বেলা-ভূমে হানিছে দশন ।
ঘনোদয়ে স্তম্ভীদেরও টলে যায় মন ।
কেমনে থাকিবে স্থির বিবাসী যে জন

উদ্ভূতমেঘ

অট্টালিকা কত শত সাজিয়াছে তোমা মত
 দেখিবে হেংগিয়া অলকায় ;
 তোমায় তড়িত মালা, সেথায় ললিত বালা,
 তুল্য শোভে কিবা দুজনায় ;
 তোমার গর্জন স্বর শুনিতে কি মনোহর,
 সেথায় মুদদ বাজে তায় ;
 তোমার অন্তরে জল পরকাশে নিরমল,
 মণিময় ভূতল সেথায় ।
 ইন্দ্রধনু তোমা-দেহে, অলকার গেহে গেহে
 চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ ;
 হর্য্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার আয়তন,
 তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ ।
 আলো করি গৃহ মাঝে বধুগণ কিবা সাজে,
 কুসুমের অনংকার গায় ।
 সে সব পড়িলে মনে, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে,
 কোথা ছিল—এসেছি কোথায় !

বিগিনবিহারি গুপ্ত সংকলিত ‘পুরাতন প্রসঙ্গ’ গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর
 স্মৃতিকথায় মেঘদূত প্রসঙ্গে বলেছেন :

“সিপাহী-বিদ্রোহের কিছু পরে আমার ‘মেঘদূত’ প্রকাশিত হইল। আমি
 যখন ‘মেঘদূত’ লিখি, তখন ও ধরণের বাদ্যলা কবিতা কেহ লিখিতেন না ;
 ঈশ্বর গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজীতে
 কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে
 [সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়] তিনি বলিলেন, ‘আমরা ধারণা ছিল বাদ্যলায়
 ভাল কবিতা রচিত হতে পারে না, মেঘদূত পড়ে দেখছি সে ধারণা ভুল।’”

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় (১৭৮১ শক আষাঢ়)
 এই অনুবাদটি সম্পর্কে বলেন :

“ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় কালিদাসের কাব্যের
 যে সকল অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রস্তাবিত মেঘদূত কোনোমতে
 কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে না।”

স্বলীল রায় সম্পাদিত মাসিক ‘ঋপদী’ কবিতাপত্রের ১৩৬৭ আষাঢ়, আশ্বিন

২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অশীল রায় সম্পাদিত দ্বিজেন্দ্রনাথের ‘মেঘদূত’ কাব্যের ভূমিকায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংকলিত হয়েছে।

১৮৭১ [১২৭৮]

মেঘদূত—প্রাণনাথ পণ্ডিত সম্পাদিত, মল্লিনাথ কৃত টীকা সহ। নাগরী হরফে মূল ও বঙ্গানুবাদ। ১৮৭১, পৃ: ১২৫, ৪৬ পঙ্ক্ত্যানুবাদ।

পূর্বমেঘ

অনুবাদের নমুনা :—

যথায় রাঘব-গিরি নমেরু-কানন
তাপক্লান্ত পথিকের জুড়ায় জীবন,
জনকতনয়া স্নানে ভূধর-দুহিতা
পেয়েছেন তদবধি চির পবিত্রতা,
প্রভু-শাপে হীনকান্তি ধনপতি-দাস
বিষম বিরহ দুঃখে করে তথা বাস।
উন্নতের প্রায় তথা করে বিচরণ,
দয়িত-বিচ্ছেদ-দুঃখ না হয় বারণ,
উজ্জান পালনে নাহি ছিল সাবধান
কুপিয়া কুবের তায় করে শাপদান—
বৎসরেক কাল ত্যজি অলকা-ভূবন,
রামগিরি আশ্রমেতে কর নিবসন ॥ ১

উত্তরমেঘ

চাক্র সৌদামিনী তব, কামিনী নয়নে
স্বর-পতি চাপ তব, নানা চিত্রগণে,
গ্রহত-সঙ্গীত-হেতু মুরজ বাদনে
সুমধুর সুগভীর তব গরজনে,
জল স্রবণ তব, মণিময় ভবনে,
উন্নতি তোমার, সব উচ্চ নিকেতনে,
যথায় প্রাসাদগণ অস্তিক-গগন,
এইমতে পারে তব করিতে তুলন ॥ ১

১৮৮২ [১২৮৯]

মেঘদূত। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল. কর্তৃক বাঙ্গালা পড়ে অনুবাদিত। ১৮৮২ পৃ. ১০, ৬০

The MEGHDUTA. Translated into Bengali Verse !
By Rajkrishna Mookherjee M. A, & B. L. Published by—
The Sanskrit Press Depository, 148, Baranoshi Ghose's
Street, Calcutta, 1882

ভূমিকা।—আমি যখন বাঙ্গালা পণ্ডে মেঘদূতের অনুবাদ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় ইহার যে অল্প কোন পণ্ডানুবাদ আছে তাহা জানিতাম না। পূর্বমেঘের প্রায় অর্ধেক লেখা হইলে, জানিতে পাইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এবং আরও কেহ কেহ বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধে মেঘদূতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম যে তাঁহারা যে প্রণালীতে অনুবাদ করিয়াছেন আমার অনুবাদ সে প্রণালীর হইতেছে না। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের যত স্বতন্ত্র অনুবাদ বঙ্গভাষায় থাকে, মূল বুঝিবার পক্ষে তত সুবিধা হইবে, বিবেচনা করিয়া আমার অনুবাদও শেষ করিলাম। অনুবাদকালে শ্রীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিজয়ারত্ন ও তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিজাসাগর মহাশয় পাঠাদিবিবেক ও মল্লিনাথের টীকা সহিত মেঘদূতের যে সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই অনুবাদদুস্তক লিখিত হইল। কেবল বিজাসাগর মহাশয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ দুইটি শ্লোক উত্তর মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের পর রাখিয়া দিয়াছি। শ্লোক দুইটি অনেকে মেঘদূত হইতে উদ্ধৃত করেন বলিয়া রাখিলাম। সংস্কৃত মেঘদূত আত্মোপাঙ একই ছন্দে লিখিত। এ নিমিত্ত সমুদয় শ্লোকই একবিধ বাঙ্গালা মিত্রাক্ষর কবিতায় অনুবাদ করিলাম। মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা করিবার নিমিত্ত মূল ও অনুবাদ একত্রে দেওয়া গেল।—

কলিকাতা, ১২৮৯ সাল, ২৫শে কাতিক।]

পূর্বমেঘ

অনুবাদের নমুনা :—

কার্য্য ফেলি অগ্রমণা যক্ষ একজন,
“কান্তা ছাড়ি দূরে গিয়া যাক নুবংসর
এ দারুণ প্রভুশাপে মহিমা আপন
হারাইয়া রহে গিয়া রামগিরি’ পর,
যথা জ্ঞানকীর স্নানে পূণ্যময় জল,
বিস্তারে শীতল ছায়া যথা তরুদল ॥ ১

উত্তরমেঘ

- চপলা ললিত বালা, ইন্দ্রচাপ চিত্র,
মধুর গম্ভীর ঘোষ মৃদঙ্গসঙ্গীত,
অন্তস্তোয় মণিময় ভূমি যেন, মিত্র,
এইরূপে পদে পদে তোমার সহিত
দেখিতেছি তুলনীয় বিবিধ প্রকারে
প্রাসাদ গগনস্পর্শী অলকা মাঝারে ॥ ১

‘মেঘদূত’—এর সমালোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় [১২৮৯ পৌষ ও ফালগুন] প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে লেখেন :

:..... মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতি বাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করণে রাজকৃষ্ণবাবুর ত্রায় দক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণ বাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্মগ্রাহী; আমরা তাঁহার অনুবাদ আত্মস্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফললাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাঙ্গালায় মেঘদূতের আর দুই-একখানি অনুবাদ আছে, তদপেক্ষা মূলের সহিত এক্ষণে রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুবাদ যে সর্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা অনাবশ্যক।”

১৮৯১ [১২৯৮]

মেঘদূত। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ১২৯৮ (‘ভারতী’ হইতে পুনর্মুদ্রিত)। পৃ.:২৭

পূর্বমেঘ

অনুবাদের নমুনা :—

স্বকার্যে প্রমাদ গণি প্রভু দিলা ক্রোধে গুরুশাপ
“বর্ষেক ভুঞ্জিবি তুই কান্তা ছাড়ি প্রবাসের তাপ;”
নিবসে বিরহি যক্ষ রামগিরি আশ্রমে অধীর,
সিদ্ধ ছায়াতরু যথা, জানকীর স্নানে পুণ্য নীর ॥ ১

উত্তরমেঘ

তোমায় তড়িৎ বালা, অলকায় ললিত ললনা
ইন্দ্রধনু তব সাজ, সজ্জিত সে পুরী অতুলনা—

এদিকে মুদঙ্গ বাত, তোমার সে স্নগভীর ধ্বনি—
 জলগর্ভতুমি ব্যথা, রক্তধনি অলকা তেমনি—
 গগন বিহারী তুমি, অত্রভেদী গিরি সে মহান্ ;—
 উভয়েই সমতুল—নাহি দেখি কিছু অসমান ॥ ১

১৮২২ [১২২২]

মেঘদূত। (কাব্যাল্লাবাদ)। শ্রীবরদাচরণ মিত্র। পৃ. ৮০, ৬১

[মেঘের গমনপথের মানচিত্র সহ]

কলিকাতা, ৫৪ কলেজ ষ্ট্রীট, এস. কে. নাহিড়ী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য
 ৮০ আনা।

বিজ্ঞাপন।—মেঘদূতের কাব্যাল্লাবাদ খণ্ডে খণ্ডে ‘নব্য-ভারতে’ প্রকাশ
 হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের অল্পমত্যাল্লাসারে তাহা বর্তমান
 পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। অনেক স্থলে পূর্ব-প্রকাশিতের পরিবর্তন
 করিয়াছি। মূলেরও ছই একস্থান নব্যরূচি-বিরুদ্ধতা-বশতঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন
 করিয়াছি।

.....কটক, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩।

[পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম. এ. ; রাধানাথ রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার,
 বি. এ., রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শপ্রাপ্ত।]

উৎসর্গ। রমেশচন্দ্র দত্ত, সি. আই. ই.।—কটক, বসন্ত পঞ্চমী, ১২২২।

সুচনায় একটি কবিতা আছে, তার অংশবিশেষ—

বিরহ কি শুধু ব্যথা,—কেবলি বেদন ?
 না, না, কবি, তুমিই তো দিয়াছ বলিয়া,
 শ্রান্ত মদনের সে যে আবেশ-স্বপন,—
 জাগে রতি-পতি বল দ্বিগুণ লভিয়া ;
 সে নহে তো তাপ, সে যে রবির কিরণ,
 সে নহে তো অশ্রু, সে যে বরষার ধায়া,
 উষ্ণখাস নহে, সে যে বসন্ত-পবন,—
 বাড়ে তায় গোড়া বাধি প্রণয়ের চারা।
 বেদনা তো বটে তায়,—কিন্তু কি মধুর !—

অন্ধকারে চামেলির সৌরভ যেমতি
মিশীথ-সমীরে কিম্বা বাঁশরীর সুর,
পরাণ আকুল করে,—বিরহে তেমতি !

কাঁদিছ কি যক্ষ-বালা,—কেঁদনা, কেঁদনা,
ভাল কি বাস না তুমি বিচ্ছেদ-বেদনা ?

পূর্বগেঘ

অনুবাদের নমুনা :—

জ্ঞানকীর স্নানে যেথা পুণ্যবারি
নদী লুটে রামগিরির পায়,
বিরাজে আশ্রম তীরেতে তাহারি,
যন নমেরুর শীতল ছায় ;
থাকে তথা যক্ষ ; কর্তব্য-হেলায়
প্রভু দিলা তারে কঠোর শাপ,—
হারায় গৌরব সহিতে সেথায়
বরষেক প্রিয়া-বিরহ তাপ ॥১

উল্লরগেঘ

তড়িত-তুলনা ললনা যথায়
ইন্দ্র-ধনু চিত্রগণেতে রাজে ;
গম্ভীরে গরজি, মেঘ-মন্দ প্রায়,
যেখানে মধুর মুরজ বাজে ;
মণি-নিরমিত, জলে মেঘ যথা ;
অভ্রে মিশি যার শিখর রয় ;
প্রতি গুণে ধরে তোমারই প্রথা
যে পুরীর হেন প্রাসাদ-চয় ॥১

পরিশিষ্টে | রমেশচন্দ্র দত্ত, রমেশচন্দ্র মিত্র, জাষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
সারদাচরণ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কটকের জেলা ও সেশন জর্জ বি. এল.
গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, উড়িষ্যার রাধানাথ রায়, রাজেন্দ্রচন্দ্র
শাস্ত্রী, ইন্ডিয়ান মিরর, ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতির ইংরেজীতে লিখিত
প্রশংসাপত্র সন্নিবিষ্ট আছে। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল।—

To say that it is the best translation into Bengali of any
Sanskrit poem that I have even seen, would scarcely convey

my opinion adequately.....I do not think I am mistaken in believing that this translation will make a name for you in Bengali literature.— Mr. R. C. Dutt. c. s., C. I. E.

I liked it exceedingly well—its metre and its choice of words, and its simplicity of language.....I have no doubt it should be a delightful work of poetry in Bengali, —Prof. Krishna Kamal Bhattacharjee, B. L. 13th June, 1893

...think very highly of your Meghduta. This saying includes every sort of detailed criticism of your work.—
• Babu Bankim Chandra Chatterjee.

১৮৯৭ [১৩০৪]

মেঘদূত। শ্রীরঘুনাথ স্কুল প্রণীত। পৃ. ৮, ৫৫ কলিকাতা, জে. এন. ব্যানার্জী এণ্ড সন্স, ব্যানার্জী প্রেস। ১১২ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড। কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৯৭ উৎসর্গ।—নাটোরাদ্বিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

ভূমিৎ, ...মেঘদূতের অনেক পঙ্খানুবাদ থাকিলেও আমি আবার করিলাম। পূর্ব অনুবাদকগণকে অতিক্রম করা আমার উদ্দেশ্য নহে; আমার, এই মেঘদূত পাঠে মনে যে অতুল আনন্দ ও অদম্য উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল ইহা তাহারই উৎস। কবির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ক্রটি করি নাই। যে আমার দোষ নহে, আমার অনভিজ্ঞতা এবং কবিতা রচনার তাদৃশ শক্তি না থাকার দোষ; তজ্জন্ম কবির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি। অনুবাদকগণ কে কতদূর মূলগ্রন্থ ঠিক রাখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, এবং মেঘদূত রচয়িতার বিশ্বাসভাজন হওয়া কতদূর সম্ভবপর তাহাও তাঁহারাই বিদিত আছেন। সম্প্রতি আমার অনুবাদখানি প্রশংসনীয় না হউক, নিন্দনীয় না হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।.....

নাটোর। তারিখ ১৪ই আষাঢ়, সন ১৩০৪ সাল।

পূর্বমেঘ

অনুবাদের নমুনা :—

যেখানে জানকী পুণিলা সলিল

সিনানে সঞ্চরি কায়া,

তরুণন্দ যেথা বিতরে সানিল

সাজ হুমধুর ছায়া,

তেন পুণ্যধাম গিরি নামে রাম
 • শোভিত বিপিন বরে,
 যক্ষ সেথা কোন বাঁধিল বসতি
 পূর্ণ বরষেক তরে ।
 স্বকীয় করমে সদা উদাসীন,
 তাই, সে, প্রভুর শাপে,
 মহিমা বিহনে দহে নিশি দিন
 দারুণ বিচ্ছেদ-তাপে ॥১

উত্তরশেষ

অলকার সৌধ তুঙ্গ তব সম,
 বিজুলা সন্নিভা নারী,
 রঞ্জিত তোরণ তব ইন্দ্রধনু,
 গর্জ, মুরজালুকারী ।
 তব নীরনিভ সমুজ্জল তার
 মণি বিমণ্ডিত ভূমি,
 তাই বলি সখে, অলকার সনে
 সরবাসে সম তুমি ॥১

১৮৯৯ [১৩৬]

মেঘদূত । (বঙ্গ-কবিতাহুবাদ) । ক্রীকেনাসচন্দ্র বিশ্বাস বি. এল কর্তৃক
 অহুবাদিত । পৃ. ৬০ কলিকাতা, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার সাম্য-যজ্ঞে, ত্রিনিবারণচন্দ্র
 ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । ১৮৯৯ । মূল্য ৥০ আট আনা মাত্র ।

[Dedication of MEGHADUTA to Col. A. Evans
 Gordon. This Humble work, is most respectfully dedicated
 as a token of esteem and regard, by His Devoted Admirer,
 The Translator.]

পূর্বশেষ

অহুবাদের নমুনা :—

নিজ অধিকার-মুগ্ধ যক্ষ একজন,
 প্রেমসী-বিরহ-জাত-যাতনা-বর্ধন—
 বর্ধ-ভোগ্য অভিশাপে প্রভুর আপন
 জতগর্ভ, ত্রিয়মাণ, লইলা শরণ—

রামগিরি-আশ্রমেতে ; যথা প্রবাহিত
জনক-তনয়া স্নান-পুণ্য-তোয়-ধার,
পল্লবিত-ক্রম-কুল যথা বিরাজিত
সুশীতল শ্রান্তিহারী স্নিগ্ধ ছায়া যার ॥১

উত্তরমেঘ

অলকার অল্পস্পর্শী প্রাসাদ-নিকরে,
উপমিত বহুগুণে হবে তব সনে,
ললিত ললনা যথা তথায় বিহরে
তেমনি দামিনী শোভে তোমার পরণে
সচিত্র প্রাসাদ—তুমি ইন্দ্র-চাপ-যুত ;
প্রহত-মুরজ-ধ্বনি উথলে সেথায়,
স্নিগ্ধ স্রগভীর ঘোষে তুমি পরিচিত ;
মগিতে শোভে সে—তুমি সলিল-কণায় ॥১

১৯০১ [১৩০৮]

পূর্বমেঘ

মেঘদূতম্ । বিধুভুষণ গোস্বামি সম্পাদিত । নাগরী হরপে মূল, এবং
ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদসহ । ১৯০১, পৃ. ২৬০ । গচ্ছানুবাদ ।
অনুবাদের নমুনা : কোন এক জন যক্ষ স্বকর্তব্য কর্মে অনবধানতার নিমিত্ত
প্রভু যক্ষরাজ কর্তৃক প্রিয়াবিরহে দুঃসহ, বর্ষব্যাপী নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায়
ভ্রষ্টশ্রী ও দীনদশাপ্রাপ্ত হইয়া চিত্রকূট পর্বতে নিবিড়চ্ছায়াযুক্ত আশ্রমে বাস
করিয়াছিল । যথায় নদী জলাশয় আদি পূর্বে জানকীর অবগাহনের দ্বারা
প্রবিত্ত হইয়াছিল ॥১

উত্তরমেঘ

যেস্থানে সুন্দর রমণীগণ শোভিত, বিবিধ চিত্রসমবিত, সঙ্গীতের জগৎ
মুরজশব্দে নিনাদিত, মণিকুট্টিমালাস্কৃত, মেঘস্পর্শিশিখর, প্রাসাদগুলি সেই সেই
ধর্মহেতু, বিদ্যাৎসনাথ, ইন্দ্রধনুঃ শোভিত, স্নিগ্ধগভীরগজিতবিশিষ্ট, অভ্যন্তরে
সলিলসহিত উন্নত মেঘের সহিত স্পর্শ করিতে সক্ষম ॥১

১৯০৮ [১৩১৫]

মেঘদূত । (কাব্যানুবাদ) শ্রীঅখিলচন্দ্র গালিত অনুদিত এবং বিবিধ
টীকা টিপ্পনী সহিত সম্পাদিত । পৃ. ১৮০, ১৫১ কুচবিহার নগেন্দ্রপ্রসাদ
রায়, বি. এল প্রকাশিত । ১৯০৮ । মূল্য ১ টাকা ।

[মঙ্গলাচরণ । উৎসর্গপত্র । নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর প্রতি]

আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত একটি কবিতাংশ :—

অমৃত-অধিক মিষ্ট যাহার অধর,
বীণাধ্বনি পরাজিত শুনি কণ্ঠস্বর,
ললিত লাবণ্য-লতা দেহ স্নকুমার,
সুস্নীল নয়ন দুটি প্রেম পারাবার,
বর রূপসীর রূপে কি দিব উপমা ?
সে অপূর্ব রূপ হেরি লজ্জা পায় রমা !
সখি ! এ জনমে সাধ না মিটিল মোর,
বল, মরিলেও সঙ্গ পাব না কি তোয় ?

মঙ্গলাচরণ অংশের কবিতাটি এই রকম ।—

জগদীশ,
তোমার প্রেমের তিলেক লইয়া
প্রেমেতে মগন বসুধা রাণী,
সে প্রেম-সরিতে প্রাবিত হইয়া
ভাসিছে ডুবিছে যতেক প্রাণী ;
কত ক্রীড়া তার, কত বা মুরতি
পবিত্র নির্মল আনন্দময়,
স্বাবর জন্ম নিখিল প্রকৃতি
গাইছে কেবল প্রেমের জয় ।
পাইয়া হৃদয়ে তোমার ইঙ্গিত
অমর গাথায় অমর কবি,
অমৃত তরঙ্গে গাইল সঙ্গীত
অমর প্রেমের অমর ছবি ।
দীন বঙ্গভাষা কোথায় পাইবে
অতুল সম্পদ বিভব-রাশি ?
দীন কবি হায় ! কোথায় পাইবে
সে দৈব-কবিতা সুষমা-হাসি !
তবু মন মোর চাহে পরশিতে
কবি কালিদাস-চরণ-তল
মাতৃভাষা-ডোরে যতনে গাঁথিতে
'মেঘদূত'-গাথা-প্রসূন-দল ।

কর আশীর্বাদ, পূরাও কামনা,
 ঘুচাও মনের কলুষ-তমঃ,
 হৃদয়ে জাগাও তব প্রেম কণা—
 কোটী পূর্ণিমার শশাঙ্ক সম ॥

উৎসর্গপত্র ।—কুচবিহাররাজ্যের স্বদক্ষ এবং প্রবীণ প্রধান অমাত্য, এবং তদ্রত্যা প্রধান বিচারালয়ের স্বমোগ্য বিচারপতি, অশেষ গুণনিকেতন, বিজ্ঞোৎসাহি-প্রবর, ভক্তিভাজন পূজ্যপাদ দেওয়ান শ্রীযুক্ত রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর, বি. এল. সি. আই. ই. মহোদয়ের শ্রীচরণে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তির সামান্য নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, তদীয় কৃপালুমত্যহসারে, উৎসৃষ্ট হইল। শিবমস্ত।

ভূমিকা।—মেঘদূত মানবের অতিশয় প্রিয় কাব্য। মেঘদূতে মানব হৃদয়ের মধুরতম ভাব অতি মনোহর রূপে বিকসিত, উচ্ছ্বসিত এবং চিত্রিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকিলে এই কাব্যের সৌন্দর্য্যভাব করিবার উপায় আদৌ নাই। অসাধারণ পণ্ডিত, অদ্বিতীয় কাব্যরসনিপুণ হুরি মল্লিনাথ কৃষ্ণা করিয়া সঞ্জীবনী টীকায় মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যার অস্তিত্ব না থাকিলে সংস্কৃতভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকের ভাগ্যে ইহার সম্পূর্ণ রসাস্বাদ ঘটিত না। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকিলে সে রসে একেবারে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে সংস্কৃত কয়জন জানেন? আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃতের দুহিতা; তিনি যে তাঁহার মাতার একরূপ একখানি উৎকৃষ্ট রত্নভরণ হইতে বঞ্চিত আছেন, ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? ইয়োরোপীয়গণ এই মধুময় কাব্যের মর্যাদা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় ইহার অনুবাদ বাহির করিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমাদের দেশে—কালিদাসের নিজের দেশে—ইহার তেমন প্রচার নাই। কয়েকখানি অনুবাদ বাহির হইয়াছে এবং তাহাতে এই প্রচার-কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি এই কাব্যের একটি সরল অনুবাদ ব্যাখ্যা পরিশিষ্টাদির সহিত বাহির হইলে অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের অনেক সুবিধা হইবে এই আশায় এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। পাঠক পাঠিকাগণ যাহাতে সকল বিষয় স্চারুরূপে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই। অনুবাদ মিলাইয়া দেবিবার সুবিধার জন্ত মূল্যংশ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।.....

কুচবিহার রাজধানী, ১লা ফাল্গুন, ১৩১৪।

অলুবাদকের প্রিয়তমা ছাত্রী ‘বঙ্গ কবিতাকাশের উজ্জ্বল কাব্যতারা’ :
 “নগেন্দ্রবালার [জন্ম মাঘ ১২৭৯ ; মৃত্যু ১৩১৩] সাগ্রহ অলুরোধেই মেঘদূতের
 অলুবাদ আরম্ভ হয়, কিন্তু উহা মুদ্রিত হইবার পূর্বেই তিনি লোকাঙ্কুরিত হন।”

—এই ‘নগেন্দ্রবালা স্রব্ধতীর প্রতি’ কবিতার অংশবিশেষ :—

প্রিয়তম কাব্য তব আদরের ধন,
 প্রেমময় হৃদয়ের বিমল দর্পণ,
 সাধের সে ‘মেঘদূত’ হ’ল প্রকাশিত,
 হায় ! হতভাগ্য আমি আনন্দে বঞ্চিত !

পূর্বমেঘ

অলুবাদের নমুনা :—

কার্য্যে অবহেলা দোষের কারণ
 কুবের যক্ষেরে দিলা এই শাপ,
 “সহিবে, হারায়ে মহিমা আপনু,
 একবর্ষ প্রিয়া বিরহের তাপ।”
 পুণ্যবারি যথা জানকীর স্নানে,
 স্নিগ্ধ-ছায়াতরু বিরাজে যথায়,
 ‘রামগিরি’ নাম আশ্রয় যেখানে,—
 সে অভাগা যক্ষ রহিল তথায় ॥১-৮

উত্তরমেঘ

সুচারু-প্রাসাদ অলকা-ভিতর,—
 তুলনার ঠিক তোমার মতন ;
 তথায় ললিত-ললনা-নিকর,
 তবকোলে শোভিত দামিনী যেমন ;
 বিবিধ রুচির ছবি অগণন
 শোভে তথা,—যথা রামধনু তব,
 গভীর মধুর তব গরজন,
 তথা উঠিছে মুরজের রব ;
 মণি-বিরচিত কুটুম তাহার,
 স্বচ্ছজল-রাশি তোমার যেমন ;
 আকাশেতে তুমি,—ওদিকে আবার
 উচ্চশির তব স্পর্শিছে গগন ॥১-১২

অন্তরীক্ষের সঙ্গীত

অগ্নিরত্তন মুখোপাধ্যায়

ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, সহজ এবং স্বাভাবিক। বিশ্বয়কর বলে মনে হলে-ও মাহুষের মনোজীবনে তথা অধিজীবনে এটা হামেশাই ঘটে; ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার মত দেহ ছেড়ে আমরা নানা বাসনার আকাশে উড়ে যাই; পাখীর মত কত গান করি, কত আলো দেখি, কত কী-র স্পর্শস্থল্লেখে হই সম্মোহিত, কতবিধ ভাবের ভবন করি রচনা, কত লোকের সাড়া পাই, কত না ভাবাবেশে কতজনের হাতে দিই হাত, মনে মন।

পড়ার ঘরে, কিংবা গাড়ীতে যেতে যেতে, কোনো বই হাতে নিয়ে হয়তো বসে আছেন, দেখলে মনে হবে, আপনি বুঝি বই-ই পড়ছেন। কিন্তু আপনার কথা আপনিই জানেন; আপনি কিছুই পড়ছেন না। বই হাতে নিয়ে দেহটা হয়তো আছে নিস্তরু—আপনি কিন্তু বেরিয়েছেন—‘অন্ত কোথা অন্ত কোনখানে’। কে জানে, হয়তো তখন ঘুরছেন কল্যাণকুমারিকার সাগর-সৈকতে, মাদুরার মীনাক্ষীমন্দিরে, কোণারকের সূর্য-রথে কিংবা সারনাথের পুষ্পোত্তানে।

এমনটা হওয়া মনস্তাত্ত্বিকবিচারে বিচিত্র কিছু নয়। পূর্বে যা দেখেছি, স্মৃতির-আনন্দে তা’ মানসচক্ষে পূর্ববার দর্শন-করা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এমন কি আগে কখনো যা দেখি নি, স্বপ্নে তা দেখাও হয়তো সম্ভব। কান্দীর আজ-ও যাইনি, যাইনি অমরনাথ, যাইনি কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, পশুপতিনাথ—তবু ভাবে-ভাবে সেখানে যাওয়া কি এতই কঠিন?... লণ্ডনে যাইনি, যাইনি ওয়াশিংটন কি মস্কো, প্যারিস কি পিকিং—তবু মনে মনে তো কতবার বার হই তরুণ পথিকের মত, কত সাগরতীরে করি পরিক্রমা, কত ঐতিহাসিক জনপদ করি দর্শন, কত নিত্যস্মরণীয় মহাকবি ও দার্শনিক এবং যৌগিবৈজ্ঞানিকদের সমাধিরক্ষে দিই পুষ্পস্তবক, কত দরিদ্র পল্লীশেথ করি বিচারণা, কত অভিজাত বিলাসহর্মে নিই বিশ্রাম।

অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এ-সব ব্যাপারও তেমন অভাবনীয় কিছু নয় যে, আমি জানি। লোকমুখে শুনে কি বই পড়ে এই যত দেশ, জনপদ ও

রাজধানী সম্পর্কে নবচেতনার অন্তরে বাস্তব ধারণার মত স্পষ্ট ধারণাই আমার হয়ে আছে। সেই সব নিবিড় ধারণাই ছবি হয়ে সত্যের মত-ই স্বপ্রাবেশে প্রতিভাত হতে পারে। এ-সকল তথ্য মনস্তাত্ত্বিকেরা বৈজ্ঞানিক নিয়মে ব্যাখ্যাও করতে পারেন।

কিন্তু কখনও দেখিনি, শুনি নি, পড়ি নি—এমন কিছু আভাস পাওয়া কি স্বপ্নে সম্ভব? জীবনের গুহাহিত অগম রহস্যও স্বপ্নে কি দেখা যায়? জাগরণে কি ভাবা যায়, ধ্যান করে' পাওয়া যায়?...যা কিছু হয়ে গেছে, তার সূত্র ধরে' জ্ঞানের রাজ্যে আমরা অগ্রসর হই, এটা সত্য। কিন্তু যা আজ ও হয়নি বলে' ভেবে আছি, তারও আভাস কি মেলে জীবনে?

আমার মনে হয়, মেলে, মেলা সম্ভব। দার্শনিক ও যোগীরা, কবিরা ও কলাবিদেরা স্বভাবজীবন থেকেই সত্য সন্ধান করেন না, স্বভাবজীবনে বাস্তবে যা প্রসূত হয়নি বলে' ভাবি, তারও স্বপ্ন দেখেন, বিশ্বাস করেন এবং সাধনজীবনের অধিগত সত্যস্বপ্নের আনন্দ থেকে-ই জীবনের তত্ত্বের ও শিল্পের আদর্শ ও রস আহরণ করেন। অবশ্য সব কবি-ই যে কবি, তা বলি না; দর্শন পড়লেই যে দার্শনিক—তা-ও নয়। স্বভাবজীবনের সাধারণ বাস্তব নিয়ে যাদের কারবার, তারা যা-হয়ে-আছে—তাই নিয়েই দেখায় নৈপুণ্য, করে হৈ-চৈ। স্বভাবকে স্বভাবের দ্বারাই যারা উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনায় আছেন, উচ্ছে যাদের রতি, তুচ্ছে বিরতি, তাঁরা, কেবল তাঁরা-ই, সবার আড়ালে বসে আকাশের বাগী শোনে, অগমের ছবি দেখেন, অতলের আনন্দ করেন স্পর্শ।

কি জানি, আপনার মনের মত কথা, বিশ্বাসযোগ্য কথা, বলা হল কিনা। বর্তমান বস্তুতাত্ত্বিক যুগে মাটির কথা-ই সত্য, আকাশের কথা শূণ্য ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু আকাশে থেকে জল ঝরে, বাতাস ভাসে, আলোক আসে—তাই না তরুতে ফুল ধরে, ফল জাগে, পাখী গান গায়, প্রজাপতি ওড়ে?

অগ্নির কথা থাক, নিজের কথা বলি। আমি তো দেহসর্বস্ব জীব, মাটি নিয়েই আছি। তবু কী আশ্চর্য, মাঝে মাঝে আকাশচারিত্রীর পাখা পাই, দেহ থেকে উঠে যাই, উড়ে যাই অগমনঙ্ক। ইঁা গো, দূরে গিয়ে নিজের দেহটাকে দেখি, চিত্রাভিনেতা যেমন দূরে বসে নিজের অভিনয় দেখে, আমি-ও তেমনি উদাসীন ভাবাবেশে নিজেকে, নিজের দেহটাকে, দেখি। যখন দেখি, তখন কিছুই বিচারবোধ থাকে না। যখন দেহে ফিরে এসে চমকে উঠি, স্পষ্টতঃ বুঝতে পারি, দেহটা আমার আমার বলে' আছি বটে, কিন্তু আমি-টা হচ্ছে অল্প কিছু পদার্থ।...তবে তো দেহটা ছেড়ে একেবারে যখন চলে যাব,

তখন-ও থাকব। আজ যেমন আছি, তেমনভাবে না-হয় না-ই রইলুম, অথ
একভাবে, চেতনার আনন্দভাবে, তো থাকব !!

জীবদ্দশাতেই দেহ ছেড়ে অত্ম কোথাও চলার কথা ‘অন্ত্যমন্সরা’ জানে—
আর জানেন যোগবিজ্ঞানীরা। আমরা বাস্তববাদী মানুষ, এ-সব তথ্যে মন দিই
না, তাই দেহ ছেড়ে আকাশচারী হওয়ার চেতনাটি বোধজীবনে স্পর্শ-ই করে
না। আসলে, ওটা আমাদের বাস্তব বৈষয়িক জীবনের কোনো ‘প্রব্লেম’-ই
নয়। নয়, তাই তাতে কোনো ‘ইন্টারেস্ট’ অনুভব করি নে। আর করি না
বলেই ওটি আমাদের সাম্প্রতিক জ্ঞান-জীবনের বাইরেই আছে উপেক্ষিত।

উপেক্ষিত হলেও সত্য, সত্য। একদিনের একটা গল্প বলি। বক্তব্যটা
সহজবোধ্য হবে। একদিন তন্ময় হয়ে শ্রীমন্তাগবত পাঠ করছি, একেবারে
আত্মস্থ হয়ে গেছি বলেই হয়, হঠাৎ আবিষ্কার করলুম : আমার এই পড়ার
ঘর থেকে, আমার পাঠরত অবস্থায় উপবিষ্ট দেহটা থেকে কখন যেন বেরিয়ে
গিয়েছি, ঘরের সামনে প্রশস্ত ওই ছাদটায় বসে উদাসীন গতব্যর্থ ভাবে
গৃহমধ্যে পাঠ-নিবিষ্ট মৃতকল্প দেহটাকে দেখছি, দেখছি আর দেখছি।

এমনটা যেন রোজ-ই হয়, এমন তখন আমার ভাব। এমন অভিজ্ঞতা,
যতদূর মনে হয় এর আগে কখনো আমার হয়নি—তবু প্রবন্ধটা লেখার সময়
মনে হচ্ছে যে, তখন আমার এমন ভাব—যেন বহুবার এমনতর মুক্তি পেয়েছি,
নিয়েছি। আরশিতে নিজের ছবিটা যেমন সহজে দেখি—দেহ থেকে বেরিয়ে
এসে বহুবার যেন নিজেকে তেমনি করে’ আগেও দেখেছি। আজ তাই
‘বিশ্বয় নয়, কৌতুক নয়, কৌতুহল নয়, কেমন-যেন-একটা নির্বেগ নিস্তরঙ্গ
একা-একা ভাব নিয়ে ঘরে-পড়ে-থাকা দেহটাকে দেখছি।

এমন সময় আমার বড় মেয়ে অর্চনা দুধ নিয়ে আমাকে দেয়ার জন্তে
ছাদের পড়ার ঘরে এল। ‘বাবা’ বলে ডাকল বার দুই। বেশ কয়েক সেকেণ্ড
পরে বই ঠেলে আমি নড়ে বসলুম। অর্চনা মনে করলে তার বাবা পড়ায় ব্যস্ত
ছিল বলেই সাড়া দেয়নি। সামনে দুধের বাটিটা রেখে সে চলে গেল।

দুধে মুখ দিয়ে আমার কিন্তু বিশ্বয়ের অবধি রইল না। কেমন-একটা
অনুভূত ভাবরোমাঞ্চে হৃৎপিণ্ডটা গুরু-গুরু করে উঠল। কী একটা মহৎ
সত্য যেন আবিষ্কার করেছি বলে মনে হল। মনে হল : আমি পৃথিবীর,
আমি আকাশের, আমি দেহের, আমি আত্মার, আমি এখানের, আমি
সেখানের, আমি জীবনের, আমি মৃত্যুর।

দেহসর্বস্ব হয়ে আছি বলেই বস্তুবন্ধনে আমি বদ্ধ। স্বকৃতিপ্রভাবে

জীবদশাতেই যদি দেহের সীমা একবার ছাড়াতে পারি ‘অসংখ্য বন্ধনগায়ে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ’। তখন মুক্ত আমি আকাশচারী ঈগলের মত স্বর্ঘ্যাতীত দূরলোকের রহস্যে : অন্তরীক্ষের সঙ্গীতে।

মানুষের মধ্যে দ্বিবিধ সত্তা। উপনিষদকথিত সেই দুই পাখী স্মরণ করুন : একজন থাকছে, আর একজন দেখছে। সহজ কথায়, এই দুই পাখীর এক পাখী ক্ষুৎপিপাসাকাতর ব্যক্তিসত্তা, আর পাখী যেন ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান-দ্রষ্টা বিশ্বসত্তা।...বৈষ্ণবদের কামপ্রেমে যে-ভেদ, দুই পাখীতে, অর্থাৎ ব্যক্তি ও বিশ্বসত্তাতে, সেই ভেদ। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা হ’ল কাম, ব্যক্তিসত্তার কামকামনা; কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা হ’ল প্রেম, বিশ্বসত্তার দিব্যোন্মাদনা। অধিকারভেদে বাপু, দুই-ই সত্য। তর্ক করে লাভ কি, যদি বৈষয়িক ও বস্তুতাত্ত্বিক, তবে ব্যক্তিসত্তাই সত্য ; যদি আধ্যাত্মিক ও আদর্শবাদী, তবে বিশ্বসত্তাই।...

আমাদের যুগে যিনি কবিদের কবি, মহাকবি, সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘মানুষের ধর্মে’ ব্যক্তিসত্তাকে বলেছেন অহং, আর বিশ্বসত্তাকে, আত্মা। মানুষের ধর্মে কাজ করে দুই আমি : ছোট-আমি আর বড় আমি। ফলতঃ দুই আমি ই সত্য। আমি ছাড়া বিশ্ব নেই, বলব কি, ব্রহ্মা-ও নেই ? আমি যদি ছোট-আমি, তবে নিজের নাগ, নিজের স্মৃতিভোগ, নিজের স্বার্থ-ই অবশ্য সত্য। যদি বড়-আমি, তবে ব্রহ্মনাম-ই সত্য আর সব মিথ্যা, অর্থাৎ আর-সবে আমি উদাসীন।...আমি যাতে উদাসীন তা আমার কাছে মিথ্যা নয়তো কী ? ..

দেহসর্বস্ব বর্তমানযুগে ব্যক্তিটাই অবশ্য সত্য এবং বাস্তব। না, বিরুদ্ধ তর্ক তুলে লাভ নেই। হেরে যাব। উপহাসিত হব। সহজমানুষের মত সাম্প্রতিকযুগে আজ স্বীকার করাই ভালো যে, ব্যক্তিহিসাবে আমরা মন, বুদ্ধি, অহংকার নিয়ে আছি। পৃথিবীটাকে সাম্যমত ভোগ করতে চাইছি ; ভোগ করতে পারলে খুশী হচ্ছি ; না পারলে, পারার পথে অন্তরাল ঘটলে, ক্রুদ্ধ হচ্ছি, ক্ষুব্ধ হচ্ছি, বিদ্রোহী হচ্ছি, দল গড়ছি, মিছিল বার করছি রাজপথে।... ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বৈষয়িক বাস্তবতার বাইরে অগ্রতর জীবন ও জগৎও কিন্তু আছে। সে-জীবনে বা জগৎ-এ না গেলে ইহজগতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না বলেই আমরা মনে করি। শুধু তাই নয়, সে-জীবনে সমায়াত হলে মানুষ

জড়বৎ পঙ্গু হবে, অকর্মণ্য হবে, এমনতর ধারণাও আছে অনেকের। সে-জীবনের আশ্বাদ-ই পাই নি—না-পেয়েই কী করে' জানলুম যে, সেজীবন বা জগৎ ফেল অকর্মণ্য হবে মানুষ? বুদ্ধ অকর্মণ্য ছিলেন? অকর্মণ্য ছিলেন খৃষ্ট, জরথুষ্ট্র, নানক, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ?

কিন্তু থাক এ-প্রশ্ন। অনেকেই এ-প্রশ্নে আজ কান দেবে না। ইহলোক নিয়েই অধিকাংশ মানুষ ব্যস্ত; ইহলোকেরি শাস্তি, স্বস্তি ও সুখের প্রয়োজনেই যে আন-লোকের সন্ধান ও সাধনা প্রাসঙ্গিক, এটা অনেকেই আজ বুঝিয়ে বলতে হয়। আমাদের বস্তুপ্রধান ব্যক্তিসত্তা ভোগাঙ্কুরুদ্ধির তৎ-তৎপরতায় এমনি প্রভাবিত যে, বিশ্বসত্তার আনন্দটি জীবনগভীরে আছে কি নয়, জানতেই চায় না, অন্ততঃ শতকরা নব্বুই জন মানুষই, চায় না।

কিন্তু তাই বলে' তা তো নয় হওয়ার নয়। তা আছে। তা জানা যায়। পাওয়া যায়। আমাদের ব্যক্তিসত্তার মতই তা সত্য। ব্যক্তিসত্তা যেমন ইন্দ্রিয়দ্বারা জগৎকে জানে, মানে, ভোগ করে, বিশ্বসত্তাও তেমনি অন্তরীক্ষকে তীক্ষ্ণতর অনুভূতির দ্বারা জানে, মানে, ভোগ করে।

আমাদের পিতৃপিতামহবৃন্দ সেই অন্তরীক্ষকেই 'সৎ' বলেছিলেন, 'জ্যোতি' বলেছিলেন, বলেছিলেন 'অমৃত'। তাঁদের সর্ধজনবিদিত মহতী প্রার্থনাটি এই : অসৎ থেকে আমাদের সত্যে নিয়ে চলো; নিয়ে চলো অন্ধকার থেকে সূর্য-মন্দিরে; নিয়ে চলো মৃত্যু থেকে অমৃতের আনন্দে।

প্রশ্ন এই : ইহজীবনেই কি মাঝে মাঝে আমরা অমৃতানন্দের স্বাদ পাই নে? বিনীতর্কে এসত্য কি আমরা মেনে নেব না, যে, আমাদের অমৃতের ধারণা 'যতটুকু, ততটুকু অন্তত' আমরা পাই? বাস্তবে না পাই, স্বপ্নে পেয়ে থাকি? অন্ততঃ পেতে চাই?

জাগরণের মত নিদ্রাও একটা বাস্তব ব্যাপার; সেই হিসাবে স্বপ্ন ও স্বভাবজাত বলে' বাস্তব। নিদ্রাকালে মানবাত্মা তার স্থূল শরীরটাকে শয়নে ফেলে রেখে সূক্ষ্ম বাসনাশরীরে লীলা যে করে, তা কি স্বভাববহির্ভূত অশ্রু কিছূ? যদি নয়, তবে তা অস্বাভাবিক নয়, সেই হেতু অবাস্তবও নয়। স্বপ্নের এই বাস্তব ব্যাপারটাকে একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে—আমাদের মনোগত বাসনার সংস্কারগুলি সূক্ষ্মশরীররচনায় সমর্থ! আমাদের উনচৈতন্যসত্তায় যা আছে, স্বপ্নে তার রূপ সূক্ষ্মশরীরে প্রকটিত হতে পারে, হয়েও থাকে।... স্বপ্নজাত এই যে সূক্ষ্মশরীরের লীলা—এর মধ্যে স্থূলশরীরের প্রভাব অবশ্য আছে। এইজন্তে স্বপ্নে আমরা সূক্ষ্মশরীর লাভ করলেও একেবারে স্বাধীন

হয়ে সর্বত্র যেতে বা সমস্ত কিছু পেতে পারি না। আমাদের স্থলবাসনার অবচেতনে যতটুকু চাই, ততটুকুর প্রতিফলনই স্বপ্নের সূক্ষ্মতায় রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।...কিন্তু এমনটা যদি কারোর কারোর হয়, যে, স্বপ্নযোগে তিনি চন্দ্রে যাচ্ছেন, শুক্র মঙ্গল-ইন্দ্র-বরুণে যাচ্ছেন, সৌরমণ্ডল পার হয়ে নবতর তারালোক করছেন পরিক্রমা, ভেদ করছেন সপ্তর্ষি, ক্যাসিওপিয়া, কালপুরুষ, হরিকুলেশ, কোটি কোটি পরার্থ বৎসর তিনি আলোর গতিবেগ ভেদ করে' চলেছেন অজস্র সহস্র কোটি ছায়াপথ, অসংখ্য অগণ্য কোটি আকাশলোক—আবার মুহূর্তে ধ্যানভঙ্গে কিরে আসছেন সুষুপ্ত পার্থিব দেহটার ইন্দ্রিয়বন্ধনে,—তবে বুঝতে হবে বস্তুপৃথিবীর অতীতে অতীতের কোনো কল্পজীবনের দিব্যতাহ্—ভাবে তিনি প্রসন্ন।

সাধারণ স্বপ্নে এমনটা অবশ্য হয় না। পৃথিবী, পৃথিবীর রূপ, পৃথিবীর অভিজ্ঞতা, বাসনাদি সংস্কার ও আত্মত বিজ্ঞা ও বিচারবোধ থেকেই মানুষের সাধারণ স্বপ্ন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দেহগত মনের প্রভাবে স্বপ্নটার শক্তি খুবই সীমিত হয়। স্বপ্ন থেকে তাই যে সূক্ষ্মশরীরের উদ্ভব হয়, তার গতিবিধি সাধারণতঃ এই পৃথিবীর মধ্যেই।

দেহগত মনের গতি পৃথিবীর, অর্থাৎ বাসনার, বাইরে যেতে পারে না সত্য, কিন্তু বিখ্যাত মনের গতি বাসনার অতীতে নবতর জীবনলোক পর্যন্ত স্পর্শ করে।...সাধারণ জীবজীবনে সূক্ষ্মের ওপর স্থলের প্রভাবই বেশি, সেই কারণে স্বপ্নযোগে সূক্ষ্মশরীরটা পেয়েও তারা স্থলভোগের ও আগ্রহের অতিশয্যাটি প্রকাশ করে। ভাবুকজীবনে, বলাই বাহুল্য, বিখ্যাত্তর আনন্দপ্রভাবই প্রকট। রূপের সাগর দেখেই তাঁদের মন যে ভরে, তা নয়, ভুরূপরতন পাওয়াতেও তাঁদের আগ্রহ। তাঁরা জেগে জেগেও 'স্বপ্ন' দেখেন : দৃশ্যের পটভূমিকায় দেখেন অদৃশ্যের অপারমহিমা। সীমার স্থলত্বে দেখেন অসীমের আনন্দলীলা।

এমন অনেক কবি ও দার্শনিক ছিলেন—এখনো, এই নাস্তিকযুগেও কেউ কেউ আছেন, যাদের জীবনবোধে স্থলের ওপর সূক্ষ্মের প্রভাবই অহুতাব্য। তাঁরা ইন্দ্রিয়গত জীবনশরীরটা থেকে উঠে আসতে পারলে তবেই প্রাণ পান, গান অহুতব করেন। জীবনযোগীরা সূক্ষ্মসত্য সমাধিস্থ হয়েই বিখ্যাত্তাওকে পর্যবেক্ষণ করেন। এক লহমায় চলে যেতে পারেন এপার থেকে আনপার। এপারের স্বর্ষ-চন্দ্রতারা, নদনদীবনউপবনসাগরপর্বত সেপারে কিছুই নেই, আছে শুধু অপারূত একটি আনন্দধারা, জ্ঞানের ও প্রেমের ধারা। অতীন্দ্রিয় সেই

ধারাপ্রবাহে অভিন্নাত যোগিমানস ইচ্ছামাত্র ভূতভবিষ্যৎবর্তমানকে দর্শন করেন, ইচ্ছামাত্র এহ থেকে গ্রহান্তরে গত্যাত করেন, ইচ্ছামাত্র ডুব দিতে পারেন অতলান্তিক রমের বিজ্ঞানে।

হ্যাঁ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা এমনিই ছিলেন। ইহজীবনের স্থূলসত্তা থেকে মুক্তি নিয়ে আপনজীবনের অতীত জীবজন্ম, বর্তমান মানবজন্ম ও ভবিষ্যৎ দেবজন্মের কথা তাঁরা সরলভাষায় বলে যেতে পারতেন। সিদ্ধার্থ গৌতমবুদ্ধের জীবনে এমনিটা দেখা গেছিল। আচার্য শংকর ও মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবনেও এমনতর বুদ্ধজন্মের প্রকাশ পৃথিবী দেখেছে। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের জীবনেও এস্তা স্বভাবগত সাধারণ সত্যের মতই প্রকট হয়েছিল।

বিজ্ঞানবুদ্ধির অধিকারে আজ আমরা সৌরমণ্ডল জয় করতে যাচ্ছি : আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি, আর কোথাও না হ'ক, চন্দ্রে আমরা যাব, গ্রহমঙ্গলে যাওয়ার পথও করব আবিষ্কার। কিন্তু মাছুষ কি ওইটুকু অধিকার পেয়েই তুষ্ট হবে? যেতে চাইবে না ইন্দ্রে, বরুণে? জানতে চাইবে না সৌর-মণ্ডলের বহির্বিধে কী আছে না আছে? চাইবে? যদি চায়, কী ভাবে যাবে? যন্ত্রযোগে? অর্থাৎ পার্থিব দেহটার ওপর এমনি তার মায়া যে, যন্ত্রযোগে সটাকে সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে যাওয়াই হবে না গ্রাহ? তবে তো দেহদাস নটাকে যন্ত্রাবিস্কারেই মগ্ন থাকতে হবে চিরকাল।...তর্কের খাতিরে যদি লি, হ্যাঁ, তাই-ই থাকতে হবে, তবে এই কথাই কি বুঝ যে, মাছুষের বিজ্ঞানী মনটা দেহসর্বস্বতাটি ত্যাগ করবে না কোনদিন?

জানী-মাছুষে জানেন—আমি যতসব বাজে কথা লিখে যাচ্ছি। কেননা মাছুষকে একদিন-না-একদিন দেহের মায়া ও দম্ভ ত্যাগ করতে হয় : তাকে যে করতে হয়। ঠেকে-ঠেকে, গিয়ে-গিয়ে, এসে-এসে, শিখে-শিখে একদা তাকে বুঝতেই হয় : জীবজীবনের মুক্তি কোথায়—যন্ত্রের আশ্বালনে, না মনের মুক্তি-সাধনে।...জীবনপথে চলতে চলতে, মনকে বিজ্ঞানমুখী করতে করতে মাছুষকে একদা বুঝতেই হবে : যন্ত্রের শক্তি যতদূর প্রসারী হ'ক না কেন, তবু তা ঐমিত। স্বতরাং বাইরের যন্ত্র দ্বারা নয়, ভেতরের যন্ত্র দ্বারাই আমরা বিশ্বাশ তথা ব্রহ্মাশ জয় করতে পারি, অগুণা নয়।

এ-তথ্য স্থূলশরীরে হয়তো বুঝ না, সূক্ষ্মবোধের আনন্দে অবগুই বুঝ।... কিন্তু সেই বোধানন্দ পেলে তো? না, পেতেই হবে, প্রকৃতির নিয়ম : প্রাকৃতিক নিয়মে আজ না-হয় কাল, কাল না পরশু, স্থূলদেহ আমাদের ছাড়তে হবে।

বুদ্ধির আফালন ও ভোগের তাড়না থেকে কিছুকালের মত দূরে যে সরতে হবে—দুঃস্বপ্ন এই গোঁড়াগাবলেই মাছুষের চেতনা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হবে : স্থূল-শরীরে মৃত্যু এলে সূক্ষ্ম শরীরের চেতনায় আমরা নবজন্ম লাভ করব। মৃত্যুও একটা নতুন জন্ম। সেখানেও নব নব অভিজ্ঞতা।

এই অভিজ্ঞতা জীবদ্দশাতেও লাভ করা সম্ভব। স্থূলশরীরের নীচতা, পাশবচিহ্না, রুঢ়তা ও মূঢ়তা প্রভৃতি বন্ধনগুলি কাটিয়ে উঠে সূক্ষ্মবোধজীবনের সাধনা করলেই ত্রিলোচন উদ্ভাসিত হয় ললাটে। তখন বিশ্বচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। অভিনব দৃশ্য দেখা যায়। গান শোনা যায়। তখন বলব কি, সুরের গভীরে ডুব দিয়ে একেবারে সুরময় হওয়াও যায় ?

কিন্তু বলে রাখা ভালো, সূক্ষ্ম শরীরটাই আত্মা নয়। রমানন্দ-ই আত্মার বিজ্ঞানপ্রাপ্তি নয়। আত্মা অনেক, অনেক দূরের বস্তু। সূর্যের অন্তরে সাবিত্রী-শক্তির মত আত্মা স্থূলে আছে, মূলেও আছে। স্থূলটা আত্মার জীবরূপ, তা পরিবর্তনশীল ; সূক্ষ্মটা আত্মার শিবরূপ, তাও পরিবর্তনশীল। সপ্তলোক, সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল—পর্বত স্থূল ও সূক্ষ্মের সমাহার। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরে যতই যাই না কেন, কৰ্মক্ষয়ে আত্মায় আত্মা না 'হওয়া' পর্বন্ত পরিবর্তনের শেষ নেই। ওটি হলে নিত্যানন্দ। অখিলানন্দ।

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেবও নন নিত্যানন্দ বিভূ আত্মা। সূক্ষ্ম যত আনন্দ-বেদনার স্বর্গরাজ্যে তিনি মহান সযাট, এই যাত্রা। পরিবর্তন আছে তাঁরো। পুণ্যক্ষয়ে তাঁর জীবজন্ম, পুণ্যসঞ্চয়ে তাঁর দেবযানগতি। কত ইন্দ্র পুণ্যক্ষয়ে জীবলোকে শক্তিমান মাছুষ হয়ে জন্মাচ্ছেন, কত ইন্দ্র পুণ্যসঞ্চয়ে স্বর্গপতিত্ব মূংপাত্রের মত ফেলে দিয়ে অধিকতর শুভদ্রব্যে অগ্রসর হচ্ছেন।

কিন্তু আত্মা হচ্ছেন, এটি বলা যাবে না। এটি হলে পূর্ণ গন্তব্য মিলল বলে আর-গতি নেই, মনে অপূর্ণত্বই যে নেই। সংসার সরছে জগৎ চলছে—আজও তার অপূর্ণ বলে। কোটি কোটি বছর ধরে অপূর্ণত্বের এই লীলা চলবে।

কিন্তু এই লীলা কি শুধু জীবজীবনের লীলা—এই স্থূলশরীরের আশা-আকাজ্জার লীলা, মানমর্ষাদা-বশঃপ্রতিষ্ঠার লীলা ? সূক্ষ্মবোধের আনন্দজীবনেও অন্তহীন জগলীলা চলছে। সেই যত লীলারো অনন্ত কোটি বৈচিত্র্য, অনন্ত কোটি অভিজ্ঞতা।

জীবজন্মের সৌভাগ্যে কতটুকুই বা তার সন্ধান রাখি ? শিবজন্মের আনন্দ-সাধনা তাই প্রাসঙ্গিক।

[ক্রমশঃ

নাগা-জীবনের কাহিনী

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ইম্ফল শহর থেকে ৪৫ মাইল দূরে মাণপুর পর্বতের কোলে কয়েকটি নাগা পল্লী—লুংবি, পাবি, চিংজিরই, উথরল। এখানে যারা বাস করে, তারা টাংখুল সম্প্রদায়ের নাগা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বস্ত একটি টাংখুল নাগা-পল্লী উথরলের নরনারীর জীবন-সমস্তা নিয়ে রচিত হয়েছে একখানি মনোরম অসমীয়া উপন্যাস—“ইয়াকুইদম”। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের রচয়িতা বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এ বছর সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক সম্মানিত হওয়ার গৌরব লাভ করেন।

উপন্যাসের ঘটনাকাল মোটামুটি তিন বছর—১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে গান্ধীজীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে পর্যন্ত। কাহিনীর দিক থেকে গান্ধীজীর মৃত্যু অবাস্তব হলেও ভাবের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই গ্রন্থে নাগা বিদ্রোহের পটভূমিকায় যে কথাকাটি সবচেয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে তা হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য হিংসা ও অহিংসার আপেক্ষিক উপযোগিতা। বহির্বিষয়ে যারা নরমুণ্ড-শিকারী বলে পরিচিত, সেই হিংস্র নাগাদের মধ্যে শান্তি ও অহিংসার বাণী কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে লেখক তা-ই নিয়ে এক দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছেন।

কিন্তু আরও গোড়াকার প্রশ্ন : নাগাদের এই সশস্ত্র বিদ্রোহ কেন ও কার বিরুদ্ধে? মূলত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। আর এটা বিদ্রোহ নয়, স্বাধীনতার আন্দোলন। গত দেড়শ বছর ধরে এই পার্বত্য নাগাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন কিছু কম হয়নি! বছরদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ও প্রতিহিংসার অগ্নিবাস্প ওদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে জমা হয়ে আছে। মহাযুদ্ধে উজাড় হয়ে গেল তাদের ঘর-দুয়ার-সম্পত্তি। তারপরে এল মহা-মড়ক। সরকার ও সৈন্যবাহিনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষতিপূরণের, কিন্তু সেই বছর প্রত্যাশিত সাহায্য আর আসেনি। ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকারের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় সরকার। ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে যেদিন উথরলের সদর অফিসে তেরঙা পতাকা উড়ল, সেদিন ওরা একান্ত মনে

কামনা করেছিল নতুন সরকারের কৃপাদৃষ্টি। কিন্তু তাতেও ওরা বঞ্চিত হল। সুতরাং নাগাদের সরকার-বিরোধী মনোভাবে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। তারা নতুন সরকারকে জাতীয় সরকার বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। তারা চায় স্বাধীন নাগারাজ্য, এবং সে স্বাধীনতা অর্জন করবে অস্ত্রের সাহায্যে।

লেখক এই মনোভাবকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন। প্রথমত, চল্লিশ কোটি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন নাগারাজ্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে না। দ্বিতীয়ত, হিংসার পথ নাগাজীবনে ডেকে আনবে এক নিদারুণ বিপর্যয়। এই নিষ্পেষিত নাগা ভূমিতে সর্বপ্রথম জাগাতে হবে প্রেম ও মানবতার পবিত্র মন্ত্র: “মানুষ এক অভিনব অত্যাচারের রাজত্ব আরম্ভ করেছে। হিংসায় অশ্রুয় পৃথিবী ভরে গেল। ভগবান! হে ভগবান! রক্ষা কর, মানুষকে রক্ষা কর।”

লেখককে গান্ধীবাদী প্রতিপন্ন করে আমি তাঁর রচনার গৌরব খর্ব করতে চাই না। অথবা তাঁর আদর্শ প্রচারের আগ্রহে উপহাসের শিল্পরূপ ক্ষুণ্ণ হয়েছে একথা বলাও আমার অভিপ্রায় নয়। আমি শুধু সর্বিনিয়ে স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, বিদ্রোহী নাগাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অত্যাচার নাগাদের সম্পর্কে অতুল মনোভাব সৃষ্টিই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বিপরীত রূপে। অর্থাৎ গান্ধীবাদী তরুণ নাগা রিখাঙ অপেক্ষা পাঠকের সহানুভূতি টেনে নেয় বনে-পর্বতে বিচরণকারী বিদ্রোহী প্রৌঢ় নাগা ভিডেশেলী। কেবল পাঠকের নয়, নাগাপল্লীর সহানুভূতিও ঝুঁকে পড়ে ভিডেশেলীর দিকে। গ্রন্থের শেষের দিকে এক জায়গায় পাওয়া যায় :

—ভারতের স্বাধীনতা এনেছে গান্ধী, নাগাভূমির স্বাধীনতা আনবে ভিডেশেলী।

রিখাঙ বলছে—এ অপপ্রচার। নাগাভূমি কি স্বাধীন হয়নি?

—যদি আমাদের দুঃখ দূর না হল তবে এ স্বাধীনতার অর্থ কী?

—তাঁর জন্ত অস্ত্র উপায় আছে?

—কী উপায়?

—সংগ্রাম।

—ভিডেশেলীর মতো?

—না, গান্ধীজীর মতো।

রিস্থাঙ-এর মুখে গান্ধী-পদ্ধতির সত্যগ্রহ অথবা শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথাটা সত্য হয়ে ওঠেনি, আরোপিত বলে মনে হল।

বাপারটা তাহলে গোড়া থেকেই বলা প্রয়োজন। রিস্থাঙ ও তার বন্ধু খাটিং ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল দুর্গম নাগাপর্বতের পথপ্রদর্শকরূপে। বিনিময়ে তাদের প্রত্যাশা হয়ত কিছু ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা মনে প্রাণে তারা ছিল ইংরেজ ও ইংরেজী-শিক্ষার অনুরাগী, খ্রীষ্টধর্মের অনুগামী। খাটিং-এর পিতা নাজেক ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত-পন্থী। ইংরেজদের সে ছুচোখে দেখতে পারে না, সে হচ্ছে স্বাধীন নাগারক্তের প্রতিভূ। তার কথা হল “ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীষ্টান ধর্মই নাগাদের স্বংসের কারণ।”

এইখানেই পিতা ও পুত্র, প্রবীণ ও নবীনের বিরোধ। বাপ বলছে ছেলেকে : বুড়োর কথা শোন্। তোদের সাহেব হতে হবে না, তোরা নাগা হ। নাগা হওয়ার মতো স্বাধ আর কিছু নেই।

—নাগা হওয়ার অর্থ ?

—স্বাধীন হওয়া।

কিন্তু নাজেকের দুর্ভাগ্য, তার ছেলে খাটিং শিলঙ গিয়ে খ্রীষ্টান হয়ে বিয়ে করতে চলেছে একটি খাসিয়া মেয়েকে। আর তার নিজের মেয়ে খুটিংলা ভালোবাসে রিস্থাঙ-কে—গ্রামের গির্জায় গিয়ে খ্রীষ্টান হয়েছে বলে যার বাপের সঙ্গে নাজেকের বহুদিনকার শত্রুতা। নাজেক ভাবছে : “পুরোনো নাগা, খাটিং নাগা আর নেই। দেশ কাল সব উলটে গেল। এখন মুণ্ড কাটা দূরে থাক, ছেলেগুলো সব শিক্ষা পেয়ে আর খ্রীষ্টান ধর্ম নিয়ে কেমন যেন বীর্ষহীন হয়ে গেছে। আজকাল গাঁয়ের বুড়োকে কেউ আর মানে না, সকলেই নির্লজ্জভাবে সেলাম করে এস্. ডি. ও-কে। শিক্ষিত ছেলেগুলো সব পুরোনো রীতিনীতিকে অমান্য করে চলেছে। তার জলন্ত প্রমাণ তার ছেলে খাটিং—যে বাপের কথা না শুনে খ্রীষ্টান হল, বি. এ. পাস করল এবং শেষকালে কিনা একটা অ-নাগা মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য শিলং চলে গেল। এত অপমান সহ্য করেও সে বেঁচে আছে। আজ ৪০।৫০ বছরের মধ্যে টাংখুল নাগা-ভূমিতে একটা স্বযোগ্য পুত্রের জন্ম হল না। মোর মরাই ভাল। ধর্ম গেল, মান গেল, মানুষের তেজ গেল, আর কী বাকী রইল ?”

গভীর নৈরাশ্রের মধ্যেও নাজেক দেখতে পায় আশার আলো—সে ভিডেগেলী। মৃত্যুর আগে একবার ভিডেগেলীকে দেখতে চাইলে তাকে

বল। হল—“সে তো টাংখুল নাগা নয়; আমাদের গ্রামের মানুষ নয়। সে হ'ল আঙ্গামী নাগা”।

—তা হোক, তবু সে খাটি নাগা।

—ভিডেগেলী খ্রীষ্টান।

—তা হোক, তাকে তোরা জানিস না। সে হাড়ে হাড়ে নাগা।

নাগাদের বীর-নায়ক এই ভিডেগেলী—নাজেকের মানস-সন্তান। তার গ্রামের নাম খনমা। নাগাভূমি থেকে সে রেঙ্গুন গিয়েছিল ব্যবসার জন্ত। সেখানে গিয়ে শুনল সিঙাপুরে স্ত্রীভাষচন্দ্রের কথা। দেশপ্রণেমে উদ্দীপ্ত ভিডেগেলী সিঙাপুরে গিয়ে ভর্তি হল তার সৈন্তবাহিনীতে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে গুলির আঘাতে একটি চোখ হারায়।

স্বাধীনতার দুর্বীর প্রেরণা সে পেয়েছে নেতাজীর কাছ থেকে। জন্মভূমিতে ফিরে এসে বার বার তার মনে পড়ছে তাঁরই কথা। সিঙাপুরে একদিন স্বাধীনতা-দিবসের প্যারেড্-এ নেতাজী বলেছিলেন : “যে মরতে জানে সেই পারে মুক্তির জন্ত যুদ্ধ করতে।” হঠাৎ তার হৃদয় কঁপে উঠল। যুদ্ধশেষে দেশে ফেরার সময়ে তার কানে এল—নেতাজীর নাকি মৃত্যু ঘটেছে। না, না, অসম্ভব। নেতাজী মরতে পারেন না, মৃত্যু অপেক্ষাও তাঁর আত্মা শক্তিশালী। নেতাজী নিজে তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন : “ভিডেগেলী, স্বাধীনতা তারই জন্ত যে মরণকে ভয় করে না।”

গ্রন্থের আরও নানা ক্ষেত্রে ভিডেগেলীর প্রসঙ্গে নেতাজীর নাম এসেছে। ভিডেগেলী যেন নেতাজীরই প্রতিচ্ছায়া। এবার দেখুন রিখাঙ্ কী ভাবছে নেতাজী সম্পর্কে। সে ভিডেগেলীর কথা প্রথম শুনল তাদেরই গ্রামের মেয়ে চারেংলা-র কাছে। চারেংলা জিজ্ঞাসা করেছিল : “আচ্ছা, নেতাজী কে?” রিখাঙ্ উত্তর দিয়েছিল : “নেতাজী? একজন ডাক্তার নেতা।”

—ভিডেগেলীর নাকি যোগ আছে তাঁর সঙ্গে।

—“বুঝি”—রিখাঙ্ মনে মনে বলে। নেতাজীর কথা সে শুনেছে। এক দুর্জয় বাসনা আর অসীম মনোবল নিয়ে মুক্তির বাণী বহন করে তিনি এসে প্রবেশ করেছিলেন এই সীমান্ত নাগাভূমিতে। কিন্তু তাঁর সেই দেশ-পগড়ার স্বপ্ন এ পথে পূর্ণ হওয়ার নয়। একদিন নেতাজী ও ভিডেগেলী দুই-ই তাদের ভুল বুঝতে পারবে। কথাটা রিখাঙ্-এর মুখে বসানো হলেও এটা যে লেখকেরই উক্তি বুঝতে কষ্ট হয় না।

বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে লেখক বিশ্বাসী বলেই এরকম বিলাট মাঝে

মাঝে ঘটেছে। তবু যে তাঁর রচনা রস-সাহিত্যের আসর থেকে নেমে সংবাদ-সাহিত্যে পরিণত হয়নি সেইখানেই তাঁর সাফল্য। ভিডেগেলীকে যথার্থ বীরের মর্যাদা দিতে লেখক কুণ্ঠিত হননি। গ্রন্থের প্রথমার্ধে তার কথা নানাভাবে আলোচিত হলেও তাকে আমরা প্রথম দেখতে পাই নাজেকের মৃত্যুদিনে। ভিডেগেলীর আগমন যেন আবির্ভাব। লেখকের বর্ণনা এইরূপ—

“ভিডেগেলী এসে নাজেকের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তার জগত্ৰিত দেহ এবং অনাড়ম্বর পরিচ্ছদের উপর। গ্রামের মানুষ তার বীরত্ব ও অভিনব পরিকল্পনার কথা আগেই শুনেছে। প্রবল প্রতাপী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া ক’রে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে একজন সামান্ত নাগা—এ কাহিনী তাদের মনকে আলোড়িত না ক’রে পারেনি।”

উপস্থাস থেকে ভিডেগেলীর অন্তর্ধান অংশটুকুও লেখকের আন্তরিক দরদ দিয়ে আঁকা। তখন রিখাঙ ও তার সঙ্গী বন্দী হয়ে আছে ভিডেগেলীর শিবিরে। ভারত সরকার গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়ে হানা দিতে এগিয়ে আসছে কেনে ভিডেগেলী তার শিবির তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে বর্মা-সীমান্ত পার্শ্ব হয়ে। যাওয়ার আগে সে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে রিখাঙ ও তার বন্ধুকে। পরস্পরের মতভেদ নিয়ে আলোচনার পর ভিডেগেলী বলছে : “তোরা এখানেই থাক। আমার সঙ্গে তোদের না যাওয়াই ভালো।”

—তুই যাবি কোন্ দিকে ?

—বলতে পারি না।

পশ্চিমে শোনা যাচ্ছে সরকারী সৈন্যবাহিনীর গোলা-গুলির শব্দ। ক্ষিপ্ৰহস্তে ভিডেগেলীর দলবল শিবির ভেঙে নিয়ে এগিয়ে গেল পূর্বদিকে। বিষন্ন চিত্তে ভিডেগেলী একবার তাকাল চারিদিকের পর্বতমালার দিকে। বিশাল নীলিমার মাঝে মাঝে সবুজ বনানীর মধ্যে হারিয়ে গেল তার মন। এই পর্বতমালাকে সে ভালোবাসে ; এখানকার মানুষ, এখানকার মাটির বুকে লুকিয়ে-থাকা নানা সম্পদ, এখানকার গাছপালা, জীবজন্তু সমস্ত কিছু সে ভালোবাসে। রিখাঙ জিজ্ঞাসা করল—তুই কবে ফিরে আসবি ?

—যেদিন সময় হবে। এই বলে ধীরে ধীরে পাইন বনের বুকে হারিয়ে গেল ভিডেগেলী।

এই সম্ভাব্য ভিডেগেলীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অহিংসাবাদী রিখাঙ-কে দাঁড় করাতে হলে তার যথোপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। সে প্রস্তুতি

কেবল নাগা পর্বতমালায় মধ্যে সম্ভব নয়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আলাপ করছে।—আমি নাগা হতে চাই না ভিডেগেলী, আমি মানুষ হতে চাই।

—আমি শুনেছি তোর কথা। কিন্তু এভাবে তুই মানুষ তৈরী করতে পারবি না। গাছের জন্তু ভাল সার ও মাটির দরকার। মানুষের জন্তুও দরকার।

—সেই সার ও মাটি হল সমগ্র পৃথিবী। এই শুয়ে-থাকা পাহাড়টাই কেবল মানুষের ঘর নয়।—গভীর বিশ্বাসের সুরে রিখাঙ বলে উঠলো। তাঁর এই বিশ্বাসের মতো তাঁর অহিংস সংগ্রামে দৃষ্টান্ত নাগাভূমির দান হ'তে পারে না। কারণ নাগারা হল জাত-হিংস্র। এই গ্রন্থে তার আভাস আছে। গোটা ভারত জুড়ে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে, রিখাঙ-এর বাবা ইয়েংমাচের কথাবার্তা হচ্ছে খাইখোর সঙ্গে :

—সে আন্দোলন কি বন্দুক দিয়ে ?

—না, বুদ্ধি দিয়ে, আগ্নেয় শক্তি দিয়ে।

—তাই দিয়ে খেদাতে পারবে ইংরেজকে ?

—পারবে।

—কী ক'রে ? যুদ্ধ না ক'রে বৃটিশকে কী দিয়ে তাড়াবে ?

—শিক্ষিত মানুষ মগজ দিয়ে পারে। গান্ধীর বড় ডাক্তার মগজ।

—গান্ধী কে ?

—ভারতের নেতা।

—তার সৈন্য নেই ?

—না, খালি হাতে যুদ্ধ করেন।

—অসম্ভব কথা।—ইয়েংমাচের সুরে অবিস্বাস।

শান্তি ও অহিংসায় অবিখ্যাত নাগাভূমি। সেই নাগাভূমির সন্তান রিখাঙ যেন দৈত্যকুলে প্রেঙ্লাদ। বৃহত্তর জীবনের পরিচয়লাভের জন্তু তাকে যেতে হল কলকাতায়। উৎকলের মার্কিন মিশনারী ডাঃ ক্রকের উত্তোগে রিখাঙ এসে ভর্তি হল কলকাতার এক মিশনারী কলেজে, আর তার থাকার ব্যবস্থা হল ওয়াই. এম. সি. এ. হস্টেল-এ। মূল কাহিনীর মধ্যে রিখাঙ-এর এই কলকাতা-প্রবাসের অধ্যায় দুটি (পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়) হাইফেন-এর মতো হলেও আমরা আগেই বলেছি নায়কের মানসিক প্রস্তুতির জন্তু এর প্রয়োজন ছিল। ইম্ফলের পি. টব্বী, গুবাহাটীর অমূল্য, কলকাতার অবিনাশ

—এরা হল তার দিবারাত্রির সঙ্গী। ওরই মধ্যে তার আলাপ হল বালিগঞ্জ-নিবাসিনী শ্রামলী ও তার পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু তার সব চাইতে বড় অভিজ্ঞতা হচ্ছে কলকাতার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভ। সাম্প্রতিক রক্তস্রাবের মধ্য দিয়ে যখন এল ১৫ই আগস্টের আহ্বান, তখন রিশাঙ্-কেও তার কলেজজীবনের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে ফিরে যেতে হয় পিতার আসন্ন মৃত্যুর টেলিগ্রাম পেয়ে।

ভিডেগেলীর মুক্তি-সংগ্রামের ব্যর্থতা দেখানো হয়েছে আরও একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সে রিশাঙ্-এর বন্ধু ও ভিডেগেলীর অল্পগামী—ফাণিটফাণ্ড। এই গ্রন্থের পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে ফাণিটফাণ্ডের বেদনাই সবচেয়ে মর্মস্পর্শী। তার তুলনায় রিশাঙ্ অতিরঞ্জিত, ভিডেগেলী অতিনাটকীয় এবং খাটিং অপরিষ্কৃত। এরা সকলেই নিজ নিজ পথে অবিচল—কেউ বিপ্লবে কেউ ভালোবাসায়, কেউ অহিংসামত্রে। এবং সেই পথেই তাদের সার্থকতা। কিন্তু ফাণিটফাণ্ড ব্যর্থ প্রেমিক ও ব্যর্থ সৈনিক। প্রেমে সে প্রত্যাখ্যাত, বিপ্লবে সে বিখাসম্ভাতক। অন্তিম পরিণতি তার সহকর্মীর গুলির আঘাতে মৃত্যু। সে গিয়েছিল কহিমায় গরুর ব্যবসা করতে। সেখানে গ্রামের বন্ধু রিশাঙ্ ও খাটিং-কে দেখে সেও ষোণ দেয় ইংরেজ সরকারের সৈন্তবাহিনীতে। তারপর একই সঙ্গে ওরা ফিরে আসে দক্ষ-বিধবস্ত গ্রাম উথরুলে। বিধবা গরীব মায়ের একমাত্র সন্তান ফাণিটফাণ্ডকে উপগ্রাসের প্রথম দিকে আমরা যথেষ্ট কৌতুকপ্রিয় দেখতে পাই। একদিন অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে রিশাঙ্ ও খুটিংলাকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো : “তোদের দুটোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আদাম ও ইভ।...না, না, লজ্জা কী? এ বয়সে প্রেম না করলে আর কবেই বা করবি?” কিন্তু এ কি কৌতুক না দীর্ঘা? কারণ কিছুকাল পরে ফাণিটফাণ্ড একদিন প্রাণের সকল আকৃতি দিয়ে বলছে : “খুটিংলা, তুই আমাকে বিয়ে কর।”

—আমি যে রিশাঙ্-কে ভালোবাসি।

—রিশাঙ্-থেকে আমি কোন্ অংশে হীন?—প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি প্রেমিকার নিঃসংশয় অহুরাগের পরিচয় পেয়ে ফাণিটফাণ্ডের হৃদয়ে একটা পাশবিক দীর্ঘাজেগে উঠলো। খুটিংলার প্রত্যাখ্যান তাকে ঠেলে দিল ভিডেগেলীর বিপজ্জনক পথে। নাজেকের মৃত্যুশয্যার পাশে ভিডেগেলীর আবির্ভাবের সময়ে সে উপস্থিত ছিল। দুটি অপরিচিত অথচ সমধর্মী প্রাণের মিলনদৃশ্য দেখে ফাণিটফাণ্ডের হতাশাভরা মন হঠাৎ এক নবীন আশার আবেগে নেচে

উঠলো। মুম্বু'নাজকের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এই লোকটা এতদিন ধরে তাদের মধ্যে বেঁচে ছিল; অথচ সে তাকে বুঝতে পারলো মাত্র আজ, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে।

তারপরে একদিন অতি সঙ্কটময় মুহূর্তে ভিডেগেলীর সঙ্গে ফানিটকাণ্ডের নির্জন সাঙ্গাৎ :

—তুই তো এখুনি বাঘের পেটে যাচ্ছিলি।

—হ্যাঁ, আমি মরবার জুটাই এসেছি এখানে।

—কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছিস বুঝি ?

—তুই জানলি কী করে ?

—তোর মত বয়সে সকলেরই এমনি হয়। কিন্তু তুই ভুল করেছিস, ফানিট।

—কেন ?

—মরতে হয় তো এর চেয়ে আরও ভালো কাজের জুট মর। ফানিট, তুই আমাকে সাহায্য কর। তোর কেউ কোথাও নেই, কিন্তু দেশ তো আছে।

সেদিন নতুন মন্ত্রে দীক্ষা হল ফানিটকাণ্ডের দেশসেবার মন্ত্রে। ভিডেগেলীকে শেষ আশ্রয় হিসাবে পেয়ে একটা অদ্ভুত শান্তি অনুভব করল। এখন আর তার জীবনের পথ অস্পষ্ট নয়। ভিডেগেলীর সঙ্গে থেকে দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টাই তার একমাত্র ব্রত।

কিন্তু পর্বত অরণ্যে ঘুরে ঘুরে ফানিটকাণ্ড ক্রান্ত। তার বুঝি মোহভঙ্গ হল। লেখক তার আত্মসমীক্ষার পরিচয় দিয়েছেন সবিস্তারে। মহাযুদ্ধ আর মহামারী তার ঘর-দুয়ারকে শাণান করেছে; ক্ষেতের মাটি পুড়িয়ে দিয়েছে কামানের গোলা। প্রেমের মনোরম কল্পনা ভেঙে চূরমার হয়েছে খুটিংলার নির্মম প্রত্যাখ্যানে। সে মৃত্যুবরণ করতে গিয়েও পারেনি। ভিডেগেলী এসে তাকে নিয়ে গেল বিশাল অরণ্যের গোপন শিবিরে—যেখানে কেবল শৃঙ্খলা, নিয়মও নির্মমতা। সেখানে নেই প্রেম ও সংসারের শান্তি। সে আজ পলাতক বিদ্রোহী। তার পিছনে ঘুরছে, সরকারের গুপ্তচর-বাহিনী। কেন সে যুদ্ধ করছে, কেন সে এতগুলি শান্তিপ্রিয় নাগাযুবককে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর পথে, স্বাধীনতা হলে কী হবে—এসব সে বুঝতে পারে না। সে কেবল জানে ভিডেগেলীর আদেশ তাকে মেনে চলতে হবে। কিন্তু আর সে পারছে না। আজ সে বুঝতে পারল তার মাঝেও একটা শালুঘ আছে যে নিজেকে

ভাবতে চায়, কাজ করতে চায়, আর চায় নারীর স্বাভাবিক ভালোবাসা। পৃথিবীর সকল বস্তু বিনিময়ে খুটিংলার হৃদয়খানি পেলেই তার জীবন সার্থক। পৃথিবীতে প্রেমের বাইরে সব মিথ্যা। দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ জীবনের সক্রমণ পরিণতি লেখক দেখিয়েছেন ফানিটকাণ্ডের চরিত্রে। জেল-হাজতে বসে তার নিশ্চিত ধারণা হল—রিখাঙ-এর পথে চললেই নাগাদের ভবিষ্যৎ শুভ। ভিডেগেলী যুদ্ধ করে আর কিছুই পারবে না, পারবে কেবল নাগাদের ধ্বংস করতে। তার শেষ কথা চারংলার কাছে : “আমাকে আজ মিলিটারী ট্রাকে করে হাজত থেকে নিয়ে যাবে ইম্ফল। আর হয়ত অনেককাল দেখা হবে না তোদের সঙ্গে। বড় দুঃখ হচ্ছে—জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। যদি কখনো মনে পড়ে চিঠি দিস আমাদের।”

—দেবো। ভগবান তোকে শান্তি দিন।

আরেকটি পুরুষ-চরিত্রের উল্লেখ প্রয়োজন—যে অসমীয়া হয়েও নাগাজীবনের সঙ্গে নিজেকে এক করে নিয়েছিল। গৌহাটীর ছেলে, বাপ রিটায়ার্ড হেডমাষ্টার। ডিগ্রী পরীক্ষার পরে বাপ-মা বলেছিল চাকরী ও বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে। কিন্তু সেই সময়ে এল অসমীয়া যুবজনের প্রাণে গান্ধীজীর সমাজ-দেবার আহ্বান। কী এক উদ্দীপনার মুহূর্তে স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র বেজবরুয়া তার প্রাণে জাগিয়ে তোলে নাগাজীবনের মোহ ও পর্বতপ্রীতি। বাপ-মায়ের কথা না শুনে ঘর-সংসার ছেড়ে এল কহিমায়। ধীরে ধীরে সে মজে গেল নাগাজীবনের মায়ায়। একদিন আচম্বিতে দেখা হল ভিডেগেলীর ভগিনী রণি-র সঙ্গে। রণি আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু তাদের ভালোবাসার ফল রয়ে গেল একমাত্র ছেলে কনচেং। ভিডেগেলীকে একদিন সে বলেছিল, “হিংসায় মানুষের উন্নতি হয় না।” তাতে ভিডেগেলী হেসে উত্তর দিয়েছিল, “অসমীয়া হয়ে তুই নাগাজীবনের কতটুকু জানিস্?”

রিখাঙ, কিন্তু এই নাগাপ্রেমিক যুবকের মধ্যে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে। কলকাতায় তার দুই বন্ধু অমূল্য ও অবিনাশ—যারা কেউ আজ বেঁচে নেই—তারাই যেন এসে একসঙ্গে দেখা দিয়েছে এই অসমীয়া যুবক-জীবনের মধ্যে। অবিনাশের মতো নিজের জীবনের প্রতি অমনোযোগী আর অমূল্যের মতো মননশীলতার অধিকারী। তারই কাছ থেকে রিখাঙ, পেয়েছে গান্ধীজীর মন্ত্র—প্রেম, অহিংসা ও মানবতার মন্ত্র। রিখাঙ-এর অনেক দুর্বল মুহূর্তে জীবন তার অন্তরে সঞ্চার করেছে আশা ও বল। জীবন হাসিমুখে প্রায়ই বলত—“তরিলে দেশ, মরিলে স্বর্গ।” একদিন সত্যসত্যই তাকে

মৃত্যুবরণ করতে হয় নিবিড় অরণ্যে ভিড়েগুলীর অল্পচরদের হাতে। নাগা-পাহাড়ে তার কোনো স্মৃতি-চিহ্ন রইল না। জেল হাজতে ফানিটকাণ্ড বলেছিল : “জীবনের মতো মানুষকে যারা হত্যা করতে পারে তারা নাগা নয়।” জীবনের মৃত্যু রিখাঙ-এর প্রেম ও অহিংসার নীতিকে দৃঢ়তর ক’রে তুলল।

উপন্যাসে রাজনৈতিক সংঘর্ষ মুখ্য বিষয় হলেও তারই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে হৃদয়ের সংঘর্ষ। ছুটি মেয়ে ভালোবেসেছিল রিখাঙ-কে—একটি তার আশৈশব সহচরী চারেংলা, আর একটি তার পিতৃশত্রু নাজেকের মেয়ে খুটিংলা। অদৃষ্টের ফেরে চারেংলাকে যে পথে যেতে হল তাতে আর সে রিখাঙ-এর জীবন-সঙ্গিনী হওয়ার কথা ভাবতেও পারে না। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে চারেংলার মুখের দিকে তাকিয়ে রিখাঙ দেখল সে মুখে শৈশবের সজীবতা নেই, যৌবনের পবিত্রতাও গেছে হারিয়ে। শৈশব-প্রিয় চারেংলার প্রতি সে একটা মমতা বোধ করে সত্য, কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের সঙ্গে সহবাস করার বিসদৃশ স্মৃতি তাকে তার কাছ থেকে চিরকালের জন্য দূরে সরিয়ে দিল।

রিখাঙ-এর জীবনে চারেংলার স্থানে এল খুটিংলা। কিন্তু সে জানে চারেংলার প্রতি রিখাঙ-এর দুর্বলতার কথা। তাই তার প্রশ্ন : তুই আমাকে কতটা ভালোবাসিস ?

—আমার গ্রামকে আমি যতটা ভালোবাসি ঠিক ততটা।

—ধেং, গাঁও আর মূই এক নাকি ?

—মোর কাছে তুই-ই সমান।

—আমিও গাঁওকে ভালবাসি, কিন্তু তোকে ভালোবাসি তার চেয়েও বেশি।

—তাহলে তোতে আমাতে বিয়ে হলে খুব ভালো হয়। আমি চাইব গ্রামকে, আর তুই চাইবি আমাকে।

—ধেং, তুই বড় ‘ধেমেলীয়া’।

রিখাঙ-এর কলকাতা যাওয়ার কথা শুনে খুটিংলা বলল, কলকাতায় গিয়ে কি আর আমার কথা মনে থাকবে তোর ? সেখানে নাকি বড় ‘ধুনীয়া ধুনীয়া ছোবালী’ (সুন্দর সুন্দর মেয়ে) আছে।

—মোর কাছে তোর চাইতে ‘ধুনীয়া’ আর কেউ নেই।

খুটিংলা সত্ত-ফোটা ফুলের মতো মনোরম, কিন্তু উপন্যাসের মহৎ ক্ষুধা মেটাবার শক্তি তার নেই। সেই শক্তির প্রকাশ হয়েছে চরিত্রহীনা চারেংলার মধ্যে।

বস্তুত চারুংলার মধ্য দিয়েই বলা যায় সমগ্র উপজাতিসের প্রকাশ। গ্রন্থের শুরু হয়েছে চারুংলাকে নিয়ে, শেষও হয়েছে তার কথা দিয়ে। যুদ্ধের আগে গ্রামবাসীর চোখে যে ছিল গোলাপফুলের তুল্য, জাপানী সৈনিক ইথেওরা এসে তার দেহ চুরি ক'রে নিল। এখন সে পাপী, সে কলঙ্কিনী, সে পতিতা। বিদেশীর হাতে বন্দিনী হয়ে সে যা হারিয়েছে, তা নারীজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু নিজের চোখে সে পতিতা নয়, কারণ সে নিরুপায় হ'য়ে আত্মসমর্পণ করলেও শেষ পর্যন্ত ঈথেওরা-কেই সে একান্ত মনে স্বামী বলে গ্রহণ করেছিল। এমন সময়ে আরম্ভ হল জাপানীদের পশ্চাদপসরণ। দলপতির নির্দেশে ঈথেওরা-কে ছাড়তে হল উত্থল। যাওয়ার সময়ে বলে গেল, যুদ্ধ থেমে গেলে আবার সে আসবে এবং আবার তারা রচনা করবে দাম্পত্য-জীবনের নীড়। এই ছুটি বিসদৃশ নর-নারীর বিদায়-দৃশ্য দিয়ে গ্রন্থের সূচনা।

ঈথেওরা আর ফেরেনি। দিন কয়েকের মধ্যে ভিডেগেলীয় কাছ থেকে এল তার মৃত্যু-সংবাদ। ইতিমধ্যে রণক্ষেত্র থেকে কিরে এসেছে বাল্য-প্রণয়ী রিশাঙ্। প্রথম সাক্ষাতে তাদের সম্ভাষণ :—তুই নাকি কোন্ জাপানীর সঙ্গে ছিলি ?

মাথা নেড়ে চারুংলা জবাব দেয়—হ্যাঁ।

রিশাঙ্-এর কাছে আবেদন জানাবার কোনো মুখ নেই চারুংলার। এখন সে কী করবে? কেন সে আত্মসমর্পণ করেছিল বিদেশী সৈনিকের কাছে? এমন কোনো পুরুষ আছে কি যে তার আত্মসম্মান ও সামাজিক মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে একজন পতিতাকে উদ্ধার করবার জগ্ন তার নিজের জীবন নষ্ট করবে? একান্তই ছরাশা। বাধ্য হয়ে একটা অবাস্থিত মাহুঘের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং সেই ঘৃণ্য মাহুঘটার সন্তান গর্ভে বহন করার কলঙ্ক থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল তার মনে। আবার আগের মতো অধর্ষিত এবং পবিত্র কুমারী জীবনের মুক্তবায়ু সেবনের জগ্ন তার অন্তরাঝা কেঁদে উঠল। রিশাঙ্ একদিন জিজ্ঞাসা করল : যুদ্ধ তো শেষ হল, তুই এখন কোথায় যাবি?

—পঞ্চায়েৎ আশ্রয় দিলে এই গাঁয়েই থাকব।

—আমি বলি কি, আমাদের এখানে হাসপাতাল হওয়ার কথা আছে। তাতে নার্স হতে পারবি, টাকাও পাবি।

—কাজ না জানলে কেন আমাকে ডাকবে?

—আমি তোমার কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দেব।

পঞ্চায়েৎ যার ঘরে চারেংলাকে আশ্রয় দিয়েছিল, একদিন সেই বৃড়ো লোকটার দুরভিসন্ধি দেখে সে ভাবল—একবার যে সমাজের চোখে অপরাধী হয়েছে, সে যেন চিরকালের অপরাধী, সারাজীবন তাকে বহন করে চলতে হবে সামাজিক পাপের বোঝা। ছুঁষ্ট লোকটা সেই মনোভাব নিয়েই আজ তার দেহটাকে চেয়েছিল। সে যেন একটা কামনা পূরণের যন্ত্র। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের রূপবান্ দেহটার উপর ঘৃণা জন্মাল। এই দেহের মধ্যেও যে একটা ইচ্ছা ও আত্মা আছে সে কথা ওরা বোঝে না, বুঝতে চায় না।

কিন্তু চারেংলার মুক্তি নেই। একদিন রাতে ফ্যানিটকাণ্ড এসে আশ্রয় চাইল চারেংলার ঘরে পুলিশের হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতিলাভের জন্য। সেদিন দুই ভাগ্যহীন নরনারীর মধ্যে যে মিলন হল তার মধ্যে কোনো পক্ষ থেকেই কোনো জবরদস্তি ছিল না, ছিল পরস্পরের উপর পরম নির্ভরতা।

কিন্তু দুজনের মনের মধ্যেই জমে আছে ভিন্ন নরনারীর স্মৃতি, অথবা, বলা চলে, তাদের সাম্নিধ্যলাভের আঁকাজ্জা। আর একদিনের সাক্ষাতে ফ্যানিটকাণ্ড বলছে চারেংলাকে : “রিখাং কলকাতা থেকে ফিরে আসার পরে তোর মতি-গতির কীরকম পরিবর্তন দেখছি। তুই আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসিস না।” চারেংলা বুঝল ওর কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সে ওকে ছুঁখ দিতে চাইল না, বলল : “রিখাঙ, আমার ছোটবেলার বন্ধু। তোদের দুজনের মধ্যে ‘কাজিয়া’ হলে আমি বড় ছুঁখ পাই।”

চারেংলার এই দ্বিধা আর দূর হয়নি। তার অবিমিশ্র ভালোবাসা ছিল রিখাং-এর জন্য, হয়তো তাকে পায়নি বলে। কিন্তু ফ্যানিটকাণ্ডের প্রতিও ছিল তার আন্তরিক সহানুভূতি। ফ্যানিটকাণ্ড কিন্তু চারেংলার কথা বড় একটা ভাবতো না, হয়তো তাকে পেয়েছে বলে। তার ধ্যানের লক্ষ্মী ছিল খুটিংলা যে তাকে সর্বদাই উপেক্ষা ক’রে এসেছে। রিখাঙ, খুটিংলাকে বিয়ে ক’রে বুঝেছে—চারেংলার সঙ্গে তুলনাই হয় না এই সাধারণ নারীর। “চারেংলার প্রাণ যেন বিশাল আকাশ, আর খুটিংলার প্রাণ যেন একটুকরো মেঘ।” এই চারটি নরনারীর মধ্যে একমাত্র খুটিংলাই নিঃসন্দেহ—সে পৃথিবীতে জন্মেছে জায়া ও জননী পদের জন্য। তাই বুঝি ফ্যানিটকাণ্ডের ভালোবাসার মূল্য দিতে সে পারেনি।

চারেংলা কি পেরেছে রিখাঙ-এর ভালোবাসার মূল্য দিতে? ইচ্ছেওয়ার কথা মনে হল। তার স্মৃতি তার প্রতি লোমকূপে জড়িত। সে-ই তো তার

নারীজীবনের সর্বনাশ করে গেছে। কিন্তু তারই বা দোষ কী? সে তো যুদ্ধের সৃষ্টি—তারও তো কামনা আছে। যুদ্ধে ভাঙা ঘরদুয়ার গরুঘহিষের ক্ষতিপূরণ হয়তো হবে, কিন্তু মহাযুদ্ধ দেহ-মন-আত্মার যে ধ্বংস করে গেল তার ক্ষতিপূরণ করবে কে? ইশ্বেওয়ার সন্তান বাঁচেনি। চারেংলার বৃত্তু মাতৃ-হৃদয় সেই নাগাপ্রেমিক স্বর্গত অসমীয়া যুবকের মাতৃহীন সন্তান কন্‌চেং-কে নিয়ে তৃপ্ত রইল। সেই শিশুর মুখখানি যেন ওকে বলছে : “চেয়ে দেখো, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখো। ধৈর্য ধর। পৃথিবীতে সকল ছিল, সকল আছেও।” শিশুর মুখে চুমু দিয়ে চারেংলা তাকে বকের উপর তুলে নিল। আঃ কী শান্তি! একটি কথা বাকী রইলো—গ্রন্থের নামকরণ। ‘ইয়াকুইদম’ অসমীয়া নয়। টাংখুল শব্দ। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এই :

খুটিংলা বলল—“আমার একটা বাচ্চা হবে রিখাঙ্‌।” রিখাঙ্‌-এর অশান্ত মনে শান্তি ফিরে এল। সে নিজে মরে গেলেও তারই তেজেবীর্ষে গড়া একটা মাতুষ বেঁচে থাকবে প্রতিনিধি হয়ে। তার ছেলেমেয়ে নাতী-নাতনী হবে। এক পুরুষের পরে আরেক পুরুষ, তারপরে আরেক... ..

—ছেলে হলে তার নাম কী রাখব জানো?

—কী?—খুটিংলার সলজ্জ প্রশ্ন।

—ইয়াকুইদম।

—মানে?—খুটিংলার সবিস্ময় প্রশ্ন।

—গণ-শাসন।

—কেন, পৃথিবীতে আর কোনো নাম নেই নাকি?

—এই নামটিই আমার কাছে সব চেয়ে ভাল।

উল্লেখযোগ্য বই

নাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

বাংলা ছোটগল্পের
অভিজ্ঞাত সংকলন

শতাব্দীর শতগুণ

১ম খণ্ড : ১৫.০০ ॥

২য় খণ্ড : ১২.৫০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর

যোগেশচন্দ্র বাগলের

ইংলণ্ডের ডায়েরী

৪.০০ ॥ বিদ্রোহ ও বৈরিতা

২.০০ ॥

নারায়ণ শান্তালার

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

গনামী

৪.০০ ॥ প্রজ্ঞাঙ্গণ (২য় মুঃ) ৪.০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারাণসী

আধুনিক কবিতার ধারা

ভবানীগোপাল সান্যাল

আধুনিকতার ধারা বাংলাকাব্যে নির্ণয় করা কঠিন। কোন কবি থেকে এই ধারা শুরু, এর রূপ বা প্রকৃতি কিরূপ তা নির্ধারণ করা সহজ বলে মনে হয় না। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় রবীন্দ্রোত্তর যুগ থেকে এই প্রবাহ শুরু হয়েছে। আধুনিক যে কোন সঙ্কলন-গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যাবে যে—তার মধ্যে লিপিক্স-শ্রীমলী-পুনশ্চ থেকে কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা হ'লে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম আধুনিক কবি। তিনি গোমুখী, সেই উৎস থেকে এ যুগের কবিতারূপ জাহ্নবীধারা প্রবাহিত হয়েছে। রাজেন্দ্র সন্দমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে, কবিগুরু পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পরবর্তী কবিগণ যাত্রা শুরু করেছেন।

আধুনিক কবিতার পরিচয়দান-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

নদী সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকে বলতে হবে মডার্ন। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে।

নদীর উপমাটি এখানে মনোজ্ঞ। তার গতিপথ পরিবর্তনের পশ্চাতে মর্জিকে দায়ী করা চলবে না। বলতে হবে ভৌগোলিক কারণের কথা। সাহিত্যেও যখন শুরু বদল হয় তখন থাকে যুগের হাওয়া-বদলের অনিবার্য ইঙ্গিত। এ মর্জি নিয়ন্ত্রিত করে। ইংরেজী কাব্যে যখন বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ, পূর্ববর্তী, স্বমার্জিত, স্বনংহত ক্লাসিক রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতন ধারা প্রবর্তন করেন, তখন শেষোক্ত দুই কবির পশ্চাতে অন্ততঃ ছিল ফরাসী বিপ্লবের মানবিক আদর্শ। কাব্যে নতন করে প্রকাশিত হ'লো গভীর আবেগ। জীবনবোধের প্রাচুর্য, মানব-জীবনের বৈচিত্র্য, অসঙ্গতি ও আকস্মিকতা এবং সৌন্দর্যের প্রতি বিশ্বাস-বিস্ময়। যুগের মানসিক প্রেরণা ব্যাখ্যা করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন :

How glorious! in self knowledge and self rule,
To look through all the frailties of the world,
And with a resolute mastery shaking off
Infirmities of nature, time and place,
Build upon social personal liberty.

এই যে প্রবাহ প্রায় অব্যাহত গতিতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত চলে এসেছে। মাঝে মাঝে সংশয়ের ছায়াপাত ঘটেছে, বৈচিত্র্যও দেখা দিয়েছে কিন্তু মূল স্রবের পরিবর্তন ঘটেনি। সংশয়ের স্রব পরিস্ফুট হয়েছে মাথা, আরনও বা টেনিসনের কাব্যে। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে আরনও অতীতের অপ্রমত্ত ও জীবনবিশ্বাসের প্রতি প্রদানবিবেদন করেছেন, টেনিসন আত্মস্থাপন করেছেন ইতিহাসের উত্তরনে। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ এসে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিপর্যয় সৃষ্টি করলো। এর প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হলো কাব্যে। স্মৃতরাং জন্মলাভ করলো আধুনিকতা। জীবনের নিত্য মূল্যে প্রদানশীল য়েটসের মুখেও শোনা গেল :

But I grow old among dreams
A weather worn, marble Triton
Among the streams.

তা হলে কাব্যে যখন আধুনিকতার কথা বলা হয়, তখন তা কোন কবির কৃতি বা মঞ্জির উপরে নির্ভর করে না। এলিয়ট থেকে যে আধুনিকতার প্রবাহ শুরু হয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করতে হ'লে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করতে হবে। অতীতে জীবনে ছিল প্রদানবোধ, ব্যক্তিচেতনা অতিমাত্রায় প্রখর ছিল না, উত্তেজনা ও চিন্তাহীন উন্নাদনা জীবনকে কলুষিত করেনি। তাই কবির কাব্যে-সৃষ্টির আদর্শ ছিল :

My song should die away
Content as theirs
Rich in the simple worship of a day.

কিন্তু বর্তমান কালে :

The memory throws up high and dry
A crowd of twisted things.

স্মৃতরাং—the last twist of the knife, এই আধুনিক কালের পরিচয়। স্বভাবত: স্রব বদল হতে বাধ্য।

বর্তমান সভ্যতা যন্ত্র-নির্ভর। যন্ত্রকে কেন্দ্র করে বড় বড় কল-কারখানা ও সংস্থা গড়ে উঠেছে। মানুষ হয়ে পড়েছে যান্ত্রিক, অমানবিক, তাদের জীবন থেকে পৌষের গান নির্বাসিত হয়েছে। এর ফলে অহুভূতি ও আবেগ, জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার পরিবর্তে শিক্ষিত মানুষ হয়ে পড়েছে অতিমাত্রায় মননজীবী আর সাধারণ মানুষ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নৈরাশ্য-পীড়িত,

বৈচিত্র্যহীন ও পৌনপুনিক জীবন-যাত্রার আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। নগর-জীবনে এই সত্য প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের দিকে তাকিয়ে একথা আর অস্বীকার করা চলে না। যদি কবি বর্ণনা করেন যে পৃথিবী আমাদের, ফাঁকা জায়গায় ঘুঁটে-কুড়ানী বুদ্ধার মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তা হলে যুগ সত্যের পরিচয় দেওয়া হবে।

প্রাচীন সাহিত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তি-জীবনের মাধ্যমে শ্রেণী ও ব্যক্তিসত্যের পরিচয়, উভয়েই প্রকাশিত হতো। অবশ্য একথা ঠিক যে সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রেণী পরিচয় ছিল প্রধান; তা ব্যক্তি-মানসকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। কিন্তু বর্তমানকালে ব্যক্তিকে অবচ্ছিন্নরূপে না দেখে তাকে সমাজজীবনের পটভূমিকায় গ্রহণ করা হয়, তার মূল্য বিচার চলে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিকে দেখেছেন, ব্যক্তির কার্যকলাপ, চরিত্রশক্তিকে অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি তাঁর মুক্তধারা বা রক্তকরবীতে দেখিয়েছেন যে মানুষ যখন প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে আঘাত করে তখন প্রাণের মহিমা হয়ে ওঠে বিজয়ী। ব্যক্তি আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে তার আদর্শকে সফল করে তোলে। অভিজিৎ বা নন্দিনীর প্রাণদান বার্থ নয়। তারা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আদর্শকে জয়যুক্ত করে গিয়েছে।

আদর্শের দিক থেকে গ্রহণ করলে এই জাতীয় উপসংহার ও সিদ্ধান্ত স্বন্দর মন্দে নেই। কিন্তু এর বাস্তবমূল্য সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। ব্যক্তির আদর্শ যদি জনসাধারণকে বিদ্রোহী করে তোলে যেমন হয়েছে রক্তকরবীতে কারিগর দল তবে প্রাণের মহিমা অর্থাৎ নন্দিনীর প্রাণদানের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু অভিজিতের একক আত্মতাগ মহিমাম্বিত হলেও বাস্তবমূল্য তার বেশী নয়। যন্ত্রের বিশিষ্ট রূপ ও ধর্ম আছে। যন্ত্র সৃষ্টি করে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, ভোগসর্বস্ব লোলুপতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা। যে আকর্ষণজীবী সভ্যতার চুংখকর পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয় তা যন্ত্রের অপরিহার্য পরিণাম। দেশে দেশে যন্ত্র নিজেকে বহু বিগুণিত করে চলেছে। এখানে ব্যক্তি-বিশেষের সং প্রচেষ্টা কালে কালে হয়ত লোকমনে সঞ্জীবিত হয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে কিন্তু তার জ্ঞাত প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, সংস্থা-স্থাপন ও আত্মদর্শন এবং প্রত্যয়মূলক প্রচার। এই যন্ত্রসভ্যতার অমানবিকরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন। তাই যাত্রী গ্রন্থের একটি কবিতায় তিনি তাই লক্ষ্যহীন পরিণাম, জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে অশ্রদ্ধা, তার ধ্বংসাত্মকরূপ পরিষ্কৃত করেছেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিকে স্থান দিয়েছেন পুরোভাগে। তাই তাঁর বিশ্বাস যে মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার অধিকারী মানুষ আবির্ভূত হয়ে সকল সঙ্কট

ও দুৰ্ভোগ থেকে সকল মানুষকে উদ্ধার করে নবযুগে উজ্জীর্ণ হবার পথ দেখাবেন। কবি তাই নবজাতকের, চিরজীবিতের বন্দনা করেছেন।

এলিয়ট চিন্তায় সমাজ-কেন্দ্রিক কিন্তু বিশ্বাসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবি। যুদ্ধোত্তর সে অবক্ষয়ের চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন তা নগরজীবনের ও নাগরিক সমাজের। তার ক্ষয়-ক্ষতি, তার জীর্ণতা ও পুঞ্জীভূত শ্রানিকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন কিন্তু আবার যখন মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন তখন তাঁর মনে এসেছে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি, সংযম ও ত্যাগের কথা। বর্তমান কালের সভ্যতা মরণোন্মুখ, ধ্বংসের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান জীবনে আছে পাথর, বালি ও সর্পিল পথ। কোথাও জল নেই যে জল প্রাণদায়িনী। এখানে কারও পক্ষে বসা, দাঁড়ান বা বিশ্রাম করা যেন সম্ভব নয়। মানুষ যখন পথ চলে তখন এক কালো ছায়া, তারই বিকৃত সত্তার রূপ, তাকেই অভিভূত করে। ‘Who is the third who walks always beside you?’ কিন্তু পরিত্রাণের পথ খ্রীষ্টীয় ধর্মের অম্লসরণে। সকল ধর্ম এই পথকে সমর্থন করে। দান, সহানুভূতি ও সংযম-এর মাধ্যমে মানুষ উদ্ধার পাবে। তীর্থযাত্রীর দল তীর্থপথে লাভ করলো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। চতুর্দিকে বস্তুতাত্ত্বিক সভ্যতার শ্রানি ও পাঁপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। পুরোনো পরিবেশে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। তাই তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো :

I should be glad of another death.

এই মৃত্যু দৈহিক কামনা—আসক্তির, লোভ ও অসংযমের। বর্তমানের ক্ষত-লাঞ্ছিত জীবন থেকে উদ্ধার পেতে হলে চাই মানসিক শুদ্ধি ও সংযম। এলিয়ট সমষ্টিগত কার্যকলাপ বা গণ-অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী নন। একদিকে বর্তমান অর্থনৈতিক সমাজ-বিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ‘Pats’ alley where the dead men lost their bones’, আবার সমষ্টিগত প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করে উক্তি করেছেন :

Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in crucked earth
Ringed by the flat horizon only.

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট দেশ ভ্রমণের পরে রবীন্দ্রকাব্য যেন সমাজের উচ্চতর থেকে নেমে এসেছে সমস্তের খোলা গঙ্গাশ্রোতে। একদিকে মানুষের অন্তহীন দুঃখে বেদনাহত হয়ে কবি ভাবছেন ধনতাত্ত্বিক সভ্যতার নরঘাতীরূপ, খ্রীষ্টের প্রাণদানের ব্যর্থতা, উপনিবেশিক স্বার্থবোধ ও তার ফলে জগৎ বিধানের উপরে

তাঁর বিশ্বাস যেন নিচলিত হয়েছে, আবার অতীতকে সকল দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের মধ্যেও জীবনের মহিমা স্মরণ করে প্রণাম জানাচ্ছেন ধরিত্রীকে ও হিরণ্যবর্ণ মহাপুরুষকে। দুঃখের পরিমাণে যেন আনন্দের সভ্যতাকে যাচাই করে নিয়েছেন।

প্রভাত সূর্যের অন্তরে

দেখতে পেলেম আপনাকে

হিরন্ময় পুরুষ ;

ডিকিয়ে গেলেম দেহের বেড়া

পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,

গান গাইলেম, 'কিছু চাইনে', কিছু চাইনে—

যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তমা,

যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,

সন্ধ্যাতারার শান্তি,

গিরিশিখরের নির্জনতা।

আত্মার আলোকে বিধ্বলীন এই সৌন্দর্যের উপলব্ধি, নিখিলের ঐক্যবোধের অল্পভূতি, রসের পূর্ণতা, রবীন্দ্রকাব্যের স্থায়ী ভাব। একদা কিছুসংখ্যক লোক মনে করতেন যে এলিয়ট বা পাউণ্ডের মধ্যে যে আধুনিক গণচেতনা আছে রবীন্দ্রনাথ তা নেই, কিন্তু পৃথিবীব্যাপী ঘটনা-প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও যে গভীর সমাজসচেতনার পরিচয় তাঁর কাব্য-নাটক ও প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তার তুলনা অগ্রজ বিরল। মাহুঘের ভুল ক্রটি বা অসম সমাজ-বিদ্ভাঙ্গের জগ্ন তিনি কোথাও ব্যঙ্গ করেননি। বরং বলেছেন যে পাশ্চাত্য কবিদের এই ব্যঙ্গ যুদ্ধের নিদারুণ অভিজ্ঞতার সাময়িক প্রতিক্রিয়া মাত্র। আবার আধুনিক কাব্যে যে অপক্ষপাত কোতূহল, যে রিসংসার চিত্র পরিস্ফুট তাকে বলেছেন উপহাস করে যে এই রীতি অঘোরপন্থীর সাধনা। এখানে স্বীকার করে নিতে হয় যে কবির এই বিচার যথার্থ নয়। এলিয়ট ও অগ্রজ কবিগণ যুদ্ধোত্তর নাগরিক-জীবনের যে রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন তার পরিচয় দিয়েছেন। এটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত বিজ্ঞানের কোতূহল নয়—সমাজের ছবি মাত্র। এই ছবিকে সাময়িক বলা যাবে না কারণ এর ফলাফল দূরপ্রসারী। সমাজ সমষ্টিগত মাহুঘের পরিচয় দেয়। এলিয়ট যেমন ব্যক্তিমানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তির উন্নতি বা হৃতিকামনা করেছেন তেমনি অডেন বা স্পেন্ডার কল্পনা করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক পন্থায় মাহুঘের কল্যাণসাধন করতে।

এলিয়টের বক্তব্য হলো যে কি করে আমরা দিগন্তপ্রসারী মার্কসভূমিকে পুনর্বাস উর্বর করে তুলতে পারি। ত্রিশ সালে এলিয়ট-পরবর্তী কবিগণ গ্রহণ করেছিলেন মার্কসবাদ। পরে তাঁরাও আধ্যাত্মিক মূল্যের উপরে গুরুত্ব অর্পণ করেছেন, প্রচার করেছেন মনের প্রীতির কথা। ‘The palpable and obvious love of man for man’—এই স্বর তাঁদের কাব্যসৃষ্টির মূলে প্রেরণা দিয়েছে। নৈতিক এই মূল্যবোধের প্রতিবাদে ইংলণ্ডেও দেখা দিল সাররিয়ালিজম ও এপোকালিপ্স ধারা। প্রথমোক্ত মতবাদের আত্মকেন্দ্রিকতা বা দ্বিতীয় ধারায় অস্পষ্ট মানবতাবাদের পরিবর্তে এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সবল স্পষ্ট মানবতা, সর্বব্যাপী মমতা ও সহানুভূতিবোধ। কবিরা স্বপ্ন দেখলেন সৌভ্রাত্য ও স্বাধীনতার।^১ সিড্‌নি কেস্‌ লিখেছেন তাঁর Being not proud কবিতায় :

Yet groping painfully, love's root may save
The dumb soul of a stone or justify
The holed heart in a cross road grave.

প্রকৃতির ঐশ্বর্যতাও তাঁদের মুগ্ধ করেছে। এল্‌ন লুইস্‌ লিখেছেন :

Yet still
I who am agonised by thought
And war and love
grow calm again
with watching
The flash and play of finches
who are as beautiful
And as indifferent to me
As England is, this spring morning.

রবীন্দ্রনাথের মতে তথ্য মাত্রেই অবহিন্ন বস্তু। ‘ভথোর পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়া’—সাহিত্যের ধর্ম। অবশ্য এই সত্য

১. It is based on a notion that through a recognition of human limitations and potentialities one may achieve a balanced purposiveness which will in some way be in accord with the balance of good in the universe.

[The trend of modern poetry : G. Bullough]

বাস্তব নয়, ভাবসত্য। বস্তুর সত্য প্রমাণিত হয় রসের ভূমিকায়। শেক্ষেত্রে জীর্ণ-
চীর হরিপদ কেরানীর মূল্য আকবর বাদশাহের ঐশ্বৰ্যের অপেক্ষা মূল্যবান।

জীবনকে দেখবার ও দেখাবার দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক কবিতার বিশিষ্টতা
প্রমাণিত করে। বর্তমান কালের কবিগণ সমগ্র দৃষ্টিতে জীবনকে দেখবার
সাধনা করেন না। তাঁরা আনন্দবাদী নন বলে জীবনের দুঃখ বেদনা ব্যর্থতাকে
সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধির প্রয়াস করেননি। জগতের
পরিণাম আনন্দ বলে মনে হলে শোক দুঃখ অকিঞ্চিৎকর রূপে প্রতীয়মান হয়।
এ জীবন মধুময়, মধুময় ধরিত্রীর ধূলি—এই উপলব্ধি বোধির। কিন্তু বর্তমান
কালে মানুষের কর্মহীন অবকাশ ও বসন্ত বাতাস ক্লান্তি ও অবসাদে ভরে ওঠে।

কবি বেদনাময় চৈতন্য নিয়ে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সঙ্গে আত্মীয়তা
স্থাপন করেন। বিশ্বকে তিনি অব্যবহিতভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করে
প্রকাশ করেন।

এর নাম বাস্তব। পরিদৃশ্যমান জগৎকে ভাবের জগৎ করে তোলা
কবির ধর্ম।

সেই আমি'র গহনে আলো আঁধারের ঘটল সংগম,

দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।

‘না’ কখন ফুটে উঠে হল ‘হ্যাঁ’ মায়া'র মস্তে,

রেখার রঙে স্বেচ্ছা দুঃখে।

আধুনিক কবি দৃষ্টি প্রসারিত করে পরিদৃশ্যমান জগৎকে দেখেন। যা প্রত্যক্ষ-
গোচর তা হয়ে ওঠে ভাঙ্গা-চোরা, বিকৃত ও বিশীর্ণ।

রাত্রির দূষিত অঙ্গে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে

আমাদের তন্ময় ভাঙ্গে ;

তারপর আকাশ ভারি হয়ে ওঠে

বিরস কাজের সুরে

কতদিনের ক্লান্তিতে ক'লের বাঁশী বাজে

পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্ৰগতি বাসের শব্দ।

বর্তমান জীবন যেন এক ছুরারোগ্য ব্যাধি, প্রকৃতির গান ছাপিয়ে বেজে ওঠে
অভাব ও বেদনার ইতিহাস।

তাইতো ছুটির গ্রাম্য সন্ধ্যা অন্ধকারের সংগীত

উপছে—উপছে ওঠে শরতের দেশ-জেড়া শতকান্নার!

কবে যে মানুষ প্রকৃতির রঙ্গে সাজবে ?

প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিমল ঘোষ-কৃত
বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকরগ্রন্থ

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

(প্রথম খণ্ড—১২'৫০)

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণ তদানীন্তন বাংলা সাময়িকপত্র থেকে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে : এটি প্রথম খণ্ড এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনাবলী এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল। অতি ছুপ্রাপ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য পত্রিকা যেটে বাংলার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাদবীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা সংযোজিত। ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরো ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থ প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্য বৃহৎ রয়েল অস্ট্রাভো সাইজের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বই, আর্টপ্লেট ও বোর্ড-বান্ডাই সমেত নামমাত্র করা হয়েছে।

ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজকর্মী সকলের পাঠযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ

॥ এই লেখকের আরো বই ॥

বিজ্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

- পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত * প্রতীচির মহাকাব্যগুলি থেকে চরিত্র চিত্রিত সংস্করণ ৫'৫০
- অনুপম কথাসাহিত্য সংগ্রহ

AFRICANISM : Rs. 16/-

দেবেশ দাশের

নবগোপাল দাসের

রাজসী (২য় মুঃ) ৩'০০ ॥ এক অধ্যায় (২য় মুঃ) ৩'০০ ॥

অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বহুর

ভারতের চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১ আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥ (২য় মুঃ) ৪'০০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর

প্রমথনাথ বিশীর

ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪'০০ ॥ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

এর জের টেনে বিষ্ণু'দে লিখেছেন :

তারপরে চা এবং তাস

ব্রিজই ভালো, না-হয় ফ্লাস।

ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আত্ননাদ, থিস্তি, অট্টহাসি।

তারপরে বাড়ি

অশ্লীল আর সর্দি কাশি

এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার বাল।

এ যেন এলিয়টের কবিতার ভাবানুবাদ :

The goat caught at night in the field over head ;

Rocks, moss, stonecrop, iron, merds.

The woman keeps the kitchen, makes tea

Sneezes at evening, poking the peevish gutter.

I an old man,

A dull head among windy spaces.

আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা মননপ্রধান, তথ্যাশ্রয়ী, অল্পসঙ্কিৎসার কোতূহলে উজ্জল ও ভাবাবেগ বর্জিত। মনোহারিতা যদি পূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্য হয় তবে এযুগের বৈশিষ্ট্য হলো মনোজয়িতা। বস্তু বা ব্যক্তি আপনার রূপ নিয়ে পরিস্ফুট। যদি কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠে থাকে তা হলেই হলো। কিন্তু এমন আধুনিক কবিও আছেন যিনি রূপের সঙ্গে ভাবের, মননের সঙ্গে অল্পভূতির সমন্বয়সাধনের প্রয়াস করেছেন। বুঝতে হবে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা একালের কিন্তু কাব্যাদর্শ অতীতের।

বুদ্ধদেব বস্তু লিখেছেন :

মৃত্যুর নাম অন্ধকার ; কিন্তু মাতৃগর্ভতাও অন্ধকার, ভুলো না, তাই কীল অবগুপ্তিত। যা হয়ে উঠছে তাই প্রচ্ছন্ন ; এসো, শাস্ত হও ; এই হিম রাত্রে যখন বাইরে ভিতরে কোথাও আলো নেই, তোমার শূন্যতার অজ্ঞতার গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্ম প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।

এ যেন সেই still point-এ উত্তীর্ণ হবার জন্ম আত্মার সাধনার ইঙ্গিত যা এলিয়টের মূল বিষয়।

ডুয়েলডফের বর্ষর সভ্যতার পরিচয় দেখে অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন :

যিশু মাতৃমূর্তি রক্তমাখা

শুকনো পড়ে আছে ধারে ঘাসে ঢাকা

চতুর্দেশী মৈত্ৰরাজ কীর্তির ওড়ায় পতাকা।

পুনশ্চ পত্রপুটে রবীন্দ্রনাথ লোকজীবনের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। যে জীবন
অসঙ্গত, পারস্পর্যহীন ও বিক্ষিপ্ত তার পরিচয় কবি দিয়েছেন। তথাপি তিনি
কাব্যসৃষ্টির ঐতিহ্য-ভ্রষ্ট নন। আনন্দবাদী কবির মন সৃষ্টির অদূরস্ত রহস্যে
যেন অগ্রমত্ত।

হে পুষ্প সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আহার মাঝে এক।

আধুনিক কবিতা প্রজ্ঞাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তাই তা বিশুদ্ধ চিন্তারূপের
— পরিচয় দেয়। স্বধীন্দ্র দত্ত লিখেছেন :

অভিব্যক্তিবাদে অবিখ্যাসী, প্রগতিতে
যতনা পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে তথা ভবিষ্যতের
নিষেধে অধুনা ত্রিশঙ্কু এবং সে খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে জানি কি না জানি
• নাস্তিরই বিবর্তবাদ।

এই বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী সময় সেনেরও। তিনি ক্রোদাক্ত নগরজীবনকে
বাদ্য করেছেন।

মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ
দিগন্তে জলন্ত চাঁদ, চিংগুরে ভিড়
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে!
কলেরা আর কলের বাঁশী আর গনোরিয়া আর বসন্ত
বহা আর হুর্ভিক্ষ

শৃঙ্খল বিধে অমৃতস্ত পুত্রাঃ।

একালে মানুষের মন রিক্ত। সে বড় অসহায়, অর্থ, গৃহ বা অত্যাশ্রয় শান্তি
থাকলেও মনে বড় ক্লান্তি ও হতাশা। জীবনানন্দ দাস তার পরিচয় দিয়েছেন :

জানি তবু জানি
নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি
অর্থ নয়, কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিশ্ব
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে

আমাদের ক্লাস্ত করে

ক্লাস্ত-ক্লাস্ত করে

লাস কাটা ঘরে

সেই ক্লাস্তি নাই।

আধুনিক কবিদের মধ্যেও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে নানা স্তরবিভাগ চোখে পড়ে। জীবনানন্দ প্রধানতঃ রূপ-পূজারী, ভাবধর্মী কবি। পাখী পাখালীর ডাক, ধানসিরি নদী, রৌদ্রের গন্ধযুক্ত চিল, নরম নদীরূপ নারী, ঘাস, মাছরাঙ্গা, পুরোনো পোঁচার জ্ঞান প্রভৃতি তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। তিনি কুমুদরঞ্জনের ধারায় বাস্তবের মধ্যে এক স্পর্শযোগ্য অপরূপ অতি-বাস্তবকে উপলব্ধি করেছেন। ভিলা মেয়ার বা য়েটস্-এর মত এই জগৎ রূপাতীত বলে অপরূপ নয়, বাস্তবের মধ্যে, এক দ্বিতীয় জগৎ। তথাপি তিনিও ক্লাস্ত ধূসর জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন ও নূতন আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেব বসু সাধারণতঃ যুগ-সচেতনতার উর্দ্ধে উঠে জীবনের দাবী মেনে নিয়েছেন। তিনি শিল্পী ও প্রেমিক; প্রেম তাঁর কাব্যের স্থায়ী ভাব। মননধর্মী কবি হওয়া সত্ত্বেও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় জীবনের রূপ ও ধ্যান সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রেম এক সর্বব্যাপী, অখণ্ড ও নির্বিশেষ রূপ ধারণ করেছে।

এলোমেলো জলে আলো উঠে জলে, ছলছল ঢেউ তোমার নামে,
তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায়, ঢেউয়ের জলে স্রোতের টানে
তোমার নামের শব্দ কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!

জীবনের দাবী সর্বাধিক বলে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে শোনা যায়।

ভুল থেকে সরে সরে অগ্নি কোন নিয়মের চলা
কিছু না কিছু না খেলা, থেমে নেই হাওয়ার শৃঙ্খলা
সৃষ্টি মাটি এই মতো।

তাইতো আরোই বেশী ভাবি,

ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনের দাবী।

বুদ্ধদেব বসু যে আধুনিক তার রহস্য বিষয়বস্তুর মধ্যে নেই। তাঁর কাব্যে মনোজয়িতা বা বিষয়ের আকৃষ্টতা নেই। যুগ-সচেতন হয়েও তিনি যুগের দাবী না মেনে রবীন্দ্রধারার অনুসরণ করেছেন। এই যুগের পরিচয় উপলব্ধি করা যায় সময় সেনের কবিতায়।

তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি

আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :

আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই ;

কাব্যে আধুনিকতা বিচার্য আদিকের দিক থেকেও। চরণের মধ্যে অতিক্রান্ত
মিল, ছন্দের বৈচিত্র্য, যেমন ধ্বনিপ্রধান ছন্দে মিশ্রণ ও আধুনিক চিত্রকল্পের
প্রয়োগ। এ ছাড়াও আছে ভাষা-প্রয়োগে স্বাধীনতা, সাধু শব্দের পার্শ্বে
কথ্য, গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করে ভাবকে মুক্তিদানের প্রয়াস। অবশ্য এই
রীতির প্রথম প্রয়োগ করেন শ্রীমধুসূদন ও পরে সত্যেন্দ্রনাথ।

যুগ-সচেতনতা অর্থ এ সব যে কবি যুগধর্মের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন
বা করবেন। যুগের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়েও তাকে অতিক্রম করা চলে।
যেমন করেছেন সেকসপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ। প্রেমেন্দ্র মিত্রও জীবন-রহস্যের
কবি। জীবনের রূপ ও রহস্য, তার জটিল গ্রন্থি তাঁর মনে এনেছে নানা প্রশ্ন।
মানবিকবোধে উদ্ভুদ্ধ হয়ে একদা তিনি মুটে মজুর, ইতরজনের প্রতি আকৃষ্ট
হয়েছিলেন। সেই বোধ তাঁকে জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে।

মানুষের ইতিহাস কত আত্মঘাতী মুহুর্তায়

পথ হারাবে,

তবু হে কালের অধীশ্বর

হতাশ আমরা হবো না।

এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে কলস্বর নদী। রাখাল বালকদের জন্ত সূর্য
আগ্ন পাটে বসে না। ‘ঘোলাটে রীতির ধোঁয়াটে রাত ঘনায়’। তথাপি
আমাদের পৃথিবীতে পাখি যদি উড়ে যায় তবুও :

একটি সাহসী ফুল

থাক শুধু চিত্ত সহচর।

যারা সূর্য সেনা তারা দেশে দেশে প্রস্তুত হয় বিপ্লবের জন্ত, নবযুগকে আহ্বান
করবার জন্ত। কিন্তু কবির প্রত্যয় শ্রীরামচন্দ্রে যিনি নরোত্তম। ইনি
আমাদের সকল সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ করে দেবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র শুধু ভাব নয়
রীতির দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের অহুগামী। ছন্দ, শব্দ অথবা রূপ-কল্পের
দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তাঁর কাব্যে বিরল।

বিষ্ণু দে, সমর সেন, স্তম্ভাধ মুখোপাধ্যায় ও স্বকাস্ত ভট্টাচার্য সমাজতান্ত্রিক
ধারার অহুগামী। বিষ্ণু দে সচেতন শিল্পী। এলিয়ট যেমন বলেন যে

কবিতার সৃষ্টি আবেগপ্রসূত যতখানি নয়, তদপেক্ষা বেশী মননের, বিষ্ণু দেব কবিতাও সেই জাতীয়। এলিয়টের মত তিনি পণ্ডিত কবি; অপ্রচলিত, অভিধানিক শব্দের ব্যবহারে পাঠক-মনকে তিনি আকর্ষণ করেন। হয়ত বা প্রতিহত করেন। কিন্তু তাঁর কবিতার ধ্বনি-সম্পদ অতুলনীয়।

বিষ্ণু দে ও পূর্বোক্ত কবিগণ যে, যুগের নৈরাশ্র ও বিক্ষোভকে প্রকাশ করে শাস্ত হয়েছেন তাই নয়; নতুন বলিষ্ঠ স্বপ্নময় ভবিষ্যতকেও তাঁরা গড়ে তুলতে চান। জীবনে আছে যে মাধুর্য, যে সোনাগলা অপরাহ্ন, প্রেম ও প্রীতির মুহূর্ত তা তাঁরা অবগত। বৃদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র অথবা নরেশ গুহ যেমন জীবন-রস উপভোগ করেছেন, অস্বীকার করেছেন তার ক্লাস্তি ও হতাশাকে, বিষ্ণু দেও তেমনি জীবনের প্রেম ও মাধুর্য বিকীর্ণ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। এর ভাঙ্গাচোরা বিধ্বস্ত রূপ তাঁকে অভিভূত করে। নিছক আত্মরুতি সাধন ও সৌন্দর্যচর্চা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁর ও অগ্ন্যাগ্ন অহুগামী কবিদের ভূমিকা স্বভাবতঃ সংগঠকের, সমাজ-বিঘ্নাস পূর্ণগঠনের। এয়ুগে চলেছে সভ্যতার শব-বাহনের কাজ, জীবনানন্দ মন্তব্য করেছেন, তাই বিনা অপরাধে ‘মরি ঘরে বসে লোভী ঔয়ের রণে’। তাই কবির বক্তব্য :

হয়তো এই আছতি শেষ হলে :

নব সমাজ গড়ার কলরোলে,

শান্তি যেথা সমান স্রুথ খোলে,

হারিয়ে যাবো সেখানে জনতায়।

যেখানে নেই বোমা তাড়ানো দেয়াল

পথিক প্রেম মৈত্রী, নয় খেয়াল ॥

‘মানসলোকের বাসিন্দা যত তলুহীন গম্বুজে’—এই ছায়াসদৃশ গম্বুজ ত্যাগ করে কবিরা নেমে এসেছেন সংঘাতগঙ্গুল জীবনে, যেখানে চলেছে নবজীবনের বীজ বপন উৎসব। ১৯৪০-৪২ সালের প্রচলিত কবিতায় সময় সেনের নূতন স্বর এসেছে। ব্যক্তির মুক্তি সমষ্টির জীবনে—এই পথে নিঃসীম অন্ধকার পার হওয়া সম্ভব হবে।

মধ্যদিনে জলে স্থলে ফেলে দীর্ঘকায় ছায়া।

গ্রহণ লেগেছে প্রাচীন সূর্যে ;

এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব

যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে

প্রগতির সম্মিলিত বীর্ঘে অক্লান্ত আত্মদানে।

প্রচারের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায় ১৯৪২-৪৬ সালের কবিতায়। তবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাস যদি কবির মর্মমূলে প্রবেশ করে থাকে তবে আপত্তির কিছু নেই। প্রচারের স্বর স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন :

হিরণ্যগর্ভ দিন

হাতে লক্ষ্মীর বাঁপি নিয়ে আসছে।

গান গেয়ে

আমাকে বলছে দাঁড়াতে।

বর্তমান যুগ, বর্তমান দিন বড় রুক্ষ, বিবর্ণ ও অনাকাজ্জিত। দু'পায়ে রাস্তার কাদা খুঁচে, নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোতে দিন পার হয়। প্রদীপের আলোতে অন্ধকার প্রেতের মত তুলে ওঠে।

অন্ধকারকে আছড়াতে আছড়াতে

ছোট্ট বউটা ভাবে

তা'হলে কালও উঠনে আঁচ পড়বে না ?

সমর সেন ও স্বভাষ মুখোপাধ্যায় রীতির দিক থেকে অনেক পরিবর্তন এনেছেন। উভয় কবি পয়ার ছন্দে প্রবাহমানতার স্বর এনেছেন। স্বভাষ মুখোপাধ্যায় হসন্ত-অক্ষরকে পয়ারে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। এই হসন্ত-অক্ষর ধনিপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও পর্বগুলিতে ভেঙ্গে-চুরে তিনি কথ্য-ভাষার ঢং-এ বিচলিত করেছেন। ছন্দের স্বর আর কবিতার স্বরের (double pattern) সমন্বয় তাঁর এক অপূর্ব কৌশল।

বাঁয়ে চলো ভাই

বাঁয়ে—

কালো রাজির বুক চিরে,

চলো—

দু'হাতে উপড়ে আনি

আমাদেরই লাল রঙে রঙীন সকাল।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় স্বকান্তের 'ছাড়পত্র' রচিত। এর মধ্যে আছে 'শোষণ' ও 'শাসনের' বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলিষ্ঠ অথচ অস্থির আশা, গণজীবনের উপরে একান্ত বিশ্বাস। প্রচারস্থলভ মনোভাব তাঁর কবিতায় বর্তমান, তথাপি জীবনকে আত্মসাৎ করবার দু'রাশা

তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অকালে তাঁর জীবনাবসান না ঘটলে তিনি হয়ত তাঁর সম্ভাবনাকে পূর্ণ মূল্য দিতে পারতেন।

স্বকালের 'প্রার্থী' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। হিমশীতল দীর্ঘ রাত দরিদ্রের বড় ছুঃখের কাটে। সারারাত খড়কুটো জালিয়ে একটুকরো কাপড়ে কান ঢেকে তারা সারারাত কাটায়। তাদের কথা শ্রবণ করে, কবি লিখেছেন :

হে সূর্য

তুমি আমাদের সঁাতসেঁতে ভিজে ঘরে

উত্তাপ আর আলো দিও,

আর উত্তাপ দিও

রাস্তার ধারের ওই উলঙ্গ ছেলেটাকে।

আধুনিক কবিতার সূচনা নজরুল, মোহিতলাল ও যতীন্দ্র সেনগুপ্তের কাব্যে। নজরুল চড়া-গলায় অসাম্য ও অত্যাচার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে সাম্যবাদী কবিতাসমূহে মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেছেন। মোহিতলাল দেহ-সন্তোগের কথা উল্লেখ করেছেন আর যতীন্দ্রনাথ প্রচলিত আনন্দ-বাদের প্রতিবাদে প্রকাশ করেছেন ছুঃখবাদের কথা। এই কবিদের কবিতায় আধুনিকতার পদক্ষেপ। তাঁদের কাব্যের স্থায়ী মূল্যায়ন হবে যে তাঁরা রবীন্দ্র-সামীপ্যে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন। নজরুলের প্রেম, প্রীতি ও প্রকৃতি-অনুরাগের স্বর, মোহিতলালের ক্লাসিক রীতি ও যতীন্দ্রনাথের জীবনানুসঙ্গ ও সৌন্দর্যপ্রীতি তাঁদের রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের সন্নিবিষ্ট উপস্থিত করেছে। পূর্বোক্ত কবিদের মধ্যে জীবনমুখীনতার স্বর তাঁদের রচনায় আধুনিকতা প্রকাশ করেছে।

একদিকে যেমন ছন্দ অতীতকে তেমনি চিত্রকল্পের প্রয়োগ আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য। ক্লাসিক রীতি ত্যাগ করে ঞ্চামলী পুনশ্চে যে নতুন চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তা কাব্যের নতুন স্তরের পক্ষে অপরিহার্য।

ছুলে উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে

অন্ধকার পিণ্ডগুলো

দল-পাকানো প্রেতের মতো।

অথবা

আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ভোঁবা

অথবা

মোটা মোটা কালো মেঘ

ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন।

আধুনিক কবিতার চিত্রকল্প বাস্তব, দৈনন্দিন জীবনের অর্থবহ। জীবনানন্দের
কবিতায় পাওয়া যায় :

শুয়েছে ভোরের বোদ ধানের উপর মাথা পেতে

অলস গেষ্যের মতো এইখানে কাতিকের খেতে।

আবার রবীন্দ্র-অম্বারী চিত্রকল্পও আছে :

আমরা দেখেছি যারা স্থপতির মারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ

প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ।

সমর সেনের চিত্রকল্পগুলি যেরূপ বাস্তব তেমনি মৌলিক। যে অঙ্ককারে
মাহুয আপন নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে তার পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছেন, হিংস্র
পশুর মত অঙ্ককার এল। যে প্রেমে আত্মদান নেই, আছে কামনার কলুষতা
তাকে রাহুর সঙ্গে তুলনা না করে কবি বলেছেন :

তোমাকে পাবার বাসনা

বিষাক্ত সাপের মতো।

সন্ধ্যার অঙ্ককারের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শঙ্কনের মতো।

নরেশ গুহ বর্ণনা করেছেন :

কর্কশ কঞ্চল ঘেরা অপ্রসর শয্যাভরা রাত

নিয়ে বসে আছি জেগে।

ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা :: বীরবল ও বাংলা সাহিত্য

ছ' টাকা

চার টাকা

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ ৬০০ ॥ বাংলা গল্পের শিল্পিসমাজ ৩২৫ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

৮০০ ॥

রবীন্দ্র-বিতাম :: রবীন্দ্র-মনীষা :: রবীন্দ্র-সমীক্ষা

৫০০ ॥

৫০০ ॥

৩০০ ॥

[সব সম্ভ্রান্ত পুস্তক-বিপণিতে পাওয়া যায়]

গ্রামসেবক রবীন্দ্রনাথ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতের শেষতম আদমশুমারি হয়েছে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে। তার নানা সমীক্ষা ইদানীং প্রকাশিত হচ্ছে। সমগ্র দেশে জনসংখ্যার হার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়েছে। ১৯৬১-র ১লা মার্চ ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার (মণিপুর, উত্তরপূর্ব সীমান্ত-অঞ্চল, নাগাভূমি ও সিকিম বাদে)। ১৯৫১-র ঐ তারিখে জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ২২ লক্ষ ২০ হাজার। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় লোক বেড়েছে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ অথবা ২১.৪২ শতাংশ। যে-সব অঞ্চলের হিসাব ১লা মার্চ আসেনি, সেগুলি যোগ করলে ১৯৬১-র জনসংখ্যা প্রায় ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ দাঁড়াতে পারে। ১৯৪১-৫১ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার ছিল, গত দশকে তা এর ৬১ শতাংশ বেশি হয়েছে। বর্তমান সংখ্যা ও গণনা থেকে বোঝা যায়, ভারতের এই বিশাল জনসমুদ্রে প্রতি বছর আরো আশী লক্ষ লোকের আবির্ভাব। জন্মহার না কমা ও মৃত্যুহার অস্বাভাবিক হ্রাস—এই দুই কারণে ভারতের জনসংখ্যা এই অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়ে চলেছে।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আদমশুমারিতে নানা বিস্ময়কর ফল দেখা গিয়েছে। তার অগ্রতম—সমগ্র দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও শহরাঞ্চলে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপ্রত্যাশিত স্বল্প হার। ১৯৬১-র গণনায় দেখা গেল ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ লোক শহরে বাস করে, সমগ্র দেশের তুলনায় তা হ'ল ১৭.৮৪ শতাংশ মাত্র। অবশিষ্ট সকলে বাস করে গ্রামাঞ্চলে। গত দশ বৎসরে শহরের লোক বেড়েছে মাত্র ১ কোটি ৫৪ লক্ষ। অবশ্য ১৯৫১ ও ১৯৬১-র আদমশুমারিতে শহরের সংজ্ঞা এক ছিল না। ১৯৬১-তে গৃহীত সংজ্ঞা সংকীর্ণতর। ফলে ১৯৫১-র হিসাবে যেসব স্থানকে শহর বলা হয়েছে ১৯৬১-তে তারা বাদ পড়েছে। জনসংখ্যা পাঁচ হাজার ও তার বেশি, প্রতি বর্গমাইলে ঘনবসতি এক হাজার ও তার বেশি, প্রাপ্ত-বয়স্কদের কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশের কৃষি ভিন্ন অন্য কর্মে নিয়োগ—এই তিনটি আবশ্যিক লক্ষণযুক্ত স্থানকে ১৯৬১-র গণনায় শহর বলে ধরা হয়েছে।

১৯৫১-র সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমানে শহরবাসীর জনসংখ্যা হ'ত ৭ কোটি ৯২ লক্ষ। সুতরাং স্থূল হিসাবে বলা যায়, এই মুহূর্তে ভারতের লোকসংখ্যা ৪৪ কোটি, তার মধ্যে গ্রামে বাস করে ৩৬ কোটি। এই বিপুল জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে বাস করে। ১৯৫১-৬১ : এই দশকে মোট জনসংখ্যার তুলনায় শহরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার মাত্র ১৮.৩ শতাংশ।

সুতরাং আজো ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ। সমগ্র দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামজীবনকে আশ্রয় করে আছে। বিগত ছুটি পরিকল্পনার দশটি বছরে ভারতে শিল্প-উদ্যোগ দ্রুতহারে বিকশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশ গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। সমগ্র দেশে জমিদারী-ব্যবস্থা উৎখাত হবার পর কৃষিপ্রধান অর্থনীতির উন্নতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তেছে। কৃষি ও সমবায়, ভারতের সামগ্রিক উন্নতিতে শিল্প-উদ্যোগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

গত দশ বছরে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গেছে—এই কথা উপরি-ধৃত পটভূমিতে সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় না। শ্রীনেহরুর উক্তি অঙ্গসরণ করে বলা যায়, আমরা গরুর গাড়ির যুগ থেকে সাইকেলের যুগে পৌঁচেছি। সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ, খামার, সেচ, সার, যান্ত্রিক উপায়ে ট্রাক্টরের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ, শস্ত রোপণ ও মাড়াই, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প, গ্রামাঞ্চলে স্থলভে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন, মহাজনি ও জমিদারির শূন্যস্থানে সামবায়িক কৃষিব্যাবস্থা ও বিপণন-সংস্থার প্রতিষ্ঠা—এই সবের উপরেই আজ গ্রামপ্রধান ভারতের তথা সমগ্র দেশের উন্নতি নির্ভরশীল।

অধুনা গ্রামাঞ্চলে আর্থনৈতিক উন্নতির জগ্ন য়ে-সব পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, তার ভিত্তি ডেভেলপমেন্ট ব্লক ও গ্রামশাখা এক্সটেনশন ব্লক। ভারতের সর্বত্র আজ ডেভেলপমেন্ট দফতরের মাধ্যমে গ্রামজীবনের রূপ বদলানোর চেষ্টা চলছে। এই কাজে নিম্নতম ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মীর নাম গ্রামসেবক। মুখ্যত তাঁরই উপরে গ্রামীণ অর্থনীতির নিঃশব্দ বিপ্লবসাধনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

গত শতাব্দের শেষ দশকে (১৮৯১) পাবনা রাজশাহী ও নদীয়া জেলায় ঠাকুর-পরিবারের বিস্তীর্ণ জমিদারিতে এবং বর্তমান শতাব্দের তৃতীয় দশকে বীরভূমের স্বকলে শ্রীকৈতনে পল্লীসংগঠন বিভাগে (১৯২২) রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গ্রামসেবক রবীন্দ্রনাথের এই

কর্মসাধনার বিস্তারিত পরিচয় অধুনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ ব্যক্তিদের নানা রচনা ও কবির লেখা নানা ভাষণ ও পত্র থেকে গ্রামসেবক রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় ধীরে ধীরে আমাদের চক্ষুগোচর হচ্ছে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ‘বদেশীসমাজ’ প্রবন্ধে ও পাবনায় অল্পস্থিতি প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে, বিশেষ করে কংগ্রেস-নেতাদের গ্রামোন্নতির পথে আহ্বান করেন। তার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ‘নিভূতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়’ গ্রামসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র-পত্নী অবলা বসুকে লিখিত এক পত্রে কর্মী রবীন্দ্রনাথের মনোভাব জানা যায় :

“আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারির মধ্যে পল্লীগঠনকার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েকজন পূর্ববন্ধের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করবার চেষ্টা করছে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উত্তোগ হচ্ছে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন স্থগভীর নিরুত্তম যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাভাব্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়—ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু যারা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবারেই মগ্নমে গলা চড়িয়ে এই-সকল শব্দ ঘোষণা করেন তাঁরাই এই বিষয়টাতে সকলের চেয়ে নিশ্চেষ্ট। এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করছেন, কাজেই আমার মতো জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নামতে হয়েছে। আমি সভাস্থলের আস্থানে আর সাড়া দিচ্ছি নে—কিন্তু সেইজন্তই দেশের যেটি সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্ত আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা যখন ফিরে আসবেন—আশা করছি ততদিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে।” [এপ্রিল, ১৯০৮]

[চিঠিপত্র ৬, ‘পল্লীপ্রকৃতি’, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ: ২২৯]

এই ব্যক্তিগত পত্রে রবীন্দ্রনাথের গ্রামসেবার সংকল্প ও আন্তরিকতা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। গত-শতাব্দের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের পল্লীবাস

তঁার গ্রামোন্নতির প্রত্যক্ষ প্রেরণা। সে প্রেরণা তঁাকে বাকি জীবন কাজ করার প্রেরণা দিয়েছিল।

ঐ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত আর-এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

‘যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্টি হয়ে ওঠে—পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, শালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্ত ধর্মগোলা বনায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়—তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।’

এই কাজে রবীন্দ্রনাথ তঁার সকল অর্থ শক্তি সময় নিযুক্ত করেছিলেন। মঙ্গলীকান্ত দাস-রচিত ‘রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থে গ্রামসেবক রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কর্মসাধনার পরিচয় বিধৃত আছে। ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী ও বগুড়া জেলায় বিস্তৃত ঠাকুর-পরিবারের কালিগ্রাম পরগণায় এক বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এই কর্ম প্রসারিত হয়েছিল। এই কর্মসাধনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, অতুল সেন, ভূপেশচন্দ্র রায়, উপেন্দ্র ভদ্র, বিবেকেশ্বর বসু। অতুল সেন-প্রদত্ত বিবরণীতে জানা যায়, এই বিচিত্র গ্রামোন্নয়ন কর্মসাধনার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ পাঁচটি : (১) যথাযোগ্য চিকিৎসাবিধান, (২) প্রাথমিক শিক্ষাবিধান, (৩) পাবলিক ওয়ার্কস্, অর্থাৎ কুপখনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার, (৪) ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা, (৫) শালিসীবিচারে কলহের নিষ্পত্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্মৃতি’ [‘রবীন্দ্রায়ণ’, দ্বিতীয় খণ্ড] গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই কর্মসাধনার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষান্তে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফেরামাত্রই তঁার পিতা তঁাকে পাবনা জেলার শিলাইদহে নিয়ে গেলেন এবং গ্রামোন্নয়ন-কর্মে নিযুক্ত করলেন।

নদীয়ার বিরাহিমপুর ও রাজশাহীর কালিগ্রাম পরগণায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেন। বিচারসভার উপরে আপীল-সভা। সমস্ত পরগণার জন্ত পাঁচজনকে নিয়ে ‘পঞ্চপ্রধান’ আপীল-সভারূপে যাবতীয় বিবাদ মীমাংসা করত। সরকারী আদালত ছেড়ে প্রজারা বিচারসভার কাছেই সুবিচারের আশায় যেত। কুষ্ঠিমাতে বয়নশিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।

রাজশাহীর কালিগ্রাম পরগণাতেই রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন-সাধনা

অধিকতর সাফল্য লাভ করেছিল, কেননা সেখানকার প্রজাদের মধ্যে একনিষ্ঠতা ছিল। পরগণার সমস্ত প্রজারা মিলে এক সমিতির নির্বাচন করে— ‘কালিগ্রাম হিতৈষী সভা’। এর অধীনে তিনটি বিভাগের জন্তে ‘বিভাগীয় হিতৈষী সভা’ স্থাপিত হয়। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সাধারণ সভা নির্বাচিত করে। হিতৈষী সভার সাধারণ ফণ্ড-এ প্রজাদের স্বেচ্ছাদত্ত টাকা জমত। এই টাকার সঙ্গে জমিদার-প্রদত্ত মোটা অঙ্কের অর্থসাহায্য যুক্ত হয়। এই টাকায় বিদ্যালয় ডিসপেনসারি ও সালিশের কাজ চলত। ইস্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাস নির্মাণের ব্যয় রবীন্দ্রনাথই বহন করেন। পতিসরে ডাক্তারখানা (ডিসপেনসারি) স্থাপিত হয়। সাধারণ ফণ্ড-এর টাকায় কালিগ্রাম পরগণায় কয়েকটি রাস্তা নির্মিত হয়। পতিসর থেকে আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল সদর রাস্তা জমিদারির টাকায় নির্মিত হয়। হিতৈষী সভা কৃপাধন, পুকুর সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার, সাঁকাই প্রভৃতি কাজে হাত দেয়। পতিসরে ধর্মগোলা স্থাপিত হয়। শিলাইদহ কুঠিবাড়ি-সংলগ্ন জমিতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে চাষের নোতুন নোতুন পরীক্ষা শুরু হয়। তার ফলে আলু টমাটো ভুট্টা আখ প্রভৃতি money-crop-এর চাষ শুরু হয়। পদ্মানদীতে ধরা উদ্ধৃত্ত ইলিশ মাছ নামমাত্র মূল্যে কিনে ছুন দিয়ে মাটিতে পুতে রেখে বৎসরকাল পরে চমৎকার সার পাওয়া গেল। সেই সার চাষের পক্ষে সহায়ক হল। তাছাড়া আনারস কলা খেজুর চাষও প্রবর্তিত হল।

এই বিচিত্র কর্মে পিতা-পুত্র সহকর্মীরূপে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কালিগ্রামে ট্র্যাক্টর ব্যবহার করেন। কালিগ্রামে কুটিরশিল্পের প্রবর্তন করা হয়। পতিসরে বয়নশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাছাড়া ধানভান্ডা কল, ছাতা ও মৃৎশিল্পে চাষীদের উৎসাহ দেওয়া হয়। এছাড়া কালিগ্রাম পরগণার প্রতি গ্রামে একটি করে পাঠশালা ও পতিসরে একটি হাইস্কুল খোলা হয়।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন-সাধনার শেষ ও প্রধান কীর্তি পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্ক। সারাজীবন দেনায় আবদ্ধ চাষী পল্লীজীবনের উন্নতির পক্ষে প্রধান বাধা। এই বাধা দূর করার জন্তু রবীন্দ্রনাথ যে-চেষ্টা করেছিলেন, তার পরিচয় দিতে গিয়ে উক্ত প্রবন্ধে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“সে সময়ে শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্তু তাঁকে যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে। তবু প্রজাদের দুঃখনিবারণের জন্তু কিছু চেষ্টা না করে তিনি থাকতে

পারলেন না। বন্ধুবান্ধব ও দু'একজন ধনী মহাজনের কাঁছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি কৃষি-ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন! এই ব্যাঙ্ক যে মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল সবই ধার-করা টাকা—ধার করতে বাবাকে শতকরা ৮ টাকা সুদ দিতে হচ্ছিল। বাবা নিয়ম করলেন প্রজাদের কাছ থেকে ১২ টাকা সুদ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচা দিয়ে ও অনাদায়ী টাকার হিসাব করলে ব্যাঙ্কের কোনো লাভই থাকে না। তবু ব্যাঙ্কের কাজ এইভাবে চলতে থাকল। মূলধন সামান্য তাতে প্রজাদের চাহিদা সংকুলান করা সম্ভব হল না। এর জন্ত বাবা যখন খুবই চিন্তিত তখন আকস্মিকভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। নোবেল গ্রাইজের এক লক্ষ আট হাজার টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। টাকাটা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, অথচ প্রজাদের হিতার্থে কাজে লাগাতে পারলেও তিনি খুশি হন। এই দোটানার মধ্যে তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কি করবেন। সুরেনদাদা ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে গ্রাইজের টাকাটা পতিসর কৃষিব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে। এতে দু'দিকেই উপকার করা হবে। তাই করা হল। যতদিন কৃষি-ব্যাঙ্ক ছিল বহুবছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। ব্যাঙ্কেরও সুবিধা হল এই মূলধন পেয়ে। কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্তৃ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালিগ্রাম পরগণার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমন-কি কয়েকজন কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেলে ঋণমুক্ত হবার। কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural Indebtedness এর আইন প্রবর্তন হল। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় হবার উপায় রইল না—নোবেল গ্রাইজের আসল টাকা সেইজন্ত কৃষি-ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে ফেরত দিতে পারে নি।

এই বর্ণনা গ্রামসেবক রবীন্দ্রনাথের পরিচয়কে সম্পূর্ণ করে তুলেছে।

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত রাজশাহী মদীয়া-পাবনায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ চালিয়েছিলেন, তা কালক্রমে বীরভূমে স্থানান্তরিত হল। রাজশাহীর কালিগ্রাম থেকে বীরভূমের স্কুল : কর্মী রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক নোতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে স্কুলের শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন-বিভাগের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এই পর্বে

রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন এল. কে. এলমহার্‌স্ট, কালীমোহন ঘোষ, সন্তোষবিহারী বসু, সি এফ অ্যাণ্ড্‌জ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগদানন্দ রায়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণে যান। ‘রাশিয়ার চিঠি’তে সংকলিত পত্রগুলে তিনি বলেছেন, ‘আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে’, আরো বলেছেন, ‘আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে।’

বলাবাহুল্য, শ্রীনিকেতনের কর্মসাধনার ভিত্তি সমবায়। এইখানেই গ্রামের মুক্তি—এই কথা রবীন্দ্রনাথ সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন। ‘রাশিয়ার চিঠি’র চতুর্থ পত্রে তিনি লিখেছেন—

“যখন একথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্তে কলম কানে গুঁজে একথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই একাজে লাগল।”

পুনশ্চ, দ্বিতীয় পত্রে লিখেছেন—

“এটা খুব করে বুঝছি, আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে এখানে ছোটো আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত।……নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে; তার চেয়ে বড়ো কথা সাগনে এসেছে।”

স্বায়ত্তশাসন, আত্মনির্ভরতা, সমবায়নীতি—গ্রামোন্নয়নের এই আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিলেন। রাশিয়া-ভ্রমণের চার বছর পরে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

“ইউরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়—চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের যুত্যা আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা—ব’লে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্বীর প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি—না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু ঝাঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে, আমার ভরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার—ওই গ্রামের কাজে। এতদিন পরে মহাআজি হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকাব্য মাল্লুখ, তাঁর পদক্ষেপ খুব

স্বদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক স্বযোগ পেরিয়ে গেছেন, অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল—একথা আমি বারবার বলেছি। আজ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। স্পষ্ট না বলুন, এর অর্থ এই যে, কংগ্রেস জাতিসংগঠনের মূলে হাত দিতে অক্ষম। যেখানে কাজের সমবায়তা স্বল্প সেখানে নানা মেজাজের মানুষ মিলনে অনতিবিলম্বে মাথা ঠোকাঠুকি করে মরে। তার লক্ষণ নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী কাজ কেউ করতে পারে না। আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারিনি। এই কথা মনে রেখো, পাবনা কনফারেন্স থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার করে এসেছি। আর, শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসংজীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে—ফলের কথা আজ কে বিচার করবে? ইতি ১৫ নবেম্বর ১৯৩৪”

[‘পল্লীপ্রকৃতি’, পৃ. ১২৭]

রবীন্দ্রনাথের এই গভীর বেদনাপূর্ণ পত্রে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফাঁকি যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই কর্মী রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী কর্মসাধনার সংকল্প প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৮ থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে—এই ছাব্বিশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে গ্রামসাধনার পথে আহ্বান করেছেন ও বাস্তবে তার রূপদানে আত্মনিয়োগ করেছেন।

‘শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি’ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত সন্তোষপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের এই দিকের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে, কাব্যসাধকরূপে নয়, গ্রাম-সেবকরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের রূপটি এই সন্তোষে তুলে ধরেছেন।

আশ্চর্য এই সন্তোষ! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

“আমার গত জীবনের আনন্দ উৎসাহ সাহিত্য, সবই পল্লীজীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে। তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মনদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ, এবং কতোবড় অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের

মাহুঘের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে।.....

তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখদুঃখ ও বেদনার কথা একে একে প্রকাশ করেছিলাম।.....

সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই-সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মাহুঘ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। ...

আমার অননিহিত গ্রামসংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।.....

আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সাংগাত সন্ধান ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্ত তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্বপ্রকাশ করবার মতো আমার কিছুই নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি, তা আমি ভুলতে পারিনি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অন্তর্ধান করেছি।.....

আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে; এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনই দেখতে পাবেন।”

[‘পল্লীপ্রকৃতি’, পৃ. ১৭০]

গ্রামসেবক রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে আজ আমাদের সাড়া দিতেই হবে। স্বাধীন ভারতকে যদি উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হয় তবে সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। এই কঠোর বাস্তবকে, নির্মম সত্যকে, বেদনার চিত্রকে অস্বীকার করার কোনো পথ নেই। গ্রামসেবক কর্মী রবীন্দ্রনাথের বিচারক হবার স্পর্ধা আমাদের ঘেন কখনো না হয়, তাঁর পথানুসারী ঘেন আমরা হতে পারি, এই সংকল্প আজ আমাদের বলদান করুক। ছত্রিশ কোটি গ্রামবাসীর সমৃদ্ধিতে দেশের সমৃদ্ধি, তাদের অবনতিতে দেশের অবনতি—এই সত্য আজ আমাদের চিত্তপটে ফুটে উঠুক। স্মরণ করি রবীন্দ্র-বাণী : ‘গ্রামই আমার ভারতবর্ষ’ ॥

যদি পড়তেই হয়

বেঙ্গল-এর বই.....

গম্পা নয়, কল্লনাও নয়

শুদ্ধসত্ত্ব বস্ত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মশাই

বরাবরেষু,

আপনাকে আর ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না মশাই! আপনি যে ভেতরে ভেতরে এমন সর্বনাশ করে বসছেন—তা কি আগে জেনেছি? আপনার কাগজটি পড়ি আর ভাবি আপনি বোধহয় এই পোড়া বাংলা দেশটার দোষত্রুটি গলদ-মলদ—সব কিছু চোখে আঙ্গুল দিয়ে ঠিক না দেখালেও গলায় হাত দিয়ে দেখাবার জন্তে সচেষ্ট হয়েছেন। এরকম ভুল বুঝে—আমিও মনে মনে সিদ্ধান্ত করেছিলাম বাঙালীর অমর্যাদা দূর করার ব্রত গ্রহণ করবো।

এই ব্রত-সংকল্পই আমার কাল হয়েছে মশাই! কাল কি করে বলি—কালশিরের কারণ বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়! তাই একটা জিজ্ঞাসার উত্তর আপনার কাছে চেয়ে এই পত্র লিখছি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোনো কাজ ছিল না। অল্প সময়ও কাজ যে আমার বড়-একটা থাকে—এমন ভাববেন না। তবে যে বাড়ীতে থাকি সেখানে মাঝেমধ্যে এটা-সেটার কন্ট্রোল লাইনে দাঁড়াতে হয়, আজ গুঁড়ো দুধ কি কাল কয়লা—এ ত'লেগেই আছে, এখন আবার কাটা পোনা মাছের জন্তেও লাইন। সে কথা যাক। যে বয়সে বেকার বলা অগৌরবের অন্ততঃ আত্মগ্লানির, আমার বয়সটা সেই সীমারেখাও পার হয়ে গেছে। ছুপুরেই আহাঁরাদি সেরে বেরিয়ে পড়ি পথে। দক্ষিণ-কোলকাতা থেকে কোনদিন গড়ের মাঠের দিকে, কোনদিন বা লেকের চারিদিকে ঘুরে বেড়াই! না, ঠিক স্বাস্থ্য তৈরীর উদ্দেশ্যে নয়, বরঞ্চ বলতে পারেন—‘কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে।’

ঘটনার দিনটিতে গিয়েছিলাম আউট্রাম ঘাটের কাছে। উজ্জল গঙ্গার ধারে শহরে বাবুদের ঘুরঘুর ভাব; শুধু বাবুদের নয়, বাবুনীদের। ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছে। বেশ লাগছিল বেড়াতে।

জানেন সম্পাদক মশাই, ‘এক পা দুই পা করি ধীরে ধীরে অগ্রসরি’ একটা নির্জন জায়গার দিকে এগিয়ে গেলাম। একটু দূরে দূরে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, বেশীর ভাগই মনে হয় স্নানাস্থানভর গাড়ী, আরোহীরা নেমে বোধহয় ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে স্নান্য আরামে রত। বেকার লোকের যা হয়—কোতুহলপ্রবণতার জন্তেই মরেছি মশাই। ছেলেবেলা থেকে আমার এই এক রোগ।

হ্যাঁ, যা বলছিলেন।

মনে হল যেন বাঙালী একটি তরুণী, আর এই তরুণীটির পিছু পিছু যাচ্ছে যে লোকটি তাকে ভিন্ন প্রদেশবাসী বলে মনে হল। সাজে-পোষাকে লম্বা চওড়ায় দেহের জেল্লা-জোলুখে মনে হল বেশ ধনী।

আমি চমকে উঠলাম। সর্বনাশ—বাঙালী ওই তরুণীটিকে ঘরের বার করেছে নাকি? একটু লক্ষ্য রাখতে হয়! বাঙালী হিসেবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার খাচ্ছি, মার খেতে খেতে অবশেষে—

হ্যাঁ, লোকটির মতলব সাধু নয়! সে-ও একটু চায়া গাছের আড়াল খুঁজছে। তরুণীটিকে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে! তরুণীটি কি ভয় পেয়েছে নাকি? কই সে ত’ টেঁচাচ্ছে না?

আমি দুর্বল বাঙালী, স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই—আমি ভেতো অকর্মণ্য বাঙালীও বটে! কিন্তু এ সময় আমার মধ্যে একটা কি বলবো, মানে—মানে—একটা বীরত্ব জেগে উঠলো। আমি হয়তো আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না, সম্পাদকমশাই, মানে যাকে বলে শিভালুরি, হ্যাঁ শিভালুরি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো!

গোয়েন্দাগিরি করার সহিষ্ণুতা নেই, একটু দূরে দাঁড়িয়ে যে আমার লক্ষ্যবস্তুর বিভাব অল্লেখ্য আলম্বন ইত্যাদির জন্তে অপেক্ষা করবো, সেটুকু ধৈর্য দেখাতে পারলাম না! আমি জিনিসটা একদিক থেকে বলতে গেলে কাঁচিয়ে ফেললাম। চেষ্টা করে উঠলাম—বিশ্বাস করুন, অভদ্রভাবে শিস দিয়ে চ্যাঁচডামি করে নয়, রীতিমতো ‘বাঁচান বাঁচান’ করে। লোকটি তরুণীটিকে সাবধানে ও সতর্কতায় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন—একটা ছোট্ট চারাগাছের আড়ালে। সাহিত্যিক বর্ণনায় বললে বোধহয় এই রকম দাঁড়াবে যে লোকটা সিংহের মতো শিকারকে নিজের কুক্ষিগত করে ত্রুন্ধদৃষ্টিতুলে আমার দিকে তাকাতে লাগলো।

আমি একেবারে জাত বেকার, মশাই; ঘাবড়াবার ছেলে নই।

যতই সেই অগ্নিকল্ল চোখের শামানি দেখি, ততই আমার গলার জোর বেড়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে কি রকম লোক জমে গেল মশাই। খেলার মাঠে ছুঁড়ে খেলা থাকলে যেমন নরমুণ্ড শুধু কিলবিল কিলবিল করে, ততলোক না হলেও ভিড় বেশ মোটা রকমের হলো। সকলের চোখে মুখেই সম্ভ্রান্ত জিজ্ঞাসা—কি হয়েছে মোহাই, কি হয়েছে দাছ!

কে কাকে জিজ্ঞাসা করছে বোঝা যাচ্ছে না! একটা কিছু হয়েছে সবাই বুঝলে। গাড়ী চাপা পড়তে পারে, সর্পাঘাতে কেউ শেষবারের নিঃশ্বাসটুকু ফেলে স্বস্তি পেতে পারে, পালানো কোনো যুবতীকে খুঁজে পেয়েছে তার অভিভাবক, এমনও হতে পারে। কিম্বা বিনামূল্যে কোনো মৌনীবাবা হয়তো বাতবেদনাবিনাশক মাছুলী বিতরণ করছেন!

আমি আব্দুল দিয়ে অকুস্থল দেখাবার আগেই দেখা গেল আমার চেয়ে অধিকতর উৎসাহী ব্যক্তির। সেই লোকটিকে ও আর তার সঙ্গে, বাহুল্য দোষ ধরবেন না, দোহাই সম্পাদকমশাই, সেই মেয়েটাকেও টেনে বের করে আনলে লোকালয়ে।

হ্যাঁ, যা ধারণা করেছি ঠিক তাই। মেয়েটি বাঙালী, তরুণী। লম্বা ঝোলানো বেণী, অঙ্ককার রাত্রে শুধু ওই বেণীটুকু চোখে পড়লে সাপ বলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। মুখটি পরিষ্কার, চোখ দুটি টানা নয়, কিন্তু পেন্সিল দিয়ে রঙ করে দীর্ঘায়ত করার চেষ্টা হয়েছে। কপালে দু'একটি চূর্ণ কুস্তলকে বক্র রেখায় বৃত্তাকার করা হয়েছে। দেখতে, জানেন সম্পাদকমশাই, মানে মন্দ নয়।

জেরা করা ততক্ষণে শুরু হয়েছে। লোকটিকে প্রথমে, আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটিকে। লোকটিকে ভ' এই মারে সেই মারে! আমি তখন একেবারে থ' বনে গেছি। তিল থেকে তাল হওয়ার প্রবাদ বাক্যটা ভাবতাম কথার কথা, কিম্বা তিল তিল দ্রব্য জমিয়ে তালের মতো করা যায়, এখন দেখছি তিলই তাল হয়!

জানেন সম্পাদকমশাই, লোকটির কোনো অঙ্কহানি হয়নি। একটা হাত বা পা খুলেও নিতে পারতো আমার উৎসাহী বন্ধুরা। কিন্তু কেন জানিনা উত্তম-মধ্যমের কয়েক পর্দা পর্যন্ত চড়িয়ে তারা লোকটাকে মুক্তি দিলে, কিম্বা শিকার ফেলে সিংহ মহোদয় পালিয়ে বাঁচলে তা বোঝা গেল না।

এবার নাগিকা-পর্ব নাটকের পালা। এখানেই যথার্থ শিত্যলুপ্তি এবং

নায়িকা শোভনদর্শন তরুণী বলে স্বাভাবিক কারণেই মানুষ-জনের উৎসাহ বেশী। বাঙালী এখনো মরেনি মোহাই, (সম্পাদকমশাই, লক্ষ্য করবেন মশাইকে 'মোহাই' বলার দল তখনো পর্যন্ত অদম্য উপচিকীর্ষায় অকাতর হয়ে আছেন) মাছ খেতে পাই না বলে যে মা-বোনকে বিকিয়ে দেব, সেটি ভাববেন না।

আশ্চর্য এদের লজিকবোধ! কোথায় শিভ্যালুরি আর কোথায় মস্তবিতৃষ্ণ। যাই হোক, মেয়েটাকে ত' উদ্ধার করা গেল।

তরুণীটি দেখতে শুভেতে যে মন্দ—এমন কথা কোনো আহম্মক কি খুব বড় ধরনের মিথ্যুকও বলবে না। আর যেহেতু মেয়েটির মুখের দিকে ভাকানো যায়, এবং তাকালে ভালই লাগে, সেই জন্তে মেয়েটিকে ঘিরে কি জেরা! কিন্তু জেরা করে বিশেষ কিছু জানা গেল না—শুধু এই খবর পাওয়া গেল যে মেয়েটির বাড়ী দক্ষিণ কোলকাতায়, মনোহরপুরের ছাড়িয়ে কোন্ এক গলি বেরিয়েছে—সেখানে!

পোড়া কপাল আমার—আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—আরে আমারও বাড়ী ওই মহলায়। আমিও সাউথ ক্যালকাটায় থাকি! কালিঘাট আছে, —না, ওই মনোহরপুরেরই কাছাকাছি—

তা হলে ত' ভালই হল মোহাই, আপনিই পৌছে দিন না। আমি যে টালায় থাকি, নইলে এই উপকারটুকু কি আর অপরকে করতে দেবার স্বযোগ দিই মোহাই!

আরো ছ একজনের আক্ষেপের কথা শুনলাম। শালুকে থাকেন বলে একটি যুবক তরুণীটিকে এগিয়ে দিতে পারছেন না,—ফেরার বাস পাবেন না কিনা তাই—ইত্যাদি।

দশচক্রের রায়—আমিই এই নাটকের প্রধানগুরু; আমাকেই এ ঝঙ্কাট পোহাতে হবে। কি আর করি? অগত্যা রাজী হতে হলো।

ট্যাকে পরমা নেই। পদব্রজেই ফিরি, শরীরে মেদ লাগার সম্ভাবনা না থাকলেও মেদবাহ্য্য থেকে রক্ষা করি নিজেকে; একটি তরুণীকে ত' হাঁটিয়ে আনা যায় না, ট্যাক্সীতে করে আনার প্রস্নই ওঠে না! আমার সঙ্গে অচেনা মেয়েটি এক গাড়ীতে উঠবে কেন, আর কি জানেন সম্পাদকমশাই, অর্থনৈতিক সামর্থ্যও আমার নেই, বাসে কি ট্রামে করে আনবো, সে পরমাও নেই। তবু হাঁটিয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত নিয়ে আসা থাক—পরে যা হয় করা যাবে; ভিড় একটু ফাঁকা হলে নিজের অবস্থার কথা অকপটে বলেই ফেলা যাবে'খন।

জনমতের রায়, মেয়েটি গুট গুট করে আমার সঙ্গেই এগিয়ে আসতে লাগলো। নিজের একটু গর্ব হতে লাগলো, গৌরবও বোধ করলাম। একটা বাঙালী মেয়েকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব পালনের স্বর্গীয় একটা দীপ্তি আমার মুখটাকে বোধহয় চকচকে করে তুলছিল।

ক্যালকাটা ক্লাবের টেন্টের পাশ দিয়ে আসছি। ভিড় নেই—হুজুগে লোকেরা যে যার কাজে চলে গেছে। আমাদের পিছু নেয়নি কেউ। আপনি যদি আজ অন্ধকার মাঠের মধ্যে চলন্ত আমাদের দুজনকে দেখতেন—আপনার মনে হত সেই শ্রীমধুসূদনের কবিতায় আছে না—কপোত কপোতী যথা...আজ্ঞে হাঁ, ঠিক তাই।

কিন্তু না, না,—জানেন সম্পাদক মশাই, মেয়েটি তখন ঠাস করে সজোরে আমার গালে একটা চড় মেরে বললে—বুদু—আমি আপনার কোন ক্ষতি করলাম যে আপনি আমার এমন সর্বনাশ করলেন?

চড় খেলাম আমি, কিন্তু কৈদে ফেললে ওই মেয়েটি! ইতিপূর্বে কোনো তরুণীর কান্না আমি দেখিনি, শুনিনি! চপেটাঘাতেও বটে, আর এই পরিস্থিতিতেও বটে, আমি কেমনধারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম! মেয়েটি বললে—জানেন, সংসারে আমিই একা রোজগার করি। মা হাঁফানিতে শয্যাশায়ী, বাবার ক্যান্সার হয়েছে। ভাইবোন—মোট আটটি, সবাই ছোট ছোট, কেউ রিকেট, কেউ পোলিও রোগী। দুদিন ধরে সংসারে হাঁড়ি চড়েনি—আজকের খদ্দেরটা ছিল ভালো—আপনার জন্তে সে ভেগে গেল—

আমি চুপ কোরে গেলাম! সম্পাদকমশাই, আমি আপনাকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, বাঙালীকে কে বাঁচাবে?

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ-এর

তথ্য ও চিন্তাসমৃদ্ধ বই

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য

সাহিত্য ও শিল্পলোক

মোহিতলালের কাব্য-পরিক্রমা

দ্বারকানাথ ঠাকুর

(কিশোরচাঁদ মিত্রের Memoir of Dwarkanath

Tagore-এর অনুবাদ)

জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চা

॥ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

জর্জ টম্পসনের সহায়তায় নব্যবঙ্গ বাঙলা দেশে যে রাজনীতি-চর্চার সূত্রপাত করেন তা অবশেষে পরিণতি লাভ করে 'বেঙ্গলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায়। বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৮৪৩ সনের ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাটি বিশেষ করে স্মরণীয়। এ সন্ধ্যাতেই ৩১নং ফৌজদারী বালাখানা হলে সে যুগের এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী সংহতভাবে সমবেত হয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে।

সর্বসম্মতিক্রমে এ সভার সভাপতি নির্বাচিত হন মিঃ জর্জ টম্পসন।

জর্জ টম্পসন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, এ সভার বিশেষ কর্মসূচী হলো একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত কতকগুলো প্রস্তাবের বিচার। এ সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হোল ব্রিটিশ ভারতে মহারাণীর প্রজাদের অবস্থার উন্নতি সাধন। এ কর্তব্যটি এমনই গুরুতর যে এর জন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও চিন্তার প্রয়োজন। অচিরকালের মধ্যে যে বিষয়ে তাদের শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সে সম্পর্কে পূর্বকার একটি প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইতিমধ্যে উপস্থিত সভারা নিশ্চয়ই চিন্তা করবার যথেষ্ট সুময় পেয়েছেন—যে চিন্তার সাহায্যে তাঁরা সুবিবেচনার সঙ্গে ভোট দিতে সক্ষম হবেন। এ সভায় যে সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক না কেন—কেউ বলতে পারবে না যে সে সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত বা বিবেচনা না করে গৃহীত হয়েছে। এরকম একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথম কথাবার্তা হওয়ার পর তিনমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশের প্রতিশ্রুত মিত্র হিসেবে শেষ পর্যন্ত ধারা জনসাধারণের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করতে যাচ্ছেন—তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত তা তিনি নির্দেশ দিয়ে আসছেন। তাঁদের দৃঢ় চিন্তাকে এখন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করবার সময় এসেছে। তাঁর সামনে উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে এখন সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে—তাঁরা কাজ শুরু করবেন কি করবেন না। তিনি অবশ্য এটা বিশ্বাস করেন ধারা একবার এগিয়ে গেছেন তাঁরা আর

পেছুবেন না। কারো মনে কোন দ্বিধা থাকলে শেষ কথা দেবার আগেই তাঁরা সরে দাঁড়াতে পারেন।

মিংটম্পসন একটু বিস্তৃতভাবেই প্রথম প্রস্তাবের মর্ম বিশ্লেষণ করেন। তারপর তিনি ভারতবাসীর অদ্ভুত পরিবেশের কথা উল্লেখ করেন এবং এ দেশের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের যে সম্পর্ক রয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করে মহারাণীর প্রজাদের গ্রায্য দাবী যাতে সংরক্ষিত হয় সেদিকে শ্রোতৃবৃন্দকে মনোযোগ দিতে অহুরোধ করেন।

মিং জি. টি. এফ্‌ স্পিড্‌ প্রথম প্রস্তাব করতে গিয়ে ভারতের অপরিমেয় ভূমি-সম্পদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতের ভূমির যে উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে তা আংশিক মাত্র। যে দেশে এত প্রাকৃতিক সম্পদ সে দেশের কোন কর্মিষ্ঠ লোক দরিদ্র থাকবে কেন? ভারতবর্ষ যে শুধু নিজের অধিবাসীদের অভাব মেটাতে—তানয়, ব্রিটেনের সহস্র সহস্র লোকের সম্মানজনক কর্মক্ষেত্রেও হবে।...কৃষি বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি আছে—এ দেশের লোকের চাইতে কে বেশী তা বুঝবে? এদেশের আশু, প্রত্যক্ষ এবং স্থায়ী উন্নতি ব্যাপারে তাদের স্বার্থই সব চাইতে বেশী জড়িত। ভারতের আইনের, বাণিজ্যের ও সরকারী নীতির উন্নয়নের জন্ত যতই তারা চেষ্টা করবে—ততই ভবিষ্যৎ বংশীয়দের তারা মূল্যবান সম্পত্তি দিয়ে যাবে। প্রস্তাবে ইংলণ্ডের কথাও বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত সমিতির উদ্দেশ্য হবে মহান দেশের প্রকৃত মূল্যের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বর্তমানে অজ্ঞতাশযতঃ অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীহীন আইনের দ্বারা তাঁরা মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে উৎসাহ দিচ্ছেন বা কোন সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি করছেন। তাঁদের নিজের উপনিবেশের প্রতি তাঁরা গ্রায্যপরায়ণ হোন। তাহলে তাঁদের প্রস্তুত দ্রব্যের জন্ত বাণিজ্যকেন্দ্র পেতে তাদের কষ্ট হবে না। এবং প্রাচ্য দেশের উৎপন্ন দ্রব্য তাঁদের প্রয়োজন ও বিশ্বাসের খোরাক জোটাতে। বর্তমানে পরিকল্পিত একটি সমিতির প্রয়োজনীয়তা তিনি বহুদিন অহুভব করছিলেন। সেজন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি এ প্রস্তাব করেছেন যে :

১. “ভারতবর্ষের যুদ্ধপ অবস্থা এবং এতদেশের সহিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ও ইংলণ্ডীয় লোকদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে এ সভার মতে অত্রত্য ব্যক্তিদিগের সাধ্যানুসারে স্বদেশের সদবস্থা ও মৌভাগ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্তব্য।”

বাবু রামচন্দ্র মিত্র এ প্রস্তাব সমর্থন করবার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

২. দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন ক্রো নাংহেব নামক জর্নৈক ইংরেজ। সে প্রস্তাবের মর্ম এই :

“এতৎ সভার মত এই যে পৃথক পৃথক ব্যক্তির স্বতন্ত্র হইয়া দেশের উপকার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির একমত হইয়া যাহাতে রাজস্ব সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্ত এ সভা স্থাপিত করা গেল, ইহাতে জাতি ধর্ম, জন্মভূমি এবং পদের কোন প্রভেদ থাকিবেক না, সর্বপ্রকার মনুষ্য আসিতে পারিবেন।”

বাবু মধুসূদন সেন এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩. তৃতীয় প্রস্তাব আনয়ন করেন বাবু তারারাঁদ চক্রবর্তী। এ প্রস্তাব করবার জন্ত তাঁকে অল্পরোধ করতে গিয়ে সভাপতি বলেন :

এ প্রস্তাব উপস্থিত করবেন এমন একজন ভদ্রলোক থাকে বন্ধু বলে ভাবতে তিনি আনন্দিত। তিনি এমন একজন লোক—যাঁর আন্তরিক অথচ নিতৃত উত্তম, কোমল বিনয়নয়িতা, সদাশয় অল্পভূতি, অল্পান সততা তাঁকে সকলের নিকট আদ্যে ও প্রশংসার যোগ্য করেছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে তারারাঁদ চক্রবর্তী বলেন, বক্তা হিসেবে জনসমাজে দাঁড়াতে অনভ্যস্ত বলে প্রস্তাবটিকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা ছাড়া তিনি আর কিছু বলতে পারবেন না। যে কাজে তাঁর চতুর্পার্শ্বস্থ ব্যক্তির সমবেত হয়েছেন সে কাজের সার্থকতা দেখবার জন্ত তিনি খুবই আগ্রহান্বিত। এ কাজকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দেবার জন্ত তাঁর নিজের ক্ষুদ্র সাধ্য যা আছে—তা তিনি করবেন। তবে বক্তৃতার সাহায্যে নয়। সভাপতি তাঁর উদ্দেশ্যে যে অপ্রত্যাশিত প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন সেজন্তে তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তারপর তিনি প্রস্তাবটি পড়েন :

“এ সভার নাম ‘বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ রহিল। ইহাতে ভারতবর্ষের লোকদিগের অবস্থা, ব্যবস্থা এবং দেশের উপায় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সমূহের অল্পসন্ধান করিয়া তাবৎ ব্যক্তিকে অবগত করান যাইবেক, এবং সভ্যেরা আইন অল্পসারে লোকের মঙ্গল, অবস্থার উৎকৃষ্টতা ও ভিন্ন শ্রেণীস্থ মনুষ্যের কুশল চেষ্টা করিবেন।”

এ প্রস্তাব সমর্থন করেন বাবু চন্দ্রশেখর দেব। তাঁর বক্তব্যের পরে সমিতির নামকরণ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক উপস্থিত হয়। তারপর প্রস্তাবে যে নাম

ছিল অধিক সংখ্যক সভ্যের সম্মতিক্রমে সে প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অতঃপর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪. চতুর্থ প্রস্তাব আনয়ন করেন বাবু রামগোপাল ঘোষ। এ প্রস্তাবের মর্ম এই :

“এই সভার সভ্যেরা রাজবিদ্বেষী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করণ্ড ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।”

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে মন্তব্য করতে গিয়ে বাবু রামগোপাল ঘোষ বলেন,— এ প্রস্তাবটিকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে এজন্য যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং সরকারী আইনের প্রতি এ সভায় উপস্থিত সভ্যদের মনোভাবকে বিকৃত করে প্রচার করা হয়েছে। দু’তিন দিন আগে তিনিও বলেছেন যে মুসলমান সরকার ইংরেজ সরকারের চাইতে ভাল ছিল। এ মনোভাব যেমন হোক কিংবা তাঁর বাক্যের অর্থ বাই হোক—তিনি ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব ছাড়া আর কিছু কামনা করেন না। তিনি শুধু বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থায় উচ্চ রাজকর্ম দেওয়া ব্যাপারে মুসলমানদের উদারতার সঙ্গে ব্রিটিশের মনোভাবের তুলনা করেছেন। এ রকম একটা ঘোষণা জনসাধারণ-সম্পর্কীয় কোন ক্রটিপূর্ণ বা ক্ষতিকর আইনের সংবিধান অস্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সংশোধন-প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূল্যবান সংস্কারের তিনি পক্ষপাতী নদেহ নেই, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃক তিনি একজন একনিষ্ঠ এবং অস্বাভাবিক সমর্থক। যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে যা ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সম্পর্কে দুর্বল করে দিতে পারে—তিনি তেমন কোন ঘটনাকে তীব্রভাবে নিন্দা করবেন।

বাবু শ্যামাচরণ সেন এ প্রস্তাব সমর্থন করবার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

৫. বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন :

“যে সকল ব্যক্তির বয়ঃপ্রাপ্ত অথচ কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন তাঁহারা যদি সভার ব্যয় নির্বাহার্থ সাহায্য করেন এবং উপরিলিখিত প্রস্তাব সকল অন্তঃকরণ সহিত গ্রাহ্য করেন তবে এতৎ সভার সভ্য হইতে পারিবেন।”

বাবু রামগোপাল ঘোষ দুই কারণে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন : প্রথমতঃ যে বিদ্যালয়ের তাঁরা ছাত্র ছিলেন সে বিদ্যালয়ের মূল্যবান শিক্ষাগ্রহণের জন্ত তাঁদের সর্বসময় ব্যয় করা তাঁরা প্রয়োজনীয় মনে করতেন। কিন্তু একই সময়ে সমাজের প্রতি এবং কলেজের প্রতি কর্তব্য পালন করা তাঁদের পক্ষে

প্রায় অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় কারণ হল এই যে—এ সমিতির প্রকৃতিই এমন সময় সময় তা সরকারের বর্তমান মত থেকে ভিন্নমত পোষণ এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এ অবস্থায় তিনি চান না যে—সরকারী কলেজের কোন ছাত্র সমিতি হতে বহিষ্কৃত হোক কিংবা যাদের নিকট থেকে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করুক। এ অবস্থায় সরকারী কলেজের বহু ছাত্রের প্রতি প্রীতি থাকা সত্ত্বেও তিনি অপরিবর্তিত-ভাবেই এ প্রস্তাব সমর্থন করছেন।

প্রস্তাবটি সর্বসমক্ষে উপস্থিত করবার পূর্বে জর্জ টম্পসন বলেন, তিনি প্রস্তাবের উত্থাপক এবং সমর্থক—উভয়ের সঙ্গে একমত। ইতিমধ্যে সমিতির সাধারণ সভাপ্রণালী সর্বসাধারণের জন্য নিযুক্ত থাকবে। সে সমস্ত সভার কার্যাবলী থেকে তারা বিনা মতে এবং বিনামূল্যে শিক্ষা আহরণ করতে পারবেন।

অধিকাংশ সভ্যের সমর্থনে এ প্রস্তাব তখন গৃহীত হয়।

৬ ষষ্ঠ প্রস্তাব করেন মিঃ জি. টি. এফ. স্পিড্ এবং সমর্থন করেন প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রস্তাবের মর্ম এই :

“নিম্নলিখিত কমিটি উপরিউক্ত প্রস্তাবের সমালোচনার সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ এক পত্র, এবং সভার কর্মকারীর তালিকা ও কর্মনির্বাহের নিয়মাদি প্রস্তুত করিয়া ৪ঠা বৃহস্পতিবার রাত্রির সাধারণ সভাতে উপস্থিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর দেব, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু তারারচাঁদ চক্রবর্তী, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র।”

মিঃ টম্পসন সভাকে লক্ষ্য করে বলেন :

এ দেশে পদার্পণ কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী-সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই তাঁর মনে আকাজক্ষা ছিল ঠিক এ রকম একটি সাধারণ সমিতি দেখবার জন্য —যে সমিতি এখনই গঠিত হইল। অবশ্য একই সময়ে তিনি চাইছিলেন এ সমিতির প্রতিষ্ঠা যাতে বিলম্বিত হয়। এর কারণ এ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি বিবেচনা এবং পরিকল্পনার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তৃতার লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ইতিকর্তব্যকে তিনি ছোট করে না দেখিয়ে বরং বড় করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কারণ শেষ পর্যন্ত যারা মিলিত হবেন তাঁরা যাতে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তাঁদের স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব যেন তাঁরা উপযুক্তভাবে নির্বাহ করতে পারেন। অতএব যা করা হয়েছে তা স্বেচ্ছাতেই

করা হয়েছে। প্রত্যেক সভ্যকে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, যে কঠিন প্রয়াসকে স্বীকার করতে হবে, যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁদের এগিয়ে যেতে হবে—সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। যে কাজ গ্রহণ করে পরে অসুতপ্ত হয়ে তা ছেড়ে দিতে হবে—এরকম কোন কাজে কাউকেও প্রণোদিত করার জন্ত কোন সস্তা কৌশল অবলম্বন করা হয়নি। যশের অধিকারী হবে বলে কোন প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়নি। কোন সম্মান লোভ বা পারিশ্রমিকের প্রলোভন কাউকে দেখানো হয়নি।

শুধুমাত্র অপরের প্রতি কল্যাণমূলক কাজই তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ কর্তব্য করেন তাহলে তিনি যে লাভের অধিকারী হবেন—তা শুধু নৈতিক ও সামাজিক। এ লক্ষ্যের প্রতিই বাঁরে বাঁরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং তিনি বিশ্বাস করেন কেউ কাউকে সে সন্ধ্যায় ভোট দিতে জোর করেনি।

.....এ সমিতির সভ্যদের সব চাইতে বড় পুরস্কার হবে এর সমৃদ্ধি!... যতদিন তিনি ভারতবর্ষে থাকবেন ততদিন তিনি এ সমিতির একজন সহযোগী কর্মী থাকতেই সম্মানিত বোধ করবেন। এ সমিতির সাফল্যের জন্ত এমন কোন ব্যক্তিগত আরাম বা ভোগস্বথ নেই—যা তিনি বিসর্জন দিতে পারেন না।.....সমিতির প্রত্যেক সভ্য এমন ভাবে কাজ করুক যাতে তার ওপরই যেন সমাজের কল্যাণ নির্ভর করছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সভ্যের মধ্যে যেন পারস্পরিক একটা বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধা থাকে। সর্বোপরি একথা মনে রাখতে হবে—কোন সভ্যের গুরুতর বা স্বেচ্ছাচারী কোন কাজের জন্ত সমিতির মূল প্রকৃতির যেন ক্ষতি না হয়।

.....সকলের থেকেই আমাদের উপদেশ নেওয়া দরকার। প্রগাঢ় বিজ্ঞতার নির্দেশেই আমাদের কার্যক্রম স্থির করা উচিত। আমাদের পূর্বকল্পিত কোন ধারণার দ্বারা যদি আমরা পরিচালিত হই তাহলে অপরের উপদেশ থেকে আমরা বঞ্চিত হব। আমি আর কিছু বলতে চাইনে। তোমরা এখন প্রায় তোমাদের দেশের কাজে নেমে পড়েছ। ভগবান তোমাদের কার্যে সফলতা এনে দিন। তারপর তোমাদের কাজের দ্রষ্টা হওয়া যখন আমার সাধ্যাতীত হবে—তখনও আমি যেন তোমাদের সম্পর্কে স্তব্ধবর শুনতে পাই এবং তোমাদের সাফল্যে আমারও কিছু অংশ আছে বলে আমি যেন গৌরবান্বিত বোধ করি।

এভাবে জর্জ টম্পসনের ভারতে আসার উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ লাভ করলো।

২৫শে এপ্রিল ১৮৪৩ তারিখে 'বেঙ্গল স্পেকট্রেটর'-এর মন্তব্যে অতঃপর বলা হয়েছে :

“অনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল। সভাপতিও সভাহ ব্যক্তিদিগকে নমস্কার জানাইয়া কহিলেন—আমার প্রার্থনা এই যে সভার অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, আর আমি এ দেশেই থাকি বা দেশান্তরেই অবস্থান করি সর্বদা এ দেশের মঙ্গল চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকিব।

যে যে মহাশয়েরা এ সভার সভ্য হইতে বাসনা করেন আমরা তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা কমিটির নিকট স্ব-স্ব নাম প্রেরণ করুন, আমরা অনুমান করি যদবধি সভার কর্মকারক নিযুক্ত না হয় তদবধি কমিটি সভা সম্বন্ধীয় পত্রাদি গ্রহণ করিবেন।”

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

বাংলা ছোটগল্পের শতবর্ষের শতগল্প ১ম খণ্ড : ১৫'০০
অভিজাত সংকলন ২য় খণ্ড : ১২'৫০

যোগেশচন্দ্র বাগলের	নারায়ণ সাত্তালের	
বিজ্রোহ ও বৈরিতা	২'০০ ॥ অনাগী	৪'০০ ॥
প্রফুল্ল রায়ের	অধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের	
পূর্বপার্বতী (২য় মুঃ)	৮'৫০ ॥ প্রদক্ষিণ (২য় মুঃ)	৪'০০ ॥
	জরাসন্ধের	
ভাগিনী (৮ম মুঃ)	৫'৫০ ॥ ক্রিয়াদগু (৫ম মুঃ)	৬'৫০ ॥
	বনকুলের	
মানদগু (৪র্থ মুঃ)	৪'৫০ ॥ জগুর্ষি (৪র্থ মুঃ)	৬'৫০ ॥
শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের	কুমারেশ ঘোষের	
প্রাথমিক অলোবিভ্রান	৪'০০ ॥ সাগর-অগর	৩৫'০ ॥
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের	নলিনী দাশগুপ্তের	
চরণিক	৩'০০ ॥ বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা	৩'০০ ॥
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর	অবোধ ঘোষের	
আম্বুবের সঙ্গে	২'০০ ॥ শ্রেষ্ঠ গল্প	৫'০০ ॥
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের	কণাদ গুপ্তের	
প্রাণ ও প্রকৃতি	১'৫০ ॥ অবরোহণ	২'৫০ ॥

প্রমথনাথ বিশী ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কাব্যচিত্রাল দশ টাকা

মধুসূদনের সনেট : একটি সমীক্ষা

শক্তিব্রত ঘোষ

মধুসূদনের কবিপ্রতিভার শেষ অবদান তাঁর ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’। বাংলা কাব্যের ইতিবৃত্তে বৈষ্ণব পদাবলী ও লোকসাহিত্য ছাড়া বহিরঙ্গ সাধনার বাহুল্যই লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথে এসে তার বিপর্যয়। মধুসূদনের ক্ষেত্রেও তার অন্তর্থা হয়নি। রাজনারায়ণ বসুর নিকট উত্তেজিত প্রতিশ্রুতিতে একদা যে সাধনার স্বচনা, চতুর্দশপদাবলীতে তার অল্পবর্তন। আঙ্গিক সচেতনতা বা model consciousness মধুসূদনের ক্ষেত্রে একটা সমর্থিত সত্য; এই সচেতনতা সব সময় কাব্যক্ষেত্রে স্খাবহ হয়েছে মনে করবার কারণ নেই। যদিচ কাব্যরূপমাড্রেই কোন-না-কোন প্রকারের সংঘমবিধি, তবু মধুসূদনের ক্ষেত্রে যে অস্থিরতা ছিল, তার কারণ হয়তো অগ্ৰত্ব। হিন্দু কলেজের যে ছাত্র Richardsonএর হাতের লেখা পর্যন্ত নকল করতে চাইতো, তাঁর সেই ব্যাকুলতার দিনে বিবেচনার ব্যবহার স্বাভাবিক ছিল না। কাজেই ধানের সমাহিতি কিংবা কাব্যসিদ্ধির অভাবে তাঁর কাব্য প্রায়ই মহৎ জীবনবেদের অঙ্গীকার করে না। বৈষ্ণব পদের উত্তরকালীন অল্পশীলন, ভালুসিংহে যা artistry, ব্রজাঙ্গনায় তা বহিরঙ্গের চমৎকৃতি রচনা বা craftকে অতিক্রম করতে পারেনি।

ঐতিহাসিক আলোচনায় ঈশ্বর গুপ্তই নবোন্মেষিত বাংলার “ভোরের পাখি”। তিনি কবিগুণালাদের উত্তরসাধক, তবু আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম লেখক। বিহারীলালের কবিতার subjectivityর পর্বসূত্র দত্ত-কবির কবিতায়; আত্মকেন্দ্রিক চিত্তবৃত্তির অল্পশীলন এখানে অসন্দিগ্ধ। রাবণের জীবনব্যাপী যে বিপুল ট্রাজিডি, শশাংকমোহন সেন, তাতে কবির আত্মপ্রক্ষেপের অনিবার্যতা উপলব্ধি করেছেন; ব্যক্তিসত্তা স্বীকৃত বলেই আবার মধুসূদনের ‘Mrs. Radha’ চণ্ডীদাসের নিত্যধ্যান শ্রীরাধিকা নন।

একদিনকার ‘language of the fishermen’, চতুর্দশপদীতে এসে ‘কমলকাননে’ রূপান্তরিত। মধুকবির জীবনে এই বিবর্তন বহিরঙ্গে আকস্মিক হলেও অন্তর্জগতে তার নির্দেশ পূর্বাঙ্কেই আত্মরক্ষা করছিল। নানা

অভিজ্ঞতার আবর্তে আন্দোলিত জীবনে যখন স্থিরতার লগ্ন এলো, তখনই সেই সব নেপথ্যাশ্রয়ী নক্ষত্রতাপে তাঁর কাব্যাকাশে নিবিড়তা ঘনীভূত হলো। কবি তাকালেন তাঁর হৃদয়ের গভীরে : যেখানে উত্তেজনারহিত এক নিভৃতমনের স্বগতোক্তির রোমাঞ্চ। এলো সনেট। পেত্রার্ক নয়, শেক্সপীয়র নয়, মিল্টন নয়; বাংলাদেশের চতুর্দশ পংক্তিবদ্ধ একশ্রেণীর কবিতা পরবর্তীকালের অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার আয়োজন-সূত্র।

মধুকবির প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশক্ষেত্র ছিল ‘wide scope’-এর মধ্যে। কিন্তু সনেটের পটভূমি ভিন্নতর। ঐতিহাসিক কারণেই উদ্ভব হতে পারে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই রাজনারায়ণ বসুর কাছে প্রেরিত পত্রে মধুসূদনের সনেটের প্রথম খসড়া দেখা যায় ‘কবি মাতৃভাষা’ শীর্ষক সনেটে। কিন্তু ১৮৬৫র আগে তিনি সনেট রচনায় কার্যতঃ তৎপর হননি। এর হেতু কি হতে পারে? ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদবধ প্রকাশিত হয়, এই সময় মহাকাব্যের ব্যাপক সমাহিতি ও মহাকাব্যলোকের মধ্যে তাঁর প্রতিভা নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ১৮৬২ এ সালে বিদেশযাত্রার সঙ্গেই তাঁর জীবনের এক ভিন্নতর গ্রন্থিমোচন। কবির প্রবাসজীবন ১৮৬২-১৮৬৬ সাল। যুরোপে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত প্রবাসজীবনকে এশিক ট্রাজিডির দৈবলাঞ্ছিত আশাহত মহানায়কের দীর্ঘখাসের মত করণ ঐদান্য কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন; আর্থিক বিপর্যয় এই সময় তাঁকে আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য করেছিল। রুহু ও অথু থেকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতায় তাঁকে শৃঙ্খলিত হতে হলো। এমনি সময় কোন কোন সুহৃদের দাক্ষিণ্য বহু-বাহিত; বিভাসাগরের দাক্ষিণ্য চিত্তের পুঞ্জীভূত শোক দ্রব হলো। স্বদেশ থেকে দূরে, দারিদ্র্যজর্জর এই অবসর কবিচিন্তে তখন স্মৃতি-পরিক্রমার পর্ব; ‘কপোতাক্ষ নদ’ বা ‘বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির’, বাংলাদেশের ‘বিজয়াদশমী’ অথবা ‘বউ কথা কও’ পাখির নিঃসংকোচ সরলতা। দিনের সংকর উত্তেজনার পর নিরুত্তাপ রাত্রির স্তব্ধশোক; গ্রীষ্মের প্রচণ্ড জ্বালায় উপশমে সঞ্চিত-করণারশির মতো বর্ষার জল—পৃথিবীর এই নিয়ম, যৌবনের ছরস্তু উত্তমের পর প্রৌঢ়ের নিরাসক্ত সঞ্চয়। এ সময় প্রাণ দুখ হয়ে ওঠে, আত্ম-উন্মীলনের এই পূতলগ্নে বহিরবয়বের দাবী গোণ। ‘অন্তরে খাটি’ সনেটের এই বিশেষ গুণটির সম্পূর্ণতাতেই মধুকবির চতুর্দশপদীর সমৃদ্ধি। বস্তুতঃ, চতুর্দশপদী রচনা-কালে কবির মনোচেতনা গীতিকবিতার অল্পকূল ছিল; কবি জীবনের নিভৃত অধ্যায়ে আত্মমোচনের তাই ব্যাপক প্রস্তাবনা। কবির আবেগ যেন পরিণামে এখানে একটা শমে এসে পৌঁচেছে। “I want to

introduce the sonnet into our own language”—এই প্রতিশ্রুতিতে সাধনার সূচনা, কিন্তু পরিণামে পাওয়া গেল এক ভিন্নতর অভিজ্ঞতা। মধুসূদনের সনেট বাংলা গীতিকবিতার নবপরিচয় সূচিত করে। ফলতঃ একথা সত্য যে, আত্ম-উন্নয়নের শ্রেষ্ঠতায় মধুসূদনের জীবনে চতুর্দশপদী কবিতাবলী বিশিষ্ট। নিজের কথা অতিসহজে প্রকাশ করবার জন্য এ যেন ছিল তাঁর স্বক্ষেত্র। এখানে সত্যকতার শাসন নেই, সংকোচের আড়ষ্টতাও বিলীন। স্মৃতিরোমহুনে যে বিবাদ, কাব্যে তা-ই অমৃতরূপা; শিবমন্দির বা বিজয়াদেশমীর স্মৃতিচারণায় যে ‘saddest thought’, হৃদয়-সংবেদী চেতনায় এখানে তা-ই ‘sweetest song’।

শেক্সপীয়রের সনেট-সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ মন্তব্য করেছিলেন, ‘with this key, Shakespeare unlocked his heart.’ এই মতবাদ নিয়ে শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে মতবৈধতার অবকাশ আছে; সেখানে এ-প্রশ্ন উঠেছে যে, শেক্সপীয়রের সনেটের বিষয় কি কবির ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ অনুভূতি, অথবা কেতাহরস্তু, ফ্যাশানের (convention) অনুসরণ বা অনুস্মৃতি (imitation)? অথচ মানন্দে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এই মতবৈধতার অবকাশ মধুসূদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সনেটের আন্তরধর্মের সঙ্গে আত্মকথার স্রবের সহযোগ ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র বিশিষ্টতার নির্দেশক।

২.

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অন্তর্গত প্রায় সব কটি সনেটই ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে রচিত; বাংলাদেশের আর্দ্রগন্ধের সঙ্গে দীপ্তিতপ্ত যুরোপের স্বাদ এই রচনাবলীতে সমন্বিত হতে পেরেছে। কিন্তু কবিতাগুলি সর্বত্র সমানভাবে তৃপ্তিকর নয়। এ-সম্পর্কে কতকগুলি সম্ভাব্য কারণও নির্দেশিত হয়েছে ॥ প্রথমতঃ, মধুসূদনের মর্মগত ‘বিশ্বজনতা’, বলিষ্ঠ সাহিত্যবুদ্ধি ও পৌরুষপ্রশান্ত ভাবুকতার বাহনে বাংলাভাষা তখন পর্যন্ত সমর্থ হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর কাব্যের কল্পনাশক্তি মিলটনের মতো চক্ষুগ্রাহ্য নয়, যতটা ধ্বনিগ্রাহ্য। তাঁর কাব্যে ধ্বনির সঙ্গে দৃশ্যটা প্রায়ই নগণ্য। অথচ চোখ ও কানের মধ্যে সাধারণ পাঠকের কাছে চোখের প্রাধান্যই বেশি, কিন্তু সনেটে তার অভাব। এটা পক্ষান্তরে সনেটের নিজস্ব দুর্বলতা বটে। তৃতীয়তঃ,

রসেটি যে বলেছেন, 'A sonnet is a monument'—মধুসূদনের রচনায় মুহূর্তের ক্ৰটিং দীপ্তি স্ফীলোকের বৃহৎস্তু স্ফটি করতে পারেনি। 'আশ্বিন মাস' কবিতাটিতে মহিষ-মর্দিনী, বচনেশ্বরী, শিখিধ্বজের সমারোহে শুভ্রকাশের চিরন্তন শুচিতার বর্ণ উপেক্ষিত; কিংবা কবিগুরু দাস্তুর ভজনাতে ইনফার্মোর দুঃস্বপ্ন স্রষ্টার সম্মানের কাছে বিরাজিচের উপাসকের পরিচয় শোচনীয়ভাবে অল্পপস্থিত। চতুর্থতঃ, অগিত্রাক্ষরে যতিপাতের যে-প্রথা গুণ বলে স্বীকৃত, সনেটের ক্ষেত্রে সেটা গুণ না হয়ে ত্রুটির অবকাশ এনেছে। এবং এই জগ্ৰেই তাঁর একটা অন্তলীন শৈথিল্য গঠনকে দুর্বল করেছে।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীকে মোটামুটি কয়েকটি পর্বে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। তাদের মধ্যে বিষয়ভেদ থাকলেও, বিভিন্ন কবিতায় কবিচিত্তের মৌল-পরিচয়ের সঙ্গতি নির্ধারিত। স্পর্শকাতরতা, অদৃষ্টানুগতা, করুণ অথচ দেশ-জাতির স্মৃতিতে ভরজিত, কিংবা প্রেমবাসনায় আকুলতা,—কবিচিত্তের এইসব নিরঙ্কুশ স্পর্শপাতে সনেটগুলি প্রায় সর্বত্র প্রসাধিত।

সাহিত্যকলা সম্পর্কিত রচনা ॥ ১ ॥ এখানে কবির কাব্যবিশ্বাস ও প্রকাশরীতির প্রসঙ্গ যেমন বিষয়ভূত, তেমনি বিভিন্ন পুরাণ, রামায়ণ, বা মহাভারতের কাহিনী-সম্পর্কিত রচনাও সংশ্লিষ্ট হয়েছে। এক কোটিতে—কবি, কবিতা, করুণরস, রোদ্ররস, বীররস, মিত্রাক্ষর ইত্যাদি; অপর কোটিতে—সীতাদেবী, সীতা-বনবাসে, বিজয়াদশমী, শকুন্তলা, ব্রজ-বৃত্তান্ত, কুরুক্ষেত্রে, গদায়ুদ্ধ ইত্যাদি সনেট। কাব্য তথা সাহিত্য সম্পর্কে কবির বিশ্বাস যেমন তাঁর চিঠিপত্রের সহস্র স্বীকারোক্তিতে উচ্চারিত হয়েছে, এই কবিতাগুলির মধ্যেও তেমনি তাঁর দ্বিতীয় মুদ্রণ। কবির মৌলিক পরিচয় কল্পনার অভিসার যাত্রায়, 'কবি' শীর্ষক সনেটে এই বিশ্বাসকে তিনি অকপটভাবে বলতে চেয়েছেন—'সেই কবি মোর মতে কল্পনাসুন্দরী। যার মনঃকমলেতে পাতেন আসনা। অন্তগামি-ভানুপ্রভা-সদৃশ বিতরি। ভাবের সংসারে তাঁর স্ববর্ণ কিরণ।' কবি ভাবনায় রোদ্ররস—'বড়ই কর্কশ ভাবা নিষ্ঠুর, দুর্মতি। সতত বিবাদে মত্ত পুড়ি রোধানলে।' তবে শৃঙ্গাররসের বর্ণনা খুব উজ্জ্বল হয়েছে বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ বীররস, করুণরসের প্রতিই মধুসূদনের আন্তরিক পক্ষপাত; সেইজন্ত 'রসকুলপতি' বীররস আর করুণরস 'রসকুলরাণী'। এবং এ-দুয়ের মধ্যে রসকুল-রাণী আধক পটয়নী।

বিভিন্ন পুরাণ, রামায়ণ, বা মহাভারতের চিত্রচরিত্র অবলম্বনে তিনি যে সনেটগুলি লিখেছিলেন, তাতে কবির মুহু ও কোমল অন্তরস্পর্শ অল্পভব করা

যায়। দেশ ও জাতির পুরাণ ও কাব্যকাহিনীর পাত্রপাত্রীরা তাঁর ভালোবাসার সামগ্রী, এবং ভালোবাসার সঙ্কে যে অশ্রুর অধিকার, একথা তো বিজ্ঞের উক্তি। ‘অল্পক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা বৈদেহি!’ বলে শীতার স্মরণিকা এই পটভূমিকাতেই রচিত। আর, মধুসূদনের খ্রীষ্টানত্বের ওপরে হিন্দুত্ব, হিন্দুত্বের ওপরে বাঙ্গালিয়ানা জয়যুক্ত হয়েছে বলে বহুঘোষিত সনদটি এখানে মনে করা বাহ্যিক হলেও প্রয়োজন, কেননা তাঁর চতুর্দশপদী অন্তত্বুক্ত এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত কবিতা সাধারণত এই ঘোষণার স্বপক্ষে উদ্ধৃত হয়ে থাকে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কবি ও মানবব্যক্তি সম্পর্কিত ॥ ২ ॥ পূর্বস্বরী ও জীবিত গুণীব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ কবিতাগুলির সাধারণ বিষয়বস্তু। এবং এই কবিতাগুলিকে কবির উদারগুণের আকরতরুগ্রন্থ গ্রহণ করা যায়। হোমার ও মিল্টনের অলুরাগী তাঁদের উদ্দেশ্যে কোন কবিতা রচনা করেননি, এ-তথ্য কোঁতুহলোদ্দীপক, মানসিক ক্ষেত্রে নবতর পরিবর্তন তার কারণ হতে পারে বটে; ভিক্টর হুগো, টেনিসন, দাস্তে বা লোল্ডষ্ট্রুকের প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাগুলি নিবেদনে সাময়িক প্রয়োজন অনেকাংশে সক্রিয় থাকলেও তাঁর বিশ্বমানবতাবোধের আংশিক উন্মোচন হতে পেরেছে বলে এ-কবিতাগুলির গৌরব স্বতন্ত্র। কিন্তু সতর্কভাবে অহুসন্ধান করলে এর কোনটিই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে না; বরং কবির সাধারণভাবে গুণগ্রাহীতার পরিচয়ই তাতে বেশি। পেত্রার্কাকে যেখানে তিনি প্রণাম নিবেদন করছেন সেখানে গুণগ্রাহিতার সঙ্গে আছে কাব্যরীতির সৌজন্যবোধ। দেশীয় কবিদের প্রতি স্মৃতিতর্পণ রচনায় জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি নম্রগভীর শ্রদ্ধানত ভক্তিই প্রধান প্রেরণা। কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাস কবিতার ভাব, ভাষা ও প্রকাশরীতি অলুধাবন করলেই এ-তথ্য উন্মোচিত হবে। প্রসঙ্গত, মুন্সুরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কবিতাগুলিও এই সন্ধানের যোগ্য ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ‘বিহার সাগর’ বা ‘দীনের বন্ধু’ বলে কবিতায় থাকে তিনি শ্রদ্ধাগুলি উপহার দিয়েছেন, তাও ভক্তি ও আনুগত্যের অবনমনায় রচিত। কি এ-ব্যক্তির বিশ্লেষণ পড়ে আরো পূর্ণাঙ্গ—‘the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali Mother’—এই হলেন বিহারসাগর; ফলে অন্তরঙ্গভাবে কাব্যে তিনি লিখতে পারেন, বিহার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে। কঙ্কণার সিদ্ধ তুমি, সেই জানে মনে। দীন যে, দীনের বন্ধু! এই থেকে দুটি কথা স্বভাবতই

মনে হতে পারে ; প্রথমত, উদ্দেশ্যমূলক হবার দরুণ কাব্যসৌন্দর্যের বাহক হিসেবে কবিতাগুলি উচ্চমান দাবী করতে পারে না ; দ্বিতীয়ত, কাব্যের প্রকাশ হিসেবে কবিতাগুলি যে রকমই হোক না কেন শ্রদ্ধার অহুভূতির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিষয়ের মর্গক্ষেত্রে তিনি সং এবং আন্তরিক । এই কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আশীর্বচন দান করে যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, তার আন্তরিকতার ধ্বনি কখনো আমাদের কাছে ব্যর্থ হয় না, আত্মবাসনার ‘সফল স্বর্ণরশ্মি’ নতুন আধারে দেখতে পেয়েছিলেন ফলে উপলব্ধির সত্যতা অসন্দিগ্ধ ।

ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস ও দেবতার কথা ; স্বাদেশিকতা ॥ ৩ ॥ চতুর্দশপদী কবিতাবলী যদি ইতিহাসের ধারায় বাংলা অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার পূর্বসূত্র হয়, তবে পক্ষান্তরে একথাও মনে নেওয়া হয় যে এইখানে রোমান্টিকবৃত্তিই কবিধর্মের মুখ্য পরিচয় । এবং একথা তো মোটামুটিভাবে পণ্ডিতজন গৃহীত যে রোমান্টিক কবিমন স্বভাবতই স্মৃতি-রোমন্থন-প্রিয় । আর এই স্মৃতিচারী রোমান্টিক মন বাংলার নিসর্গ বা উৎসব-অহুষ্ঠান বিষয়ক কবিতাগুলিতে স্বতোৎসারিত । এবং রোমান্টিক অহুভূতি সব সময়েই অকৃত্রিম, ফলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা অনায়াসে কাব্যস্বাদের অঙ্গীকার করে । কপোতাক্ষ নদের স্মৃতিচারণ, মহাত্মতে নিবেদিত আশ্বিনমাসের নিবিড় অভিজ্ঞতার পরিচর্চা, জীবকুল-হিতৈষিণী ছায়াচ্ছন্ন বটবৃক্ষের মৌলিক সত্যধারণ, সর্বত্রই মর্ম-স্পর্শের কল্পিত সত্যতা । তাছাড়া, প্রবাসযাত্রায় মধুসূদনের এক নিশ্চিত সঙ্গী ছিল জন্মভূমির প্রতি অবাধ মমত্ববোধ । যুরোপ যাত্রার প্রাকালে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি তার স্মারক । ‘If I live to come back, we shall meet ; if not, what will my countrymen say a hundred years hence !

Far away—Far away

From the land he loved so well

Sleeps beneath the colder ray !”

পরবর্তীকালেও লিখেছিলেন, ‘রেখো মা দাসেরে মনে, এ-মিনতি করি পদে’ । কবিপ্রাণের আকুল নিবেদনে এই অংশ মর্মস্পর্শী । এবং এইখানেই সাধারণতঃ স্বাদেশিকতার প্রশ্ন উঠে থাকে । একথা অবশ্যই মনে হতে পারে যে এ-সমস্ত কবিতার একটা স্বাভাবিক স্বদেশপ্রেমের গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বিশুদ্ধ ‘স্বদেশপ্রেম’ বলতে যে বিশিষ্ট অহুভূতি বোঝায়, মধুসূদনের অহুভূতি

সম্ভবতঃ তা থেকে একটু ভিন্নতর। নিছক স্বদেশপ্রেমের ঘোষণা এখানে প্রায় অল্পপস্থিত, যা আছে তা প্রধানতঃ স্বাভাবিক কাব্যপ্রেরণার উৎসাহের মধ্যে অল্পস্মৃত। 'বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেরণার উপস্থিতি এ-সব কবিতার উৎকর্ষের কারণ হয়েছে বলে' অনুমান সম্ভব। তবে নিছক স্বদেশিকতার কবিতাও তাঁর আছে, যেমন, ভারতভূমি বা আমরা। এই দুই রকমের কবিতার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যই স্বদেশিক অল্পভূতির আপেক্ষিকতা বিচারের সহায়ক।

অদৃষ্টবাদে নিবেদিত দার্শনিকতা-মূলক ॥ ৩ ॥ অদৃষ্টবাদে নিবেদিত আশাহত কবিচিত্ত তাঁর কাব্যে সাধারণতঃ গোপন থাকেনি, দীর্ঘশ্বাসের তুলিকায় তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই পর্বের কিছু কিছু কবিতায় সেই বিষাদচিত্র আছে, কখনো কখনো একটা দার্শনিক মনোভাবের বিবাগী রং তাতে দেখা যায়। শ্মশান, পরলোকে, নূতন বৎসর, আশা প্রভৃতি কবিতা এই পংক্তি-ভুক্ত হতে পারে। এইসব কবিতাগুলিকে অবিমিশ্রভাবে দার্শনিক বলে চিহ্নিত করা সমীচীন নয় বটে, তবে এগুলি 'দার্শনিক-স্বলভ' বলতে আপত্তি উঠবে না। মুক্তচিন্তের নির্মোহ এখানকার সাধারণধর্ম। অবশ্য শিল্পের অভিব্যক্তিতে কাব্য দর্শনের নিকটতম প্রতিবেশী, আর এ-কথা সত্য হলে কাব্যমাত্রেরেই কোন না কোন রকমের দর্শন, কেননা কবিকুল দ্রষ্টা ও প্রবক্তা। কবির এই আত্মপরিচয়ে কাব্যের গৌরব, এবং এখানে যে তার উপস্থিতি উপলব্ধ, তা পক্ষান্তে প্রমাণ করে যে এই পর্যায়ের রচনাগুলি কবিতার মৌলিক সত্যে অচঞ্চল।

কাব্যজীবনের প্রথম থেকেই মধুসূদনের মধ্যে এক নিয়তি-নির্ভরতা ধরা পড়েছে; দেশী-বিদেশী ক্লাশিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ও আত্মীয়তার বিনিষ্ঠতা-স্বত্রে এই প্রবণতা গড়ে ওঠা সম্ভব, আত্মজীবনের উচ্চাশা ও অচরিতার্থতার অভিজ্ঞতায় তা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। মহৎ প্রচেষ্টার অহং ব্যর্থতার পর অবসন্নতা বখন পরিণাম ফল, তখন তার ঘণ্টা অনিবার্যতা উপ্ত হয়, এখানে সেই গাঢ় অভিজ্ঞতা এক করুণ আবহ সৃষ্টি করেছে। এই অভিজ্ঞতাই জীবনজিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে 'পরলোকে' বা 'শ্মশান' কবিতায়। মিসগশোভার বিবরণে বা পৌরাণিক কাহিনীর স্মরণে, এমন কি নূতন বৎসরের বরণ-ক্ষেত্রেও তার নিয়ন্ত্রণ অল্লাস্ত।

বিচিত্র প্রসঙ্গ ॥ ৫ ॥ এই পর্যায়ে বিষয়ের বৈচিত্র্য যেমন কবিমানসের ব্যাপ্ত আগ্রহের পরিচয়স্বল, তেমনি কোথাও কোথাও নিছক কবিপ্রেরণার অভিধাতে রচিত রোমান্টিক ভাবাবহ বা গীতিকবিতার উপযুক্ত ভাবধর্মী

বিশ্বয়ের উৎক্ষেপ এক অনিন্দিত-অভিজ্ঞতা। কতগুলি কবিতা প্রেমমূলক, যেমন, 'মেঘদূত' বা 'বউ কথা কও', এবং এগুলির রসচেতনা অনেক সময় ব্যক্তিগত সম্পর্কেও উদ্ভাপে প্রদীপ্ত। 'ছায়াপথ', 'সায়ংকাল', বা 'সায়ংকালের তারা' ইত্যাদি কবিতা বিষয়ের সামান্যতায় সাধারণ হলেও, রোমান্টিক কবিচিত্তের মুক্তি যে তুচ্ছের পথেও সম্ভব, এ-কথা তো আমরা প্রায় সকলেই জানি।

॥ 'বেঙ্গল'এর চিরায়ত সাহিত্য-সম্ভার ॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
রাতভোর (২য় মুঃ)	২'০০ ॥ কুমালু (২য় মুঃ)
মধুমতী (২য় মুঃ)	২'৫০ ॥ নীলাঞ্জন (২য় মুঃ)

সরলাবালা সরকারের
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (সচিত্র) ৪'৫০ ॥

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের	নীলকণ্ঠের
অমূল তরু (৪র্থ মুঃ)	৩'০০ ॥ এলেবেলে
বিগত দিন	৩'৫০ ॥ হরেকরকণবা (২য় মুঃ)

কালকূটের
অমৃতকুন্ডের সন্ধ্যা (২য় মুঃ) ৫'০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের	দিলীপ মালাকারের
যুদ্ধের ইয়োরোপ	৪'০০ ॥ নেপোলিয়নের দেশে

ননীগোপাল গোস্বামীর ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥
জীবে প্রেম করে যেই জন ১'২৫ ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের	রূপদর্শীর
কয়লাকুঠীর দেশে (২য় মুঃ)	৩'৫০ ॥ কথায় কথায় (২য় মুঃ)

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

কলেজ স্ট্রীটের রেলিং

কুমারেশ ঘোষ

রেলিং তো লগুনে বাকিংহাম প্যালেসে আছে, কলকাতায় গভর্ণর হাউসে আছে, তোমার-আমার বাড়ির বারান্দায় আছে—কিন্তু কলেজ স্ট্রীটের প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং এমন ‘ভারতী’-র রেলিং কি আছে কোথাও? এখানে ‘ভারতী’-র কথাটা ভারতীয় নয়, ভারতী সংক্রান্ত।

কলেজ স্ট্রীটের এই রেলিং ভারতী-ভারাক্রান্ত। একটি কলেজের—তাও আবার একটা খানদানি কলেজের রেলিং—এ বই-বিপণি বা পুস্তক-প্রদর্শনী বাসা বাঁধবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। একটা গাছে পাখীর বাসার মতই এটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়ম। বরং মেডিক্যাল কলেজের রেলিং বা গোলদীঘির রেলিং—এ বই সাজানো থাকলে আমরা—সাহিত্য-রসিকরা মর্মাহত হতাম।

কলেজ স্ট্রীটের এই রেলিং যেন বই সাজাবার জন্মেই। কিংবা বই সাজাবার জন্মেই এ রেলিং-এর সৃষ্টি। সাহিত্য সৃষ্টি করলেই চলে না, চাই সাহিত্যের প্রচার। এই রেলিং সাহিত্যের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট।

কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটায় ‘সাহিত্য-তীর্থ’ নামে এক বনেদী সাহিত্য-সংস্থা আছে। কলেজ স্ট্রীটের লোহার রেলিংয়ের আঙুটায়-আঙুটায় এও আর এক ‘সাহিত্য-তীর্থ’।

কিংবা এই রেলিং ‘রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি’ বা ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ অথবা গ্রাশাল লাইব্রেরীর পকেট সংস্করণ। তফাৎ এই সব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বই পড়তে হয় বা টাকা জমা দিয়ে ঘরে এসে কাজ হয়ে গেলে আবার ফেরৎ দিয়ে আসতে হয়। এক্ষেত্রে টাকা দিয়ে একেবারেই বই বগলে করে বাড়ি আসা। এবং অনেক সময় এমন সব বই হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়—যা হাতে চাঁদ পাওয়ার মতই সুদূর্লভ ব্যাপার। পণ্ডিতরা বেঁচে যান বহু পণ্ডশ্রম থেকে!

কিন্তু এই সব দুর্লভ-বই অতি স্বল্পভেই এই রেলিং-এর আঙুটায় এসে ঝুলতে থাকে। অর্থাৎবই এই আবির্ভাব বা অনেক সময় প্রাহুর্ভাবের কারণ। অবশ্য,

অন্ত কারণও আছে। পণ্ডিতব্যক্তিদের ছেলেরা সাধারণত অ-পণ্ডিত হয়—এই কারণই যেন এই কলেজ স্ট্রীটের রেলিং-এর বই-ব্যবসার স্রীরুদ্ধির বড় কারণ! যেমন বাপ টাকা জমায় আর পরে ছেলে ওড়ায় (প্রায় ক্ষেত্রেই)—ঠিক তেমনই অনেক বাপ বই জমায় আর ছেলে পরে সেসব সরায়। সেগুলো সোজা মড়ক বেয়ে আসে এই সব রেলিং-এ—অন্ত কোন পণ্ডিতের অপেক্ষায়।

তবে এই রেলিং থেকে যেসব বই কিনে ঘরে নিয়ে গেলেন জানাঘেষী—সে সব বইয়ের সব না হোক কিছু যে তাঁর অবর্তমানে (কিংবা এজগতে বর্তমান থাকাকালীনই)—ফের আবার রেলিং ফিরে আসবে না—তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বেড়ালের টুঁটি চেপে ধরে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলেও যেমন সে আবার মিউ-মিউ করে ঘরে ঢোকে। কলেজ স্ট্রীটের রেলিং যেন রেকারিং অঙ্ক।

সব তীর্থেই যদি পাণ্ডা থাকে—এই সাহিত্য-তীর্থেও থাকবে না কেন? আছে। লুঙ্গী-পরা পাঞ্জাবি গায়ে, ভাঙা-ভাঙা বাংলা-বলা অবাঙালী মুসলমানই এই জ্ঞান-মন্দিরের পাণ্ডা। এদের মাথায় ডাণ্ডা মারলে বা পেটে বোমা মারলেও হয়তো সাহিত্যের ‘স’ বেরবে না—কিন্তু যদি কোন একখানা মনের মত বইয়ের দিকে নজর দিয়েচো, ব্যাস, সেখানাকে তোমার সামনে নাকের ডগায় এনে শুরু করবে, লিন না স্মার—এখোন আর ই বই পাবেন না, পাবেন না কুথাও!...এবং পাবো না যে কোথাও, সে খবর তোমার-আমার চেয়ে ওরাই বেশি রাখে এবং কোথা থেকে পেলো বা পরে পাবে—সেটা আমরা জানি বলেই এই পুস্তক-পীঠস্থানের পাণ্ডা এরাই। এরা নমস্ত।

এখানে কী না পাবে তুমি? লাল মুচমুচে পাতার অতি-পুরাতন বই—যা মাথা খুঁড়লেও অন্ত কোথাও পাবে না—আর পাবার আশাই ত্যাগ করেছিলে—কিন্তু একদিন ঐ রেলিং-এ চোখ ঠেকাতে ঠেকাতে চলবার সময় দেখলে—সে বইখানি আর একখানি বইয়ের আড়াল থেকে মুচকে হাসচে। বুঝি তোমাকেই দেখে। কোন পাড়ার বোঁ বা মেয়ে জানালায় আড়াল দিয়ে তোমাকে দেখে হাসলেও বুঝি এত আনন্দ পেতে না! এ যেন পথ-চলতে দামী কোন পাথর কুড়িয়ে পাওয়া।

পাক্ষী-আন্দোলনের আগে যখন মন্দিরে কোন হরিজনের প্রবেশধিকার ছিল না—(এখনও অনেক মন্দিরে নেই)—তখনও কিন্তু এই জ্ঞান-মন্দিরে ছিল, হরিজন-পুস্তকের অবাধ যাওয়া আসা। এই রেলিং-এ তাদের সমান মর্যাদা। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার এমন করাসী উদার উদাহরণ কলকাতায়

কলেজ স্ট্রীটের এই লোহার জ্ঞান-বৃক্ষের ডালে-ডালে ফলন্ত। তাইতো দেখি, এই রেলিং-এ কালিদাসের কাব্য থেকে একেলে অনেক অশ্রাব্য অপাঠ্য সব কিছু সমপাংস্ত্রেয় অবস্থায় স্ফুজিত। পঞ্চাশ একশো বছরের পুরোনো পত্রিকা বা বই, বটতলার নাটক, একেলে আমীষ উপন্যাস, নানা রকমের ভ্রমণ-কাহিনী, অদ্ভুত শিকার-কাহিনী, গাঁজাখুরী গোয়েন্দা গল্প বা ভূতের গল্প, মন-মাতানো ছোটদের গল্পের বই, উপকারী ডাক্তারী বা কবিরাজী বই, শিয়োর-সাকসেস, শর্ট-কার্ট, পসেবল্ কোশেন, মেড-ইজি, টিকা-টিপ্পনী সমেত গীতা, বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী—সব সব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কলেজ স্ট্রীটের এই ফুটপাথের রেলিং-এ তাদের সাধনা-লব্ধ জ্ঞান আমাদের বিতরণ করবার আশায়।

আবার তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে চোখ মারচে যৌবন-জ্বালানো সচিব্র কামশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র, কোকশাস্ত্র আরো কত কি! ঠাকুরবাড়ী, বেজাবাড়ী, স্থলবাড়ী—সবই এই একই বেড়ার মধ্যে। যেন ত্রিবেণী সঙ্গম।

শ্রীক্ষেত্রও বলতে পারো। এখানে জাত-বিচার নেই। সকলেই স্বাগতম। চোর, মাতাল, রেস্‌স্‌ডে, খেস্‌স্‌ডে সব আদে এখানে, বই বেচে-পয়সার জোগাড় করতে। আসেন জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষক, ছাত্র, শিল্পী, লেখক এবং আরো অনেক—‘যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানে না মণি, তাহার কি খানিক’ সাংগ্রহে সংগ্রহ করতে! এখানে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—সবাই আছেন তাঁদের বাণী প্রচার করতে। আছেন পুরোন দিনের প্রাচীন লেখকরা তাঁদের ভুলে-যাওয়া গ্রন্থাবলী হাতে করে। আছেন হাল-আমলের সাহিত্যিক সব দায়ী কাগজে ছাপা নামী উপন্যাস বগলে করে! আছেন বাস্তবায়ণ, ফ্রেড, হাভলক ইলিস, মেরি স্টেম্পস—তাঁদের কামশাস্ত্র নিয়ে। আর আছে ধাউড় আর মেথর অনেক—পাক, কাদা আর নর্দমার ময়লা জমিয়ে গায়ে ছিটোবার জন্তে।

এক কথায় এ বাজারে কাঁচকলা আর মাংস একই দোকানে বিক্রি হয়। তাই মাঝে মাঝে এখানে নাকি আসে গ্যাসের অতি দুর্গন্ধ, আর ধূপের মুছ্‌ স্ফুট!

তবে কলেজ স্ট্রীটের এই রেলিং-এ পুরোন বইগুলোর মধ্যে হঠাৎ আনকোরা হালের বইয়ের হাল দেখে চমকে যেতে হয়। যার থাকা উচিত ছিল নতুন বইয়ের দোকানের শো-কেসের মধ্যে নতুন রং-দার জ্যাকেট পরে—সে কিনা রাস্তায় রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েচে সাদা শেমিজ পরে! বিধবা তরুণী যেন দাঁড়িয়ে বৃড়িদের সঙ্গে। সাদা পাভলা কাগজের মলাট আঁটা, ললাটে লাল বা নীল পেন্সিলের নামাবলী—ভেতরটা সত্ত-প্রস্ফুটিত কুসুমের মতই পবিত্র,

অনাবিল, অনাব্রাত ! বাড়ির জানলায় দাঁড়ানো সুবেশিনী রিক্তা হয়ে রাস্তায় দাঁড়ালে কদর তার কমবেই। তাই হাতে-লেখা পাতলা মলাটে মোড়া নতুন বই বিক্রি হয় এখানে অর্ধেক দামে।

আচ্ছা, গৃহস্থের বেরিয়ে যাওয়া মেয়ের মত এসব বই প্রকাশকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কিসের লোভে ? নিজেদের সস্তা করার লোভ ? না। লোভ ঐ বাঁধাইওয়ালার ও রেলিং-এর পুস্তক-পাণ্ডাদের। ছাপাখানার আঁতুরঘরে ‘বই-বালা’-রা জন্ম নিলো, কিন্তু প্রকাশকের ঘরে পেলো না ঠাঁই। ‘ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই’—ছোট যে দোকান। অতএব তাদের পাঠাতে হয় বাঁধাইওয়ালার সাজঘরে। প্রকাশকের ইচ্ছেমত বাঁধাইওয়ালা তাদের কতকগুলো কিস্তিতে কিস্তিতে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠিয়ে দেয় প্রকাশালয়-পিত্রালয়ে। পরে প্রকাশক-পিতা বাংলাদেশের অচলপ্রথায় টাকা নিয়ে কল্লাদের পাত্রস্থ করেন। আর যারা থেকে গেল বাঁধাইওয়ালা বা দপ্তরীর বাড়ি, তাদের অবস্থা ? ঐ রেলিংওয়ালা তার ঘরে এসে লোভ দেখাতে থাকে : এই লেও ভাই রুপেয়া। বেশ, পঁচিশ পঞ্চাশ পিস মাল তো ছোড়ো।

—সে কি হয় ?

—আরে বাবা, বহুত হোতা। বোলেগা, চুহা কাটা, পোকাংমে কাটা।

লেও-লেও, দেও-দেও !

লোভে পড়ে দেয় কয়েকখানা বার করে। তবে সব দপ্তরী যে এমন করে, তা নয়। তা যদি করতো, নতুন বইয়ের বাজার বাঁজা হয়ে যেতো !

তবে ঐ রেলিং সাজানো বেশীর ভাগ নতুন বই-ই অঙ্গহীনা, পঙ্গু। বইয়ের ভিতরের একটা বা দুটো ফর্মা-ই নেই। অথচ বাইরের বাহার খুব। অনেকটা বসে-থাকা সুন্দরী খোঁড়া মেয়ের মতই। না চলা পর্যন্ত বোঝা দায়।

কাজেই এই রেলিং হঠাৎ কেউ এসে একখানা তিন টাকার বই তিন আনায় কেনে ‘কিস্তিমাং’ করবে, তার উপায় নেই। বরং মাং করতে গেলেই কাং। বইখানা ঘরে এনে পড়তে গেলে দুই বা এক ফর্মার একটি লংজাম্প দিতে হবে। কাজেই তিন টাকার বই তিন আনায় দিতে চাইলেই উৎফুল্ল না হয়ে বিশেষ চিন্তাঘটিত হওয়া এবং তৎক্ষণাৎ প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঐস্থানে দাঁড়িয়েই এক-একটি করে পাতা উল্টে দেখা, পড়া নয়। বরং বলভে পারো, পাতা-পড়া।

আসলে সব জিনিসেরই একটা না একটা কোশল আছে। কলেজ স্ট্রীটের রেলিং-এরও আছে তেমনি।

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

“জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্ত ইংরেজি বর্জন অত্যাশঙ্কক নয়, বরং তার বিপরীত। সহযোগী সঙ্ঘরী ভাষা (অ্যাসোসিয়েট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ) রূপে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন দ্বারাই জাতীয় সংহতি দৃঢ়বদ্ধ হবে।”

গত ১৮ই আগস্ট কলকাতায় এক সভায় উপরোক্ত অভিমত বিভিন্ন বক্তার ভাষণে শোনা যায়। ডঃ ত্রিগুণা সেন এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, জনাব আবদুল হালিম ভাষণ দেন।

ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন,—“সংস্কৃত যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তি, ইংরেজি তেমনই রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি। ভারতের জীবনযাত্রা আধুনিক হয়েছে ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে আসার পরে। বহির্জগতের যা কিছু শুভকর, তা আত্মস্মাৎ করতে হলে ইংরেজী আমাদের চাই। ভারতবাসীর কাছে ইংরেজি মামুলি বিদেশী ভাষা মাত্র নয়। ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশসাধনে ও দেশের সার্বিক উন্নতিসাধনে ইংরেজির দান অবশ্যস্বীকার্য।

— “হিন্দী ভাষা-সাম্রাজ্যবাদীরা অ-হিন্দীভাষী সমাজের উপর হিন্দী চাপিয়ে দেবার জন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁরা অত্যাশঙ্কক দাবি করছেন। তাঁরা অত্যাশঙ্ক ভারতীয় ভাষার উন্নতিসাধনে আগ্রহী নন। তাঁদের কাছে ‘হিন্দী, হিন্দু ও ভারতীয় এক’। কিন্তু তাঁরা জানেন না, কী ধরণের হিন্দী গৃহীত হবে—সংস্কৃতপ্রধান হিন্দী অথবা উর্দু। সমগ্র ভারতীয় জীবনের একমাত্র ভাষা হবার দাবি কোনো ভারতীয় ভাষারই নেই।

“ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে চোদ্দটি ভাষা ‘জাতীয় ভাষা’র (ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ) মর্যাদা পাবে। কিন্তু হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করেন, হিন্দী ‘রাষ্ট্রভাষা’, বাকি সব নিতান্তই ‘আঞ্চলিক ভাষা’। এই ভাষাগত জড়ীবাদকে রুখতেই হবে।” সভায় গৃহীত প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাম্প্রতিক ঘোষণাকে অভিনন্দিত করা হয় ও পার্লামেন্টে ইংরেজিকে অনিদিষ্ট কালের

জন্ম সরকারী সহযোগী ভাষারূপে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব আনয়নের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা হয়।

*

*

*

সম্প্রতি সাহিত্য আকাদেমির কার্যকরী পরিষদের এক সভা নয়াদিল্লীতে আকাদেমির সভাপতি শ্রীজগদ্রাল নেহরুর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এক প্রস্তাবে উক্তর স্ত্রীতীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করে শান্তজন মদস্তবিশিষ্ট এক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ভারতীয় ভাষাসমূহের দ্বিভাষী সম্পর্কে অল্পসন্ধান করবেন ও অল্পমূল্যে সরল অভিধান প্রণয়ন করবেন। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে আদান-প্রদান সুবিধা হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শ্রীমজীর জীবনী ও উপদেশ-সমৃদ্ধ রোম্যা রঙ্গী-রচিত বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থটি অনুবাদ ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

*

*

*

স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের গুণিজন-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ১২শে আগস্ট দুজন সাহিত্যসেবীকে সংবর্ধনা জানান হয়।

প্রথম জন হলেন বর্তমানে পুনা-বাসী প্রখ্যাত প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব সভাপতিত্ব করেন। তিনি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘকালের সাহিত্যসাধনার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বোমকেশ'-চরিত্র আজ ঘরে ঘরে পরিচিত। শরদিন্দু-সাহিত্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিভাষণে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই সংবর্ধনা লাভ করে আমি কৃতজ্ঞ। আজ স্বাধীনতা যোল বছরে পা দিল। আশা করব স্বাধীনতা আজ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বালস্বলভ চপলতা পরিহার করবে ও গভীর গম্ভীর জীবনসাধনায় আত্মনিয়োগ করবে ও সাহিত্যের উৎসাহ যোগাবে।'

দ্বিতীয় যে সাহিত্যসেবী সংবর্ধনা লাভ করেন, তিনি অশীতিপর প্রবীণ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শিশুসাহিত্য-রচয়িতা ও 'শিশুভারতী'-সম্পাদক রূপে তিনি সুপরিচিত। অনুষ্ঠানের সভাপতি 'স্বপনবুড়ো' (শ্রীঅখিল নিয়োগী) যোগেন্দ্রনাথের আদর্শনিষ্ঠ সুদীর্ঘ সাহিত্যসাধনার বিস্তারিত পরিচয় দান করেন ও বলেন, 'আজ প্রদেশ কংগ্রেস সাহিত্যসেবীর গুণগ্রাহী হয়েছেন। বড় স্তরের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ক্ষোভ ছিল যে

দেশের বিদেশী রাজা দেশের গুণিসংবর্ধনায় আগ্রহী নন। আজ সে ক্ষোভ দূর হল।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাই।

গত ৩রা আগস্ট বর্ধমানে ৭০ বছর বয়সে প্রবীণ দেশকর্মী-সাহিত্যসেবী বলাই দেবশর্মা (গাঙ্গুলি) লোকান্তর গমন করেছেন। তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমথ দেশনেতাদের সহকর্মী ছিলেন। সাপ্তাহিক ‘আর্ব’ ও মাসিক ‘শ্রী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। “ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়” নামে একটি জীবনী তিনি লিখেছেন। ব্রহ্মবান্ধবের বিখ্যাত ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকায় তিনি তরুণ বয়সে ‘ধানীলঙ্কার ঝাল’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখে রাজস্বারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে দেশমাতৃকা ও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে দেশ এক স্মৃস্তানকে হারালো।

আসাম সাহিত্য আকাদেমির উপদেষ্টা পর্ষদের সম্প্রতি-অমুষ্ঠিত সভায় এক অমুবাদ-পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পর্ষদের আহ্বায়ক ডক্টর বিরিক্কিকুমার বরুয়া জানান যে, পরলোকগত ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলুই-রচিত দুটি উপন্যাস হিন্দীতে অমুবাদিত হয়েছে এবং অসমীয়া প্রবন্ধসাহিত্যের এই নির্বাচিত সংকলন হিন্দী ও ইংরেজিতে অনূদিত হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গ্রন্থই ইতঃমধ্যে অসমীয়াতে অনূদিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার অ-হিন্দী-ভাষী ছাত্রদের ১৯৬২-৬৩ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ২২০টি বৃত্তি দেবেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারসমূহ বৃত্তির জন্য আবেদন-পত্র সংগ্রহ করবেন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠাবেন বলে জানা গিয়েছে। হিন্দী প্রচার সমিতিগুলি থেকেও এই ধরনের আবেদন শীঘ্রই গ্রহণ করা হবে।

গত ১৭ থেকে ২৩ জুন—সপ্তাহব্যাপী সেমিনার অমুষ্ঠিত হয়েছে ডালহৌসীতে। পঞ্জাবী লেখকসভার উদ্যোগে অমুষ্ঠিত এই সেমিনারে ঔপন্যাসিক শ্রী এস. নানকসিং পোরোহিত্য করেন। ‘স্বকীবাঁদ ও পঞ্জাবী

লেখকসমাজ’—ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। সর্বশ্রী গিয়ানীকর্তার সিং, মোহন সিং জোশ, সাধু সিং হমদর্দ, কিশণ সিং, মোহন সিং, জিং সিং শীতল, হরচরণ সিং, অগ্রিক সিং, সন্তোষ সিং ধীর, প্রদীপকুমার, তারা সিং ছন, জগজিৎ সিং আনন্দ এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

*

*

*

গত ২২ আগস্ট সুইজারল্যান্ডের মন্টানোলায় নিজ বাসভবনে প্রখ্যাত জার্মান কবি-ঔপন্যাসিক হেরমান্ন হেস্‌সে পঁচাশি বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৮৭৭ সালে জার্মানিতে তাঁর জন্ম। ১৮৯৯ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস Peter Comenzind প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ তাঁকে এনে দেয় খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। এই সময় থেকেই তিনি পুরোপুরি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১২ সালে হেস্‌সে জার্মানি ছেড়ে চলে যান, আর আসেন নি। ১৯২৩ সালে তিনি সুইস নাগরিক হন। সুইস নাগরিকরূপেই তাঁর বাকি জীবন কাটে।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Magistar Ludi এবং Siddharta তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিয়েছে। শেষোক্ত উপন্যাস বাংলায় ‘সিদ্ধার্থ’ নামে অনূদিত হয়েছে।

হেস্‌সে টম্যান মান ও ফ্রান্জ কাফ্‌কার সমগোত্রীয় লেখকরূপে ও প্রথম সমরোত্তর জার্মানির প্রভাবশীল সাহিত্যনায়করূপে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কবিতায় তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা, ধর্মচেতনামুগ্ধ মহৎ উপন্যাসে পরিণতি।

হেস্‌সের পিতামহ, পিতা প্রবল ধর্মাত্মরাগী ছিলেন। হেস্‌সে শেষজীবনে সেই পথেই গিয়েছেন। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

*

*

*

গত ২২ আগস্ট রবীন্দ্রভারতী-হলে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সহযোগিতায় অবনীন্দ্র-পরিষদ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ৯২তম জন্মদিবস পালন করেন। এই উপলক্ষে এক ‘পঞ্চাহ-ব্যাপী অবনীন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র-চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ‘বিচিত্রা’-ভবনে। এই বছর অবনীন্দ্রনাথের ‘আলোক-ধেতু’ চিত্রের প্রতিলিপি পরিষদ প্রকাশ করেছেন। গত বছর ‘ভারতমাতা’ চিত্রের প্রতিলিপি পরিষদ প্রকাশ করেছিলেন। পরিষদ-কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে একটি স্থায়ী চিত্র-প্রদর্শন-কক্ষ স্থাপনের আবেদন জানিয়েছেন যেখানে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা রাখা যাবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, সম্প্রতি অবনীন্দ্রনাথের ‘বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী’ নবরূপে মুদ্রিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন রূপা কোম্পানি। ‘ইণ্ডিয়ান মোসাইক অব্ অরিয়েন্টাল আর্ট’-এর স্বর্ণজয়ন্তী সংখ্যা “অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর” নামে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। প্রকাশিকা—শ্রীযুক্তা শ্রীমতী ঠাকুর। মূল্য ১৫/- ও ২/- টাকা। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা পনেরোটি ছবির প্রতিলিপি এতে গ্রথিত হয়েছে। এই গ্রন্থ প্রকাশ করে সম্পাদক ও প্রকাশিকা শিল্পরসিকমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হলেন।

*

*

*

পবিত্র-জয়ন্তী

‘চলমানতাই পবিত্রতা’।

গত ২৮ আগস্ট মহাজাতি সদনে সর্বজনমিত্র পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ৭০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উৎসবের প্রথম দিবস পবিত্র-মিত্র শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উপরোক্ত উক্তি করেন। চারদিনব্যাপী উৎসবের মূল স্মৃতি এই কথায় ধরা পড়েছে।

১১ ভাদ্র ১৩৬২ (২৮ আগস্ট, ১৯৬২)—পবিত্রদা ৭০ বছরে পদার্পণ করলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন ৫০ বছরের সাহিত্যচর্চার সহস্র স্মৃতিভার।

পবিত্র-অভিনন্দন পত্রে বলা হয়েছে—

“হে বন্ধু, আজ তোমার জীবনের সত্তর-বছরে পদার্পণের এই শুভ উৎসবে তোমার অগণন বন্ধুজনের অন্তরের উদ্বেল আনন্দ গ্রহণ কর। সকলের বন্ধু তুমি, সকলের সমবয়সী তুমি, এই তোমার সর্বোত্তম পরিচয় দিয়ে আজ তোমাকে অভিনন্দিত করি।.....স্মৃতি আর প্রীতি দিয়ে গাঁথা এই বরণমালা গ্রহণ করে কৃতার্থ কর আমাদের।”

‘পবিত্র গুণমুগ্ধ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অমরাগিবৃন্দ’-এর পক্ষ থেকে উৎসবের প্রথম দিনে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। এটির রচয়িতা শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীষোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। যারা বক্তৃতা করেন, তাঁদের মধ্যে উপরোক্ত লেখকরা ছাড়া ছিলেন—সর্বশ্রীনরেন্দ্র দেব, কালিদাস নাগ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হারিতকৃষ্ণ দেব, বাগী রায়, কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়,

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কাজি আব্দুল ওহুদ, বোমানা বিশ্বনাথম, আর উৎসব-সমিতি সম্পাদকদ্বয়—ভবানী মুখোপাধ্যায় ও শুদ্ধমন্ত বসু ।

প্রতিভাষণে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বলেন,

“গুরুদেব বলতে পেরেছিলেন, সত্তর বছর বয়সে আমার পরিচয় একটা পরিণতিতে এসে পৌঁচেছে। সত্তরে আমিও পদার্পণ করলাম। পরিচয় আমার কিছুই নেই, নেই পরিণতি। আমি আজও অপরিশ্রুত ও অদূরদর্শী। ধারা আমার আজকের এই সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন, তাঁদের প্রীতির বন্তায় আমি প্রাবিত। —মানুষকে আমি ভালবেসেছি আশৈশব। মানুষের প্রয়াস, মানুষের সংগ্রাম, মানুষের বড় হবার, বড় কিছু গড়বার, ধরবার কামনা আমার রক্ত উতলা করেছে সব সময়। আজ সত্তর বছরেও রক্তের সে ঘোর কেটেছে, এমন কথা বলতে পারি না।”

দ্বিতীয় দিন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত “বিহুসী” ব্যঙ্গনাটক (মলয়ার থেকে পরিবর্তিত রূপে গৃহীত) থিয়েটার ইউনিট কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

তৃতীয় দিন সব-পেয়েছির আসরের ছেলেমেয়েরা স্বপনবুড়োর প্রযোজনায় “নীল পাখি” (মেতরলিস্কের ব্লু-বার্ড-এর বাংলা রূপ : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) নৃত্যনাট্য অভিনয় করেন। তারপর রাখাল ভট্টাচার্য-রচিত ও অতীনলাল-পরিচালিত “শ্রীচৈতন্য” নৃত্যনাট্য ভারতীয় শিল্পী-পরিষদ মঞ্চস্থ করেন। এই তিনটি অভিনয়ই দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল।

চতুর্থ দিন, ৩১শে আগস্ট, শেষ অনুষ্ঠান। তরুণ লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঁচ হাজার এক টাকার তোড়া দেওয়া হয়।

উৎসব-সমিতি ছাড়া অগ্ন্যাত্ন বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে পবিত্র-বাবুকে নানা উপহার দেওয়া হয়। সভাপতি ছিলেন মুজকফর আহমেদ।

উৎসব উপলক্ষে দুটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হয়েছে (১) পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা-সংকলন, দাম ৩৬৫ ন. প.। (২) ‘পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী’ গ্রন্থ, দাম তিন টাকা।

শেষোক্ত সংকলনের দুটি ভাগ,—প্রথম ভাগে পবিত্রবাবুর প্রতি প্রীতি-শুভচ্ছামূলক রচনা, দ্বিতীয় ভাগে গত সত্তর বছরের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিক্রমা। ষোল জন খ্যাতনামা লেখক ষোলটি প্রবন্ধ বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের পরিক্রমা করেছেন।

এই দুটি গ্রন্থ জয়ন্তী-অনুষ্ঠান-সমিতির কাছে (১১ ডি, রামধন মিত্র লেন,

কলকাতা—৪) পাওয়া যাচ্ছে। জয়ন্তী-তহবিলে এখনো অর্থসাহায্য গ্রহণ করা হচ্ছে বলে সম্পাদকদ্বয় জানিয়েছিল। পবিত্র অম্বরাগীমাত্রেরই এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাবেন বলে সমিতি আশা করেন।

*

*

*

সম্প্রতি কেরলে দুজন প্রখ্যাত মালয়ালী লেখকের জন্ম-জয়ন্তী বংসর পালিত হয়েছে। তিরুভল্ল শহরে মালয়ালী কবি শ্রীবেণীকুলম গোপাল কুরুপ-এর ৬০ বছরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আর ত্রিচূর শহরে অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক শ্রীজোসেফ স্ত্রুদাসের ৬০ বছরের জন্মদিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে সংবর্ধিত লেখকদের রচনা সংকলন ও স্মারক-সংকলন প্রকাশিত হয়। আমরা শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুরুপ ও শ্রীস্ত্রুদাসের দীর্ঘ সুখী জীবন কামনা করছি।

॥ বেঙ্গল-এর অভুলনীর গ্রন্থসম্ভার ॥

	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর	
আজব জীবিকা	৩.০০ ॥ জীবন-মৃত্যু (২য় মুঃ)	২.৫০ ॥
	ভবানী মুখোপাধ্যায়ের	
অখণ্ড জগৎ (৩য় মুঃ)	৩.০০ ॥ জর্জ বার্গাড শ (২য় মুঃ)	৮.৫০ ॥
	বিমল দত্তের	
কাশ্মীর প্রিন্সেস অগাধ সমুদ্রে মৃত্যুর মাঝে জীবন-যুদ্ধ (৩য় মুঃ)	৪.০০ ॥	
	খাশি দাসের	তেজেশচন্দ্র সেনের
মা (৩য় মুঃ)	২.৭৫ ॥ হারানো ছেলে (কিশোর উপন্যাস)	১.২৫ ॥
	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
শাদা-কালো	৩.০০ ॥ সেই আনন্দ্য রাত	২.০০ ॥
	নীলকণ্ঠের	
অন্ত ও প্রত্যহ (২য় মুঃ)	৫.০০ ॥ চিত্র ও বিচিত্র (৪র্থ মুঃ)	৩.৫০ ॥
	বিনায়ক সাম্যালের	অজিত মুখোপাধ্যায়ের
রবি-তীর্থ	৪.০০ ॥ অমৃত মন্ডন	৪.০০ ॥
	দীপেন রাহার	বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কাঁচা মাটি পাকা পথ	৪.৫০ ॥ দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ	৬.৫০ ॥

পূরবীতে বাঁধা দুটি গান

ভোলানাথ ঘোষ

বারো বছর—খুব বেশি দিনের কথা নয়—মাত্র বারো বছর আগে এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক একটি মোড়ক নিয়ে এলেন। চিনিনা—তাই জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন—‘চেনার কথা নয়—আমার নাম অমরেন্দ্র ঘোষ—দেশ বরিশাল।’ বললাম ‘বহু’—তাকালাম তাঁর মোড়কটির দিকে। চেয়ারে বসে মোড়কটি কোলের ওপর রেখে বললেন—‘শুনলাম আপনি বই-পত্র নিয়ে সমালোচনা করেন—তাই এলাম আপনার কাছে। আমার একটু লেখার বদঅভ্যাস আছে।’ হেসে বললাম, ‘ওটা তো গুণের কথা—আপনি সাহিত্যিক—আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া তো দোভাগ্যের কথা।’ তিনি একটু শ্রান হেসে বললেন, ‘তাই আমাকেই আসতে হ’লো আপনার কাছে। আমি সেকালে জন্মালেও একালের লেখক। তাই প্রকাশনের বাড়ি—সমালোচক বাড়ি ধরনা দিতে হয়—বলতে আমি লিখেছি—আপনি দয়া করে পড়ুন।’ বুঝলাম কোথায় যেন—কি কারণে প্রচ্ছন্ন অভিমান রয়েছে তাঁর মনে। প্রসঙ্গ এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—‘কোথায় আছেন।’ বললেন ‘মাথা গৌজার জায়গার নাম টালিগঞ্জ—আর অল্পপূর্ণার ভাণ্ডারের হা-ভাতে কেয়ানি?’ বুঝতে পারিনি ভেবে আর একটু পরিষ্কার করে বললেন—‘রেশনিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিন্তু রেশন নেই।’ সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষ জোরে হাসার চেষ্টা করলেন।

একটা বিড়ি ধরিয়ে মোড়কটা খুলে তিনখানি বই আমার দিকে এগিয়ে ধ’রে বললেন, ‘আপনার জন্তে এনেছি—পড়ে দেখবেন। ভালো মন্দ যা বলতে হয় বলবেন।’ বইগুলির নাম—পদ্মদীঘির বেদিনী, চরকাসেম, দখিনের বিল। একখানি বই আবার রাজশেখর বহু মহাশয়কে দেবার সঙ্কল্প থাকলেও দেওয়া হয়নি—তাঁর নাম লেখা রয়েছে। বইগুলির পাতা উন্টে দেখছি—আর সেই ফাঁকে ফাঁকে অমরেন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলে চলেছেন—‘দেশকে—দেশের মানুষকে যেমন দেখেছি তেমনটি করে আমার লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শহরকে ভালো চিনি না—গেঁয়ো মানুষের লেখায় গেঁয়ো মানুষের কাহিনীই পাবেন। আমি fresh from the soil—গ্রাম-বাংলার মানুষ। হিন্দু-

মুসলমানের বাংলা—সব গেছে—সব গেছে।’ ঠুঁকে বললাম, ‘আচ্ছা আমি পড়বো—এবং আপনার লেখা সম্বন্ধে লিখবো।’ সেদিন আরও অনেক কথা হলো। যাবার সময় বলে গেলেন—‘আর যাই করুন না পড়ে লিখবেন না—না প’ড়ে—আজকালকার রীতিতে সমালোচনা করবেন না।’ তাঁর কথা রেখেছিলাম।

ধীরে ধীরে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আরও অনেক বই লিখেছেন, ভাঙছে শুধু ভাঙছে, অহল্যাকতা আরও অনেক বই। ছোটগল্প লিখেছেন। অনেক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প’ড়ে শুনিয়েছেন, মাঝে মাঝে মন্তব্য করেছেন—‘খটকা লাগলে জিজ্ঞাসা করবেন।’ বইয়ের দোকানে দেখেছি—চুপটি করে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করেছি ‘ব্যাপার কি—এ ভাবে বসে।’ হাসিকান্না থেকে অনেকদূরের একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল—‘টাকার জুটে।’ অনেক সময় এমন হয়েছে—প্রয়োজনের তাগিদে উপন্যাসের স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছেন। বঙ্কিম চার্টার্ড স্ট্রিট দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন—সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষ। দেখা হতেই বললেন—মেয়ের বিয়ের জন্তু টাকা সংগ্রহ করতে হচ্ছে। খাতা খুলে দেখালেন বাংলা দেশের লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অধ্যাপকদের নাম। প্রতিদিনের অভাব-দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও শিল্পীমন সৃষ্টিপ্রবাসী ছিল। একদিন দিস্তা তুই কাগজ কিনে বাড়ি যাবার পথে আমার বাড়ি এলেন, বললেন—‘ভাই, একটা প্লট পেয়েছি। আমাদের ওদিকে কয়েকদর মুসলমান বাস করেন—ওঁদেরই একজনের বাড়িতে মুরগীতে ডিম পেড়েছে—ওই থেকে পেলাম। ট্রামে বসে বসে ভেবেছি—খাসা গল্প হবে—এখন বলবো না।’ আমিও আর জোর করিনি—সে গল্পও বোধ হয় আর বলা হয়নি। ‘আমি কল্লোর যুগের লোক’ একথা বেশ গর্বের সঙ্গে বলতেন। নিজের লেখার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও তিনি অনেকটা নিঃসংশয় ছিলেন, কেবল ‘শরীর ভালো নেই, অভাব কিছুতেই মিটেছে না’—এই দুটি কথা বলতে গিয়ে মুখচোখ বেদনায় করণ হয়ে উঠত।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা—সংস্কৃত কলেজের সামনে অস্বস্থ শরীর নিয়ে প্রকাশকদের কাছে সহদয়তার খোঁজে এসেছেন। দেখা হতেই হাত ধরে বললেন, ‘বুঝলেন ভোলাবাবু, বর্তমান জগতের সঙ্গে কিছুতেই রফা করতে পারলাম না। এত ভালোবাসলাম—কিন্তু ভালোবাসা পেলাম না। আমি হাসতে ভুলে গেছি—কাঁদতে লজ্জা হয়। ভবিষ্যতের কথা জানি না—কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—আমি হেরে গেলাম!’ সান্দ্রনা দেবার জন্তু সেদিন

বলেছিলাম—‘অতসব ভাববেন না’। রোগজীর্ণ প্রৌঢ় শেষবার বলে গেলেন—‘কিন্তু আমি নিজেই হারিয়ে ফেলিনি—যা বলতে চেয়েছিলাম—শেষদিন পর্যন্ত তাই বলে যাবো।’ আজ সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষকে আর কোথাও দেখা যাবে না—শুধু দেখতে পাই তার বইগুলি শো-কেসে দাঁড়িয়ে ডেকে বলছে—আমরা আছি—ওকে আমাদের মধ্যে পাবে, সাহিত্যিক অমরেন্দ্র ঘোষ নেই—তার রচনা এখনও আমাদের-আপনার সামনে আছে।

আরও তিন বছর আগের কথা ভাবছি। হাতে লাঠি, দীর্ঘ দেহ এক ভদ্রলোক এলেন। পরিচয় পেলাম—তিনি কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেন। কবিরাজী চিকিৎসায় যশ আছে—কিন্তু সেদিকে খুব ঝোঁক দেখালেও অল্পরাগ বেশি লেখায়। তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। সেদিন এসেছেন রোগী দেখতে। তাঁকে কিন্তু রোগী দেখার জন্তে ডাকা হয়নি। তিনি নিজেই এসেছেন—কোনোরকম লৌকিকতার ধার ধারেননি সেদিন। রোগী দেখে শুধু-অল্পপান সব ব্যবস্থা করলেন। আমায় বললেন, ‘আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি—কিন্তু আপনার কথা এত শুনেছি!’ জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কার কাছে?’ রমেশবাবু হেসে বললেন, ‘আপনার দিদি অমিয়ার কাছে।’ বুঝলাম অমিয়াদি অনেক বাড়িয়ে বলেছে। আমার নিজের বোন বেঁচে নেই—তাই ও আমাকে আরও বেশি করে ভালোবাসে। আমি হেসে বললাম, ‘দিদি তো একটু বাড়িয়ে বলবেই।’ রমেশবাবু স্নেহে বললেন, ‘পরিচয় তো হলো এবার দেখা যাবে।’ আমায় না আমার ওখানে—আমাদের সাহিত্য-সেবক সমিতিতে আপনাকে সভ্য করে নেবো। মিটিংএ আসবেন—অনেকে সেখানে আসেন।’ গিয়েছি গুঁর সমিতির সভায়—দেখা হয়েছে অনেকের সঙ্গে—শুনেছি অনেক বক্তৃতা—অনেক কবিতা—অনেক গল্প। দুচারটি আলোচনায় আমাকেও যোগ দিতে হয়েছে—রমেশবাবুর আদেশে। কোনোদিন না গেলে চিঠি দিয়েছেন—‘প্রীতিভাজনেয়, সেদিনের সভায় আপনাকে পাবো আশা করেছিলাম, না আসাতে দুঃখ পেয়েছি।’ সভায় দেখতাম—রমেশবাবু কখনও বসে—বেশির ভাগ সময় শুয়ে বুকে তবলারূপে চোখ বুজে বক্তৃতা শুনছেন। সভা আরম্ভের আগে তাঁর বাড়ির সামনে রোয়াকে বসে চা খেতে হয়েছে—আর আমায় জমিয়ে রেখেছেন পবিত্রদা ও রমেশবাবু দুটি বন্ধুতে। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। রমেশবাবু হয়ত কারও কথা শুনছেন—বা শুনে জবাব দিতে যাবেন—কিংবা চুপ করে বসে আছেন—হঠাৎ দেখা যেতো তিনি

হাত ঘুরিয়ে তুড়ি দিলেন। আমি দেখলৈও কখনও সেকথা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। একদিন ট্রামে এমনি এক তুড়ি কাটতেই পবিত্রদা বললেন, 'তো'র এটা ভারি বদ অভ্যাস।' রমেশবাবু বললেন—'কোনটা।' পবিত্রদা বললেন, 'এই তুড়ি দেওয়া। রোগীর সামনে এরকম তুড়ি দিলে রোগী বা সে বাড়ির লোকের মনের ভাব কি হতে পারে ভেবেছিস?' রমেশবাবু গভীর হয়ে বললেন, 'কদিন ধ'রে লক্ষ্য করছিস?' পবিত্রদা বললেন, 'আর প্রায় ২০।২৫ বছর ধরে লক্ষ্য করছি—বলবো বলবো করে বলা হয়নি।

রমেশবাবুর কুরপালা, শতাব্দী, গৌরীগ্রাম, কাজল প্রভৃতি বই আকারে তখন বেরিয়েছে। চক্রবাক প্রভৃতি আরও পরের লেখা। আমি একদিন তাঁর কাছে একটি গল্প চাইলাম। তিনি আমার বিমুগ্ধ করেননি। কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি—আমি বলার পরদিনই তিনি আমার বাড়িতে লেখা পৌছে দিলেন। আমি বললাম, 'এত কষ্ট করার কি দরকার ছিল—আমি তো যেতামই।' তিনি 'হেসে বললেন, 'যে প্রেরণায় এই সৃষ্টি—সেই প্রেরণাই আমাকে ঠেলে আপনার এখানে এনেছে।' রমেশবাবুকে দূর থেকে দেখিনি—তাকে কাছের মানুষ হিসাবেই পেয়েছিলাম। এত কাছে পাওয়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম—রমেশবাবু সখের সাহিত্যিক নন। কবিরাজ রমেশচন্দ্রের গভীর নাড়ীজ্ঞান ছিল—সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রও মানুষকে চিনতে পারতেন। তাঁর উপগ্রাস ছোটগল্পে সেই চেনা মানুষেরই ভিড়। শহরে দীর্ঘদিন বাস করলেও তাঁর ফরিদপুরকে তিনি ভোলেননি। শহর থেকে দূরের জীবনশিল্পী হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব সমধিক।

মুক্তারামবাবু স্ট্রীট থেকে রমেশবাবু এসেছেন কলেজ স্ট্রীট—এর বইয়ের পাড়ায়। দুর্বল মানুষ—লাঠি একহাতে—আর একহাতে অল্প কারও পিঠে ভর দিয়ে তিনি চলেছেন—। চেনা মানুষ তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারেনি। নানা কথার মাঝে তাঁর সাহিত্য-গেয়ক সমিতির কথা একবার বলেছেন, পঞ্চাশ বছর হয়েছে এই সমিতির—তার স্বর্ণ জয়ন্তী হবে—সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রের বলিষ্ঠ কল্পনা : সমিতির পক্ষ থেকে একটি জয়ন্তী-পত্র প্রকাশিত হবে, তার জন্তে অনেক লেখাও সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কাজ শুরু করে আন শেষ করতে পারলেন না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রী রমেশচন্দ্র অনেকের প্রাণরক্ষা করেছেন—সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র অনেক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু একটি আত্মানে মাড়া দিয়ে সেই তুড়ি মেরেই চলে গেলেন। সমিতির স্বর্ণ জয়ন্তী, জয়ন্তী-পত্র সবই মৃৎপাত্রের মতো ফেলে চলে গেলেন। ধারা দায়িত্ব

নিয়েছিলেন—তাদের শুভবুদ্ধি হোক রমেশবাবুর অসমাপ্ত কাজকে সাফল্য-মণ্ডিত করার দায়িত্ববোধ যেন ভগবান তাঁদের দেন। রমেশচন্দ্রের রচনা-সম্ভারকে যথাযোগ্য প্রীতি-শ্রদ্ধা জানাবার সচেতনতা বাঙালী পাঠকের চোখে দেখা দেয়।

জীবনের চলতি পথে—কত ফুল বারে গেল—কত মহাপ্রাণ মহাপ্রয়াণের পথে যাত্রা করেছেন। আমরা অনেক ভুলি, সামান্যই মনে রাখি। বাঙলা দেশে বিশেষ করে সাহিত্যিকদের বেলায়—প্রায় ভুলে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, অনেককে তো ভুলে বসে আছি। ইতিহাস-রচনার সময় লুপ্ত-রত্নোদ্ধারেরই শুধু প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু প্রাণের যে দরদ যে একাগ্রতা নিয়ে এরা প্রতিমা গড়েছিলেন—প্রাণের যে বিশালতা নিয়ে জীবনকে দেখে ছিলেন—সৃষ্টির প্রেরণায় যাকে বিগ্রহরূপ দান করেছেন—সেই সৃষ্টি ও তার স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া মহা অপরাধ। তাই বলি অশ্রু যদি থাকে তবে সেই অশ্রুর কিছুটা অংশ এঁদের জন্তে বারে পড়ুক। বাঙালী রসিক-পাঠক এই কথাটি মনে যেন রাখে—অনেকের মাঝে এই দুজন জীবনশিল্পীও ছিলেন।

॥ বেঙ্গলএর অনুপম কিশোর সাহিত্য ॥

বাগ্‌ভট্টের

নমিতা বহুর

লালুভুলু (৩য় মূঃ) ৩'০০ ॥ পিক্‌নিক ২'০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

খুলী দরওয়াজা (২য় মূঃ) ১'৭৫ ॥ প্রাণী ও প্রকৃতি ১'৫০ ॥

চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর (জরাসন্ধ)

বেবতীভূষণ ঘোষের

রং চং ১'০০ ॥ সবুজ টিয়া ১'৭৫ ॥

দেবদাস দাশগুপ্তের

পরভূত প্রকৃতি (ভারত সরকার পুরস্কৃত) ১'০০ ॥ প্রাণের কথা ১'০০ ॥

ননীগোপাল গোস্বামীর

সদ্য প্রকাশিত জীবে প্রেম করে যেই জন ১'২৫ ॥

আমাদের উৎসব ১'০০ ॥ মাটির গড়া এই ধরনী (২য় মূঃ) ১'০০ ॥

আশা দেবীর

অমরেন্দ্র সেনের

স্মৃতি নদীর ঢেউ (৪র্থ মূঃ) ১'০০ ॥ ডাক টিকিট ১'২৫ ॥

মনের কথা ও 'ধেনো' উপন্যাস

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

অতি আধুনিক বাংলা-গল্প-উপন্যাসে মনঃসমীক্ষার চেষ্টা বোধ হয় নতুন করে আর-একবার দেখা দিচ্ছে। একালে সাহিত্যের আসরে লেখকদের ভিড়ও বেড়েছে, বিজ্ঞাপনের জোরও বেড়েছে। এক বিষয়ে স্পষ্ট কোনো অভিমুখিতা দেখা দেবার আগেই হঠাৎ যেন নতুন এক-একটা ঝাঁক এসে পড়ে। বিকৃত ইচ্ছা, সুপ্ত কামনা, অনতিপ্রকাশিত তাগিদ ইত্যাদি ব্যাপার ফুটিয়ে তোলার দিকে একেবারে হাল-আমলের এই যে উৎসাহ, ইতিহাসে এরও অতীত আছে। মানুষের জীবনে কোনো অভিব্যক্তিই ইতিহাসহীন নয়। তাই একালের এই ডেউয়ের কথা ভাবতে-ভাবতে, কতকটা হালকা ভাবেই অতীতের কথা মনে এলো।

'ধেনো উপন্যাস' কথাটা দ্বিজেন্দ্রলালের। তাঁর জন্মশতাব্দপূর্তির শুভলগ্নে তাঁর কথা নিয়েই এ-গ্রন্থ উত্থাপন করবার স্বযোগ পাওয়া গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আবাঢ়ে' বইয়ে 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' নামে একটি কবিতা আছে। তাতে বস্তুপরিবেশের যথাযথ বোধ ত্যাগ করে যারা মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আছে,—উপদেশও আছে।

হরিনাথ লোকটি চিত্তাকর্ষক রকমের। দুর্গাপূজার ছুটিতে কর্মস্থল পাটনা থেকে তিনি গরিফায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি উপন্যাস পড়বার দিকে তাঁর ঝাঁক ছিল। তিনি সেইসব উপন্যাস থেকেই মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করতেন। শ্বশুরমশাইয়ের কাছে তিনি কেবলই টাকা চাইতেন। তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী শাড়ি-রাউজ-জুতো ইত্যাদি সামগ্রী ভালোবাসতেন। সে-খরচ অবিশিষ্ট সৌদামিনীর পিতাই বহন করতেন,—হরিনাথ নিজে সিরাজগঞ্জ পাবনা অঞ্চলের মাছুষ; তাঁর মনে এসব ভাবনা ছিল না। সৌদামিনীর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর! দ্বিজেন্দ্রলাল বলে গেছেন :

আরো এটা বলে রাখি সৌদামিনী অতি

রূপসী ও সাধ্বী দশবর্ষীয়া যুবতী।

ট্রেনে আসতে আসতে হরিনাথ তাঁর সেই সৌদামিনীর কথাই ভাবছিলেন! পাটনা-গরিফার মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছিল। বিরহের পরে মিলনে হরিনাথ কতো যে খুশি হবেন,—সৌদামিনীর মন যে কী ভাবে

সে-মিলন গ্রহণ করবে, সেই মনস্তত্ত্বের ভাবনাই তাঁকে পেয়ে বসেছিল ! কালাপাড়-ধুতি আর বানিশ-করা জুতায় স্তম্ভজিত হরি—ট্রেনে বসে সে সব কথা ভাবতে-ভাবতে—‘কাঁদতে লাগল সত্যি শেষে ভেউ ভেউ করি।’ বলা বাহুল্য, হরিনাথের মনস্তত্ত্বের কথা দ্বিজেন্দ্রলাল গভীর হয়ে বলতে চাননি। গিরীন্দ্রশেখরের মতন গভীর আলোচনাতেও তাঁর মন ছিল না। প্রভাত-কুমার, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র,—অথবা তাঁদের আগে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঔপন্যাসিক যেভাবে তাঁদের গল্প-উপন্যাসে মনের তত্ত্ব দেখিয়ে গেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সে মর্জিতেও হরিনাথের কথা বলেন নি।

হরিনাথের এক সহযাত্রীর ছবি দেখিয়ে, তিনি সেই স্মরনিক বৃদ্ধকে দিয়ে একটি মর্যাস্তিক দুর্ঘটনার বীজ বুনিয়েছিলেন। সেই বৃদ্ধ সহযাত্রী হরিনাথকে দেখে, আসল ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে হরিনাথের চেহারার প্রশংসা ক’রে তিনি বলেন যে, হরিনাথের সবই ভালো,—জুতো, ধুতি সবই চমৎকার,—কিন্তু সামান্য একটু ফ্রটি চোখে পড়েছিল তাঁর। হরিনাথ শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পৌছোবেন রাত্রে। গরিফা তুচ্ছ একটি গ্রাম। সেখানে পৌছোবার আগে হরিনাথ চিঠি লিখে তাঁর যাত্রার খবরটি জানিয়ে রাখলে ভালো করতেন। কিন্তু তিনি যখন তাতে নারাজ, তখন সে-বিষয়েই বা বলবার কি আছে? কিন্তু সবই সহ্য করা যায়, সবই ঠিক,—তাঁর চেহারাটি ভালো বটে, কিন্তু দাড়িতেই তা মাটি হয়েছে !

এছেন কৌকড়ানো ঘন, এত লম্বা দাড়ি—

রাখে মূর্দফরাস মুচি দর্জি এবং হাড়ি।

সে-কথা শুনে হরি অত্যন্ত বিচলিত হন। ঠিক হোলো, বর্ধমান স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালে দাড়িটা কামিয়ে নেওয়া যাবে। বর্ধমানে পৌছে, এক টাকা দক্ষিণা স্থির ক’রে, হরিনাথ পরামানিকের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর বাদিকের দাড়ি ফর্সা হয়ে যায়—‘কান্তেতে নিহত যেন অগ্রহায়ণের ধান’। কিন্তু পরামানিক ডান দিকে এগুবার আগেই গাড়ি ছাড়বার সময় হয়। প্রথম ঘণ্টা বেজে উঠতেই হরিনাথ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ত্যাগ ক’রে গাড়িতে ফিরে যান ! এবং সেই অবস্থায় হুগলিতে পৌছে,—সেখানে গাড়ি বদল ক’রে—প্রথমে এক ছ্যাকড়া গাড়িতে,—তারপর নাকি নৌকোতেও কিছু পথ পেরিয়ে, হরিনাথ গভীর রাত্রে গরিফায় পৌছেছিলেন। সেখানে, তাঁকে সেই রাত্রে খুবই নাজেহাল হতে হয়। প্রথমে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের হাতে বেদম প্রহার হয়,—শেষে, স্বয়ং সৌদামিনীও তাঁকে দেখে মূর্ছা গিয়েছিলেন !

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই গল্পের শেষে যে ‘মর্ম’ প্রকাশ ক’রে গেছেন, তাতে অন্ত্যস্ত উপদেশের সঙ্গে এই উপদেশটি তিনি বিশেষভাবে দিয়েছেন যে,— ‘ধেনো উপন্যাসের’ ‘অধিকাংশই গাঁজাখুরি জেনো।’ হরিনাথ অতিরিক্ত পরিমাণে বাজে উপন্যাস পড়ে বন্ধপঙ্খ-বোধ হারিয়েছিলেন। তাই তাঁর এই দুর্দশা !

প্রভাতকুমারের ‘যজ্ঞ-ভঙ্গ’ গল্পটির কথা এই ধারাতেই মনে আসতে পারে ! সে কোনোরকম নিন্দার অভিপ্রায়ে নয়। মনস্তত্ত্বের দিকে আমাদের গল্প-সাহিত্যের আদিপর্বেরই ঝোঁক শুরু হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে কেবল এইটুকুই বক্তব্য।

একদিন কোনো এক আশ্বিনের সকালে বিদ্যাচলের ‘হিন্দু-স্বাস্থ্য নিবাসে’ খালিসপুর গ্রামের বন্ধুবিশারী বন্ধকে দেখা গিয়েছিল সে-গল্পে। এফ-এ পাশ করতে পারেন নি তিনি ; বয়স তিরিশের কাছাকাছি ;—সেই বয়সে যোগাভ্যাস শিক্ষায় তিনি অল্পরাগী হয়ে ওঠেন ! বিদ্যাচলে গিয়ে তিনি ‘যোগিনী-সাধন’ দেখবার স্বযোগ পেয়েছিলেন। কালিকানন্দ সেখানকার তান্ত্রিক সাধু। বন্ধুবিশারীর ভগিনীপতি সুরেন্দ্রনাথের বড় ভাই চন্দ্রনাথকে কালিকানন্দ ‘যোগিনী-সাধন’ দেখাতে ব্যস্ত ছিলেন। বাইরে সেই কালিকানন্দ-সাধু আর যোগিনীসাধন-ঘটিত সমারোহ—আর, ভেতরে এঁদের মনোরাজ্যের ঘাত-প্রতিঘাতের বিবরণ,—প্রভাতকুমার দুই-ই দেখিয়ে গেছেন। আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যে — গল্পের সেই আদি-যুগে, প্রভাতকুমারের ছোটো গল্পগুলি খুবই আদরের জিনিস বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

বাংলা গল্পের আদি-পর্বের প্রথম লেখকদল,—তথা প্রবর্তকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁরও নাম স্মরণীয়। তাঁর জন্ম ১২৭৯ সালে। তাঁর পিতা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় মাতা কাদম্বিনী দেবী। বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে প্রভাতকুমারের পৈতৃক নিবাস ছিল। পিতামাতার তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। পিতা জয়গোপাল ছিলেন রেলকর্মচারী। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‘দাসী’ ও ‘প্রদীপ’ পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। প্রথম জীবনে সিমলায় তার-বিভাগে তিনি একটি কাজ পান এবং সেই সময়ে ‘ভারতী’র লেখক হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখ ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্তে তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন এবং সে-সময়ে ‘কাশীবাসী’ নামে তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। ‘ভারতী’-তে সে

গল্প ছাপা হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তখন বিলাতে ছিলেন। তাঁরই সাহায্যে প্রভাতকুমার মিডল-টেম্পলে প্রবেশ করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয় সেই সময়ে। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মিডল টেম্পলের ব্যারিস্টার ছিলেন। সেই সূত্রে সম্রাটের আমন্ত্রণে তিনি একদিন সম্রাটের ভোজ-সভাতেও যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি বিলেত থেকে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে, প্রথমে দার্জিলিং-এ, রঙপুরে,—পরে গয়ায় কর্মজীবন শুরু করেন। ‘ভারতী’, ‘প্রবাসী’, ‘মানসী’ ইত্যাদি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ‘মানসী’ ও ‘মর্যবাহী’ পত্রিকার তিনি অনেকদিন সম্পাদনও করেছিলেন [১৩২২ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩৩৬ সালের মাঘ পর্যন্ত]। তিনি যে সংস্কৃত সাহিত্যের নিয়মিত পাঠক ছিলেন, সে-কথা মন্থনাথ ঘোষের লেখা থেকেই জানা যায়। তিনি ভূয়োদর্শী ব্যক্তি ছিলেন, তাতেও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথও মনস্তত্ত্বে আগ্রহী ছিলেন, প্রভাতকুমারও।

প্রভাতকুমারের প্রথম গল্প ‘শ্রীবিলাসের ছবুন্ধি’ প্রকাশিত হয় মহিলার ছদ্মনামে। তাঁর শেষ লেখা অসমাপ্ত উপন্যাস ‘বিদায় বাণী’ বহুমতীতে প্রকাশিত হয়। ১৩৩২ সালের ২২এ চৈত্র সোমবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু প্রভাতকুমারের কথাও এখানে কেবল প্রসঙ্গতঃ মনে এলো। তাঁর বা অন্য কোনো লেখকের জীবনী পরিবেষণ করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ আর প্রভাতকুমার—বাংলা ছোটগল্পের সাধনা করে গেছেন প্রায় সমকালে। ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসে,—অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, তাঁর ‘গল্পাঞ্জলি’র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর ‘মাতৃহীন’ গল্পটি ‘মানসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হ’তে দেখে অনেকেই সে-ঘটনা সত্য বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি পরের মনের কথা পরকে যৎকিঞ্চিৎ দেখে লেখেননি। নিজের মনের সাহায্যেই তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই ভূমিকায় তিনি নিজে বলে গেছেন—‘আমি মনঃকল্পিত ঘটনা লইয়াই, অধিকাংশ গল্প লিখিয়া থাকি—তবে কচিৎ কখনও বাস্তব জীবনেরও দুই-একটি ঘটনা থাকে বটে। কেবল ‘আদরিণী’ গল্পটি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। উহার প্রায় চোদ্দ আনা কথা সত্য।’

বিজ্ঞেন্দ্রলালের হরিনাথ দত্তই হোন, আর প্রভাতকুমারের ‘মাতৃহীন’ গল্পের

সেই শরৎকুমার মিত্রই হোন,—অথবা সাহিত্যের ছোটো-বড়ো বহুবিচিত্র চরিত্র-সমারোহের মধ্যে অন্য যিনিই হোন,—ধীরই হোক,—মাল্লবের মনস্তত্ত্ব যে সাহিত্যের অন্যতম প্রথম ও প্রধান অঙ্গসন্ধানের বিষয়, তাতে আর সন্দেহ কিসের ?

আমাদের সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের চর্চা তবু অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার। অভিধানে ‘স্নায়ু’ শব্দের একটি মানে দেওয়া হয়েছে ‘Sinew’—অর্থাৎ দেহের অস্থিবন্ধনী বা পেশীবন্ধনী। আবার, নার্ড-এর প্রতিশব্দ ‘স্নায়ু’ ধরে নিলে ‘নার্তাস সিস্টেম’কে ‘স্নায়ুতন্ত্র’ বলতে আপত্তি হবে না। পাশ্চাত্য দেশে ১৮৫০-এর কাছাকাছি সময়ে এই স্নায়ুতন্ত্রের বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়, এবং তখন থেকেই মস্তিষ্কের রোগ আর মানসিক ব্যাধির মধ্যে সম্পর্ক বিচার স্পষ্ট হতে থাকে। ‘Dementia paralytica’ বা পাংগলামির বিকারতত্ত্ব বর্ণনার বৈজ্ঞানিক প্রয়াস সেই সময়েই সূচিত হয়। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে ফরাসী মনোবিজ্ঞানীর দল হিষ্টিরিয়া রোগে অভিভাবন বা suggestion-এর ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বপ্নচারিতা [Somnambulence] এবং অত্যাগত কোনো কোনো মনোবিকারের ক্ষেত্রে, মন যে নিজের মধ্যেই কতকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে, এক দিকে নিষ্ক্রিয় থাকে, অথচ অত্যাগত দিকে সক্রিয় থাকতে পারে,—তাও দেখা গেল। প্যারিসে শারকোর [Charcot] কাজ ছিল এই ধরনের। ১৮৮০র আগেই এসব চর্চা ঘটে গেছে। ব্রুয়ার [Breuer] এবং ফ্রয়েড [Freud] তাঁদের স্বতন্ত্র কাজ দেখিয়ে দেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ফ্রয়েডীয় গোষ্ঠীর মনোবিকলন-কর্মের মূল কথাটা এই যে, বিভিন্ন লক্ষ্যের সংঘাত থেকেই ইচ্ছার দমন শুরু হতে থাকে। সম্ভ্রান্ত মনের বাইরে গিয়ে পড়লেও এইসব অবদমিত ইচ্ছার কাজ বন্ধ হয় না। হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মানসিক ব্যাধিতে ভোগা এবং স্বপ্ন দেখাও এইরকম অবদমনের ফল। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে রুশ মনোবিজ্ঞানী পাব্লভের ‘সাপেক্ষ প্রতিবর্ত’বাদ বা ‘কন্ডিশনাল রিফ্লেক্স’ মতবাদ দেখা দেয়। কিন্তু এখানে সে-আলোচনা থাকে এখন। এসব প্রশঙ্গের বিস্তৃতি অনাবশ্যক।

সরসীলাল সরকারের ‘মনের কথা’র ভূমিকায় গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখে গেছেন—‘ফ্রয়েড বলেন, আমরা যে কেবল জানা-ইচ্ছার বশেই অনেক সময় কাজ করি তাহা নহে; অনেক ইচ্ছা অজানা থাকিয়াও আমাদের কার্যে

নিয়োজিত করে। এই ধরনের ইচ্ছার অস্তিত্ব আমরা সহজে ধরিতে পারি না। অজ্ঞাত ইচ্ছা ধরিবার চেষ্টাকে ইংরাজিতে Psycho-analysis বলে।’ অপর পক্ষে, ‘মনোবিশ্লেষণের প্রচলিত অর্থ হোলো কোনো আচরণের অন্তর্নিহিত কারণ বা মূল মনোভাব খুঁজে দেখা।’ কিন্তু ক্রয়েড যে সাইকো-আনালিসিসের কথা বলে গেছেন, সে অল্প কথা। গিরীন্দ্রশেখর তাই এও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, —‘এই প্রক্রিয়া সাধারণ মনোবিশ্লেষণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইজন্ত ইহাকে মনোবিশ্লেষণ না বলিয়া মনোব্যাকরণ বলিব।’ অবদমিত ইচ্ছার কথা বলিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ‘নির্বাসিত ইচ্ছা’! সেই ভূমিকাতেই তিনি আরো বলেছেন : ‘ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ইচ্ছাগুলির প্রকৃতিও ভিন্ন রূপ। যেটি অপেক্ষাকৃত উপরের, সেটি নীচের ইচ্ছার তুলনায় সামাজিক হিসাবে কম অত্যাশ, এবং যেটি নিম্নস্তরের তাহা অতীব দৃশ্যীয়। মনোবিদেরা বলেন, অতি গভীর স্তরের ইচ্ছাগুলি প্রায়ই কামজ। এই ইচ্ছার স্বরূপ-নির্ণয় মনো-ব্যাকরণের একটি দুর্লভ ব্যাপার।’

সরসীলাল নিজে তাঁর সেই চটি বইখানির [মাত্র ৯৫ পৃষ্ঠার] ‘নিবেদন’ অংশে মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের একটি উক্তি স্মরণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ‘রাজযোগ’-এর ‘অবতরণিকা’তে এবং বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়েও শরীর আর মনের সম্পর্ক, মনের চঞ্চলতা, মনের অধিকারক্ষেত্র ইত্যাদি নানা প্রশঙ্গ দেখা দিয়েছে। সে-সব আলোচনাও বৈজ্ঞানিক কিংবা আধ্যাত্মিক আলোচনা! সাহিত্যে মনের প্রকৃতিতে বা ভাবনার স্রোতে মনোযোগী হওয়া অল্প ব্যাপার!

আমাদের সমাজে নর-নারীর প্রেমের তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ-অঞ্চলেও মনোব্যাকরণের কাজ আছে। নারী তাঁর স্বামিদেবতাকে ভক্তি ক’রবে, চুপ ক’রে অত্যাচার সহ্য ক’রবে,—তাঁর অত্যাশ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকবে না,—এই বাঙালী আদর্শের কথা তুলে, সরসীলাল বলেছেন : ‘কিন্তু বাস্তবতাব্রী বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে, সংসারে প্রেমের আর একটি বিভিন্ন প্রকার আছে। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘মৃণালিনীতে’ গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়ের প্রেম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, দিগ্বিজয় যেদিন গিরিজায়ার নিকট সম্মার্জনীর আঘাত না পাইত, সেদিন তাহার মনে হইত, বোধ হয়, গিরিজায়ার ভালবাসা লোপ পাইতেছে। এই আলেখ্যের মধ্যে বাস্তবিক সত্যের চিত্র আছে। অনেক পুরুষেরই স্বভাব এইরূপ যে, ভক্তি, মিনতি, স্তব-স্তুতি অপেক্ষা সম্মার্জনীর বা তাহার প্রতীক কিছু তাহাদের

অন্তরে শান্তি বা তৃষ্ণা প্রদান করে, এবং ইহাতেই তাহাদের যথার্থ প্রেমের বিকাশ হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত অভিজ্ঞতা হইতে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন হরিনাথের শব্দরবাড়ি যাত্রার কথা লিখেছিলেন, তখন হরিনাথের মনস্তত্ত্বের খবর সম্বন্ধে তাঁকেও খেয়াল রাখতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র,—তাদের পরে অন্ত লেখকদল,—এইভাবে নানা হস্ত ধরে, নানা বিস্তারের মধ্য দিয়ে মনের গভীরে যাবার চেষ্টা করেছেন। সেই খেই ধরেই, এখানে,—শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত আগেকার বাংলা গল্পের এবং বাংলা উপন্যাসের এক ধরনের বিষয়বস্তুর একটু উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৩১২ মালে ‘সাহিত্য’ পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশচন্দ্র দত্তের ‘নূতন ঝি’ নামে একটি গল্প ছাপা হয়েছিল। ছোটো ছোটো কয়েকটি অল্পচ্ছেদ-বিভাগে—ছাপার হরফে মোট আট পৃষ্ঠার [পৃঃ ২৬৫-২৭৩] এই লেখাটি—সর্বসমেত সাতটি পর্বে বা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম অল্পচ্ছেদটিই এই সাতটি ভাগের প্রথম ভাগ। প্রকাশচন্দ্রের অল্পমত রীতির বিশদ ধারণা পেতে হ’লে তাঁর এই লেখা থেকে এখানে কিঞ্চিৎ নমুনা তোলা দরকার। প্রথম পর্বে তাঁর সেই গল্পের ভূমিকাটি পাওয়া যায় :

‘আষাঢ়ের রাত্রি। নিবিড় অন্ধকার। আকাশে বিদ্যুৎ হানিতেছিল। গুরু-গুরু মেঘগর্জনের সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু জোরে নহে; গাছের পাতা চোয়াইয়া বৃষ্টির জল আস্তে আস্তে পড়িতেছিল; টপ টপ শব্দ শোনা যাইতেছিল। শিশিরকুমার পালঙ্কে শুইয়া গল্প শুনিতেছিল। নূতন ঝি তাহার পাশে শুইয়া পাখা নাড়িতেছিল; গল্প বলিতেছিল। হঠাৎ শিশির জিজ্ঞাসা করিল,—‘ঝি, তোমার নাম কি? ঝি বলিল, ‘আমায় অ-মা বলে ডেকে।’ গল্প শুনিতে শুনিতে শিশির ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার বয়স সাত বৎসর।’

দ্বিতীয় অধ্যায়টি পরিমাণে আর একটু বড়ো। তাতে মোট পাঁচটি অল্পচ্ছেদ। সেখানে এই বালক শিশিরের জনক শরৎবাবুর কথা বলা হয়েছে। তাঁর অলস, অকর্ষণীয় জীব উল্লেখও চোখে পড়ে। এই নতুন ঝি যে খুবই কর্মপটু, সে-কথার ইশারা দিয়ে লেখক এও জানিয়েছেন যে, তিনি এখন মনের সাধ মিটিয়ে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গল্প করবার অবকাশ পান। এই নতুন

পরিচারিকা যে সাধারণ ইতর শ্রেণীর বি ছিল না, লেখক সেকথাও বলেছেন। সে লেখাপড়ার কাজও জানে। শিশিরকুমারকে বোধোদয় এবং পাটিগণিত পাঠের সাহায্য করে, আবার—‘বি উলের কাজ জানে, রেশমের ফুল তোলে, জরীর জুতা বুনতে পারে। শরৎবাবুর স্ত্রী হারমোনিয়াম টিপিবার সময় যখন বেসুরো হইয়া পড়েন, তখন বি বেশ বুঝিতে পারে। এই বি কায়স্থ-কন্যা এবং মধবা, কিন্তু বসন্তরোগে তার মুখশ্রী বিকৃত হয়েছে, তাছাড়া সে গম্ভীর। শরৎবাবুর স্ত্রী সরযু তাকে ভয় করেন। এ-রীতি ‘ধেনো’ উপন্যাসের রীতি নয়,—অর্থাৎ উদ্ভট কিছু নয়। মনের রহস্ত দেখাতে গিয়ে কাহিনীর খেই হারাননি লেখক। তিনি এইভাবে পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলে-ছিলেন।

তৃতীয় পর্বে কানপুর থেকে শরৎবাবুকে তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্তে কলকাতায় আসতে দেখা গেছে। বিয়ের যখন মাত্র দুদিন বাকি, সেই সময় হঠাৎ এই বির পাঁকস্থলীতে ছুরারোগ্য এক ব্যাধির লক্ষণ ধরা পড়ে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, তাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই কথা বলে নেওয়া দরকার যে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে তৃতীয়ে প্রবেশ করার মধ্যে একে একে সাতটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তারপর, শেষ অবস্থায় গঙ্গাতীরে মুম্বু বি শরৎবাবুকে বললে :

‘আলোটা উল্কে দাও, মুখে একটু গঙ্গাজল দাও, কাছে বস। শরৎবাবু দীপ উজ্জল করিয়া দিয়া নিকটে বসিলেন, বির মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। বি বলিতে লাগিল,—‘আমি মরিলে মাথায় সিঁহুর দিও ; নখে আলতা ছোঁয়াইও। স্বামীর কাজ কোরো। সেই ছাদে জ্যোৎস্না রাত্রে কি বলেছিলে,—মনে পড়ে ? আমার মুখের দিকে চাও। ফুলশয্যার রাত্রে...।’ শরৎবাবু ভাবিলেন, প্রলাপের লক্ষণ দেখা দিতেছে। বলিলেন, বি ! কি বকছো ? কলিকাতায় তোমার কেউ আছে ? কাউকে খবর দেব ?’ বি বলিল, অ্যা, আমার স্বামী আছে, পুত্র আছে,—তুমি—শিশির—মেই। বি চুপ করিল। শরৎবাবুর মুখের দিকে চাহিল, সে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, তাহার অন্ধ-চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। শরৎবাবু উঠিতে যাইতেছিলেন, বি তাঁহার হাঁটু ধরিল, বলিল, বস, আমি—মা শীতলা—হাত দেখ—শিশিরের মা—বি সরযু—ভুল কোরো না।—চিনতে পারলে না ?’

‘শরৎবাবু হঠাৎ যেন একটু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের হাতের মধ্যে বিঁচ হাত তুলিয়া লইলেন। এমন সময় ঘরে যেন কাহার ছায়া পড়িল। তিনি বিঁচ হাত ত্রস্তে নামাইয়া রাখিলেন। কেন?’

পঞ্চম পর্বে শরৎবাবু তাঁর ছেলে শিশিরকে নিয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তখনো বিঁচ প্রাণান্ত ঘটেনি। রাত্রি এগারটা বেজে গেছে তখন। শিশির বিয়ের বাক্স খুলে তাতে পাঁচছাজার টাকা কোম্পানির কাগজ দেখতে পায়। সেই কাগজে সে তার নিজের নাম, তার বাবার নাম এবং—স্ববাসিনী দাসী ও আর দুটি অপরিচিত নাম দেখে, টাকা এবং কাগজ বাক্সে ভুলে রাখে। কিন্তু সেই বাক্সে যে সব গহনাপত্র ছিল, তা থেকে একটি আংটি নিয়ে, শিশির নিজের আঙুলে পরে। সেটি আবার খুলে রেখে দিতে গিয়ে সেই আংটিতে তারই পিতার প্রথম ঘোঁষনের একখানি ছবি দেখতে পায়!—ছবির ফ্রেমের উপরে খোদা—‘শরৎ’, নীচে ‘স্ববাসিনী’। ‘শিশির, হাতের মধ্যে আংটি মুঠা করিয়া ধরিল; ভাবিল স্ববাসিনী কে? তার মার নাম সরযু। এছাড়া সেই বাক্সে পাওয়া একখানি নীল খাতায় শিশির তার ‘অ-মা’র যে গোপন আত্মকথা খুঁজে পায়, সেইটির সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিতেই প্রকাশচন্দ্রের এই গল্পের পঞ্চম অধ্যায় ভরে গেছে। এই অধ্যায়টিই এই সংক্ষিপ্ত গল্পের সর্বাধিক দীর্ঘ অংশ। বাক্সে প্রায় আড়াইশ টাকা এবং তিনচারখানি গয়না ছিল। শিশির তার মা সরযুর কাছে সেই বাক্স রেখে দিয়ে, নিজের ঘরে ঢুকে দেই নীল খাতাখানি পড়তে আরম্ভ করে।

এই আত্মকথা থেকে জানা যায় যে, স্ববাসিনী শরৎবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী,—শিশির তারই সন্তান; শরৎবাবু যখন বিদেশে ওকালতি করতে যান, সেই সময়ে স্ববাসিনীর কলেরা হয়েছিল... প্রয়াগে স্ববাসিনীর বসন্ত রোগ এবং সেই রোগে তার প্রায় মৃত্যুবৎ যন্ত্রণার কথাও এই আত্মকথাতেই শিশিরের চোখে পড়ে। এই পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যেই শিশির নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছে যে, স্ববাসিনীই তার মা!

রাত তখন দুটো। নিঃশব্দে দরজা খুলে সে বেরিয়ে গেছে তার মায়ের কাছে। গঙ্গাতীরে ‘অ-মা’র তখন নাভিধ্বাস আরম্ভ হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টি যেমন পরিমাণে সবচেয়ে বড়ো, এই ষষ্ঠ অধ্যায়টি তেমনি সবচেয়ে ছোটো। অতঃপর

‘প্রাতে আসিয়া শরৎবাবু দেখিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মুখাগ্রি

করিয়া শিশির একদৃষ্টে চিতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার কাঁচের মত স্বচ্ছ চক্ষু শুষ্ক, বারিহীন। নিজের চতুর্দশবয়স্ক বালকের এই নিশ্চল মূর্তি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

মুগ্ধ অধ্যায়ে, সরযু শিশিরকে ডেকে, তাকে এই পরিচারিকার মৃত্যুতে অভিভূত হতে নিষেধ করেছেন। তখন শিশির বলে যে, এ তো তার নিজেরই মাতৃবিয়োগ হয়েছে! সরযু তাতে সংশয় প্রকাশ করাতে শিশির সেই নীল খাতা, আংটি আর কোম্পানীর কাগজ শরৎবাবুর সামনে ফেলে দিয়ে সরযুকে বলে, 'বাবাকে জিজ্ঞাসা করো, অ-মা আমার কে।'

প্রকাশচন্দ্র লিখেছেন : 'তাহার কণ্ঠে বজ্র ; চক্ষে আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখ মেঘ।'

এই বলে সেকালে প্রকাশচন্দ্র তাঁর এই গল্প শেষ করেছিলেন।

এও মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এ ঠিক 'ধেনো' উপন্যাসের নমুনা নয়। নারীর মূল্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে-গ্রন্থে যে অতুলনীয় দেখা গেছে এ যেন তারই পূর্বাভাস! শীতের আগে হেমন্তের হাওয়ায় যেমন হিমের আভাস বোধ হয়।

'ধেনো'-উপন্যাস অল্প এক বস্তু। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই উদ্ভট, কৃত্রিম, আজগুবি ব্যাপারের বিরুদ্ধে ছিলেন।

নাট্যবিষয়ক একমাত্র দ্বিমাসিক

সুত্রধার

শারদীয়—২য় বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ॥ মূল্য এক টাকা।

বিশেষ আকর্ষণ : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের পূর্ণাঙ্গ নাটক

অন্যান্য রচনায় ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, মনমথ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ রথীন রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

॥ ১০-এ অস্থিনী দত্ত রোড, কলকাতা ২৯ ॥

প্রতিভার অপমৃত্যু

ভবানী মুখোপাধ্যায়

কবিতা কি? কবিতা কি বিকারের একটা অভিব্যক্তি? জীবনের জালা জুড়ানোর জন্ত সর্বক্লেশহর বটিকা? প্রার্থনা? মন্ত্র আবৃত্তি? সারল্য-ভরা এক লুপ্ত জগতের জন্ত মনোবেদনা? অক্ষম পৃথিবীকে বিলুপ্ত করার জন্ত কোনো বিস্ফোরক পদার্থ? হৃদয় এবং মনকে পরিবর্তিত করার জন্ত কোনো আত্মহানি? এর উত্তরে বলা যায়, কবিতা এই সবই এবং আরো অধিক কিছু। যখন ষোলো বছর বয়স তখন অন্ততঃ উনবিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, আর্থার র‍্যাবো এমনই কথা ভেবেছিলেন। বয়ঃসন্ধিকালে র‍্যাবো ভেবেছিলেন যে তিনি তাঁর কবিতার কুঠার দ্বারা জ্ঞানবৃক্ষের মূলে আঘাত করতে পারবেন, এবং তারপর ভালো মন্দের বাইরে অথবা এক জগতে চলে যেতে পারবেন। মাত্র চার বছর লেগেছিল তাঁর এই ঘোর কাটতে। বৃক্ষের মূলে কুঠারাবাত করতে গিয়ে কবি নিজের আঙুলই কেটে ফেলেছিলেন। অনন্তের সন্ধানে যেতে গিয়ে কবির মন অথবা জগতেই চলে গেল। হতাশায় হাতের কুঠার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাই কবি বিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন।

কিন্তু হৃদয়ের জালা বা মস্তিষ্কের যন্ত্রণা থেকে কি ভাবে ত্রাণ পাওয়া যাবে? দান্তের মত তিনি নরকে বেড়াতে যান নি, তিনি নরকে গেছেন পাতকীদের মত। তিনি নেশা সুরু করলেন। স্বরাপানে বিভোর হয়ে অচেতন হয়ে রইলেন। যৌন-বিকারের শিকার হয়ে সমকামিত্বে মাতলেন। নিজের সমস্ত জ্ঞানকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন। এই সব দুষ্কৃতির ছুর্তোগটাই তিনি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করেছেন, উপভোগ নয়। তান্ত্রিকদের মত এ এক বিপরীত বৈরাগ্য সাধন। মানবিক জগৎ থেকে যত তিনি পলাতক হওয়ার প্রয়াস করেছেন, যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তত বেশী।

র‍্যাবোর প্রতিটি স্বপ্ন পরিশেষে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বাড়িতে কঠোর প্রকৃতির জননী, সেইখানে আপনাকে বন্দী মনে হত কবির, তাই তিনি এক নতুন স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন যেখানে তিনি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম। প্রয়োজনের প্রাচীরে তাঁকে বার বার মাথা খুঁড়ে মরতে হয়েছে। প্রকৃত প্রেমের স্বপ্ন দেখেন র‍্যাবো, কিন্তু জীবনে প্রত্যক্ষভাবে যা পান তা বিরজিকর

র‍্যাবো সারলোর এক সংসারের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে পাপ বা পুণ্যের কোনো সংস্পর্শ নেই, কিন্তু পাপচক্র থেকে জ্ঞান পাওয়ার যতই তিনি চেষ্টা করেন ততই দৃঢ়ভাবে সেই চোরাবালিতে তাঁর পা ডুবে যায়। বাউগুলে, কিংবা চোরাঅস্ত্রের চালানকারী বা ক্ষুদ্রে সওদাগরী তাঁর মুখ থেকে অমৃতের স্বাদ মুছে দিতে পারে না। র‍্যাবো এক নতুন ভাষার স্বপ্ন দেখেন, যে ভাষায় সব জ্ঞান ধারণ করা যাবে, কিন্তু বুঝতে পারেন যে বহু ব্যবহৃত প্রবীণ ভাষাই তাঁর সম্বল, কারণ নতুন ভাষা হবে হ য ব র ল।

॥ ২ ॥

তরুণ কবির মুখাকৃতি দেখলে মন ব্যাথায় ভরে ওঠে, যেন এক দেবশিশু, সারলোর প্রতিমূর্তি। ভ্যান গগ বা আঁতোয়ান আরতুর মুখেও ছিল এই আহত সারলোর অভিভাব্যক্তি। যে সূর্য্যমান-সূর্য ভ্যান গগকে উন্মার্গগামী করেছিল, র‍্যাবোর জগৎ ছিল তার থেকে মুক্ত। যে-ক্রোধের আধিক্যবশতঃ আঁতোয়ান আরতু প্রায় উন্মাদ হয়ে গিছিলেন, যার ফলে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন—“to all those who are servile to the imbecility which oppresses them and with which they copulate day and night.”

তবে র‍্যাবোর মধ্যে সেই বিদ্রোহিতকর আত্মাহুসন্ধানের আবেগ ছিল। ভ্যান গগ এবং আঁতোয়ান আরতুর মতো আপনাকে ঘিরে পলে পলে ঘুরে মরতে গিয়ে র‍্যাবোও আত্মহারা হয়ে গেছেন এবং আত্ম-আবিকারের পর মাথা ঘুরে গেছে। সেই যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তার ফলেই তিনি মাদকদ্রব্য সেবন করলেন, সেই মাদকদ্রব্য কখনও গজিকা (hashish)। কখনও স্বপ্ন, আর স্বপ্নভঙ্গ হলে কাজ, গচ্ছময় অর্থকরী কাজ। যা হয় কিছু একটার মধ্যে ঢুকে থাকতে হবে।

যে-কবি আপন গানের গলাটিপে তাকে হত্যা করেছেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কে পরিহাস করবে? হয়ত তিনি অপরিণত, তাঁর যন্ত্রণার মধ্যে হয়ত বয়ঃসন্ধির স্পর্শ আছে। কিন্তু ভ্যান গগ যখন প্রেমের প্রমাণ হিসাবে নিজের আঙুল পুড়িয়েছিলেন কিংবা কান কেটে ফেলেছিলেন তখন কি তিনি পরিণত ছিলেন? আর আরতু যখন যা কিছু শব্দের অর্থ এবং আত্মা আছে তাকে ‘swine’ বলেছিলেন, তখন কি তিনি স্বস্থ মস্তিকে ছিলেন?

র'্যাবোর স্বপ্ন বয়ঃসন্ধির স্বপ্ন হতে পারে, কিন্তু সব স্বপ্নই কি তাই নয় ? এমন কি ত্রায় বা মৈত্রীর স্বপ্নও তাই। র'্যাবো অগ্রাহ্য করেছেন। এ যুগে আমরা সবাই যখন চাঁপাগলায় কথা বলতেই পছন্দ করি তখন যদি কেউ সহসা বলে ওঠে—“I have stretched rope from steeple to steeple, garlands from window to window ; golden chains from star to star.” তখন কি আমরা অস্বস্তি বোধ করি না ? এই উক্তিকে আলাঙ্কারিক মনে করলে ভুল করা হবে। এই উক্তি সেই মানুষের, যিনি মনে করেছেন যে একটা নতুন ভাষার সন্ধান পেয়েছেন তিনিই চীৎকার করতে পারেন। কারণ, তাঁর ধারণা এইভাবেই তার বক্তব্যের অর্থ বোধগম্য হবে। এই বাণী সেই মানুষের, যার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে, আর সেই বাকরোধের কারণ যিনি, তিনি শব্দরিক্ত হয়েছেন, তাই এই ধ্বনি যেন রুদ্ধকণ্ঠের আর্তনাদ !

মিস এনিড ষ্টারকির পূর্ণলিখিত Arthur Rimbaud গ্রন্থে আমরা কবিকে যেমন পাই, তেমনই শুনতে পাই তাঁর রুদ্ধকণ্ঠের আর্তনাদ। মিস ষ্টারকি যা কিছু বলার আছে সব বলেছেন আর এই গ্রন্থ পাঠ করার পর আমরা কবির আকৃতি পাই না—কিংবা এমন এক আকৃতি আমাদের মনে ছাপ রেখে যায় যা মুছে ফেলা কঠিন, যা শয়নে, স্বপনে, জাগরণে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিশোরকুমার, নীল চোখ আর তার সেই চোখে জগতীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। পনেরো বছরের ছাত্রের মায়াময় মুখ, মাথায় যার স্বপনের পসরা, তার কথায় মন ভরে যায়।

এই তরুণ আত্মসমর্পণ করে লাম্পাটো। এই কবি মনে করেন যে তিনি ঈশ্বরের সমতুল্য, এই অপরিচ্ছন্ন ছোকরার সঙ্গেই একদিন থিয়েটারে ভের-লাইনের হঠাৎ দেখা। এই ক্রুদ্ধ ভবঘুরে একদিন অত্যা এক কবির কণ্ঠে নিজের কবিতার আবৃত্তি শুনে বলে উঠেছিলেন “Shit”, সেই কবিকে তিনি অবশ্য অপছন্দ করতেন। আবার এই কবি মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে অস্ত্রের চোরা চালানীর কারবারে সন্তর্পণে ছুটে চলেছেন দিনের পর দিন। সওদাগর হিসাবে এই কবির রক্ষিতা একজন হা রা রি জীলোক। খঞ্জ হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই কবি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। মৃত্যুপথযাত্রী অবশেষে আপন ধর্ম বিশ্বাসে ফিরে আসে। অথচ এতদিন তাকেই সে ভয় করে

এসেছে। এই আবৃত্তি নিঃসঙ্গ মানুষের আত্মমনের আকৃতি আর পরাজয়ের ক্রন্দন।

॥ ৩ ॥

ডঃ মিস্ এনিড ষ্টারকী র‍্যাবো সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত, বস্তুতঃ তাঁর চেয়ে অধিকতর র‍্যাবো সম্পর্কিত জ্ঞান আর কারো হয়ত নেই। র‍্যাবো সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Arthur Rimband-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ, তারপর ১৯৪৭-এ দ্বিতীয় সংস্করণ, আর—সম্প্রতি ফেব্রুয়ারি এ্যাণ্ড ফেব্রুয়ারি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গিত একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এই স্মৃতিগ্রন্থ গ্রন্থটির দাম পঞ্চাশ শিলিং। আর্থার র‍্যাবো সম্পর্কিত নতুন তথ্য এবং নতুন আবিষ্কারের ভিত্তিতে এই গ্রন্থটির পুনরাবর্তীত্ব ঘটেছে।

ডঃ ষ্টারকী মনে করেন র‍্যাবো রহস্যের মূল সমস্যা আছে তিনটি। বিপরীতধর্মী অসংখ্য ঘটনা এবং বহুবিধ জটিলতার মধ্যে কবির নিখুঁত রেখাচিত্র অঙ্কন কি সম্ভব? দ্বিতীয়তঃ “Illuminations” নামক যে কাব্য-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ষাটবছর নিরুদ্দেশ থাকার পর সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার রচনাকাল কবে? খ্যাতির ও শক্তির সর্বোচ্চশিখরে পৌঁছে আর্থার র‍্যাবো যে সাহিত্য ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন তার কারণ কি? অথচ তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বা তার কাছাকাছি।

যদিচ র‍্যাবো যে বয়সে সাহিত্য জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সারস্বত কর্মে ইস্তফা দিয়েছিলেন সেই বয়সে অনেকে সবে লিখতে শুরু করে তবু তিনি “One of the greatest French Poets in the last years of the Nineteenth century”। যে মানুষ একদা “in the days of his belief in Art, had dreamt of becoming a seer, an angel, the equal to God”; যখন লেখার কাজ ত্যাগ করলেন একেবারে বাউণ্ডুলে হয়ে গেলেন—সন্ন্যাস গ্রহণের কথা চিন্তা করেও ইথিওপিয়ান সোমালি উপকূলে চোরাই অস্ত্র আমদানি এবং দাস ব্যবসায়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রকৃতির এই বিপরীতধর্মী আকৃতির কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

অনেক সমালোচকের মতে র‍্যাবোর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ‘কবিতা’র আর কোনও মূল্য ছিল না তাঁর কাছে, বয়ঃসন্ধিকালে যেমন সব মানুষের মনে

কবিতার কণ্ঠস্বর প্রবৃত্তি জাগে, এও সেই রকম —“The upheaval in his nature caused by puberty.”

কবিতার রাজ্যপাট থেকে কবির এইভাবে স্বেচ্ছানির্বাণনকে আর এক সমালোচক কবির শক্তির বক্তব্য বলেছেন। ডঃ মিস এনিড ষ্টারকীর মতে—
“at the height of his greatest creative activity, he believed that like Faust he had acquired supernatural powers through the agency of magic, and imagined that like Faust, he had become the equal of God and eventually that his sin of pride and arrogance had been as great as deserving of condemnation.”

র‍্যাবোর বিশ্বাস হয়েছিল যে অভিব্যক্তির অত্যন্ত এক যন্ত্র কবিতা বটে তবে তা মানবিক বিবর্তনের সর্বোচ্চ ভঙ্গী নয়। কবিতা তাঁকে ত্যাগ করে এবং তিনি যখন দেখলেন যে অহংকারের পাপ তাকে আশ্রয় করেছে তখনই তিনি কাব্যের পথ ত্যাগ করেন। র‍্যাবোর জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রোহভেদী—
“the deliberate and mistaken turning away from his own mode of expression, poetry, for as far as we can Judge, the only moment of real happiness and satisfaction which he ever enjoyed in his life was during the period of his creative activity, when he believed in art and in himself.”

॥ ৪ ॥

এই কারণেই কবির আকৃতি আমাদের উদ্ভ্রান্ত করে তোলে, তখন আমরা সবিস্ময়ে ভাবি কোন সে স্বদূর দিগন্ত যার আবিষ্কারে কবি অনন্তে বাঁপ দিয়েছেন। কোন্ সেই তীর প্রান্ত, যেখানে আত্মাকে বাঁধার মত কোনো শক্তি নেই, সেই স্বদূরেই এক আদর্শ সন্ধানে ছুটেছিলেন র‍্যাবো, এবং তারই ফলে শেষ পর্যন্ত আপন হারা হয়েছিলেন। গৃহকোণের উষ্ণতা র‍্যাবো শিশুবয়সে লাভ করেন নি, জীবন সম্পর্কে এই অনীহা কি তারই ফল? খুব যে বেশী তাঁর দাবী ছিল তা নয়, পরবর্তী জীবনে আর্থার র‍্যাবো চেয়েছিলেন ঘরপী আর ঘর। ধন নয়, মান নয়, একখানি বাসা। তাও পাননি।

কয়েক বছর ধরে তান গভীর ভাবে ভেরলাহনের অনুরক্ত ছিলেন। প্যারীতে তখন কম্যুনের কাল। র‍্যাবোও বেরিয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বাসনায়। সেই সময় ভেরলেনকে তিনি একটি কবিতা উপহার পাঠান। ভেরলেন ত' কবিতা পেয়েই র‍্যাবোকে চিঠি লিখলেন, তার পাঠ হল, “প্রিয় বন্ধু! হে মহাত্মা!” আর লিখলেন : “সমগ্র প্যারী আপনার প্রতীক্ষায় আকুল!”

র‍্যাবোর তখন ষোলো বছর বয়স, সেই দিনই তিনি লিখেছিলেন ‘মাতাল তরণী’। তারপর ছুটলেন প্যারীতে। ভেরলেন আর র‍্যাবো, দুজনের প্রথম দর্শনেই প্রেম, তারপর নববিবাহিতা স্ত্রী, খ্যাতি ইত্যাদি ফেলে ভেরলেন র‍্যাবোকে নিয়ে চললেন পর্যটনে দেশ থেকে দেশান্তরে। শেষ পর্যন্ত ব্রাসেলকে ভেরলেন র‍্যাবোকে একদিন পিস্তল ছুঁড়ে আহত করলেন কাব্য জগৎ থেকে র‍্যাবোর বিদায়ের কাল সমাগত। কুড়ি না হতেই কিশোর কবি কাব্যস্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে পথে পথে ঘুরেছেন, এই ভাবেই বেঁচেছিলেন সঁইত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত।

ভেরলেন এবং র‍্যাবোর এই প্রেমের পরিণতি যা হয়েছে তাই অবশ্যস্বাবী। দুজনের প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন। র‍্যাবো ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস পছন্দ করতেন না, ভেরলেন যতই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন, র‍্যাবোর অশ্রদ্ধা তত বেড়েই ওঠে।

জীবনের শেষ দিকে র‍্যাবো তার বালক ভৃত্য দজামিকে ভালো বেসেছিলেন, উইলে তার জন্ত কিছু অর্থও রেখেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তার ভগ্নীর প্রতিও আকৃষ্ট হন। এই মেয়েটি মৃত্যুকালে কবির যথেষ্ট পরিচর্যা করেছিল।

এই সব অনুরক্তির ইতিহাসের পিছনে আছে কিন্তু অশ্রুভরা বেদনা। এ বেদনা পরাজিত মানুষের, যা কিছু স্নেহ, যা কিছু প্রীতির পরিচয় সে পেয়েছে তাই সে নিমজ্জমান ব্যক্তির মত আঁকড়ে ধরেছে। যৌবনে ডাষ্টবিনে আহার কণিকার সন্ধান করতে হয়েছে র‍্যাবোকে। আর উত্তরকালে তাঁকে সন্ধান করতে হয়েছে প্রেমকণিকার। যারা মনে করেন যে তিনি কাব্যলব্ধীকে ত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নাহিত্যের প্রতি তাঁরা ভ্রান্ত। তাঁরা একথা মনে আনেন না যে কবির এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন আত্মহননের আর এক অভিব্যক্তি। নির্বাসনকালে তিনি যে সব

পত্র লিখোছিলেন তাতে কাব্য সম্পর্কে এতটুকু হাঁদিত নেই, এবং আতোয়ান আরতু যাকে বলেন—*The Stale odours of a mind which is well-fed because the man himself is well-fed.*” তাও নেই।

॥ ৫ ॥

ডঃ মিস ষ্টারকী অশেষ ক্লেশ সহকারে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে *“Une Saison En Enfer”* (একটি ঋতু-নরকে) র‍্যাবোর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ নয়, *“Illumination”*-এর কিছু কিছু অংশ পরবর্তীকালের রচনা। কিন্তু তার কি কোনো প্রয়োজন ছিল? যে কবি কিশোর বয়সে এত নতুন ধরণের কবিতা লিখে মনে করেছিলেন পৃথিবীর মুক্তি আনবো? তাকে তার দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে উদ্ধার করবো, তিনি শুধু সেই কবিতা নয়, সকল রকমের কবিতা থেকেই চিরবিদায় নিয়েছিলেন।

“Une Saison En Enfer” এ কবির স্বপ্ন জগতের সবটুকুই বিপর্যস্ত, ভেঙে চূর্ণমার—কবি চীৎকার করছেন *“Good Luck ! I cried, and I saw a sea of flames and smoke in the sky ; to the right, to the left, all the riches of the World flaming like a billicon thundear-bolts”*

শুধু বিশ্বজগৎ নয়, প্রেমও জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর সামনে এখন আছে এক উন্নত জনতা—*“I saw myself before on infuriated mecb facing the firing squad, weeping out of pity for their being unable to understand, and forgiving !”*

যে মূল্য তিনি স্বীকার করেননি সেই মূল্য দ্বারা বিচারে তাঁর আপত্তি ছিল, তিনি তাই বলেছেন *“Priests, professors, masters you are making a mistake in turning me over to the law. I have never belonged to these people, I have never been a Christian ; I am of the race that sang under torture ; laws I have never understood ; I have no moral sense, I am brute. You are making a mistake.”*

আর্থার র‍্যাবো কাব্য জগত থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তার কারণ কবিতার মাজিক তাঁর কাছে মরীচিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবিতাকে

পর্যায়নের একটা উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে তিনি রাজী নন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে তিনি তাই স্বীকৃতি দিতে চান।

কবি হিসাবে র‌্যাঁবো কুড়ি বছরেই আত্মহত্যা করেন, বাকী সত্তেরো বছরের জীবন আর্থার র‌্যাঁবোর প্রেতজীবন। কিন্তু জীবনের শেষ ছ'তিন দিন মাত্র আর্থার র‌্যাঁবো বিদ্রোহী রণক্লান্ত হয়ে শান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবন নয় মৃত্যুই র‌্যাঁবোকে শেষ পর্যন্ত শান্ত করেছে। কিন্তু শেষ অংকের আত্ম-নিবেদন নয় প্রথম অংকের বিদ্রোহই আমাদের অন্তরস্পর্শ করে।

তার কাব্যশক্তিকে দৃঢ় করেছে এই ভাব—এই অবস্থা, মিস্টারকীর মতে, প্রেরণা শক্তি, “Words with him are no longer intended to bear their dictionary meaning ; they are no longer to express a logical content, or to describe ; they are a form of magic charm, they are intended to evoke a state of mind and soul. The essence of poetry does not consist in the words, or in the images—however beautiful these might be—poetry is the very sensation itself, and this sensation is to be allowed to find its own best expression, just as the lava stream burns out its own bed.”

বর্তমান কাল রুঢ়, রক্ষ কাল। একালের মাপকাঠিতে বয়ঃসন্ধির স্বপ্নবিলাসী কবির বয়ঃসন্ধি কালীন বিদ্রোহ উপেক্ষিত হতে পারে। তবে তার বিচার হবে নির্বোধের বিচার। কিশোর কবির উদ্দামতাকে এ যুগের দৃষ্টিতে বিচার করলে ভুল হবে। যদি এই তর্ক করা যায় যে কেবলমাত্র কুড়ি বছরের অপরিণত কিশোরের পক্ষেই কাব্যের প্রতি এতখানি আস্থা রাখা সম্ভব, জ্ঞানবৃক্ষের মূলে কুঠার চালনা করার চিন্তা করাও সম্ভব। সব চেয়ে আশ্চর্য, বয়সে অনেক কম হলেও অনেক পরিণত বয়স্ক যা জ্ঞান লাভ করতে পারে না, র‌্যাঁবো তা পেয়েছিলেন মাত্র কয়েক বছরেই। এই জায়গায় পৌঁছাতে অপর অনেক লেখকের অনেক বছর লেগেছে। আর এই অবস্থার কথাই Samuel Beckett বলেছেন—“there is nothing to express, nothing with which to express, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, together with no obligation to express.”

নতুন বই

উপগ্রন্থাস		
মসিরেখা	জরাসন্ধ	২'০০
বিকিমিকি জোনাকি	কুশাহু বন্দ্যোপাধ্যায়	২'৭৫
উত্তর তোরণ	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩'৫০
সবার উপরে	সীতাদেবী	৪'৫০
নয়া পতন (১ম)	সুদীন চট্টোপাধ্যায়	৪'০০
উর্বশীর তালভঙ্গ	প্রিয়দর্শিনী	৬'০০
হংস-মিথুন	শৈলেশ দে	২'৫০
গল্প		
বারোভূতের আসর	পরিমল গোস্বামী	৫'০০
ভারতীয় গল্প সংকলন	বোমানা বিশ্বনাথন (অনুদিত)	৪'০০
অর্কিড	স্ববোধ ঘোষ	২'৫০
প্রবন্ধ		
ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস	ডঃ স্কুমার সেন	১৫'০০
নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি	ডঃ স্ববোধরঞ্জন রায়	৬'৫০
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়)	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১২'৫০
সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১২'০০
বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও	গল্পকার ভূদেব চৌধুরী	১৬'০০
মধুসূদনের কাব্যালংকার	ও কবিমানস	
মাইকেল-জীবনীর আদিপর্ব	ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৬'০০
রামায়ণ ও ভারত-সংস্কৃতি	ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৬'০০
সাহিত্য শিল্প	প্রবোধচন্দ্র সেন	৪'০০
সাহিত্য ও সমাজ মানস	ভোলানাথ ঘোষ	৩'০০
	নারায়ণ চৌধুরী	৩'০০
জীবনী		
গরীয়সী গোরী	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪'৫০
	স্মৃতিকথা	
নিজেমে হারামে খুঁজি	অহীন্দ্র চৌধুরী	১৬'০০

সাহিত্যিকের সাধনা

বনফুল

আমার জীবনে অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। অগ্নিযুগের বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ দেখেছি, গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতিচক্রকে দেখেছি। দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, বিহারের ভূমিকম্প দেখেছি, পঞ্চাশের মন্বন্তরে অন্নহীন মানুষদের হাহাকার শুনেছি। দেশের বুকে খড়্গ হেনে যে স্বাধীনতা এল তাও দেখলাম। চোখের সামনেই হিন্দু-মুসলমানের রক্তের দেশের মাটি ভিজে গেল। প্রতিদিন অনুভব করেছি, যে বাঙালীরা একদিন ভারতে সর্বক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল আজ তারা সর্বক্ষেত্রেই অনেক পিছনে পড়েছে। এর কারণ শুধু রাজনৈতিক চক্রান্ত নয়, এর আসল কারণ আমাদের চারিত্রিক অবনতি ঘটেছে। উন্নতশির, ঋজু মেরুদণ্ডশালী শুভ্র-চরিত্র লোক আমাদের দেশে কমে আসছে।

সাহিত্যিকের কাজ মানুষকে বড় হওয়ার প্রেরণা দেওয়া, তার সামনে বলিষ্ঠ সমর্থ শাস্ত্র মনুষ্যত্বের আদর্শ তুলে ধরা, তার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, তাকে অজ্ঞায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করা, তার মনে প্রতিবাদ করবার সাহস সঞ্চার করা।

সাহিত্যিকের এই মহৎ আদর্শ আমি কতকটা পালন করতে পেরেছি তা জানি না, তবে এইটুকু জানি, পালন করতে চেষ্টা করেছি।

এই সভায় অনেক জ্ঞানী গুণী সাহিত্যিক শিল্পী আছেন। তাঁদেরও আমি আন্তরিক অনুরোধ করছি, দেশকে বড় করুন, দেশের মহত্ত্ব আবার ফিরিয়ে আনুন। ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলুন। যে সূর্য অস্ত গেছে তা আবার উঠবে এই আশ্বাসের বীজ বপন করুন সকলের মনে, তা হলেই অন্ধকার কেটে যাবে।

[সংবর্ধনার উত্তরে প্রতিভাষণ, ২২ জুন, ১৯৬২]

প্রবোধচন্দ্রিকা

স্বধীর করণ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের স্থান সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বাঙলাগতের সেই শৈশব-যুগে তিনিই ছিলেন ‘শিশুমাবে যেমন মণ্ডল’। তাঁর রচিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছিলেন পঞ্চগোরার অন্ততম গৌরান্দ, জন ক্লার্ক মার্শম্যান। ভূমিকা-রচনার কাল : পনেরোই মে, আঠারো’শ তেত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ; স্থান শ্রীরামপুর। মৃত্যুঞ্জয় অবশ্য ভূমিকা-পাঠের স্বযোগ পাননি। কারণ, প্রবোধচন্দ্রিকার আত্মপ্রকাশের বহুপূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। আঠারো’শ উনিশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তীর্থভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি যখন দেশে ফিরে আসছিলেন, তখন ‘পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্বক পরলোক প্রাপ্ত’ হন। তৎকালীন সংবাদপত্র সমাচারদর্পণ এই সংবাদ প্রকাশ করেছিল। প্রবোধচন্দ্রিকার রচনাকাল আঠারো’শ তের খ্রীষ্টাব্দ। রচনার কুড়ি বছর পরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল।

কেরী এবং মার্শম্যান, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। মার্শম্যানের ভাষায়, মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন—*Profound scholar of the age* এবং *Colossus of literature*। প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য ছিল ‘সিভিলিয়ান’দের বাঙলাভাষা ও সাহিত্য শেখানো। ফিরিঙ্গিদের বোধের জগত তাঁর এই প্রচেষ্টাকে হঠাৎ ফিরিঙ্গি-বোধের কাজে লিপ্ত হ’তে দেখলেও এক এক সময় অবাক হবার মতো কিছু থাকে না বটে, কিন্তু বাঙলাগতের সেই প্রথম সূর্যোদয়ের কালে প্রবোধচন্দ্রিকার মতো একটি বহুমুখী গ্রন্থ যে-ভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং ভাষা-প্রীতিকে গভীর আন্তরিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে তা’ সে যুগে তুলনাহীন। নিছক কলেজীয় উদ্দেশ্যস্বার্থই তাঁকে প্রভাবিত করেনি। মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের ফলেই প্রবোধচন্দ্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল, এ কথা বিশ্বাস করার উপযুক্ত কারণ অনেক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে প্রবোধচন্দ্রিকা রচিত হয়েছিল এ কথাকে অস্বীকার না করেই উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করা যেতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বাঙলাভাষা ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশীয় ভাষা জানতেন এবং ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল বলেই অনুমান করা যেতে পারে। এই সমস্ত ভাষা অপেক্ষা বাঙলাভাষা যে শ্রেষ্ঠ, এ ধারণা; তিনি প্রদ্বার সঙ্গেই এবং যুক্তিযুক্তভাবেই পোষণ করতেন এবং প্রবোধচন্দ্রিকাতে তাঁর অভিমত প্রদান করে বলেছেন : “অগ্ৰাণ্ণ দেশীয় ভাষা হইতে গোড়দেশীয় ভাষা উত্তমা,—সর্বোত্তমা-সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য হেতুক। যেমন দুই এক পণ্ডিতাবিধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাবিধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যনুমানে সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গোড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচনা করিতেছেন।”

প্রবোধচন্দ্রিকার সমমানযুক্ত অন্য একটি গ্রন্থ সেকালে আর রচিত হয়নি। এমন একটি বিচিত্র সাহিত্য-গ্রন্থ অন্য কোন পণ্ডিতের নিকট থেকে আর পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন বিবরণের একটি অসামান্য গ্রন্থ রূপেই এটি তৎকালে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্য-মানসিকতা সম্পর্কে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন, সে কথা প্রবোধচন্দ্রিকা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলা যায় : “যেখানে তাঁহার সহযোগীরা এক ঘোড়ার একাগাড়ীতে কোনও মতে টাল বাঁচাইয়া চলিয়াছেন সেখানে মৃত্যুঞ্জয় বহু অশ্ববাহিত রথের আরোহী হইয়া মন্থন স্বচ্ছন্দগতিতে ও সম্ভ্রান্ত চালে স্থির লক্ষ্যভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন।”

মৃত্যুঞ্জয় হিতোপদেশ-এর বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন আঠারোশ আট শ্রীষ্টান্দে। প্রবোধচন্দ্রিকা রচনাকালে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। কিন্তু সে প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বহিরাঙ্গিক। শ্রীল শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূপাল-তনয় শ্রীল শ্রী বৈজ্ঞানিক তাঁর পুত্রের শিক্ষার্থে প্রভাকর নামে নানা-শাস্ত্রবিদ একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন। অধ্যাপক প্রভাকর, রাজপুত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে যে শিক্ষাদান করেছিলেন, তাঁরই বিবরণ আছে এই গ্রন্থে।

আসলে; পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারই নানাশাস্ত্রাধ্যাপক ব্যাকরণাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তিবান প্রভাকর শর্মা এবং রাজপুত্র শ্রীধরধর বর্মা ‘অভিনব যুবক সাহেবজাতের’ প্রতিভূ।

প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থ সম্পর্কে মার্ম্যান তাঁর লিখিত ভূমিকায় বলেছেন—

This work was composed by the late Mrityunjoy Vidyalanker one of the most profound scholars of the age,

and for many years chief Pundit in the college of Fort William, for the use of the Young Gentlemen of the Civil Service studying in that institution. The work, which he left unpublished at his death, consists chiefly of narratives from the Shastras, written in purest Bengali, of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens."

মৃত্যুঞ্জয়ের অসামান্য পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন মন্তব্যও বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। অল্পবাদকার্ণে মৃত্যুঞ্জয়ের দক্ষতা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসা এবং পারিতোষিক লাভ করেছিল। পনেরো বছর ধরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। আঠারো'শ বোল খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের জজপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করে তিনি কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন।

প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থের বিষয়-বৈচিত্র্য উইলিয়াম কেরীকেও মুগ্ধ করেছিল। আঠারো'শ উনিশ খ্রীষ্টাব্দের পাঁচই জানুয়ারী, কলেজ কর্তৃপক্ষকে কেরী একটি পত্র লিখেছিলেন। প্রবোধচন্দ্রিকা রচনার জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে যাতে তিনশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়—এই সুপারিশই পত্রটির মূল বক্তব্য ছিল। অত্যাশ্চর্য বক্তব্যের মধ্যে গ্রন্থটির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন: 'It is a sketch of the whole cycle of Hindoo Literature, illustrated by familiar examples and interspersed with anecdotes intended to exemplify the different sciences described therein'.

॥ ২ ॥

বাঙলাভাষায় সাধু ও চলিত রূপের বিভিন্ন নিদর্শন প্রবোধচন্দ্রিকায় রক্ষিত। চলিত ভাষায় যথেষ্ট গ্রাম্যতার উপস্থিতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অশালীনতার আভাস থাকা সত্ত্বেও একথা সহজগ্রাহ্য যে মৃত্যুঞ্জয় চলিত ভাষায় কৃতী রচনাকার ছিলেন। সাধুভাষার ক্ষেত্রে তিনি স্বভাবতঃই আড়ষ্ট এবং কোন কোন সময় কৃত্রিম কিন্তু তাঁর চলিত ভাষা 'ভালগারিটি' সত্ত্বেও সজীব এবং গতিশীল। মার্শম্যান অবগ্রহই সংস্কৃত-অহুসারী ভাষাকেই purest Bengalee নামে অভিহিত করেছিলেন এবং সেই ভাষাকেই বাঙলাভাষার মূখ্য আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁর দৃষ্টিও যথেষ্ট পরিমাণে স্বচ্ছ ছিল। তিনি এ

আশংকাও প্রকাশ করেছিলেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা তুর্বোধ্য মনে হতে পারে। ভাষার ভাল্গারিটি যে হাত্তরস পরিবেষনের জন্ত একেবারে অসমীচীন নয়, এ যুক্তিও তিনি দিয়েছিলেন। প্রবোধচন্দ্রিকার ভূমিকাতে তাঁর বক্তব্য এই ভাবেই পরিস্ফুট : The writer anxious to exhibit a variety of style has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders : the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour. In other parts of the work he has drawn so freely on the Sungskrit that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance.”

প্রবোধচন্দ্রিকা রচনাকালে মৃত্যুঞ্জয় সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ভাষাকে বর্জন করেছিলেন এবং বিদেশীভাষার প্রভাববর্জিত বাঙলা ভাষাকেই আদর্শ ভাষা রূপে স্বীকৃতি দান করেছিলেন। মার্শম্যানের ভাষায় : “All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of this compilation.”

প্রবোধচন্দ্রিকা সম্বন্ধে মার্শম্যানের চূড়ান্ত বক্তব্য হচ্ছে : “Any person who can comprehend the purest work and enter into the spirit of its beauties may justly consider himself master of the language.” উনবিংশ শতাব্দীর আদিপর্বে বাঙলা ভাষার অল্প কোন একটি গ্রন্থ সম্পর্কে এই মন্তব্য নিশ্চয়ই স্বপ্রযুক্ত হতো না। এমন একটি বহুমুখী গ্রন্থ সেকালে আর রচিত হয়নি। জ্ঞান, নীতি, দর্শন, ব্যাকরণ, পুরাণ ইতিহাস লোককথা জাতিবিবরণ এবং আরও বহু কিছু—কখনও বা ‘কথা’র মাধ্যমে, কখনও বা গুরু-গস্তীর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বাঙলা-ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষার পক্ষে গ্রন্থটির বিশেষত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বাঙলা ভাষার প্রথম যথার্থ গন্ত-শিল্পী হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার অধুনা স্বীকৃত। পরবর্তী সময়ে পণ্ডিতী ভাষার জন্ত তাঁকে অবশ্য যথেষ্ট লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর জীবৎকালে শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতিই লাভ করেছিলেন তিনি। আসলে, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী, সংস্কৃত-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কেই বিচার করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যুগন্ধর-শক্তি মৃত্যুঞ্জয়ের কৃতিত্ব যে সংস্কৃতধর্মী ভাষাপ্রয়োগে নয়, তাঁর আসল কৃতিত্ব যে বাঙলা সাধু এবং চলিত গন্তভাষার প্রয়োগে, এ কথা কোনক্রমেই অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁর চলিত

প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিনয় ঘোষ-কৃত
বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকরগ্রন্থ

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

(প্রথম খণ্ড—১২'৫০)

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণ তদানীন্তন বাংলা সাময়িকপত্র থেকে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনাবলী এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল। অতি দুপ্রাপ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য পত্রিকা যেটে বাংলার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা সংযোজিত। ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরো ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থ প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্য বৃহৎ রয়েল অস্ট্রীভো সাইজের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বই, আর্টপ্লেট ও বোর্ড-বান্ধাই সমেত নামমাত্র করা হয়েছে।

ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজকর্মী সকলের পাঠযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিজ্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
সচিত্র সংস্করণ ৫'৫০ ॥

* প্রতীচির মহাকাব্যগুলি থেকে চয়িত অল্পপম কথাসাহিত্য সংগ্রহ

AFRICANISM : Rs. 16/-

দেবেশ দাশের

নবগোপাল দাসের

রাজসী (২য় মুঃ)

৩'০০ ॥

এক অধ্যায় (২য় মুঃ)

৩'০০ ॥

অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বসুর

ভারতের চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১ আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মুঃ) ৪'০০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর

প্রমথনাথ বিশীর

ইংলণ্ডের ডায়েরী

৪'০০ ॥

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গেই প্রমথ চৌধুরী, তেরশ একুশ বঙ্গোন্দের সবুজ পত্রের একটি সংখ্যায় লিখেছিলেন : “এ ভাষা অস্বদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাঙলা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত ; ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই এবং এ ভাষা যে সাহিত্যরচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ।...আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা স্বসংস্কৃত ও পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।”

প্রবোধচন্দ্রিকার মুখবন্ধ পাঠে ‘অভিনব যুবক সাহেবজাতের’ যথেষ্ট দুর্ভাবনা হতো নিশ্চয়ই। কারণ বাঙালী জাতের পক্ষেও তা’ অবাঙলা বলেই মনে হয়। “অকারাদি থাকারান্তমালা যতপি পঞ্চাশং সংখ্যকা কিম্বা এক-পঞ্চাশং সংখ্যা পরিমিতা হউক, তথাপি এতাবম্মাত্র-কতিপয়-বর্ণাবলী-বিজ্ঞাস বিশেষ-বশতঃ বৈদিক-লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত-পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্যজাতীয় ভাষাবিশেষবশতঃ অনেকপ্রকার ভাষাবৈচিত্র্য শাস্ত্রতঃ নোকতং প্রসিদ্ধ আছে।” এ ভাষা বাঙালী জাতের পক্ষেও দুর্ভর। মৃত্যুঞ্জয় এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন বলেই তাঁর বাঙালীকে সংস্কৃত রীতির মাধ্যমে প্রকাশ করেননি, শুধু পাণ্ডিত্যকেই প্রকাশ করেছেন। তাই মৃত্যুঞ্জয় যেখানে খাঁটি বাঙালী সেখানে তাঁর ভাষা পুরোপুরি বাঙলা ; নাগরনভাতাপুষ্ট কৃত্রিম বাঙলা নয়, মাটির গন্ধমাখা গ্রাম-বাঙলার বাঙলা। এ ভাষাও সাহিত্যের যথার্থ বাহন নয়, কিন্তু এরই মধ্যে ভবিষ্যৎ চলিত বাঙলার বীজনিহিত ছিল।

সংস্কৃত থেকে সরাসরি গ্রহণের রীতিকে যেখানে তিনি অবলম্বন করেছেন, সেখানেই তাঁর ভাষা অস্বচ্ছ কিন্তু তাও কোনক্রমেই আড়ষ্ট নয়। তাও বাঙলার অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হতে পারে না বটে কিন্তু সংস্কৃত ভাষা থেকে অনায়াসে নিজের একটি স্বচ্ছন্দ গতিপথ খুঁজে নিতে পারে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ থেকে গৃহীত অংশগুলির বাঙলা অনুবাদকেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা-রীতি রূপে গ্রহণ করে “কোকিলকুলকলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছী-করাত্যচ্ছনিবাস্তঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।” প্রভৃতি অংশের প্রচার আমাদের কাছে বহুদিন ধরে স্বীকৃত লাভ করে আসছিল। কিন্তু আসল মৃত্যুঞ্জয় এখানে অনুপস্থিত। যেখানে তিনি কাহিনী বলেন, ‘কথা’* বলেন,

* বিশিষ্টার্থক-তাৎপর্যক স্বকপোল-কল্পিত যে বিষয়, তদর্থক যে গুণসমূহ সে কথা হয়।
—প্রবোধচন্দ্রিকা ॥ প্রথম স্তবক—পঞ্চম কুসুম।

লোককথা-প্রবাদ-প্রবচন বলেন, সেখানে তাঁর প্রকাশ নিঃসংকোচ। চলিত ভাষা অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্যতাদোষছুষ্ট হ'লেও তা সত্যিই প্রাণবান এবং স্থূল হস্তরসহৃষ্টির উপযোগী।

ইংরাজী ভাষার শব্দটি অশ্লীল, অসমীচীন, গ্রাম্য প্রভৃতি অর্থে প্রচলিত; আমাদের কাছে তা' অশ্লীলতারই নামাস্তর মাত্র, এখন কি গ্রাম্যতাদোষছুষ্ট ভাষার অর্থ আমাদের কাছে সেই একই ইংগিত বহন করে আনে। তাই গ্রাম্যতা শব্দের অর্থ এখন পরিবর্তিত। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু গ্রাম্যতা বলতে গুরুচণ্ডালী বুঝিয়েছেন। “গ্রাম্যতা—গাওয়ালিয়াপণ শব্দে লোকে প্রসিদ্ধ। গ্রাম্যতাদোষের প্রসক্তি অসভ্যলোকের কথনেতে হয়।—যেমন হে কান্তে। তোমাকে কাময়মান যে আমি, এতাদৃশ আমাকে তুমি কেন না চাহ।” মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের অর্থে—তাঁর ভাষাকে গ্রাম্যতাদোষযুক্ত বলা চলে না। কারণ প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনি বাঙলাভাষার তিনটি রূপকেই যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। প্রথমটি সংস্কৃতধর্মী—প্রায় অবাঙলা; দ্বিতীয়টি—মাধু বাঙলা এবং প্রায় সংস্কৃতমুখাপেক্ষী এবং তৃতীয়টি খাটি বাঙলা,—নির্ভেজাল কিন্তু সাহিত্যের ভারবহনে অক্ষম এবং শিথিল। এ যেন সন্তোজাত শিশুর মধ্যে একই সন্দেহ স্বর্গ-মর্ত্যের অনুরূপ; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের রূপায়ণ।

উদাহরণঃ ১ ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্তমানা চতুর্বাহরূপা ভাষা অস্বাদিতে যুগপৎ প্রবর্তনানন্তরূপে যতপি প্রতীয়মানা হউন। তথাপি পূর্বোক্ত পরা পশুস্ত্রী মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুর্বাহরূপেতেই প্রবর্তমানা হউন।

২ অতিবড় উদার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছুঁড়িঙ্গ সময়ে অস্বাভাবে পরিজন প্রতিপালনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া এক স্বকীয় গোকো প্রতি হট্টে লইয়া যান।

৩ ব্যাত্ত্রী কহিল, তার আটক কি, সে সর্বনেশে গোসাতে হন হন করিয়া আসিয়া দাঁত কড়মড় চক্ষু কণকণ যখন করে তখন ভয়েতে খোঁকা খুকি গুলির চক্ষু হইতে বারবার করিয়া জল পড়ে ও ছরছর করিয়া মুতিয়া ফেলায়। আমার প্রাণ ধড়ধড় করে, গা থরথর, গরগর, জরজর করে। যদি দৈবাৎ কদাচিৎ অল্প মাংসাদি, তবে ফরফর করিয়া ফিরিয়া যায়। আবার আপনিই থর-থর করিয়া আইসে।

বলাবাহুল্য মৃত্যুঞ্জয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন তৃতীয় উদাহরণের মধ্যেই। প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনি বাঙলা গল্পের আদি-মধ্য-অন্ত রূপের নিদর্শন তুলে ধরেছিলেন ভবিষ্যৎ বাঙলাভাষার সাহিত্যিক রূপটিকে খুঁজে নেবার জন্তই।

বাংলায় কালিদাস-চর্চা

অমলেন্দু ঘোষ

(পূর্বানুস্মৃতি)

১৯১০ [১৩১৭]

মেঘদূত। শ্রীনিতাইচাঁদ শীল কর্তৃক অনুবাদিত। পৃঃ ৮০, ৬৯ [চুঁচুড়া শীলগলি। কলিকাতা, ১০৩১ আহিরীটোলা স্ট্রীট হইতে শ্রীরাজনারায়ণ লাহা কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৭। মূল্য ৥০ আনা।]

উৎসর্গ।—স্নেহভাজন ও অন্তরঙ্গ বান্ধবগণের করকমলে। ভূমিকা।—সংস্কৃত ভাষায় আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। এই কাব্যানুবাদে, পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী মহাশয়ের কৃত চিত্র পাঠ্য ‘মেঘদূত’ের টীকা ও বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ আমায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। সংস্কৃত কাব্য বিশেষতঃ মহাকবি কালিদাসের রচনা, ভিন্ন ভাষায় পদ্যানুবাদ করা যে সহজসাধ্য নহে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আমি যথাসাধ্য মূলের সহিত ভাব ঠিক রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি। তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণই বলিতে পারেন।...

চুঁচুড়া, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ সাল।

পূর্বমেঘ

অনুবাদের নমুনা :

কুবেরের অভিষাপে.কোন যক্ষ অভাজন
সহে রামগিরিশিরে বর্ষব্যাপী নির্বাসন !
প্রিয়ার বিরহশোকে ভেবে প্রাণ জর জর !
প্রেমানলে জ্বলে জ্বলে ক্লেশ কম কলেবর !
তটিনী সরসীচয় যে পবিত্র পুণ্যস্থানে
হইয়াছে পুণ্যোদক জানকীর পুণ্যস্থানে,
রচিয়া আশ্রম যেথা স্নিগ্ধতরুছায়াবৃত
স্নানমুখে যাপে দিন যক্ষ হয়ে জীবন্মৃত ॥ ১

উত্তরমেঘ

শুন, 'ওগো জলধর ! হর্ষাবলী মনোহর
সেই চারু পুরী অলকার ।
নারীবৃন্দে সুশোভিয়া, চিত্রে সুরঞ্জিয়া হিয়া ।
উথলিয়া মুরজবাংকার ।
মণিরত্নে ঝলদিয়া, মেঘমালা পরশিয়া,
তোমার ঐ বিজলী-সনাথ,
ইন্দ্রধনু-সমন্বিত, মুহুমন্দ গরজিত,
সলিলউজল দিনরাত,
মনোহর কলেবর, নিরখি,' হে জলধর !
স্পর্ধা করি' আপনার মনে—
সেই সে প্রাসাদমালা, অলকা করিয়া আলা,
সমকক্ষ হয় তব সনে ॥ ১

১৯১৭ [১৩২৪]

মেঘদূত । (মূল, অদ্বয় ও পত্ন্যভাবাদ) । [শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ অঙ্কুরিত] ।
পৃ. ৮০, ১২০ [পরিশিষ্ট ক—চ] ।

১ম সংস্করণ ১৩২৪ । ৮নং, নেলুয়াপাড়া রোড, খিদিরপুর হইতে

শ্রীপ্রমথনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ।

আখ্যাপত্রে অল্পবাদকের নাম নাই । উৎসর্গ-পত্রে 'পাঁচকড়ি' নামটি
লিখিত আছে ।

পূর্বমেঘ ।

অল্পবাদের নমুনা :

জ্ঞানহেতু জ্ঞানকীর (অঙ্গ পরশনে)
পবিত্রসলিলা (বহে) তটিনী যথায়,
সুশীতল ছায়াতরুমণ্ডিত (কাননে,
নিভৃত) আশ্রমে, সেই রামগিরি-গায়,—
কর্তব্যে বিমুখ বলি' প্রভু অভিষাপে
বর্ষব্যাপী নির্বাসনে গৌরববিহীন,
দয়িতাবিরহজাত গুরু মনস্তাপে
বসতি করিত এক যক্ষ (অল্পদিন) ॥ ১

উত্তরমেঘ ।

(বিজলী সদৃশী) যেথা রূপসী রমণী,—
 (ইন্দ্রধনুবর্ণপ্রায়) শোভে চিত্রসারি,—
 সঙ্গীতে মৃদঙ্গ বাজে (যেন মেঘধ্বনি),—
 মণিময় ভূমি (যেন মধ্যো বহে বারি),—
 অদ্রস্পর্শী,—অলকার প্রামাদ সকল,
 তড়িতজড়িত, ইন্দ্রধনু সমন্বিত,
 স্নিগ্ধঘোরনাদী, তুঙ্গ, অন্তরে সজল,
 সর্বগুণে সমতুল তোমারি সহিত ॥১

এই অল্লাবাদটির পরিমার্জিত নূতন সংস্করণে অল্লাবাদকের নাম আছে ।
 অল্লাবাদেও পরিবর্তন ঘটেছে, তাই নূতন সংস্করণের অল্লাবাদের নমুনাও
 দেওয়া গেল ।

মেঘদূত । মূল, অম্বয় ও পত্নাল্লাবাদ । শ্রীপাচকড়ি ঘোষ অল্লুদিত ।
 মচিত্র । পৃষ্ঠাক ৮০, ১২০, পরিশিষ্ট ক-ঢ ।

নূতন পরিমার্জিত সংস্করণ চুঁচুড়া ; ১৩৪৫ বুদ্ধ পূর্ণিমা । মূল্য ১২ টাকা ।

অল্লাবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ ।

জানকীর স্নানে পূত, (স্বচ্ছ, সুবিমল,)
 নিখরিরিধারা যেথা (বহে ধীরে ধীরে),—
 (চারিধারে শোভে) স্নিগ্ধছায়াতরুদল,—
 (নিভৃত) আশ্রমে সেই রামগিরিশিখরে,
 কর্তব্যে বিমুখ বলি, প্রভু-অভিশাপে
 বর্ষভোগ্য নির্বাসনে গৌরববিহীন,
 দয়িতাবিরহজাত গুরু মনস্তাপে
 বসতি করিল কোন যক্ষ (কিছুদিন) ॥১

উত্তরমেঘ ।

(দামিনী-সদৃশী) যেথা রূপসী রমণী,—
 (ইন্দ্রধনুবর্ণসম) শোভে চিত্রসারি,—
 সঙ্গীতে মৃদঙ্গ বাজে (যেন মেঘধ্বনি),—
 মণিময় ভূমি (যেন মধ্যো বহে বারি),—

অভ্রম্পর্শী,—অলকার প্রাসাদ সকল,
তড়িতে জড়িত, সুরধনুসমন্বিত,
মৃদুঘননাদী, তুঙ্গ, অন্তরে সজল,
সর্বগুণে সমতুল তোমারি সহিত ॥১

নিবেদন : বঙ্গসাহিত্যের বাজারে মেঘদূত-অনুবাদের বোঝা ক্রমশঃ বিলক্ষণ দুর্বল হইয়া উঠিলেও, সেই বোঝার উপর আমাদের এই শাকের আটিও কোনমতে কাটিয়া গেল। মাহুষের রুচি সমান নহে,—‘দিগুনাগ’-দলের মধ্যে দুই-দশ জন ‘নিচুলে’রও অসম্ভাব নাই ; সেইরূপ দশজনের অনুরোধে ইহার একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশের দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছি।—আমাদের এই অনুবাদে কবিতা-রস-মাধুর্য-বিকাশের আকাংখা নাই,—পরলোকগত বন্ধু সুরেশচন্দ্র সরকার, M.A., M. R. A. S., মহাশয়ের ইঙ্গিতমত, ইহা নিতান্তই ‘literal’ ; আর ইহার বৈচিত্র্যবিহীন ছন্দের পক্ষে ইহা ‘সর্বশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত’ স্বর্গত রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগামী। রসজ্ঞ পাঠকের রুচিকর না হইলেও, আমাদের এই পন্থা সেই দুই মহাজনের অনুবর্তী,—ইহাই মাত্র ভরসা। তবে, অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদ মূলের অপেক্ষা দুর্বোধ হয় ; আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর অনুবাদ সেই দোষে ছুট্ট কিনা, তাহা সহদয় পাঠকগণের বিবেচ্য। এই সংস্করণে, অনুবাদের স্থানে স্থানে, ভাষাগত কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা গিয়াছে। তবে, অনুবাদকল্পে সর্বত্র সূরি মল্লিনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি ;—কচিং ব্যতিক্রমের জন্ত, পূর্বমত, পরিশিষ্ট হেতু নির্দেশিত হইয়াছে।...

[মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, গোঁহাটি কটন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, বিজ্ঞাবিনোদ ভক্তিসরস্বতী, প্রভৃতির সাহায্য গৃহীত।]

আখ্যাপ্ত্রে Pope-এর Fools rush in where angels fear to tread—পংক্তি, এবং কালিদাসের—

অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে (কাব্যে) সিন্ধু পূর্বসুরিভিঃ ।

মনৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রশ্রেবাস্তি মে গতিঃ ॥”

—শ্লোকটি উদ্ধৃত।

মেঘদূত । শ্রীনরেন্দ্র দেব অনুদিত ।

[চতুর্দশ সংস্করণ ১৩৬৬ । পৃ. মেঘদূত আলোচনা ২০+ অহুবাদ
১০৩+ ইঙ্গিত ও সংস্কৃত মূল ১১ । কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় গ্র্যাণ্ড সন্স ।
শিল্পী জ্ঞানদাকান্ত দাস, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, চারু রায় প্রভৃতি দ্বারা চিত্রিত ।]

অহুবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ ।

প্রণয়ে বিভোর এক
কর্মভীরু যক্ষ, প্রভু-শাপে
প্রিয়ার বিরহ ভারে
বর্ষাকাল নির্বাসনে যাপে ।
জনক-তনয়া স্নানে
পুণ্য যেথা তটিনী উচ্ছ্বাস,
ছায়া-স্নিগ্ধ তরু ঘেরা
রামগিরি-বক্ষে করে বাস । ১

উত্তরমেঘ ।

তড়িৎ-লতার তুলা যেথা
সুন্দরীদের স্খাম তরু,
প্রাসাদ প্রাচীর-চিত্র যেন
দীপ্ত রঙীন ইন্দ্রধনু !
যেথায় বাজে মৃদু-গীতে
স্নিগ্ধ গভীর মেঘের সুর,
সৌধ-শিখর স্পর্শে যেথা
তোমার মতোই আকাশপুর ;
সজল তব বর্ষসম
হর্গ্যসম যেথায় রক্তময়
মিলবে গো তার তোমার সাথে
সকল গুণে সুনিশ্চয় । ১

ভূমিকা ॥...বাংলা ভাষায় মেঘদূতের অসংখ্য অহুবাদ প্রকাশিত হয়েছে,
কিন্তু তার মধ্যে অধিকাংশ অহুবাদেই দেখতে পাই কেবলমাত্র অহুস্বর ও
বিসর্গ মুছে দিয়েই যেন বাংলা করবার চেষ্টা হয়েছে । ফলে, তারা অকারণ

সংস্কৃতের জাত হারিয়ে ফেলেছে, অথচ বাংলা ভাষার সামাজিক পংক্তিতেও উঠে আসতে পারেনি। সংস্কৃত কাব্যের বাংলা পত্ন্যুবাদে যদি সংস্কৃত শব্দই বেশীর ভাগ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে অহুবাদের কোনও সার্থকতা থাকে না বলে আমি যথাসাধ্য মেঘদূতের আভিজাত্য বজায় রেখে একেবারে আধুনিক সরল বাংলা ভাষায় মেঘদূত তর্জমা করবার চেষ্টা করেছি। সংস্কৃতালুরাগীরা হয়তো এতে ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু, তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, এ অহুবাদ তাঁদের জন্ত নয়। আমার বিশ্বাস সংস্কৃত ভাষায় যাদের তেমন দখল নেই তাঁরা আমাকে এ অহুবাদের জন্ত নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন।

“মেঘদূতের যে শ্লোকগুলি কালিদাসের স্বরচিত বলে স্বধীসমাজে গ্রাহ্য হয়েছে, আমি কেবলমাত্র সেইগুলিরই অহুবাদ করেছি, প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি বাদ দিয়েছি। কালিদাসের মেঘদূত আগাগোড়াই সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরচিত। বাংলা কবিতায় ছন্দের মাত্রা হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের প্রভাব মুক্ত বলে আমি এই অহুবাদে সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দকে টেনে এনে আমার কবিতা-গুলিকে অকারণে ভারাক্রান্ত ও একঘেয়ে করে না তুলে আগাগোড়া একে একটি সহজ স্বচ্ছন্দ ও সর্বজনবোধ্য হালকা স্বরে গাঁথবার চেষ্টা করেছি এবং বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্ত মাঝে মাঝে নানা বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশ করেছি। ভাষার ভাবঘন গাঢ়তার গুণে সংস্কৃত শ্লোকগুলি অনেক কথা বলেও মাত্র চারটি লাইনেই সমাপ্ত হয়েছে; কিন্তু, সহজ বাংলায় সে স্বযোগের অভাব বলে প্রত্যেকটি শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট করে তোলার জন্ত আমাকে অহুবাদের মধ্যে কবিতার লাইন প্রয়োজন মতো কম বেশী ও ছোট বড় করে নিতে হয়েছে। অহুবাদও যে চার লাইনের মধ্যেই শেষ করতে হবে এমন কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, এবং ভাষান্তরিত করবার সময় আপন ভাষার ছন্দ নির্বাচনে অহুবাদকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বলে আমি মনে করি। শ্লীলতার সীমা লংঘন সম্বন্ধে রুচিবাগীশদের মতো কালিদাসের বিচার করতে বসি। আমার মতে—অরসিকের মৃঢ়তা মাত্র। তাই সে বিষয়ে কোনও প্রসংগই উত্থাপন করবার আমার ইচ্ছা নেই।...” —নরেন্দ্র দেব

অহুবাদের সূচনায় কবি-প্রণাম নামে কালিদাসের বন্দনা আছে।

উৎসর্গঃ নিখিল-বিরহী-জন-হিয়ার প্রতি অসীম সমবেদনা নিয়ে অমর কবি কালিদাস তাঁর অহুপম কাব্য মেঘদূতের শ্লোকে শ্লোকে বিরহের যে অভিনব স্বর্গলোক সৃষ্টি করে গেছেন, হৃদয় অলকায় অবরুদ্ধা পরাণ-প্রিয়ার

প্রণয়-সুখ-সঙ্গ-হারী অভিশপ্ত যক্ষের অরুন্ড মর্মবেদনার সেই করুণ-গাথা, আমি আজ সাগ্রহে নিবেদন করে দিলুম—আমার এই নিঃসঙ্গ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে শাস্ত বিরহী আত্মা তার একান্ত-বাহিতা প্রিয়-কান্তার অনন্ত-বিচ্ছেদ-ব্যথায় নিত্য-নিয়ত ব্যাকুল-চিত্তে অশ্রু বিসর্জন করেছে, সেই পরম প্রেমাত্মানীর উদ্দেশে।

বিজ্ঞানাগর ও অবনীন্দ্রনাথের পরে মেঘদূত কাব্যের অনুবাদক হিসাবে কৃতিত্ব ও সফলতার মাপকাঠিতে কবি নরেন্দ্র দেবের নামই উল্লেখযোগ্য। তাঁর মেঘদূত অনুবাদের ১৪টি সংস্করণই তার সন্দেহাতীত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা চলে। ‘উৎসর্গ’ অংশের রচনা থেকে কবি নরেন্দ্র দেবের বিরহী মনের স্পর্শ পাওয়া যায়।

১৯৩০ [১৩৩৭]

মেঘদূত। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। [১৩৩৭ মাঘী পূর্ণিমা। সচিত্র পৃ. ৮০, ৩৪, ১২১, ৬৮০। কলিকাতা, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত।]

গ্রন্থের প্রথমাংশে প্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত ‘মেঘদূত-পরিচয়’ এবং শেষাংশে অনুবাদকের ‘মেঘদূত-প্রসঙ্গ’ আলোচনা দুইটি অত্যন্ত মূল্যবান। অমূল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ সম্পাদিত ‘পঞ্চপুষ্প’ পত্রিকায় এই অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত।

অনুবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ

যক্ষ করে এক আপন কাজে হেলা,
কুবের তারে দিলা কঠোর শাপ—
“নির্বাসনে রহো ত্যজিয়া প্রেয়সীরে,
দ্বাদশ মাস সহো বিরহ-তাপ।”
দুঃখে রামগিরি-আশ্রমে সে রহে
হারায়ে সহজাত মহিমা তার,—
স্নিগ্ধ ছায়া যেথা বিতরে তরু যত
সীতার স্নানে পূত সলিল যার ॥ ১

উত্তরমেঘ

তুলনা করি যদি মিলিবে তব সাথে
প্রাসাদগুলি, ভাই, সে অলকার,—
তোমাতে বিদ্যা, ললিত নারী সেধা,
ইন্দ্রচাপ তব, চিত্র তার,
গীতির সাথে সেধা মুরজ বাজি' উঠে,
স্নিগ্ধ-গম্ভীর তোমার রব,
তোমার বৃকে জল, মণির মেঘে সেধা
উচ্চ তুমি, উচু শিখর সব ॥ ১

১২৬২ [১৩৩২]

মেঘদূত। মহাকবি কালিদাস বিরচিত [মূল, অম্বয়, অম্বয় সঙ্ঘে ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, বিবরণ, অনুবাদ] পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ১৩৩২, [বঙ্গমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ-এর কালিদাসের গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত]।

[অম্বয়মুখী বাংলা অনুবাদ। এইজন্তে অনুবাদে নমুনা উদ্ধৃত করা হয়নি।—লেখক।]

১২৩৮ [১৩৪৫]

মেঘদূত। মূল ও পত্নানুবাদ। হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম. এ. বি-এল, বেদান্তরত্ন। [১৩৪৫ সাল, পৃ. ৭৮, মূল্য ৮০ আনা।]

অনুবাদকের বিজ্ঞপ্তি : কালিদাসের বিশ্ববিখ্যাত কাব্য 'মেঘদূত'র কয়েকখানি বঙ্গানুবাদ আছে—তথাপি মংকৃত এ পত্নানুবাদ প্রকাশ করিলাম কেন? প্রথমতঃ, কৈশোর হইতে 'মেঘদূত'র প্রতি আমার পক্ষপাত। এমন সময় ছিল যখন 'মেঘদূত'র অধিকাংশ শ্লোক আমি আবৃত্তি করিতে পারিতাম। যখন ঐরূপ আবৃত্তি করিতাম তখন কোন কোন প্রখ্যাত শ্লোকের পত্নানুবাদ আপনা হইতে মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিত। আজ জীবনের অপরাধে 'মেঘদূত'র প্রতি আমার সেই পক্ষপাত তিরোহিত হয় নাই, বরং ভিন্ন ভিন্ন দেশের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কাব্যের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তই চিন্তে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এই 'মেঘদূত'ই পৃথিবীর খণ্ডকাব্যসমূহের মুকুটমণি।...

অনুবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ

এক যক্ষ—কদাচিৎ
স্বাধিকারে অবধানহীন,
কাস্তার বিরহে গুরু
প্রভু-শাপে মহিমা বিলীন—
...স্নিগ্ধ ছায়াতরু,
জল সীতা-স্নানে পবিত্রিত
নিবসিল ‘রামগিরি’
বর্ষ তব হয়ে নির্বাসিত ॥ ১

উত্তরমেঘ

তোমার বিহ্যৎ মেঘ !
—বামা সেথা বিহ্যৎবরণী
তব মন্দির—সেথা গীতে
প্রহত গরজে গুরুধ্বনি
তব ইন্দ্রধনু-শোভা
—সেথা চিত্র বিচিত্র বরণ
গর্ভে তব স্বচ্ছ বারি
—ভূমি সেথা ভূমির মগুন
—তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী তব
অভভেদী অলকা ভবন ॥ ১

‘পরিশিষ্ট’ অংশে ‘মেঘদূতে’ মেঘের পথ—নামক মূল্যবান আলোচনা যুক্ত
আছে।

১৯৪৩ [১৩৫০]

কালিদাসের মেঘদূত। মূল, অনুবাদ, অন্বয়সহ ব্যাখ্যা ও টীকা।
রাজশেখর বসু। [কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫০ প্রাবণ। পৃ. ভূমিকা। ০+
১০ অনুবাদ ইত্যাদি। [সংস্কৃতের সাহিত্য গ্রন্থমালার ১ সংখ্যক গ্রন্থ]

অনুবাদ : গজ

অনুবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ

নিজ কার্বে অমনোযোগের জন্ত কোনও এক যক্ষ কুবেরের শাপগ্রস্ত
হয়। কান্তাবিরহে ছঃসহ একবর্ষভোগ্য ঐ শাপের ফলে বিগতমহিমা
হয়ে সে রামগিরি-আশ্রমে বসতি করলে। সেই স্থান
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুণ এবং তথাকার জল জনকতনয়ার স্নানহেতু
পবিত্র ॥ ১

উত্তরমেঘ

সেই অলকার প্রাসাদসমূহের যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তদ্বারা
সর্বাংশে তোমার সহিত তুলনা করা চলে। তোমার যেমন বিদ্যুৎ,
প্রাসাদের তেমন স্নন্দরী বনিতা; তোমার ইন্দ্রচাপের তুলনা
প্রাসাদের চিত্রাবলী; স্নিগ্ধগম্ভীর গর্জনের তুলনা সংগীতে
মুরজবাছ; তোমার অন্তঃস্থিত জল, প্রাসাদের মণিময় ভূমি;
তুমি যেমন উচ্চ, প্রাসাদচূড়াও সেরূপ অঙ্গলিহ ॥ ১

ভূমিকা ॥ মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পদ্যানুবাদ আছে। যারা বিনা
আয়াসে কালিদাসের কাব্যের মোটামুটি পরিচয় পেতে চান তাঁদের পক্ষে
এইরূপ অনুবাদ অতিশয় উপযোগী। কিন্তু পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হক, তত
মূল রচনার ভাবাবধানে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও
ভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। কালিদাস ঠিক কি লিখেছেন জানতে
তাঁর নিজের রচনাই পড়তে হয়। যারা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে
মাথা ঘামাতে চান না অথচ মূলরচনার রসগ্রহণের জন্ত একটু পরিশ্রম স্বীকার
করতে প্রস্তুত আছেন তাঁদের জন্তই এই পুস্তক লিখিত হল। এতে প্রথমে মূল
শ্লোক তার পর যথাসম্ভব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।
এরূপ অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেজন্য
পুনর্বাক্য অর্থের সঙ্গে যথাযথ অনুবাদ এবং প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া
হয়েছে। আশা করি এই দুইপ্রকার অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ
পাঠকও মূল শ্লোক বুঝতে পারবেন।”.... [২. ৮. ৪১] রাজশেখর বসু।

১৯৪৭ [১৩৫৪]

মেঘদূত। শ্রীঅসিতকুমার হালদার কর্তৃক মূল সংস্কৃত কাব্য হইতে অনূদিত
ও চিত্রিত। [শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক লিখিত ভূমিকা এবং মূলকাব্য সম্বলিত।

পৃ. ১০, ৭, ৬৫, ৩০। সঁচিত্র, ১ম সংস্করণ ১৩৪৫, মূল্য ৮ টাকা। এলাহাবাদ,
দি ইনডিয়ান প্রেস লিমিটেড প্রকাশিত।]

অনুবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ

স্বাধিকারে মাতি যক্ষ-স্বজন
বরষের তরে ছুঃখ বহি—
প্রভুশাপ লভি বিগত গরিয়া
কান্তার গুরু বিরহ সহি,—
ছায়া স্থশীতল তরুবাঁধি যেথা
জানকীর স্নান-পুণ্য বাণী
বাস করে রামগিরি আশ্রমে
কোনোরূপে হায় দিবস যাপি ! ১

উত্তরমেঘ

বিদ্যুৎ তব ললিতা-বনিতা,
মঞ্জিত আছে সৌধ তারা ;
অলকা-হর্গ্য লয় মেনে তাই
তোমার সকল গুণের ধারা ।
ইন্দ্রধনুর লেখা যে তোমার
আলেখ্য তার ভূষণ রহে,
গভীর নিনাদে রত তুমি মেঘ
মুদঙ্গ-গীতি সৌধে বহে ।
অন্তরে ধরি রাখ তুমি বারি
তারা মণিময় ভূমেতে থাকে ;
উন্নতভাব আছে যে তোমার,
অল ভেদিয়া শিখর রাখে ॥ ১

অনুবাদের অংশে কালিদাসের মন্দাকিনী ছন্দ বাংলায় অনুবাদের সুবিধা-
অনুবিধা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা আছে।

১২৪৮ [১৩৫৫]

মেঘদূত। ডাক্তার অমলেন্দু গুপ্ত এম-বি, বি-এস অনূদিত। পৃ. ৫৬। ২য়
সংস্করণ, প্রাবণ ১৩৫৫। মূল্য পৌনে দুই টাকা। উৎসর্গ।—স্বহৃদবর
রায়সাহেব প্রবোধচন্দ্র বসু বি-এল।

২য় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

অনুবাদের নমুনা :—

পূর্বমেঘ

বিরহী যক্ষ তর

অভিশপ্ত হয়ে,

মনের ছুঁখে রামগিরিতে

রহে নিরাশ্রয়ে ;

মা জানকীর অঙ্গস্পর্শে

পুণ্যতোয়া তীরে,

ঘন তরুর নিবিড় ছায়া

আবাস তার ঘিরে ॥ ১

উত্তরমেঘ

রামধনু আর বিজলী সনে

কেবল থাকি থাকি

অভভেদী সৌধ সেথায়

কর্ছে মাথামাখি,

রূপসী আর রঙিন চিত্রে

প্রাসাদ আছে জুড়ে,

নৃত্য-গীতে আসর জমে

মৃদঙ্গের সুরে ॥ ১

এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—
“...যাক্—বেশ লিখেছ, বেশ লাগলো স্থানে স্থানে between the lines—
সুন্দর সুন্দর passage বেশ ফুটেছে। যেমন—

“প্রেম-মাখান নারী হৃদয়

বিচ্ছেদ যবে সহে,

পতনমুখী ফুলের মত

আশার বৃন্তে রহে।”

প্রকাশও বেশ সহজ-সুন্দর, যেমন—

“খ্যাতনামা রাজধানী ঐ

বিদেশিয়ার নাম,

কামনার সে কল্পতরু

নয়ন অভিরাম ;

বেত্রবতী যেথায় নদী

কলশ্বনে ধায়,

সুধায় তার স্নিগ্ধ হ'য়ে

আকুল পিপাসায়” ॥

পরস্পর কথা ক'বার মত সরল, সহজ, ঘরোয়া ভাষা,—ছন্দটিও তার উপযোগী। আমি উপভোগই করলুম। মৌঠব-সুন্দর, যৌবনস্বলভ সবুজ প্রচ্ছদ-মধ্যে স্থান পাবারই যোগ্য।”

১৯৫৭ [১৩৬৪]

কালিদানের মেঘদূত। ভূমিকা, অলুবাদ, টীকা—বুদ্ধদেব বসু।
(আঠারোটি চিত্র সংবলিত)। - পৃ. ১৯৫ কলিকাতা, ১৯২৭ সেপ্টেম্বর
[১৩৬৪ আশ্বিন]।

সূচী : সংস্কৃত-কবিতা ও মেঘদূত ; অলুবাদের বক্তব্য ; চিত্র ; পূর্বমেঘ ;
উত্তরমেঘ ; টীকা ; চিত্রপ্রসঙ্গ।

অলুবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ

জনকে যক্ষের কর্ণে অবহেলা ঘটলো বলে শাপ দিলেন প্রভু,
মহিমা অবমান, বিরহ-গুরুভার ভোগ্য হ'লো এক বর্ষকাল ;
বাঁধলো বাসা রামগিরিতে, তরুগণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে,
এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য ॥ ১

উত্তরমেঘ

রয়েছে বিহ্বলিতবনিতায়, ইন্দ্রধনু গৃহচিত্রে,
গানের আয়োজনে গ্রহত পাখোয়াজে স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ,
স্বচ্ছ ভূমিতল সজল মনে হয়, শেহন করে মেঘে-তুঙ্গ চূড়া—
সৌধাবলী যেথা এ-সব লক্ষণে তোমারই অবিকল তুলনা ॥ ১

প্রথম প্রকাশ—‘কবিতা’ পত্রে। পরে সংশোধিত হয়ে গ্রন্থাকারে
প্রকাশিত।

অলুবাদের সূত্রপাত সম্পর্কে ‘অলুবাদের বক্তব্য’ :

“‘মেঘদূত’-অলুবাদে আমি কিছুটা আকস্মিকভাবে হাত দিয়েছিলাম ; এর
জ্ঞান বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছিলো না, বা মনে-মনে এর পরিকল্পনাও করিনি।
এক অচিরস্থায়ী অসুস্থতায় সময়যাপনের উপায়রূপে এর আরম্ভ ; তারপর,

অন্ত নানা ব্যাপারের ফাঁকে-ফাঁকে, প্রায় এক বছর ধরে, এটিকে সাহসিক সম্পূর্ণতা দিতে হয়েছে। ‘মেঘদূত’র অনুবাদের পক্ষে যেটি প্রথমতম প্রশ্ন—‘কোন ছন্দে লিখবো?,—তার উত্তরের জন্য ভাবতে হয়নি আমাকে, কেননা সে উত্তর অনেক আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়ে গেছেন।’—পৃ. ৬৮

‘মেঘদূত’-এর রাজশেখর বসু অনুদিত সংস্করণ থেকেই বর্তমান অনুবাদক মহাশয় সবিশেষ উপকৃত হয়েছেন, একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করেছেন।

বর্তমান অনুবাদাদি পাঠান্ত্রে আমার মনে হয়েছে কালিদাসের মেঘদূতের এষাবত প্রকাশিত বাংলা সংস্করণগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদটি পণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা-টিপ্পনি এবং মূল্যবান চিত্রসজ্জার, মুদ্রণ পারিপাট্যে অবশ্যই মনোমুগ্ধকর, সন্দেহ নেই। কিন্তু অনুবাদে বসু মহাশয় আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেছেন বলে মনে করতে পারিনি। কারণ-স্বরূপ সংক্ষেপে বলতে পারি সংস্কৃত কাব্যের সেই ধীর ও উদাত্ত ভঙ্গি এতে রক্ষিত হয়নি। অত্যন্ত চটুল ও চলতি ভাষা প্রয়োগেই এর অনেকখানি মাধুর্য মার খেয়ে গেছে বলে মনে হয়।

১৯৫৭ [?]

মেঘদূত। মল্লিনাথ অনুদিত। সচিত্র, পৃ. ৬, ৭৬। কলিকাতা অশোক পুস্তকালয় প্রকাশিত। [গ্রন্থে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই ; কলিকাতা, জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকায় ১৯৫৭ উল্লিখিত আছে।] [‘কালিদাস গ্রন্থমালা’র অন্তরগত প্রথম গ্রন্থ মেঘদূত] শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী-অঙ্কিত চিত্র-সম্বলিত।

অনুবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ

বধু-প্রেমমধু মত্ত যক্ষ হেলা করি নিজ কাজে,
কুবেরের শাপে বর্ষ যাপে সে নির্বাসনের মাঝে।
প্রিয়ার বিরহে ব্যথাতুর প্রাণ, হয়েছে মহিমা হারা,
জনকতনয়া স্নানে যে তটিনী বহিছে পুণ্য ধারা
তরু ছায়া ঘেরা সিন্ধু সে তটে—রামগিরি আশ্রমে
রহিয়া একাকী, বিচ্ছেদ-তাপ দুঃসহ তার ক্রমে ॥ ১

উত্তরমেঘ

বিদ্যুৎলতা ললিতা বনিতা—ইন্দ্রধনুর চিত্র প্রায়,
বাজে মৃদঙ্গ সঙ্গীত সুরে গম্ভীর গুরু মূর্ছনায় ;
গগনলগন মণিময় পুরী রচিত সেধায় দেখিবে জানি,
তোমারি তুল্য অতুলন তারা, স্নেহনীরে ভরা হৃদয়খানি ॥ ১

ভূমিকায় ত্রীগৌরীনাথ শর্মা লিখেছেন :

“বর্তমান অনুবাদ আক্ষরিক নহে, ভাবানুগ। আমি ইহা সম্পূর্ণ পড়িয়াছি এবং প্রচুর কাব্যরসানন্দ আনন্দ করিয়াছি। আর এ বিশ্বাস দৃঢ় জন্মিয়াছে যে, পাঠকের চিত্ত ইহাতে পরিতৃপ্ত হইবে।”

১৯৫৮ [১৩৬৪]

মেঘদূত। মূল কালিদাস থেকে পদ্মানুবাদ। ত্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বি. এল.। পৃ. ৮৫। ১৩৬৪, রামনবমী পরিশিষ্টে মূল সংস্কৃত মেঘদূতম সংকলিত। ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা সংবলিত।

অনুবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ

যক্ষ এক নিজের পরে
অর্পিত কাজ হেলা করে,
প্রভুর শাপে মহিমাহীন
হ'ল একটি বরষ তরে ;
প্রিয়ার করণ বিয়োগ-ব্যথায়
অভিশাপ সে গুরুভার ;
রামগিরি বন আশ্রমেতে
বাঁধালো আপন বাসা তার ।
ঘন-বন-তরু-রাজির
মিথু ছায়ায় সুশীতল,
জনক-স্নাতা-সীতার স্নানে
পবিত্র সে শৈল-জল ॥ ১

উত্তরমেঘ

আকাশ চুমে তোমার মত
প্রাসাদ উচ্চ অলকার,
বিশিষ্টতায় তোমার সাথে
তুলনা সব মেলে তার ;—
তোমার আছে সৌদামিনী
সেথায় নারী তড়িৎ-শিখা ;

ইন্দ্রধনু অঙ্গে তোমার

প্রাচীরে তার চিত্রলিখা,

স্নিগ্ধ গভীর মন্ত্র তব

মুরজ রব সঙ্গীতির

মণিময় তার কক্ষতল

যেন তোমার অন্তঃনীর ॥ ১

ভূমিকায় ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

“মূল শ্লোকের ধ্বনিরোল এখানে অল্পপস্থিত ; অন্ত্যমিল এখানে প্রকট ; তথাপি ছন্দের অতি-তারল্য মূলের গান্ধীর্ষ ও দৌষম্য বিনষ্ট হয়নি। আমার ধারণায় এটাই অল্পবাদকের প্রধান কৃতিত্ব। দ্বিতীয় কৃতিত্ব, মূলের পাঠ কোথাও বিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করেনি। তৃতীয় কৃতিত্ব, অন্ত্যমিল-যুক্ত শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে আগাগোড়া...কাব্যাল্পবাদের ফলশ্রুতি বিরক্তিকর একঘেষেমি নয়। গুরু তৎসম শব্দের উপল-স্বর্ধণে দ্রুত তরল ছন্দের চাপল্য ব্যবহৃত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি গান্ধীর্ষ এসেছে। এজন্তই এই কাব্যাল্পবাদ ব্যর্থতার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে।”

১৯৫২ [১৩৬৬]

আলেখ্যদর্শন। কালিদাসের মেঘদূত খণ্ডকাব্যের মর্মকথা। সুশীল
রায়। কলিকাতা ১৩৬৬, আশ্বিন। পৃ, ৯০+১০১

[সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিত
কথামুখ ও লেখকের কথা সংবলিত।]

অল্পবাদ : গছ।

অল্পবাদের নমুনা :

পূর্বমেঘ

“কোথায় রাগগিরি আশ্রম আর কোথায় অলকাপুরী,
কোথায় বিরহী যক্ষ আর কোথায় তার বিরহিনীকাস্তা—
এই ছয়ের মাঝখানে যে ব্যবধান তা শূন্য দিয়ে পূর্ণ
করা নয়, এদের দু’জনের মাঝে নদী পর্বত ও নগরী
থরে থরে সাজানো। রেবা বেত্রবতী নির্বিঘ্না
শিপ্রা গন্ধবতী গন্ধীরা চর্মবতী সরস্বতী
জাহ্নবী—এই নদীরা শুধুমাত্র শ্রোতস্বিনী নয়,

এরা এক একটি মানবী ; দূতরূপী মেঘের
 অভিযান-পথে এরা বিচিত্ররূপে এসে মেঘের সঙ্গে
 সাক্ষাৎ করেছে । মেঘের এই দীর্ঘপথ তারা ভরে দিয়েছে
 সোনার ও মোহাগায়।—[অপূর্ব মেঘ ।

উত্তরমেঘ

যক্ষের বাণী বহন করে অলকার তীর্থে এসে পৌঁছে
 গিয়েছে অপূর্ব মেঘ । এ তীর্থ এক পরমতীর্থ । এর
 পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব অবিকল আকারে ধরা পড়েছে মেঘের
 সর্বাঙ্গে । মেঘে আর অলকায় আর পার্থক্যই যেন নেই
 বিন্দুমাত্র । মেঘের ছায়া অলকার গায়ে পড়েছে, না,
 অলকার ছায়া এসে পড়েছে মেঘের সর্বাঙ্গে—ঠিক
 বলা যায় না । দূর থেকে এই উভয়কে আমরা
 দেখতে পাচ্ছি একইরূপে রূপান্বিত, একই শোভায়
 সুষোভিত ।—[নিরন্তর মেঘ ।

‘লেখকের কথা’ অংশ থেকে জানা যায় : ‘আলেখ্যদর্শন’ শিরোনামে
 আলোচ্য মেঘদূতের মর্মকথা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনের জুলাই
 থেকে ১৯৫২ সনের জাহ্নবারি পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকায়, ‘উদয়ন’ ছদ্মনামে ।
 মেঘদূত কাব্যের বাংলা অনুবাদে স্থলীলবাবু যে অভাবিত ও অদৃষ্টপূর্ব অভিনব
 পন্থা অবলম্বন করেছেন, সে বিষয়ে সমালোচকদের সঙ্গে পাঠকেরাও একমত
 হবেন । স্থলীলবাবু নিছক অনুবাদকমাত্র নন । তিনি মেঘদূত কাব্যের
 মর্মগ্রহণে সমর্থ হয়েছেন, কেননা, স্থলীলবাবু একজন কবি হিসাবেও সুপরিচিত ।

নারায়ণ সাত্তালের

বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প (২য় মুঃ) ৩.৫০ ॥

বল্লাক ৪.০০ ॥

মনামী ৪.০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠার পর

সমিতির প্রথম সভা ৪ঠা মে, ১৮৪৩

‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ স্থাপিত হবার পর সমিতির সভারা সর্বপ্রথম মিলিত হন ৪ঠা মে বৃহস্পতিবার, ১৮৪৩ সনে ৩১নং ফোর্ডদারি বালাখানা হলের উপরিতলে।

এ সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ। জর্জ টম্পসন বিশেষ কারণবশত এ সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। সভার কার্যবিবরণীর পরিচয়দানপ্রসঙ্গে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখের ‘বেঙ্গল শ্বেকটেটর’ লেখেন :

“সভাস্থে সভাপতি কহিলেন যে মেং টমসন সাহেব কোন কারণবশতঃ অত্য়কার সভায় আগমন করিতে অক্ষম হইয়াছেন। অত্য় অধিক সময় গিয়াছে এ নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করা যায় যে অত্য়কার সভা স্থগিত থাকিবেক কি সভার কার্যনির্বাহক নিয়ম ও কমিটির নির্ধারিত নিয়মাদি বিবেচনা করা হইবেক।”

সভাপতির জিজ্ঞাসার উত্তরে উপস্থিত সভ্যেরা নবপ্রতিষ্ঠিত সভার কার্য-নির্বাহক নিয়মাদি (bye-laws) বিবেচনা করতে সম্মত হওয়ায় সভার কাজ শুরু হলো।

মিঃ জে. টি. এফ. স্পিড্ প্রস্তাব করলেন, পূর্ব সভায় যে সমস্ত নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে এ সভায় তা গৃহীত হোক। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র এ প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

মিঃ ক্রো একটি সংশোধিত প্রস্তাবে বললেন, ‘ঐ সকল নিয়ম সাধারণের সম্মুখার্থে এক ২টা করিয়া বিবেচনা করিলে ভাল হয় কিন্তু বিলম্ব প্রযুক্ত এ সভায় হইতে পারে না অতএব আমি প্রস্তাব করি যে আগামি বৈঠকে এ বিষয়ে বিবেচনা করা যায়।’

মিঃ পি. ডি. রোজারিও এ সংশোধিত প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

মিঃ জি. এফ. রেমফ্রি ও মিঃ ক্রোর সংশোধিত প্রস্তাবের পোষকতা করেন। তিনি বলেন : ‘ঐ সকল নিয়ম বিশেষভাবে বিবেচনা করা আবশ্যিক বটে কারণ ইহাতেই সোসাইটির তাবৎ কর্মে নির্ভর হয়।’

সংশোধিত প্রস্তাবটি অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর সভ্যদের দেয় চাঁদা এবং এককালীন দান সম্পর্কে একটি পত্র পঠিত হয়। ক্রো সাহেবের প্রস্তাবে এবং মিঃ স্পিডের সমর্থনে ইহা স্থির হয় যে পরবর্তী সভাতে উহা বিবেচিত হবে।

সভ্যদের চাঁদা সম্পর্কে মিঃ স্পিড্ প্রস্তাব করেন কমিটির বিবেচনা মতে সভ্যদের তিন মাস পর পর তিন টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। এ প্রস্তাবে আরো বলা হয় যাঁরা সমিতির সভ্যপদ প্রার্থী তাঁরা যেন কমিটির নিকট নিজেদের নাম পাঠান।

এ প্রস্তাবের সমর্থন করেন মিঃ ফ্লোরি (Mr. Flury)।

মিঃ ক্রো সভাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে এ প্রস্তাবও ঐ সকল নিয়মের (bye-laws) অন্তর্গত; অতএব এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এ সভার এক্সিয়ারের বাইরে। উক্ত প্রস্তাব সংশোধন করে তিনি বলেন যে এটাও আগামী সভায় বিবেচনা করা উচিত।

মিঃ রোজারিও মিঃ ক্রোর বক্তব্যের সমর্থন করেন।

মিঃ ক্রোর এ সংশোধিত প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত কিনা সে সম্পর্কে সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়।

শেষ পর্যন্ত সংশোধিত প্রস্তাব এবং পূর্ব প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মিঃ ক্রোর প্রস্তাবে মিঃ রোজারিওর সমর্থনে এবং সকলের সম্মতিতে এই স্থির হয় যে সে সভায় যে সমস্ত ব্যক্তি সভ্য শ্রেণীভুক্ত হলেন তাঁরা আগামী সভায় মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

সর্বশেষে সভাপতিমশাই ঘোষণা করলেন যে আগামী সভার অধিবেশন হবে ১১ই মে বৃহস্পতিবার রাত্র আট ঘটিকায়।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, জর্জ টম্পসনের অল্পপস্থিতিতে উক্ত সভায় বহু বিষয়ের আলোচনা হলেও উল্লেখযোগ্য কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। সভার নিয়ম নির্ধারণ সম্পর্কে উল্লেখ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় জর্জ টম্পসনের উপস্থিতিতে পরবর্তী সভায়।

॥ ১১ই মে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ ॥

‘বেঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠার পর ফৌজদারী বালাখানা হলে সোসাইটির সভ্যদের উল্লেখযোগ্য অধিবেশন বসে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে।

এ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মিঃ জি. টি. এফ. স্পিড্।

ইতিপূর্বে কার্যকরী সমিতি সোসাইটির স্থল পরিচালনার জন্য যে সমস্ত নিয়ম নির্ধারণ করেছিলেন তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হওয়ায় সভ্যদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ঐ সব নিয়ম নিম্নলিখিতরূপে ধার্য হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখের 'বেঙ্গল স্পেকটেক্টর' থেকে সে নিয়মগুলির বাংলা ভাষারূপ যথাযথভাবে উদ্ধার করা হল :

১. "ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ও তৎশোধনের উপায় প্রদর্শক লিপি এবং এই সভার উত্থাপনীয় অগ্রাগ্র বিষয় বাহাতে উত্তমরূপে বিবেচিত হইতে পারে এতাদৃশ পত্রাদি ও স্বাক্ষরিত বিবরণ আনয়ন করা হইবেক।

২. আইন, রীতি ও দেশের উৎপন্ন এবং লোকদিগের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধীয় বিষয় সকল জ্ঞাত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক সকলের এক লাইব্রেরী হইবেক।

৩. যে সকল আইনের পাণ্ডুলেখ্য গভর্নমেন্ট দ্বারা প্রকাশিত হয় কমিটির সভ্যেরা তাহা বিবেচনা করিবেন এবং আবশ্যক মতে সভার মাসিক বৈঠকে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন।

৪. সোসাইটিতে যে সকল বিষয় বিবেচিত হইবেক তদ্বিষয়ক যে সকল পুস্তক মুদ্রিত আছে প্রয়োজনানুসারে সময়ে সময়ে কমিটি তাহার সারাংশ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিবেন।

৫. সোসাইটির অভিপ্রেত বিষয় উত্তমরূপে অনুসন্ধানার্থে কমিটি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করিবেন এবং উত্তর প্রাপ্ত্যানন্তর রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া সাধারণ সভার উপস্থিত করিবেন।

৬. সাধারণ সভায় সে বিষয় গ্রাহ্য হইবেক তাহার মূদ্রণ ও বটন বিষয়ে কর্তৃত্ব কমিটি করিবেন।

৭. সোসাইটি দেশের ছুঃখমোচন ও হুনিয়ম নিমিত্ত কমিটির দ্বারা দরখাস্ত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া গভর্নমেন্টের সমীপে প্রেরণ করিবেন।

৮. কমিটি এতদ্দেশীয় নানা শ্রেণীস্থ লোকদিগের অধিকার, কর্তব্যতা, ও লাভ বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক সোসাইটির অনুমতানুসারে সময়ে সময়ে প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করণান্তর ঐ সকল লোকদিগকে বিতরণ করিবেন।

৯. আগষ্ট মাসাবধি যে সকল ব্যক্তির সভ্য হইবেন পূর্বকার এক সভাতে তাঁহাদিগের নাম কোন সভ্য প্রস্তাব করিবেন এবং কেহ তাহাতে পোষকতা

কারবেন এবং তদাগ্রিম সভাতে বেলাটের দ্বারা উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে
ত্রিভাগের দুইভাগ লোকের সম্মতিতে তাঁহাকে সভ্য করা যাইবেক।

১০. সভার ধারা অথবা অভিপ্রায়ের পরিবর্তক প্রস্তাব করণে যদি
কোন সভ্য ইচ্ছুক হন তবে একমাস পূর্বে সমাচার দিতে হইবেক এবং তাঁহার
প্রস্তাব প্রকাশ করা যাইবেক ; পরে সম্মতি গ্রহণ কালীন সভ্যেরা প্রতিনিধি
দ্বারাও স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১১. সভ্যদিগের ত্রিমান্তর দেয় বাৎসরিক দান ৬ টাকার নূন
হইবেক না।

১২. এই সভার এক সভাপতি, দুইজন বাইসপ্রিসিডেন্ট, একজন
এতদ্দেশীয় ও একজন খ্রীষ্টিয়ান সম্পাদক, এক ধনরক্ষক এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত
১২জন কমিটি থাকিবেক ; আর উক্ত কর্মকারীরাও কমিটির সভ্য হইবেন।

১৩. যাহারা সভার কর্মকারী তাঁহারা সকলেই সভার সভ্য হইবেন
এবং প্রতি বৎসর কর্মকারী নিযুক্ত হইবেক, তাঁহাদিগের নিয়মিত সময়াভীত
হইলে পুনশ্চ নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

১৪. মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে অথবা সভ্যদিগের মতানুসারে অন্য
কোনবারে সভার মাসিক বৈঠক হইবেক এবং ৬ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলে
সভার কার্য আরম্ভ হইবেক।

১৫. সভ্যেরা যে বিষয় সভাতে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা
যদি বাদানুবাদের যোগ্য হয় তবে একমাস পূর্বে সংবাদ দিতে হইবেক এবং
তাহাতে সভার অধিকাংশের সম্মতি অপেক্ষা করিবেক।

১৬. সভার বৈঠকে সকলেই যাইতে পারিবেন কিন্তু কোন বিষয়ে
বাদানুবাদ করণে এবং মত প্রদানে কেবল সভ্যেরা সক্ষম হইবেন।

১৭. সাধারণ কমিটি ও সব কমিটির বৈঠকেও সভ্যেরা যাইতে পারিবেন
কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে অথবা মতামত দিতে
পারিবেন না।

১৮. ৩জন উপস্থিত থাকিলেই সাধারণ কমিটির কার্য আরম্ভ হইবেক।

১৯. কমিটির বাৎসরিক রিপোর্ট গ্রহণ এবং কর্মকারী নিযুক্ত করণ ও
উপস্থিত মতে অগ্রাগ্রহ কর্ম নির্বাহ করণের নিমিত্ত প্রতি বৎসর মে মাসের প্রথম
বৃহস্পতিবারে সভার বৈঠক হইবেক।

২০. সাধারণ কমিটির এক সাব কমিটির দ্বারা সভার ধন রক্ষণাবেক্ষণ
কর্ম নির্বাহ হইবেক।

।নগ্নাশ্রিত প্রাতঃশরণ (resolutions) ।নধারত হহল ।

কমিটিৰ উপৰিলিখিত নিয়ম সকল স্বশৃঙ্খলভাবে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিবেন এবং
যাহাতে তাহাদেৱ বিবেচনায় ভাল বোধ হয় তদনুসাৰে দুই এক কথাৰ
পৰিবৰ্তন কৰিবেন ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিক সাভাৰ কৰ্মকাৰী হইয়াছেন ।

মেং জৰ্জ টমসন সভাপতি ।

বাবু ৰামগোপাল ঘোষ ধনৱক্ষক ।

বাবু প্যাৰীচাঁদ মিত্ৰ সম্পাদক ।

কমিটি । মেং জি. এফ. ৱেমফ্রি, জি. টি. এফ. স্পিড, এম. ক্ৰো, বাবু
হৰিমোহন সেন, বাবু তাৱাচাঁদ চক্ৰবৰ্তী, বাবু গোবিন্দচন্দ্ৰ সেন, বাবু চন্দ্ৰ-
শেখৰ দেব, বাবু দক্ষিণাৱঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বাবু ব্ৰজনাথ ধৰ, ৱেভাৱেণ্ড
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, বাবু শ্যামাচৰণ সেন, এবং বাবু সাতকড়ি দত্ত ।

বাবু প্যাৰীচাঁদ মিত্ৰ সভাকে বিজ্ঞাপন কৰিলেন যে টমসন সাহেব সভা
স্থাপনাৰ্থে এক শত টাকাৰ এক ড্ৰাফ (Draft) দিয়াছেন, সভোৱা অবগত
ধাকিতে পাবেন যে উক্ত সাহেবেৰ এই দ্বিতীয় দাতব্য হইল অতএব তাহাকে
ধন্যবাদ প্ৰদান কৰা উচিত । তাহাতে সকলে সন্মত হইলেন ।

টমসন সাহেব নমস্কাৰ প্ৰত্যৰ্পণ পূৰ্বক কহিলেন ১৮৪১ সাল অবধি ইণ্ডিয়া
গভৰ্ণমেণ্ট কৰ্তৃক যে সকল এক্ট প্ৰকাশিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আগামী দুই
সভাতে দুই লেকচাৰ দিবেন ; সভাস্থ সকলে প্ৰশংসাপূৰ্বক গ্ৰাহ কৰিলেন ।”

এই হলো ১১ই মে ১৮৪৩ খ্ৰীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ‘বেঙ্গল ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ৰ
সভাৰ বিৱৰণ । এৱপৰ সম্পাদকীয় মন্তব্যে নিম্নলিখিত ঘোষণা ছিল :

“আমরা আহ্লাদপূৰ্বক পাঠকবৰ্গকে বিজ্ঞাপন কৰিতেছি যে ঐ সভাৰ
৩১জন এতদেশীয় এবং ১০জন ইংৰাজ সভ্য হইয়াছেন । সবিস্তৰিত বই
সকলেৰ নিকট প্ৰেৰণেৰ ক্লেস নিৱাৰণাৰ্থে আমরা অনুৰোধ কৰি, যে যে
মহাশয়েৱা উক্ত সভাৰ সভ্য হইতে ইচ্ছুক আছেন তাহাৰা স্ব স্ব নামধাম ও
দাতব্যেৰ সংখ্যা লিখিয়া কমিটি অথবা সম্পাদকেৰ সমীপে প্ৰেৰণ কৰুন ;
সভাতে বাৎসৰিক দাতব্য ৬ টাকাৰ ন্যূন নহে ।”

॥ সোসাইটিৰ নিয়মেৰ (bye-laws) বিচাৰ ও মন্তব্য ॥

১১ই মে ১৮৪৩ খ্ৰীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সভায় যে নিয়মগুলি (bye-laws)
নিৰ্ধাৰিত এবং গৃহীত হয় নব্যবঙ্গৰ ৰাজনীতি-চৰ্চাৰ ইতিহাসে তা একটি

নতুন পদক্ষেপের সূচনা করে। নিছক আলোচনা-সমালোচনার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে নব্যবঙ্গ এ সমস্ত নিয়ম প্রণয়ন এবং তাদের কার্যকরী রূপ দেবার মাধ্যমে দেশের বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উল্লেখযোগ্য নিয়মগুলির তাৎপর্য আলোচনা করলেই এ মন্তব্যের যথার্থ্য প্রমাণিত হবে :

এক সংখ্যক নিয়মে (bye-laws) দেখা যায় নব্যবঙ্গ তাঁদের রাজনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার অভিপ্রায়ে সর্বপ্রথমে তথ্য সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছেন। ‘ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ও তৎসংশোধনের উপায়-প্রদর্শক পত্রাদি ও স্বাক্ষরিত বিবরণ সংগ্রহ’ করবার মূল উদ্দেশ্য হল এই। রাজনীতি আবেগময় ভাবোচ্ছ্বাস নয়। তার জ্ঞান চাই দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি। এক সংখ্যক নিয়মে সে পরিচিতির জ্ঞান প্রস্তুতির প্রতিই লক্ষ্য করা হয়েছে।

দুই সংখ্যক নিয়মে সে পরিচয় যাতে ভ্রান্তিহীন ও তথ্যসমৃদ্ধ হয় সেজ্ঞান দেশের আইন, রীতি, উৎপন্ন, জনসাধারণের অবস্থা এবং অভাব-অভিযোগ সম্পর্কীয় পুস্তক সংগ্রহ ও পাঠের ওপর নব্যবঙ্গ জোর দিয়েছেন। নব্যবঙ্গের নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনাকে একটি স্পষ্ট ও স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার জ্ঞান এরূপ সূচিস্থিত পরিকল্পনার প্রণেতা যে জর্জ টম্পসন তা তাঁর পূর্ববর্তী বক্তৃতা পড়লেই বোঝা যায়।

তৃতীয় সংখ্যক নিয়মে (bye-laws) সরকার-পরিকল্পিত কোন আইন বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে সে আইনের খসড়া (draft) জোগাড় করে তা সমালোচনা করিবার জ্ঞান নব্যবঙ্গকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার পঁচাত্তরে যে বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও পার্লামেন্ট-সদস্য জর্জ টম্পসনের হস্তচিহ্ন বর্তমান ছিল—তাতে সন্দেহ নেই। জনস্বার্থ-বিরোধী যে কোন সরকার-পরিকল্পিত আইনকে বিধিবদ্ধ হতে বাধা দেওয়াই হল এ প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঁচ সংখ্যক নিয়মটিতেও (bye-laws) রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় আছে। নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চা যাতে ‘arm-chair politics’-এ পর্যবসিত না হয় এবং দেশের অবস্থা সম্পর্কীয় আলোচনা যাতে বাস্তবভিত্তিক হয়—সেজ্ঞান বিভিন্ন স্থানে প্রশ্ন প্রেরণ এবং উত্তর সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে।

আট সংখ্যক নিয়ম (bye-laws) প্রণীত হয়েছিল গণ-সংযোগ করবার উদ্দেশ্যে। এ দেশের নানা শ্রেণীর লোকের অধিকার, কর্তব্য ও লাভ-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা (pamphlet) মুদ্রণ ও ঐ শ্রেণীর লোকের মধ্যে উহা বিতরণের মধ্যে এ গণ-সংযোগের ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান যদি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী মাহুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তা দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের কোন কাজে আসে না। জনসাধারণের স্বাধিকার চেতনা যদি জাগ্রত না হয় তাহলে সে প্রতিষ্ঠান কখনও শক্তিমঞ্চয়ে সমর্থ হয় না। ভারতের রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বহুকাল পরে মহাত্মা গান্ধী—যার কলে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে তিনি গণধর্মী রূপ দিতে সচেষ্ট হন। এ গণ-সংযোগের অভাবেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্বে জাতীয় কংগ্রেস আকাজক্ষিত শক্তি অর্জন করতে পারেনি। আশ্চর্যের বিষয় মহাত্মা গান্ধীর গণ-আন্দোলন প্রবর্তনের বহুকাল পূর্বে একজন বিদেশী ভারতপ্রেমিকের পরিচালনায় শিক্ষিত বাঙালী রাজনীতিকের গণ-সংযোগ প্রয়াসকে কার্যকরী করে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তবে সাত সংখ্যক নিয়মটিতে (bye-laws) Parliamentary Democracy-ই যে রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে নব্যবঙ্গের কাম্য ছিল—তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের ‘দুঃখ মোচন ও স্থানীয় নিমিত্ত’ তাঁদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা যে প্রচলিত সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের সীমায় সীমাবদ্ধ ছিল—তা বলাই বাহুল্য। গণ-সংযোগের সাহায্যে দেশের শক্তিকে সংহত করে পরাধীন দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করবার স্বপ্ন তাঁরা দেখেননি। সে স্বপ্ন সে যুগের পক্ষে অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছু নয়—এ সত্য তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। এ ছাড়া ইংরেজ-সংস্পর্শের পূর্ববর্তী মুসলমান-শাসনের তুলনায় বিদেশাগত ইংরেজদের শাসনের মধ্যে তাঁরা অনেক প্রগতির চিহ্নও লক্ষ্য করেছিলেন। মেজন্তু তাঁদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মুখ্য লক্ষ্য ছিল বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনের সাহায্যে (by constitutional means) প্রচলিত শাসনের গলদ দূর করে জনকল্যাণভিত্তিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্ত সরকারের ওপর চাপ দেওয়া। তাঁদের এ আকাজক্ষাকে কার্যকরী রূপ দেবার চেষ্টা করলেন মানবতাবাদী জর্জ টম্পসন ‘বেঙ্গলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করে।

জর্জ টম্পসনের অনুপ্রেরণায় নব্যবঙ্গ ইংরেজ শাসনাধিকারে দেশের জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হবার জন্ত যে ব্যাপক প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়েছিলেন তার বিবরণ দেওয়া হবে এ আলোচনার পরবর্তী একটি পর্বায়ে।

(ক্রমশঃ)

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসব আগামী জানুয়ারি মাসে বিশ্বের সর্বত্র অহুষ্ঠিত হবে। আমেরিকা, ইয়োরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে উৎসব-প্রস্তুতি-সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। গত ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিবেকানন্দ প্রদর্শনী অহুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামীজি-ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, চিঠি ও বিবেকানন্দ-রচনাবলীর সমাবেশে এটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ-জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি নিয়ে এক পুতুল-প্রদর্শনী সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

*

*

*

‘সাহিত্যের খবর’-এর আগামী পৌষ সংখ্যা বিবেকানন্দ-সংখ্যারূপে প্রকাশের আয়োজন চলছে। এ বিষয়ে পাঠকদের অভিমত আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

*

*

*

গত ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ছুটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সম্মেলনের সূচনা হয়।

মহাজাতি সদনে শিল্পীসংস্থা-আয়োজিত চারদিনব্যাপী শরৎ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন, ‘ভাবপ্রণতাই বাঙালীর শক্তি, শরৎচন্দ্র ভাবপ্রবণ ছিলেন বলেই কালজয়ী সাহিত্য রচনা করতে পেরেছেন।’ সভাপতি তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘শরৎচন্দ্র যে ‘লক্ষ্মীর ঘট’ দিয়ে গিয়েছেন, বাঙালি চিরকাল তা থেকে সুধারস পান করবে।’ অসমীয়া সাহিত্যিক শ্রীধীরেন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রাধারানী দেবী, শ্রীমোজ বসু, শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। সম্মেলনের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় জানান, কলকাতায় শরৎচন্দ্রের নামে একটি স্থায়ী স্মৃতিভবন নির্মাণ, দেশী-বিদেশী ভাষায় শরৎ-সাহিত্যের অনূবাদ, প্রামাণ্য শরৎ-জীবনী প্রণয়ন ও ডকুমেন্টারী ফিল্ম তোলা, দেবানন্দপুরে শরৎমেলা সংগঠন ও লেখকদের রেষ্ট-হাউস নির্মাণের কর্মসূচী তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

*

*

*

মারবেল প্যালেসে তিনদিন নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সমাগত লেখকদের সাদর আমন্ত্রণ জানান। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়। শিশু-গ্রন্থ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীগোপাল মিশ্র, শ্রীনবকান্ত বড়ুয়া, শ্রীঅমরেন্দ্রলক্ষণ গ্যাডগিল, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীউৎপল হোমরায়, শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে প্রমুখ শিশু-সাহিত্যিক অধিবেশনে যোগ দেন।

*

*

*

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অষ্টত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন ডিসেম্বরের শেষে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতি বাংলা পাঠকদের থেকে এক মতপত্র আহ্বান করেছেন। নভেম্বর ১৯৬২ পর্যন্ত—এক বৎসরকালের মধ্যে প্রকাশিত মৌলিক বাংলা রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, রম্যরচনা, নাটক ও গল্পগ্রন্থের নাম ও প্রকাশকের নাম—পাঠকদের কাছ থেকে আহ্বান করেছেন। শ্রেষ্ঠ উত্তরের জন্য তিনটি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অভিমত পাঠাবার ঠিকানা : অভ্যর্থনা সমিতি, সাহিত্য সম্মেলন, ৪, সিভিল লাইনস, গোরখপুর, উত্তর প্রদেশ।

*

*

*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত ১৯৬২ সালের ‘লীলা পুরস্কার’ পেয়েছেন শ্রীযুক্তা পুষ্প দেবী। তাঁর লেখা ‘উপনিষদ নির্মাণ’ গ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। স্বল্প-শিক্ষিতদের মধ্যে ছুঁহু বেদ-উপনিষদের বাণী সরল ছন্দে এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে।

*

*

*

রবীন্দ্র-গবেষক শ্রীপুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি-প্রদত্ত তিন হাজার টাকার পুরস্কার বর্তমান বৎসরে পেয়েছেন। ১৯৬০ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন স্বর্গতা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী। শ্রীযুক্ত সেনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*

*

*

আর্থার কোয়েস্লার-রচিত ‘দি লোটাস্ অ্যাণ্ড দি রোবোট’ গ্রন্থটি সম্প্রতি ভারত সরকার নিষিদ্ধ গ্রন্থ বলে ঘোষণা করেছেন। ভারতী-বিরোধী মন্তব্যের জন্যই এই পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ঋণশোধ !

চীনের সকাতর আবেদন শাড়া দিয়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চীনকে সহায়তা দেবার জন্তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ডাঃ এম অটলের নেতৃত্বে যে মেডিক্যাল ইউনিট ও অস্ত্র সাহায্য পাঠিয়েছিলেন সমগ্র 'অষ্টম রুট আর্মি' এবং তাদের অধিনায়ক ও বর্তমান লালচীনের সর্বপ্রধান সেনাপতি মার্শাল চু-তে তাঁদের স্বাগত সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন...চীনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত মাও সে-তুং '১৯৩৯ সালের ২৪শে মে এক পত্রে জওয়াহরলালজীকে অভিবাদন-অভিনন্দন জানিয়ে এই সংবাদ দেন।

“এই পত্রালাপের ২০ বৎসর কাল পরে বিগত ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে লাদাখ অঞ্চলে ভারতীয় এলাকার প্রবেশ করে লালচীনের একদল সৈন্য অতর্কিতভাবে ভারতীয় প্রহরীদলের উপর গুলী চালায়। এই আক্রমণের পর চীনের সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা ৯টি ভারতীয়ের মৃতদেহ এবং ১০ জন ভারতীয় প্রহরীকে বন্দী করে নিজেদের এলাকায় নিয়ে যায়।

“কিন্তু রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত মাও সে-তুং, চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চৌ-এন-লাই এবং প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত চু-তে—এঁরা কেউ ভারতীয় দেহগুলি সংকার করেন নি! কেন করেন নি, তার কারণটি তাঁরা ভেবে রেখেছিলেন। অর্থাৎ এই ঘটনার ঠিক ২৩ দিন পরে পৃথিবীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, উদারপন্থী এবং শান্তিবাদী, ভারতবরেণ্য জওয়াহরলালের জন্মদিনের প্রভাতে উক্ত ৯টি ভারতীয় মৃতদেহ ভারতবাসীকে উপহার দেওয়া হয়! সেই দিনটি ছিল ১৪ই নভেম্বর, শনিবার, রাসপূর্ণিমার প্রাক্কাল!”

প্রবোধকুমার সাংঘালের

রাশিয়ার ডায়েরী

বিখের কমিউনিস্ট জগতের বাস্তব বিচিত্র ও
নির্ভীক সত্যকথনে প্রোজ্জ্বল গ্রন্থ ২৫.০০ ॥

দেবেশ দাশের	সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
ইয়োরোপা ৮ম মুঃ ৩.০০ ॥	কৃষাণু ২য় মুঃ ৬.০০ ॥
স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের	প্রমথনাথ বিদ্যী ও
প্রদক্ষিণ ২য় মুঃ ৪.০০ ॥	তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের	কাব্যবিতান ১০.০০ ॥
অমূল তরু ৪র্থ মুঃ ৩.০০ ॥	নীলকণ্ঠের
বিগত দিন ৩.৫০ ॥	হরেকরকমবা ২য় মুঃ ২.৫০ ॥
	অজ্ঞ ও প্রত্যহ ২য় মুঃ ৫.০০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

* * *

কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা ভারত সরকারের পক্ষে হিন্দী বিশ্বকোষ সম্পাদনা ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছিলেন ১৯৫৪ সালে। বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড ১৯৬০ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়েছে। গত আগস্ট মাসে (১৯৬২) দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫২৮ ; লিখেছেন আড়াই শ জন লেখক।

* * *

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের উত্তোগে মহীশূরে কুমারাজ-সাগরে পক্ষকালব্যাপী (১৯ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট) লেখক-শিবির অর্থাষ্ঠিত হয়েছে। এই শিবিরের অধ্যক্ষ ছিলেন কন্নাদ কবি শ্রী ডি. এস. কর্কি। আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিশ জনের বেশিসংখ্যক প্রতিনিধি এই শিবিরে যোগ দেন। ভারতীয় লেখকদের সাধারণ সমস্তাসমূহ আলোচনার ও সমাধানের জন্য এই শিবির অর্থাষ্ঠিত হয়েছিল।

* * *

অখিল ভারত পঞ্জাবী লেখক সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন পঞ্জাবী লেখক সভা ও কেন্দ্র পঞ্জাবী লেখক সভার যুক্ত উত্তোগে আহূত হয়েছে। গত আগস্ট মাসে প্রস্তুতি সমিতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হবে : 'জাতীয় সংহতি-সাধনে লেখকদের ভূমিকা', 'দেশবিভাগ-পরবর্তী পঞ্জাবী উপন্যাসের ধারা', 'পঞ্জাবী গদ্যভাষার সমস্যা'। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকরা এইসব আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন।

* * *

প্রখ্যাত তেলুগু ও সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রী মাল্লাদি সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী গত ১২ জুন বিরাসী বছর বয়সে বিশাখাপত্তনে লোকান্তরিত হয়েছেন। তিনি কিছুকাল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের তেলুগু ভাষার অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে অল্প বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তেলুগু ও সংস্কৃত—উভয় ভাষাতেই তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর লেখা প্রধান গ্রন্থসমূহ : 'অল্প দশরূপকম্', 'কলাপুরাণোদয়ম্', 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', 'সংস্কৃত কবিদের জীবনী'। তাঁর মৃত্যুতে তেলুগু ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হলো।

* * *

কলকাতার রবীন্দ্র-কাননে (বিডন স্কয়ার) গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে

বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত তিন সপ্তাহব্যাপী যাত্রা-উৎসব শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

এই উৎসবে মোট বাইশটি দলের অভিনয়ে তেত্রিশটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। তার মধ্যে পঁচিশটি নাটক পেশাদার যাত্রা দল কর্তৃক অভিনীত হয়। বিরাত মণ্ডপে ৪৩০০টি দর্শক-আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে অভিনয়-মঞ্চ স্থাপিত হয়। মঞ্চের সকল দিক ঘিরে আসন পাতা হয়েছিল।

উদ্বোধন-দিবসে যাত্রাজগতের ধুরন্ধর নট-নাট্যকার শ্রীফণী বিজ্ঞাবিনোদ ও জনপ্রিয় নাট্যকার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দে মহাশয়দ্বয়কে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

যাত্রা-উৎসবের উদ্বোধন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন : “আমি দেখেছি যে, বাংলা তথা ভারতের লোকসংস্কৃতির বিনাশ নেই। কতকাল ধরে আমাদের দেশে যাত্রা, পালাগান চলে আসছে—আজো এদের জনপ্রিয়তা কমেনি ; এদের সাহায্যে আমাদের দেশের সাধারণ লোক যেমন আনন্দ পেয়েছে, তেমনই শিক্ষাও পেয়েছে। লোকশিক্ষার জন্তে যাত্রাগানের প্রয়োজনীয়তা বরাবরের মতো আজো আছে। তাই থিয়েটার-সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও আজ তা বেঁচে রয়েছে। আমি যাত্রার জনপ্রিয়তা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। বাংলার যাত্রাগান ব্রজেন দে, ফণী বিজ্ঞাবিনোদ, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি শক্তিমানদের সহায়তায় উন্নতির পথে অগ্রসর হোক, এই কামনাই আমি করি।”

*

*

*

কলকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে প্রাচ্য বিজ্ঞানুশীলনের ক্ষেত্রে বাংলার অবদানকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিচ্ছে। দেশী ও বিদেশী বহু মনীষীর গবেষণা-পুত এবং সাধনা-সমৃদ্ধ এই পরিষৎ স্টেন কনোর (Sten Konow) মত মহাপণ্ডিত পরিষদের “পরিদর্শন গ্রন্থে” সংস্কৃত শ্লোক পরিষৎ-প্রশস্তি রচনা করে নিজের নামকেও সংস্কৃতায়িত ক'রে স্বাক্ষর করে গেছেন—“ইতি শ্রী শৈলকণ্ঠ ভট্টেন” রূপে। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতাত্মিক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্তে পরিষৎ বহুবিধ উপায়ে বিচিত্র কর্মধারা অনুসরণ করে চলেছে। যেমন—

১। সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা, পাঠ ও সমালোচনা।

২। সনাতন পদ্ধতিতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার দ্বারা সকল প্রকার শাস্ত্রের অধ্যাপনা।

৩। গ্রন্থাগারে যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ।

৪। অপ্রকাশিত প্রয়োজনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ।

৫। সংস্কৃতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ও তাহার মাধ্যমে বিদ্বৎ সংস্কৃত উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া।

৬। সংস্কৃত অভিনয়ের শিক্ষাদান এবং নাটকাদির নিয়মিত অভিনয় দ্বারা সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচার।

৭। শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা ও অমূল্য উপায় লোকশিক্ষার প্রসার।

৮। অমূল্য বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা।

৯। বিশাল গ্রন্থাগার ও পাঠভবনের প্রতিষ্ঠা।

শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিজ্ঞা-গ্রন্থাগার এই পরিষদের দ্বিতলে অবস্থিত। পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় রচিত ভারত-তত্ত্ববিষয়ক সকল দুর্লভ গ্রন্থের বিরাট সংগ্রহ রয়েছে এখানে। চৌদ্দ হাজার অমূল্য পাণ্ডুলিপি এখানে সংগৃহীত হয়েছে। পরিষদের সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। পরিষদের নিজস্ব বঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যবিভাগ বাংলার গৌরবের বস্তু। আরো বহুবিধ কর্মধারা অর্থাভাবেই পরিষৎ অনুসরণ করতে পারছে না। এইদিকে সরকার এবং জনসাধারণের সম্মিলিত দৃষ্টি একান্ত অপেক্ষিত।

গত ৩০ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার পরিষদের ৪৬ তম বার্ষিকোৎসব ১৯৮১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট নিজস্ব বঙ্গমঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক. হুমায়ুন কবিরের পৌরোহিত্য সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে একটি প্রাচ্যবিজ্ঞাসংক্রান্ত প্রদর্শনীও সেই দিন ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় সভাপতি কবির মহোদয় সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে এই পরিষদের কর্মধারাকে অভিনন্দিত করেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাত্মক সংস্কৃতে স্বাগত জানান এবং অধ্যাপক সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন। অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী জানান ধন্যবাদ।

পরিষদের সদস্যরা কবিগুরু “ডাকঘর” নাটকটির সংস্কৃতানুবাদ “বার্তাগৃহম্” বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। পরিষদের সহঃ-সম্পাদক, সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে সর্বভারতীয় নেতা অধ্যাপক ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী এই “বার্তাগৃহমের” রচয়িতা। ভাষার সারল্যে ও

মাধুর্য্যে এবং ভাষান্তরীকরণে মূলের ভাব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষণে তিনি অনন্তসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই “বার্তাগৃহম্” ভারত-সরকার Sanskrit Tagore Memorial Volume-এ সাহিত্য আকাদেমী হতে প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। গত বৎসর বেতার এবং রঙ্গমঞ্চে বহুবার এই বার্তাগৃহমের অভিনয়ে পরিষৎ সদস্যেরা অভূতপূর্ব নৈপুণ্যে প্রদর্শন করেন। বর্তমান অভিনয়েও সেই মান অক্ষুণ্ণই রয়েছে। নাটকটি পরিচালনা করেন সিদ্ধ নাট্যপরিচালক অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য, ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দীপক চট্টোপাধ্যায়, কুমারী রূপলেখা বসু, কুমারী হেনা মজুমদার এবং পরিচালক সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও লেখক ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী। সংগীতাংশে অংশগ্রহণ করেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কুমারী সুদক্ষিণা মুখোপাধ্যায়। ডঃ হেরষ চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মধুসূদন কাব্যতীর্থ মঞ্চরচনায় সহায়তা করেন। প্রযোজনায় ছিলেন ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। প্রতিটি পাত্রপাত্রীর আঙ্গিক-বাচিকাদির যথাযথ প্রয়োগে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের এই কুশলী বিদগ্ধ শিল্পীবৃন্দ সর্বভারতে শতাধিক সংস্কৃত নাটকের সার্থক অভিনয়ে সংস্কৃত নাট্য-জগতে যুগান্তর আনয়ন করেছেন। উচ্চারণের বিশুদ্ধির ক্ষেত্রে এঁরা আদর্শ স্থানীয় এটা বাংলার বিশেষ গৌরবের কথা। বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজের এই প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং সারস্বতবৃন্দের মধ্যে অবতরণ বাংলার নাট্যজগৎকে সমৃদ্ধি দান করে, এই দিনের অভিনয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক কবির, এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, লোকসভা-সদস্য চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, আচার্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিদগ্ধ কলারসিকেরা উপস্থিত থেকে সংলাপ রচনা ও অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ প্রাচ্যবিহার অল্পশীলনে নিখিল বিশ্বের কেন্দ্রতীর্থে পরিণতি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

যদি পড়তে হয় ত

বেঙ্গলের বই পড়ুন।

অন্তরীক্ষের সঙ্গীত

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

॥ দুই ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

স্থূলশরীরটাকে বলি জীবদেহ আর সূক্ষ্ম শরীরটাকে, শিবদেহ। মেঘের অন্তরালে চন্দ্রমার মত শিবদেহটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে জীবদেহের আবরণে : অতি বাস্তব সেই আবরণের বন্ধন ভেদ করে প্রত্যাহই, এমন কি প্রতি মুহূর্তেই দে-টি মুক্তি পেতে চাইছে, মনের আকাশে ভাসছে, আত্মার আকাশে মিলছে। এত সংগোপনে, এমনি রহস্যজনক সূক্ষ্মছন্দে, শিবগতির এই কার্যটি সম্পাদিত হচ্ছে যে আমরা, জড়ভাবে ভাবিত দেহীরা, তা বুঝতেই পারছি না। স্থূল চোখে জীবদেহের গতি-পরিণতি ধরা পড়লে আমরা বলি দেহটা পরিবর্তনশীল : কোমার থেকে পৌগণ্ডে, পৌগণ্ড থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে, প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্যে, বার্ধক্য থেকে মরণে—দেহ জীবনের গতাগতি। বোধির আনন্দ মহিমায় ধ্যান করতে পারলেই ধারণা হবে যে, দেহের এই গতাগতি বা পরিবর্তনশীলতা সম্ভব হচ্ছে শিবদেহের বন্ধন-মুক্তির নিত্য প্রচেষ্টায়।...শিবদেহ কেবলি, কেবলি, কেবলি প্রকাশপথ চাইছে, যুগ যুগ ধরে চাইছে, জন্ম জন্ম ধরে চাইছে। কত মৃত্যু তাই পার হয়ে এলাম, কত জীবন, কত, কত জীবন, হলাম পার, হব পার।... ইহলৌকিক বাস্তব জীবনে জীবনদেহটা নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি করি—অতি সত্য এই মহান তত্ত্বটি তাই বুঝতে পারি না, বুঝতে চাই না। কিন্তু একদিন-না-একদিন চাইতেই হবে : কামকামনা, স্বখদুঃখ, ভোগশোক, মানপ্রতিষ্ঠা নিয়ে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মেই এ-জীবনে যুম আসবে সেই জীবনে জেগে ওঠার জন্তে, যেন জীবদেহের আবরণ যাবে ফেঁসে ; শিবদেহ তখন খাঁচা-ছাড়া পাখীর মত উধাও হবে অনন্তে। কোথায় যাবে ? না, যেখান থেকে এসেছে, সেখানে।

কোথা থেকে এসেছে ? বৃহত্তমেরো বৃহত্তর সত্তা থেকে অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে, আনন্দ থেকে, আত্মা থেকে। কিন্তু আত্মায় ফিরতে হয়। মৃত্যু হলেই যে আত্মা মিলবে, এমন নয়। যতদিন পুনর্জন্মের সূক্ষ্মতা বা দুষ্কৃতি—ততদিন আত্মদর্শন ও ব্রহ্মনির্বাণ সম্ভব নয়। জীবদেহের কোমার, যৌবন ও

বার্ধক্যের মত দেহান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও নতুন এক জন্ম। ‘জাতক্য হি
 ক্রবো মৃত্যুক্রবং জন্ম মৃত্যু চ’। মৃত্যু-জন্মেও জীবনার্থকের নবতর সাধনা
 চলে মহত্তর জন্মজন্মের প্রার্থনায়। অবশ্য সাধারণ জীবমানবদের মধ্যে
 ভোগবৃত্তের কামনাটাই প্রবল থাকে বলে—মৃত্যুর পর অদৃশ্যজন্মেও কামবীজ
 তাদের অক্ষুণ্ণ থাকে। তারা কামনার বেগে শিবত্বের পথে নয়, জীবত্বের
 পথেই নামতে চায়, নামে। যাদের যেমন ভাবনা, বাসনা, সূক্ষ্মশরীরে
 তাদের প্রচ্ছন্নভাবে তেমন ভাবনা-বাসনাই ফলে উঠতে চায়। ভাবনার
 সিদ্ধি ও বাসনার চরিতার্থতার জন্য জীবশরীরে জন্ম নেয়ার আগ্রহে প্রাণপণ
 তারা চেষ্টা করে : অবশেষে কর্মফল ভোগার্থ যথাকালে তারা জীবশরীরে,
 জীবলোকে আসে। থাকে। ভোগ করে। আবার যায়। আবার আসে।
 যতকাল জীবত্বে বাসনা, ততকাল ভোগভূমে গতাগতি।

তবু জীবের মুক্তি হবে—কেননা শিব আছেন যে প্রচ্ছন্ন শরীরে। আমাদের
 ইন্দ্রিয়লোকের অগোচরে প্রচ্ছন্ন সেই সূক্ষ্ম শিবের লীলা চলছে, ভেতর থেকে
 তাই কোনো-না-কোনো উপায়ে, কোনো-না-কোনো কারণে টান পড়ছে।
 ইহলোকে যেমন শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ, সংগুপ্ত সেই সূক্ষ্মশরীরেও তেমন।
 কেউ জীব-লোকে ফিরবার কামনায় ব্যাকুল; কেউ জীবজন্মের দুষ্কৃত
 দুঃস্বপ্নকে সাধনবলে অতিক্রম করার উচ্ছ্বাসে বীতনিদ্র; কেউ শান্ত প্রশন্ন
 স্বর্গলোকে অবস্থান করেও মহত্তর কোনো দিব্যজীবনের অপেক্ষায় তপোনিরত,
 কেউ জন্ম জন্মান্তরের সাধনপ্রভাবে সত্যলোক-যাত্রী দেবাত্মা; কেউ অপাবৃত্ত
 অব্যাহত পুণ্যমহিমায় অযুত সৌরমণ্ডলের নিয়ন্ত্রী শক্তি মহেন্দ্র; কেউ
 মহেন্দ্রমণ্ডলের অচিন্ত্যপূর্ব ব্রহ্মজ্যোতি। এই জ্যোতি সৃষ্টিপ্রতিভায় ব্রহ্মা,
 পালনপ্রতিভায় বিষ্ণু, প্রলয়প্রতিভায় মহেশ্বর। নির্বিশেষ ব্রহ্মবীজ থেকেই
 বিচিত্র এই বিশ্বশক্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সেই ব্রহ্মবীজ-ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের,
 সেই হেতু আমাদেরো, কারণ। আমরা কার্য। কার্যে কারণের সূক্ষ্মশক্তি।
 জীবজীবনে, বিশেষ করে’ জীবমানবের শিবজীবনে, এই শক্তি-চেতনার
 সূচনা। কিন্তু সূচনা সূচনা-ই। অনেক, অনেক পথ তারপর পেরোতে হয়।
 অনেক, অনেক পথ পেরিয়ে, পেরিয়ে এবং পেরিয়ে আদিগৃহে আমাদের
 আসতে হবে। ঘর-পালানে বয়াটে বালকের মত আজ অবশ্য আদিগৃহে,
 আপনগৃহে ফিরতে চাইছি না। পথে পথে প্রবাসে ঘুরছি, পথের প্রলোভনে
 থামছি। আসক্তি আনন্দে বাসন্ত সংগীত করছি রচনা? এরো চেয়ে আরে
 মহত্তর সংগীতের সম্ভাবনা হয়তো আছে, কিন্তু যেটুকু পেয়েছি, সেটুকুর

মহত্ব-প্রচারেই আছি সচেতন। রাজার ছেলে, তবু বয়াটে ছেলে। প্রবাসে পড়ে আছি মদ্যাক্ষ মাতালের নেশা-নন্দের বাস্তবতায়।

সংসারে আমরা অনেকেই এই বয়াটে বালকের মত। দেবযান-গতিপথে, স্বর্গহের পথাভিমুখে আমাদের বাসনা নেই।...কত বড় বিশাল এই ব্রহ্মাণ্ড—প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে কত ‘লোকের’ সমাহার : ভূলোক শুধু নয়, কত ভুবলোক, কত স্বর্লোক, কত মহর্লোক, কত জনলোক—লোকে লোকে কত জীবনের অভ্যুদয়, জীবনে জীবনে কত লীলা, লীলায় লীলায় কত রস, কত রঙ, কত আশ্বাদন—কিন্তু না, এ-সমস্ত যেন কিছু না, সত্য শুধু আজ যেটুকু পেয়েছি সেইটুকু : সত্য এই মর্ত্যজ মোহজীবন। এই তার ভোগসন্ধ্যা মধুঘোষন, এই প্রাপ্তি, এই কান্তি, এই তৃপ্তি।...ভোগাসক্তির আতিশয্যে বারংবার তাই জীবত্বের পথে নামতে চাই। বলি, এটাই বাস্তব। ইহজীবনে, মনে-ও করি : এ-ছাড়া অন্যতর বাস্তব আর নেই।

আমাদের এই কামনার টানে সেই একই বেগে তাই জগল্লীলা চলছে, চলবে আরো লক্ষ্য কোটি বৎসর। আমরা-ও এই একঘেষে ভোগবতীর কূলে বারংবার ফিরব, ফিরব আর ফিরব। মনের মত করে’ ভোগ করতে পারছি না বলে’ লড়াই করব, শোষণের ফন্দী আঁটব, নতুন নতুন আইন বাতলাব, বোমা ফাটাব, বিষ ছড়াব আকাশে। আবার সময় বুঝে শাস্তি শাস্তি-ও করব। যুগ যুগ ধরে এমনি চলবে। একঘেষে এই জীবোন্মত্ততাটাকেই বীরত্ব বলে, আধুনিক সভ্যতা বলে, করব প্রচার। জীবনের গভীরে, অন্তরীক্ষের আনন্দে নবতর জীবনের অজস্র বসন্ত যে আছে প্রচ্ছন্ন, অজস্র সহস্র কুসুম যে আছে প্রসুদিত হওয়ার প্রতীক্ষায়, প্রগতি করব বলে’ তা সহজে স্বীকার করব না। কেউ করছে শুনলে দলবৈধে তাকে ‘পাগল’ বলে হাসব, ‘পলাতক’ বলে তাড়াব। ‘অবাস্তব’ বলে’ ডাক্তার ডাকব। তখন দশচক্রে ভগবানো তৃত হবে। ‘সভ্য’ ডাক্তারের নির্দেশে তাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠানো হবে। হাজতে রাখা সম্ভব হলে—তা-ও হবে।

তবু কেউ কেউ সে লোকের খবর এ-লোকে জানার জন্তে আসবে। যুগে যুগে আসছে।...ধর্মের রক্ষার জন্তে, সাধুদের পরিব্রাজনের জন্তে, যুগে যুগে বিচিত্ররূপে সত্যসত্যই ‘তিনি’ আসছেন—আসছেন কবিরূপে, শহীদরূপে, ভক্তরূপে, দার্শনিকরূপে, ধর্মনেতারূপে, শাস্তিবাদীরূপে, সমাজ-সংস্কারকরূপে। বলি, তাঁরা সব কাঁরা? ‘তিনি-র’-ই বিচিত্র ‘যুগরূপ’ কি তাঁরা নন? যুগভেদে রূপভেদ, কর্মভেদ, ভাবভেদ। আসলে সকল ভেদের মূলে-ই সত্য সেই ‘তিনি’

—তাঁর ইচ্ছা : অসং থেকে চলো সতে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃততে—বুঝবে জীবনের মর্ম কী, ধর্ম কী।

বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন এই : যুগ যুগ ধরে বিচিত্ররূপে বিচিত্র প্রয়োজনে তিনি তো আসছেন, কিন্তু মানুষের মুক্তি কি সম্ভব হচ্ছে ? না, হচ্ছে, কিন্তু মনের মত করে হচ্ছে না। হবে কি করে ? অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমানেরা : সে-লোকের খবর দিতে এসে এ-লোকের নাম-যশ অর্থ-প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি পূজা-পাওয়ার প্রলোভনে যে পড়ে যাচ্ছে !...ঈশোদ্বীপ্তা এই পৃথিবী, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো এর আনন্দ, এ-তত্ত্ব জীবনধ্যানে আমরা তো তেমন করে” প্রতিভাত করতে পারছি না, চাইছি-ও না। রাজনীতিক বা সমাজসেবীদের কথা থাক। ধর্মনীতিকদের দিকে-ও চেয়ে দেখুন—দেখবেন, তাঁদের সম্প্রদায়ে ‘খাটি’ যদি থাকেন বিশ’ পারসেন্ট, ‘মাটি’ তবে মিলবে আশি পারসেন্ট। আদর্শ আছে মুখে, কিন্তু অন্তরে আছে আদর্শবিরোধী যত বিলাসচিন্তা, প্রভুত্বচিন্তা, স্বার্থচিন্তা—এক কথায়, অহং চিন্তা। অহং-এর অন্ধকারে মাটির পৃথিবীটা অহং-কেই বাস্তব বলে জানছে। এই বাস্তবের পক্ষে ঈদের সমর্থন, দেশ-সমাজে ‘কুলীন’ বলে তাঁরাই গ্রাহ্য হচ্ছেন, বিশ্বস্ত বলে, ভোট পাচ্ছেন, বিজ্ঞ বলে সম্মানিত হচ্ছেন।

তবু ভয় পাবার কারণ নেই এই জন্তে যে, ‘তিনি’ প্রত্যহ-ই আসছেন, তাঁর আসার বিরাম নেই কোনোকালে। আজ না বুঝি কাল নিশ্চয়ই বুঝব, যে, আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, তিনি আসেন—নূতন করে’ আবার আসার পথটি রাখেন প্রস্তুত করে’। সেই পথ ধরে’ প্রত্যহ-ই আসছে নব নব ধর্মসঙ্গ, কর্মসঙ্গ, কবিসঙ্গ, আসছেন বিপুলশক্তিধারী যুগবিপ্লবী, যুগাবতার—মানুষকে শেখাচ্ছেন শান্তির তত্ত্ব, প্রেমের তত্ত্ব, স্বকৃতির তত্ত্ব, শুধু মাত্র ভোগের নয়, ত্যাগের পথে, যোগের পথে দিচ্ছেন টান। ফলে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ছে, সংস্কৃতির রূপ বদলাচ্ছে। কর্মের পরিধি সীমা ছাড়ছে, সাধনার মূল্য মর্যাদা পাচ্ছে, আত্মার ঐশ্বর্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।...হ্যাঁ গো, হচ্ছে।

বিশ্বাস করা তাই ভালো, যে, মানুষ আজ এ-পথে-ও যেমন, সে-পথে-ও তেমন : ‘প্রকৃতির’ ঠেলায় সে জীবন্তে চলে, ‘পুরুষের’ আকর্ষণে শিবন্তে টলে। টলতে-টলতে চলতে-চলতে একদিন-না-একদিন গন্তব্যের অভিমুখে মুখ ফেরাবে : বোধির ঠিকানা পাবে, ‘মঙ্গলের’ আনন্দ আশ্বাদ করবে। সুন্দর হবে।

তখন, আজ না-হলেও কাল, কাল না-হলে পরশ—সেই যত সুন্দরদের স্পর্শে মাটির পৃথিবীটাই ধারণ করবে স্বর্গকান্তি। রক্ত মাংসে-গড়া মানুষ হয়েও

‘আমরা যেন দেবমানব হব। তখন আমাদের গৃহে থাকবে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য, সমাজে সম্প্রীতি। বিদ্যালয়ে শ্রদ্ধা ও স্নেহ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম, স্বদেশে সর্বতোভদ্র সৌভাগ্য, বিধে বিশ্বমঙ্গলের সদিচ্ছা। তখন আমাদের বাবসাবিগ্ণ সাধুতার সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হবে; আমাদের রাষ্ট্রনীতি গোষ্ঠীমঙ্গলে শুধু নয়, দেশমঙ্গলে তথা বিশ্বমঙ্গলে হবে সচেষ্ট; আমাদের পৃথিবী হবে সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত কল্যাণ-সুন্দর মহাভূমি; আমাদের কর্ম হবে বিশ্বজনহিতায় মহাযজ্ঞ; আমাদের ধর্ম হবে স্থিতপ্রজ্ঞসাধনার মহান পন্থা ও পাথের। তখন :
‘কুর্বেম্বেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা—

এবং ত্বয়ি নাত্মথতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে’

—মানুষ বলবে। ‘যাশ্চনবজ্ঞানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরানি’—মানুষ গাইবে। তখন তার পরিণামটা কি হবে? জীবদশাতেই মানুষ স্থলশরীরের থেকেও সূক্ষ্মশরীরে আলোক করবে আহরণ : জীব থেকে-ও শিবৈশ্বর্য করবে লাভ। ইচ্ছামাত্র তাঁর ব্রহ্মাও দর্শন তখন সম্ভব হবে। আজ ‘আমরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-তন্ত্র নির্মাণ করে’ বহু ক্রেশে চাঁদে ‘লুনিক’ পাঠাচ্ছি, চাঁদের অপরার্ধে কী-আছে না-আছে জানবার জন্তে অভিনব বিজ্ঞানপন্থা আবিষ্কার করছি, তখন যোগসুন্দরের জ্ঞানমহিমায় যত্র-তত্র যাওয়া ও জানা সম্ভব হবে, বিধে প্রত্যাগত হয়ে সত্য-তত্ত্ব প্রকাশ-করাও হবে সম্ভব।

মানুষের সেইটেই যে পরম পুরুষার্থ তা’ অবশ্য নয়। এ কালেও এমন অনেকে আছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে আছেন, যারা সর্বজ্ঞ, যারা জীবনমুক্ত মহর্ষি, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রহস্য যাদের করায়ত্ত। এই কি ব্রাহ্মী স্থিতি? এই কি পুরুষার্থ? না। বর্তমান অধ্যায়ে এইটুকু মাত্র বলার কথা : দেবমানবত্বের সাধনায় মানুষের শক্তি কোটি-কোটি গুণ বেড়ে যাবে। সেদিনকার কাব্যসাহিত্য, তত্ত্বদর্শন, কর্ম-ধর্ম, ধ্যানধারণা অনির্বচনীয় রসবসন্তের অনন্ত বিলাসে কুসুমিত হবে। সেদিনকার পৃথিবীর রূপ, স্বদেশের ঐশ্বর্য, সমাজের চরিত্র। গৃহের শান্তি ও মানুষের প্রেম কল্পনা করাও এখন সম্ভব নয়।

মানুষকে কিন্তু স্বগসুন্দর সেই ‘মহাদিন’টির প্রতীক্ষায় থাকতে-ই হচ্ছে। কেউ জ্ঞাতসারে থাকছেন, কেউ, অজ্ঞাতসারে।

(ক্রমশঃ)

কালকূটের

অমৃত কুন্তের সন্ধানে ৮মঃ

৫০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

পথ চলে গেছে

সমর সোম

[ভাদ্র সংখ্যায় 'দূরের পথ' নামে প্রকাশিত রচনার দ্বিতীয় কিস্তি]

[২]

— জ য পু র —

রাত শেষ হয়ে আসছে। প্রায় চারটে বাজলো। জয়পুর স্টেশনের কিছু দূরে গাড়ী থামে। স্তিগনন্ নেই। জয়পুর আসছে; বিছানা বেঁধে তৈরী হয়ে নিই।

বাইরে আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। অন্ধকার চিরে ছুটে বেড়াচ্ছে বিদ্যুৎলতা। হ্রস্ব বর্ষণ। আমাদের বগি এইখানে কেটে যাবে। দুর্ঘোণে মাথায় করে কে আসবে এসময়? স্থির হয়—কাটা বগিতেই ভোর করে দোব। তারপর বর্ষণ থামলে যাত্রা হবে শুরু।

দেখা গেল ধারণা ভুল। দুর্ঘোণের পুরানো বন্ধুরা বৃষ্টির মধ্যেই অন্ধকার ডিঙ্গিয়ে ছুটে এসেছে। এনেছে ফুলহার। শ্রদ্ধেয়র জগ্ন এমনি আন্তরিকতা। শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সকলের। এরা কেউ তাঁর দলের লোক নয়।

বনস্পতি ছায়া ছড়ায়, কাছে থাকলে সে ছায়ায় ভাগ বসানো যায় অনায়াসে। শ্রদ্ধেয়র মালার ভাগ স্বীকার করতেই হয়। বৃষ্টির মধ্যে স্টেশন-ওয়াগনে উঠল বাক্স-বিছানা। আমাদের ঘিরে বসলো জনতা।

পথ ভেসে গেছে। দু'পাশে জমে উঠেছে বালু-কুপ। ছবির মত স্বপ্ন রচনা করছে দূরে দূরে সরকারী পথের আলো। এই জয়পুর! এখানে আছে মানসিংহের রাজধানী। এখানকার বুক ঘেঁষে ছড়িয়ে গেছে আরাবলি পর্বতের সারি। কে জানতো,—আরাবলি তখন বৃষ্টি ও অন্ধকারের পর্দা ঠেলে কাছ থেকেই আমায় দেখছিল।

স্বপ্ন ভগ্ন হোল রামলীলার গানে। ওই কর্ণপটাহবিদারক অস্ত্র-কীর্তন উত্তর প্রদেশের বহু রাত্রি করেছে নিদ্রাহীন। আবার এখানেও সেই? চমকে উঠি।

গাড়ী এসে থামে। সামনেই কিশোর নিবাস। ভূদান সমিতির কার্যকর্তা পূরণচাঁদজী নামলেন বৃষ্টির মধ্যে; দেখালেন পথ। ছত্র এবং

ছত্রধারীর অভাব ছিল না। তবু বিশাল ফটক পার হয়ে ভিজে ভিজেই উপরের সিঁড়ি ধরে উঠে গেলাম। অগ্নি কারো হাতের ছাতা মাথার উপরে উঠলে—নিজের কাছেই নিজের মাথা হেঁট হয়ে আসে। জায়গীরদারের কুঠি—এই কিশোরনিবাস। যত বড় কম্পাউণ্ড তত বড় ঘর।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছিল। থাক না মেঘ আর বৃষ্টি, ভোরের পাখী দুর্ধোগেও চূপ থাকতে পারে না। স্বর্গশূলীর বিরাট গহুজের মাথায় বিদ্যুতের ঝোলানো আলো ঝড়ে দোলে। থরথর কাঁপে তার ছায়া। সে ছায়া আমার ঘরেও ছড়িয়ে যায়, দোলা জাগায়। সন্দিনীকে দেখিয়েছিলাম স্বর্গশূলীর আলোছায়া, দুর্ধোগ-রাত্রির সেই নিরন্তর অস্থিরতা। ছিটিয়ে-পড়া আলোর হলুদ গুঁড়িয়ে ও শুধু আমার দুচোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঘুম আর হলো না।

ভোরের আলো পেয়েই জেগে ওঠে জয়পুর। চারশো বছর আগে কোন একদিনে, কোন একক্ষণে আমার প্রাসাদের নিভৃত বিশ্রামে স্বপ্ন দেখেছিলেন দ্বিতীয় জয়সিং—নতুন রাজধানী জয়পুরের। আমার প্রাসাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভেবে উঠতে পারি না—এস্বপ্ন এ পরিকল্পনা কেন! জয়পুরের সঙ্গে আমার বিরাট পার্থক্য। জয়পুর হোল—সমতল ভূমির মন্থণতা। এই মন্থণতাই কি ছিল জনপদ সৃষ্টির অব্যর্থ আমন্ত্রণ? কে জবাব দেবে?

ইতিহাস আজ স্তব্ধ, নতমস্তক। হাওয়া-মহলের বিল্লীর দিকে চেয়ে মুগ্ধ হলেও আমার প্রাসাদের কালজয়ী গৌরব-শিখরে তুচ্ছতা, সামান্যতার কোন ধুলোই জমতে পায়নি। জয়পুরের হাওয়া-মহল, সর্বতোভদ্র পরিকল্পনা অল্পযায়ী চারকোণের চার তোরণ, একই নক্সার একই রংয়ের বাড়ী, মোজা সমান্তরাল পথ—সুপরিকল্পিত রুটির মধ্যে সৌন্দর্যকে বেঁধে রেখেছে, স্বতঃস্ফূর্তির আনন্দে কোথাও উদ্বেল হতে পারেনি।

পূর্ণচাঁদজী আর গুলাবচাঁদজী আর ভগবতী দেবী সকালের যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হলেন। প্রাণ খোলার জন্তে লোক চাই পথে। সন্দিনীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ নেই। নেশা ধরে আসার ভয় আছে। একদিকে ভয় আর একদিকে দূরত্বের বেদনা গ্রহি বাঁধে। উপায় নেই। বসে বসে ভগবতী দেবীর বেপরোয়া কথা-বার্তা এবং ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করি।

ইনি কর্মী; প্রাণের অসীম প্রাচুর্যের অধিকারিণী। দলের কথা বলে এঁর শ্রুতি তাই দলন করব না। গোয়ায় সাম্রাজ্যবাদী পর্ভুগীজদের বিরুদ্ধে ইনি ছিলেন সত্যাগ্রহী অভিযাত্রীক। হঠাৎ একদিন থবর ছড়িয়ে পড়লো—

ভগবতী দেবী গোয়ায় শহীদ হয়েছেন। এই দেহান্তর সংবাদের উপর জয়পুরের বহু রাজনৈতিক সভায় বক্তা ও শ্রোতা দু'পক্ষই চোখের জল বুকে করে শোকপ্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল ভগবতী দেবী বহাল তবিরে ফিরে আসছেন। আজো তাই স্বযোগ পেলে এ নিয়ে লোকে রহস্য করে। এদিকে তাঁর কান নেই। গভীর আত্মীয়তায় অনায়াসে তিনি মানুষের দিকে চোখ ফেরান; হঠাৎ ভোরবেলায় এক ঠোঙা সিঁকাড়া নিয়ে হাজির।

—“ও কি করেছেন?”

—“খেতে ভালো লাগবে! জমবে চায়ের কাপ!”

আপনার সঙ্গে বসে আহারের ভাগ নেবেন অসম্মোচে। ক্লাস্তি লাগলে বিনা জিজ্ঞাসায় আপনার বিছানা বেদখল করে টান হয়ে শোবেন, আলাপ ভালো না লাগলে—চেষ্টা দিয়ে থামিয়ে দেবেন, সত্যের খাতিরে অগ্রিয় কথা বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। অদ্ভুত এক খোলামেলা মন।

পুরণচাঁদজী নিজে ব্যস্ত, গুলাবচাঁদজীও তাই। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত কেটে যায় কিশোর মহলে। ঘর আছে, ঘরগী আছে; হাতে হাতে রয়েছে স্নেহভালবাসার বহু লাগাম। তবু এঁরা গৃহী হয়েও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস নিরাসক্তিতে মুক্তি খোঁজে না, অন্তর-শক্তিতে প্রাণবান হয়ে জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র আশক্তির উপর রাজ করতে চায়।

জয়পুরের নতুন প্রাসাদ ভবনের পাশ দিয়ে চলি। দেখা যায়—শহর নিয়ে রাজশক্তি পরিকল্পনা করলেও মানুষের ভবিষ্যত কোন পরিকল্পনায় ধরা পড়েনি। বস্তুর সমারোহ আছে, মনুষ্যত্বের সম্মান নেই। মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই। জনদেবতা দুঃস্থ। দারিদ্র্যে, দুঃশিক্ষায়, বিষাদে ভার চোখের কোলে জমেছে কালি। যত এগোই হৃদয়ের বোঝা তত ভার ঠেকে।

ইতিহাস কি কিছু রাজার নাম? সভ্যতা বলতে কি কিছু পথ আর সাজানো দোকান? অপরিচ্ছন্ন জীবন, অশিক্ষা-অর্ধশিক্ষা, অনাহার, সামাজিক ও পারিবারিক গ্লানি, তিক্ততার এবং রিক্ততার মধ্যে মানুষের এই যে চাপা কান্না—একি সভ্যতার সকল কলগুঞ্জন ব্যর্থ করে দেবে না?

দেখতে দেখতে পথ শহর ছাড়িয়ে যায়। বেরিয়ে পড়ে তার ক্লাস্ত আত্মা বন্ধন-নিষেধের বাইরে। ইতিহাসের অতীত অধ্যায় সামনে ধরে বলে—“চিনতে পারছ? ওই তো আমেরী প্রবেশদ্বার!...ওই সেই রাজপুত রাজাদের সমাধি ছত্রিয়। এঁদের শ্মশানশয্যাও নিরঙ্কুশ। দেখছনা, কোন

প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, কোন রকম প্রতিস্পর্ধা নেই।' তাকিয়ে মনে হয়—
স্বতিনৌদেহর আড়ম্বরে রাজকীয় বিলাস মৃত্যুকেও আঁকড়ে ধরেছে।

—‘পথের ডান পাশে ও কি জল-শোভা হ্রদ কোথা থেকে এলো পূরণজী?’

—‘প্রকৃতির দান! মানুষ কি এ হ্রদ তৈরী করতে পারে! পিছনের ওই
পাহাড় বেয়ে নামে বৃষ্টির জলোচ্ছ্বাস। ভরে ওঠে, ভেসে যায় সমতল ভূমি।
ওই দেখুন মোমজী, এ হ্রদের প্রাণ!’

সত্যিই, দেখবার মত এক বিরাট জলমহল। অপূর্ব! চারিদিকে সবুজ
কাঁচের মত জল... আর তারই মাঝে দ্বীপের মত তন্দ্ৰাজড়ানো এই মহল। এর
পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় জয়সিংহের। তাঁর কল্পনার জলমহলে থাকতো হৃদয়ের
সমারোহ, প্রাণের অফুরন্ত আলোড়ন। আর আজ?—পূরণজীর কথায়...
সাধারণ মানুষের বিচারে—এক ভূত্‌হা মকান! ভূতের বাড়ী!!

হোঃ হোঃ করে শিশুর মত প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন সকলে। ব্যাপার কি?
ভূতের নামে ভয় পায়,...এঁরা হাসেন কেন?

গুলাবচাঁদজী বুঝিয়ে দেন,—ভূত হলাম আমরা। আগস্ট আন্দোলনের
সময় ইংরেজ সরকারের ঘাড় মটকাবার জন্তে আত্মগোপন করে এই বাড়ীতে
বসে থাকতাম।

ভারতবর্ষের একজন প্রথম শ্রেণীর ধনকুবের টাকা দিয়ে এ বাড়ী কিনতে
চেয়েছিলেন। জানিনা জলমহল তাঁর কি কাজে লাগতো! হয়তো কোন
হিসাব-কিতাবের দপ্তর হতো! জনসাধারণ কিন্তু তাঁকে কিনতে দেয়নি।
আন্দোলন করে পথ আগলেছিল তহবিলের। বুঝিয়ে দিয়েছিল—তহবিলের
জোরে জলমহল দখল করা যায় না। জলমহলের উপর আছে বৃন্দাবনের
গোবিন্দজীর আশীর্বাদ। মন্দির-বিদ্রোহী জিজিয়াকর প্রবর্তক ঔরঙ্গজেবের
ভয়ে ভক্তের দল বৃন্দাবন থেকে ঠাকুরকে এনেছিল এখানে। জলমহল তাই
শোভা নয়; জলমহল শিবিরও বটে।

পাহাড়ী পথ ধীরে ধীরে ধীরে উঠেছে উপরে। চলে গেছে বহু গ্রাম
জনপদ পার হয়ে শাহপুরা ও দিল্লীর দিকে। পাশে পাশে খয়ের গাছের স্নিগ্ধ
শোভা, বাবলার হাল্কা ছায়া। মেঘলা দিনের মধুর আমেজে স্বপ্ন দেখছে অরণ্য।
মানুষের স্বপ্ন চোখে ভাসে; অরণ্যের স্বপ্ন তার ছায়ায় দোল খায়, সবুজ পাতায়
ভেসে বেড়ায়। চোখ চাই দেখবার জন্তে, হৃদয় চাই ভরে তোলবার জন্তে।

নতুন রাজধানীর পথ দেখতে দেখতে পুরোনো রাজধানীতে মিশে যাচ্ছে।
আমেরী প্রবেশদ্বার ধরে পৌছব পুরোনো রাজধানীর বুকে। স্থির গাঙ্গীর্ষে

অবিচলিত পাষাণ প্রাচীর পাহাড়ের কাঁধে বসে আকাশে হাত বাড়িয়েছে। প্রাসাদের অগণিত শিখর আবার প্রাচীরের নাগালও ছাড়িয়ে গেছে। কোথায় রাজা মানসিংহ! কিন্তু কে বলবে তিনি নেই! তাঁর অশ্ব-সুরধ্বনি, তাঁর ঘোষণা, তাঁর আহ্বান শতাব্দীর পার থেকে এ পাষাণ প্রাচীরে আজো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ষোড়শ শতাব্দীর আরাবলি বোধ হয় আরো সুন্দর ছিল। মানসিংহের কাছে দুর্গম সৌন্দর্যের এই কোণটুকু ছিল পরম শান্তির। মোঘল আক্রমণের ভয় ছিল না আমেরের জীবনে। পিতামহ বিহারীমল আকবরকে রাজপুত-কন্যা দিয়ে মিত্রতা পাকা করেছিলেন বটে, তবু অনেক যুদ্ধ লড়েছেন মানসিংহ।

তারই পরিকল্পনা ছিল বিশেষ করে এই আমের রাজ্য ঘিরে। এসেছিল বহু কারিগর আরাবলির কঠিন পাথর স্তরে স্তরে কেটে সাজিয়ে দিতে। আমের প্রাসাদের কঠিন স্থূলতা ও নিরবিচ্ছিন্ন গাভীর্ষই বড় কথা। কারুকার্যের প্রচার নেই, আছে শুধু স্থানিচিত আশ্রয়ের নির্ভরতা। আমের নগরীর চোখে আছে সান্দ্রতা। নিঃস্রাবীপ রজনীতে অন্ধকার আকাশের নীচে মনকে ভাসিয়ে দেবার মত মুহূর্ত যে সেদিন অজস্র ছিল না মানসিংহের প্রাসাদ তারই সাক্ষ্য দেয়।

বীর মানসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে নাম কিনেছিলেন। শান্তির নিকুঞ্জ সাজবার সরঞ্জামেরও কিছু অভাব ছিল না। তবু কেমন এক অদ্ভুত সংঘমে আমের প্রাসাদে মানসিংহ মহল দাঁড়িয়ে আছে। এক এক সময়—সংঘমকে শূন্যতা বলেও ভুল হয়।

অবশ্য মানসিংহের দ্বাদশ মহিষীর মহলও আছে। এতগুলি মহিষীর তাৎপর্য বুঝি না। মনের হাসি মুখে চাপি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি দ্বাদশ মহিষীর পাথরের ঘর, উঠান, স্নানকুণ্ড। প্রত্যেকের ঘরের সামনে উঠানের পাশে আছে তিনটি করে উল্লন। সে ঘর, সে উঠান আজ চৌকিদারদের ঘর উঠানের সমান মনে হবে। কিন্তু এদের মধ্যে আছে প্রাণ, আছে সামন্ত-যুগীয় রোমান্স। এই আট হাতের উঠানেই সেদিন রাজপুত সুলদরীদের জীবনে আসতো বসন্ত, এই ছ'হাতের ঘরেই ডানা ছড়াতো সমস্ত স্ব্থ-দুঃখ।

আমের প্রাসাদ পাহাড়ের বৃকে ছবির মতো সাজানো। মাওটা হ্রদের কোলে দিন রাত ঢুলছে এ পাহাড়। মাওটার অর্থ হোল শীতের বরষা। প্রত্যয়ন বায়ুর জলে এ হ্রদ ভরে ওঠে বলে লোকে এর নাম দিয়েছে 'মাওটা'। হ্রদের উপর জলবিহারের ব্যবস্থা আছে। সরকারী আয়োজন ছাড়াও রয়েছে

বেশরকারী স্ট্রীমলঞ্চ। দূর থেকে চোখে পড়ে মাওটার বৃক্ এক উদ্ভানের ধ্বংসাবশেষ। কংকালের মত বেরিয়ে আছে অসংখ্য ইটের পাঁজর। খোঁজ করে জানতে পারি—একদিন এখানে নাকি থাকতো কেশরের (জাকারাগ) বাহার।

আমের প্রাসাদে চোকবার মুখেই দিলারাম বাগ।—প্রাসাদ গড়া শেষ হোল, মাল-মসলাও কিছু বাঁচলো। এবার শিল্পী দিলারাম শুরু করলে বিনা মজুরীর কাজ।...গড়ে উঠল দিলারাম বাগ।

শুন খুশী হই। পূরণজীকে বলি—‘শিল্পী তখন যে ব্যবসাদার হয়নি! এখন তো শিল্পী নেই, আছে কন্ট্রাক্টর!’

খাওয়া আর শোওয়া নিয়েই যে বর্তমান সভ্যতা বেশী ব্যস্ত। আজ সবটাই কেমন যেন ওজনে মেপে নেওয়া হয়। হিসাবের বাইরে কেউ যাবে না। যে যতটুকু পাবে সেই হিসাবে সে দিতে রাজী। দেওয়ার মধ্যে নেওয়ার স্বার্থই বড়। আন্তরিকতার আজ একান্ত অভাব। সেদিন মাল্লব ভাবতো অল্প কথা—‘কুতে রণন্তে!’ কর্মের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে নিতেই মাল্লব এগিয়ে আসতো। শুধু এক দিলারাম কেন—অনেক দিলারামেরই সন্ধান পেয়েছি এই রূপময় ভারতে।

দিলারাম বাগের ভেতরে রয়েছে আমের প্রাসাদের সংগ্রহশালা। শঙ্করাচার্যের সময়কার মন্দিরচূড়ার ভগ্নাবশেষ দেখে মনে হয়—কোনারক মন্দিরের স্থাপত্যের সঙ্গে এর কোথায় যেন মিল রয়ে গেছে। তিনশো পঁয়ত্রিশ এবং ছুঁশো চুরাশী বছর আগেকার ছুটি পাথরের যুপকাঠের দিকে ইঙ্গিত করেন পূরণজী—‘বরনালা গ্রামে পাওয়া গেছে। ব্রাহ্মী-লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় টানা টানা কয়েক ছত্র লেখা। বহু চেষ্টা করি পড়তে; সম্ভব হয় না। অল্প কারো সাহায্যও পেলাম না। আমাদের দেশের সংগ্রহশালায় এই এক অব্যবস্থা। দূর দূরান্তর থেকে মাল্লব আসে দেখতে জানতে। সাধারণ বুদ্ধির সাধারণ লোক তারা। বুঝিয়ে দেবার মত লোক না থাকলে সংগ্রহশালার কোন অর্থই হয় না। শাইলেন্ট পিকচারের সাজ-পোশাক আর অঙ্গ-ভঙ্গী দেখে ফেরার মত ব্যাপারটা দাঁড়ায়। কেউকেটা না হলে কিউরেটররাও চোখ তোলেন না।

সম্বর হ্রদ খুঁড়ে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর কিছু পাথর-মূর্তি, আড়াই হাজার বছরের পুরানো মাটি ও পাথরের কাজ, গুপ্ত যুগের মাটির পুতুল, পোড়ামাটির বলদটানা রথ, য়ুনানী মূর্তা, অলঙ্কার এবং ধাতুশিল্পের ছোটখাটো বহু সংগ্রহ দিয়ে একে সাজানো হয়েছে।

ভগবতী দেবী এবার আমাদের সঙ্গে ছাড়লেন। পাথরের দেওয়াল তিনি সহ করতে পারেন না। পাহাড়ী পথ সামনে। সোপান-শ্রেণী ঘুরে ঘুরে কখনো বা সোজাসুজি উপরে ওঠে গেছে। পাহাড়ী গাঁচের ছায়া আছে, মাথায়, পাশে আছে সঙ্গিনী! মনের আনন্দকে হারাবার কোন সম্ভাবনা নেই আজ। দেখতে দেখতে শিলাদেবীর মন্দিরে পৌঁছে যাই।

ভক্তের ভগবান আর ঐশ্বর্যের দেব-দেবীর মধ্যে অনেক অন্তর। ভাস্কর্য মন্দিরে বটের ছায়ায়—সামান্য ফুলজলে ভক্তের ভগবানকে দেখেছি শান্তিতে থাকতে। ঐশ্বর্যের দেব-দেবীর চোখে ঘুম নেই, একটানা পূজা-আড়ম্বরে ক্লান্ত তিনি। শিলাদেবীরও সেই অবস্থা। তিনি যে রাজবংশের দেবী। এ যেন বন্দীশালা।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার রূপে দিয়ে মোড়া। শক্তিময়ীর বহুরূপ, নানা মহিমা খোদাই হয়েছে দুয়ারে জানলায়। মাথা নত করে ভেতরে যাই। খেতপাথরের মন্দিরে ফুলপাতা ও জালির কাজের ছড়াছড়ি। মন্দির খেতপাথরের কিন্তু দেবীমূর্তির পাথর কালো। তখন ছিল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ। কেদার রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে পূর্ব বাংলা থেকে মানসিংহ আমেরে ফিরলেন শিলাদেবীকে নিয়ে। সেই থেকে হয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠা।

লোকে বলে বীর মানসিংহ প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে করেছিলেন শক্তিপূজা, চেয়েছিলেন জয়। তাই দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফেরার পথে দেবীকে ফেলে আসতে পারেননি। আবার এ কথাও শোনা যায় পরাজিত কেদার রায় মৈত্র প্রত্যাশা করে মানসিংহকে দিয়েছিলেন—মেয়ে এবং শিলাদেবী। জানিনা কোন কাহিনী সঠিক। তবে বুঝি—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দেবী রাজ্যের বহু উত্থান-পতনে মানসিংহ ও তাঁর বংশধরদের জীবনে এক সংশয়বিহীন দৈবী-নির্ভরতা হয়ে বিরাজ করেছেন। কি স্থখে, কি দুঃখে—এই মন্দিরদুয়ারে বুক খালি করে গেছে বহু বীর বহু বীরাসনা। মায়ুষের জীবনে দৈনন্দিন সুখদুঃখের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক আজ নেই বললেই হয়।

অতীতের আড়ম্বর এখনো শিলাদেবীকে ঘিরে আছে। দেবীর চরণামৃতের জল গণ্ডুষ পাততেই পুরোহিত শরাব দিয়ে ভরিয়েছিলেন। প্রথমে বুঝিনি। ভরা গণ্ডুষ জিভে ঠেকাতেই চমকে উঠি। বিষাক্ত নাগকে ফণা নাচাতে দেখলেও হয়তো এতখানি চমক লাগতো। সব চেয়ে বেশী কষ্ট হয় যখন

দেখি বলকান্-জী-বাড়ির কয়েকটি ছেলে চরণামৃতের গুণে চোখ লাল এবং মুখ ভার করে শুয়ে আছে। দোষ দেবীর নয়; দোষ মানুষের। ভক্তি তাই অটুট থাকে, বিতৃষ্ণা জাগে ভক্তের উপর।

মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আগে হোমকুণ্ডের ঘরে ঢুকি। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাই। ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ছুটি চোখে নামে ধারা, দেখতে কিছুই পাই না। হোমকুণ্ডের পাশে কান পেতে থাকি মন্ত্রের জন্ত। কোথায় মন্ত্র?—শুনতে পাই—“দেবী কী চরণে পর কুছ দেদো বেটা! ভলা হোগা!!”

এরপর আর দাঁড়াতে ইচ্ছা করে না। এখুনি যদি বলে ওঠে—‘শতায়ু হোগে!’ তাহলে সঙ্গিনী দিতে বাধ্য করবে। মনের যারা দোসর মেয়েদের সবচেয়ে দুর্বলতা তারাই। তাদের ভালো-মন্দের কথা পেড়ে অনায়াসেই লোকে প্রবঞ্চনা করে মেয়েদের। এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আমি। তীর্থরাজের দেশে থাকি, পাণ্ডাগিরি ভেঙ্ ও ভিক্ষার আর্ট বুঝ না? মনে পড়ে ছোড়দি-মণির কথা। প্রয়াগে স্নানে নিয়ে গেসলাম। ত্রিবেণী তীর্থের পুণ্যবারিতে কত জন্মের পাপ ধুয়ে যায়! দূর-দূরান্তের থেকে ছুটে আসে দলে দলে যাত্রীরা। গ্রাম থেকে শহর থেকে, দেশ থেকে দেশান্তর থেকে আসে মানুষ। কুন্তে আসে শ্রীপঞ্চমীতে, আসে মাঘে, পিতৃপক্ষে আসে। আসার আর অন্ত নেই। কেউ ঝাণ্ডা নিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে স্ত্রী-পুরুষের দল নিয়ে আসে, কেউ বা আসে ট্রাউজার হাওয়াই শার্টে হন হন করে। আবার কেউ আসে মাথা মুড়োতে। পুরুষের কাচা ধরে মালগাড়ীর মত দেহাতী মেয়েরা—গান গাইতে গাইতে চলে তীর্থস্থানে। কলির শ্রেষ্ঠ তীর্থ যে!

বাংলার এক প্রান্ত থেকে যে অক্ষয় সৌভাগ্যের জন্তে ছুটে এসে জলে নামতে না নামতেই কেউ তাঁকে মৃত স্বামীর নামে পাঁচ টাকার দক্ষিণা সমেত দুধ, কেউ সেই হারে ফল, কেউ বা তুলসী, তিল, অন্ন এবং আরো অনেক কিছুর উৎসর্গ করিয়েছিল। জল থেকে যখন তাঁকে টেনে তুললাম তখন সে অক্ষর ধাক্কা প্রায় শ’খানেক। পাণ্ডাদের ধমকে ফেরাতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলাম—‘আমার মৃতস্বামী পুত্র বাপ মার নামে একগলা গঙ্গাজলে ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম,—আর তুই তাদের ফিরিয়ে দিবি? তাঁদের অকল্যাণ হবে না?’

—বঁচে থাকলেই মানুষের সব কল্যাণ-অকল্যাণ!

—মানুষের আত্মা বলে তোরা কিছু মানিস না বুঝি?

স্ত্রী-চরিত্রের এই অনস্বীকার্য সত্য তাদের মহিমায়ী করবে কিন্তু আমাদের যে জানিয়ে-শুনিয়ে ঠকায়। হোমবুও থেকে তাই পালিয়ে বাঁচি।

এবার লক্ষ্য প্রাসাদ।

ভেতরে যাবার রোকটোক নেই মাছুষের। বিপদ হল ক্যামেরা নিয়ে। সখ মেটাতে জরিমানা দিতেই হবে। লেখকের জন্তে ক্যামেরা অবশ্য সখের নয়—প্রয়োজনও বটে। জরিমানা দিয়ে মুসীখানার মধ্যে ঢুকি। লাল পাথরের বিরাট মুসীখানা। সামনে তার শুভ্র প্রাসাদ। আরো শুভ্র খেত-পাথরের প্রশস্ত সোপান। রাজরক্ষী নেই,—চৌকীদার বসেছিল; উঠে পিতল মোড়া ভারী ভারী ছুথানি কপাট খুলে দেয়। ভেতরে ঢুকব কি, বাইরের দেওয়াল-জোড়া মোগলাই আধার, শ্রাব পাত্র, ইরাণী-শৈলীর ফুলপাতার জরীপ করতে থাকি। পুরানো পার্শিয়ান ও রাজপুত শৈলী মিলে-মিশে প্রবেশপথেই ইলুজাল ছড়িয়ে রেখেছে।

এ প্রাসাদ তিন পুরুষের। মানসিংহ গড়েছিলেন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে, জয়সিংহ সাজালেন শান্তির দিনে। জয়সিংহের গড়া অংশে শুধু বিলাসের তন্ত্রা, প্রাসাদের দৃষ্টি যেন সুখস্বপ্নে অর্ধনিমিলিত।

প্রাসাদ উতানে আগে ফুটে থাকতো আনার ফুল, হয়ে পড়তো আনার শাখা ফলভারে। আজ কিছুই নেই। আমরা কেশর আনার একটাও এখন চিনি না। ওদের দিয়ে দিয়েছি কাশ্মীরকে। প্রাসাদ-রক্ষক ইসমাইল মির্জা আগেভাগেই সব কেটে-কুটে মাঠ করে রেখে গেছেন। এ যেন সুন্দরের সমাধি! .

তবু কিছু আছে, অনেক আছে। ঘুরে ঘুরে আশা মেটে না, বৃকে চোখে পিপাসা থেকেই যায়। মোহ ছড়ায় স্বপ্নপুরী। বুঝতে পারি আজকের যুগে ঘরে মন টেকে না কেন। আমাদের ঘর বলতে সাদা দেওয়াল...শূন্যতা। কিন্তু এখানে?—শুধু স্বপ্ন! সোনা রঙ, সবুজ, আর মেটে লালের কি অপূর্ব সমারোহ! দেওয়ালভরা অসংখ্য ছবি। সাদা পাথরের সঙ্গে কালো পাথরের কোলাকুলিতে ফুটে উঠছে কত রূপ! দেওয়ান-ই-খাস ও শিম-মহলের দেওয়ালে ফুটেছে ফুল। খেলা করে বেড়াচ্ছে সাদা পাথরে খোদাই করা বিরাট পাথরে প্রজাপতি। কি রেখা! কি বর্গচ্ছটা! কি ভাবভঙ্গী! মুগ্ধ চোখ ফিরতে চায় না। কোথায় গেল আমাদের এই সব কারিগর?

শিমমহল এ প্রাসাদের প্রাণ। শিমমহলই এ প্রাসাদের স্বপ্ন। শিমমহলকেই বলব এক জীবন্ত কবিতা। ছবি আঁকার বহু সাধন বহু

উপাদানই তো আজ দেখা যায়! টাইপরাইটার দিয়েও লোকে ছবি আঁকছে শুনেছি। কিন্তু ছোট লাল-হলুদ নীল-সবুজ ও সোনালী কাঁচ দিয়ে কৃষ্ণাধার যে ছবি শিসমহলের দেওয়ালে আঁকা রয়েছে তার তুলনা মেলা তার।

কালের প্রহার-চিহ্ন এদিক-ওদিক ছড়ানো। রং হয়েছে ফিকে। পড়েছে ধুলো। কোথায় রাজা জয়সিংহ, কোথায় সেই আমের! মাহুকের বৃক্কের স্বপ্ন এমনি করেই তার চিতার আগুনে ছাই হয়ে যায়। যোগ্য উত্তরাধিকারী খুঁজে পায় না। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, দর্শকদের অবিবেচনায় শিসমহলের বহু কাঁচের অবস্থা সঙ্গীন। রাজা-রানীর অন্তঃপুরে এ হঠকারিতা সহিবে কেন!

প্রমোদ-কক্ষের সেই বিরাট গোলাধ ছাদে আজও শত শত নক্ষত্রের চমক। হাজারো আয়নায় দেখি সঙ্গিনী হাসছে; বুঝতে পারি দৃষ্টিতেই যাচাই হ'তো শিসমহলের মূল্য। বা পাশের ঘর ছিল মহিবীর, ডান দিকের ঘর ছিল মহারাজের। কামনার নিরঙ্ক প্রহর জুড়ে জলতো ছুটি শিখা...অথচ একটি দীপ।

দীপালোকের মত কোমল উষ্ণতায় ভরা থাকতো সেই ভালবাসার জগৎ। বুদ্ধির চমৎকারিত্বে বাইরের কোলাহলে গলা ডুবিয়ে ভিড়ে ভাসতে চায়নি ভালোবাসা। হৃদয় দিয়ে সমর্পণের আনন্দে আপনাকে ভাসিয়ে দেবার শক্তি আজ যেন ভালোবাসার নেই। চকিত চেতনা তাই তাকিয়ে দেখে। আটকোনা ঘরগুলির দেওয়ালে দেওয়ালে রঙীন কাঁচের উপর সাদা চকমাটির কাজ মনকে হঠাৎ কেন জানিনা উদাস করে দেয়।

প্রাসাদের পূর্ব অলিন্দ থেকে উকি দেয় পুরানো শহর। পুরুষদের জন্ম ঝিমিয়ে-আসা এক উত্তানের নক্সা হৃদের কোলে। চারিপাশে আরাবলির চেটে-খেলানো চূড়া, আকবর যুগীয়-মসজিদ... সব যেন ছবি!

—শরৎ পূর্ণিমার সে রাত আর আমেরের জীবনে নেই সোমজী! যে রাতের প্রতীক্ষায় কত প্রাণ পাগল হয়ে যেতো। পূর্ণ চাঁদের আলোয়...খোলা আকাশের নীচে বসতো এইখানে এক বিরাট দরবার।" পূরণজী কথা খামিয়ে সংকেত করেন। "ওই দেখুন, ওই চণ্ডা পাষণবেদী...ওখানে বসতো দরবার আসর। আজ এ বেদী শূন্য নিঃসঙ্গ, নিরাবরণ, নিরাভরণ কিন্তু সেদিন কত মথমল কত কিংখাপ কত ফুলহারে রঙীন হয়ে থাকতো! নর্তকীর পায়ের মুছ কোমল স্পর্শ জড়ানো আছে এ বেদীর বুকে। বহু তাল এখানে

একদিন ক্লান্ত হয়ে গেছে, আনন্দের আত্মরিস্থিতির, বহু শ্বেদবিন্দু এখানে গড়িয়ে পড়েছে।”

বেদীতে হাত রেখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ কেমন যেন পিছিয়ে যাই কয়েক শতাব্দী। কানে ভেসে আসে নৃপুরনিকণ। আজ শরৎ পূর্ণিমার দিন নয়, আজ পূর্ণিচাঁদের আলো নেই তবু স্তন্যতে পাই তোড়ি ও দরবারির উন্মাদ মূর্ছনা। চারিপাশে রয়ে গেছে মস্তণ পাথরের স্তূঠাম ঝিল্লী। প্রাসাদ-সুন্দরীদের দৃষ্টি এই ঝিল্লীর ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়তো দরবার-গৃহে। তাদের রেশমী ওড়নার মদির গন্ধে এলিয়ে যেতো সারা দরবার। আজ তারা ইতিহাস... আজ তারা না-বলা কাহিনী...না-লেখা কাব্য।

অন্দরমহলের পাশ দিয়ে চলেছি; পূর্ণগজী বলেন—“মেয়েদের ইতিহাস অন্দরমহলের রূপ রং বলে যারা প্রমাণ করতে চেয়েছে তাদের কথা যে মিথ্যা—বিশ্বাস করেন সোমজী? এই প্রাসাদ তার সাক্ষ্য দেবে। এই প্রাসাদই বলবে মেয়েরা শুধু আতর জলের স্তগন্ধ নয় রাজকার্যের ধারণাও বটে! এখানে দাঁড়িয়ে রাজমহিষীরা পরামর্শ দিতেন রাজশাসনে।

পাষণ-গবাক্ষের দিকে চোখ ফেরাই।

সঙ্গিনী খুশী হয় পূর্ণগজীর কথায়। প্রেম ও প্রয়োজনে মেয়েরা যে পুরুষের পাশে পাশে চলেছে একথা শুনে সব মেয়েরই খুশী হওয়া উচিত। পুরুষেরা সম্মান দিচ্ছে মেয়েদের; কিন্তু তা নিয়ে মনে মনে মন্ত অভিমান তাদের। উঁচু তলার মানুষ হয়ে নীচু তলার লোককে দরজা খুলে দিয়ে যে আত্মপ্রসাদ সাধারণতঃ লোকে উপভোগ করে থাকে তারই চমক তথাকথিত শিক্ষিতের চোখে-মুখে। আবার এদিকে মেয়েদের মধ্যেও প্রগতির নামে প্রতিযোগিতা এসে যাচ্ছে। সাহচর্য ও সান্নিধ্যের মাধুর্য আড়ালে ফেলছে ‘অপার ডগস্’ ও ‘আওয়ার ডগস্’ স্তলভ সন্দেহ। জানিনা সত্যকার সহযোগী এবং সহধর্মী করে মেয়ে-পুরুষ হতে পারবে!

প্রাসাদ-পরিক্রমা শেষ হয়ে আসছে। সামনেই জয়সিংহের ভোজন-গৃহ। ভোজ্য সামগ্রী নেই, আসন নেই, কিংকরী নেই, স্তগন্ধ বারিও নেই। বারো ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া একখানি ঘর শুধু ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই রাজা-অতিথিদের ভোজনগৃহ। সে ঘরের দেওয়ালে রঙীন নক্সা। লাল কলি, নীল পাপড়ি ও সবুজ পাতার বাহার দেখলে মন ভরে যায়। সাহেবী কায়দার আধা অন্ধকার, স্ত্রিদের দরজা কিছুই নেই; আছে তবু আহারে রুচি আনবার যত পরিবেশ।

জয়সিংহের খাস থানা-কামরা দেখে অবাক হলাম। ছাদ জুড়ে আছে লতাপাতার বাহার, আর দেওয়াল জুড়ে আছে ভারতের তীর্থস্থানগুলির ছবি। মনে হোল তাঁর অগ্নের মালিক তিনি ছিলেন না। দীনছুয়ার অধীশ্বরের কাছ থেকেই আসতো সে অগ্নি; আর নেবার সময় গ্রহীতা ভাবতেন তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে এই তীর্থভূমি ভারতের সেবক বলে। নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলাম। জানিনা—এ উত্তর সত্য না মিথ্যা। মহারাজ জয়সিংহকে তো আজ খুঁজে পাব না! অনেক উত্তর এমনিভাবেই হারিয়ে যায়। অনেক প্রশ্ন এমনি অতৃপ্তিই চিরদিন কঁদে ফেরে।

আমের প্রাসাদের কথা শেষ করবার আগে রাণীদের সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলে নিতে চাই।—রাণীদের হৃদয় ছিল, মাথা ছিল, কিন্তু চরণদুটি ছিল কর্মবিমুখ। ভক্ত পুরুষের পূজা পেতে পেতে বোধ হয় তাঁরা শালগ্রাম শিলা হয়ে এসেছিলেন। না-নড়ালে নড়তে পারতেন না। পায়ে হেঁটে চলবার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল রাজসমৃদ্ধি। এক দালান থেকে আর এক দালান, এক কোণ থেকে আর এক কোণে যেতে হলেও তাঁরা ঠেলা-রথে চড়ে বসতেন। সে রথ এখনো রাখা আছে।

এইজন্তেই বোধ হয় রাজপুরী শত্রু-কবলিত হলে সবচেয়ে আগে ধরা পড়তেন রাণীরা। অবশ্য 'জওহর ব্রত'র কথাও ইতিহাস বলে; আমাদের যুগের মেয়েরা যেদিকে যেভাবে বঞ্চিত হোন না পা দুখানি হারিয়েছেন একথা বলা চলে না। প্রার্থনা করি শিলাদেবীর উদ্দেশ্যে, ভক্ত পুরুষেরা হৃদয়পদ্মের উপহার নিতে নিতে তাঁরা যেন শালগ্রাম শিলা না হয়ে পড়েন।

*

*

*

গিরিধারীর অনন্তা প্রেমিকা মীরা চিতোর থেকে পদব্রজে একদিন বেরিয়েছিলেন বৃন্দাবনের পথে। যাত্রাপথে বিশ্রাম করেছিলেন এই আমের শহরে। আজ সে পবিত্র মূহূর্তের স্মরণ-চিহ্ন হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দর মন্দির।

প্রধান প্রবেশ-পথ পার হতেই সামনে পড়ে স্তম্ভদ্বার। দুটি বিরাট পাথরের হাতী; গলায় জুলছে ঘণ্টা। তাকাই চূড়ার দিকে; মনে পড়ে কানীশ বিশ্বনাথ মন্দিরের কেমন যেন এক সাদৃশ্য রয়েছে। কারিগরের নিপুণ হাতে পাথর পেয়েছে ভাষা। প্রশস্ত প্রাচীরের বৃকে ধরা পড়েছে নানা রেখায়—নানা রূপ। নীচের অংশে হাতী ও বাঘ-মুখ, তার উপর

ঘোড়া। আরো উপরে কত বাদক, কত নর্তকী, রাসলীলায় উজ্জ্বল হয়েছে।
সাদা ও লাল পাথরের এ কারুকার্য শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভব।

মীরামন্দিরের সামনে গড়ুরমন্দির। আকৃতিতে সে মন্দির ছোট কিন্তু
দেওয়ালে গহ্বজ-ও চূড়ায় পাথরে পাথরে খোদাই-করা রূপের কি সমারোহ।
চামর হাতে সেবিকা, রাধাকৃষ্ণ, মা-যশোদা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু,
কমলদলবাসিনী কমলা চোখের সামনে এসে দাঁড়ান। মন্দিরের ছাদ জুড়ে শ্বেত-
পাথরের স্তম্ভতায় বিভিন্ন মূর্তায় দেখা দেন বিষ্ণু ও নারায়ণ। সমস্ত
যাত্রাপথের দুঃখ মন্দিরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মিটে আসে।

আমাদের এ মীরা-মন্দির কিছু আজবের নয়। বহুবার এর সংস্কার
হয়েছে। উৎসাহী সংস্কারকের হাতে ভারত-স্থাপত্যের লাঞ্ছনাও চোখে
পড়ে। মেরামতের সময় স্থানপূরণের জন্তে কিছু নতুন-মূর্তি বসানো হয়েছে।
হঠাৎ চোখে পড়ে দেব-গন্ধর্বের পাশে খোদাই-করা একখানি অতি-পরিচিত
মূখ; তামাক হাতে ঠাকুরদার মত দাঁড়িয়ে আছেন। স্থানে স্থানে এসে
গেছে জৈনমূর্তি। বড় বেমানান মনে হয়। যেখানে যা সাজে না, যেখানে
যা মানায় না, সেখানে তাকে টানলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহতই হয়। এই
সহজ কথাটুকু জীবনের বহু ব্যাপারেই আমরা ভুলে বসি।

মন্দির ছেড়ে মাহুঘের ঘরে পথ ফিরে চলে।

সব দেশে সব শহর ও গ্রামে জীবনযাত্রার এক একটি নিজস্ব ধারা আছে।
তাকে জানবার আগ্রহ নিয়ে পথে পথে ঘুরছি বহুদিন। আজ সেই আগ্রহই
টেনে এনেছে এখানে।

প্রথমে চলি সংগনের। রামনিবাস পার্ক, সংগ্রহালয়, হাসপাতাল,
বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ—সব পিছনে পড়ে থাকে। দৃশ্যপটে জনতা
নেই। ইটপাথরের বোকা হাল্কা হয়। দেখা দেয় মোতির মত মোতিডুংরী
পাহাড়। বর্তমান জয়পুর-রাজের তৃতীয় মহিষী থাকেন এই মোতিডুংরীর
এক কোণে। দূরে গণেশমন্দিরের চূড়া রুষ্টিজলে ধুয়ে জলজ্বল করছে। তারই
কাছে জয়পুর কংগ্রেস অধিবেশনের বাঁধানো বেদী আজো শ্রুতি বুকে নিয়ে
দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মরুভূমির এক টুকরো ছবি মাথা তুলে অবাক করে দেয়।
ধূ ধূ করছে বালুশায়া। তারই পাশে আবার তৈরী হচ্ছে নতুন জনপদ—
নতুন কলোনী—গান্ধীনগর।

পাশ দিয়ে চলে গেছে সংগনের জয়পুর রোড। দেখতে দেখতে দুর্গাপুর
গ্রাম এসে পড়ে। জয়পুর থেকে আট মাইল এগোতেই দেখি সভ্যতা

একেবারে শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। হেনরী কার্টিয়ারের জয়পুর সন্মুখে লেখা কয়েক লাইন মনে আসতেই বুক ঠেলে বিজ্ঞপ আসে। ভেবে পাই না তিনি কি দেখে লিখে বসলেন—“Here you can drive along perfect roads through healthy clean villages where cholera or plague is conspicuous by their absence. The people are well-fed and do not have in their looks that horrible gloom of hopeless misery which is common in the East.”

হায়রে সাহেব, তুমি কোন চোখে দেখেছিলে? কাদের দেখেছিলে? গ্লানি যে দেখছি চোখের চারপাশে গাঢ় হয়ে আছে! কত নোংরা! দারিদ্রের কুংসিত ছুটি বাহু কদর্বভাবে ছড়ানো। তবে, হ্যাঁ স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, রয়েছে টি. বি. স্ত্রানাটোরিয়াম। কিন্তু হাসপাতাল খুললেই কি দেশের স্বাস্থ্য-সমস্তা মিটবে?

দুপাশে ছড়িয়ে আছে উবর অল্পবর মৃত্তিকা। পাথরে পাথরে আজো সে বন্ধা; ব্যর্থ তার অঙ্কুরের স্বপ্ন।

সংগনের ঠিক গ্রাম নয়, আধা মফঃস্বল শহর। হাতে-তৈরী কাগজ চামড়ার কাজের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু খ্যাতিকে যারা বাঁচিয়ে রাখবে সেই কারিগররা বাঁচতে পারছে কই! অপরিচ্ছন্ন ঘর, ভেঙ্গে-আনা স্বাস্থ্য, অল্পমুগ্ধ আহার তাদের বাঁচতে দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। চারিদিকের কর্মব্যস্ত জীবন, আশা ও সাজনার মধ্যে যে কথা বিশ্বাস করতে চাই তাতে বারবার এমন ভাবেই ধাক্কা লাগে। স্বর্গত সর্দার বলভভাই প্যাটেল একটা কথা বলতেন—খাকান পিকান মলতো নথি বাকী বধু সাকছে। অর্থাৎ খাওয়া পরা ছাড়া বাকী সবই ঠিক আছে! দেশের অবস্থা সন্মুখে বলতে গিয়ে এটা ছিল তাঁর দুঃখের পরিহাস।

দেশী কাগজ-তৈরীর কাজ মুসলমানরাই ভালো জানে। সংগনের মুসলমান জনসংখ্যাই মোটামুটি বেশী। কাগজীদের একজন বড় উত্তোক্তা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। আলহবক্স-সাহেবের সঙ্গে যেতে যেতে দেখি—একদিকে মুসলমানী চুড়িদার অন্তদিকে রাজপুত ঘাঘরা ও টিকলীপরা মুখগুলি অসীম কোঁতুহল নিয়ে তাদের অনাহৃত অতিথির দিকে তাকিয়ে আছে।

সংগনের আছে আট হাজারের কাছাকাছি বাসিন্দা। এদের মধ্যে অল্পমান এক হাজার লোকের জীবিকা হোল, কাগজ-তৈরী। দেড় হাজার লোক চামড়ার কাজে, হাজার খানেক কাপড় ছাপাইয়ের কাজে, আর দেড়

হাজার জয়পুর শহর পর্যন্ত ঘরবাড়ী তৈরীর কাজে যাতায়াত করে, আর বাকী মানুষ করে কৃষি। আসল কথায় কুটিরশিল্পের উদ্যোগের একটা জীবন্ত প্রাণকেন্দ্র এই সংগনের।

আল্লহব্বের সঙ্গে ঢুকে পড়ি তার কারখানা-ঘরে। এ কারখানার শ্রমিক তার সমস্ত পরিবার। আট বছরের মেয়েটি পর্যন্ত বাদ পড়েনি। যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কম।

—এক রীম ভালো কাগজে কত টাকা পাও ভাই?

—পঞ্চাশ টাকা!

আবার জিজ্ঞাসা করি,—পরিবারের আয়?

—একশো বিশ! কখনো বেশীও হয়।...কিন্তু মেশিন যে এসে গেছে সংগনরে।

—খুশী নও মেশিন আসায়?

আল্লহব্ব মুখে কিছু বলে না; সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে দেয় যন্ত্রের সামনে। সরকারী সাহায্যে এই মেশিন তারা পেয়েছে।

—এখন আমরা যারা এখানে কাজ করি তাদের কেউ কাগজী বলে না বাবু। এখানে আছে মেশিনম্যান, ফিডার কুলী।

যন্ত্রকে উপলক্ষ্য করে এমন ভাবেই তো শ্রেণী গড়ে ওঠে।

মেশিনম্যান পায় নব্বুই টাকা, ফিডার পায় পয়তাল্লিশ টাকা, আর কুলিকে দিতে হয় দৈনিক পাঁচসিকে।

আল্লহব্ব সরে যেতেই মেশিনম্যান এসে ফিস ফিস করে বলে—‘সরকার ছুটি বলতে আমাদের আছে শুধু রবিবার। কারখানায় কাজ করে তেমন সুবিধা করতে পারছি না। মাসকাবারে ঠিকমত মাইনেটাও পাই না হাতে। পাল্পের অভাবে কারখানার কাজ প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে বর্ষার দিনে পাল্প পাওয়াই কঠিন। দুরবস্থার অন্ত নেই আমাদের। মাইনের জন্তে দু’মাস তিনমাস অপেক্ষা করতে হয়।...আপনারা সরকার আমাদের কথা একটু বলবেন। এমন করে কতদিন আর চলে!’

এই তো কাগজী শ্রমিকের কথা।

মালিকপক্ষের কথা হোল যন্ত্র এনে বিপদে পড়েছি। আগে লোকের তুলনায় কাজ ছিল বেশী। সব সময় কাজের জন্তে থাকতো ব্যস্ততা। ষাট হাজার টাকা সরকার দিচ্ছে শুনে হাত পেতেছিলাম বড় লোভে। আজ সেই লোভ এনেছে অশান্তি।

বুঝতে পারছি এ অশান্তি তাদের জীবনে এসেছে ক্লান্তি, এনেছে বিবর্গ
বিবাদ। অপর অশান্ত সমুদ্র তারা খড়কুটোর মত ভাসছে। জীবনের গভীর
অন্ধকার থেকে যে স্বপ্নাস্কুর এদের মাথা তুলতে চেয়েছিল তা আজ কেবল
জেগে ওঠার বেদনা।

চরমোত্তোগের বস্তীতে পা রাখতেই বুকখানা কঁপে ওঠে। বাপু হরিজনদের
কোল দিয়েছিলেন, বৃকে টেনে নিয়েছিলেন। সে বৃকে গুলির নিশানা সেধেছে
তারই প্রাণের চেয়ে প্রিয় দেশবাসী। আততায়ীর গুলি এদের জীবনের
ভবিষ্যৎকেও শূন্য করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত চর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে
পথের উপর বসেছে আসল কারিগর। ভেতরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কানপুর
থেকে আসা চামড়া সাজানো হাল ফ্যাশানের জুতো তৈরী হচ্ছে।

চামড়ার কাজ হচ্ছে অথচ ট্যানারী নেই। পঁচাশী টাকা মাইনে দিয়ে রাখা
হয়েছে কারিগর, শিক্ষক ; শিক্ষানবীশ ছাত্ররাও মাসিক পনেরো টাকা ভাতা
পাচ্ছে। এক বছর কাজ শেখার পর শিক্ষার্থীরা ছড়িয়ে পড়বে শহরে শহরে
নতুন নতুন চর্ম প্রতিষ্ঠানে। অনেকে নিজেই দোকান খুলে বসবে। একদিকে
এ ভালোই। শুধু কেরানী আর সরকারী অফিসর, শিক্ষক আর উকিল নিয়ে
দেশ বাঁচতে পারে না। যারা শতকরা তিরিশ নম্বর পেয়ে পাস করলে তারা
তো সত্তর ভাগ ব্যর্থতা নিয়ে ফিরেছে জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে। তাদের শিক্ষ-
কতায় এনে লাভ কি ? তারা কারিগর হলে দেশের উন্নতিই হবে বুঝি।
আদালতগুলির দিকে তাকালেই চোখে পড়ে যত মক্কেল তার দশগুণ উকিল।
একজনকে দেখে দশজন শকুনির মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিথ্যাকে কূটতর্কে
সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্তু সবাই বুদ্ধিতে শান দিচ্ছে। এই শ্রেণীর
জীব নিয়ে পৃথিবীর কোন্ কল্যাণ হবে ? তার চেয়ে সং কারিগর অনেক
ভালো।

কিন্তু মৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ এবং ট্যানারীর কাজে দৃষ্টি না দিলে পথের
উপর বসে থাকা এই সব খানদানী কারিগরদের আজকের উপযোগী শিক্ষা না
দিলে কারিগরীরও যে কোন ভবিষ্যৎ দেখছি না। ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে
আসি। চোখ খুলে তাকাতে ইচ্ছা করে না। চারিদিকেই নজরে পড়ে সেই
পরিচিত হুঃস্থ মানবাত্মা ; হিন্দুস্থানের পথে পথে শীর্ণ ক্লান্ত শিশুর রূপ ধরে যারা
দাঁড়িয়ে আছে, পোড়ো মাঠ, নালায় ও ভাঙ্গা কুটিরে যে খেলায় ব্যস্ত।
পাশেই রাধানাথজীর মন্দির। দেবতার সঙ্গে মনে মনে ঝগড়া করি—তুমি
কি কেবল রাধারই নাথ ? এদের কি কেউ নও ?

(ক্রমশঃ)

ভাষার প্রশ্ন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

নির্মল বসু

ভারতে ভাষার সমস্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রের সরকারী ভাষারূপে দেবনাগরী হরফে হিন্দীকে গ্রহণ করার পর থেকে এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক চলেছে। ভাষার উৎকর্ষ, শিক্ষার মান, আন্তর্জাতিক সুবিধা ছাড়াও জাতীয় সংহতি ও সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে হিন্দীর প্রবল বিরোধিতার ফলে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজন হয়েছে, এবং ১৯৬৫ সালের পরেও যে ইংরেজী বেশ কিছুকাল হিন্দীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষারূপে অবস্থান করবে এ সম্পর্কে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। আসাম দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে রাজ্য-ভাষার প্রশ্নটিও আলোচিত হয়েছে। সমস্যাটি আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ভাষা-সমস্যার আলোচনা হয়েছে: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (federal government) পটভূমিকায় ভাষা-সমস্যার বিচার। যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যা অবশ্যই ঐক্যের সমস্যা—কেন্দ্র ও অঙ্গ-রাজ্যের সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা। তাই জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে ভাষা-সমস্যার আলোচনার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য আছে। তথাপি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। বিশেষ করে যখন প্রায়ই ভাষা-প্রসঙ্গে অগ্নাগ্ন কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ক্যানাডা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও ভাষা-সমস্যার ওপর দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থার শতবার্ষিকী অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নরেশচন্দ্র রায় তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ “Federation and Linguistic States”-এ (ফার্মা কে, এন, মুখোপাধ্যায় কলিকাতা—১২ প্রকাশিত)।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নানাদিকে। সাধারণতঃ বিভিন্ন ভাষা, বংশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের নানা লোক-অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। পৃথক সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে নষ্ট না করে এদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ও পারস্পরিক মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখাই হল যুক্তরাষ্ট্রের কাজ। আর এ কাজে ভাষার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুভাষী

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা কি হবে? অঞ্চলের (রাজ্যের) সঙ্গে কেন্দ্রের কাজকর্ম কোন ভাষায় চলবে? এক রাজ্যের সঙ্গে অপর রাজ্যের পারস্পরিক কাজকর্ম কোন ভাষায় হবে? কেন্দ্রের ভাষা কোন একটি রাজ্যের অধিকাংশের পক্ষে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য না হলে কি করা হবে? কোন রাজ্যে একাধিক ভাষাভাষীর লোক বাস করলে সেখানে কোন ভাষাকে রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করা হবে? এ সব প্রশ্নের স্ব্ঠু মীমাংসার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শাসনের সফলতা যথা রাজ্যসংঘ (Union of States) রূপী যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি নির্ভর করে। তা ছাড়া পরোক্ষভাবেও ভাষার প্রশ্ন এসে পড়ে। এক অঞ্চল অপর অঞ্চলের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর হলে অনগ্রসর অঞ্চলের বিক্ষোভ ভাষাকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়। আসামে “মাটি করে” গ্রন্থে অর্থনৈতিক সমস্তা থেকে ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের হিন্দী-বিরোধিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থনৈতিক অবিচারের ধারণা থেকে।

বিশ্বের প্রথম যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাষার সমস্তা বিশেষ দেখা দেয় নি। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক এখানে এলেও সকলেই ইংরেজীকে গ্রহণ করে নিয়েছে, ইংরেজী-ভাষী মার্কিন সমাজের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে। ক্যানাডায় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সময় এ সমস্তা দেখা দিয়েছিল। ফরাসী-ভাষী প্রধান কুইবেকের অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজীর পাশা-পাশি ফরাসী ভাষাকেও ক্যানাডার সরকারী ভাষা করা হয়েছে। সুইজার-ল্যান্ডের অধিবাসীদের শতকরা ৭১ ভাগ জার্মান ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র জার্মান ভাষাকে সরকারী ভাষা করা হয় নি—শতকরা ২১ ভাগ অধিবাসীর ভাষা ফরাসী ও শতকরা ৬ ভাগ অধিবাসীর ভাষা ইতালীয়কেও সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে—তিনটি ভাষারই মর্যাদা সমান। সোভিয়েট ইউনিয়নে রাশিয়ান ভাষা কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হলেও সব আঞ্চলিক ভাষাতেই সরকারের কাজ চলে।

ভারত এক জাতি কিনা, এ নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও আবহমান কাল থেকে ভারতের ঐক্যবোধের ধারণা চলে আসছে। ইংরেজ শাসনে এ ঐক্য দৃঢ় হয়েছে, এবং এক-জাতীয়তার ধারণা স্পষ্টতা লাভ করেছে। মুসলীম সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তান স্ব্ঠি সত্ত্বেও ভারত এক, এবং ভাষা, ধর্ম, বংশ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী এক জাতির অন্তর্ভুক্ত, এই বোধ ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বাধীনতার পর এই ঐক্যবোধ আরও দৃঢ় হবার

কথা, অথচ ঐক্য নষ্ট হচ্ছে এবং সর্বত্র বিভেদের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ কি? ডঃ নরেশচন্দ্র রায় তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন : (১) যুক্তরাষ্ট্র গঠনে ভ্রান্ত নীতি; (২) ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন; (৩) সরকারী ভাষা নীতি।

যুক্তরাষ্ট্র রূপে ভারতকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোথায় ত্রুটি হয়েছে, সে আলোচনা না করে ভাবার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের কথাই বর্তমান নিবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। ডঃ রায়ের সুস্পষ্ট অভিমত, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত ভুল ও অবिवেচনা-প্রসূত হয়েছে। এক ভাষাভাষী লোক নিয়ে একটি প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন করলে সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়, ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিচ্ছিন্নকরণের প্রবৃত্তি জাগে, এবং সংখ্যালঘু-ভাষীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। যুক্তি নয়, জনমতের চাপে সরকার ভাষাভিত্তিক রাজ্য-গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। অবশ্যই এই বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। একভাষী রাজ্য গড়ে তুললেই বিভেদের প্রবণতা বাড়বে, ইতিহাস কিন্তু একথা প্রমাণ করে না। বরং অন্ধ-গঠনের পর অন্ধ-মাত্রাজের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে; মারাঠি-গুজরাতির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে যে এ নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, এই নীতির সূচু প্রয়োগে সরকারের ব্যর্থতাই তার জন্ত দায়ী। সর্বত্র ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতি স্বীকার করা হল। অথচ মহারাষ্ট্র-গুজরাটের ক্ষেত্রে তা মানা হবে না—সেরাইকেলা-খরসোয়ান ও ডিয়াভাষী হওয়া সত্ত্বেও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না, বিশেষ বিশেষ স্বার্থের প্রভাবে এইরূপ সিদ্ধান্ত থেকেই উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। না হলে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন ও সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা (যা ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন না করলেও প্রয়োজন হবে) করলে উপকারই হবে। তবে এ কথা ঠিক, কোন শিল্প স্থাপন বা কোনরূপ প্রশাসনিক কার্যের জন্ত ভাষাগত অঞ্চলের দাবীর অগ্রগণ্যতা বিবেচনা করা উচিত নয়—অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের প্রশ্নই একমাত্র বিবেচ্য হওয়া আবশ্যক।

প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা (official language) প্রশ্নে। সংবিধানে হিন্দীকে সরকারী ভাষা রূপে ঘোষণা মারাত্মক ভুল হয়েছে। ভাষাগত উৎকর্ষের প্রক্ষেপে হিন্দী একাধিক ভারতীয় ভাষার নীচে। তা ছাড়া আরও কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে : (১) হিন্দী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের অধিকাংশের ভাষা। অপর অঙ্গ-রাজ্যগুলির ভাষা নয়। কোন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ভাষাকে সমগ্র রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা রূপে গ্রহণ

করলে সমতার নীতি ক্ষুণ্ণ হয়, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যবোধ নষ্ট হয়। (২) যে সব অঞ্চলে (বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে) হিন্দী বোধগম্য নয়, সেখানে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি রাখা সরকার ও জনসাধারণের পক্ষে অস্ববিধাজনক। (৩) হিন্দী সরকারী ভাষা হওয়াতে, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী প্রভৃতিতে হিন্দীভাষীদের স্ববিধা হবে। অ-হিন্দীভাষীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। ফলে কেন্দ্রে হিন্দী-ভাষীদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র, গণতন্ত্র সব কিছুর বিরোধী। ডঃ রায় হিন্দীর পরিবর্তে ইংরেজীকে সরকারী ভাষা করার প্রস্তাব করেছেন। এ প্রস্তাব নতুন নয়। অনেকেই এই কথা বলেছেন। ইংরেজীর পক্ষে যুক্তি বহু আলোচিত, পুনরুল্লেখ না করলেও চলবে। তবে কেবল ইংরেজী হবে না হিন্দী ও ইংরেজী উভয়ে একত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে, এ নিয়ে মতভেদ আছে। ডঃ রায় প্রস্তাব করেছেন, সরকারী কাজে ইংরেজী ব্যবহৃত হবে, (আনুষ্ঠানিক কাজকর্মে ceremonial occasions) হিন্দী ব্যবহার করা হবে। তবে চিরকাল ভারতের সরকারী ভাষা ইংরেজী থাকবে, এ ব্যবস্থা অনেকেই মনঃপুত নয়।

ভাষার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক নয়। একক ভাষা হিসাবে হিন্দী ভারতের অধিকাংশ মানুষের ভাষা। সেদিক থেকে জোর-জুলুম না করলে হিন্দী গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। তবে তার পূর্বে হিন্দী সকল অঞ্চলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই, এবং অগ্রাগ্র ভাষার থেকে শব্দসংগ্রহ করে ভাষাকে পুষ্ট করা চাই। ভাষার বিকাশের জন্ত সময় প্রয়োজন। স্বাভাবিক বিকাশের মধ্য দিয়ে কেবল হিন্দী না হয়ে, একাধিক ভাষাও (ছুই, তিন, চার...) সর্বভারতীয় স্তরে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। আপাততঃ কোনরূপ নীমারেখা না টেনে (ধরা যাক বিশ-পঁচিশ বৎসরের জন্ত) ইংরেজী কেন্দ্রের একমাত্র সরকারী ভাষা হোক; স্প্রীম কোর্ট, পার্লামেন্ট সর্বত্র এর অব্যাহত ব্যবহার থাক। ইতিমধ্যে এক বা একাধিক ভারতীয় ভাষা সর্বভারতীয় ভাষারূপে বিকাশ লাভ করলে তা ইংরেজীর স্থানাভিষিক্ত হবে, অথবা ইংরেজীও অগ্র ভাষার পাশাপাশি থাকবে।

রাজ্যস্তরে সরকারী ভাষার প্রশ্নেও সংবিধানের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুর পক্ষে বিপদের কারণ হয়েছে। রাজ্য আইনসভা নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যে কোন ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করতে পারে। আসামের ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়েছে, বাংলাভাষী ও পার্বত্য অধিবাসীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের মত হওয়া সত্ত্বেও আইনসভার

সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বযোগে কেবলমাত্র অসমীয়াকেই রাজ্যের সরকারী ভাষা করা হয়েছে। প্রতিবাদ, আন্দোলন, প্রাণবলি কোন কিছুই একে প্রতিরোধ করতে পারে নি। ডঃ রায় রাজ্যান্তরেও ইংরেজীকেই সরকারী ভাষা করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারী ভাষা এক হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে প্রশাসনিক ও অগ্রগত কার্যে সুবিধা হবে। শাসনের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করে মাতৃভাষাকেই সরকারের কাজকর্মের ভাষা করার যুক্তি ডঃ রায় গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণ সহজেই শাসনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে; তাছাড়া চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তথা ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন হলে শাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইংরেজী জ্ঞান সকল মানুষেরই হবে। ডঃ রায়ের এ যুক্তিও সর্বলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেন্দ্র ও অগ্র রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইংরেজী, হিন্দী বা অগ্র যে-ভাষাই ব্যবহার করা হোক না কেন, রাজ্যান্তরে মাতৃভাষাতেই সকল সরকারী কাজ হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে শাসনে সাধারণ মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে না—মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের ব্যাপার হয়ে থাকবে, গণতন্ত্র ব্যর্থ হবে। সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে, কোন রাজ্যের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষাকে রাজ্যের অগ্রতম সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে সংবিধানে রাজ্যের প্রতি রাষ্ট্রপতির নির্দেশদানের যে ব্যবস্থা আছে তা কার্যকরী করা শক্ত। সংবিধানে স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষার মাধ্যম ও অগ্রগত কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাষার স্থান নিয়েও ডঃ রায় তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, এবং এ-সবের সঙ্গে ভারতীয় ঐক্যের সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনেই রক্ষা করা সম্ভব। জোর করে এককেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, কিংবা বিভিন্ন রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন হবার সুযোগ দিয়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রগঠন—কোনটিই ষথার্থ পথ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহারের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। ভারতের ভাষা-সমস্যাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করতে হবে।

হিন্দী বা কোন ভাষাকে জোর করে অগ্রের ওপর চাপানো নয়, স্বাভাবিক

বিকাশের গতিতে কেন্দ্রের ভাষা গড়ে উঠবে। একথা ঠিক সুইজারল্যান্ডের মত ক্ষুদ্র দেশ কিংবা এক-দল শাসিত সোভিয়েট ইউনিয়নে যা সম্ভব তা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের পরিবেশ-অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য একটি একান্ত-ভারতীয় ব্যবস্থা ধীরে ধীরে এখানেই গড়ে উঠবে। প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষা ও সংখ্যালঘুর ভাষার স্বার্থ সমানভাবে রক্ষা করতে হবে—কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ এক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। পারস্পরিক বোঝাপড়া যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি; যুক্তরাষ্ট্র আজ “Cooperative federation.” ভাষার প্রয়োগে এই “Cooperative দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

উল্লেখযোগ্য বই

শশিভূষণ দাশগুপ্তের	বিনায়ক সান্তালের	
ব্যান ও বন্তা	৩০০ ॥ রবি-তীর্থ	৪০০ ॥
যোগেশচন্দ্র বাগলের	সতু বত্তির	
বিজোহ ও বৈরিতা	২০০ ॥ সতুবত্তির গল্প	২৫০ ॥
শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের	নলিনী দাশগুপ্তের	
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান	৪০০ ॥ বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা	৩০০ ॥
বৃন্দদেব বসুর	গোপাল হালদারের	
নীলাঞ্জনের খাতা	৪০০ ॥ আড্ডা ২য় মুঃ	২০০ ॥
বিক্রমাদিত্যের	দিলীপ মালাকারের	
মুন্দের ইয়োরোপ	৪০০ ॥ নেপোলিয়নের দেশে	২০০ ॥
নীহাররঞ্জন গুপ্তের	প্রফুল্ল রায়ের	
বিশকুম্ভ ২য় মুঃ	৪০০ ॥ পূর্বপার্বতী ২য় মুঃ	৮৫০ ॥



সাহিত্যের খবর
বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ৩য় ॥
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

মুক্ত করো ভয়

রবীন্দ্রনাথ

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান ।
সঙ্কটের কল্লনাতে হোয়ো না ত্রিয়মাণ ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয় ।
হুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো ।
মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয় ।
ধর্ম যবে শঙ্করবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ ।
মুক্ত করো ভয়, দুঃসহ কীজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয় ॥

উপন্যাসের পুনর্বিচার

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

শ্রাবণ মাসের ‘সাহিত্যের খবর’ পত্রিকায় ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নব মূল্যায়নের চেষ্টা করিয়া একটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার উপন্যাসে জীবনসত্যের অভাব, বাঙালীমূলভ ভাবালুতার আতিশয্য ও বৃহত্তর পটভূমিকায় নর-নারীর শাস্বত জীবনসমস্তুার প্রতি অমনোযোগ প্রভৃতি ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্রের ‘ষোড়শী’-চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনার উদ্ধার করিয়াছেন ও শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে শরৎচন্দ্র জীবনের কবি নহেন, সমাজের কবি। সমালোচক এই আলোচনার ফলস্বরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের মধ্যে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন।

এই আলোচনার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ সম্বন্ধে কিছু দার্শনিক মূলতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। “জীবন একটি অনির্দেশ্য নামহীন আকারহীন চৈতন্যপ্রবাহ।” “জীবন বস্তু নয়, বস্তুর আত্মা। খুব ছোট ছোট জিনিস—একটি গানের রেশ, একটি সবুজ পাতার উপর আলোর নাচন, একটি ক্ষণমুহূর্ত—এই সব চৈতন্যের অণু অনবরত জীবনের চিরপ্রবাহমান স্রোতের উপর ঝরে পড়চে। আর শুধু এই সবের মধ্যে দিয়েই জীবন প্রকাশিত ও প্রবাহিত হয়।” এই সমস্ত দার্শনিক সঙ্কেতময় মন্তব্যের সাহায্যে তিনি মানবসত্তার সমাজবন্ধনাতীত, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সীমাতিসারী এক অতীন্দ্রিয় রূপকল্পনাই ঔপন্যাসিকের নিকট প্রত্যাশা করিয়াছেন। আচরণের বহিঃ-পরিবেশ প্রভাবিত, বস্তুতত্ত্বনির্মিত, চিন্তা কর্ম আচরণের মধ্যে আভাসিত, পারস্পরিক সংঘাতের দ্বারা বিশেষিত যে চরিত্র-পরিচয় আমরা ঔপন্যাসিকের নিকট পাইতে অভ্যস্ত, ডঃ অরুণকুমার তাহাতে তৃপ্ত নহেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে যেমন মানবাত্মার শুভ নিরঞ্জন চৈতন্যস্বরূপ পরিচয়টি মাঝে মাঝে উদ্ঘাটিত হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়া যদি উপন্যাসে আকাজিক হয়, তবে ঔপন্যাসিকের সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। কবি ও

ঔপন্যাসিকের বস্তু উপাদান ও রূপায়ণ প্রণালী পৃথক। কবিজীবনের ধারাবাহিক পরিচয় না দিয়া উহার কয়েকটি ভাস্বর বিন্দুতেই নিজ দৃষ্টি সংহত করেন; ঔপন্যাসিককে প্রাত্যহিক তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করিয়াই অন্তররহস্য উদ্ঘাটন করিতে হয়। কবিসৃষ্ট চরিত্র আমাদের কল্পনা সমর্থনের দ্বারা ইপ্রতিষ্ঠিত; উপন্যাসসৃষ্ট-চরিত্র আমাদের ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতার সমর্থন না পাইলে সার্থকতা বঞ্চিত হয়। মাঝে মাঝে উভয়ের মিলন সম্ভব; কিন্তু উভয়ের সর্বকালীন অভিন্ন প্রত্যাশা করিলে আটের বিচিত্র পদ্ধতি হইতে যে রসবৈচিত্র্য আশ্বাদন করা যায় তাহা দুর্লভ হইয়া পড়ে ও বিভিন্ন কলারূপের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত সীমারেখাটি অস্পষ্ট হয়।

তাহা ছাড়া, অতি আধুনিক যুগে ব্যক্তিত্ব-রহস্তের আসল উৎস লইয়াই আমাদের মৌলিক ধারণা বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। ফ্রয়েডের যৌনবাদতত্ত্ব, ভার্জিনিয়া উল্ফের চেতনাপ্রবাহতত্ত্ব ও জেমস জয়েসের অসংবদ্ধ, বিভিন্ন-স্তরবিগ্নস্ত মানসক্রিয়ার সমকালীন স্ফূরণতত্ত্ব চরিত্র-পরিচিতির মূল ভিত্তিকেই নাড়া দিয়াছে! বিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বদৃষ্টিতে কোন বস্তুই স্বতন্ত্র উপাদান গঠিত অস্তিত্ব নাই, সবই মূলশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ পদার্থ-জগতের স্বরূপ-পরিচয় উহার বস্তুগঠনে নাই, আছে শক্তিক্রিয়ায়। অবশ্য আমাদের ব্যবহারিক ধারণায় এই উপাদানভেদবিলাপী তত্ত্বের প্রভাব এখনও পড়ে নাই। সেইরূপ মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্বচিন্তার ফলে এখন সত্তারহস্তের কেন্দ্রবিন্দুই স্থিরতা হারাইয়াছে। যাহাকে কার্যকারণশৃঙ্খলায় বাঁধিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, যাহার স্বরূপ ক্রম-বিবর্তনের ফলে উপনীত এক স্থির পরিণতিতে নিহিত*বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল বর্তমান মনোবিকলনতত্ত্ব তাহাকে একটি অনির্দেশ্য, সর্ববন্ধনমুক্ত অল্পভূতিপ্রবাহের চলমানতার সহিত একাত্মরূপে নির্দেশ করিতেছে। কোন ব্যক্তিসত্যই নির্দিষ্ট রূপের বন্ধনে ধরা পড়ে না।—ইহা মুহূর্তে মুহূর্তে গতিশীল ও পরিবর্তমান এক অজ্ঞাত ও অসম্পূর্ণ পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অতীত যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকবৃন্দ আমাদের নিকট মান্বষের যে পরিচয় তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহার বৈধতার সম্পর্কেই সন্দেহ জাগিয়াছে। ঔপন্যাসিক তাঁহার আখ্যানের উপর যেখানে যবনিকাক্ষেপ করেন সেখানে তাঁহার পূর্ণচ্ছেদ টানার অধিকার নাই। ডঃ অরুণকুমারের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় “একটি গানের রেশ, একটি সবুজ পাতার উপর আলোর নাচন, একটি ক্ষণমূহূর্ত”—জীবনশ্রোতে ভাসমান চৈতন্যকণিকাগুলিই সত্তাসার রচনা করে। অর্থাৎ এখন উপন্যাস-লেখককে উপনিষদমন্ত্রে দীক্ষিত

হইয়া স্থূল জীবনের অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্য বর্জন করিয়া উহার অন্তরালস্থিত এক সূক্ষ্ম ও ক্ষণে ক্ষণে আভাসিত রহস্য মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইবে। উপন্যাসপাঠকেও দার্শনিক মনোভাবসম্পন্ন হইয়া চরিত্রসৃষ্টির ধারাবাহিকাতর দিকে বীতস্পৃহ হইয়া উহার বিচ্ছিন্ন জ্যোতির্বিন্দুসমূহের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। বস্তুসংস্পর্শের যে শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার উপন্যাস তাহারই মর্মমূলে যে এক নূতন মায়াবাদ অঙ্কুরিত হইবে ইহা কে পূর্বে অনুমান করিতে পারিত।

২

ইহাই যদি উপন্যাসের আদর্শ হয়, তবে খুব কমসংখ্যক উপন্যাসিকই এই দুর্লভ আদর্শের সার্থক অনুবর্তী হইতে পারিয়াছেন। যতদূর মনে হয় তাহাতে বাংলা উপন্যাসিকদের মধ্যে একমাত্র বিতৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই আত্মিক জ্যোতির্ময়তার স্বরূপ অলুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। ইউরোপীয় উপন্যাস সাহিত্যে রোমা রোঁলার জঁ ক্রিষ্টফ, আলডুস হাক্সলের কোন কোন উপন্যাস, কনরাড ও হার্ডির উপন্যাস এই মরমিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু ইহারা বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির চিরাভ্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রিয়াশীলতাকে বাদ দিয়া কেবল ধ্যানলভ্য বোধিবিন্দুকেই জীবনরহস্যের একমাত্র আধার বলিয়া মনে করেন নাই। জীবনে পরম রহস্যের অল্পভূতি কখনও কখনও আসে, কিন্তু ইহা আসে সাধারণ জীবনযাত্রার পথ ধরিয়া, অসাধারণ আবেগময় চিন্তা-আলোড়নের গভীরতা হইতে। রূপকে বাদ দিয়া যদি অরূপের কোন মূল্য থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলার্মোন্দর্যসৃষ্টির জগতে নহে। যে পর্যন্ত দর্শনদীক্ষা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দ নিরূপণ না করে, সে পর্যন্ত অন্ততঃ উপন্যাসে-আমরা অরূপ তত্ত্বকে লাভ করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিবে না। যদি কোন ব্যক্তির জীবনে গানের রেশ ও সবুজ পাতার উপর আলোর নাচন উহার চরম সন্তারহস্ত উদ্ঘাটিত করে, তবে সেই ব্যক্তির জীবনসাধনার পরিপূর্ণ চিত্রের সাহায্যেই এই সত্যজ্যোতনার প্রকিয়াটি আমাদের বোধগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে।

ডঃ অরুণকুমারের উত্তম বেত্রদণ্ডের ত্রায় মানদণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সকল দেশের প্রাচীন ও সন্তো-অতীত উপন্যাসিক গোষ্ঠীর জন্ত দুঃখ জাগে। এই মখিলিখিত স্তম্ভাচার-প্রচারের পূর্বে ষাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল তাঁহাদের পক্ষে অনন্ত নরক বাস ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের শরণচন্দ্রের জন্ত ডঃ অরুণকুমায় নিতান্ত সদয় হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর

ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটি পিছনের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের ইংরাজ ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর—রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্কট, জেন অস্টেন, ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট-এমিলি ও শার্লট—ব্রেটে প্রভৃতি লেখকদের—কি ব্যবস্থা হইবে? ইহারাই ইংরাজী উপন্যাসের ভিত্তিপত্তন ও দূরীকরণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহারাই মানুষকে সমাজ প্রতিবেশে ও ব্যক্তিজীবনের নিভৃত অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়া উহার জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও “একটি গানের রেশ ও একটি সবুজ পাতার উপর আলোর নাচনের” রহস্তোন্মেষদিনী শক্তি সম্বন্ধে দিব্যদৃষ্টি ছিল না। সুতরাং এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে কেবলমাত্র অতীত যুগে জয়গ্রহণ করার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জগৎ দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিতে হইবে।

ডঃ অরুণকুমারের একটা সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করি—তাহা হইল সমস্ত উপন্যাসেরই পুনর্বিচারের প্রয়োজনীয়তা। হয়ত কোন কোন ঔপন্যাসিক অনেকটা যুগকালের সমর্থনে, যুগমানের কোতুহল মিটাইবার জন্ত, বা বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের আকর্ষণে তাঁহাদের ত্রাণ্য প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী জনপ্রিয়তা, এমন কি সমালোচনা-প্রশস্তি অর্জন করিয়াছেন। কেহ কেহ মানব প্রকৃতির গভীরে অবতরণ না করিয়া, কেবল উহার উপরিভাগের বৈচিত্র্য ও আকর্ষক রসাবেদন দেখাইয়াই শ্রেষ্ঠ পদবীতে স্থান পাইয়াছেন। এক এক যুগে পাঠকের মানস-প্রবণতা হয় নৃতনের মোহে না হয় কোন দীর্ঘ-অব্যবহৃত বুদ্ধির চরিতার্থতার জন্ত এক বিশেষ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। যে লেখক যত স্বকোশলে এই প্রবণতাটি ধরিতে পারেন, যুগচিন্তার বিশেষ ভাবানুভার প্রয়োগ দিতে পারেন তিনি ততই সমসাময়িক খ্যাতির অধিকারী হন। কাজেই ভবিষ্যতের অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধি ও জীবনরহস্য উন্মোচনের অশ্রান্ত মানদণ্ডের প্রয়োগে অতীত যুগের খ্যাতিনাম্য স্রষ্টাদের নবমূল্যায়ণ সমালোচনার একটা অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। কিন্তু সঙ্গ সঙ্গ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আমরা জীবন সম্বন্ধে কোন নব-আবিষ্কৃত theoryকেই যেন আমাদের বিচারের মূলমন্ত্র না করিয়া বসি। ঔপন্যাসিকের পক্ষে কোন নতুন জীবনতত্ত্ব জানা বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে কোন বিশিষ্ট সমাজবিদ্যুত ও নীতিনিয়ন্ত্রিত জীবন-কাহিনীর মধ্য হইতেই তিনি উহার গভীরতম তাৎপর্যটি নিষ্কাশিত করিতে পারেন।

প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিনয় ঘোষ-কৃত
বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকরগ্রন্থ
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

(প্রথম খণ্ড—১২'৫০)

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণ তদানীন্তন বাংলা সাময়িকপত্র থেকে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড এবং কবি ইন্ডরচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনাবলী এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল। অতি দুস্তাপ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য পত্রিকা যেটো বাংলার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা সংযোজিত। ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরো ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থ প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্য বৃহৎ রয়েল অস্ট্রাভো সাইজের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বই, আর্টপ্লেট ও বোর্ড-বাঁধাই সমেত নামমাত্র করা হয়েছে।

ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজকর্মী সকলের পাঠযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিজ্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
সচিত্র সংস্করণ ৫'৫০ ॥

[প্রতীচির মহাকাব্যগুলি থেকে চয়িত অল্পম কথাসাহিত্য সংগ্রহ]

AFRICANISM : Rs. 16/-

দেবেশ দাশের	নবগোপাল দাসের		
রাজসী (২য় মুঃ)	৩'০০ ॥ এক অধ্যায় (২য় মুঃ)	৩'০০ ॥	
অশোক মিত্রের	বুদ্ধদেব বহুর		
ভারতের চিত্রকলা	স্বদেশ ও সংস্কৃতি		
৪১টি আর্ট প্লেট সংযোজিত	১৫'০০ ॥	(২য় মুঃ)	৪'০০ ॥
শিবনাথ শাস্ত্রীর	প্রমথনাথ বিনীার		
ইংলণ্ডের ডায়েরী	৪'০০ ॥ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য	৪র্থ মুঃ	৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে পরে আলোচনা করিব এখন শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের সারবত্তা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ডঃ অরুণকুমার বলিয়াছেন যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে “দেশকালাতিক্রমী মহৎ চেতনা নাই।” ইহা সত্য হইলেও ইহাতে তাঁহার ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের দাবী খণ্ডিত হয় না। ইংরাজ মহিলা-ঔপন্যাসিক জেন অষ্টেন দুই ইঞ্চি পরিমিত হস্তিদন্তফলকে মানবের ভাগ্যলিপি উৎকীর্ণ করিয়া অমরতার অধিকারিণী হইয়াছেন। ব্লেক বলিয়াছেন যে যাহার দিব্যদৃষ্টি আছে তিনি একটি বালুকণায় অনন্তের আভাস দেখেন, তাঁহার প্রসারিত মূষ্টিতে অসীমকে ধরিতে পারেন। চেতনার ব্যাপ্তি-বিস্তার একটা মহৎ গুণ সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা ঔপন্যাসিকের পক্ষে অপরিহার্য নহে। তাঁহার পরিধি ব্যাপ্তই হউক, সঙ্কীর্ণই হউক উহার মধ্যে তিনি জীবনের গভীরে অল্পপ্রবেশ করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। নিজের ঘরের ছোট কাহিনী, নিজ সমাজ-পরিবারের বিশেষ সমস্যা এমন করিয়া উপস্থাপিত করা যায় যাহাতে উহাদের সার্বভৌম তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়। Ripeness is all, দার্শনিক প্রজ্ঞাঘন দৃষ্টিতে জীবনের স্তম্ভঃখমিশ্র, পতন-অভ্যুত্থানবন্ধুর কাহিনীর নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ গৌরীশঙ্করের শৃঙ্গে আরোহণের মত দুঃসাধ্যতম সাধনার ব্যাপার। শেক্সপিয়ার, গ্যায়টে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কীটসের দুই একটি কবিতায় এই উত্তম জীবনসমীক্ষার স্পর্শ পাওয়া যায়। সকল জীবনস্রষ্টার ক্ষেত্রে এই দুর্লভ আদর্শ প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ সাহিত্যকেই কীর্তির শিখরচ্যুত করিতে হইবে। মার্লো, শেলী, হুইনবার্গ, মেরেডিথ, ভিক্টর হুগো, এমন কি রবীন্দ্রনাথ (তাঁহার প্রথম বয়সের রচনায়), হার্ডি, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকে যে পরিমাণে জীবনের আবেগময়, অস্থির আদর্শসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন, সে পরিমাণে প্রজ্ঞাভাস্যর স্থির জীবনবোধের পরিচয় দেন নাই। বলিতে কি রহস্তবেষ্টিত মানব জীবনে যোজাও একটা বড় সাধনা; পরম প্রাপ্তি সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু দুর্গম তীর্থযাত্রার মহিমা অল্পভব করাও সামান্য কৃতিত্ব নহে। এই অজুহাতে শরৎচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিলে তিনি অনেক দুর্ভাগ্যসহচরের সাথী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শরৎচন্দ্রের ষোড়শী চরিত্রে ভৈরবী সাধনার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই তাহা ঠিক। তিনি চণ্ডীপীঠকে বাহ্য আবেষ্টনরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, উহার

নিগূঢ় ধর্মপ্রভাবের দিকটা উপেক্ষা করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে ষোড়শীকে ভৈরবীরূপে দেখাইয়া শরৎচন্দ্র তাহার মর্যাদাবোধ, চরিত্রদৃঢ়তা ও অশিক্ষিত গ্রামবাসী সম্পর্কে মাতৃভাবের স্মরণ প্রভৃতি একটা বড় তীর্থ-পরিচালনা উপলক্ষ্যে যে বৈষয়িক গুণের অলুশীলন হয় তাহারই উপর বিশেষ লক্ষ্য দিয়াছেন। ঊনবিংশ শতকের তন্ত্রসাধনা ধর্মভাব স্মরণের বিশেষ সহায়ক ছিল না; ইহা আচার-অলুষ্ঠানের নিম্মাণ ও কপট অহুত্বহিতৈর্ষ্যবসতি হইয়াছিল। ভৈরবী জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় রুচুসাধন—কৌমার্য ব্রতপালন ও বিবাহিতা নারীর পক্ষে স্বামিসঙ্গ-বর্জন—যে কতটা নিষ্ঠার সহিত পালিত হইত তাহা পূর্ণ ভৈরবী মাতঙ্গীর জীবন-ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কেন ষোড়শীকে খাটি ভৈরবীরূপে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য লাগে। ষোড়শীর ধর্মীয় আবেষ্টন তাহার মধ্যে কিছুটা পুরুষোচিত-কর্তৃত্বশক্তি ও স্বামিসঙ্গ-বক্তিতার অবদমিত সংসারসুখকামনা স্মরিত করিয়াছিল মাত্র। ষোড়শীর সহিত জীবানন্দের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার ভৈরবী-জীবন তাহারই একটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। ভৈরবীর বিধিনিষেধ জীবানন্দের প্রতি তাহার আকর্ষণের বিরোধিতা করিয়া দ্বন্দ্বের পরিসর ও তীব্রতা বাড়াইয়াছে। নকল ভৈরবীর বাহিরের খোলসটারও কিছুটা প্রয়োজনীয়তা আছে। শরৎচন্দ্র সেইটুকুকেই কাজে লাগাইয়াছেন। জীবন যে সর্বথা বৃত্তি-অলুসারী হয় না রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। তিনি লাভণ্যকে শিক্ষয়িত্রীরূপে ও যোগমায়াকে তাহার সে-কেলে মাসীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সংলাপে ও আচরণে, বিশেষতঃ লাভণ্যের প্রেমমুগ্ধতায় ও যোগমায়ার প্রণয়-পোষকতায় আমরা কি শিক্ষয়িত্রী বা অভিভাবিকার স্বর শুনিতে পাই? মতির মা অশিক্ষিতা গৃহস্থ-বধু কিন্তু তাহার কথাবার্তায় নাগরিকার তীক্ষ্ণ সপ্রতিভতা ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে। এমন কি হলা মালীও শুধু আগাছা উপড়ায় না, হৃদয়ঙ্গ উদ্ভিদ সম্বন্ধেও সে সচেতন। ইহাদের মধ্যে কাহারও বৃত্তি-উপযোগী চরিত্র নাই। সুতরাং মেকী চালাইবার অভিযোগে একা শরৎচন্দ্রই অপরাধী নহেন, তাঁহার অভিযোক্তাও অভিযোগ সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন না। শরৎচন্দ্রকে বিচার করিতে হইবে শুধু চরিত্র-পরিকল্পনার অবাস্তবতার মানদণ্ডে নয়, তিনি যে উপলক্ষ্য খানিকটা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কতটা সদ্যব্যবহার করিয়াছেন শেষ পর্যন্ত তাহারই

পরিপ্রেক্ষিতে। ভাববিলাস, অতিকথনপ্রবণতা ও সময় সময় হৃদয়-সংঘাতের অপরিমিত বিস্তার প্রভৃতি ক্রটি শরৎ-সাহিত্যে আবিষ্কার করা দুরূহ হইবে না। ইহা বাঙালী চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য ও বাঙালী ঔপন্যাসিকও কতকটা এই জাতীয় প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারেন না। কিন্তু সমস্ত বাদ দিয়া জীবানন্দ ও ষোড়শীর যে দীর্ঘায়িত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজটিল দ্বন্দ্ব তাহা কি মানব হৃদয়রহস্তের এক অজ্ঞাত অধ্যায় উন্মোচিত করে না ?

শরৎচন্দ্রের আসল সমস্যা ছিল বাঙালী সমাজের অনভ্যন্ত প্রতিবেশে প্রণয় সংস্কারের ও পারিবারিক বিরোধের তির্যক গতির উপলক্ষ্য সৃষ্টি। এই অভিনবত্ব প্রবর্তনের জন্ত তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পরিবেশে কৃত্রিমতা ও চরিত্রে প্রথরতার আতিশয্য আনিতে হইয়াছে। ইহারা অতিরঞ্জিত হইয়াছে কিন্তু একেবারে অস্বাভাবিক হয় নাই। বাঙালীর সহজ জীবনছন্দের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে বেমানান নয়। এই প্রয়োজনের জন্তেই তিনি বিশেষভাবে সমাজনিষ্ঠ ও পরিবারনিষ্ঠ ঔপন্যাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত সমাজ ও পরিবারই ব্যক্তি-জীবনের উপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিত। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যাহা কিছু সংগ্রাম তাহা এই দুই একাধারে পোষণ ও নিষ্পেষণকারী সত্তার সহিত। এই অশ্রান্ত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়াই মানবাত্মা নিজ স্বভাব-মহিমায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয় নাই। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিও পরিবার ও সমাজে সদা-সংলগ্ন থাকিয়া ভাবগগনের ঊর্ধ্বলোকে উঠিতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্র সবই বাঙালী, হৃদয়বৃত্তির নূনতম স্বাধীনতালাভের প্রয়াসে সর্বদা বিব্রত, আত্মরক্ষায় সন্তুষ্ট বলিয়া আত্মপ্রসারের উল্লাসের স্পর্শহীন। ইহারা তাই সার্বভৌম মনুষ্যত্বে উন্নীত হয় নাই। ইহাদিকে বাঙালী-জীবন সংস্কৃত করিয়া না দেখাইলে ইহাদের বাস্তবতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ক্ষুণ্ণ হইত। সমাজের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ও সমাজবোধজনিত নীতিসংস্কার এই সমস্ত চরিত্রের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিহত করিয়া এক বেদনাময় পরিস্থিতি, রক্তস্রাবী আত্মযুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজে এই জাতীয় বাধার কোন প্রশ্নই উঠিত না। সমাজ-পীড়নে ক্ষতবিক্ষত বাঙালী মানবাত্মার দোলাবলতা দেখাইতে গিয়া লেখককে অনিবার্য কারণে বাঙালী-সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের প্রতি অত্যধিক জোর দিতে হইয়াছে। গৃহযুদ্ধে পীড়িত আত্মা একবার নিজ সমাজ-প্রতিবেশের দিকে, একবার নিজ অন্তরের প্রেরণার দিকে অনবরত দৃষ্টি দিতে গিয়া সমাজ-চেতনার অতীত সার্বভৌম ভাবলোকের ঊর্ধ্বস্তরে উঠিবার অবসর পায় নাই।

যেখানে সমাজের উদ্ভূত খজা তাহার মাথার উপর পতনোন্মুখ সেখানে “একটি গানের রেশ, একটি সবুজ পাতার উপর আলোর নাচনে” তাহার আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের উপলক্ষ্য স্বভাবতঃই তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজ-প্রবর্তিত শ্রেয়োবোধ তাহার চিন্তকে এমন অভিভূত করিয়াছে যে তাহার নিজের ইচ্ছাই তাহার নিকট অস্পষ্ট-বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মীর আত্মদমন এই অস্থিমজ্জাগত শ্রোয়োসংস্কার হইতেই উৎপন্ন। অতঃপর কোনও সমাজে ঠিক এই ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হইত না। এই চরিত্রগুলি হয়ত যোলানা বাস্তব নয়। থানিকটা theory-পরিকল্পিত। কিন্তু উহাদের অপ্রশমিত সুদীর্ঘকালস্থায়ী মনোবেদনার বাস্তবতা সন্দেহে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সমাজ ও পরিবারসত্তা যেখানে উপন্যাসের ভাবজটিলতা-সৃষ্টির একটা প্রধান উপাদান, সেখানে উহাদের প্রভাব ছোট করিয়া দেখাইলে উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হইবে। সমাজক্লিষ্ট নরনারীর মানস যন্ত্রণা বিশ্বাসযোগ্য করিতে হইলে সমাজের সদাসক্রিয় আততায়ী-রূপটি প্রকটিত না করিয়া উপায় নাই। এই অবস্থা-সঙ্কটই শরৎ-সাহিত্যের একাধারে সহনীয়তা ও সঙ্কীর্ণতার মূল।

৪

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুইজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের—বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের—এই সমাজশ্রয়ী প্রেরণা অতি শীঘ্রই এই আশ্রয়চ্যুত হইয়া উহার ভাবভিত্তি হইতে স্থলিত হইয়াছে। বঙ্কিমের যুগে যে অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও যে ধর্মাশ্রয়ী জীবনচন্দ্র সর্বস্বীকৃত বাস্তব সত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল, অতি অল্প-দিনের মধ্যেই সেই ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মকেন্দ্রিক জীবন বস্তু-অবলম্বন হারাওয়া অবাস্তব কল্পনাবিলাসের পর্যায়ভুক্ত হইল। শৈবুলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্ত, কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা ও রোহিণীর অপঘাত মৃত্যু, প্রফুল্লের নিষ্কামধর্মদীক্ষা, শ্রী ও জয়ন্তীর সন্ন্যাস, সীতারামের পদস্থলন ও নৈতিক পুনর্বাচন—এ সমস্তই পরবর্তী যুগে জীবনবৃত্তচ্যুত হইয়া এক ধর্মবায়ুগ্রস্ত লেখকের খেয়ালসৃষ্ট বস্তুরসহীন কাগজের ফুলের গ্রাফ প্রতিভাত হইল। সন্ন্যাসী-পরমহংস-জাতীয় অতিমানবগণ বাঙলা সমাজ ও পাঠকের মন উভয়ক্ষেত্রে হইতে নির্বাসিত হইয়া নিছক কাল্পনিকতার ধূম্রলোকে আশ্রয় লাভ করিলেন। সার্বভৌম মনস্তত্ত্বের দোহাই পাড়িয়া বাঙালীর বিশিষ্ট মানসিকতাকে অপাংক্তেয় করা হইল। গণিকার প্রতি সহানুভূতি সতীর গ্রাফ অধিকারকে স্থানচ্যুত করিয়া পাঠকদের দরদী চিত্তে

সাময়িক অভিনন্দনধন্যতা অর্জন করিল। ঋষির দিব্যকল্পনা জড়বাদী বস্তুনিষ্ঠ জীবনবোধের দ্বারা ধিকৃত হইল। বহুমুখী নীতিবাগীশ কলাবোধহীন প্রচারকের অখ্যাতি লইয়া জীবনশিল্পীর মহিমা হইতে অপসারিত হইলেন।

শরৎচন্দ্রও সেই যুগপরিবর্তনের অমোঘ বিধানে নিজ গৌরবময় সিংহাসন হইতে ভ্রষ্টপ্রায় হইতে চলিয়াছেন। যে স্ববিশুদ্ধ, কঠোর নিয়মরক্ষিত সমাজ ও পরিবার তাঁহার জীবন-সমস্ত্রাবোধ উদ্দীপনের প্রধান অবলম্বন ছিল, মাত্র পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে তাহারা সংহতি হারািয়া অণু-পরমাণুতে চূর্ণ হইয়াছে। আজ সমাজের সমষ্টিগত সত্তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত; পরিবার নিয়ন্ত্রণও বিধস্তপ্রায়। আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্র্যাটে অধিষ্ঠিত দাম্পত্যজীবন সমাজ ও পরিবারের নীতিশাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এখন এক ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার বাধা আসে অপরের স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধিতায়। কোন সমষ্টিগত ঔচিত্যবোধ আর ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করার স্পর্ধা পোষণ করে না। আজকাল আমরা আত্মকেন্দ্রিক ছোট ছোট বুকে প্রায় পরস্পর-নিঃসম্পর্কভাবে বাস করি। সাম্প্রতিক কালে আমাদের জীবনসমস্ত্রার প্রকৃতি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। কোন দীর্ঘকালপোষিত সংস্কার আমাদের মনোবেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের হেতু হয় না। এখন পূর্বানুসরণের নিরঙ্কুশ প্রস্তুতি, স্বাধীন প্রেমের ভাগ্যবিপর্যয়, অপাত্রতন্তু প্রণয়ের বিড়ম্বনা, অবিশ্বাসী প্রেমের মর্মদাহ—ইহারাই উপন্যাসের উপজীব্য হইয়াছে। এই নূতন প্রণালীর ভাল-মন্দ, উহার মানব চরিত্রের উপর আলোকপাতের সফলতা বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত বিচারের সময় আসে নাই। তবে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবেশ-প্রভাব-বর্জিত, আত্মভাবমগ্ন নর-নারী হয়ত ‘গানের রেশ ও সবুজ পাতার উপর আলোর নাচনের’ সান্নিধ্যিকতায় গভীরতম অন্তর-রহস্য-অনুভূতির বেশী স্বযোগ পাইতেছে। জীবনছন্দের এই অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনে শরৎচন্দ্র অনেকটা প্রাচীনপন্থী ও অতি-আধুনিক যুগমানসের প্রতি স্বল্প-আবেদনশীল হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমাজ যদি হঠাৎ বায়ুস্তরে বিলীন হইয়া যায় তবে সমস্ত যুদ্ধটাই অর্থহীন হইয়া পড়ে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে অনেকটা তাহাই ঘটিতে চলিয়াছে। যে স্রোতোপথ শুষ্কপ্রায় হইয়াছে তাহাতে উচ্ছ্বসিত আবেগের জোয়ার অনেকটা কোঁতুক ও বিস্ময়েরই সৃষ্টি করে। নূতন খাতে আবেগের প্রবাহ দেখিতে দেখিতে মরা গাঙে বন্যার প্লাবনকে আরও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

শরৎচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস হইতেই কালের অগ্রগতি দ্বারা পেছন ফেলা আবেগোচ্ছ্বাসের অসঙ্গতি চোখে পড়ে। তাঁহার ‘পল্লীসমাজে’ গোবিন্দ

গাঙ্গুলি, বেণী ঘোষাল প্রভৃতি পল্লী-ধুরন্ধরগণ হয়ত এখনও বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের অন্তত প্রভাব যে অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ধর্মভীতিমূলক সামাজিক শাস্তি ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল তাহা যুগ পরিবর্তনে ভৌতা হইয়া পড়িয়াছে। অতি-আধুনিক যুগের রমেশ হয়ত পল্লীগ্রামে এত ঘটনা করিয়া পিতৃশ্রদ্ধের আয়োজন করিত না ও এই উপলক্ষ্যে সমাজপতির দল পাকাইবার ও কুৎসা রটনা করিবার অবসর দিত না। একঘরে হইবার আশঙ্কা লোকের সহজ ধর্মবুদ্ধিকে এতটা আচ্ছন্ন করিত না। রমেশ ও রমার মধ্যে যদি ভালবাসার সঞ্চার হইত তবে তাহার কৃত্রিম দমনপ্রয়াস এতটা মর্মবেদনা ও বিষাদকরণ পরিণতির সৃষ্টি করিত না। তারকেশ্বরের বাসাবাড়িতে একদিনের সেবা-যত্ন ও পরিতৃপ্তি উভয়ের নিকটেই ভবিষ্যৎ জীবনের সার্থক ইঙ্গিত বহন করিত। রমাও তাহার তুচ্ছ কুলমর্যাদা ও জমিদারী প্রতিষ্ঠার মোহে বেণীর মত কুচক্রীর হাতে অসহায় ক্রীড়নক হইত না। ‘অরক্ষণীয়া’-য় মেয়ের বিবাহ দিবার যে অসহনীয় দুর্ভোগ তাহার বস্তুরূপটা হয়ত এখনও পুরোমাত্রায় আছে, কিন্তু যে মানস অসহায়তা, চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হওয়ার যে দুঃস্বপ্ন এই লাক্ষনার পাশ্রে বিষজালা মিশাইয়াছে, তাহা এখন অধিকতর প্রতিরোধশক্তিতে বলীয়ান। কোন অতি আধুনিক ঔপন্যাসিক এই বৃত্তি স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতার যুগে কণ্টাদায় সন্ধ্যকে উপন্যাস লিখিবেন না। কেননা কণ্টাদায়ের দায়টাই ক্ষীণ হইয়াছে। অন্ততঃ কোন দুর্ভাগিনী অন্তঃ কণ্টা মাতৃপদাঘাতের চরম লাক্ষনা হইতে যে রক্ষা পাইবে তা স্থনিশ্চিত। একান্নবতী পরিবারের পারস্পরিক আঘাত-সংঘাত, বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন প্রকার স্বার্থদ্বিসম্পন্ন লোকের অনিবার্য মতবিরোধ ও তিক্ততা ঐরূপ বহুকোষবিশিষ্ট সংস্কার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বিশিষ্ট ছন্দটি হারাইয়াছে। মানব প্রকৃতির পরিবর্তন হয় নাই, কিন্তু উহার প্রয়োগক্ষেত্রে সংকীর্ণতর হইয়াছে। পল্লীনারীর ক্ষরধার, ঈর্ষাকুটিল ও বিদ্বেষবিশ্রাসী রসনা এখন অল্পশীলনের অভাবেই খানিকটা কুষ্ঠিত হইয়াছে—রাস্তা বামনীরা আর ততটা উগ্রভাবে প্রকট নহেন। রাসবিহারীর কূটবুদ্ধি ও বিলাসবিহারীর আত্মসন্ত্রস্ততা এখনও পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়, কিন্তু ব্রাহ্ম শাস্ত্রদায়িকতা ও পরমত-অসহিষ্ণুতা আর উহাদের চিত্তবিকারের পটভূমিকা রচনা করে না। ‘পথের দাবী’র অভিমানবুদ্ধ ও মাত্রাতিরিক্তভাবে উচ্ছ্বসিত স্বাদেশিকতা স্বাধীন বাঙলায় যেন বাস্তব বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত না ইহা ঐতিহাসিক রোমান্সের বর্ণাঢ্য অতিকথনের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছে। একমাত্র ‘গৃহদাহ’ ও

‘চরিত্রহীন’ ও ‘শ্রীকান্তে’র কোন কোন অংশ অনেকটা বহিঃপ্রভাবযুক্ত আত্মসমীক্ষার আধুনিকতায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত মনে হয়।

এই যে অবশুজ্ঞাবী পরিবর্তন ইহার জন্ত শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক মর্যাদা কি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? মাহুষের মনের আধার যত দ্রুত বদলায়, মাহুষের মন তত দ্রুত বদলায় না। কাজেই অতীতের সার্থক জীবনচিত্র ভবিষ্যতেও একটি যুগাতিশায়ী তাৎপর্য বহন করিতে পারে। ইন্দ্রনও যে বায়ুপ্রবাহের ফুৎকারে জলিয়া উঠে তাহার পরিবর্তন হইতে পারে। কিন্তু প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার স্বরূপ একই থাকে। আগুন চন্দনকাঠেই জলুক বা সাম্প্রতিক কালের পচা কাঠেই জলুক তাহাতে আগুনের প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য হয় না। এই আগুন উর্ধ্বশিখ বা অধঃশিখ হইতে পারে অথবা সমরেখায় দীপ্তি ছড়াইয়া প্রতিবেশভূমিকে আলোকিত করিতে পারে—তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। অতীত যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সমাজ প্রতিষ্ঠানভূমি আগাগোড়া বদলাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠার হাস পাইয়াছে একরূপ অভিযোগ বড়একটা শোনা যায় না। ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ—ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, ব্রণ্টে-ভগিনীগণ—যে সমাজের আধারে তাঁহাদের মানব চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি পরিবেশন করিয়াছিলেন, সেই আধার ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। ডিকেন্সের ব্যঙ্গাতিরঙ্গন, থ্যাকারের নীতিকথা প্রচার, জর্জ এলিয়টের পাণ্ডিত্যভ্রমর, ব্রণ্টে-ভগিনীদের উদ্ভূত আত্মঘোষণা ইত্যাদি ক্রটির সঙ্গে যুগোপযোগিতার অভাব মিলিত হইয়া তাঁহাদের সমকালীন আবেদনকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ ও সীমাবদ্ধ করিয়াছে। এমন কি টলষ্টয়ের মত যুগাতিশায়ী লেখকেরও রুশদেশের সমাজ-চিত্র আজ স্বপ্নের মত অবাস্তব ও যে সামাজিক পরিস্থিতির আশ্রয়ে তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীর জীবনসমস্তা জুট পাকাইয়াছিল তাহা আর জীবনমূলে রসসিঞ্জন করে না। তথাপি তাঁহার চরিত্রদের জীবনযন্ত্রণা কি আমাদের পক্ষে বাস্তবতা হারাইয়াছে? অরুণকুমার বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে সাময়িকতা ও উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতার অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ইহার কারণ যে তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে সমকালীন-সমাজনিষ্ঠ লেখক নহেন। বঙ্কিমের অতীত যুগের সমাজে রোমান্সের দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া উহার বন্ধ হাওয়াকে সচল রাখিয়াছে। সে সমাজ আর নাই, কিন্তু রোমান্সের চিরনবীনত্ব তাঁহার দিগন্ত প্রসারিত করিয়াছে ও তাঁহার উপন্যাসের সজীবত্ব বিধান করিয়াছে। বঙ্কিমের সূর্যমুখী, ভ্রমর, শৈবলিনী, কুন্দ, রোহিণী, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, অমরনাথ—ইহার সমাজে বাস করিয়াও

সমাজ-বিবিক্ত। ইহাদের প্রাণমূল সমাজমুক্তিকায় দৃঢ় সংস্কৃত নয়। কাজেই সমাজের অবলুপ্তিতেও ইহাদের জীবনাবেগ নিঃশেষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি ও ঔপন্যাসিক দুইই চরিত্রগুলি এক পায়ে সমাজজীবন সংলগ্ন, অন্য পায়ে ভাবলোকের উর্ধ্বাকাশে আরোহণ তৎপর। তাহাদের প্রায় সকলেরই ব্যক্তিমস্তাকে বেঠন করিয়া প্রতীকী সত্তার জ্যোতির্গুণ প্রসারিত। গোরা, সূচরিতা, শচীশ, দামিনী, অমিত রে, লাবণ্য, কুমুদিনী, নিখিলেশ, সন্দীপ, বিমলা আপন আপন প্রাণরহস্তে প্রতিবেশসীমাকে লঙ্ঘন করিয়াছে। আমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণ মানিয়া লই না, আবার সম্পূর্ণ ভুলিতেও পারি না। ইহারা এক সার্বভৌম জগতের ইঙ্গিতে যেমন আমাদের সম্পূর্ণ আপনারও হয় না, তেমন সম্পূর্ণ পুরাতন হয় না। শরৎচন্দ্র সমাজের মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, সেইজন্ত এই মাটি শিথিল হইলে তাঁহার মুষ্টিও অনেকটা শিথিল হইয়াছে। কিন্তু যে সমালোচক মনে করেন যে ইহারই জন্ত তিনি বাতিল হইয়া গিয়াছেন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রশংসা করিতে পারি না। যিনি অবলীলাক্রমে শরৎচন্দ্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামাইবার পক্ষে রায় দেন, সমালোচক হিসাবে তাঁহার নিজের কোন্ শ্রেণীতে স্থান তাহাও সংশয়াতীত নহে।

বেঙ্গলের উল্লেখযোগ্য বই

শশিভূষণ দাশগুপ্তের	বিনায়ক সাত্ত্বালের		
ব্যান ও বন্যা	৩'০০ ॥	রবি-তীর্থ	৪'০০ ॥
ষোড়শচন্দ্র বাগলের		সতু বত্তির	
বিজোহ ও বৈরিতা	২'০০ ॥	সতু বত্তির গল্প	২'৫০ ॥
ত্রিনিবাস ভট্টাচার্যের		নলিনী দাশগুপ্তের	
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান	৪'০০ ॥	বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা	৩'০০ ॥
বুদ্ধদেব বহুর		গোপাল হালদারের	
নীলাঞ্জনের খাতা	৪'০০ ॥	আড্ডা	২য় মুঃ ২'০০ ॥
বিক্রমাদিত্যের		দিলীপ মালাকারের	
যুদ্ধের ইয়োরোপ	৪'০০ ॥	নেপোলিয়নের দেশে	২'০০ ॥

শরৎচন্দ্রের নব মূল্যায়ন

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক-খ্যাতি যখন সারা দেশে ব্যাপ্ত, তখন তাঁর নামোল্লেখ করে দরদী কথাশিল্পী কথাটি ব্যাপকভাবে চলিত হয়েছিল। যারা এই অভিধাটি চালু করেছিলেন, তাঁরা কি মনে করে তা করেছিলেন ঠিক জানি না। কিন্তু কথাটি শরৎচন্দ্রের সঠিক পরিচিতি বহন করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সত্যিই শরৎচন্দ্র দরদী। দরদের দৃষ্টিতেই তিনি দেখেছেন দেশ, জাতি ও মানুষকে। জীবনের সমস্ত সঙ্কট-সমস্যাতে তুলে ধরেছেন তিনি দরদের অল্পপ্রেরণায়, সমাধানে কোথাও যদি পৌঁছে থাকেন ত সে-ও দরদের সমাধান। অর্থাৎ বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে শরৎসাহিত্যের মেরুদণ্ড খুব মজবুত মনে হয় না।

এই বাস্তবতা-বিবর্জিত বলেই, তিনি স্বল্পবিঘ্ন সাধারণ নরনারীর প্রিয় লেখক হয়েছেন, আর এই অনতিক্রম্য ক্রটির জগ্গেই মাঝে মাঝে মহৎ সাহিত্যের প্রাপ্ত হুঁয়ে গেলেও, তাঁর রচনা কোনদিনই পূর্ণ মহত্বে অভিষিক্ত হতে পারেনি। পতিতাকে তিনি মহাসতী বানিয়েছেন, বিমাতাকে করেছেন মৃতিমতী মাতৃস্নেহ স্বরূপিনী। গুণ্ডা লাঠিয়ালকে করেছেন আত্মমর্ষাদার উগ্র সচেতনতায় প্রায় মহাপুরুষের সমপর্যায় ভুক্ত। এগুলো মন-কেড়ে নেওয়ার অমোঘ অস্ত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু এতেই অপমৃত্যু ঘটেছে তাঁর বেশীরভাগ প্রসিদ্ধ রচনার।

জীবনে যেটা যে রকম, তাকে ঠিক সেই রকম রেখে উপভাস গাঁথা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে তর্ক ওঠে। উপভাস ও নাটক জীবনের হুবহু ফোটোগ্রাফী, না প্রতিকলিত ছাতি, সে প্রশ্ন হাজির করেন কেউ কেউ। এ তর্কে সময় ক্ষেপ বোধ হয় অনাবশ্যক। পৃথিবীর মার্কামারা প্রথম শ্রেণীর উপভাস যেগুলি, তাতে পাঠক ধরার এই স্বলভ কৌশলটি প্রযুক্ত হতে দেখি না, এটাই অসম্বোধে বলতে পারি।

অবশ্য একথা বলতে হবে এই স্বত্রে যে জীবনকে তার যথার্থ স্বরূপে চিত্রিত করলেও এবং বাস্তবের ভিত্তি নিষ্ঠার সঙ্গে আকড়ে থাকলেও, মহৎ উপভাসকার যারা, তাঁরা সব-কিছুর উদ্দেশ্যে বৃহৎ একটা তত্ত্বলোকের সঙ্গেও যোগনিবদ্ধ থাকেন। তাই বাস্তবের সমস্ত ওঠা-পড়া ও ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁরা উপনীত হন এমন একটা জীবনদর্শনে, যা দিন-কাল-পাত্রাতীত।

এইটুকুই হল উপন্যাসের আত্মা, যা বিধৃত থাকে তার দেহ বা আখ্যান-বস্তুর মধ্যে। নিছক জমাটি গল্প বলার জগ্রে কোন দেশেই মহৎ উপন্যাস লেখা হয়নি। ডল্টয়েভস্কী, টলস্টয়, গোর্কি, আনাতোল ফ্রাঁস, রমঁঁ রলঁঁ, টমাস মান, সবাই জীবনদর্শন-প্রবক্তা উপন্যাসিক। অভ্যাস-মলিন প্রতিদিনের পরিবেশে অদ্ভুত ও অভাবনীয় কোন কিছুর আমদানি করে তাঁরা মানুষের আবেগের সমুদ্র আলোড়িত করে তোলেননি। জীবনের হিংস্র, জয়, অসুন্দর ও অসমান রূপকেই তাঁরা এঁকেছেন। কিন্তু এ-সবকে অতিক্রম করে পাঠকের মন পৌঁছেছে যে উপলব্ধি বা জিজ্ঞাসায়, যে বিতর্কে বা সমাধানে, তা ত কোন ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়। তা হল সর্বমানবিক অহুত্বতির সাগরসঙ্গম!

এই নিরিখে বিচার করুন শরৎচন্দ্রের রচনার। তাঁর মানুষরা ছোট, সমস্তাও ছোট। তাই কোনোটার আবেদনই ঘরের চৌকাঠ ছাড়িয়ে বেশী দূর-এগায় না। শরৎচন্দ্র এমন একটা মানুষ আসরে নামাননি, যার কোন দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসা বা বৈজ্ঞানিক জগৎ-নিরীক্ষা আছে। এমন কোন সমস্তার অবতারণা করেননি তিনি, যা খাওয়া-পরা, বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করার পরিমিত গণ্ডী ছাড়িয়ে জ্ঞান ও কর্মের কোন বৃহৎ দিগন্ত স্পর্শ করে। নরনারীর জীবনের এমন কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাতকে রূপ দেননি তিনি, যা জৈব বাঙালীয়ানার উর্ধ্বে উঠে মানুষের কোন শাশ্বত তৃষ্ণার চেহারা ধরেছে!

একান্নবর্তী পরিবারের সমস্তা, জাতিভেদ ও কল্যাণদায়ের সমস্তা, দাম্পত্য অসম্বন্ধের সমস্তা, অকাল বৈধব্যের সমস্তা... একান্তভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সুবিদিত এই সব সমস্তার বাইরে একবারও পা বাড়াননি শরৎচন্দ্র। আর এই বিচিত্র সমস্তার বাহনরূপে তাঁর রচনায় যে মানুষদের দেখা মেলে, তাদের আমরা দেখি বারবারই। এক-এক পরিবেশে আকার তাদের হয় এক-এক রকম, কিন্তু প্রকারটা বদলায় না। যেন একই সন্দেশের পাক, ছাঁচ হিসাবে কোনটা আম, কোনটা জাম হয়!

এ না হবে কেন? প্রথমত শরৎচন্দ্রের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পরিসর ছোট; দ্বিতীয়ত বাস্তবের মাটি দিয়ে সত্যিকার মানুষ গড়ার মতো দৃঢ় জীবনবোধ বা নিমুক্ত দার্শনিক দৃষ্টিও ছিল না তাঁর। তাই একই ধরণের চরিত্র তাঁর নানা বইয়ে ফিরে ফিরে আসে। এবং এই ক্লাস্তিকর পৌনঃপুনিকতার তাল সামলাতে শেষপর্বন্ত তিনি আশ্রয় নেন অলীক কল্পনা ও উদ্বেল ভাবাবেগের। ফলে মানুষগুলো তাঁর হাতে নীরক্ত নির্জীব পুতুল বিশেষ হয়ে উঠে। পুরুষরা তাঁর সবই নিষ্পৌরুষ, নারীরা সবই বাগীন্দরী।

একপক্ষের অসহায় আত্মসমর্পণ ও অল্পপক্ষের অফুরন্ত বক্তৃতার তোড়, এরি মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় তাঁর গল্প। তা বলার আড়ম্বর করে প্রচুর, কিন্তু বলার মতো কথা বলে কমই।

শরৎচন্দ্রের পাশে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে ঔপন্যাসিক হিসাবে নিঃসন্দেহে অনেক বড় আসন দিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের পায়ে একটা নীতিবাগীশের বেড়ী ছিল, তাই জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতা যে-পথে নিয়ে যেতে চেয়েছে গল্পকে, অধিকাংশ সময়ই তা তিনি যেতে দেননি। কিন্তু জীবনের বোধ ও বিস্তার তাঁর কত ব্যাপক ছিল! কত বিচিত্র মানুষের মিছিল নামিয়েছেন তিনি সাহিত্যে! আর সে-সব মানুষের প্রত্যয়, প্রয়াস ও পিপাসা কত বিচিত্র! তিনিই প্রথম বাঙালী ঔপন্যাসিক, যিনি আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ছনিয়ায় অমরদের মহাযাত্রী বলে গণ্য হতে পারেন এজ্ঞে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরাধিকারী, কিন্তু তাঁকে অতিক্রম করে তিনি কোথায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, নিশ্চয় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না আমায়।

গোয়ার স্বগভীর জীবনজিজ্ঞাসা ও চতুরঙ্গের অফুরন্ত জীবনতৃষ্ণার পূর্বাভাস আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাই বঙ্কিমে। কিন্তু তার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও শুনি না শরৎচন্দ্রে। শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন, চোখের বালি থেকেই তিনি লেখার গড়ন আয়ত্ত করেন প্রথম। হয়ত তাই। কিন্তু চোখের বালিকে বহু দূর পিছনে ফেলে, তার স্রষ্টা ধাপে ধাপে যত পথ পাড়ি দিয়েছেন, তার সঙ্গে তাল রেখে কয়েক পা-ও এগোতে পারেননি শরৎচন্দ্র। চেষ্টা করেছেন অবশ্য তিনি পথের দাবী ও শেষ প্রশ্ন লিখে, গতানুগতিক গৃহস্থালীর কাহিনীর পরিবর্তে মননশীল উপন্যাস বানাতে। কিন্তু সফল হয়েছেন কি? মেকী মননশীলতার অপটু নৌকা তাঁর বানচাল হয়েছে সত্যকার জীবন-তরঙ্গের মুখোমুখি হতেই। জীবনের সজ্জাত-সমস্তার বড় যখন নাস্তানাবুদ করে তুলেছে, অসহায়ভাবে তখন তিনি আঁকড়ে ধরেছেন সেই দরদের খুঁটিই!

এর কারণ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মতো পর্যাপ্ত বৈদগ্ধ্য ছিল না শরৎচন্দ্রের। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অনেক কিছু পড়ার কথা অবশ্য আছে তাঁর চিঠিপত্রে। কিন্তু লেখাতে এই অধ্যয়ন ও অল্পশীলনের ছাপ তাঁর কিছুই মেলে না। ব্যক্তিগত সাহচর্যও তাঁর সঙ্গে করেছি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। তাতে তাঁর সংবেদনশীল চিত্ত ও সহৃদয় স্বভাবের পরিচয় পেয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণেই। কিন্তু মনীষা ও মনস্তিতার সাক্ষাৎ পাইনি। ঐ মৌলিক উপকরণই ছিল না তাঁর এবং, মহৎ উপন্যাস লিখতে পারেননি তিনি,

আসলে মনের ভাঙারে তাঁর বৈদগ্ধ্যের প্রচুরায়ত সঞ্চয় ছিল না বলেই। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছি। টলস্টয়, রল্লা, টমাস ম্যানও কি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ভাবলে অবাক লাগে! নিঃসন্দেহ, শরৎচন্দ্র এঁদের সমস্তরের ঔপন্যাসিক নন।

তা বলে শরৎচন্দ্র কি নিতান্তই সাধারণ লেখক? মোটেই তা নন। বাংলাসাহিত্যে প্রায় পথ্য তিনি দিয়েছেন প্রচুরই, যা শ্রেয় রূপেও চিহ্নিত হতে পারে কোথাও কোথাও। ব্যথিত, পতিত, নিগৃহীত মানুষকে তিনি সম্মান দিয়েছেন, জীবনের দুঃখ-কষ্ট, আঘাত-অবমাননাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন, যার মধ্যে কল্পনার আতিশয্য থাকলেও কাপট্য নেই, বিদ্রোহের বাহিদীপ্তি না থাকলেও সমবেদনার অশ্রুধারা আছে। দৃষ্টিতে তাঁর একই সঙ্গে দূরবীক্ষণের প্রসার ও অণুবীক্ষণের সূক্ষ্মতা হয়ত ছিল না। কিন্তু মার্জনার প্রশান্তি ও নম্রতার মেঘাচ্ছন্নতা দিয়ে তিনি দৃষ্টির অসম্পূর্ণতা অবশ্যই পূরণ করে নিয়েছেন। এগুলো স্থলভ শক্তি নয় এবং ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট থেকে হার্ডি, মেরিভিথ, গ্যালসওয়ার্দি পর্যন্ত, দ্বিতীয় সারির বহু সার্থক ঔপন্যাসিক দেখা যাবে ছুনিয়ায় যাদের সঙ্গে তাঁকে একাসনে বসাতে নিশ্চয় পারা যায়।

*

* *

*

বলা দরকার যে শরৎচন্দ্রের যশোহরণের কোন অভিপ্রায় কারো নেই। তা নেই আমরাও। কিন্তু তাঁর লোকান্তরের প্রায় পঁচিশ বছর পরে আজ তাঁর প্রকৃত মূল্যায়নের একটা প্রয়াস হওয়া দরকার বৈকি! তাতে অত্যাঙ্কি ও অতি-প্রীতির ধূলো-বালি ঝরে গিয়ে তাঁর সত্য মূল্য যা, সেটুকুই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই প্রয়াসে আমি শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েও, তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না আমি। তিনি আলোচনায় অগ্রমুখ্ত মন নিয়ে অগ্রসর হতে পারেননি, উত্তেজিত হয়েছেন এবং সেইজন্তেই যুক্তিভ্রষ্ট হয়েছেন।

যদি পড়তে হয় তবে

‘বেঙ্কল’এর বই পড়ুন॥

এখনো গেল না আধার

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

গত শ্রাবণ সংখ্যা (১৩৬৯) ‘সাহিত্যের খবর’এ ‘শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার’ নামে বর্তমান লেখকের একটি সাত পৃষ্ঠার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রতিবাদে বৃহদাকার ‘গল্পভারতী’র পৃথুলকায় শারদীয় সংখ্যায় আচার্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি আট পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লিখেছেন—‘উপন্যাসের পুনর্বিচার’। আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য ও অবলম্বন করেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

কিন্তু ব্যক্তিগত কথা থাক্। আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পড়ে শরৎ-উপন্যাসের পুনর্বিচার সম্পর্কে আমরা কতটা পথনির্দেশ পাই পৌঁটাই বিবেচ্য। তাঁর প্রবন্ধটি আন্তোপান্ত পড়ে আমার পূর্ব প্রবন্ধের বক্তব্য প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করা দরকার বলে মনে হয়নি। তিনি লিখেছেন, “ডঃ অরুণকুমারের একটা সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করি—তাহা হইল সমস্ত উপন্যাসেরই পুনর্বিচার প্রয়োজনীয়তা।” আমি শরৎচন্দ্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলেছি বলে আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখিত ও উত্তেজিত হয়েছেন। আমার বক্তব্য ছিল, শরৎচন্দ্র সমাজের কবি, জীবনের শিল্পী নন।

আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুদ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন, তাহ’লে ভিক্টোরীয় যুগের প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের কী হবে? আমি লিখেছিলাম, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আবেদন দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিকগণ—ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, ব্রন্টে-ভগিনীগণ এঁদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আমার বক্তব্যের সমর্থনই চোখে পড়ে। তাঁর প্রবন্ধের কয়েকটি বাক্য উদ্ধার করছি।

(ক) “শরৎচন্দ্রের যে কোন উপন্যাস হইতেই কালের অগ্রগতি দ্বারা পেছনে ফেলা আবেগোচ্ছ্বাসের অসঙ্গতি চোখে পড়ে।”

(খ) “শরৎচন্দ্র সমাজের মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, সেইজন্য এই মাটি শিথিল হইলে তাঁহার মুষ্টিও অনেকটা শিথিল হইয়াছে।”

(গ) “শরৎচন্দ্র যুগ-পরিবর্তনের অমোঘ বিধানে নিজ গৌরবময় সিংহাসন হইতে ভটপ্রায় হইতে চলিয়াছেন।”

(ঘ) “ডঃ অরুণকুমার বলিয়াছেন যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ‘দেশকালাতিক্রমী মহৎ চেতনা নাই।’ ইহা সত্য হইলেও তাঁহার ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের দাবী খণ্ডিত হয় না।”

(ঙ) “ভাববিলাস, অতিকথনপ্রবণতা ও সময় সময় হৃদয়-সংঘাতের অপরিমিত বিস্তার প্রভৃতি ক্রটি শরৎ-সাহিত্যে আবিষ্কার করা দুরূহ হইবে না।”

আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পঞ্চোক্তি আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। তাহ’লে তাঁর সঙ্গে আমার দৃষ্টি-পার্থক্যটা কোথায়?

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। প্রায় শতাব্দীর এক পাদ আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন উত্তেজনাহীন পক্ষপাতমুক্ত নিরাসক্ত মূল্যায়ন ও পুনর্বিচার হবে, এটাই আমার আশা। আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পড়ে আমার সে আশা পূরণ হল না, দেখছি এখনো আধার অপসৃত হয় নি।

আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করেছেন—“রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্কট, জেন অস্টেন, ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, এমিলি ও শার্লট ব্রন্টে প্রভৃতি লেখকদের কি ব্যবস্থা হইবে?” শরৎচন্দ্র এবং এই সকল ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করায় তিনি দুঃখিত হয়েছেন। অথচ তাঁরই লেখায় শরৎ-উপন্যাসের ক্রটি সম্পর্কে পূর্বোক্ত পঞ্চোক্তির সাক্ষ্য পাই। তাঁরই প্রবন্ধে এই বাক্যটি পাই—“ডিকেন্সের ব্যঙ্গাতিরঙ্গন, থ্যাকারের নীতিকথা প্রচার, জর্জ এলিয়টের পাণ্ডিত্যভ্রম, ব্রন্টে-ভগিনীদের উদ্ধত আত্মঘোষণা ইত্যাদি ক্রটির সঙ্গে যুগোপযোগিতার অভাব মিলিত হইয়া তাঁহাদের সমকালীন আবেদনকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ ও সীমাবদ্ধ করিয়াছে।”

ভিক্টোরীয় যুগের জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সম্পর্কে একালের সমালোচক ও সাহিত্যশাস্ত্রীদের অভিমত কী, তা নিশ্চয়ই আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন। তবু তাঁকে একবার সে-কথা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই।

ঔপন্যাসিক-সমালোচক হেনরী জেমস্ বাইশ বছর বয়সে ডিকেন্সের তীব্র সমালোচনা করেন। আজ পর্যন্ত তার কোনো যোগ্য প্রতিবাদ হয়নি এবং সবাই তা মেনে নিয়েছেন। হেনরী জেমস্ লিখেছেন :

Insight is perhaps too strong a word for Dickens ; for we are convinced that it is one of the chief conditions of his genius not to see beneath the surface of things. If we

might hazard a definition of his literary character, we should, accordingly, call him the greatest of superficial novelists. We are aware that this definition confines him to an inferior rank in the department of letters which he adorns ; but we accept the consequence of our proposition. It were, in our opinion, an offence against humanity to place Mr. Dickens among the greatest novelists. For, to repeat what we have already intimated, he has created nothing but figures. He has added nothing to our understanding of human character.

হেনরী জেমস-এর এই উক্তির স্বেথানে যেখানে ‘ডিকেন্স’ শব্দটি আছে, সে-সব স্থানে যদি পরিবর্তে ‘শরৎচন্দ্র’ শব্দটি বসাই, তাহ’লে কি খুবই অগ্রায় হবে ?

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কী, গোর্কি, আনাতোল ফ্রাঁস, রমঁা রলঁা, টমাস মান : এঁদের যদি প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলি, তাহলে ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, হার্ডি, মেরিডিথ, গ্যালসওয়ার্দি এবং শরৎচন্দ্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলাই সমীচীন। এতে আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিটা কোথায় ?

শরৎচন্দ্র বাস্তবধর্মী লেখক এই অর্থে যে, আবেগপ্রবণ বাঙালি পাঠক-পাঠিকাকে জয় করার সুলভ কৌশল তিনি আয়ত্ত ও ব্যবহার করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর বাস্তবজ্ঞান স্বীকার করতেই হয়। রমণীমোহন বা শিশুতোষ কাহিনী রচনায় শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্য ছিল, একথা কে অস্বীকার করে ? আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাতেই বলি, “যে লেখক যত স্নকৌশলে পাঠকের মানস-প্রবণতাটি ধরিতে পারেন, যুগচিন্তের বিশেষ ভাবালুতার প্রশ্রয় দিতে পারেন তিনি ততই সমসাময়িক খ্যাতির অধিকারী হন।” শরৎচন্দ্রের সিদ্ধি-রহস্য এখানেই নিহিত : ভাবালুতার প্রশ্রয় ও করুণরসের অসংযত প্রকাশ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মহৎ উপন্যাসের প্রকৃতিগত উপাদানের শোচনীয় অভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশাল মানবসমাজ—সুদূরগত মানবসভ্যতা—বিরাট পটভূমিতে নরনারীর জীবনের চিরন্তন সমস্যা—যাকে আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় ‘গানের রেশ ও সবুজ পাতায় আলোর নাচন’ ব্যাকাংশটি উদ্ধৃত

করে রক্ষা করেছেন—সেই প্রতীকধর্মিতার অল্পপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক মানুষের প্রত্যয়, প্রয়াস, ব্যর্থতা, জীবনতৃষ্ণা, জীবনজিজ্ঞাসা—এসবের কিছুই শরৎ-উপন্যাসে নেই। পরিচিত গৃহসংসারে তুচ্ছ ক্ষুদ্র মান-অভিমান বা অস্বাভাবিক স্নেহের প্রকাশ, এই সম্বল করেই তিনি উপন্যাস লিখেছেন। মহৎ জীবনবোধে অনুপ্রাণিত মননশীল উপন্যাস রচনায় শরৎচন্দ্র ব্যর্থ। ‘গৃহদাহ’, চরিত্রহীন ‘পথের দাবী’, ‘শেষ প্রশ্ন’, ‘দেনা-পাওনা’—খুব ভেবেচিন্তে এই পাঁচটি উপন্যাসের নাম করা যায়, কিন্তু ধোপে টেকে না। সেকী মননশীলতার জীর্ণ তরী সত্যকার জীবনতরঙ্গের প্রথম অভিঘাতেই ডুবে গেছে।

আসলে শরৎচন্দ্র কেবল বাংলা-লেখক নন, তিনি বাঙালী লেখক। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের ক্রটি ও হীনতা শরৎ-উপন্যাসে শিল্পরূপ লাভ করেছে বলেই মধ্যবিত্ত বাঙালীর হৃদয়ে শরৎচন্দ্রের আসন। শরৎচন্দ্র রমণীমোহন শিশুতোষ কাহিনীর লেখক—এখানেই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। হৃদয়-বৃত্তির অতিচর্চা, তাবালুতার অতিরেক, গৃহগতপ্রাণতার অতিরঞ্জন মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রের মানসিক খাত, শরৎচন্দ্র তাই সরবরাহ করেছেন। শরৎচন্দ্রের মতো সেক্টিমেন্টাল স্বতোবিরোধী উপন্যাসিকের জন্ম আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তীক্ষ্ণদী সমালোচক উত্তেজিত হন, এটাই আশ্চর্য।

শরৎচন্দ্র স্বতোবিরোধী লেখক, একথা শুনে হয়ত অনেক কপালে তুলবেন। তাঁর চরিত্রগুলি সহজ ও স্বাভাবিক নয়, একথা শুনেও হয়ত বা কেউ কেউ আপত্তি করবেন। এই আপত্তিসমূহের নিরসন করা দরকার।

শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের দলাদলি ও সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির নিন্দা করেছেন, অথচ একান্নবর্তী পরিবারের সমর্থন করেছেন, তা ভেঙে গেলে জোড়া দিয়েছেন। বেশ কিছুসংখ্যক মিষ্টি-মিষ্টি প্রেমের গল্প তিনি লিখেছেন, কিন্তু জাত-কুল বাঁচিয়ে। সংসারে ভা’য়ে ভা’য়ে বা’ জা’য়ে জা’য়ে যে সংঘর্ষ হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তা প্রবল ভাবাবেগের বন্ধ্যায় ধুয়ে গেছে। তিনি প্রচলিত যৌন-নীতিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন, কিন্তু অনেক বেশী অন্ততঃ সারশূন্য জাতিভেদপ্রথা ও বৈধব্যের পবিত্রতা রক্ষায় তিনি উৎসাহী।

শরৎচন্দ্রের প্রধান নর-নারী চরিত্রগুলিতে ভারসাম্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। উচ্ছৃঙ্খলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা, নিষ্ঠা ও বিমুখতা, আবেগোচ্ছ্বাস ও যুক্তিবাদিতা, গোঁড়ামি ও উদারতা, লম্পট্য ও সংযম, আত্মমর্যাদা ও স্নেহবুভুক্ষা পাশাপাশি একই চরিত্রে দেখা যায়।

আসল কথা, শরৎচন্দ্রের মূল্যবোধে অসামঞ্জস্য ছিল। তাঁর মতো সেক্টিমেণ্টাল লেখকের পক্ষে স্বভাব-উপন্যাসিক হওয়াই সম্ভব, উচ্চতর জীবনবোধ ও গভীরতর উপলব্ধি তাঁর কাছে আশা করাই অত্যাশ। তাঁকে বলা হয় বাস্তববাদী প্রগতিশীল লেখক, আসলে তিনি অন্তঃসারশূন্য আদর্শের পূজারী রক্ষণশীল লেখক। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিসংকীর্ণতা ও মননদৈগ্ধ্য আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন। তা যখন করেছেন, তখন শরৎ-উপন্যাসে সর্বজনীন মূল্যবোধের ও গভীর উপলব্ধির শোচনীয় অভাবও স্বীকার করবেন অন্ততঃ এটুকু আশা করা যায়। তারপর উপন্যাসসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান কোথায়, তা মেনে নিতে কষ্ট হবে না। শরৎচন্দ্র উপন্যাসক্ষেত্রে মেকী চালাতে চেয়েছিলেন, এ সম্বন্ধে আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন; তাকে আবেগপ্রবণ বাঙালী চরিত্রের দোহাই পেড়ে সমর্থন করতে চেয়েছেন। শরৎ-উপন্যাসের চরিত্রগুলি সার্বভৌম মনুষ্যত্বের উপনীত হয়নি—এ কথা মেনে নিতে তাঁর এত দ্বিধা কেন, তা বুঝি না।

আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রবন্ধের একটি উপনাম দিয়েছেন : মথিলিখিত স্নানমাচার। সবিনয়ে বলি, তাঁর লেখারও একটি উপনাম আমার মনে এসেছে, বোধকরি সেটাই সার্থকতর শিরোনাম : তিমির-জাতক।

আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে বর্তমান লেখকের সমালোচকরূপে যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে কটুক্তি করেছেন। পুনরায় সবিনয় নিবেদন করি, তিনি আমাদের আচার্য, সেই কারণে এই কটুক্তির জবাব-আমি দেব না।

॥ বেঙ্গলের নানা রকমের বই ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের

সীমান্তের সপ্তলোক

তিন টাকা।

[ভারতীয় সীমান্ত ভ্রমণের আশ্চর্য কাহিনী]

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

মার্কসবাদ

২০০ ॥ চরণিক

৩০০

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

“ভারতীয় প্রহরীদলের অপমৃত্যুতে সেদিন মিঃ খুশ্চভ মর্মান্বিত হয়েছিলেন এবং রক্তিম চীন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন লাদাখ এবং অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চল থেকে চীনা সৈন্যদলকে প্রত্যাহার করে নেন এবং নেহরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। চীন কর্তৃপক্ষ খুশ্চভের অনুরোধ রাখেননি। ড্রাগন তার ধারালো দংষ্ট্রায় লাদাখের পূর্বাংশ কামড় দিয়ে আজও ধরে রয়েছে। চিবোয়নি, গেলেনি, উদগীরগও করতে চায় না। শুধু তার হৃর্বোধ্য হিংস্র চক্ষু শিকারের দিকে তাকিয়ে দপ দপ করে জ্বলছে। এ জন্তু প্রাগৈতিহাসিক আমলের, একালে এর জুড়ি মেলে না।”

প্রবোধকুমার সান্যালের

রাশিয়ার ডায়েরী

কমিউনিস্ট জগৎ ও জীবনের হার্দ্য তীক্ষ্ণ
বাস্তব প্রতিচ্ছবি। অল্পস্র ছবি।

প্রথম খণ্ড : ১৪'০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : ১২'০০ ॥ দুটি খণ্ড একত্রে : ২৫'০০ ॥

দেবেশ দাশের

নবগোপাল দাসের

ইয়োরোপা ৮ম মুঃ ৩'০০ ॥ প্রেম ও শ্রণয় ৪'০০ ॥

বিমল দত্তের

কাশ্মীর প্রিন্সেস

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও জীবনে
উত্তরণের বিস্ময়কর কাহিনী ৩য় মুঃ ৪'০০ ॥

স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

প্রদক্ষিণ ২য় মুঃ ৪'০০ ॥ কৃষাণু ২য় মুঃ ৬'০০ ॥

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নীলকণ্ঠের

অমূল তরু ৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥ অত্ন ও প্রত্যহ ২য় মুঃ ৫'০০ ॥

কালকূটের

অমৃত কুন্তের সন্ধানে

৯ম মুঃ বাংলা সাহিত্যের এক নতুন
৫'০০ ॥ দিকের সূচনা করেছে।

বিক্রমাদিত্যের

দিলীপ মালাকারের

যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪'০০ ॥ নেপোলিয়নের দেশে ২'০০ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

প্রফুল্ল রায়ের

বিষকুন্ত ২য় মুঃ ৪'০০ ॥ পূর্বপার্বতী ২য় মুঃ ৮'৫০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

দূরতর দ্বীপ

দেবভোষ বসু

অন্তত বাঙালী পাঠকসমাজের এক বৃহদাংশ যে এখনো শরৎচন্দ্রীয় আকর্ষণ-শক্তির বশীভূত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। কি গুণে তাঁর রচনাবলী পাঠকের মনের উপর এমন দীর্ঘজীবী প্রভাব বিস্তার করেছে, সে আলোচনা আপাতত অবাস্তব। কারণ আজকাল সেটাকে আর গুণ বলে মনে হয় না। শুধু মনে হয় সাফল্যের চাবিকাঠি যে জনপ্রিয়তা সেটা আসলে পাঠকের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে লেখকের বক্তব্য বা ভঙ্গীর আকস্মিক মিলন ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য একাধিক সমালোচকের বিচারে তাঁর ক্ষিতিজ আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যের পরমতম বিস্ময়। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী শরৎচন্দ্রের প্রতি বরাবর প্রসন্ন ছিলেন। তাই আগন্তকের মতো বঙ্গভারতীর দ্বারপ্রান্তেই তিনি থেমে রইলেন না। এলেন এবং জয় করলেন, প্রতাপে নয় ভালোবাসায়, এক নিমেষেই বাঙালীর নিগ্রহ মনোলোক তাঁর আয়ত্তে এলো। নিকট জগতের সাধারণ মানুষ এবং মর্ত্যবন্ধনের হাসিকান্না বাংলা উপজাতির মুক্তির সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো—যেন এতকাল পাঠক ওই বাঞ্ছিত মিলনোৎকর্ষণেই দিন গুনেছে। শাসনের অবরোধ ভেঙে তিনি বেরিয়ে এলেন, সঙ্গে তাঁর প্রসিদ্ধ চরিত্রের দীর্ঘ মিছিল, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ যার সামান্য লক্ষণ। এতদসঙ্গেও, পাঠকের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব অনায়াসেই নিশ্চিহ্ন হলো। তাহলে কি করে বলবো বাংলাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের জন্ম প্রস্তুত ছিল না, যদি তাঁরই সৃষ্টি এত সহজে, এমন অকষ্টবদ্ধ পদ্ধতিতে পাঠকের প্রত্যাশার সঙ্গে মিলে যায়? অথচ একবার যদি স্বীকার করি যে তিনি পাঠক তৈরী করেননি, পাঠকই তাঁর জন্ম তৈরী হয়ে বসে ছিলো, তাহলে একথাও আমাদের অবশ্যম্ভাব্য যে তাঁর আবির্ভাব মোটেই আকস্মিক নয়, বাংলাদেশের জলবায়ুর পক্ষে তা সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও গতানুগ। তা যদি না হতো, তবে রবীন্দ্রযুগের এই লেখক বছর্বেই অনাদরের ঊষরতায় হারিয়ে যেতেন।

কি গল্প, কি উপজ্ঞাস কোনো ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র এমন কোন পরিচয় রেখে যান নি, যা সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে গড়তে পারে। পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম তাঁর একাধিক। তিনি বুঝেছিলেন যে বাংলাদেশের সমতল আবহাওয়ায়

‘তিনসঙ্গীর’ মতো গল্পগ্রন্থ অথবা ‘গোরা’, ‘চোখের বালি’র মতো উপন্যাস-রচনা ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র। তাই গোড়া থেকেই তিনি সারল্যের অঙ্গীকার নিলেন। ভাবপ্রবণতার ষড়ষষ্ঠ বুদ্ধিকে নির্বাসনে পাঠালো, এবং প্রেমের স্থান গ্রহণ করলো মধ্যযুগীয় রোমান্স। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের পাঠকসংখ্যা চিরকালই অত্যন্ত; তার সবচেয়ে চক্ষুস্থান কারণ বোধ হয় এই যে সাধারণ পাঠক তা পড়ে বুঝতে পারে না। আর শরৎচন্দ্র প্রথম থেকেই শেষদিন পর্যন্ত কোনোসময়েই লোকসাধারণের প্রশংসা হারালেন না। সরল অল্পবাদে অশিক্ষিতপটুদের ফলে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক গল্পগুলি নামান্তরে জনপ্রিয় হোলো। মেঘ ও রৌদ্র, বিচারক, মাস্টারমশায়, জ্বরী পত্র, শেষের রাত্রি প্রভৃতি গল্পে স্নেহ, প্রেম, মনুষ্যত্বের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা যে নিছক গল্প-জমানো ক্ষমতার অসাধ্য, সে কথা কে না জানে? কল্পনা ও মননশক্তির যে অপূর্ব যোগপত্তি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র, শরৎচন্দ্রে তার শোকাবহ অনটন। এর জগৎ তাঁকে দোষ দেওয়া অগ্রাঘ্য; অন্তত কল্পনার অভাবকে রোমান্স দিয়ে পূর্ণ করতে পারলেও, তাঁর উপন্যাসের অল্পজ্ঞান পাত্রপাত্রী তাঁরই মননদৈত্বের স্বাভাবিক ফসল। এতে উপস্থিত পাওনা অবশ্য যথেষ্ট। কিন্তু সাহিত্যের উত্তরাধিকার তাতে কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে তা পুনর্বিবেচ্য। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে কথা বারবার বলা হয়েছে, যেমন সমাজবিরোধী ভাবযুরে অথচ জীবনসহ চরিত্রের উৎপাদন, এবং যে কথা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা আসলে ভ্রান্তির আদিউৎস। প্রকৃতপক্ষে চরিত্র শব্দটির অর্থ শরৎচন্দ্র ভালো বুঝতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে বিশিষ্ট কতিপয় লক্ষণের যোগফলই চরিত্র। এ কথার প্রমাণ চরিত্রহীনের কিরণময়ী, গৃহদাহের মহিম ও সুরেশ এবং ‘শ্রীকান্ত’ নামক গ্রন্থের নাম-চরিত্র। এরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, অধিকন্তু শৃঙ্খলার শাসনে এদের উপর ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত চেনা রাস্তার বাইরে পা বাড়ায় না। এবং যেহেতু গোটা মানুষের পরিচয় শরৎচন্দ্রে সর্বত্র অল্পপস্থিত, তাই তাঁর বায়রনীয় চরিত্রসমূহ শেষপর্যন্ত দুহুতিরই নায়ক হয়ে ওঠে, তাদের মধ্য দিয়ে জীবনের কোন মহত্তম অর্থ মূর্ত হয়ে ওঠে না। অথচ কতকগুলি লক্ষণই চরিত্রের সাধারণ উপাদান এবং জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সংঘাতে সেই সমস্ত লক্ষণ যে ভূমিকা গ্রহণ করে তার মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে মানুষের স্বভাব ও মৌলিক, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্য। যে ‘হোমো ফিক্টাস’ নায়ক উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ, সে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিভূ নয়। কিন্তু সেইজন্মেই সে অবাস্তব হয় না; সে

তখনই অবাস্তব হয়ে ওঠে, যখন তার উপর ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়া বাঁধাছকে চলতে থাকে, তখন তার আত্মশক্তি লেখকের অভিপ্রায়কে অনুসরণ করে। শিল্পীর স্বাধিকার অবশ্যগ্রাহ্য বটে, কিন্তু সে স্বাধিকারের অর্থ অনুদার আত্মপ্রক্ষেপ নয়, নির্লিপ্ত আত্মবিকাশ। যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটেছে, সেখানেই দেখা দিয়াছে লেখকের অপমৃত্যু।

শরৎচন্দ্রের মানবতা ও উদারতার কথাও বহুবার শোনা গেছে। এবং তা যে ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে প্রাপ্ত, কোন কোন গ্রন্থে সে কথাও অনুল্লিখিত থাকে নি। উদার হবার দিকে শরৎচন্দ্রের একটা ঝোঁক ছিল—সেকথা তর্কাতীত। তাঁর পল্লীসমাজ, অরক্ষণীরা, বামূনের মেয়ে, মহেশ প্রভৃতি লেখা সে কথার প্রমাণ। কিন্তু সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে, অনুমোদিত প্রথার বিপক্ষে, বিবিধ সামাজিক সমস্তার ভাবপ্রবণ রূপায়নে তাঁর লেখনী স্বয়ংচলিত ছিল বলেই কি তিনি উদার? একদিন, যখন এই সমস্ত সমস্যা জীবনের বহির্দৃষ্টেও প্রতিপত্তি হারাবে, তখন কি আমরা তাঁকে উদার বলতে পারবো? নিশ্চয়ই পারবো না, কেননা তাঁর উদারতার ভিত্তি সঙ্কীর্ণতার উপর। অনুশাসনের অবরোধ পেয়েই তিনি কখনোই খোলা হাওয়ায় নিজের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারেন নি; বন্ধমূল সংস্কার তাঁকে এমনই পেয়ে বসেছিলো যে ভাসা ভাসা প্রেম, খাত্তাব আর সমাজসঙ্কট ব্যতীত জীবনের কোন গূঢ়তম অস্থখ তাঁর কর্মক্ষম হৃদয়কে একবারো বিচলিত করেনি। বিচিত্র চরিত্র তাঁর উপস্থাসে অনেক আছে, কিন্তু তারা কেউ স্বাভাবিক মানুষ নয়, মিলিআ কপল্‌স্টোনের উক্তি, “they make noises, and think they are talking to each other; they make faces, and think they understand each other.”

সাহিত্যের উদারতা মানে মিলনাকাজক্ষা, আসক্তির প্রত্যাহার। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাতেও আত্মকেন্দ্রিকতার প্রভাব অল্প নয়। অধিকন্তু কোনো সার্বজনীন মূল্যবোধও তাঁর ছিল না যার ফলে উপস্থাসে গভীরতা আসে। গল্প-বলার রমণীয় পটুত্ব এবং হৃদয় বর্ণনাগুণে এত সহজেই পাঠকগোষ্ঠী তাঁর কাছে এসেছিল যে, খ্যাতির কলরবমুখরিত প্রাঙ্গণ ছেড়ে অন্তরঙ্গের সাধনায় তাঁর সময়ভাব ঘটলো। মানবতার প্রচলিত আদর্শের সঙ্গে স্বকীয় মূল্যবোধের যে মিলনে সাহিত্যে কালোত্তর লক্ষণ ফুটে ওঠে, তার স্থান গ্রহণ করলো হুঃখ, দারিদ্র্য, নিষিদ্ধ প্রেম আর বেপরোয়া জীবনের অগভীর বর্ণনা।

এতক্ষণ যে কথা বলা হোলো তার সারাংশ এই যে শরৎচন্দ্রের রচনায় বর্ণনা আছে কিন্তু উপলব্ধি নেই, চরিত্র আছে কিন্তু মানুষী স্বভাবের অনটনে তার যন্ত্রের মতো, লেখকের ইচ্ছাশক্তির পদানত। তাঁর রচনাবলীর সর্বাঙ্গীণ আলোচনায় না নেমেও, একটি উপন্যাসের প্রসঙ্গে এ কথার যথার্থ্য স্পষ্ট। এবং সে উপন্যাস, তাঁর অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, গৃহদাহ। প্রকৃতপক্ষে গৃহদাহ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পরিকল্পনা-প্রবণতার যে লক্ষণ সহজলভ্য, তাতেই তাঁর শিল্পসত্তার চরমতম পরাজয়। অচলার পক্ষে যুগপৎ ও.মহিম ও সুরেশের প্রেমাকাজিক্ষী হওয়া সম্ভব কিনা, তা নিয়ে পাঠকের কোন মাথাব্যথা নেই। ফলশ্রুতিতেই সে পরিতৃপ্তি। এবং যদি মেনেও নি যে গৃহদাহ উপন্যাসে অচলার হৃদয়দ্বন্দ্ব বিখ্যাত ও উত্তীর্ণ, তথাপি ঐ উপন্যাসের বিরুদ্ধে পাঠকের অভিযোগ শাস্ত হয় না। কঠিন, নিষ্কম্প মহিমের প্রতি অচলার হৃদয়-সমর্পণ যতখানি অস্বাভাবিক, ততোধিক শিশুতোষ সুরেশের প্রতি তার প্রথমদর্শনেই অল্পরাগের অভিজ্ঞতা। আশ্চর্য যে উপন্যাসে মহিমের প্রতি লেখকের জীবনবিমুখ আচরণ অত্যন্ত স্পষ্ট, মনোহরণ কোন গুণে একদা সে অচলার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তা ভেবে কূল পাওয়া যায় না। অথচ এই চরিত্রটিই উপন্যাসের চাবিকাঠি, প্রেমের দ্বন্দ্বকে সরলীকরণে এবং জটিলতার গ্রন্থিমোচনে এর অবদান অসামান্য। অচলার একপাশে এই অ-মানুষ অথবা অতিমানুষ মহিম, অগ্রদিকে, প্রাণবন্ত, হিতব্রতী এবং মধ্যযুগশোভন বেপরোয়া সুরেশ। তুষারশীতল স্বামীর নান্দিত্য ছেড়ে সুরেশের উষ্ণ আশ্রয়ে অচলার প্রস্থান তাই খুব স্বাভাবিক—সম্ভবত যে কোন নারীর পক্ষেই স্বাভাবিক, যতক্ষণ নারী নারীই, স্ত্রী নয়। এটা ভালো না খারাপ এই নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক ধীশক্তি ব্যয় হয়েছে। এবং আজ যখন আমরা বুঝি যে উপন্যাসিকের সঙ্গে অভিভাবকের কোন সাদৃশ্য নেই, তার আত্মীয় নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত দৈশ্বর। তখন আদিগুরু স্বাধিকারপ্রমত্ততায় স্বভাবতই আমাদের বিস্ময় জাগে। কারণ উপন্যাসের অন্তর্গত চরিত্রসমূহ তখনই জীবন্ত ও স্বভাবানুগ যতক্ষণ তাদের আত্মবিকাশ আত্মস্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য পরিণতি। হৃতাণ্যের বিষয় প্রথার বন্ধনে যে উদারতার জন্ম, তা সঙ্গীর্ণ হতে বাধ্য। তাই দাম্পত্যজীবনের সীমান্তনীতিকে তিনি গ্রন্থের শেষদিকে পুনর্প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেলেন; সুরেশের আত্মবিসর্জনের মধ্যদিয়ে অচলার মোহমুক্তি ঘটালেন তিনি। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, এই আত্মবিসর্জন আমাদের মনে বিন্দুমাত্র অহুকম্পা বা ভীতি জাগালো না। মহৎ চরিত্রের মানুষী দুর্বলতা মত্তেও ট্র্যাজেডীর নায়ক অসম্পূর্ণই থেকে গেল।

তার অন্যতম কারণ মহিম ও সুরেশ উভয়েই চারিত্র্যগুণবর্জিত এবং একান্তভাবে স্রষ্টার অহুগত। চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই ঘটনার বিস্তার এবং ঘটনার মধ্য দিয়েই চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঘটনার পূর্বপরিকল্পনা অত্যন্ত স্পষ্ট। চরিত্র থেকে ঘটনার উৎপত্তি নয়, ঘটনার মধ্যেই চরিত্রের অমোঘ আনাগোনা। অত্যন্ত সাজানো-গোছানো, মানানসই, কিন্তু বিশ্বাসে নয়। প্রাণের কোন সাদা তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা ঘটনা চরিত্রের মধ্যেই থাকে; তাকে উদ্ভাবন করতে হয় না, আবিষ্কার করতে হয়। অথচ দুর্বল উদ্ভাবনায় শরৎচন্দ্রের উপস্থাপন ক্লাস্তিকর। প্রমাণস্বরূপ গৃহদাহের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। মহিমের গৃহদাহের মূল নায়ক কে, সুরেশ না মহিমের বিধিলিপি, এ সমস্তার মীমাংসা গবেষকদের জগ্না মূলতুবি রেখেও বলা যায় যে গৃহদাহের ঐ পরিকল্পনা আসলে মহিমের অনাগত ভাগ্যবিপর্যয়ের আলাংকারিক উপস্থাপনা। শুধু তাই যদি হয় তবে মানতেই হবে যে খুব দুর্বল সেই প্রতীক, কার্যকারণবিবর্জিত, লেখকের উদ্ভাবন-ক্ষমতার অপরিণত দৃষ্টান্ত। সম্ভবত আগামী বিপর্যয়ের পূর্বাভাস নাটকরচনার একটি প্রথা অনুমোদিত রীতি বলে। শরৎচন্দ্রের মন তার স্বধাসংকেতে দিশা হারিয়েছিল। কিন্তু শিল্পকলার প্রতি আহুগত্য দেখাতে যেয়ে নির্মম রসিকতাকে এতখানি প্রশ্রয় শরৎচন্দ্র দিতে পারেন না। আর সংস্কারাঙ্ক, রক্ষণশীল পল্লীসমাজও হঠাৎ আইনকে নিজের হাতে নেবে, এমন চিন্তা অকল্পনা-প্রসূত। এই ছুটি সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে তৃতীয় যে সম্ভাবনার কথা স্বতই মনে পড়ে তার উল্লেখ পর্যন্ত জনপ্রিয় উপস্থাপনের বিরুদ্ধে অনপন্যে অপরাধ। কারণ প্রাণবন্ত, পরোপকারী সুরেশের প্রতি লেখকের অপত্যস্নেহ সর্বাধিক বলে, তাকে দিয়ে নিরীহের ঘরপোড়ানো শরৎচন্দ্রের অনভিপ্রেত। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের চরিত্রসমূহও নাকি নিজের গলায় কথা বলে না এবং তাদের প্রতি পদক্ষেপ অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা স্বভাবের প্রতিবিম্বপাত, শরৎচন্দ্রে তাই স্বাধিকার-প্রমত্ততার কুলক্ষণ। এমনকি সাধারণ পাঠকও সে কথা বোঝে বলে লেখকের অনবধানেরই সুরেশ সম্পর্কে যে ধারণা তার মনে জাগে তাতে আর যাই থাক, শ্রদ্ধা বা অজুস্মার নামগন্ধ নেই। অধিকন্তু সুরেশের অধিকাংশ সংকাজই উপস্থাপনের অলিখিত অধ্যায়। এবং শেষের দিকে, যখন পৃথিবীতে তার যা যা করার ছিল সব শেষ হয়ে গেল, তখন রাত্রির কলঙ্ক থেকে তাকে উদ্ধারের জগ্না শরৎচন্দ্র এক উজ্জল মরণের উদ্ভাবনা করলেন, কারণ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে এইভাবেই অমরাবতীতে গৌছান যায়।

অন্যদিকে মহিমের অহুদারতা এবং জীবনবিমুখ আচরণের প্রতি লেখকের

ক্ষমাহীন মনোভাব সর্বত্র উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থে মহিমের উপস্থিতির কোন স্বতন্ত্র অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বভাবতই নির্দ্বন্দ্ব এই ব্যক্তি জীবনের বৃহত্তম সঙ্কটেও অবিচলিত। নষ্টনীড়ের ভূপতিকেও আমরা দেখেছি। সেই কর্মমন্ডল ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে যে ধ্রুবতারার বলে ভুল করেছিল। কিন্তু তারও হৃদয়ে একদিন ঝড় উঠলো এবং সেই ঝড় শান্ত করার জন্য মনের সঙ্গে বহু বোঝাপড়া তাকে করতে হয়েছে। আর মহিম? হাগুগুণের নিতান্ত অনটনে সে একটি অবিশ্রান্ত পুরুষ, স্রষ্টার ষড়যন্ত্রে অসহায়। আসলে সে কোনো চরিত্র নয়, সে স্বরেশেরই ভগ্নাংশ। স্বরেশের মধ্যে যে প্রাণধর্মের অস্বাভাবিক প্রাচুর্য, মহিমে তারই অমাহুষিক হাহাকার। হয়তো এদের দুজনের যোগফলেই মাল্লু স্বাভাবিক ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠে। কিন্তু প্রেমের ত্রিভুজ রচনার তৎপরতায় শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে জীবনের যে কিঞ্চিদধিক সম্পর্ক আছে, মনে হয়, শরৎচন্দ্র তাও বিস্মৃত হয়েছিলেন। ফলত গৃহদাহ শিল্পের বিরুদ্ধে একটি ক্ষমাহীন অপরাধের নমুনা হয়েই রইলো এবং দুঃসাহসিকতার যথেষ্ট প্রক্ষেপ সত্ত্বেও আধুনিক বাঙালী পাঠকের কাছে তা আর রুচিকর আবেদন আনে না।

কেননা সেই দুঃসাহসিকতা আসলে অশ্লীলতারই নামান্তর। সাহিত্য তখনই অশ্লীল যখন লেখকের আত্মপ্রকাশ কুণ্ঠার পদানত। কিন্তু একথা সমালোচকরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে চিত্রাঙ্গদা রূপকহীন বলেই অশ্লীল কেননা পরিচ্ছদই শালীনতা। কিন্তু সূধীশ্রেষ্ঠ ই. এম. ফর্টার 'ঘরে বাইরে'র মধ্যেই অশ্লীলতা দেখেছিলেন এবং সৌন্দর্যের কুণ্ঠাহীন প্রকাশে 'চিত্রাঙ্গদা' তাঁর দৃষ্টিতে সুস্থ এবং শালীন। প্রকৃতপক্ষে সার্ভের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ যখন অমূলক, তখন ভেবে পাওয়া যায় না কেন শরৎচন্দ্র স্বরেশ-অচলার সংরক্ত রাত্তিকে এতটা গোঁণ করে উপস্থিত করলেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরী' গল্পে রাত্তির ঘটনাটি স্মরণীয়। সেই সংরাগ যে কত তীব্র ও সুন্দর তা পাঠকমাত্রেরই জানেন। তাহলে কেন শরৎচন্দ্র নিষিদ্ধ প্রেমের দুঃসাহসিক অবতারণা করেও শিল্পের রম্যলোকে উত্তীর্ণ হতে পারলেন না? আসলে জনপ্রিয়তার মোহ যেমন তাঁকে পেয়ে বসেছিলো, অন্তরিক শিল্পীর সাধনা যে সত্যোচ্চারণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একথাও তিনি কখনো বোঝেন নি। আয়োজন সম্পূর্ণ করার তীব্র তাগিদে সব কিছুই আনলেন তিনি, কিন্তু কোনো ঘটনাই শিল্পের অক্ষয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হোলো না। তাঁর অবিভ্রাম চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ঘটলো না; বুদ্ধির অভাবে, ভাবালুতার সংযোগে তা, সূধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, প্রাকচলিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তর-চলিশ পৌরস্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো।

সবিনয় নিবেদন : শরৎচন্দ্র, উপন্যাস ও পুনর্বিচার

পল্লব সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে উপন্যাস-চিন্তার পুনর্বিচারমূলক দুটি প্রবন্ধ খুব সম্প্রতি পড়তে পাবার একটা সুযোগ ঘটেছে। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, “সাহিত্যের খবর”—শ্রাবণ সংখ্যায় ‘শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রবন্ধের মূলগত বিরোধিতা করে পূজা সংখ্যা “গল্পভারতী”তে আর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—‘উপন্যাসের পুনর্বিচার’। আধুনিক এবং প্রবীণ—এই দুই ভিন্নধর্মী সমালোচকের সাহিত্যিকবিরোধ স্বভাবতই বুদ্ধিজীবী-মহলে কিছু আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডঃ মুখোপাধ্যায় জীবনের কতকগুলি মৌল দার্শনিক তত্ত্বের অনুভাবনাকে উপস্থিত করেছেন। তাদের কোনো কোনোটির সঙ্গে বর্তমান লেখকের ঐক্যমত্য ঘটেনি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তিনি যে মাপকাঠিতে বিচার করেছেন, তার প্রতি আস্থা জানানো সম্ভব হচ্ছে। পক্ষান্তরে, শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমারবাবু উক্ত তত্ত্বগুলির সম্পর্কে স্লেষাত্মক নেতিভাব দেখিয়ে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে এই ধরনের পুনর্বিচার করায়। স্বভাবতই, শ্রীকুমারবাবুর উল্লিখিত সূত্রগুলিকে ধরে আরও এগিয়ে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

*

*

*

উপন্যাসের মধ্যে ঋষি-কবি-স্বলভ বিচ্ছিন্ন-জ্যোতির্বিদ্যু-নিবন্ধ-দৃষ্টির অভিক্ষেপ থাকতেই হবে এ যেমন ঠিক নয়, তেমনই আবার এটাও ঠিক যে, নৈর্ব্যক্তিকতার প্রতিভাসকে যদি উপন্যাসিক অস্বীকার করেন, তা হলে, তিনি নিজের আবেগ এবং প্রবণতাকে নিজের সৃষ্টির সঙ্গে সন্তায়িত করবেনই। এবং তা হলে কি, যে এপিক-ধর্মিতা উপন্যাসের প্রধানতম উপাদান, তার থেকেই বিচ্যুতি ঘটে না? ঐ নৈর্ব্যক্তিকতার অর্থ এই নয় যে, উপন্যাসিক ভুলে যাবেন তাঁর উপজীব্য সমাজ-সংসারের বস্তু-গ্রাহতা—বরং, তার অর্থ এই যে, সেই বস্তু-পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও তদতিরিক্ত ভাবনাকে তিনি প্রমূর্ত করবেন। একথা ঠিকই, সমসাময়িক যুগ ও জীবনের যথাযথ অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করবার

পর খুব কম কথাশিল্পীই ঐ ‘অতিরিক্ত ভাবনা’কে বাণীমূর্তি দিতে সক্ষম হয়েছেন। হয়ত, করাদুলি গণনায় সেই সব মহাশেষ্টাদের নাম উল্লেখ করা যায়। “কোনো উত্তত বেত্রদণ্ডের ছায় মানদণ্ড”-এর প্রয়োজন নেই, অনপভষ্ট বুদ্ধি দিয়েই বিচার করা যায় যে, একমাত্র সেই মহাশেষ্টারাই প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক। ‘ওআর এ্যাণ্ড পীস’ কি ‘রেজারেশন’ কি ‘ব্রাদার্স কারামোজোভ’ কিংবা ‘বাডেন ক্রকস’—এক বিশেষ দেশ-কালের কথা ঠিকই, কিন্তু সেই দেশকালাতিক্রমী এক সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক প্রেরণায় এগুলি সর্বমানবিক, মহাকাব্যিক হয়ে উঠেছে। এই প্রেরণা, শরৎচন্দ্রের লেখায় ত কোথাও ব্যক্ত হয়নি!

আদিকালীন ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের উল্লেখ করে শ্রদ্ধের শ্রীকুমারবাবু প্রশ্ন করেছেন যে, যে মাপকাঠিতে ডঃ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রকে ঔপন্যাসিকদের দ্বিতীয় সারিতে বসিয়েছেন, সেই মাপকাঠিতে বিচার করতে হলে এঁদেরও কি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করতে হয় না? আশা করি, ডঃ মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারে বর্তমান লেখকের সঙ্গে সমকণ্ঠ হয়ে বলবেন, হ্যাঁ, তাই হয়! ইংরেজী উপন্যাসের গোড়াপত্তন এবং প্রাথমিকবিস্তৃতি এঁরাই ঘটিয়েছেন, যদি একমাত্র এই যোগ্যতার জগুই এঁদেরকে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক বলতে হয়, তা হলে সেই একই যুক্তিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের, বাংলাদেশের সেরা গল্পলেখকের দল বলে মেনে নেওয়া চলে কিনা, শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমারবাবু তার বিচার করুন!

শরৎচন্দ্র, আবেগের কথাশিল্পী, হৃদয়ের সের জারক-জরানো জীবনবোধের কাহিনীকার, এ কথা আশা করি শ্রীকুমারবাবুও অস্বীকার করেন না। নৈর্ব্যক্তিক যে জীবন-প্রজ্ঞা না থাকলে প্রকৃত অর্থে ঔপন্যাসিক বা মহাকাবি হওয়া যায় না, সে প্রজ্ঞা শরৎচন্দ্রের লেখার কোন্‌খানে অনুভূত হয়েছে জানি না; শরৎচন্দ্রের সমস্ত জীবনের সাধনার মূল স্বরলিপিটি সক্রপণ-আবেগের সঙ্কেতচিহ্নে লেখা। আবেগ, হৃদয়ের ফসল; প্রজ্ঞা, মস্তিষ্কের। শুধু শারীরিকভাবেই মস্তিষ্কের সংস্থান হৃদয়ের ওপরে নয়, অনুভূতির দিক থেকেও প্রজ্ঞা, আবেগের চেয়ে মূল্যবান! তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি, মান, রুঁলা বা হাক্সলীর লেখায় হৃদয় নেই—একথা বলছি না, কিন্তু হৃদয়ের আদি-অনুভবগুলিকে ছাড়িয়ে, তাঁদের লেখায় হৃদয়োত্তীর্ণের অনাদি-অনুভবগুলির তাঁরা প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক।

আসল কথা, যুগচেতনায় প্রবুদ্ধ না হয়ে সমালোচনা করতে বসলে

স্বভাবতই সব কিছুই অবোধা লাগে। সেই অ-প্রবুদ্ধতারই ফসল-চিন্তা হল “ঔপন্যাসিকের পক্ষে কোন নূতন জীবনতত্ত্ব জানা বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে কোন বিশিষ্ট সমাজবিধৃত ও নীতিনিয়ন্ত্রিত জীবনকাহিনীর মধ্য হইতেই তিনি উহার গভীরতম তাৎপর্যটি নিকাশিত করিতে পারেন”, কি “আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুইজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের—বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের—এই সমাজশ্রয়ী প্রেরণা অতি শীঘ্রই এই আশ্রয়চ্যুত হইয়া উহার ভাবভিত্তি হইতে স্থলিত হইয়াছে”, কিংবা “নূতন খাতে আবেগের প্রবাহ দেখিতে দেখিতে মরা খাতে বস্ত্রার প্লাবনকে আরও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়”—প্রমুখ উক্তি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সবারই পরম শ্রদ্ধাপদ অধ্যাপক, সাহিত্য-আলোচনার সময়ে তাঁর কাছে আরও একটু দায়িত্বশীল বাচন কি নিতান্তই অতিরিক্ত কিছুপ্রত্যাশা? চলন্ত গাড়ীতে বসে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে গন্তব্যস্থানটুকু লক্ষ্য করার ঝামেলা পোহাতে হয় না ঠিকই, কিন্তু যে জায়গা ছেড়ে আসা হয়েছে সেটাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় দৃষ্টিপথ থেকে। ফলত, তখন সবটাই বিপরীত গতিতে চলছে বলে মনে হয়! স্বভাবতই, যেকালে মানুষ মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে, চাঁদে রকেট পাঠাচ্ছে, জীবন-মৃত্যুর রহস্যকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলছে—নূতন সমাজ ও অর্থনৈতিক বিদ্যাসকেন্দ্র সম্ভব করে তুলছে, সে যুগের মননশীলতাকে সচেষ্ট হয়ে অর্জন করা এবং তার পটভূমিতে জগৎ-জীবন এবং বিজ্ঞান-ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন করা কি একান্তই প্রয়োজনীয় নয় যে কোনও বুদ্ধিজীবীর পক্ষে? ঔপন্যাসিকের মত সমালোচক হতে গেলেও যে প্রথম সারিতে স্থান পাবার প্রয়াস পেতে হলে ঐ নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনা করতে হয়!

শরৎচন্দ্র যে যুগের এবং যে সমাজের চিত্রায়ন করেছেন, সে যুগ এবং সমাজ যে ক্রান্তিরেখায় বিলীন হয়েছে, শ্রীকুমারবাবু, নিজেই তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বগভীর অল্পভূতি এবং আবেগ দিয়ে সেই যুগ ও জীবনের চিত্রায়ণ করলেও, শরৎচন্দ্র তার মধ্যে কি এমন শাশ্বতবাণী রেখে গেছেন, যা দেশ-কালকে ছাড়িয়ে সর্বমানবিক হয়ে উঠেছে? একই ধরনের সমস্যা, একই ছাঁচের চরিত্র এমন কি একই কেতার সংলাপ তাঁর লেখায় বরাবর ঘুরে এসেছে—কোথায় সেখানে বহুবিচিত্র অল্পসংখ্যকী অথচ নিরাসক্ত এষণার সমাহার? বিচিত্র মানুষ, বিচিত্রতর চরিত্র এবং সমস্যার সম্মুখে যে সাবিক বোধ উদ্দীপিত হয় ‘ওআর এ্যাণ্ড পীস’, ‘আনা কারেনিনা’, ‘ক্রুৎসার সোনটা’ কি ‘রেজারেক্সন’ পড়ে—তা কি ‘দত্তা’, ‘নিষ্কৃতি’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘বড়দিদি’ কিংবা ‘গৃহদাহ’ পড়ে

পাই ? একই ধরনের থল এবং কুচক্রী গ্রাম্য মাতব্বর এবং দল্জাল-বুদ্বা, একই ছাঁচে ঢালা মাতৃমূর্তি এবং একই ফরমুলার বোবা-প্রেমের কি অসার্থক-মিলনের বাঁধা গং ছাড়া সেখানে আর যা শুনেছি, তার মূল্য কতটুকু ?

‘ওআর এ্যাণ্ড পীস’, ‘রেজারেজ্ঞন’ প্রমুখ উপন্যাসের কথা না হয় না-ই ধরলুম। এদের চেয়ে বহু পরিমাণে স্বল্পখ্যাত ‘ব্ল্যাক সোআন’ উপন্যাসের কথাই উদাহরণ হিসেবে না হয় বলি। মানের ‘ম্যাজিক মাউন্টেন’ কি ‘বাডেন ব্রকস’ প্রমুখ অগাচ্ছ বিখ্যাততর উপন্যাসের কথাও না হয় এ প্রসঙ্গে ভুলেই গেলুম। তাতেই বা কি ? ‘ব্ল্যাক সোআন’র যে ট্রাজিক অহুভব—তার সমতুল কোনও উল্লেখ কি গোটা শরৎ-সাহিত্যে কোথাও মিলবে ? বিগতযৌবনা নারীর হৃদয়ে জেগেছে অসামাজিক প্রেম ; পুত্রকল্প একটি ছেলের প্রেমে পড়ে প্রৌঢ়া নারীর অহুভূতি হচ্ছে যৌবন সতেজতার। তাঁর সম্ভানরা বাধা দিতে গিয়েও বিফল হয়েছে—কেননা, প্রৌঢ়া যুবতী নারীর শারীরধর্মও ফিরে পেয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর প্রেমই যৌবনকে ফিরিয়ে এনেছে। জীবনকে নতুনভাবে ভালবাসতে শিখেছেন তিনি।.....এই পরম-প্রাপ্তির মুহূর্তে তিনি জানতে পারলেন যে শারীর-লক্ষণকে তিনি যৌবনের পুনরাগমনের আশ্রয়সাধনা বলে মনে করেছিলেন—তার হেতু হল গর্ভাশয়ের দুরারোগ্য ক্যান্সার। উন্মুখ হৃদয়কে মর্মান্তিক হাহাকারে চুরমার করে দিয়ে গেল এই সংবাদ।....এই ট্রাজিক অহুভূতি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন কি ? কিন্তু যে প্রগাঢ়-প্রশান্ত অনীহায় মান এই কাহিনী বলে গেছেন, এই ট্রাজেডীকে দেশ-কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সর্বমানবিক করেছেন—তার তুলনা শরৎ-সাহিত্যে কোথায় ? অচলা কিংবা সুরেশের অচরিতার্থ প্রেমের জ্ঞান সহৃদয় পাঠক-হৃদয়ে সংবেদনশীলতা স্পন্দিত হয় ঠিকই কিন্তু তার স্থায়িত্ব এবং গভীরতা কতখানি এই কাহিনীর তুলনায় ?

শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীকুমারবাবু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ঘাটতির দিকটাকে তুলে ধরেছেন। সে সবটুকু স্বীকার করলেও কি শরৎচন্দ্রের মাহাত্ম্য বাড়ে ? শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে যাননি ; রবীন্দ্রনাথও প্রায় তাই। কিন্তু, তবু রবীন্দ্র-উপন্যাসে একটা দার্শনিকতার আবহ-সঙ্গীত রপিত হয়ে তাকে অনেক সময়েই মহাকাব্যিক স্পন্দনা দিয়েছে। আর ঠিক এই জিনিসটিরই অভাব শরৎ-উপন্যাসে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও বহু-বহু সময়ে রোম্যান্সের পাখনায় ভর দিয়ে সর্বমানবিক অহুভূতির স্তর স্পর্শ করা যায় ; তা-ও ত শরৎচন্দ্র নেই ! বঙ্কিমচন্দ্র ‘এথিস্ট’কে বড়

করেছেন ; শরৎচন্দ্র করেছেন ‘কমপ্লেন’কে ; ‘রবীন্দ্রনাথ’ই ‘ডিট্যাচড্’—এই তিন স্রষ্টার মধ্যে । তাই সীমায়তনভাব তাঁর লেখার মধ্যে যতটাই থাক না কেন— আজও বাংলাসাহিত্যের সেরা ঔপন্যাসিক তিনিই ।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এসব যুক্তি মানবেন কিনা, জানি না । তবে, যে ‘theory পরিকল্পিত’ ছকে সাহিত্যবিচারের তিনি এত ঘোর বিরোধী, সম্ভ্রানে সেই ‘theory পরিকল্পনা’ (তাও বকেয়া !) থেকে তিনি নিজে বেরিয়ে আসতে পারলে অস্বীকার করার কোনও হেতু নেই । তা ছাড়া স্ব-বিরোধিতা ত সমালোচকের পক্ষে সদৃশ নয় !

শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করতে গিয়ে, শ্রীকুমারবাবু বাঙালী স্বভাবের আবেগ-প্রবণতার দোহাই দিয়েছেন । এটাও কি ঠিক হল ? আত্ম-নির্ভর জাতীয় অর্থনৈতিকভিত্তি এবং এক বিশেষ শ্রেণীর সুপরিণত মনীষার ফলশ্রুতিই যে উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টার সহায়ক—একথা শ্রীকুমারবাবুকে আমার স্মরণ করিয়ে দেওয়া দুঃসাহস ঠিকই ; কিন্তু সবিনয়ে সেই সাহসের প্রকাশ ঘটতে গিয়ে দ্বিধা করবারও কোনও কারণ দেখি না । ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার যতটা বিকাশের ফলে যুগ ও জীবন, মহীকহের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং তারই ইতিহাস হিসাবে উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টি হয়—সেই বুর্জোয়া-অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির বিকাশ বাংলাদেশে আজও পুরোপুরি হয়নি । এই অর্থনৈতিক সত্যকে খোলামনে মেনে নিলেই বাংলাসাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের ফসল, গোলা ভরে জমা হয়নি কেন, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না ।

পরিশেষে একথা বক্তব্য শ্রীকুমারবাবু লিখেছেন, “যিনি অবলীলাক্রমে শরৎচন্দ্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামাইবার পক্ষে রায় দেন, সমালোচক হিসাবে তাঁহার নিজের কোন শ্রেণীতে স্থান তাঁহাও সংশয়াতীত নহে—”

—বাংলাসাহিত্যে গুড়গুড়ো ভট্টাচার্য মশায়ের যুগ কিন্তু প্রায় একশ বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে !

পাণ্ডিত্যের মত শ্রদ্ধাও নিজেই অর্জন করতে হয় ।

উপহারে

‘বেঙ্গল’এর বই দ্বিতীয়রহিত !

সাহিত্যের রীতি ও শরৎচন্দ্রের আত্মকথা

নগিন্তা সেন

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে শরৎচন্দ্র বিনয় সহকারে জানিয়েছিলেন—

“সাহিত্য-সেবাই আমার পেশা, কিন্তু ইহার যাচাই-বাছাই ঘষা-মাজার ব্যাপারে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ, একথা আমার মুখে অদ্ভুত শুনালেও ইহা বাস্তবিক সত্য। কোন ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় করে সাহিত্য-পদ নিষ্পন্ন হয়েছে, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, রসবস্তুটি কি, কাকে বলে সত্যকার আর্ট, কি ইহার সংজ্ঞা, আমি কিছুই এ সকলে জানি না। সুতরাং তথ্যপূর্ণ গভীর গবেষণার লেশমাত্রও আমার কাছে আপনারা আশা করবেন না।”

তাঁর নিজের দেওয়া এ কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও বলতে হয় যে, সাহিত্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার গুরুত্ব কম নয়। তাঁর ‘ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্য’, ‘সাহিত্য ও নীতি’, ‘সাহিত্যে আর্ট ও ছুঁনীতি’, ‘আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ’, ‘সাহিত্যের রীতি ও নীতি’ ইত্যাদি প্রবন্ধ, পত্রসংকলন ও অগ্ৰাগ্র নানাবিধ রচনায় ইতঃস্তত-বিক্ষিপ্ত তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত মন্তব্যাদি এ যুগে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের সেই সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করা গেল।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যে গুরুবাদ মানতেন। বাংলা ঔপন্যাসিকদের গুরুস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-নিবেদনের কোন ক্রটি ছিল না। কিন্তু অন্ধভক্তির মোহে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি বলেছেন—

“.....বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধাবোধ করি নাই।”

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সম্পর্কিত মতবাদের প্রতিবাদেও তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন। তবে একথা স্বীকার করতেই হয়—বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-আদর্শের যে উচ্চ কোটিতে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র সে সামর্থ্যের অধিকারী নন। তাঁর অল্পভূতিপূর্ণ চিন্তাভাবনায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের

মননশীলতা, বিস্তৃত জ্ঞান ও জীবনবোধের স্বাক্ষর তেমন প্রত্যক্ষ নয়। তবু তাঁর সহজ সরল মতবাদের গভীরতা মনকে অভিভূত না করে পারে না।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমে সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশনায় তাঁর অভিমত জেনে নেওয়া দরকার। সাহিত্য কাকে বলে?—

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

“সাহিত্যের গোড়ার কথা হল সহিত থেকে অর্থাৎ সকলের সহিত সহানুভূতি দরকার। এইটাই মূল কথা।”

কিন্তু শুধু “সমাজের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই” সাহিত্যে নয়, “ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ।” অর্থাৎ সাহিত্যে তিনি জীবনের সংকীর্ণতার উদ্ধার কামনা করেছেন। এ ছাড়া সাহিত্যের আরো একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির উন্নয়ন ও সংগঠনকার্য সাধন করা। সাহিত্যের এই কল্যাণকর দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি আবার বলেছেন যে—

“.....সাহিত্যরসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুখমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্যরসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।” অবশ্য “হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্ঘ্য থাকে বিকশিত হইয়া না উঠিলে” যে কোন কিছুই সাহিত্যপদবাচ্য হয় না, সে কথা তিনি স্বীকার করে গেছেন।

সাহিত্যতত্ত্বের এই আলোচনায় স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে সাহিত্যসাধনায় তিনি কোন পথের পথিক? অর্থাৎ আদর্শবাদ না বস্তুতান্ত্রিকতা কোনটি তাঁর অভিপ্রেত। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক—

“গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, idealistic and realistic। আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুই নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি করে যে এই দুটোকে ভাগ করে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙরা জিনিসই ঘটে, তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে?”

সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁর কাম্য হলেও তিনি যে নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর বিভিন্ন পত্র ও প্রবন্ধে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বার বার জানিয়ে গেছেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ‘উত্তর’ পত্রিকায় আবার সংখ্যার তাঁর ‘চরিত্রহীন’ উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

“সত্য আর সাহিত্য আলাদা। সত্য সাহিত্যের বনেদ, কিন্তু সেটাই সব নয়। সাহিত্য একটা শিল্প—যেমন করে মাজালে মানুষের মনে একটা দাগ ফেলতে পারে, যা অনেকদিন থাকে।”
এ বিষয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তিনি অনেক জায়গায় ব্যক্ত করেছেন—

“.....সংসারের অদ্ভুত কিছু একটা জানাই সাহিত্যিকের বড় উপকরণ নয়। আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।”
এই অপরিমিত দরদর স্পর্শই তো শরৎসাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা রোমাণ্টিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবে একথাও ঠিক যে, শরৎচন্দ্র আদর্শবাদের উগ্র পৃষ্ঠপোষক নন। তাঁর রচনায় তিনি খুব কমই বড় আদর্শবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। বরং সহজ সরল মানুষের অন্তরলোকে প্রবেশ করে তার সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার ইতিহাস উদ্ঘাটনেই তাঁর বেশি আগ্রহ। এ সম্পর্কে ভাল মন্দের বিচার তিনি করেন নি।

“.....মন্দের ওকালতী করিতে কোন সাহিত্যিকই কোনদিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়।”

মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে দেখা এবং তার মনুষ্যত্বকে মুখ্যায়িত করাই শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বড় আদর্শবাদ। সাহিত্যসাধনায় এই হোল তাঁর মূলমন্ত্র। তবে ideal এবং real এ দুয়েরই সমন্বয় উপন্যাসে তিনি কামনা করেছেন—

“.....সম্প্রতি কেউ কেউ অভিযোগ উত্থাপিত করচেন যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেচে। একটাকে বাদ দিয়ে

আর একটা হয় না, অস্তুতঃ উপগ্রাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন ধার ঘেঁসে চলবে সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও কৃতির উপরে।”

এ ছাড়া সাহিত্যের আরও একটা দিক আছে। শরৎচন্দ্রের ভাষায় সেটা ‘বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু’ অর্থাৎ সাহিত্যের নীতিশিক্ষার দিক।

“বিষ্ণুশর্মার দিন থেকে আজও পর্যন্ত আমরা গল্পের মধ্যে থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে কোন ক্রটি হলে আর আমরা সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এই দিককার বাঁধ ভেঙ্গেই তা হুকার দিয়ে ছোটো। প্রশ্ন হয়, কি পেলাম কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হ’ল? এই লাভালাভের দিকটাতেই আমি সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিতে চাই।”

কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতে সাহিত্যিক সমাজসংস্কারক বা নীতিবাদ নন। তাই সাহিত্যে নীতির মান বজায় রাখতে গিয়ে যদি সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্য-সত্তাকে বলি দেন তবে তাতে যে শুধু সাহিত্যের অপমান হবে তা নয়, সাহিত্যিকও সাহিত্য-শ্রেণীচ্যুত হবেন। কারণ—

“মানবের স্বগভীর বাসনা, নরনারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচকে কি করে।

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে।.....”

প্রসঙ্গত তিনি তাঁর “পল্লীসমাজ” উপগ্রাসের বিরূপ সমালোচনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেকালের সমালোচকদের মতে এত বড় দুর্নীতিকর বই আর নেই। রমার অপরাধ সে বিধবা হয়ে রমেশকে ভালবেসেছিল। যতীন্দ্রমোহন সিংহ রমাকে কটাক্ষ করে তাই তাঁর “সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা” বইএ বলেছিলেন—

“তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কিনা তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি! ছিঃ!”

এ সম্পর্কে অগ্র একজন বিশিষ্ট সমালোচকও মন্তব্য করেছিলেন যে, এই

দুর্নীতি প্রশ্রয় পেলে হিন্দুসমাজ রসাতলে যাবে।' এই কথাই জবাবেই শরৎচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন—

“এ ধিক্কার art এর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে 'এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।”

তঁার ‘চরিত্রহীন’কে আরও দুর্ভাগ্যবান বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দিবাকর-কিরণময়ীর প্রসঙ্গে সমালোচনার স্মৃতিস্ক্র বাণের আঘাতও তাঁকে কম সহ্য করিতে হয়নি। তবু নীতির যুপকার্ঠে মানবিক কামনা-বাসনার হত্যা প্রত্যক্ষ করতে রাজি হন নি। বরং তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন—

“.....‘চরিত্রহীন’ এর নাম। তখন পাঠককে ত পূর্বাঙ্কেই আভাস দিয়াছি—এটা স্মৃতিস্ক্রকারিণী সভার জন্মও নয়, ফুলপাঠ্যও নয়। টলটলয়ের ‘রিসরেকশন’ তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুঃচরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ নাই?.....”

বন্ধিমের এই উপস্থাপনাটি সম্বন্ধে তাঁর সবচেয়ে বেশি অভিযোগ চিরকাল ধুমায়িত হয়ে উঠেছে। রোহিণী-হত্যার অপরাধ থেকে তিনি বন্ধিমকে অব্যাহতি দিতে পারেন নি।—

“.....ছেলেবেলায় ‘কৃষ্ণকান্তের উইলের’ রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না। ভালই হ’ল। হিন্দুসমাজও পাণ্ডুর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন—নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয় দুঃখে সমবেদনায় বন্ধিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।.....

...হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু ম’ল যে আর তার সুস্থ সত্যসুন্দর art। উপস্থাপনের

চরিত্র শুধু উপস্থাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানিতে তার মরা চলে না।”

বন্ধিমচন্দ্র সে যুগে সমাজের দিকে চোখ রেখে নীতি বাঁচিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু এ যুগের লেখকদের সেখানে থেমে থাকলে চললে না, তাঁদের সত্যকথা বলতে হবে। এবং সেজন্ত যদি সমাজের ক্ষত দেখাতেই হয় তবে শরৎচন্দ্রের মতে তা করাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র শুধু প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারের সংরক্ষণে মনোযোগী ছিলেন না, তিনি ভাঙতেও চেয়েছিলেন, গড়তেও চেয়েছিলেন।—

“.....আজকাল একটা তর্ক উঠেছে—আমরা দুর্নীতি প্রচার করছি, যা খারাপ, মন্দ তাই সব লিখছি।.....আমি এমন জিনিস এনেছি, যা আগে ছিল না, যা নাকি অত্যন্ত নোংরা। অবশ্য আমি মনে করি না যে সব সত্যই সাহিত্যে স্থান পেতে পাবে। অনেক কুৎসিত ব্যাপার আছে, যাতে সাহিত্য হয় না। আমি পাপীর চিত্র এঁকেছি। হয়তো পাপ তাঁরা করেছেন, তাই বলে খুনী আসামীর মত তাঁদের ফাঁসি দিতে হবে নাকি? মানুষের আত্মার আমি অপমান করতে পারি না। কোনো মানুষকেই নিছক কালো মনে করতে আমার ব্যথা লাগে। আমি ভাবতে পারিনে যে একটা মানুষ একেবারে মন্দ, তার কোন redeeming feature নেই।”

মানুষের প্রতি এই সহানুভূতিবশতঃ তিনি বন্ধিমের মত সমাজ-শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন নি। বরং বলেছেন যে—

“.....বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পছলে এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয় ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল।”
অবশ্য আশার কথা যে নীতির মানদণ্ড সব যুগে এক থাকে না। তবে নীতির প্রসঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে চিরকালই একটা প্রধান সমস্যা এবং তার সমাধানে শরৎচন্দ্রের এই অভিমতগুলি যে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নয় সে কথা মনে নেওয়ায় কোন কুণ্ঠার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

সাহিত্য-সংসারের আরো একটা প্রধান মতবাদ art for arts' sakeকেও শরৎচন্দ্র নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর ১৩৩৮ সালে লেখা একটা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন—

“.....তোমার মতই আমি ঐ বুলিগুলো মানিনে। যেমন art for art's sake, ধর্ম for ধর্মের sake, truth for truth's sake

ইত্যাদি। Art-এর উপলব্ধি সকলের এক নয়, ওটা ভিতরের বস্তু, তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যাওয়া এবং তারই পরে এক ঝোঁকা জোর দেওয়া অবৈধ। ধর্ম, truth প্রভৃতি শুধু কথাই নয় তার চেয়ে বেশি কিছু। এটা সর্বদা মনে রাখা চাই। গল্পের উদ্দেশ্য যদি চিন্ত-রঞ্জন করাই হয় তবুও এই factটা থাকে যে ওটা দুটো কথা চিন্ত এবং রঞ্জন।”

তিনি যদিও একমাত্র বস্তুকেই স্বীকার করেন নি তবু স্বন্দরের জগতই সাহিত্যের একক অস্তিত্ব তাঁর সমর্থন লাভ করতে পারে নি। এক্ষেত্রে তিনি সমন্বয়বাদী অর্থ্যাৎ স্বন্দর এবং অস্বন্দর দুয়ের সহাবস্থানই তাঁর সাহিত্য-ধর্ম।

এই সমস্ত নানা মতবাদের চর্চা ছাড়াও শরৎচন্দ্র উপন্যাসের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে যে সব নির্দেশ দান করেছেন তা এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে এক সময় বলেছিলেন—

“.....যা নিজের জীবনে অভিজ্ঞতা দিয়ে সত্যি হয়ে উঠবে—অবিশ্বাস কল্পনা থাকবে, তাই হবে সাহিত্য-বস্তু। নিজের আয়কে অতিক্রম করে ব্যয় করতে যেও না।”

ঔপন্যাসিকের পক্ষে এ ছুটি উপদেশ মূল্যবান সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রও এই গুরুবাক্য শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। আর অভিজ্ঞতা যে ঔপন্যাসিকের অতি বড় সম্পদ সে সম্পর্কেও তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না।—

“বাড়ীতে বসে আর্মচেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না” এবং “সত্যিকার জীবন দেখতে গেলে শুচিবাইগ্রস্ত হলে চলে না।”

শুধু জীবনই নয় সেই সঙ্গে “মানুষের ভিতরের সত্যটা realise করাই” তাঁর অন্ততম উদ্দেশ্য বলা যায়। তারও জগৎ দরকার প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা।

কিন্তু উপন্যাস রচনায় তিনি ছিলেন প্রেরণাবাদে বিশ্বাসী, স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকলে যে কেবল ফরমাস দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করা যায় না তা তিনি ভালই উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিলের এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

“এক ছত্র লেখা বার হয় না এ কি বিশ্বেশ দেশ। গত ৪৫ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি আর ঘণ্টা দুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি।

এখন মনে হচ্ছে বুঝি বা আর কখনো লিখতেই পারবো না।”

প্রেরণায় ভাঁটা পড়ায় সে সময় তিনি যে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এ থেকে তা বুঝতে পারা যায়। অবশ্য এ কথা সত্যি যে গল্প উপন্যাস সাহিত্যিকের অখণ্ড অনুভূতিরই ফলশ্রুতি, খণ্ড বিচ্ছিন্ন চিন্তার দান নয়।

তবু সাহিত্যিককে যথাসাধ্য নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে। তাঁর উপলব্ধির বস্তু যে কেবল তাঁরই ব্যক্তিগত বিষয় নয় তা যে সার্বজনীন বোধের আশ্রয় একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। শরৎচন্দ্র সে বিষয়েও ঔপন্যাসিকদের সচেতন থাকবার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

“ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চোকা জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচারবুদ্ধির পরে। নিজে কে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দেশ পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির perspective এবং সাহিত্যের perspective কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তা ছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়।”

এই perspective সম্পর্কে উপযুক্ত বোধের অভাব যে অতিবড় সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যর্থতার কারণ হতে পারে তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

এরপর স্বভাবতঃই ঔপন্যাসের বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গ ভাবতে হয়। ঔপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ তার কাহিনী। কিন্তু এখানেও শরৎচন্দ্র প্রেরণাবাদে আস্থাশীল। কারণ এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সহজাত ব্যক্তির অধিকারী। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার বশে কাহিনী তাঁর লেখনীমুখে অনায়াস গতিতে এগিয়ে যেত—

“অন্তান্ত গ্রন্থকারদের যা নিয়ে বিপদ—প্লট পায় না—সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় না।...মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে কোটাইবার জন্ত প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।”

চরিত্র প্রস্ফুটন ব্যাপারে তিনি অভিজ্ঞতার উপরই বেশি নির্ভর করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত উপদেশবাক্য স্মরণ করে বলতে হয়—

“চোখে দেখে যা পরথ করবে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়।”

তাছাড়া—

“সত্যের উপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। বনেদ নিরেট হলে আর ভয় নেই—যাই বললে অস্বাভাবিক অমনি বদলে ফেলতে হয় না। আমি যে চরিত্র দেখেছি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তার যে পরিণতি তাই লিখেছি। তাই আমার ভয়ের কারণ নাই। লোকে সেগুলোকে অস্বাভাবিক বললেই আমি মানব না।”

চরিত্রের সার্থকতা আবার কিছুটা নির্ভর করে তার সংলাপের উপর। কারণ সংলাপের মধ্যে নিয়েই পাঠকের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান ঘটে থাকে। এই সংলাপরচনায় শরৎচন্দ্র ছিলেন বিশেষ মনোযোগী। কিন্তু তাঁর সংলাপে রবীন্দ্রিক মনন ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধর্মিতা যে বেশি প্রশ্রয় পায়নি তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য বিভূতিভূষণীয় অনাড়ম্বর সংলাপের রীতিও তাঁর আদর্শ পথ নয়। এদিক থেকে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের মধ্যবর্তী বলা যায়। অর্থাৎ তাঁর সংলাপে চমক থাকলেও তাতে হৃদয়বৃত্তির তুলনায় দৃষ্টিবৃত্তির একক প্রাধান্য গ্রাছ হয়নি। তাঁর মতে সংলাপের সার্থকতা প্রধানতঃ নির্ভর করে তার আবেদন-সামর্থ্যের ওপর—

“কথাকে কেমনভাবে বলতে হয়, কত সোজা করে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে” ..

সেই প্রচেষ্টাই তিনি উপন্যাস-লেখকের কাছে প্রত্যাশা করেছেন। এ ছাড়া তিনি আরো বলেছেন যে—

“Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই,—কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশি বলেছে। এই হ'লো artistic form-এর ভিতরের রহস্য। প্রথমে হয়ত মনে হবে আমার সব কথা বলা হল না, পাঠকেরা বোঝেই ঠিক বক্তব্যটি ধরতে পারবে না, কিন্তু এখানেই হয় লেখকের মস্ত ভুল। না বোঝে বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু বেশি বোঝাবার গরজ না লেখকের প্রকাশ পায়।”

উপন্যাসের কলাকৌশলের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সংশয়ের পক্ষপাতী। কারণ তাঁর মতে “লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়।” তাই—

“অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত।”

এই ইঙ্গিতধর্মিতা যে বড় সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয় এতে পাঠকের মনও স্বচ্ছন্দ বিহারের কিছুটা অবকাশ লাভ করে।

আবার লেখকের সৃষ্টির প্রয়াস যাতে তাঁর রচনায় প্রকট হয়ে না ওঠে সেদিকেও তিনি বেশ সতর্ক ছিলেন। শিল্পসৃষ্টির সবচেয়ে বড় কথা যে সৃষ্টি ব্যাপারে আয়োজন-আড়ম্বর ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন রাখা, এ তথ্য তিনি বিস্মৃত হন নি। তাই লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

“...এই আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে।

ওদের এমনি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না এলেই নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল।”

তাঁর মতে উপত্যাসের আরো একটা প্রধান রীতি হচ্ছে—উপত্যাসের প্রারম্ভ সূত্র ও সংহত হওয়া প্রয়োজন যাতে “পড়ার interest গোড়ার দিকে অন্ততঃ যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।”

পরিশেষে লেখকদের তিনি সর্বাধিক এই কথাটাই মনে রাখবার অনুরোধ জানিয়ে গেছেন যে—

“গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি সমস্তই।”

॥ ‘বেঙ্গল’এর নানান জাতের বই ॥

তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আমার কালের কথা ১ম খণ্ড : ২য় মুঃ ৪.০০ ॥

কুমারেশ ঘোষের	নারায়ণ সান্ত্বালের	
সাগর-নগর ৩.৫০ ॥	মনাম্মী	৪.০০ ॥
কণাদ গুপ্তের	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
অবরোধ ২.৫০ ॥	মাথুর ২য় মুঃ	৪.০০ ॥
নারায়ণ চৌধুরীর	শশিভূষণ দাসগুপ্তের	
বাংলার সংস্কৃতি ৩.০০ ॥	ব্যান ও বজ্রা	৩.০০ ॥

হুমায়ুন কবিরের

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩য় মুদ্রণ ৩.৫০ ॥

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল—রক্তস্রাবের মধ্য দিয়েই ভাতৃহত্যার রক্তে সেদিন ভারতের ভূমি সিক্ত হয়েছিল। তারপর অনেক দুঃখবেদনাশ্রুর পথ পেরিয়ে আমরা প্রগতিশীল গণতন্ত্রের পথে চলেছি। স্বখে দুঃখে পনেরোটি বছর কেটে গেছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণে নবোত্তম ভারতরাষ্ট্র সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এমন সময় এলো মর্যাস্তিক আঘাত। শাস্ত্র হিমালয় আজ অশান্ত। গত ২০শে অক্টোবর (১৯৬২) চতুর চীনা ড্রাগন নখজংঘা মেলে লাদাখ ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে সশস্ত্র অভিযান শুরু করেছে। গত দুমাসে দ্রুত পটপরিবর্তন হয়েছে। সীমান্তরক্ষার জন্য সমগ্র ভারতকে সশস্ত্র থাকতে হবে ও বহু বৎসরের জ্ঞান সামরিক শক্তিরূপে আপন যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। এই নব পটভূমিতে আমাদের জীবনযাত্রাকে ঢেলে সাজতে হবে; হিংস্রকুটিল চীনা সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করতে হবে; ঘরের শত্রুকে বিনাশ করতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—বর্তমানে এই আমাদের ভাগ্যলিপি। আমাদের সকল উন্নতি কিছুটা ব্যাহত হবে। শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির উপর এই নোতুন অবস্থার প্রতিক্রিয়া ক্রমশই স্পষ্টতর হবে বলে মনে হয়। এখন সশস্ত্র প্রতিরোধের সংকল্প আমাদের চিন্তকে আচ্ছন্ন করেছে। সাহিত্যকর্মীদের সামনে এক নোতুন কর্তব্যের ডাক এসেছে। স্বভাবতই আমাদের সাহিত্যচর্চাকে স্বাধীনতারক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিযুক্ত করতে হবে, সরকারকে দিতে হবে সমর্থন, সাধারণকে উৎসাহ। এই চীনা আক্রমণের ফলে ভারতে সাম্যবাদী চিন্তার অবসান ও দেশপ্রেমী গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রতিষ্ঠা হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু নভেম্বরের এক সংসদ-অধিবেশনে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন : চীনের এই আকস্মিক আঘাত 'সহসা ভারতের মুখ থেকে এক যবনিকা সরিয়ে ফেলেছে—দেখতে পাচ্ছি এই দেশের তাক্ষণ্য দুবার। এই জাতি প্রাণচঞ্চল। গত কয়েকদিনের মধ্যে দেখতে পেলাম ভারতের আত্মসমাহিত দৃঢ় মূর্তি।'

আজ আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ প্রতিজ্ঞায় ক্ষোভে রোষে চঞ্চল। সারা দেশ আজ ‘এক জাতি এক প্রাণ একতা, জাগে নব ভারতের জনতা’। দুৰ্দ্ধ কৰ্তব্যের পথে দুঃসহ কঠোর বেদনায় আমরা আজ জেগে উঠেছি। ভারতের জয় হোক !

* * * *

ষাট বৎসর বয়স্ক জনপ্রিয়তম মার্কিন ঔপন্যাসিক জন স্টাইনবেক এই বৎসর সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ষষ্ঠ মার্কিন সাহিত্যিক যিনি সাহিত্যে এই পুরস্কার পেলেন। অপর পাঁচজন হলেন উইলিয়ম ফকনার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, সিনক্লয়ার লুইস, পার্ল বাক, ইউজিন ও’নীল।

স্টাইনবেকের সমাজদর্শন বৈশিষ্ট্যময়—সমাজের অন্তর্য্য অবিচারের আঘাতে বিচলিত ও তাকে প্রত্যাঘাতে উত্তত এই সমাজদর্শন লেখককে দরদী শিল্পী বলে পরিচিত করেছে। তাঁর ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসও দরদ-মেশানো। তাঁর গল্প-উপন্যাসে আবেগ, দরদ ও আন্তরিকতা প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়।

এ-যাবৎ স্টাইনবেক সাতাশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর খ্যাতি জগৎব্যাপী হয়েছে ‘দি গ্রেপ্স অব্ র্যাথ্’ (১৯৩৯) উপন্যাসটির জন্ত। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের জন্ত তিনি আমেরিকার পুলিৎসার-পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মার্কিন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার সম্ভাবনা-ভরা রাজ্যের উদ্দেশে পালিয়ে-আসা কয়েকটি দেশান্তরী পরিবারের গভীর মর্মস্পর্শী কাহিনী এই উপন্যাসের অবলম্বন। “ইন্ ডিউরিয়াম ব্যাটল্” (১৯২৬) ও “অব্ মাইন্স্ অ্যাণ্ড মেন্” (১৯৩৭) গ্রন্থদ্বিতে শ্রমিক-জীবনের প্রতি লেখকের দরদ প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু পরবর্তী রচনাসমূহে স্টাইনবেকের এক নোতুন পরিচয় পাওয়া গেল। “টোটিলা ফ্ল্যাট” (১৯৩৫), “ক্যানারি রো” (১৯৪৪) ও “সুইট থার্সডে” (১৯৫৪) উপন্যাস-তিনটিতে আরেক লেখকের দেখা পাই—জীবন সম্পর্কে এক নোতুন দৃষ্টি এগুলিতে ধরা পড়েছে। এগুলিতে ক্যালিফোর্নিয়ার সাগরকূলের কয়েকটি সাধারণ চরিত্রের দেখা মেলে যাদের মূল মাটির গভীরে প্রেথিত।

স্টাইনবেকের প্রথম উপন্যাস—“কাপ অব্ গোল্ড” (১৯২৯), “দি প্যাসচার্ন্স অব্ হেভেন” (১৯৩২), “টু এ গড আননোন” (১৯৩৩)। এগুলির সঙ্গে “টোটিলা ফ্ল্যাট” প্রভৃতি গ্রন্থের মিল নেই। আবার “গ্রেপ্স অব্ র্যাথ্” উপন্যাসের ধারাও তিনি পরিত্যাগ করেছেন। “দি লঙ্ ভ্যালী”, “দি পার্ল” প্রভৃতি পরবর্তী রচনায় নব ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু “ওয়েওয়ার্ড বাস”

সম্পূর্ণ অন্তর্ধরণের উপন্যাস। তাঁরপরই এলো “ইস্ট অব ইডেন”। স্টাইনবেক অশান্ত ও নিয়ত পরিবর্তনশীল লেখক। তাঁর সম্পর্কে সমালোচকেরা কখনো একমত হতে পারেননি। “দি উইন্টার অব আওয়ার ডিসকন্টেন্ট” ও “ট্রাভেলস্ উইথ্ চার্লি ইন্ সার্চ অব আমেরিকা” (১৯৬২)—সম্পূর্ণ নোতুন ধরণের রচনা, একটার সঙ্গে অপরটার মিল নেই। খ্যাতি, অখ্যাতি ও পুনরায় খ্যাতি স্টাইনবেক লাভ করেছেন। কিন্তু বারবার পথ পরিবর্তনে তাঁর শ্রাস্তি নেই। কত বিচিত্র তাঁর রচনা।

“ওয়েওয়ার্ড বাস”এ পথের ধারে এক ভোজনশালায় সারারাত ধরে আটকে-থাকা একদল বিভিন্ন মেজাজের মানুষের কাহিনী উপস্থিত করা হয়েছে। শেষ লেখা—“ট্রাভেলস্ উইথ্ চার্লি ইন্ সার্চ অব আমেরিকা”তে নায়ক স্বয়ং লেখক। আধুনিক মার্কিনীদের একান্ত পরিচয়লাভের জন্ত চার্লি নামে একটি ফরাসী কুকুরকে সঙ্গী করে নায়কের সারা দেশে পরিভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী স্টাইনবেক এই গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন। যে-সব সমালোচক ইতিহাস ও পৌরাণিক উপাখ্যানের মিশ্রণে রচিত “ইস্ট অব ইডেন” পড়ে বিরক্ত হয়েছিলেন, তাঁরাই স্টাইনবেকের শেষ দুটি রচনা পড়ে মুগ্ধ রয়েছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফ্রেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যালিনাসে স্টাইনবেকের জন্ম। স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও লৌকিক উপাখ্যানের প্রতি বাল্য থেকেই তাঁর আগ্রহ ছিল। স্টানকোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়াশুনার পরে লেখক হবার আগ্রহে নিউইর্ক যান ও সংবাদপত্রে যোগ দেন। কিন্তু শীঘ্রই তা ছেড়ে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে আসেন ও পুরোপুরি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি সাহিত্যসাধনা ও মানবজীবনদর্শনে নিরত আছে। আজ তিনি মার্কিনদেশের জনপ্রিয়তম লেখক। অশান্ত কৌতুহলী, পরীক্ষা-নিরত, অর্থগন্ধানী স্টাইনবেক আজো পুরনো হয়ে যান নি, কেননা তিনি জানেন জীবনের রহস্য ও আনন্দ অক্ষুরন্ত।

* * * *

গত অক্টোবরে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস-লাইব্রেরির উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী প্রথম কাব্য-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। রবার্ট ফ্রস্ট, ওগ্ডেন জ্যাস, লুই আন্টারমায়ার, হেনরী র্যাগো [‘পোয়েট্রি’ সম্পাদক], স্ট্যানলি কুনিংস্ প্রমুখ মার্কিন কবি, ও সমালোচক স্যার হার্বার্ট রীড এই উৎসবে যোগ দেন। ‘কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিক’, ‘গত অর্ধ-শতাব্দীর মার্কিন কবিতা’, ‘কবি

ও পাঠক জনসাধারণ', 'কাব্যের ছন্দোৰূপ', 'আমেরিকার চারণ-কবি ও বুটিশ সমালোচক' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

এই উৎসব 'পোয়েট্রি জার্নালের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা-বৈঠক সভাপতিত্ব করেন জার্নাল-সম্পাদক কবি হেনরী র্যাগো। 'পোয়েট্রি' জার্নালের বয়স হ'ল পঞ্চাশ। এই বৈঠক সম্পাদক বলেন, প্রতি বৎসর প্রায় সত্তর হাজার কবিতা অযাচিতভাবেই তাঁর হাতে আসে। এঁদের কেউ প্রথম শ্রেণীর কবি। কেউ-বা কবিশ-প্রার্থী। কাব্যরচনায় সম্ভ্রতিকালে যে জোয়ার দেখা দিয়েছে তা অতূতপূর্ব।

* * * *

গত চই নভেম্বর কলকাতার মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের (ইউ. এস. আই. এস.) প্রেক্ষাগৃহে আমেরিকার "পোয়েট্রি" কবিতাপত্রের পঞ্চাশত্মপূর্তি উৎসব পালিত হয়।

অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু ও নরেশ গুহ এই সভায় "পোয়েট্রি" পত্রিকার অবদানের কথা উল্লেখ করে ভাষণ দেন। তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই পত্রিকা গত পঞ্চাশ বছর ধরে কবিতার পাঠকসৃষ্টিতে যে সাহায্য করেছেন তারো উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গতে অরণ্যোগ্য, "পোয়েট্রি" পত্রিকার প্রাক্তন বিদেশী সম্পাদক খ্যাতনামা কবি এজরা পাউণ্ড রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অলুবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির বহুপূর্বেই।

* * *

রুশ লেখক যেভজেনি পোপোভকিন একটি চমকপ্রদ সংবাদ দিয়েছেন, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই বরিস পাস্তেরনাক-রচিত বহুখ্যাত বহুনির্দিত উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো' সোবিয়েত দেশে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই উপন্যাস ইতালীয় ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তারপর ইংরেজীতে। এই উপন্যাসের জ্ঞাত পাস্তেরনাককে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, কিন্তু সোবিয়েৎ কর্তৃপক্ষের ভৎসনায় তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। গতবছর তিনি মারা গিয়েছেন। এই উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

* * *

সোবিয়েৎ দেশের প্রধান সাহিত্যপত্রিকার নাম "নোভি মির" (নব জগৎ)। মস্কো থেকে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংখ্যা বিক্রি হয়ে যায়। এই

সংখ্যায় প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী আলেকজান্ডার শোলংনিটাসিন-রচিত একটি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সোবিয়েৎ-ভূমিতে স্টালিনের যে বর্বর নিষ্ঠুর অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এই প্রথম তা উদ্ঘাটিত হল। ঐ সময়ের বন্দীজীবনের অসহ্য অত্যাচার এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। সোবিয়েৎ সেনাবাহিনীর মুখপত্র ‘রেড স্টার’এ বলা হয়েছে, “এই কাহিনীটি সোবিয়েৎ সাহিত্যের একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এই কাহিনী স্টালিনের অমানুষিক অত্যাচারের প্রথম সত্য আলোচ্য।”

*

*

*

সম্প্রতি এশিয়া পাবলিশিং থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১৯৩৮-৩৯এ প্রদত্ত ভাষণাবলীর এক মূল্যবান সংকলন “ক্রস-রোডস” নামে প্রকাশিত হয়েছে (মূল্য ১৫ টাকা)। সুভাষ-ব্যক্তিত্বকে বোঝার পক্ষে এই গ্রন্থ সহায়ক হবে বলে দাবী করা হয়েছে।

*

*

*

সোবিয়েৎ বিজ্ঞানপরিষদের এশীয় জাতিসমূহের ইনস্টিটিউটের ভারতীয় বিভাগের প্রধান, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ভূদাদিমির কালিয়ানোফ সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতের রুশ অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করছেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আদিপর্বের অনুবাদ করেন শ্রীকালিয়ানোফ। গত ২৭শে অক্টোবর লেলিনগ্রাদ থেকে সভাপর্ব অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি বিরাটপর্ব অনুবাদে নিরত। বনপর্ব অনুবাদ করছেন তাঁর ছাত্রী স্ভেৎলিনা লেভিনা।

*

*

*

বর্তমান বৎসরে উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য সৃষ্টির জন্ম হাস্‌স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন পুরস্কারলাভ করেছেন মেরী নব্টন তাঁর ‘দি বরোয়ার্স অ্যাক্টো’ শিশুপাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর জন্ম। এই গ্রন্থে তিনি ইতঃপূর্বে ‘কারনেগী পদক’ পেয়েছেন। গত জুলাই মাসে জুরিখে এক আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী এই নির্বাচন করেছেন।

*

*

*

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর স্বেল্লনাথ সেন বাহাদুর বৎসর বয়সে গত ৩০শে অক্টোবর পরলোকগমন করেছেন। জাতীয় দলিলাগারের (গ্রাশনাল আর্কাইভস) অধ্যক্ষ ও সংগঠক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক স্বেল্লনাথ বাঙালীসমাজের রত্নরূপে ভারতে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। মরাঠা

দেশের ইতিহাসকাররূপে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক প্রচারিত হয়। ইংরেজিভাষার লেখা তাঁর প্রধান গ্রন্থাদি—‘ছত্রপতি শিবাজী’, ‘মরাঠিদের শাসনপ্রণালী’, ‘মরাঠিদের যুদ্ধপ্রণালী’, ‘শিবাজীর জীবন’। মরাঠা-ইতিহাসের তিনি ‘অথরিটি’। তাঁর বাংলা রচনা—‘অশোক’, ‘হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায়’।

*

*

*

চতুর চীনের হিংস্র আক্রমণের স্বরূপ বুঝতে হলে দুটি সত্ত্ব-প্রকাশিত বই পড়া দরকার। ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ রচিত ‘চীনের ড্রাগন’ (দাম ৩.৫০/বাক্ সাহিত্য) এবং সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীর ‘যবনিকা কম্পমান’ (দাম ৪.০০/গ্রন্থপ্রকাশ)।

*

*

*

গত ৯ই নভেম্বর সকালে পুনা থেকে পাঁচ মাইল দূরস্থ শহর হিঙ্গে ‘ভারতরত্ন’ ডক্টর দোন্দু কেশব কার্ভে পরলোকগমন করেন। সাধারণ্যে তিনি মহর্ষি কার্ভে নামেই পরিচিত। মৃত্যুকালে এই মনীষীর বয়স হয়েছিল ১০৪ বৎসর। পশ্চিম ভারতে জ্ঞানীশিক্ষা ও সমাজআন্দোলনে মহর্ষি কার্ভের দান অতুলনীয়। বহু রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি ও লোকনেতা অপেক্ষা মহর্ষি কার্ভের দেশসেবা অধিকতর মূল্যবান। মহর্ষি কার্ভের বিচিত্র জীবনকাহিনী আমাদের সমাজ-জীবনে এক উজ্জ্বল দীপস্তম্ভ—তা বহু বৎসর ধরে আমাদের পথ দেখাবে।

*

*

*

*

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশনে হচ্ছে উত্তর প্রদেশের গৌরখপুরে। আগামী ২৫ থেকে ২৯ ডিসেম্বর চারদিন ব্যাপী এই অধিবেশনে ভারতীয় লেখকরা যোগ দিচ্ছেন। অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আচার্য শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী স্বচেতা কুপালনী সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত, শ্রীরামধারী সিংহ ‘দীনকর’, ডাঃ প্রভাকর মাচোয়ে, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ শচীন সেন, স্বামী হিরন্ময়ানন্দ, শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী, হার্ডাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ আর্থার ইসেনবার্গ বিভিন্ন শাখায় উদ্বোধক বা সভাপতিরূপে যোগ দেবেন। এই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবও অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

*

*

*

*

অক্টোবরের শেষভাগে তিনজন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখক ভারত-সোবিয়ৎ সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি অস্থায়ী সোবিয়ৎ দেশ ভ্রমণে যান। এঁরা হলেন— রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী, ডক্টর হাজারী-প্রসাদ দ্বিবেদী। এঁরা রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রভাতবাবু আজো শান্তিনিকেতনে আছেন। শ্রীকৃপালনী বর্তমানে— সাহিত্যআকাদেমির সেক্রেটারী। তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপক এবং বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির সম্পাদক ছিলেন। ডঃ দ্বিবেদী বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের পরিচালক ছিলেন, এখন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন।

এঁরা লেলিনগ্রাদে ছিলেন চারদিন। এঁদের ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— রবীন্দ্রনাথের সোবিয়ৎ সফর-সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ ও নথীপত্র পরীক্ষা। এখানকার এশীয় জাতিসমূহের ইনসটিটিউটের প্রাচ্য বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ ও লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দের সঙ্গে এঁরা আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক কালিয়ানোক, অধ্যাপিকা ভেরা নোভিকোভা, হিন্দীভাষাবিদ পণ্ডিত বারাল্লিকফ।

উপরি-উক্ত দুই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অতিথি তিনজনকে এক সভায় সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধনায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীকালিয়ানোক।

লেলিনগ্রাদের বিদ্বৎমণ্ডলী ভারতীয় অতিথিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের সোবিয়ৎ-ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ ও নথীপত্র-পরীক্ষার ফলে তাঁরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আমরা আশা করি।

*

*

*

১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, কৃষিনৈতিক ছবিটি ফুটে উঠেছে। সমাজনসচেতন বাঙালীমাত্রেয়ই এই সব বিচিত্র তথ্য জানা উচিত বলে আমরা মনে করি। এখানে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল [আনন্দবাজার-প্রদত্ত] :

১৯৬১ সনের আদমশুমারীতে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে সমগ্র ভারতের মাত্র ২৮৭ শতাংশ হইলেও গোটা দেশের শতকরা ৭২৬ জন লোক এই রাজ্যের অধিবাসী।

১৯৫১-৬১ সনে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ৩২.৭৯ ; পূর্ববর্তী

দশবছরের হার ছিল ১৩'২২। ১৯১১-৬১ সনে, অর্থাৎ গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে এ রাজ্যে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৯৪ ভাগ।

গত পঞ্চাশবছরের লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী বাড়িয়াছে আসামে—শতকরা ১৭৪ ভাগ। তাহার পরই কেরলের স্থান—শতকরা ১৩৬'৫ ভাগ বৃদ্ধি। তৃতীয় আসন গুজরাটের—বৃদ্ধি শতকরা ১১০'৫ ভাগ। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির কর্মপ্রার্থীরা না আসিলে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা আরও কম হারে বাড়িত বলিয়াই মনে হয়।

বসতির ঘনত্ব

জনবসতির ঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সমান নহে। রাজ্যের শতকরা ৫৮'৮ জন লোক বাস করেন ঘনবসতি পূর্ণ অঞ্চলে—যেখানে প্রতি বর্গমাইলে বসতি হাজারের বেশী। প্রতি বর্গমাইলে বসতি যেসব অঞ্চলে ৭৫১ হইতে ১০০০ জন সেইসব জায়গায় বাস করেন রাজ্যের শতকরা ২২'৯৯ জন অধিবাসী। বাদবাকী শতকরা ১৮'৯৩ জন লোক বাস করেন অপেক্ষাকৃত “হাল্কা” অঞ্চলে—অর্থাৎ যেখানে বর্গমাইল প্রতি বসতি ৫০১ হইতে ৭৫০ জন।

সমগ্র ভারতে আর একমাত্র কেরলে অর্ধেকের বেশী লোক (৫৭'২২ জন) ঘনবসতিপূর্ণ (যেখানে বর্গমাইল প্রতি বসতি হাজারের বেশী) অঞ্চলে বাস করেন।

হিসাবটা আরও একদিক দিয়া করা হইয়াছে। সেই বিচারে পশ্চিমবঙ্গের ৩৯'৬২ অংশে (মোট আয়তন ১০০ ধরিয়া) প্রতি বর্গমাইলে হাজারের বেশী লোকের বাস। এক কেরল ছাড়া (৪০'০৩ অংশে) আর কোন রাজ্যে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এতটা বিস্তৃত নহে।

শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গে গত দশবছরে শহরের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৬৪টি। ১৯৫১ সনে ছিল ১২০টি (ইহাদের মোট জনসংখ্যা ৬,২৮১,৬৪২); ১৯৬১ সনে দাঁড়াইয়াছে ১৮৪টি (ইহাদের মোট জনসংখ্যা ৮,৫৪০,৮৪২)।

বর্তমানে এক লক্ষের বেশী লোকবসতির শহর পশ্চিমবঙ্গে ১২টি; ১৯৫১ সনে ছিল মাত্র ৭টি। ১৯৫১ সালে রাজ্যে পঞ্চাশ হাজার হইতে লক্ষকম একজন অধিবাসীর শহর ছিল ১৪টি; ১৯৬১ সালে দাঁড়াইয়াছে ১৯টি।

গত দশবছরে পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজারকম একজন অধিবাসীর শহরের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সবচেয়ে বেশী—১৯৫১ সালে ছিল ১৮টি, ১৯৬১ সালে ৫০টি।

১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে পুরুষের
অনুপাতে নারীর হার বাড়িয়াছে। ১৯৫১ সালে প্রতিহাজার পুরুষে মহিলা
ছিলেন ৬১৩ জন, এখন ৭০১ জন।

বড় বড় শহরে নারীর অনুপাতিক হার কম। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বড়
১২টি শহরে প্রতি হাজার পুরুষে মহিলা ৬১২ জন। একেবারে ছোট শহরে
নারীর হার অনেক বেশী—প্রতিহাজার পুরুষে ৮১৭ জন মহিলা।

গ্রাম-বাঙ্গলা

এরাজ্যে মোট গ্রামের সংখ্যা ৩৮,৫৩০। গ্রাম-বাঙ্গলার মোট অধিবাসী
সংখ্যা ২৬,৩৮৫,৪৩৭। ইহার মধ্যে ১৩,৫৭৯,০৪৪ জন পুরুষ এবং ১২,৮০৬,
৩৯৩ জন মহিলা।

দশহাজারের উপর বসতি বর্তমানে এমন গ্রামের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে
২৪টি। ১৯৫১ সালে ছিল ১৪টি।

সভা প্রকাশিত হল

নবগোপাল দাসের মননশীল উপন্যাস

অনুদ্বারিত পাঁচ টাকা

বেঙ্গলের অনুপম কিশোর সাহিত্য

বাণভট্টের	তেজেশচন্দ্র সেনের	
লালু ভুলু (৩য় মূঃ) ৩.০০ ॥	হারানো ছেলে	১.২৫ ॥
বিক্রমাদিত্যের	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের	
খুলী দরওয়াজ (২য় মূঃ) ১.৭৫ ॥	প্রাণী ও প্রকৃতি	১.৫০ ॥
চাকচন্দ্র চক্রবর্তীর	নমিতা বসুর	
রং চং এক টাকা ॥	পিক্লিক	২.০০ ॥
	দেবদাস দাশগুপ্তের	
পরাভূত প্রকৃতি (ভারত সরকার পুরস্কৃত) ১.০০ ॥	প্রাণের কথা	১.০০ ॥
	ননীগোপাল গোস্বামীর	
জীবে প্রেম করে যেই জন ১.২৫ ॥	আত্মাদের উৎসব	১.০০ ॥
আশা দেবীর	অমরেন্দ্র সেনের	
ঘুমতি নদীর তেউ (৪র্থ মূঃ) ১.০০ ॥	ডাকটিকিট	১.২৫ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা : বারো ॥

অন্তরীক্ষের সঙ্গীত

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ তিন ॥

জীবশরীরে যখন থাকি তখন মরণশীল সাধারণ মানুষের মত-ই আমাদের ব্যবহার। তখন স্বথদুঃখ হাসিকান্না কামক্রোধ লোভমোহমাৎসর্য। তখন ভাবকদের বিরুদ্ধে যুক্তি, দম্ভ; বস্তুচর্চার ঔদ্ধত্যে প্রগতি।.....মাটির এই শরীরটার বন্ধন ভেদ করে শিবসত্তার ভাবজ্যোতিটি যদি জেগে উঠে—জেগে ওঠে মাটির মর্মলোক থেকে স্বেতপদ্মবিকাশের আনন্দের মত, তবে জীবজীবনের নবজন্ম হয় সৃষ্টিত: তখন ভুলোকের সমস্ত-কিছুই শুধু যে অল্পভবগোচর হয়, তাই নয়, ছালোকের অদৃশলোকও, হয়। জীবলোকে চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে ভ্রাণ নিই, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ করি, ত্বক দ্বারা স্পর্শস্থখ পাই। কিন্তু শিবসত্তার দিব্যমহিমায় একটি মাত্র ‘শক্তি’ দিয়েই-ই পঞ্চবিধ কেন, বিশ্ববিধ কর্ম-ও সমাধা করি: শিবসত্তার উদ্বোধনে অনির্বচনীয় একটি চেতনার ধারা সর্বশরীর ও মনকে অত্যাশ্চর্য রহস্যানন্দে অভিষ্মাত করে’ রাখে। তখন পিতৃলোক ও ঋষিলোক থেকেই শুধু নয়, দেবলোক থেকে-ও আহ্বান আসে, বাণী আসে, আশীর্বাণী আসে।.....

দৃষ্টি খুলে যায় বলে’ তখন, ধ্যানকান্ত মুদ্রিত নয়নের সম্মুখে, সৃষ্টির বহুতর রহস্যদ্বার-ও হয় উদ্ঘাটিত।.....সত্য কথা বলতে কি, জীবলোক থেকে বহুকাল হ’ল ধারা বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ আকাশপথে নামেন, আবির্ভূত হন আনন্দে। জীবলোকে যেমনভাবে আমরা কথা বলি, কথা শুনি, দেখি, হাতে হাত দিই, তেমনভাবে কোনো কার্য তখন যে হয়, তা নয়, কিন্তু অল্পভাবে-অল্পভাবে আলিঙ্গন ঘটে, এবং তাতেই জ্ঞান হয়, অভিজ্ঞতা হয়, গোপন অনেক তথ্য ও তত্ত্ব রোমাঙ্কিত হয় চেতনার আনন্দে। বিষয়টা বোঝাবার নয়। তবু মানুষের ভাষায় কথোপকথনের ভঙ্গীতে যদি বোঝাবার চেষ্টা করি—তবে তা’ কতকটা এই রকম দাঁড়ায়:

—মনে হ’ল আপনি আকাশ থেকে নামলেন...জ্যোতির্ময় দিব্যরূপে এসে দাঁড়ালেন...

—সর্বত্র-ই তো আকাশ, বৎস। আকাশ থেকে দূরে মাটিটাকেই সর্বস্ব মনে করো বলে আকাশটা দূরে মনে হয়, কারোর কারোর কাছে ‘শূন্য’ বলে-ও মনে হয়।

—আপনি কি আজ সর্বত্র-ই বিরাজিত ?

—তুমি-ও।

—যখন ভাবি, আমি-ও, তখন কী দুঃসহ আনন্দ যে অনুভব করি। তখন মনে হয়, মৃত্যু-ই অমৃত, দেহ-টা-মৃত্যু। দেহটা ছাড়তে না-পারলে মুক্তি নেই।

—ও-জন্মের কথা তো হ’ল না সৌম। এ-জন্মে দেহটা বিধাতার স্নেহ তাঁর আশীর্বাদ।...দেহটা ষতদিন আছে, বিধাতার কর্মে ততদিন তাকে নিয়োজিত করো...কৃতী হও কর্মভূমে।

—কিন্তু আমি যে...

—হ্যাঁ, কী চাও, আমি জানি। কিন্তু দেহ-কে উপেক্ষা করে’ মুক্ত হওয়ার ব্রত এ-জন্মে নয়। দেহের মধ্যে থেকেই মুক্তির সাধনা করো : জন্মের ঋণ পরিশোধ করো।

—কিন্তু তাতে কি বিলম্ব হবে না ?

—জোর করে কি গন্তব্যে যাওয়া যায় ? প্রস্তুত হতে-হতে যেতে হয়। অজস্র সহস্র জন্মের ঋণ পরিশোধ করতেই হবে—তবে তো গন্তব্য, তবে তো মুক্তি।

—আপনি পেয়েছেন ?

—পেলে তো ‘সম্ভলোক ভেদ করে’ ‘সত্যলোকের’ যাত্রী হতাম।

—এমন কী করছেন ?

—দেহে থেকে তুমি যা করছ, দেহ ছেড়ে-ও আমি তাই-ই করছি : পৃথিবীর বিচিত্র বাসনা বারংবার আমাকে টান দিচ্ছে। কাটাতে চাইছি। তিনজন্ম লাগবে।

—বার বার তিনবার এখনো আপনাকে এই পৃথিবীতে নামতে হবে ?

—পৃথিবী বলতে কি এই মানুষের পৃথিবী ? জীবের জন্মভূমি শুধু কি এই সূর্যতনয়া মৃত্যু ?

—তবে ?

—আমি জন্মলাভ করব ‘ঋণা’শ্রিত কোনো পীত-গ্রহের ঋতুধীপে, হাজার বৎসর করব সাধনা। আবার জন্মলাভ করব নবতর এক শান্তিনিকেতনে :

মাতা 'অরুন্ধতী'র স্নেহপুষ্ট কোনো শ্রাম-গ্রহের তপোধামে। সেখান থেকে পুনর্বীর, 'কালপুরুষ'র কোনো কল্যাণাশ্রয়ে।

—তিনজন্মের পর কর্মক্ষয়, মুক্তি ?

—মুক্তি কি এতই সহজ, প্রিয়তম ? সাধনার জোর থাকলে তিনজন্মের পর পিতৃলোক পার হয়ে যাব, ঋষিলোকও হব পার।

—তখন আপনার সঙ্গে অনুভবে-ও আর দর্শন মিলবে না ?

—জীবদ্দশায় এমনভাবে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দেখা-করার কেন চেষ্টা করছ ?

—একটু নির্জন হলেই যারা স্থলশরীরে থাকতে পারেন না, তাঁদের কী হবে...

—মনটিকে ভরাতে হবে কর্ম-চিন্তায়। স্বদেশসেবায়। বিশ্বত্রতের আনন্দে।...জ্ঞানের দ্বারা 'তাকে' জানো, যোগের দ্বারা 'তাঁতে' মেলো, কর্মের দ্বারা 'তাঁকে' করো, ভক্তির দ্বারা 'তাঁ'-ই হও।

অর্থাৎ জীবশরীরে কর্তব্যকর্ম করার আরো কয়েক বৎসর তা'হলে অবশিষ্ট আছে এখনো। শরীরের ওপর মায়ী অদম্য। খানিকটা স্বস্তি পেলুম যেন।

কথোপকথনচ্ছলে বিষয়টা লিখলুম বটে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি। এমন ভাবে মাহুষের মত কথার পৃষ্ঠে কথা যে হ'ল, তা নয়। আকস্মিক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে এই ভাবের কথা রোমাঞ্চ বিদ্যুৎবেগে অনুভবশক্তিকে স্পর্শ করল, অভিনব জ্ঞান-চমকে সর্বসত্তা হ'ল পূর্ণ।

অনেক সময়, বিচিত্র সংবাদ এই, অতীত জন্মের রহস্যদৃশ্য-ও অনুভবে আসে। মনে করুন, স্থলশরীরে ভাবের আকাশ থেকে আরো আকাশে আপনি চলেছেন। হঠাৎ কৌতূহলবশতঃ অরণ্যসঙ্কুল একটা পার্বত্য-অঞ্চলে অবতরণ করলেন। কিছু দূরে বেশ খানিকটা ফাঁকা পথ। নির্জন। নিঃশব্দ। হঠাৎ, কী বিচিত্র, প্রশস্ত সেই পার্বত্যপথে অতিরম্য একটি গৃহকুঞ্জ ভেসে উঠল। সম্মুখে কত বিধ পুষ্পতরু। পুষ্পে পুষ্পে প্রজাপতি। গঙ্গাফড়িং। মধুমক্ষী।

গৃহের অভ্যন্তর থেকে একজন রূপসী বিদেশিনী এল বেরিয়ে। সম্মুখস্থ একটা সপিল পথের পানে তাকাল। ঝাঁকড়া চুলগুলো হাত দিয়ে সরাল।

দাঁড়িয়ে কার জন্ত যেন অপেক্ষা করল। শ্রিয়মাণা বিবাদিনী মূর্তি। গৃহ থেকে বার-পথে চলল কিছুদূর।

এমন সময় আপনাকে দেখে :

—এ কী! তুমি! তুমি তো কবে চলে গেছ...

—কিন্তু কী আশ্চর্য, তুমি তো যাও নি...

—না, আমি যেতে যেতে-ও আছি। তোমার জগতেই যে থাকতেই হবে।

—কিন্তু আমি তো নেই; আর আমি কি অতীতে ফিরতে পারি, কেউ পারে?

—না, অতীতে কেন ফিরবে, অকৃতকর্মের বন্ধন ভেদ করে আমি-ই যাচ্ছি ভবিষ্যতে...

—কতদিন পরে দেখা হল...

—বোধহয় বছর তিন হ'ল।

—বছর তিন কি, বলো তিনশো বছর...চার জন্ম তারপর পার হয়ে এসেছি, জানো?

—সে কি?

বলতে বলতে অদৃশ্য হল ছায়াময়ী। কোথায় সেই পার্বত্য দেশ, সেই গৃহরঞ্জ, পুষ্পতরু, পুষ্পে পুষ্পে প্রজাপতি। যেন মুহূর্তের স্বপ্ন।...কিন্তু সত্যি কি স্বপ্ন? আমাদের চারিপাশের আকাশে আমাদেরি প্রাক্তন বাসনার ও প্রারন্ধ কর্মকামনার বিচিত্র জগৎগুলি অহরহ লীলায়িত হয়ে রয়েছে। বস্তু-বৈষয়িকতায় আমাদের ইহলৌকিক জীবনের ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি অতি সতর্ক, এইজন্ত চোখের সামনে প্রমুদিত প্রাকৃত চিত্রগুলিই দেখি বা দেখতে পাই, চোখের বাইরে আমাদের অতীত বাসনার অথবা সাধনার চিত্র বা চরিত্রগুলি দেখতে পাই নে।

সংসারে যারা আছেন, তাঁরা তো আছেন-ই, যারা ছিলেন, তাঁরাও আছেন তাঁদের সূক্ষ্ম অথবা স্থূল বাসনার স্পন্দতরঙ্গে।...আমি একদিন সংসার থেকে চলে যাব, কিন্তু চলে গিয়েও থাকব, থাকতে হবে-ই। বাসনার ছেদ হলে আমি মুক্তি পাব, কিন্তু যে-বাসনাগুলি আমা থেকে অতীতে উদ্ভূত হয়ে আছে, বর্তমানেও উদ্ভূত হচ্ছে কারণে অ-কারণে, তা-সবের তরঙ্গ কি নিশ্চিহ্ন হওয়ার? আমি যাব, একদিন মুক্তিও পাব, কিন্তু সে-গুলি থাকবে, থাকছে। পাঁচ শ কি হাজার বছর পরে ফের যদি এখানে আসতে হয়, বলা যায় না,

হঠাৎ আমার আজকেকার বিষাদিনী কি আছলাদিনী বাসনাকে দর্শন করে চমকে, থমকে, দাঁড়াব। বলব, তুমি? এখনো আছ?

পথ দিয়ে চলতে চলতে ভাবের ঘোরে অতীত-আমি-কে, আমি-র সাধনা বা বাসনাকে, আমি-র চারপাশকে এমনি স্পষ্ট সৌন্দর্যে দেখতে পাওয়া সম্ভব। একটু আগে যে বিদেশিনী, বিরহিনীর কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হয়েছে, সেটি ভাবব্যঞ্জক একটা রূপক মাত্র নয়। ...তিনশো বছর পূর্বের কথা কেন, তিন হাজার বছরের পূর্বের কথা বিষাদিনী বাসনাকেও, দৃষ্টি থাকলে যেথা সম্ভব। অতৃপ্ত কামনার তীব্রতায় ক্ষণে ক্ষণে তারা নানা স্থানে, এমন কি, শূন্য স্থানেও, স্থখরচনার হাহাকার গড়ে তুলছে, ভেঙে পড়ছে, ফুটে বেরোচ্ছে। জীবশরীরে এটা কেউ-ই স্পষ্টতঃ দেখতে পায় না। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই, অদৃশ্যভাবে, বিরহবেদনার, স্থখ-সাধনার, হাসিকামার লীলা চলছে দিনের পর দিন। এই যে আমি নির্জনে, নিস্তরু নিভূতে, অদ্ভুত যত অবিদ্যাস্ত্র ব্যাপার লিখে যাচ্ছি, যে ঘরে বসে লিখছি, সেই ঘরের বায়ুমণ্ডলে ইথারের কম্পনের অন্তরালে কত বিচিত্র-লোকের লীলাস্পন্দ যে উঠছে, পড়ছে, নিভছে, জাগছে—কেউ কি জানে। পৃথিবীটা তো অসংখ্য বাসনা-কামনার বিদ্যুৎ-বিভূতির তীর্থধাম। যেদিকে তাকান, একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি, ভাবদৃষ্টি, নিয়ে দেখুন যা দেখছেন, তা ছাড়া আরো অনেক কিছু হয়তো দেখতে পাবেন। তখন জীবশরীরে ও মনে বিশ্বয়ের অবধি থাকবে না।

অথচ বিশ্বয়ের কিছুই নেই। জানি না, হঠাৎ ক্ষণ-বিদ্যুতের চমকস্পর্শে কিছুটা মাত্র জানি, কিংবা জানা-না-জানার স্বন্দে মনটা দোলে, তাই বিশ্বয়।

মানুষের সূক্ষ্ম বাসনার কম্পনে অমিততেজ, অমিত বীর্ষ। মলিনা বাসনার বেগে আমরা বন্ধনের পথে নামি, বিশুদ্ধা বাসনার বেগে আমরা মুক্তির আকাশে উঠি। জীবজন্মে আমরা যতপ্রকার বাসনা যতভাবে করছি, ততভাবেই আমাদের বেঁধে ফেলার জন্তে নব নব প্রাণের রূপস্পন্দ নির্মিত হয়ে, তরঙ্গায়িত হয়ে থাকছে। ...মলিন বাসনায় দুষ্কৃতি, বিশুদ্ধ বাসনায় সূকৃতি। এ-জন্মের দুষ্কৃতি আগামী জন্মের জীবনটিকে অদৃশ্য সূক্ষ্ম আকর্ষণে বন্ধনের পথে টানবে; সূকৃতি থাকলে এইটুকু হয়, আগামী জন্মজীবনের গতিপথে অদৃশ্য অধ্যাত্মচেতনার সহায়তা মেলে। মানুষ হয়ে জন্মেছি, স্ত্রী-পুত্র-কণা নিয়ে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে, কাষকর্ম নিয়ে আছি, বাসনা ত্যাগ করা বড় সহজ কথা নয়। তবে বাসনাকে যতদূর

সম্ভব বিপ্লবী রাখা বেদনাটি থাকলে মন্দ হয় না।...দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনেও এটি স্মরণে রাখা শোভন এবং সুন্দর। ধরুন, আপনি একজন প্রতিবাসীর ওপর বিদ্বেষ বাসনা পোষণ করে মনে মনে তার অকল্যাণ কামনা করলেন। আপনার মনের এই গোপন ব্যাপারটি কেউ-ই জানেন না, কিন্তু ঠিক জানবেন, সেই অকল্যাণ কামনার অগ্নিপ্রবাহ সৃষ্টির মর্মমূলে সঞ্চিত রইল মারণমন্ত্রের ভীষণতায়। এর আঘাত আপনার শত্রুকে সহিতে হবে, আপনাকেও হবে।...কেমন করে হবে, অল্প কথায় সহজে বলার নয়। কিন্তু কোনো এক শুভজন্মে যদি ইহসংসারে আবার আসেন, পথ দিয়ে চলতে চলতে আজকের এই বিদ্বেষবাসনার মার-মূর্তির সম্মুখীন হন, তখনি বুঝবেন, আপনার প্রাক্তন দুষ্কৃতিগুলি অসংখ্য কবন্ধের দৌরাণ্যে কতবার কতভাবে আপনার দেবদানপথে বাহু মেলে দাঁড়ায়, পর্বত-প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করে, কৃতকর্মের দুঃসহ যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত করে জন্ম থেকে জন্মান্তরে।...প্রাচীন ঋষিরা তাই ‘স্বস্তিমানুষোভাঃ’ কিংবা ‘সবেব লোকা স্থিতি নো হন্ত’ বলে যে চিন্তাপ্রসাদ আশ্বাদন করতেন, তার মধ্যে তাদের বাসনালোককে বিশুদ্ধ করার তপস্কাই ছিল প্রচ্ছন্ন।

সার কথাটা এই : ইহলোকে যা করছি, যা ভাবছি, যা বলছি, যা লিখছি—সমস্তই অনন্তের কোলে থেকে যাচ্ছে, থেকে যাচ্ছে আমাকে গতিপথে বাধা দিতে, কিংবা সহায়তা করতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই নিকাম ভাবে কর্ম করার, ধর্ম করার, উপদেশ দি়তেন, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা শমদমদয়া উপরুতি-ততিক্ষা ও অপরিগ্রহের কথা উত্থাপন করতেন।...মনটাকে বাসনা-শূন্য করা খুবই কঠিন যে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু শুভবাসনায়, মঙ্গল-বাসনায়, মন ভরাতে পারলে সূক্ষ্মতির আশীর্বাদ সম্ভব হয়। তার দ্বারা জন্ম থেকে জন্মান্তরের পথে দিব্যজ্যোতি প্রভাসিত হয়। অন্ধকার পথে যেতে যেতে হঠাৎ আলোর ইঙ্গিত দেখলে যে-আশা জাগে, স্মৃতি জাগে, আপন জীবনের কর্ম ও ধর্ম দ্বারা প্রজ্জ্বলিত শুভকামনার আলোককণিকাগুলি দেখে তেমনি আশা জাগে, অপার আশ্বাসে অনুভবসত্তা রোমাঙ্কিত হয়ে ওঠে। জীবনশরীর থেকে উঠে শিবশরীরে একবার আকাশ-পরিক্রমা করতে বেরোলেই এ সমস্ত রহস্যবিষয় বোধির গহীন সত্তাকে স্পর্শ করে—তখন আফালন নয়, অনুভব ; অবিশ্বাস নয়, ‘অভ্যাসযোগেন’ অভিজাত। তখন গন্তব্য না পেয়েও আনন্দ : ‘পথ চলাতেই আনন্দ’।

শরৎচন্দ্র কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক ?

নারায়ণ চৌধুরী

বিগত শ্রাবণ সংখ্যা সাহিত্যের খবর পত্রিকায় অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় “শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার” এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তাঁর প্রতিপাদ্য হল এই যে, ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা তাঁর প্রাপ্য নয়; তিনি আসলে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, তাঁর লিখন-নৈপুণ্য সম্বন্ধে উত্তরকালীন পাঠকসমাজের মধ্যে এক ভ্রান্ত কিংবদন্তী গড়ে ওঠার ফলে তাঁকে আকাশের চাঁদ বানিয়ে তোলা হয়েছে।

অরুণবাবু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন এই বলে যে শরৎচন্দ্র মূলতঃ করুণরসের লেখক। তাঁর এই করুণরসের ভিতর ভাবালুতা যতখানি, হৃদয়বস্তার উদার্য, ঐশ্বর্য ও ব্যাপকতা ততখানি নয়। শরৎচন্দ্রে দরদ আছে, কিন্তু যাকে বলে উদার মানবীয় সহানুভূতি ও বিশ্বব্যাপী কারুণ্যের চেতনা, তার পরিচয় তাঁর লেখায় তেমন পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের সমবেদনার কোন স্ফুটন পটভূমি নেই; তা একান্তভাবেই গৃহবদ্ধ, প্রাদেশিক, বাংলা দেশের প্যাচপেঁচে জল-হাওয়ার দোষে কেবলই ক্রন্দন-তৎপর।

এ ছাড়া অরুণবাবু শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর একটি যে অভিযোগ এনেছেন তা হচ্ছে এই যে, শরৎ-সাহিত্যে কবিশ্বপ্নের ছোঁতনা নেই, তা নিতান্তই একজন খণ্ডদৃষ্টির অধিকারী গগুপ্রাণ লেখকের রচনা মাত্র। শরৎচন্দ্র খণ্ড কাল ও খণ্ড দেশকে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন, যে কবিদৃষ্টি থাকলে সৃষ্ট সাহিত্যের ভেতর দেশকালের উৎসর্গ সার্বভৌমত্ব ও সার্বকালীনতার রসের সঞ্চার করা যায়, সেই দিব্যদৃষ্টি শরৎচন্দ্রের ছিল না। এই দৃষ্টি না থাকার ফলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে বড় বেশী মর্ত্য-ঘেঁষা, বস্তুতান্ত্রিক, সমসাময়িকতার চিহ্নমণ্ডিত বলে মনে হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাংলা দেশের বিশিষ্ট সমাজ-পরিবেশের বাইরে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি বা কল্পনা কখনও প্রসারিত হয় নি এবং এই সমাজ-পরিবেশের মধ্যেও আবার তাঁর মনন পারিবারিক চৌহদ্দির মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে। অরুণবাবুর মতে শরৎচন্দ্র মূলতঃ সঙ্কীর্ণ সমাজ ও পরিবার-জীবনের শিল্পী, উদার বিস্তৃত মানবজীবনের শিল্পী নন।

অরুণবাবুর এই প্রবন্ধের বক্তব্য এতই অভিনব ও চাঞ্চল্যকর যে, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একজন প্রবীণ ও স্বধী সমালোচকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তিনি পত্রান্তরে এক সুবিস্তৃত রচনায় অরুণবাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য অরুণবাবুর বক্তব্যের ঠিক বিপরীত। শ্রীকুমারবাবুর প্রতিবাদ সংক্ষেপিত করলে এই রকম দাঁড়ায় : অরুণবাবু শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ‘উচ্চত বেত্রদণ্ডের জায়’ যে মানদণ্ড প্রয়োগ করেছেন, সেই মানদণ্ড অন্তান্ত্রদের বেলায় প্রযুক্ত হলে অনেক দেশী-বিদেশী ঔপন্যাসিকই খারিজ হয়ে যান। কবিদৃষ্টির অধিকার নিয়ে আর কজন ঔপন্যাসিক উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন আর কজনই বা তাঁদের রচনায় স্বসমাজ বা স্বকালের নীতিমত গভীকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছেন? সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত স্বভাববিন্দু কবিত্বশক্তির দৈবপ্রসাদে বলীয়ান হয়ে কেউ উপন্যাস রচনা করেছেন এমন লেখকের সংখ্যা ‘কোটিতে গোটিক’ বললেও চলে। কি এদেশে, কি ওদেশে। পশ্চাত্য সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকদের অধিকাংশই হলেন শরৎচন্দ্রের বর্গের লেখক : কাব্যের আশীর্বাদবশিত বাস্তব-ধর্মী মৃত্তিকাগন্ধী শিল্পী। তাঁদের লেখায় কবিস্বলভ অসীমের বা অতীন্দ্রিয়ের হাতছানির কোনো বার্তা নেই। অথচ তাঁরা সকলেই স্ব স্ব সাহিত্য শক্তিশালী ঔপন্যাসিক রূপে লোক ধৃত হয়েছেন। তাঁদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, নিপুণ ‘পূর্ববেক্ষণ-ক্ষমতা, সমাজ-বাস্তবতার বোধ এ সকল গুণের জগুই তাঁরা বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকের মর্যাদা লাভ করেছেন দেশে এবং বিদেশে। কাব্যগুণ বা বিশ্বদৃষ্টির আপেক্ষিক অভাবের দরুণ তাঁরা যদি বাতিল না হন তো শরৎচন্দ্রই বা বাতিল হবেন কোন যুক্তিতে? অন্ত্র ঔপন্যাসিকদের বেলায় যে আদর্শ প্রযোজ্য নয় বা কখনও প্রযুক্ত হয় না, শরৎচন্দ্রের প্রতি আকস্মিক বিরাগবসে হঠাৎ তাঁর বেলায় সেই অসম্ভব, অতি-স্বকঠিন মূল্যায়নের মানদণ্ড প্রয়োগ কি শরৎচন্দ্রের প্রতি সুস্পষ্ট অবিচার নয়? শরৎচন্দ্রকে খাটো করবার এই অত্যাশাহী চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে লেখক নিজেকেই খাটো করেছেন।

পক্ষ-প্রতিপক্ষের বক্তব্য পাশাপাশি রেখে এবার আমরা আমাদের অভিমত জ্ঞাপনের চেষ্টা করতে পারি। অরুণবাবু ও শ্রীকুমারবাবুর যুক্তি-পরস্পরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা দুজনেই মতামত-প্রকাশের ক্ষেত্রে দুই বিপরীত চূড়ান্ত প্রান্তীয় বিন্দুতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। একজন শরৎচন্দ্রকে

অকিঞ্চিংকর প্রতিপন্ন করবার অত্যাশাহে শরৎচন্দ্রের রচনার ভিতর করুণ রসের আধিক্য ও তথাকথিত জনপ্রিয়তার গুণ ছাড়া আর কোনো গুণেরই সাক্ষাৎ পান নি। অন্তর্জন এই মতটিকে খণ্ডন করবার আগ্রহাতিশয্যবশতঃ আবার এক দমকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুবিন্দুর উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং সেখান থেকে মূল লেখককে লক্ষ্য করে অনেক চোখা চোখা বাণ হেনেছেন। এর দু-একটি, এমন কি, কটিদেশের নিম্নাভিমুখীও হয়েছে। (যেমন প্রতিবাদী ইঙ্গিত করেছেন যে, যে সমালোচক শরৎচন্দ্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলেন, সমালোচকরূপে তাঁর শ্রেণীবিচারও ওই কোটিতেই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এটি গাল ছাড়া আর কিছু নয়।) কিন্তু সত্য বোধ হয় কখনও এরূপ চূড়ান্ত বিপরীত প্রান্তে বিরাজ করে না। সত্যের ধর্মই বোধ করি এই যে, তা মধ্যতা, সমন্বয়ী, কঠিনতম সামঞ্জস্য-প্রয়াসের ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলায় যত্নশীল। মনে হয় শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য অরুণবাবুর বক্তব্যের মধ্যেও পুরাপুরি নেই, শ্রীকুমারবাবুর বক্তব্যের মধ্যেও পুরাপুরি নেই। তাঁদের দুইয়ের অভিমতের সামঞ্জস্যবিধান করে মধ্যবর্তী কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বোধ করি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য উচ্চারণ করা যায়। মধ্যবর্তী এই স্থানটুকু খুব সঙ্গীর্ণ হতে পারে, কিন্তু সেটি স্বর্ণমণ্ডিত। ওই মধ্যস্থিত স্বর্ণভূমির উপর থেকে একবার শরৎ-সাহিত্যের জরীপ করা যাক।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অরুণবাবুর এই বিশ্লেষণ খুবই খাঁটি যে শরৎচন্দ্রের শিল্পী-মানসের ভিতর কবিত্বটি অল্প-বিস্তার অল্পপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাব্যস্বরভিমণ্ডিত রোমাটিক মায়াকুহেলি কিংবা রবীন্দ্রনাথের গল্পোপন্যাসের অপূর্ব কাব্যস্বাদ শরৎচন্দ্রের রচনার ভিতর সন্ধান করতে গেলে বিফলমনোরথ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকুমারবাবুর এই অভিমতও অকাটা যে, কাব্যের মানদণ্ডে উপন্যাসের পরিমাপ করতে গেলে 'ঠগ (এইস্থলে কবিত্বহীন ঔপন্যাসিক) বাছতে গাঁ উজাড়' হয়ে যাবার সম্ভাবনা। শ্রীকুমারবাবু এই ক্ষেত্রে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পর বিভূতিভূষণ ছাড়া আর কোনো নাম খুঁজে পান নি। সত্যিই তা-ই। এই যদি উপন্যাসরাজ্যের প্রকৃত পরিস্থিতি হয় তো একটা অসম্ভব আদর্শ শরৎচন্দ্রের বেলায় প্রয়োগ করে তাঁকে নাস্তানাবুদ করবার চেষ্টা কেন। যে গুণ তাঁর মধ্যে নেই সেই গুণ তাঁর লেখায় খুঁজতে যাওয়া কেন? এইরূপ নগ্নার্থক পদ্ধতিতে কোনো লেখকেরই বিচার হয় না, হওয়া উচিত নয়। যার কাছে থেকে আমরা যেটুকু পেয়েছি তার জন্তই তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। শরৎচন্দ্রের কবিত্বটি না থাকতে পারে,

কিন্তু কাহিনী-রচনার ক্ষমতা যে তাঁর অপরিমিত এ কথা তো অতি-বড় শরৎবিরোধীও স্বীকার করবেন। বাংলাদেশকে সাহিত্য নামক বস্তুর দ্বারা এমনভাবে মাতিয়ে যেতে কি আর কোনো লেখক পেরেছেন? এই মাতিয়ে যাওয়াটা ‘কিছু নয়’ বলে যদি কোনো সমালোচক রায় দেন তা হলে সবিনয়েই আমি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হতে বাধ্য হব।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা নিছক একটা কিংবদন্তী নয়, ‘মীথ’ নয়, তা আজল্যমান বাস্তব সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে শরৎচন্দ্রের বইয়ের যে হারে কাটতি হয়েছে এমন আর কোনো লেখকেরই আজ পর্যন্ত হয়নি। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পাশে নিম্নতর হয়ে গেছেন। জানি একমাত্র জনপ্রিয়তার নিরিখেই কোনো লেখকের মূল্যমান স্থিরীকৃত হওয়া উচিত নয়, তাই বলে ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে খারিজ করবার চেষ্টারও কোন মানে হয় না। পাঠকসাধারণ কর্তৃক অনাদৃত তথাকথিত বুদ্ধিগর্বি লেখকের পক্ষে এই জাতীয় উক্তি করে আত্মতুষ্টি বোধ করতে চাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বলাই বাহুল্য, তা লেখকের যথার্থ মূল্যায়ন নয়। শরৎচন্দ্র বাংলাদেশে অমনি-অমনি জনপ্রিয় হননি : তাঁর জনপ্রিয়তার সূদূত ভিত্তি ছিল। তাঁর পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা, অপরূপ কাহিনী-বয়ন ক্ষমতা, তাঁর অপরিমেয় সহানুভূতি শক্তিশালী লেখকদের মধ্যেও অতিশয় বিরল গুণ। সর্বোপরি, শরৎচন্দ্রের মনোরম লিখন-ভঙ্গীর কি কোনো তুলনা আছে? শরৎচন্দ্রের অগ্নি সব রচনা-বৈশিষ্ট্য যদি বিতর্কের খাতিরে আমরা এই মুহূর্তে খারিজ করেও দিই, তা হলেও এই একমাত্র গুণের দরুণ—এই অসাধারণ লিখনচাতুর্য হেতু—বাংলার পাঠকসাধারণের হৃদয়রাজ্যে তিনি চিরকাল না হোক বহু দীর্ঘকাল সূদূতভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকবেন।

আশ্চর্যের বিষয়, শরৎচন্দ্রের মনোরম লিখন-ভঙ্গী বা স্টাইল সম্বন্ধে বাদী-প্রতিবাদী কেউ একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। একজন বিশিষ্ট লেখকের এ যে কীরকম বিচার-ক্রিয়া, কীরকম মূল্যায়ন-পদ্ধতি তা আমার বুদ্ধিতে আসে না। শ্রীকুমারবাবুর পক্ষে শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে অল্পকূলে সবচেয়ে যেটা বড় যুক্তি হতে পারত, নানা অনাবশ্যক কথার ডামাডোলের মধ্যে সেই মোক্ষম যুক্তিটিই তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। শরৎচন্দ্রের মত ভাষার জাহ্নু আর কোনো কথাশিল্পীর লেখনীতে কি আজ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে? শরৎচন্দ্রের কালের সমাজ বদলেছে, পরিবারের কাঠামো বদলেছে, ব্যক্তির উপর সমাজের চাপের আর পূর্ব-কঠোরতা নেই; ফলে শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতটিও

আজ কিছু পরিমাণে বদলে গেছে তা অস্বীকার করবার যো নেই। সবই মানলাম, কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের যেটা অপরিবর্তনীয় ধ্রুব গুণ—স্টাইলের জাহ্নু—তার তো আর পরিবর্তন হয়নি। তবে কেন আমরা অরুণবাবুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শরৎ-সাহিত্যকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করব, আবার শ্রীকুমারবাবুর কথার প্রতিধ্বনি করে “হায় রে সেকাল” বলে শরৎচন্দ্রের কালের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপের ভঙ্গীতে দীর্ঘশ্বাস মোচন করব? কোনো লেখকের কালকেই কি আর ধরে রাখা যায়, তাঁর সাহিত্যকেই শুধু ধরে রাখা চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার জমিদারকেন্দ্রিক সমাজের আজ ছিটেকোটাও অবশিষ্ট নেই, তা বলে তাঁর সাহিত্যের কি লয়ক্ষয় হয়েছে? একই বিচারের নিরিখ শরৎচন্দ্রের বেলায়ও প্রযোজ্য। শরৎচন্দ্রের কাল অপগত হয়েছে, কিন্তু কালাতিশায়ী হয়ে বেঁচে আছে শরৎ-সাহিত্যের স্নগভীর আবেদন। উড়িয়ে দিতে চাইলেই ওই আবেদন উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শরৎ-সাহিত্যের যেটা আসল সঙ্গীর্ণতা, সেটা অরুণবাবু নির্দেশ করেননি। পক্ষান্তরে যেটা শরৎচন্দ্রের মহত্তম গুণ—স্টাইলের সৌন্দর্য ও তদ্রূপ পাঠকমনকে মোহিত করবার ক্ষমতা—সেটা শ্রীকুমারবাবুর দ্বারা চিহ্নিত ও কীৰ্তিত হয়নি। স্মরণ্য কেমন করে বলি যে ওই দুই মূল্যাক্ষন-প্রয়াসের ভিতর শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে যথার্থ সত্যের উদ্ঘোষণ হয়েছে? দুটি বিচার-ধারাই একতরফা, স্মরণ্য অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। গুণের কথা বলেছি, এবার দোষের কথাটা বলি।

শরৎ সাহিত্যের মূল ত্রুটি এইখানে যে, তা শ্রেণীগত পক্ষপাতের দ্বারা মলিন। ব্যক্তি হিসাবে শরৎচন্দ্র অপরিমেয় দরদের অধিকারী ছিলেন : মানুষের দুঃখে তাঁর অন্তর স্বতঃই কেঁদে উঠত, বিশেষ সেই মানুষ যদি নির্ধাতিত শোষিত স্তরের হয় তা হলে তাঁর সহানুভূতির অভিব্যক্তি আর বাধা মানতে চাইত না। কিন্তু এটা হল শরৎচন্দ্রের হৃদয়গত বিচার। মননগত বিচারের ক্ষেত্রে এসে দেখতে পাই, শরৎচন্দ্র তাঁর স্বকালে প্রবহমান শ্রেণীগত ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে অযৌক্তিক পক্ষপাত ও অন্তায় লুকিয়ে আছে তার উপরে উঠতে পারেননি। রাঢ় দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণের অহুদার কুসংস্কারে তাঁর চিত্ত ভরপুর ছিল। বাংলার সমাজজীবনে বহু অনর্থের কারক ব্রাহ্মণ-শ্রেণী সম্পর্কে তাঁর শ্রেণী-পক্ষপাতজনিত গদগদ চেতনা বহুক্ষেত্রেই সত্যবিচারে উপনীত হতে তাঁকে বাধা দিয়েছে। কোন মহৎ শিল্পীর কাছ থেকে এরকম মনোভাব আশা করা যায় না। শরৎচন্দ্র বিদ্রোহীও ছিলেন না, বিপ্লবীও

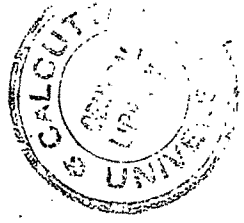
ছিলেন না, আসলে তিনি ছিলেন স্থিতিবস্থার পরিপোষক, যে স্থিতিবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে কুলীন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় তাঁদের সর্ববিধ স্বথ-স্ববিধা নিয়ে বহাল-তবিয়েতে রয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক ছিলেন, কিন্তু এরকম উৎকট সাম্প্রদায়িকতা তাঁর ছিল না। তিনি হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কথা ভেবেই লেখনী চালনা করেছেন, ওই সমাজের কোনো খণ্ডাংশের কথা ভেবে নয়। শরৎচন্দ্র হৃদয়বতার দিক দিয়ে খুব ঐশ্বর্যবান, কিন্তু মননশীলতার দিক দিয়ে দরিদ্র। তাঁর মানস-পটভূমি রাঢ়দেশের সঙ্কীর্ণ সীমার বাইরে বেশীদূর প্রসারিত ছিল না। এই দিক হুঁতু যদি অরুণবাবু তাঁর আক্রমণ চালাতেন, তা হলে আমাকে তাঁর সহযোগী হিসাবে পেতেন।

তবু সব বলা-কওয়ার পরও যে কথাটা থেকে যায় তা হচ্ছে এই যে, শরৎচন্দ্র এক আশ্চর্য শিল্পী। তাঁর গল্পোপন্যাস বার বার পড়েও তৃপ্তি হয় না। তাঁর অনবদ্য ভাষার জাদুতে, কাহিনীর মনোজ্ঞতায় আর চরিত্রসৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতায় সকল প্রতিকূলতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। না-ই বা পেলাম তাঁর লেখায় কাব্যের স্বাদ কিন্তু জীবনের গভীর স্বাদ তো মেলে। শিল্প ও শিল্পীর মূল্যায়নে তার দাম কি কিছু কম?

॥ বেঙ্গলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই ॥

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর	প্রাণতোষ ঘটকের	
আয়ুবের সঙ্গে	২'০০ ॥ মুক্তাভাস্ম	২য় মুঃ ৫'৫০ ॥
সতীনাথ ভাদুড়ীর	স্ববোধ ঘোষের	
পত্র লেখার বাবা	৪'০০ ॥ শ্রেষ্ঠ গল্প	৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥
আনন্দকিশোর মুন্সীর	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
ভেলকি থেকে ভেমজ	৩য় মুঃ ৬'৫০ ॥ প্রাগৈতিহাসিক	৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
কয়লাকুঠির দেশে	২য় মুঃ ৩'৫০ ॥ শ্রেষ্ঠ গল্প	৩য় মুঃ ৫'০০ ॥
বিক্রমাদিত্যের	রমাপদ চৌধুরীর	
যুদ্ধের ইয়োরোপ	৩'৫০ ॥ পিয়ামপন্দ	৫ম মুঃ ৩'০০ ॥
যোগেশচন্দ্র বাগলের		
বিজোহ ও বৈরিতা		
২'০০ ॥		

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো



সাহিত্যের খবর
বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ৪র্থ ॥
পৌষ, ১৩৬৯

আহ্বান

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ ।
জীবন রণে জীবন দানে
সবারে করহ আগুয়ান ।
হাতে হাতে ধরি দাঁড়াইব সারি সারি
প্রাণে বাঁধিতে হবে প্রাণ,
আলস্য জড়তা নিরাশ-বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ ।
তরুণ তপনে মধুর কিরণে
সত্ত্ব কি হাসিবে প্রাণ ?
সুখের কোলে ভাবেতে গলে
কে রবে কে রবে শয়ান ?
সাধিতে বীরের কাজ পর হে বীরের সাজ
করে ধর সাহস কৃপাণ,
জীবনব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান ॥

—মুকুন্দদাসের যাত্রার গান

খৃষ্টান মিশনারী ও ভারত-ইতিহাস

মুরারি ঘোষ

গোয়া থেকে পর্তুগীজ মিশনারীগণ ডেপুটেশন পাঠালেন সম্রাট আকবরের দরবারে। সম্রাট আহ্বান জানিয়েছেন। তাই এই ডেপুটেশন। পর্তুগীজ যাজকেরা উল্লসিত। এইবারে বোধ হয় সম্রাট খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নেবেন। বাছা বাছা কয়েকজন যাজক আকবরের রাজসভায় হাজির। কয়েকদিন ধরে কেবল আলোচনাই চললো। আকবর স্থিরচিত্তে খৃষ্টকথা শোনেন। কিন্তু সভা-মৌলবীরা তর্ক জুড়ে দেন। সম্রাটের মৌজ্ঞপ্রকাশে কমতি ছিল না। যথেষ্ট আদরযত্নে যাজকদের আতিথেয়তা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন না। পর্বটক মান্নুচী বলছেন আকবরের কিছু খৃষ্টান রাজকর্মচারী ছিল। তাদের স্ত্রিবিধের জন্তেই যাজকদের ডেকে আনা। অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অন্য কথা বলেন। আকবর স্বয়ং-উদ্ভাবিত ধর্মমতে সর্ব-ধর্মসম্ময়ের কারণে খৃষ্টতত্ত্বের আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। যাজকেরা স্ত্রিবিধে করতে না পেরে গোয়ায় ফিরে এলেন।

এরপরে আরো দুটো মিশন রাজসভায় গিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে পর্তুগীজ সম্রাটের আশা ছিল আকবর বোধ হয় খৃষ্টান হবেন। সেই বাবদে সমগ্র ভারতে একদিন পর্তুগীজ সাম্রাজ্য কায়ম হবে। আকবরের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তৃতীয় পর্তুগীজ মিশন রাজসভায় স্থান পেয়েছিল। যাজকেরা অশেষ পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু আকবরের যে নিজস্ব এক ধর্মমত ছিল এঁদের কেউ তা ধরতে পারেননি। এই ভুল শুধু সম্রাট আকবর সম্পর্কে নয় সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কেই হয়েছিল। ইগনাটিয়স-অ-লায়লা (Ignatius of Layola) খৃষ্টধর্ম প্রচারের মানসে সোসাইটী অব জিসাস স্থাপন করলেন। দেশে দেশে সোসাইটীর সদস্যরা ছড়িয়ে পড়লেন। এই সোসাইটীর সদস্যরাই সম্রাট আকবরকে ধর্মাস্ত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আকবরকে কেন্দ্র করে যে ভুল তাঁদের হয়েছিল ভারতে প্রথম যুগে খৃষ্টধর্ম প্রচারে মেটাই ছিল মিশন সদস্যদের সাধারণ রীতি।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে আলবুকার্ক গোয়া দখল করলেন। শাসকবর্গের সঙ্গে পর্তুগীজ যাজকেরা গোয়ায় এসে পৌছোলেন। তরবারি আর বাইবেল দুটোই

ছিল অল্প। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার এলেন সোসাইটীর নেতা হয়ে। সম্ভবতঃ প্রচেষ্টার মধ্যে কাজ শুরু হল। স্বল্পবিত্ত সর্বহারা সম্প্রদায়ের মধ্যেই জেভিয়ার অল্পপ্রবেশ করলেন। তাও উল্লেখযোগ্য কোন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নয়। ‘পরব’ নামে সমুদ্রোপকূলবর্তী এক জেলে সম্প্রদায় গোষ্ঠীগত ভাবে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ষোড়শ শতকে এর চেয়ে উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য খৃষ্টান মিশনারীরা লাভ করেননি।

এই সাধারণ অসাফল্যের একমাত্র কারণ ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে খৃষ্টান মিশনারীদের গভীর অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা। ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মত উৎসর্গিত প্রাণ মহান ধর্মযাজকের সীমিত জ্ঞান প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। জেভিয়ারের একবারও মনে হয়নি যে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ধর্মভীরু মানুষদের দেশে এসেছেন। এখানে আড়াই হাজার বছরের পুরানো এক ধর্ম বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেশের অন্তরে চিরকালের জন্মে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। এদেশ থেকেই এশিয়ার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বে সাফল্যময় ধর্ম-অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এশিয়ার ধর্মগুরুর আসন পেয়েছে ভারতবর্ষ। পাহাড় মরু, বনপথ ডিঙিয়ে এশিয়ার ধর্মপ্রাণ মানুষেরা ভারতবর্ষে এসেছেন তীর্থ-ভ্রমণ সাঙ্গ করতে। জেভিয়ারের যতখানি দুর্ময় আশা ছিল অমানুষিক ব্যর্থ পরিশ্রমে তা একদিন হতাশায় পরিণত হয়ে গেল। ধর্মনেতা ইগনাটিয়স-অব-ল্যায়োলাকে যে পত্র দিলেন তা গুণিধানযোগ্য :

“The natives are so terribly wicked that they can never be expected to embrace Christianity. It is so repellent to them in every way that they have not even patience to listen when we address them on the subject, in fact, one might just as well invite them to allow themselves to be put to death as to become Christians. We must now therefore limit ourselves to retaining those who are already Christians.”

অনেক আশা নিয়ে জেভিয়ার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সকল ধর্মের চেয়ে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। জেভিয়ার আর তাঁর শিষ্যবর্গের ধারণা ছিল যে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার আর দেশজ সামাজিক অন্ত্যায়গুলির দিকে হিন্দুদের চোখ ফেরাতে পারলেই কাজ হ’বে। এদেশের জাতীয় আচরণ ও ধর্মবোধ বিষয়ে মিশনারীদের এই সাধারণ অজ্ঞতা তাদের অতিমানবিক পরিশ্রমেও সফল আনেনি।

কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তাঁদের পরিশ্রম আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। তা হল মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলনে। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁরা যুগধর্মকেই সেবা করেছেন। স্বল্পভে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কারণে খৃষ্টান-সাহিত্য প্রচার-উদ্দেশ্যে মুদ্রণযন্ত্রের প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রিত সাহিত্যসৃষ্টি খৃষ্ট যাজকেরাই করেছেন।

গোয়ার মুদ্রণযন্ত্র আমাদানি হল ১৫৫৬ সালে। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র। আমাদানি করলেন সোসাইটির যাজকেরা। প্রথম বই ছাপা হল যাজক জেভিয়ারের Doutrina Christie (1557)। জেভিয়ারের সময় কোন প্রাদেশিক ভাষাই যথেষ্ট সাহিত্যমূল্য বহন করতো না। বিদেশী যাজকেরা ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হয়ে প্রথম প্রথম দেশীয় ভাষার সহায়তা নিতে শুরু করেন নি। পর্তুগীজ ও ল্যাটিন ভাষাই ছিল মাধ্যম। দুরূহ বিদেশী ভাষায় ধর্মপ্রচারের অসুবিধেগুলি টের পেতে বেশী দেরী হল না। চোখ পড়লো দেশী ভাষাগুলির ওপর। সাধারণের বোধগম্য করে দেশী ভাষাগুলির মাধ্যমে বাইবেল, প্রার্থনা পুস্তক আর খৃষ্টধর্মের মূল নীতিগুলি প্রচারের মূল্য তাঁরা উপলব্ধি করলেন। Doutrina Christie তামিল অক্ষরেও মুদ্রিত হল ১৫৭৮ সালে। দেশী অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বই। মুদ্রাকর-সম্পাদক ফাদার রে: জাও ভা ফারিয়া। ভারতে মুদ্রিত প্রথম যুগের এই ছুটির সন্ধান এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই ছুটি বই থেকেই ভারতের মুদ্রণযুগের শুরু। এই সূচনা হল খৃষ্টান যাজকদের দ্বারাই।

ফাদার জাও (Father Jao) দেবনাগরী অক্ষরও ঢালাই করে রেখেছিলেন। তখন দেবনাগরী অক্ষরে ঐ প্রেস থেকে কোন বই ছাপা হয়েছে বলে জানা যায়নি। কিন্তু সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন ভাষায় খৃষ্ট যাজকদের মুদ্রণ-প্রচেষ্টায় সন্ধান পাওয়া যায়। যাজক টমাস স্টিকেশের মারাঠী ভাষায় ‘খৃষ্ট পূরাণ’ (১৬১৬ খৃ:) কিংবা Doutrina Christie-এর মারাঠী অনুবাদ মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য কাজ। এমন কি মারাঠী কাব্যে ‘সেন্ট এন্টনির’ জীবনীও (১৬৫৫) লিখিত হয়েছে। দেশের শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মাতৃভাষায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার আগেই খৃষ্ট যাজকেরা যে মনোনিবেশ করেছিলেন তার বৈপ্লবিক ফল এখন আমরা চূড়ান্ত ভাবে ভোগ করছি। বিশেষ করে তামিল মারাঠী হিন্দী আর বাংলা ভাষার প্রাথমিক পর্যায়ে খৃষ্টান যাজকদের অশেষ দান স্মরণীয়। তামিল ভাষায় ফাদার ফারিয়া, টমাস বেস্টি, ফাদার জিগেনবাল, ফিলিপ ফ্যাড্রিসিয়াস, বেঞ্জামিন স্কল্ট্জে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তামিল ভাষার অন্যতম দক্ষ

কারিগর ফাদার জিগেনবার। এই ভাষায় সরল ব্যাকরণ রচনা তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। এছাড়া একাধিক খৃষ্টীয় দর্শনের বই তাঁর রচিত। জিগেনবার নিজেই একটা ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তামিল ভাষায় প্রার্থনা-পুস্তক রচনা করেছেন বেঞ্জামিন স্লন্টজে। স্লন্টজের আর এক কীর্তি হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ রচনায়। তামিল ভাষায় বিখ্যাত অভিধান সংকলন করেন ফাদার ফ্যারিসিয়ান। স্লন্টজে তামিল, তেলেগু, হিন্দুস্থানী তিন ভাষাতেই বাইবেলের অংশ-বিশেষ অনুবাদ করেন।

হিন্দীভাষায় উল্লেখযোগ্য নাম ফাদার হেনরী মার্টিন। তিনি আন্তরিক যত্নের সঙ্গে হিন্দী, পার্শী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। হিন্দী ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন ফাদার মার্টিন।

বিদেশী বণিকের ধর্ম ও রাজনীতিই হল মুখ্য কারণ। শাসকের অনুশাসনে আর ধর্মের বন্ধনে ভারতীয় ভাষাচর্চার অল্পকূল আবহাওয়া পর্তুগীজ ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল। ষোড়শ শতকের প্রথম পর্বে পর্তুগীজ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই এই চেষ্টার শুরু। গির্জার মঠে সাধু-সন্তদের দেশীয় ভাষা রপ্ত করা অবশ্য-কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। ভারতীয় ভাষায় দখল থাকলে বর্ধিত বেতন ও বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা ছিল। গোয়ায় প্রথম যে ধর্মীয় অনুশাসন রচিত হল তাতে তৎকালীন আর্চবিশপের এই মর্মে নির্দেশনামা জারী হয়েছিল যে এ দেশীয় কোন ব্যক্তিকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার আগে তার মাতৃভাষার দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমে মাতৃভাষায় তার যথাযথ শিক্ষা সমাপ্ত হবে, তবে তার ধর্মাস্তকরণে মনোযোগ দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য, পরে ধর্মাস্তরিত ব্যক্তি মাতৃভাষার মাধ্যমেই নতুন ধর্ম প্রচারে ব্রতী হবে। পর্তুগীজ শাসন ও ধর্মের এই সমস্ত অনুশাসন দক্ষিণ ভারতে তামিল ও মারাঠী ভাষার উন্নতির সহায়ক হয়েছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় নয়, মঠ-মন্দিরের উৎসাহে জাতীয় ভাষাগুলি স্বগঠিত ও স্থলিখিত হবার প্রাথমিক সুযোগ পেয়েছে। সাধারণের মধ্যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ভাষা রূপে নয় শিক্ষার ভাষা রূপেও প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পর্তুগীজদের এই প্রচেষ্টা বাংলা দেশেও ফলবতী হয়েছে।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধ্বে বাংলা দেশে পর্তুগীজ ঘাঁটি স্থাপন শুরু হল। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায়। মিশনারী প্রচারকদের বসবাস শুরু হয়েছিল একই সঙ্গে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পর্তুগীজ যাজকদের প্রকাশিত বাঙলা বই-এর খবর পাওয়া যায় (Bengal : Past and Present :—1914

July-Dec ।) কেবল খবরই। কেননা অধুনা এ সব বই-এর শাস্ত্রাংগ মেলেনি। গোয়ায় অবস্থানকারী ফাদার মার্কোস সান্তোচ্চী-এর (Father Marcos Santocci) বিরতি থেকে জানা যায় যে বাঙলা ভাষায় পতু'গীজ যাজকেরা শব্দ-সংগ্রহ, ব্যাকরণ ও প্রার্থনার ওপর বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনা করেছিলেন। অবশ্য এর পরের যুগে পতু'গীজ ফাদার আন্তুস্পাসাও-এর বাঙলা বই-এর সন্ধান মিলেছে। তাঁর প্রথম বই : “Catechism de doutrina christa” লিসবনে মুদ্রিত হয়। এ বই-এর এক পৃষ্ঠা পতু'গীজ ভাষায় ও অপর পৃষ্ঠা তার বাঙলা অনুবাদে মুদ্রিত। দ্বিতীয় বই : “রূপার শাস্ত্রের অর্থভেদ”। তৃতীয় বই, পতু'গীজ ও বাঙলা ভাষার শব্দসংগ্রহ।

আরেকজন পতু'গীজ মিশনারী Bento de Silvestre রচিত লগুনে প্রকাশিত প্রার্থনামালার সন্ধান পাওয়া যায়। পতু'গীজ মিশনারীদের এই সব প্রচেষ্টা অতি সাধারণ সূচনা মাত্র হলেও তা ভবিষ্যতে এক বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের আভাস দেয়। বাঙলা দেশে এর পরের ইতিহাস আরো বিচিত্র, আরো ব্যাপক। সেই বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের নায়ক রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী। শুধু মাত্র বাঙলা গণ্য নয় ভারতীয় প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর রয়েছে।

প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় খুঁটান যাজকেরা এদেশে পথিকৃত। ধর্মপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও খুঁটান মিশনারীরা আপন কর্মপ্রভাবে ইতিহাসের যন্ত্র রূপে কাজ করে গেছেন। ধর্মের পথ পেরিয়ে সামাজিকতার বৈপ্লবিক পট পরিবর্তনে তাঁরা অজ্ঞাতসারে অক্লান্ত কর্মী রূপেই পরিচিত।

সমরায়োজনে

চাই

স্বর্ণালঙ্কার ।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে

মুক্তহস্তে দান করুন।

বাংলায় কালিদাস-চর্চা

অমলেন্দু ঘোষ

[বিক্রমোর্বশী]

ট্রোটক ছন্দে রচিত বিক্রমোর্বশী নাটক মোট পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। কালিদাস-চর্চায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন, 'বিক্রমোর্বশী'ই কালিদাসের প্রথম নাটক। দ্বিতীয় নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। তৃতীয় নাটক—শকুন্তলা। বিক্রমোর্বশী নাটকে বর্ণিত উর্বশী-পুরুষবা কাহিনী বেদগ্রন্থেও পাওয়া যায়।

কাহিনী-পরিচয় ॥ আকাশপথে বিচরণকালে তিন সখির মধ্যে উর্বশী হঠাৎ এক দুরন্ত দানব কর্তৃক অপহৃত হয়। দানবের হাতে বন্দিণী উর্বশী ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তখন অবশিষ্ট দুই সখি উর্বশীর বিপদে কেঁদে ওঠে। এদিকে, সূর্যের উপাসনা সমাধা করে মর্তের রাজা পুরুষবাও আকাশপথে মর্তে ফিরছিলেন। এমন সময়, নারী-কণ্ঠের আর্তস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে যান। এবং উর্বশীকে দানবের হাত থেকে উদ্ধার করে আনেন। রাজার চেষ্টায় ক্রমে উর্বশীর জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু পুরুষবাকে দেখে উর্বশী যেমন আকৃষ্ট হোলেন রাজাও উর্বশীকে পাবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অবশেষে নানা নাটকীয় সংঘাতের পর উভয়ে মিলন হয়।—সংক্ষেপে এই হোল বিক্রমোর্বশী নাটকের কাহিনী।

প্রসঙ্গ-কথা ॥ বিক্রমোর্বশী নাটক-প্রসঙ্গে বিতাসাগরমহাশয় বলেছেন : “ইহাতে পুরুষবা ও উর্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্বশীর আত্মোপান্ত শকুন্তলার ত্রায় সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন পুরুষবা, তাঁহার অশেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন,—এ বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর যে, কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।”—[সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।]

দুই ॥ অল্পবাদপঞ্জী

১৮৫২ [১২৬৬]

বিক্রমোর্বশী । কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্বশী নাটকের উপাখ্যান ভাগ ।
শ্রীরামসদয় ভট্টাচার্য প্রণীত । পৃ. ২, ১১৫

[A Tale From The Bikramorbashree of Kalidas By
Ramsadaya Bhattacharjea.]

কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস, ১৮৫২ ।

অল্পবাদের নমুনা : [পঞ্চম অঙ্ক] :

“নরপতি উর্বশী সম্ভিষ্যাহারে রাজধানীতে উপনীত হইয়া পরম স্নেহে
কালযাপন করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ উর্বশী তৎসহযোগে গর্ভবতী হইলেন,
সুত্রপতির শাপান্তর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরুঢ় হইল । তখন সাতিশয়
দুঃখিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় ! সকলই গর্ভোদয়ে পুত্রমুখ
নিরীক্ষণ ও স্বামীকে প্রদর্শন করিবার প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া থাকে, কিন্তু
আমি কি হতভাগিনী ! স্বামী পুত্রমুখ বিলোকন করিলে, আমি তাঁহার
বদনসুধাকর দর্শনে বঞ্চিত হইব, এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল ।
যাহা হউক গোপনে গর্ভাবস্থা অতিবাহন করিয়া প্রসবকাল উপস্থিত হইলে
কোনরূপে স্থানান্তরে প্রসব করিয়া কাহারও হস্তে সন্তান সমর্পণ করিব, এই
নিশ্চয় করিয়া নিয়ত তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
অপ্সরজাতির গর্ভলক্ষণ মনুষ্যগণের চায় অনায়াসলক্ষ্য নহে ; সুতরাং কিঞ্চিৎ
প্রযত্ন ও কৌশল করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে গর্ভাবস্থা অতিক্রম করিলেন
এবং এক বিজন প্রদেশে এক স্কুমার কুমার প্রসব করিয়া সত্ত্বর সেই সন্তোজাত
সন্তানকে চাবন মূনির আশ্রমে সত্যবতী নাম্নী এক তাপসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া
প্রত্যাগত হইলেন এবং পূর্ববৎ অসংকুচিত চিন্তে কালাতিপাত করিতে
লাগিলেন ।”

বিজ্ঞাপন : “সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি কালিদাস-প্রণীত বিক্রমোর্বশী নামক
নাটক অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল, ইহা মূল গ্রন্থের অবিকল
অল্পবাদ নহে, উপাখ্যানটি মাত্র সংকলিত হইয়াছে, এবং অনেক স্থানে অল্পবাদিত
হইয়াছে । অতএব সংস্কৃতভিজ্ঞ মহাশয়গণের নিকট আমার এই নিবেদন, যে
সাধারণের নিকট কালিদাস-কৃত বিক্রমোর্বশীর একরূপ কদাচারে পরিচয় দান
নিবন্ধন অপরাধ মার্জনা করিয়া যেন আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন । আর

সংস্কৃতানভিজ্ঞ মহাশয়দিগের নিকট এই প্রার্থনা যে এই অনুবাদিত গল্পটি মাত্র পাঠ করিয়া যেন বিক্রমোর্বশীর রসবত্তার উৎকর্ষাপকর্ষ অবধারিত না করেন।...

১০ই অগ্রহারণ, সংবৎ ১৯১৬

১৮৬২ [১২৬২]

বিক্রমোর্বশী। সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমোর্বশী ত্রোটকের উপাখ্যান ভাগ।
শ্রীধারকানাথ গুপ্ত প্রণীত। পৃ. ৯৯, ৯৮

[কলিকাতা, জে. জি. চ্যাটার্জি এণ্ড কোং মুদ্রিত। ১৮৬২]

অনুবাদের নমুনা : [পঞ্চম অঙ্ক] :

“রাজা উর্বশী সঙ্গে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলে স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং প্রজাগণ সকলেই আহ্লাদ-মাগরে নিমগ্ন হইয়া রাজ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। রাজা, সকলকেই প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার অনুপস্থিত কালের কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে ঐক্য বাক্যে মহারাজের বিরহ দুঃখ ব্যতীত আর কোন দুঃখ উপস্থিত হয় নাই, এই বলিয়া উত্তর প্রদান করিলেন। রাজা শুনিয়া মহানন্দিত হইলেন। অনন্তর সকলে দীর্ঘকাল বনবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা উর্বশীর লতা-ভাব-গ্রস্ত এবং সঙ্গম-মণি প্রভাবে তাঁহার পুনর্লীভের বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন। সকলে শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।”

প্রচ্ছদপত্র ও আখ্যাপত্রে যথাক্রমে ‘সম্ভাব শতক’ ও ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ থেকে দুইটি উদ্বৃতি আছে। যথা,—

আতর সঞ্চিত নাই, বঞ্চিত সঁাতারে।

মানসে মনন যেতে পয়েনিধি পারে ॥

—সম্ভাব শতক।

রাজেন্দ্র সঙ্গমে

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।

—মেঘনাদবধ কাব্য।

মঙ্গলাচরণ : [বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শ্রীকরকমলেশু]

“...স্বর-সুন্দরীদিগের মধ্যে, উর্বশী পরম রূপবতী। নিরুপম রূপলাবণ্য প্রভাবে ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের ও চন্দ্রবংশাবতঃ রাজা পুরুষবার অতিশয় প্রিয় পাত্রী হন। এই প্রযুক্তই কবিকুল-ভিলক কালিদাস ইহাকে শোভনতম ভাব

ও বাক্যাংকারে ভূষিত করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রীতি সম্পাদনার্থে তাঁহাকে প্রদান করেন। তাহাতে ইনি নৃপকুলেশ্বর রাজা বিক্রমাদিত্যেরও সতিশয় হৃদয়ানন্দ-দায়িনী হইয়াছিলেন। উপযুক্ত অংকার প্রদানে ইহার শোভা বর্ধন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়; তবে কি, কালিদাস ইহাকে যে সকল অংকার দিয়াছিলেন, আমি তাহার অল্পকরণেই ইহার বেশ বিস্তার করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু তাহাও যে সুন্দর ও সুসঙ্গত হইয়াছে এমন নয়; স্বতরাং ইহার শোভার অনেক খর্বতা হইয়াছে। যে দুই একখানি নবীন অংকার প্রদান করিয়াছি, তাহা ইহার লাবণ্যময় কমনীয় গাত্রোপযুক্ত হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না। ফলতঃ ইহাকে ভাবাংকারে ভূষিতা করিতে আমি সাধ্যানুযায়ী যত্ন ও সতিশয় আয়াস স্বীকার করিয়াছি।...

কলিকাতা। ২১শে আশ্বিন, শকাব্দা ১৭৮৪

১৮৬৮ [১২৭৫]

বিক্রমোর্বশী নাটক। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। মূল সংস্কৃতের অম্বুবাদ।
পৃ. ১০৬

[কলিকাতা, কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীকালীকিংকর চক্রবর্তি কর্তৃক
মুদ্রিত। ১২৭৫]

[আখ্যাপত্রে অম্বুবাদকের নাম নাই। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যিক পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুদিত ২য় সংস্করণ বিক্রমোর্বশী দৃষ্টে নিঃসংশয় হওয়া গেল এটি গণেন্দ্রনাথের ১ম সংস্করণ বিক্রমোর্বশী। ২য় সংস্করণের 'নিবেদন' অংশে উদ্বৃত্ত অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য মিলিয়ে নিয়েই একথা বলা গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সংস্করণের আখ্যাপত্রে ভারবির একটি সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত আছে।

পরপ্রণীতানি বচাংসি চিব্বতাং

প্রবৃত্তিসারা খুলু মাদৃশাং গিরঃ।

পাঠকের সুবিধার জগ্গেই অম্বুবাদকের নামাক্ষিত ২য় সংস্করণ অবলম্বনেই এখানে আলোচনা করা গেল।

বিক্রমোর্বশী নাটক। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। মূল সংস্কৃতের অম্বুবাদ।
৩গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অম্বুবাদিত। প. ৯৭ ২য় সংস্করণ, সন ১৩০৮ সাল।

কলিকাতা, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনুবাদের নমুনা : [গত-পত]

[বথারুড় রাজা, সার্থি ও ভয়নিমীলিতাক্ষী উর্বশীকে ধরে
চিত্রলেখার প্রবেশ] ।

চিত্র ॥ ভয় নাই আর সার্থি !

রাজা ॥ আর বথা ভয় ।

পলায়েছে দৈত্যগণ, তাজ ভয় ভীৰু !
বজ্রির মহিমা এই রক্ষিছে ত্রিলোক ।
তোমার আয়ত চক্ষ মেলাও স্তন্যরি ।
সরোবরে নিশাশেষে আপনি আপনি
কমল যেমন ফুটে ।

চিত্র ॥ এখনো চেতনা

হায় ! হলো না সখীর, বহিছে নিশ্বাস,
এইমাত্র রহিয়াছে জীবিত-লক্ষণ ।

রাজা ॥ বড় ভয় পেয়েছেন প্রিয়সখী তব ;
মন্দার কুসুমমালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দেখায়ে দিতেছে যেন হৃৎকম্প তাঁর
সুবিশাল স্তনমধ্য কাঁপিছে নিশ্বাসে
মুহমুহ পড়ে উঠে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ।

চিত্র ॥ স্থির ও প্রিয়সার্থি ! অপসরাগণের
হেন কি উচিত হওয়া ?

রাজা ॥ যায় নি এখনো

আহা ! ভয়-কম্প তাঁর, কুসুমের মত
কোমল হৃদয়ে স্তন-আবরণ যেই
চিকণ বসন, আহা কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দেখায়ে দিতেছে সেই ভয়কম্প তাঁর ।
সচেতন হয়েছেন প্রিয়সখী তব ।
আবিভূত হলে শশী, যথা অন্ধকার
ছাড়ে রজনীকে ক্রমে, নিশাকালে যথা
অগ্নিশিখা ধূমরাশি কাটি দেয় দেখা ।
বেগবতী ভাগীরথী, তীর ভাঙ্গি যবে
তার শ্রোতোমুখে পড়ে, হয় কলুষিত,

ক্ষণকাল পরে ক্রমে আপন বেগেতে
দূরে ফেলি পুনঃ তারে প্রসন্ন সলিলে
যান চলি যেই রূপ, সে রূপ তোমার
সখীর স্মৃতি হতে ক্রমে মোহাবেশ
ছাড়িয়া যাইছে এবে দেখ দেখ চেয়ে ।

চিত্র ॥ উঠ উঠ প্রিয়সখি ! দেবগণ-স্মরি
হয়ে পরাত্যুত এবে হয়েছে হতাশ ।
দয়াবান্ মহারাজ আপন্ন তরিতে ।

উর্ব ॥ [চক্ষু মেলে]
প্রকাশিয়া অস্ত্রজাল মহেন্দ্র আপনি
উদ্ধার কি করেছেন এ আপদ হতে ?

চিত্র ॥ মহেন্দ্র-সদৃশ মহারাজ পুরুরবা
রেখেছেন এ আপদে ।

উর্ব ॥ [রাজাকে দেখে স্বগত]
দানবেন্দ্র হতে ?
অপমান মোর যাহা, উপকার তাহা
করেছে আমার তবে হইবে বলিতে ।

নিবেদন : “তেত্রিশ বৎসর অভীত হইল আমার পূজনীয় জ্যোতিষাত
৬গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্বে সংস্কৃত নাটকের
যথাযথ অনুবাদ [গণ্ডে পণ্ডে] প্রকাশ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার
প্রকাশিত গ্রন্থের সমস্ত খণ্ড নিঃশেষ হওয়ায় উহা আবার মুদ্রিত হইল।

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গণেন্দ্রনাথের বিক্রমোর্বশী প্রকাশের ৩০ বছর পর ওই অনুবাদ-প্রসঙ্গে
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর বিক্রমোর্বশী অনুবাদের ‘নিবেদন’ অংশে বলেছেন : “...
[বিক্রমোর্বশী’র] প্রাকৃত গানগুলি প্রক্ষিপ্ত কিনা সে বিষয়ে মতান্তর থাকিতে
পারে। এক্ষণে, যাহারা এই প্রাকৃত গানগুলি পাঠ করিবার জন্ত কুতূহলী
তাহারা পূজনীয় মদগ্রজ ৬গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গদেশ প্রচলিত বিক্রমোর্বশী
নাটকের অবিকল বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ
করিতে পারেন।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতির' [দ্রঃ 'বাড়ির আবহাওয়া' অধ্যায়] মধ্যেও
গণেন্দ্রনাথের বিক্রমোর্বশী অনুবাদের উল্লেখ রেখে গেছেন।

১৯০১ [১৩০৮]

বিক্রমোর্বশী। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত। পৃ. ৭০,
৮৪। [কলিকাতা, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০৮]
অনুবাদ : গদ্য-পদ্য।

অনুবাদের নমুনা : [পঞ্চম অঙ্ক]

[গন্ধমাদন পর্বত-প্রান্তে 'অকলুষ' অরণ্য।...উন্নত-বেশে রাজার প্রবেশ।]

রাজা ॥ ওরে দুরাছা রাক্ষস ! দাঁড়া-দাঁড়া—আমার প্রিয়তমাকে কোথায়
নিয়ে যাচ্চিস্ ? কি উপাত্ত ! আকাশে উঠে শৈল-শিখর হতে আমার উপর
যে বাণ বর্ষণ করচে। [চিন্তা করিয়া]

নব জলধর এযে—নহে দৃষ্ট বর্ষাবৃত

রাক্ষস ভীষণ।

এযে দেখি দুরাক্ষষ্ট ইন্দ্রধনু—এতো কভু

নহে শরাসন।

প্রবল এ বৃষ্টিপাত, এতো নহে রাক্ষসের

বাণ পরম্পরা,

কনক নিকষ স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ এ—এতো নহে

প্রেরয়ী অপ্সরা ॥

[চিন্তা করিয়া] তবে সে রন্তোর না জানি এখনো কোথায় ?

থাকিবে কি কোপ-বশে হইয়া প্রচ্ছন্ন কায়

শক্তির প্রভাবে ?

কিন্তু সে যে নাহি পারে-স্থাকিতে গো বহুক্ষণ

মানিনীর ভাবে।

যদি স্বর্গে গিয়া থাকে—আমা প্রতি পুন তার

হবে আর্দ্র মন।

সম্মুখে থাকিতে আমি দৈত্যেরো কি সাধ্য তারে

করে গো হরণ।

তবে সে যে একেবারে নেত্র-অগোচর হল

তাই বা কেমন ?

[চারিদিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে] হায় ! হতভাগ্য জনের একটা ছুঃখ যেন
অন্ত ছুঃখের সঙ্গে একস্বত্রে গাঁথা । কেননা,—

সহসা গো স্বদুঃসহ প্রিয়ার বিচ্ছেদ-কষ্ট

এ সময়ে হল উপস্থিত ।

নব জলধর যবে করিবে গো দিনগুলি

রমণীয় আতপ-রহিত ॥

[হাসিয়া] কেননা বৃথা এই মনস্তাপ আমি সহ্য করচি ! মুনীরা তো
বলেন—রাজাই কালের কারণ । আচ্ছা, তবে কি আমি এই বর্ষাকাল স্থগিত
রাখতে অবজ্ঞা দেব ? কিন্তু না, এই বর্ষার লক্ষণগুলিই আমার রাজোপচার
স্বরূপ । এই দেখনা,—

বিদ্যুল্লেক্ষিত অভ্র—সুবর্ণ রঞ্জিত চাকু

চন্দ্রাতপ যেন প্রসারিত,

এ নিচুল তরুণ মঞ্জরী-চামর যেন

করে ধরি' করে সঞ্চালিত ।

গ্রীষ্ম-অবসানে দেখ উচ্চৈঃস্বরে করে গান

বন্দী শিখী যত—

বণিক জলদ-দল আনিতেছে সঙ্গে করি'

ধারা-হার কত ॥

যা হোক—এই সব রাজ-বিভবের স্লাঘা করে' আর কি হবে ? আচ্ছা
আমি তবে এখন এই কাননে আমার প্রিয়াকে অন্বেষণ করি । [দেখিয়া]
হায় ! প্রিয়ার অন্বেষণ করতে গিয়ে এইগুলি যে আরও আমার বিরহের
উদ্দীপক হয়ে উঠল ।”

অনুবাদের নিবেদন : “বিক্রমোর্বশীর এই বঙ্গানুবাদে আমি মুখ্যতঃ
বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ শংকর-পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসরণ
করিয়াছি । তিনি অনেকগুলি পুঁথি পরস্পরের সহিত মিলাইয়া, সম্যক
বিচারপূর্বক যে পাঠান্তরগুলি বিস্তৃত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে
সন্নিবেশিত হইয়াছে । বঙ্গদেশে যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহার সহিত অনেক স্থলেই
এই সকল পাঠ সম্বন্ধে অনৈক্য দেখা যায় ।—শংকর পণ্ডিতের প্রকাশিত গ্রন্থের
আর একটি বিশেষত্ব এই, ইহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কের প্রাকৃত
গানগুলি একেবারে বর্জিত হইয়াছে । তিনি এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি মূল

গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে না দিয়া পরিশিষ্ট পৃথকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁর ভূমিকায় এই সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন।...যে যাহা হউক, প্রাকৃত গানগুলি প্রক্ষিপ্ত কি না সে বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে। এক্ষণে, যাহারা এই প্রাকৃত গানগুলি পাঠ করিবার জন্য কুতূহলী তাহারা পূজনীয় মদগ্রজ - গণেশেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গদেশ প্রচলিত বিক্রমোর্বশী নাটকের অবিকল বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন।”

১৯০৩ [১৩১০]

বিক্রমোর্বশী। মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্বশী নাটকের বঙ্গানুবাদ।

শ্রীবিহারীলাল রায়, বি. এ. অনূদিত। পৃ. ১১৩

১ [কলিকাতা, সাথী প্রেস—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১০]

অনুবাদের নমুনা : [পঞ্চম অঙ্ক]

রাজা ॥ অমাত্যগণের জানাও আদেশ মম

কুমারের অভিষেক আয়োজন তরে।

[কঙ্করী প্রস্থান, সকলের আকাশপথে দৃষ্টি, আকাশের দিকে চাহিয়া]

কোথা হ’তে আসে এই বিদ্যুৎসম্পাত ?

নিকষ প্রস্তরে যথা গোরোচনা রেখা,

কপিশ জটাকলাপে শশিকলা সম

শুভ্র উপবীতধারী দেবর্ষি নারদ

আসিছেন উজলিয়া অই স্বর্গপথে,

মুক্তাহার বিভূষিত অতি শোভমান

স্ববর্ণ অক্ষর-যুত কল্লবৃক্ষ সূম !

আর্য্য, শীঘ্র অর্য্য আন মহর্ষির তরে।

উর্বশী ॥ এই অর্য্য মহর্ষি কারণে।

নারদ ॥ [প্রবেশ করিয়া]

জয় জয় মহারাজ মর্ত্যের ঈশ্বর।

রাজা ॥ ভগবন্ প্রণমি চরণে।

উর্ব ॥ বন্দি দেব।

নারদ ॥ বিরহ বিহীন হও দম্পতী তোমরা।

রাজা ॥ [জনান্তিকে]

মহর্ষির আশীর্বাদ হউক সফল !

[প্রকাশ্যে]

উর্বশীর পুত্র এই বন্দিছে চরণ ।

নারদ ॥ দীর্ঘজীবী হও বৎস ।

রাজা ॥ কৃপা করি করুন এ আসন গ্রহণ ।

[সকলের উপনিবেশ]

[সর্বিনয়ে] ভগবন্ ! আগমন কোন প্রয়োজনে ?

নারদ ॥ শুন রাজা মহেন্দ্র আদেশ—

রাজা ॥ অবহিত আছি ভগবন্ ।

নারদ ॥ অন্তর্যামী দেবরাজ জানিয়া তোমার
বন গমনের বাঞ্ছা, আদেশিলা তোমা—

রাজা ॥ কি আদেশ তাঁর ?

নারদ ॥ “ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ

বলেছেন, ঘোর যুদ্ধ হইবে অচিরে

সুরাসুরে ; তুমি তাঁর সমর সহায় ।

শস্ত্র তাগ যুক্ত নহে এখন তোমার ।”

তাই তেঁই আদেশিলা, তুমি যত কাল

ধরিবে নশ্বর দেহ, উর্বশী তোমার

সহধর্মিণীর রূপে রবে তব সনে ।

উর্ব ॥ বাঁচিলাম ! অপনীত হইল এখন

সুকঠিন শেল মম হৃদয় হইতে ।

রাজা ॥ মহেন্দ্রের অতি কৃপা দেব আমা পরে ।

নিবেদন : “প্রায় তিন বৎসর পূর্বে আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ ডেপুটি
ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন চক্রবর্তী, এম. এ. মহোদয় আমাকে
মহাকবি কার্লিদাসের ‘বিক্রমোর্বশী’ অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। কোনও
অবৈতনিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ; সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ
করিবার কোনও কল্পনা তখন হয় নাই—১৩০৮ সালের জন্মাষ্টমীর পূর্বে অনুবাদ
শেষ হয়....অনুবাদে আমার কোন বিশেষ কৃতিত্ব নাই ; তবে যাহাতে
মহাকবির নামে কলঙ্ক না স্পর্শে সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অনুবাদ

কার্য যতদূর প্রকৃত করিতে পারিয়াছি, তাহাতে ক্রটি করি নাই। অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে দুইটি গান এবং দৃশ্য বিভাগ আমার নিজস্ব। ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য।... —জন্মাষ্টমী, ১৩১০। গ্রন্থকার।

১২৩২ [১৩৩২]

বিক্রমোর্বশীয়ম। নাটক। মহাকবি কালিদাস বিরচিত। প্রণীত রাজেন্দ্রনাথ
বিজ্ঞানভূষণ সম্পাদিত। ১৩৩২ মহালয়া।

[বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজের অন্তর্গত ‘কালিদাসের গ্রন্থাবলী’ ৩য় ভাগে সংকলিত বিক্রমোর্বশী; পৃ. ২১৫-৩৩১। মূল, অঘয়, অঘয় সংক্ষেপ ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, বিবরণ, অনুবাদ সহ। মূল গ্রন্থাবলী সিরিজ ৪র্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ; বর্তমান ৩য় ভাগ ১০ম সংস্করণ—১৩৬০। অনুবাদের পরিশিষ্টে দীর্ঘ ১৩ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ‘তাৎপর্য’ অংশে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং রসগ্রাহী আলোচনা আছে।]

অনুবাদের নমুনা : [দ্বিতীয় অঙ্ক]

রাজা ॥ [নিশ্বাস ছেড়ে] সখে, কিন্তু সত্য বলতে কি, উর্বশীকে দেখা অবধি চোখের এমনই দুর্দশা ঘটেছে যে, উপবনের কুসুমভারনত লতা, তাতে পর্যন্ত মন বসতে চাচ্ছে না। স্মৃতরাং যাতে আমার আশাটা মেটে, এমন একটা কিছু পথ ঠাওরাও ভাই ॥ ৫৩

বিদূষক ॥ ভাই, তার জ্ঞান ভাবনা কি? অহল্যাকে পাবার নিমিত্ত ইন্দ্র যখন পাগল হয়েছিলেন, তখন তার সচিব হয়েছিল বজ্র, আর উর্বশীর জ্ঞান পাগল হয়েছ তুমি, তোমার সচিব হব আমি। কেন না,—এক্ষেত্রে তোমরা দুইজনেই সমান পাগল ॥ ৫৪

রাজা ॥ কৈ একটু ভাবলে না তুমি? ॥ ৫৫

বিদূষক ॥ [চিন্তার ভাণ করে] এই বসলুম ভাবতে, তুমি কিন্তু প্রাণপ বকে আমার সমাধি-ভঙ্গ করো না ভাই! [হঠাৎ স্মরণ টের পেয়ে মনে মনে] ভাই তো আমি দেখছি। সত্যি সত্যিই একটা মস্ত জ্যোতিষী হয়ে দাঁড়ালুম ॥ ৫৬

রাজা ॥ সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা উর্বশী অতি দুর্লভ জেনেছি, তবুও কন্দর্পদেবের আমার উপর এই অত্যাচার। অথচ—বাসনা পূর্ণ হয়—হয়—এমন সময়ে মনের যে অবস্থা ঘটে, আমার মনও তেমনি হঠাৎ যেন মিলন-স্বপ্নের শাস্তি-মাগরে ডুবে যাচ্ছে। কি ব্যাপার এ! [মদনাতুর অবস্থায় রইলেন] ॥ ৫৫

[আকাশখানে উর্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ]

চিত্রলেখা ॥ সখি, উর্বশী ! বিনা কারণে কোথায় চল্লি—বল তো ? ॥ ৫৮
 উর্বশী ॥ [মদন-কাতরভাবে ও সলজ্জ হৃদয়ে] সেই হেমকূট-শিখরে
 লতার শাখায় যখন আমার হার জড়িয়ে গিয়েছিল, তখন সখি ! তোমায়—
 “ছাড়িয়ে দাও” গলায় “বড় জড়িয়েছে, একে ছাড়ানো আমার কর্ম নয়”—
 বলে তুমিই না আমায় ঠাট্টা করেছিলে ? আর এখন জিজ্ঞাসা করছ—কোথায়
 শুধু শুধু যাচ্ছি ? ॥ ৫৯

চিত্রলেখা ॥ কি ! সেই রাজর্ষি পুরুষবার নিকটে চলেছিস নাকি ? ॥ ৬০

উর্বশী ॥ সখি ! লজ্জার মাথাটা খেয়ে তাঁর খোঁজেই বেরিয়েছি ॥ ৬১

চিত্রলেখা ॥ সখি ! তা হলেও একটু ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত ।
 আচ্ছা বল তো—আগে সেখানে কাকে পাঠিয়েছিস ? ॥ ৬২

উর্বশী । হৃদয়কে ॥ ৬৩

চিত্রলেখা ॥ আচ্ছা তা না হয় হল । তাকে পাঠালে কে ॥ ৬৪

উর্বশী ॥ মদন আমাকে পাঠাচ্ছেন ॥ ৬৫

চিত্রলেখা ॥ এর উপর আমার আর কোন কথা নাই ॥ ৬৬

উর্বশী ॥ সখি ! এখন সেই পথটা দেখিয়ে দে, যে পথে গেলে কোনরূপ
 বাধা-বিপত্তি ঘটবে না । কেউ দেখতে পাবে না ॥ ৬৭

চিত্রলেখা ॥ সখি ! নিশ্চিত হ' । দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের দু'জনকে
 যে অপরাজিতা বিদ্যা শিখিয়েছেন, সেই বিদ্যাবলে একবার শিখা বাঁধলে পরে,
 —কোনও দৈত্য-দানব আর আমাদের দিক দিয়ে দেখতে পাবে না ॥ ৬৮

বিক্রমোর্বশী অনুবাদের পরিশিষ্টে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও রসগ্রাহী আলোচনা
 আছে তার এক জায়গায়, পুরুষবা ও উর্বশীর মিলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যাশ্রমক্ষে
 পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃষণ বলেছেন :

“মহাকবি [কালিদাস] স্বর্গের ললনাকে মর্তের অধিবাসীর প্রতি অনুরক্ত
 করাইয়া দেখাইলেন যে, মর্তেও স্বর্গের কমনীয় বস্তু আছে,—থাকিতে পারে ।
 রাজর্ষি পুরুষবার অনুপম সৌন্দর্য, অপাপ-বন্ধ-হৃদয়, অগাধ স্নেহ, তাই তাহা
 স্বর্গ-বিলাসিনীরাও প্রার্থনীয় হইল । যদি উভয়ের হৃদয় অনাবিল ও নিষ্পাপ
 হয়, বিধাতার রূপায় যদি উভয় হৃদয়েই উভয়ের নিমিত্ত উৎকর্ষা জন্মে, তবে
 স্বর্গ, অথবা ‘স্বর্গাদপি’ রমণীয়তর । তাই দানব-বাহ-পাশ-মুক্তা উর্বশী রাজার
 গুণরাশি-পাশে পুনরায় আবদ্ধ হইল ।”

পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং রসগ্রাহী আলোচনায় সমৃদ্ধ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃষণ

সম্পাদিত ‘কালিদাসের গ্রন্থাবলী’ বাংলায় অমূল্য সম্পদ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত কালিদাসের গ্রন্থাবলীর চলতি বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রনাথের সাফল্য পাঠকের কাছে আশ্চর্য রকমের আনন্দদায়ক; আর অনুবাদকদের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত।

১৯৫৬ [১৩৬৩]

বিজ্ঞমোবশী। শ্রীকুরাম ভট্টাচার্য অনূদিত। পৃ. ৬৭, সচিত্র। [কলিকাতা, ৬১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট; অরুণা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৬৩ অক্ষয় তৃতীয়া]

[উৎসর্গপত্রের তারিখ : ১৩৬২ দোলপূর্ণিমা]

অনুবাদের নমুনা : [৪র্থ পর্ব]

প্রেমিক-প্রেমিকা আপনাদের একান্তভাবে পাবার জন্য বেছে নিলেন গন্ধমাদন পর্বতের অতি রমণীয় এক নিভৃত কুঞ্জবন। অভিমানিনী উর্বশী মায়াকাননে লতায় পরিণত হোলেন। প্রিয়াবিরহে রাজা ‘কোথা উর্বশী, কোথা প্রিয়তমে?’ বলে কেঁদে ফিরেছেন সারা কাননে, উন্মত্তবৎ পর্বতে।

গমনোৎসুক ওগো কলহাঁস!

আঁখি ফিরাবে?

মোর মানিনীর বার্তা দিয়াই

না হয় মানস সরসে যাবে।

প্রেয়সীর মদ মত্ত চলন

কোথা হতে তুমি করিলে হরণ?

উড়িয়া যেয়ো না ভয়ে অকারণ

শুনো মিনতি।

ওই যা! মৃগাল কন্দ মুখেই

পলায় মরালী চকিত গতি।

‘সঙ্গম-মণি’-স্পর্শে চিরযৌবনা উর্বশী আবার নিজবেশ ফিরে পেলেন।—

নুপতিকরের সেই পবিত্র

মণিপরশে।

লতিকারুপিনী স্বরস্বন্দরী

শিহরি’ উঠিল বেদনারসে।

ছিন্ন করিয়া যাহুবন্ধন
 বাহিরিয়া এলো রমণী রতন,
 কহিল আবেগে, “চেয়ে দেখো আমি
 দয়িতা তব,
 তুমি না জাগিলে, ওগো প্রিয়তম !
 কি ব্যথা সয়েছি কাহারে কব ?”

বিশ শতকের অনুবাদের মধ্যে কুড়ারামবাবুর অনুবাদ ভাবে ভাষায় ও
 ছন্দে যথার্থই নিঃসমধুর শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তীর আঁকা রেখাচিত্রগুলি অনুবাদের
 মূল্যবর্ধনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

বিবিধছন্দে ‘বিক্রমোর্বশী’র মূল সাহিত্যাখ্যানভাগ অনূদিত হয়েছে।
 ভূমিকায় কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন : প্রাঞ্জল ভাষা ও স্থূললিত
 শব্দবাংঙ্করে উর্বশীর মঞ্জীরধ্বনি অনুরণিত হইয়াছে। আবার ধীরোদাত্ত নায়ক
 পুরুষবার ভাবগাম্ভীর্য স্নন্দরভাবে ভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে—[১ বৈশাখ
 ১৩৬৩]।

॥ বেঙ্গলের বরণীয় সাহিত্য সম্ভার ॥

প্রবোধকুমার সান্তালের

রাশিয়ার ডায়েরী

কমিউনিস্ট জগৎ ও জীবনের নির্মল হৃদয়
 বিচিত্র রূপায়ণ।

প্রথম খণ্ড : ১৪'০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : ১২'০০ ॥ তৃতীয় খণ্ড একত্রে : ২৫'০০ ॥

দেবতাত্ত্বা হিমালয় ১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯'০০ ॥
 ২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০'০০ ॥

স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
প্রদক্ষিণ ২য় মুঃ ৪'০০ ॥	দিকশূল (৩য় মুঃ) ৪'৫০ ॥
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর	নীলকণ্ঠের
মহাকাল (২য় মুঃ) ৩'৫০ ॥	হরেকরকম্বা ২য় মুঃ ২'৫০ ॥
নারায়ণ সান্তালের	নারায়ণ চৌধুরীর
মনামী চার টাকা ॥	বাংলার সংস্কৃতি ৩'০০ ॥
বিক্রমাদিত্যের	দিলীপ মালাকারের
যুদ্ধের ইরোপ ৪'০০ ॥	নেপোলিয়নের দেশে ২'০০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ জর্জ টম্পসনের কলকাতা ত্যাগ ॥

জর্জ টম্পসনের বলিষ্ঠ পরিচালনায় নব্যবঙ্গ যখন ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ স্থাপন করে ব্যাপকভাবে রাজনীতি-চর্চার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে বেঙ্গল ‘স্পেকটেক্টর’-এ একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হলো : সেদিন অর্থাৎ ৮ই জুন বিকেলেই জর্জ টম্পসন দিল্লী-সম্রাটের দৌত্যকার্য গ্রহণ করে কলকাতা ছেড়ে দিল্লী চলে যাচ্ছেন। ‘স্পেকটেক্টর’ লিখলেন :

আমাদের পাঠক-সম্প্রদায় সম্ভবতঃ জানতে পেরেছেন যে মিঃ জর্জ টম্পসন দিল্লী সম্রাটের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। আজ বিকেলেই তিনি দিল্লী নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন এ দেশীয় সমাজের শুভেচ্ছা। খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি কলকাতা প্রত্যাবর্তন করবেন। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির ৬ই জুন তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তাঁর কলকাতা ত্যাগের জন্ম দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে এবং তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে তিনি যেন সোসাইটির কাজের অগ্রগতির জন্ম মাঝে মাঝে সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠান, এবং সোসাইটির সভাপতি হিসেবে সাধারণ-ভাবে সম্ভবমত এর লক্ষ্য ও কর্মপন্থার প্রতিনিধিত্ব করেন।

[ভাষান্তর লেখকের]

সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর একাংশকে সক্রিয় রাজনীতি-চর্চায় উৎসাহিত করবার পর ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিতে জর্জ টম্পসন উচ্চবেতনে সম্মানজনক পদ গ্রহণ করায় বিদেশী পরিচালিত সংবাদপত্রে সমালোচনার ঝড় উঠলো। ‘ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জর্জ টম্পসনের ভারতপ্রীতিকে ভণ্ডামির পরিচায়ক বলে আক্রমণ করলেন। নব্যবঙ্গ অবশ্য জর্জ টম্পসনের ভারত-প্রীতির ওপর বিশ্বাস অটুট রেখে এ অভিসন্ধিপরায়ণ সমালোচনার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন ‘বেঙ্গল স্পেকটেক্টর’-এ। জর্জ টম্পসনের দিল্লী গমনকে উপলক্ষ করে সে সময় স্বদেশী ও বিদেশী মহলে বাক্-বিতণ্ডার যে ঝড় উখিত হয়েছিল তার পরিচয় দেওয়া হবে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে।

॥ জর্জ টম্পসনের কলকাতা ত্যাগের পর ॥

নিজের কর্মোপলক্ষে কলকাতা ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেও জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গের সামনে যে কর্মপন্থা রেখে গেলেন তা উদ্দীপ্ত করে রাখলো নব্যবঙ্গকে সক্রিয় রাজনীতি-চর্চায়। জর্জ টম্পসন নির্দেশিত কর্মপন্থার অন্ততম ছিল দেশবাসীর বাস্তব অবস্থা-সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ। জর্জ টম্পসনের কলকাতা ত্যাগের পরও নব্যবঙ্গ সে তথ্যসংগ্রহ কার্যে যে সক্রিয়তা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন তা আজকের দিনেও যে কোন রাজনীতিবিদকে বিস্মিত করবে।

দেশের জন-জীবনে তখন দুটো সমস্যা খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। একটি হলো দেশ-শাসনের নামে পুলিশী বর্বরতা ও অত্যাচার আর দ্বিতীয়তঃ জমিদার কতৃক প্রজা-শোষণ। দেশের বৃহত্তর জন-স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে নব্যবঙ্গ সর্বপ্রথমে সচেष्ट হলেন এ প্রজা-শোষণের স্বরূপ অবগত হবার জন্য। এ উদ্দেশ্যে নব্যবঙ্গ ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’র মধ্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। সে সাবকমিটি গ্রামাঞ্চলের নিপীড়িত রায়তদের প্রকৃত অবস্থা অবগত হবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট কতগুলো প্রশ্ন লিখে তাদের উত্তর দেবার জন্য অনুরোধ করে পাঠান। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই সাব-কমিটির আবেদন সহ সে প্রশ্নগুলো ‘বেঙ্গল স্পেকটেটর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিয়ে ‘বেঙ্গল স্পেকটেটর’-এর বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখিত সে আবেদন ও প্রশ্নের যথাযথ উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

“বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি”—এতৎ সভার সাব-কমিটির দ্বারা এতদ্দেশীয় ভূমিকর্ষকদিগের অবস্থা বিষয়ক কএক প্রশ্ন প্রস্তুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইতেছে ; আমরা অতিশয় আশ্লাদ পূর্বক ঐ সকল প্রশ্ন নিয়ে প্রকাশ করিলাম, বোধ করি যে সকল মহাশয়দিগের নিকট এই সকল প্রশ্ন প্রেরিত হইবেক তাহারা ইহার সত্বতর দ্বানে বিশেষ যত্ন করিবেন।

১. রাইয়তদিগের মধ্যে খোদকস্তা প্রভৃতি কতপ্রকার বিভেদ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাইয়তদের পাট্টাতে কীরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে ও তদনুসারে ভূমির উপর তাহাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ স্বত্ত্ব থাকে ?

[Enumerate the different classes of Ryots, and state the nature of the tenures under which lands are held by them ?]

২. যাহারা রাইতদের নিকট জমি বিলি করিয়া লয় এমত কোন পেটাত্ত

রাইয়ত আছে কিনা ? যদি থাকে তবে তাহারা কয় প্রকার এবং ভূমিতে তাহাদের কিরূপ স্বত্ব ?

[Are there any grades of under-tenants holding their tenures from the Ryots ? If so, how many, and what are the rights enjoyed by them ?]

৩. জেলার মধ্যে শালি গুণে প্রভৃতি কতপ্রকার ভূমির ভেদ হইয়া থাকে ?

[What are the distinctions of lands recognised in the district ?]

৪. ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমিতে কি কি ফসল এবং বৎসরের মধ্যে কত ফসল হয় ?

[What are the articles produced on each of those descriptions of land, and how many crop do they annually produce ?]

৫. রাইয়তেরা আপনাদের জমি স্বয়ং আবাদ করে কিনা যদি তাহারা স্বয়ং না করে তবে ঐ সকল জমি কাহারো আবাদ করে স্বয়ং কৃষিকারক রাইয়ত অধিক কিম্বা অগ্রের দ্বারা কৃষিকারী রাইয়ত অধিক ? আর দুই প্রকার রাইয়তের মধ্যে কোন প্রকার রাইয়ত কতগুণ অধিক ?

[Do the Ryots in general cultivate their own lands ? If not by whom is such land tilled ? What proportion does the number of Ryots cultivating their own lands bear to the number of those who employ others to cultivate them ?]

৬. উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমিতে শালিয়ানা গড়ে কত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ শস্ত গড়ে কি মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে ?

[What is the average quantity of produce per biggah of each description of land; and the average market value thereof.]

৭. যে স্থলে রাইয়ত স্বয়ং ভূমির আবাদ না করে সে স্থলে কৃষিকারককে কত বেতন বা উৎপন্ন শস্যের কত ভাগ দিতে হয় ?

[When the Ryot does not himself cultivate his land, what is the amount of wages or the proportion of produce paid by him by the actual cultivator of the soil ?]

৮. উক্ত ভিন্ন ২ প্রকার জমির প্রত্যেক বিধা আবাদ করিতে কত খরচা পড়ে ?

[What is the amount of expense for cultivating of each description of land ?]

৯. ভূমি সকল প্রস্তুতাবধি শস্য উৎপন্ন করিয়া বিক্রয় পর্যন্ত কি কি খরচ পড়ে তাহার বিশেষ বলিবেন ?

[Enumerate the different items of charge incurred from the preparation of soil up to the sale of produce ?]

১০. ঐ সকল ব্যয় নির্বাহ করিতে রাইয়তদিগের কি কি উপায় আছে ?

[What are the means which the Ryots possess of paying these charges ?]

১১. যদি রাইয়তকে কর্জ করিতে হয়, তবে কাহার নিকট কি কি সর্বোত্তম কর্জ করে। আর রাইয়তেরা মহাজনী কিংবা তস্কারী দ্বারা অথবা অন্যান্য প্রকারে যেরূপ টাকা সংগ্রহ করে তদ্বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহা বলুন।

[If he borrows, from whom and on what terms ? State all particulars of the systems called Mahajoonnee, Tuccaree etc. as for Ryots are concerned.]

১২. উক্ত ভিন্নপ্রকার ভূমির প্রতি শালিয়ানা খাজনা কত ? বিঘাতে রাইয়তকে বা কত দিতে হয় এবং পেটাও রাইয়তকে কত দিতে হয় ?

[State the different rates of rent paid per biggah of each description of land by the Ryots and the undertenants ?]

১৩. জমিদার ও তালুকদার ইজারাদার প্রভৃতির রাইয়তদিগের উপর কি কি আবণ্ডয়াব তলব করিয়া থাকেন এবং রাইয়তেরা পেটাও রাইয়তদের নিকটই বা কি কি আবণ্ডয়াব লইয়া থাকে, আর এই সকল আবণ্ডয়াব কে কি প্রকারে আদায় করে ?

[State all the Abwabs imposed by the Zaminders, Talukdars, farmers etc. upon the Ryots or by the Ryots upon his under-tenants and how are these Abwabs collected ?]

১৪. রাইয়তদের দেয় খাজনার সহিত তুলনা করিলে আবণ্ডয়াবের পরিমাণ কত হইবেক ?

[What proportion do these Abwabs bear to the rent paid by the Ryots ?]

১৫। রাইয়তেরা খাজনা ও আবওয়াব দিতে বিলম্ব করিলে জমিদারেরা কি প্রকারে কত ক্ষুদ্র লইয়া থাকেন ?

[What interest is charged by the Zaminders on the Ryots in case of delay made in paying their demand ?]

১৬. রাইয়তেরা জমিদারকে ও পেটাও রাইয়তেরা রাইয়তকে সেলামি প্রভৃতি কিছু দিয়া থাকে কিনা ?

[Are any salamies or other fines paid by the Ryots to the Zaminders or by the under-tenants to the Ryots ?]

১৭. খাজনার উপর কি বিবেচনায় কত সেলামি প্রভৃতি লইয়া থাকে ?

[What proportion do such fines bear to the rental ?]

১৮. খাজনা এবং আবওয়ার সমুদায় দিয়া রাইয়তের গড়ে কি উপস্থিত থাকে, যাহারা স্বয়ং কৃষি করে তাহারাই বা কি পায় এবং যাহারা অস্থির দ্বারা কৃষি করে তাহাদেরই বা কত লাভ থাকে ?

[What proportion does the average profit of the Ryot bear to the rent and Abwabs he pays, both in the case of him who cultivates the land himself and of him who employs others to do so.]

১৯. দেখা যাইতেছে যে ভূমিতে ফসল উৎপাদনার্থে শ্রম ও ব্যয় উভয়েরই আবশ্যক হইয়া আপনকার জেলাতে ব্যয়েতেই বা কত লাভ হয় এবং শ্রমেতেই বা কত মুনাফা হয় ইহার প্রভেদ আপনকার জ্ঞানানুসারে এই তালিকায় লিখিবেন।

[Distinguish as far as possible the profits of capital and profits of labour in the district.]

২০. একশত রাইয়তের মধ্যে কতজন রাইয়ত শালিয়ানা ১২ টাকা অবধি ৩০ টাকা লাভ করে ?

৩১ অবধি ৬০ টাকা পর্যন্ত

৬১ " ১৮০ " "

১০০ " ২০০ " "

দুই শতাধিক কত ?

প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিনয় ঘোষ-কৃত
বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকরগ্রন্থ

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

(প্রথম খণ্ড—১২'৫০)

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণ তদানীন্তন বাংলা সাময়িকপত্র থেকে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনাবলী এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল। অতি দুপ্রাপ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য পত্রিকা যেঁটে বাংলার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা সংযোজিত। ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরো ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থ প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থালুকুল্যের জন্য বৃহৎ রয়েল অক্টোভো সাইজের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বই, আর্টপ্লেট ও বোর্ড-বান্ধাই সমেত নামমাত্র করা হয়েছে।

ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজকর্মী সকলের পাঠযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
সচিত্র সংস্করণ ৫'৫০ ॥

[প্রতীচির মহাকাব্যগুলি থেকে চয়িত অল্পপম কথাসাহিত্য সংগ্রহ]

AFRICANISM : Rs. 16/-

দেবেশ দাশের

নবগোপাল দাসের

রাজসী (২য় মুঃ)

৩'০০ ॥

এক অধ্যায় (২য় মুঃ)

৩'০০ ॥

অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বহুর

ভারতের চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪টি আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মুঃ)

৪'০০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর

প্রমথনাথ বিনীরা

ইংলণ্ডের ডায়েরী

৪'০০ ॥

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশাস' প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

[Fill up the following form to the best of your knowledge.]

How many Ryots in a hundred make annually from 12 to 30 Rupees ?

Ditto from 31 to 60 Rupees ?

„ „ 61 to 100 „ ?

„ „ 101 to 200 „ ?

Ditto upwards 200 Rupees ?]

২১. রাইয়তেরা কি প্রকার আহাৰাদি করিয়া থাকে ও কিরূপ অবস্থায় থাকে এবং তাহাদের মধ্যে এক এক ব্যক্তির কত ব্যয় পড়ে ?

[What is the general mode of living of the Ryot ? and what is the average yearly expense per head ?]

২২. রাইয়তদিগের ব্যয়াদি ও পানাদি বিষয়ে কি প্রকার স্বভাব ?

[What are the general habits with regard to frugality, sobriety etc.]

২৩. রাইয়তদের সুখাভিলাষ ও ভোগেচ্ছা কি পর্যন্ত আছে তাহা আপনি যত জানেন তাহা বলুন।

[State your belief as to the desire of the Ryots to enjoy the comforts and luxuries of life ?]

২৪. রাইয়তেরা কাহাকেই বা আবশ্যক বলে এবং সুখই বা কাহাকে বোধ করে ও ভোগই বা কাহাকে কহে ?

[What, in the opinion of the Ryot constitute the necessities, the comforts and the luxuries of life ?]

২৫. ভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন জাতীয় রাইয়তদের মধ্যে কি পর্যন্ত বিজ্ঞা ও জ্ঞানের চর্চা আছে এ বিষয়ে আপনি যতদূর জানেন সমুদয় বলুন।

[State all the particulars you are aware of, regarding the state of education among the Ryots of different classes and castes.]

২৬. আপনার বিবেচনায় তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত উত্তম উপায় কি হইতে পারে ?

[What do you think will be the best means of promoting education among them ?] .

২৭. ঐ সকল লোকেরা আপনাদের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট ?
এবং অবস্থার উৎকৃষ্টতার জ্ঞাত তাহাদের বিশেষ যত্ন আছে কিনা ?

[What is the state of feeling with regard to their present condition, and whether they have any desire to ameliorate that condition ?]

২৮. তাহারা অবস্থার উৎকৃষ্টতার নিমিত্ত স্বয়ং কোন উপায় দর্শাইতে পারে কিনা ?

[Can they suggest any means for the amelioration of their general condition ?]

২৯. সামান্যতঃ যেক্ষেপে কৃষিকর্ম হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা উত্তম কৃষির কোন উপায় কোন জমিদার বা রাইয়ত করিয়াছিল কিনা ?

[Were any improved method of cultivation ever introduced in your district by any of the Zaminders or Ryots ?]

৩০. রাইয়তাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি ও অবস্থার উৎকৃষ্টতা নিমিত্ত কোন জমিদার কখনও কোন উপায় করিয়াছিলেন কিনা ? যদি করিয়া থাকেন তবে কি পর্যন্ত করিয়াছেন আপনি এ বিষয়ে যে যে দৃষ্টান্ত অবগত আছেন তাহা লিখিবেন ?

[Is there any desire among the Zaminders and to what extent, to educate their Ryots, or in any other way ameliorate their general condition ? Mention the instances you know of indicative of such disposition.]

উক্ত প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে নবাবঙ্গের রাজনৈতিক দৃষ্টি সক্ষীর্ণ নগরবৃত্ত অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছে বৃহত্তর দেশের দিকে। ইংরেজাধিকারের কিছুকাল পরের থেকে দেশে শিল্পায়ন শুরু হলেও তখনও উহা দেশব্যাপী বিস্তৃত লাভ করেনি। দেশ ছিল তখন মুখ্যত কৃষিনির্ভর। সেজ্ঞা জনসাধারণের উন্নয়ন বলতে বোঝাত প্রধানত কৃষকদেরই উন্নয়ন। কোম্পানী-সরকার কলকাতায় Agricultural and Horticultural society of India প্রতিষ্ঠা করে কৃষিকার্যের উন্নতির জ্ঞাত তখন সচেতন ছিলেন বটে কিন্তু তাদের এ উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থপ্রণোদিত। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পণ্য উৎপাদনের জ্ঞাত ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের যে সমস্ত কাঁচামালের প্রয়োজন (যেমন,

কার্পাস, পাট প্রভৃতি) তার উৎপাদন বর্ধিত করাই ছিল সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য। এ অবস্থায় জমিদার-শোষিত কৃষকদের অবস্থার উন্নতির দিকে তাদের লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক নয়। অথচ দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ডও কৃষক-সমাজ। সংস্কৃতি সভ্যতা সব কিছুই উন্নয়ন নির্ভর করে দেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতির ওপর। সে কৃষকেরাই ছিল তখন কোম্পানী সরকার, ধনতন্ত্রী জমিদার ও নব্যশিক্ষিতদের ওপর সব চাইতে বেশী উপেক্ষিত।

কিন্তু কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোম্পানী-সরকারের কোন ইচ্ছা বা দায় নেই। জমিদারদের সাহায্যে নির্দিষ্ট রাজস্ব পেলেই তারা সন্তুষ্ট। দেশের মাটির সঙ্গে লোভী বিদেশী শাসকদের কোন হস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, যেমন গড়ে উঠেছিল বিদেশী মুসলমান শাসনের আমলে। মুসলমানেরা এ দেশ অধিকারের পর স্বদেশে ফিরে না গিয়ে এ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সাত সাগরের ওপর থেকে আগত দুঃসাহসী বিজেতা ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে কোন উপায়ে এ দেশের বিত্ত সামগ্রী শোষণ করে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করা। কোম্পানীর আমলের এ বর্বরোচিত প্রজ্ঞা-শোষণের বর্ণনা দিয়েছেন বহু বিদেশী ইতিবৃত্তকার ও এ দেশীয় স্বদেশ-প্রেমিক মনীষী। বাঙালীর ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের এ অবর্ণনীয় হৃদশার চিত্র স্বদেশপ্রেমিক কোন কোন মনীষীকে ভাবিয়ে তুলেছে। রেভারেন্ড লালবিহারী দের *Bengal Peasant Life*, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক, 'সাম্য', রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Peasantry of Bengal', 'Economic History of India,' রবীন্দ্রনাথের পরীপ্রকৃতি ও সমবায়বিষয়ক প্রবন্ধ, রাশিয়ার চিঠি, সখারাম গণেশ দেউড়রের 'দেশের কথা,' প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা,' অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'জমির মালিক,' ৬বিমলচন্দ্র সিংহের 'কৃষিসমস্যা' সম্পর্কীয় প্রবন্ধ ও বই—এরূপ জাগ্রত চিন্তার পরিচয়।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে দেশের কৃষক-জীবনের বাস্তব সমস্যা নিয়ে চিন্তা ছিল একপ্রকার অभावিত ব্যাপার। সে যুগে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর প্রধান আকাজ্জক বস্তু ছিল কোম্পানী-সরকারের অধীনে মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া। এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য তাঁরা আন্দোলনও কম করেন নি—সমকালীন

বাঙালীর ইতিহাস এ মন্তব্যের সমর্থন করবে। অবশেষে সে যুগের নেতৃ-স্থানীয় বাঙালী দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদের মত উচ্চমর্যাদাপূর্ণ সরকারী কর্ম শিক্ষিত বাঙালীর নিকট উন্মুক্ত হল।* প্রতিভাবান কোন কোন নব্যবঙ্গ সে সমস্ত পদ গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। কলকাতায় রইলেন তাঁরা—যাঁরা সরকারী কর্ম গ্রহণ না করে ব্যবসা প্রভৃতি স্বাধীন কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই শুভমুহুর্তে সংযোগ ঘটলো মানবতাবাদী জর্জ টম্পসনের। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বাধীনতাপ্রিয় নব্যবঙ্গ জর্জ টম্পসনের উৎসাহ উদ্দীপনায় (ইতিপূর্বে প্রকাশিত জর্জ টম্পসনের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য) দেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃষক-জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্তু কিরূপ উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন তার পরিচয় রয়েছে ‘বঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’র সাব-কমিটি প্রচারিত উক্ত প্রস্তাবলীতে।

নব্যবঙ্গের মধ্যে জমিদার ও প্রজা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্তু সর্বাপেক্ষা আগ্রহী ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ‘বঙ্গ ভাষার লেখক’ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন প্যারীচাঁদ সে সময়কার জমিদার ও প্রজা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লেখেন (Zaminder and the Ryots)। “বিলাতে এ প্রবন্ধ লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পার্লামেন্টের কমন্স সভাতেও এ প্রবন্ধের কথা উঠে। (দ্রষ্টব্য: বঙ্গভাষার লেখক, পৃ: ২৭২)। বাংলা দেশে কৃষি-সম্পর্কীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্তু তিনি আলোচ্য সময়ের পরবর্তীকালে” “১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘Agricultural and Horticultural Society of India’-র সদস্য নির্বাচিত হন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি দেশীয় লোকের মধ্যে কৃষি-সম্পর্কীয় জ্ঞানপ্রচারের উদ্দেশ্যে ছয় খণ্ডে ‘ভারতবর্ষের কৃষি বিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ’ সম্পাদনা করেন (১৮৫৩-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ ‘কৃষিপাঠ’ নামক পুস্তকখানি এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে Agriculture in Bengal’ নামক তাঁর বিখ্যাত কৃষিবিষয়ক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। কৃষি সম্পর্কে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ প্যারীচাঁদকে ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত Agriculture and Horticulture Society-র সহকারী সভাপতির সম্মানজনক পদে নিযুক্ত করা হয়।*

*দ্রষ্টব্য: বর্তমান লেখক কর্তৃক কিশোরীচাঁদ মিত্রের Memoir of Dwarkanath Tagore এর অনুবাদ: দ্বারকানাথ ঠাকুর (সম্বোধি) পৃ: ৭৪

*দ্রষ্টব্য: বর্তমান লেখকের ‘আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য (জিজ্ঞাসা) পৃ: ১৫৩

বাংলা দেশের কৃষক ও কৃষি-জীবনের ব্যাপক সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্যারীচাঁদই যে উক্ত প্রশ্নগুলোর প্রণেতা তা অস্বীকার করতে দ্বিধা হয় না। এ ছাড়া দেশের অবর্ণনীয় দুর্দশার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ। ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত বেথুন সাহেবের Black Acts-এর সমর্থনে তিনি যে তেজোদৃষ্ট বক্তৃতা দেন তাতে বাংলা দেশের কৃষকদের প্রতি তাঁর রক্তরঞ্জিত বেদনার ভাষা বাস্তব রূপ পেয়েছিল। উক্ত প্রশ্নগুলো প্রস্তুত করবার সময় তিনিও প্যারীচাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে-ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নব্যবঙ্গ যখন ‘বেঙ্গল স্পেকটেক্টর’ পত্র প্রকাশ করেন তখন থেকেই বাংলা দেশের কৃষক ও কৃষির উন্নতির জন্ত সচেষ্ট হওয়া ছিল তাঁদের অন্ততম লক্ষ্য। এ পত্রিকার লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ‘স্পেকটেক্টর’-এর প্রথম সংখ্যায় লেখেন:

.....“The Spectator will be principally devoted to the consideration of these subjects which practically bear upon the diffusion of education, the promotion of domestic and social reform, the development of agricultural and other resources of our country and the amelioration of our political condition as a nation.”

দেশের কৃষিসম্পদের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য নব্যবঙ্গের পূর্বেই ছিল। কিন্তু সর্বপ্রকার শোষণের হস্ত থেকে কৃষককে উদ্ধার করে তাদের নিরাপত্তা ও স্বথ বিধান করতে না পারলে অশিক্ষিত ও বুদ্ধিশূ কৃষক সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কখনও সম্ভব নয়—এ কথা ভালো করে উপলব্ধি করলেন তাঁরা মানবতাবাদী রাজনীতিবিদ জর্জ টম্পসনের সংস্পর্শে এসে। ইতিপূর্বে ছাত্রাবস্থাতেই ফরাসী বিপ্লবের সর্ববন্ধনমুক্তির আদর্শ তাঁদের প্রথম যৌবনের অনুভূতি ও কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এখন তাঁদের সে আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার স্বযোগ এলো। এ আদর্শচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে নব-প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’র পক্ষ থেকে স্থিতিস্থাপক প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সে প্রশ্ন প্রেরণ করে বাংলা দেশের কৃষক ও কৃষিকার্য সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন নব্যবঙ্গ।

প্রশ্নগুলোর প্রকৃত বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে—জমিদার-শোষিত প্রজাদের অবস্থা অবগত হওয়াই শুধুমাত্র তাঁদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দেশে কত শ্রেণীর রায়ত আছে তার নির্ণয় করা, জমির ওপর তাদের কিরূপ স্বত্ব, জমিতে কি কি প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়, বৎসরে কত ফসল উৎপন্ন হয়

এবং কি মূল্যে বিক্রয় হয়, রায়তেরা জমি নিজে চাষ করে বা অপরের দ্বারা চাষ করায়, ভূমিহীন চাষীরা কত পারিশ্রমিক পায়, এবং কত শস্য তাদের জমিদারকে দিতে হয়, প্রতি বিঘা জমি আবাদ করতে কত খরচ পড়ে, কি উপায়ে কৃষকেরা চাষের খরচা নির্বাহ করে, মহাজনদের নিকট তারা কি স্তর্ভে কর্ত্ত করে, জমিদারেরা কৃষকদের নিকট নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত কত দাবী করে, দেয় খাজনার তুলনায় এই অতিরিক্ত করের পরিমাণ কত, নির্ধারিত সময়ে দেয় খাজনা দিতে না পারলে জমিদারেরা প্রজাদের নিকট কি পরিমাণ স্ত্ৰ দাবী করে, রাইয়ত বা পেটাও রাইয়তেরা (under tenants) জমিদারকে কিছু সেলামি দেয় কিনা, দিলে সে সেলামির হার কত, খাজনা ও অতিরিক্ত কর দেবার পর কৃষকদের কি লাভ থাকে, প্রতি জেলায় ব্যয়েতেই বা লাভ কত এবং শ্রমেতেই বা মুনাফা কত (Profits of Capital and Profits of Labour)—এ সমস্ত খুঁটিনাটি প্রশ্নের সাহায্যে জমিদার ও কৃষক প্রজার সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা হয়েছে।

এ ছাড়া কৃষক-প্রজার অবস্থা অবগত হবার জন্ত তাহারা কি আহ্বার করে, কিরূপ অবস্থায় থাকে, খাওয়ার জন্ত প্রত্যেকের বাৎসরিক ব্যয় কত, তাদের ব্যয়ের স্বভাব ও পানাসক্তি কি, তারা কি প্রকার স্ব্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষী, আবশ্যক স্ব্থ ও ভোগ বলতে তারা কি বোঝে, তাদের মধ্যে বিত্তা ও জ্ঞানের চর্চা আছে কিনা, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায় কি হতে পারে, বর্তমান অবস্থায় তারা সন্তুষ্ট কিনা, এবং অবস্থা পরিবর্তনের জন্ত তারা সন্তুষ্ট কিনা, এবং অবস্থা পরিবর্তনের জন্ত তারা যত্ববান কিনা, নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্ত তারা কোন উপায় দেখাতে পারে কিনা, প্রচলিত কৃষিকর্মের সংস্কারের জন্ত জমিদার বা কৃষক প্রজা সচেষ্ঠে কিনা, প্রজাদের শিক্ষার জন্ত কোন জমিদার কোন চেষ্টা করেন কিনা, করলে সে চেষ্টার ধরন কি—এ সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নের সাহায্যে নব্যবঙ্গ বঙ্গদেশের কৃষকদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, বর্তমান সমাজ-প্রগতির যুগে বা আমাদের সংস্কারকামী সমাজনেতা ও রাজনীতিবিদদেরও অনুকরণযোগ্য।

কিন্তু ছুঁর্তাগ্যের বিষয় নব্যবঙ্গ এ সমস্ত প্রগতিশীল সমাজ-ভাবনাকে কার্য-করী রূপ দিয়ে সক্রিয় কোন আন্দোলন শুরু করবার আগেই তাঁদের সকল প্রেরণার মূর্তিমান উৎস জর্জ টম্পসন চলে যেতে বাধ্য হলেন স্ত্ৰদূর দিল্লীতে।

জর্জ টম্পসনের কলকাতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নব্যবঙ্গের নব-উদ্দীপ্ত কর্ম-প্রবাহেও ভাটা পড়লো।

[ক্রমশঃ]

পথ চলে গেছে

সমর সোম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২) জয়পুর ॥ দ্বিতীয় কিস্তি ॥

ছপুর্নে খাওয়ার আয়োজন ছিল বলবন্তজীর গো-সেবা-সংঘতে। ইনি বাপুর্ন পুরোনো সহকর্মী। নেতৃত্বের জাঁকজমকের চেয়ে তাই নিঃস্বার্থ কর্মই ভালো বোঝেন। বাপুর্ন শিক্ষা ছিল কর্মী হবার শিক্ষা। ক্ষমতা, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার জন্তু কখনো দৌড়াননি। ভগবানের ইচ্ছাকে নিজের জীবনের মধ্যে বারবার খোঁজবার চেষ্টা করেছেন। শ্রদ্ধেয় বলেন—“বাপু বলতেন, প্রফুল্ল, মনে রেখো, ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না।” তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দিল্লীতে যখন উৎসব-সমারোহ বাপু তখন ছুটে চললেন নোয়াখালির পথে, কথল জড়িয়ে বসে রইলেন বিড়লামন্দিরের এক দালানে। না হতে চাইলেন রাষ্ট্রপতি, না হতে চাইলেন প্রধান মন্ত্রী। শ্রদ্ধেয়র মুখ থেকে শুনেছি—দিল্লীতে তিনি তাঁকে বলে গেছিলেন—‘প্রফুল্ল, তোমার সমস্ত কার্য থেকে ছুটি নিয়ে অন্ততঃ দশ দিনের জন্তু তুমি নিশ্চয় সেবাগ্রামে আসবে। কংগ্রেসের ভবিষ্যত কর্মপন্থা, দেশকে সত্যকার গড়বার কর্মপন্থা আমরা আলোচনা করব।’ কিন্তু সেদিন আর এল না। কর্মী রামকে চিরদিনের জন্তু প্রণাম করে চলে গেলেন। বলবন্তজীরা সেই একই গুরুর শিষ্য। এঁরা কেউই তাই স্বার্থমুগ্ধ পৃথিবীর মানুষ নন। এঁরা সেই দেবতার দূত, প্রবাসী আলোক।

বলবন্তজী স্বাধীনতা পাবার পর নির্বাচন লড়তে যাননি। এসেছেন শহর থেকে দূরে গো-সেবার কাজ নিয়ে। রাজস্থানের গো-সম্পদ সত্যিই সম্পদ। হরিয়ানা গরুর উপযুক্ত দেখাশুনা করলে রাজস্থান অনায়াসে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে পেতে পারে—একথা বলবন্তজী বিশ্বাস করেন। একদিন রাজস্থানে ‘ভালডা’ চুকতে পারতো না। আইনের বাধা ছিল। বাইরে থেকে আমদানী দেশী ঘাঁর উপরও ছুটাকা করে কর দিতে হোত। কিন্তু আজ? বলবন্তজী দুঃখ করেন, আজ সে সব ব্যবস্থা উঠে গেছে বেটা! লোকে এখনো ‘ভালডা’ পছন্দ করে না। কিন্তু কত দিন আর? জয়সলমেই ভালডার এজেন্ট পাওয়া একদা ভার হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু পেটের দায়ে সব আদর্শ, সব পছন্দ-অপছন্দ ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে। লেकिन फिर भी.....”

কিন্তু তবুও সাত বছর ধরে বলবন্তী এই কাজ নিয়ে এখানে আছেন। রাজস্থানের শাসনতন্ত্রের হর্তাকর্তা সকলেই জানেন ‘ইনি সৎ...ইনি মহৎ...ইনি তাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু সক্রিয় সাহায্য কি পান? কেন পাবেন! হাসতে হাসতে বলেন—‘গায় সে ভোট নাই মিলেগা বাবা!...গরু কি ভোট দিতে পারে? গরুর যদি ভোট দেবার অধিকার থাকতো তাহলে তাদের স্থত্বে অধিকার নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হতো।’

আজকের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার কি শুধু তারই থাকবে যে রাজনীতির দিক দিয়ে মূল্যবান? দুঃখ হয় বলবন্তজীর কথা শুনে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে চার-চারবার রাজস্থানের মন্ত্রীমণ্ডলীর ভাঙ্গা গড়া হয়েছে। নিজেদের মধ্যে ভোটের জগৎ যে অস্থিরতা তার মধ্যে গো-সেবার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু! বলবন্তজীর কর্মধারা বোঝাবার মত সময় কোথায়! তবু তাঁর ধৈর্য আছে, পথ যত দুর্গমই হোক না—তিনি চলেছেন। গান্ধিজীর সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখছেন,—দেখালেন; বিনোবাজীর লেখা ভূমিকাও পড়ে শুনালেন।

মহুগুবর্জিত পরিত্যক্ত পাহাড়ী অঞ্চলে বলবন্তজীর গড়া এ আশ্রমে একদিন হয়তো সাফল্য আসবে। সেই প্রত্যাশায় মুখের হাসি আর বুকের আনন্দ তাঁর অমান থাক—বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা রেখে আবার বেরিয়ে পড়ি। ইতিমধ্যে কাছাকাছি কোথাও চা খুঁজে...থেয়ে...পৌছে গেছে আমাদের ড্রাইভার। রাজপুত যুবক বলবন্তজীর আশ্রমে আমাদের সঙ্গে অন্ন স্বীকার করলে না। অজুহাতে এড়িয়ে গেল। কিন্তু আসল অজুহাত যে কোথায় তা বুঝতে আমাদের একটুও অস্ববিধা হয়নি।

বলবন্তজী সর্বোদয়ের আদর্শে বিশ্বাস করেন। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, মানুষের কাছ থেকে মানুষকে আলাদা করে রাখার কথা ভাবতেই পারে না। হরিজন ও হরজন সবই তাঁর চোখে সমান। সেবাগ্রামের যান্ত্রিক জীবন যজ্ঞের চক্র সকলের সঙ্গে ভাগ করে খান। সংস্কারপন্থী রাজপুত যুবক আজ জাহাঁই তাঁর আশ্রমে অন্ন নিলে না।

কিছু বিরে বৃষ্টি থেমে গেছে। প্রথমত্রে আলো ছড়িয়ে আছে মুণ্ডা ঘাসের লম্বা পাতায় আর বাবুলের চিকণ-চিকণ কাঁটায়। গ্রামের পথ শহরে ফিরে আসে। শহরে ঢোকবার মুখেই জলস্রোতের দপ্তর। আমরা আসছি খবর পেয়ে অধ্যক্ষ বদ্রীনারায়ণ স্থানীয় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীভগীরথ কনোড়িয়াই আসলে এর অধ্যক্ষ কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজকর্মের সব ভার স্থানীয়জীর উপর।

রাজস্থান তৃষ্ণার্ত ; অবশ্য সে মরুভূমি নয় । বিকানের ও জয়সলমের ছাড়া মরুভূমির আসল চেহারা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না । তবু তৃষ্ণা আছে । প্রয়োজন মত জল মেলে না । বিকানের ও জয়সলমেরে চাইলে একগ্রাম জল পাবে না মাল্লুষ কিন্তু এক বালতি দুধ পৌঁছে যাবে । জলকষ্ট এত সংগীন । তৃষ্ণার্ত রাজস্থানে জল সরবরাহের ভার নিয়েছে জলবোর্ড । কুয়া আর ইদারার নতুন নতুন পরিকল্পনা, বুষ্টির জল ধরার স্থায়ী ব্যবস্থার জন্তে এরই মারফৎ চেষ্টা চলেছে সারা রাজস্থানে ।

প্রায় দুটো বেজে আসছে । জয়পুর সংগ্রহালয় পৌঁছবার সময় হয়ে এলো । গাড়ী উর্ধ্বাশ্বাসে ছোটে । বাইরে সিঁড়িতে পা রাখতেই দেখা দেন ডাইরেক্টর অব আর্কিওলজি ডাঃ সত্যপ্রকাশ । আমাদের যাবার খবর আগে ভাগেই পৌঁছে গেছে বুঝতে পারি ।

সংগ্রহশালার বিরাট হলঘরে অতীত ঐশ্বর্যের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার মত আনন্দ আর নেই । সংগিনী দৃষ্টি ফেরায়,—‘দেখেছা ?’

—‘কী ?’

—‘মাল্লুষ !’

মাল্লুষই বটে ! জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সাক্ষাৎ এই দেহখানা । তাই দেহ যতদিন থাকবে ততদিন মাল্লুষই বলবো মমীকে ! ইজিপ্ট থেকে আনা ১৮৮৭ সালের মমী বিরাট কাঁচের শো-কেসের মধ্যে শোওয়ানো আছে । বুড়ো আঙুলের আবরণ সরিয়ে দিলেন ডাঃ সত্যপ্রকাশ—‘এই দেখুন, দেহ তেমনিই আছে !’ অভিজ্ঞতার মত তাকিয়ে দেখলাম, শিউরে উঠলো সে মুহূর্ত । এ দেহ কার জানি না, শুধু মনে হোল মানব বুদ্ধির চমৎকারিত্বের প্রমাণ এই বন্দী দেহপিঞ্জরে শূন্যতার এক অপরিমীম বেদনা দিন-রাত স্পন্দিত হচ্ছে । আর্কিওলজিস্টরা তা কোনদিনই দেখতে পাবে না । শব্দাধার থেকে সরে আসি ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভৈজ্ঞানিকের নকল হয়েছিল এদেশে ; তার নয়না ঘর ভরে সাজানো । আছে জয়পুর ও আশপাশের রাজ্যের সামন্তযুগীয় অস্ত্রসজ্জা । মোঘল যুগের সমরাস্ত্র ছাড়া জাপানের অস্ত্রশস্ত্রও দেখি । এই দিয়ে কেউ বাঁচিয়েছে সমাজকে, কেউ ধ্বংস করে গেছে সারা দেশ । কোথাও বা এর ইতিহাস কলঙ্কিত হয়েছে হিংসা ও লোভে, কোথাও আবার উজ্জল হয়েছে ত্যাগ ও তপস্যায় । যোদ্ধার দেশে সেদিনের এত অসংখ্য যুদ্ধ-সরঞ্জাম —আজ কেবল সংগ্রহশালার অলংকার । সত্যতার মাইল-পাথর !

জয়পুর সংগ্রহশালায় আছে অনেক। মানুষের জীবনে সৌন্দর্যবোধ কত রূপে যে আত্মপ্রকাশ করেছে...কত পথে যে সে এগিয়ে গেছে তার হিসাব-নিকাশ করে অস্ত পাওয়া যায়। ধাতুশিল্পের অজস্র সুন্দর সুন্দর নমুনা... সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজের সংগ্রহ। ঢাকা, জয়পুর, কাশ্মীর—এমন কি সুদূর সিংহল দ্বীপ থেকে আনা হয়েছে রূপোর কাজ; বারাগসী, মোরাদাবাদ এবং ভারতের আরো নানা অঞ্চলের মীনা ও পিতল কাঁসার কাজ এ সংগ্রহালয়ের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে। যতবার এদের দিকে তাকিয়ে দেখি ততবার যেন আমার দেশকে নতুন করে চিনতে পারি। কোথায় গেল ভারতের সেই সব কারিগর? পুরুষাবৃত্তে যে ক্ষমতা তাদের দশ আঙুলে দানা বেঁধেছিল আজ কোথায় তা কোন কারখানায় সেই সব কারিগর মজুর খাটছে? ভারতের প্রদেশে দেশে কত কারিগর না একদিন ছিল। কল্লনা ও দক্ষতায় প্রয়োজনকে দিয়েছে প্রয়োজনাতীতের মর্যাদা। রুচির দক্ষিণা দিয়ে নিবেদন করেছে সভ্যতার সর্বভুক দেবতাকে। কত রকমারী দীপ আর দীপদানই না এরা তৈরী করেছে। দেশে দেশে তার রূপ আলাদা দেখে বিস্মিত মন থমকে যায়!

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাজা মানসিংহই ছিলেন এ অঞ্চলের প্রাণ। অনেকে জানে মহারাজ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারির বলকেই আনন্দ পেতেন। আমিও জানতাম। চলতি ইতিহাসের চালাকিতে অনেক কথাই যে চাপা পড়ে আছে। রাজা-রাজড়া ও যুদ্ধের নাম তারিখ মুখস্থ করেই আমরা ইতিহাস শেষ করি।

আজ কিন্তু ডাঃ সত্যপ্রকাশ হেসে বলেন,—‘আসুন একটা সুন্দর জিনিস দেখাই!’

একটু ঘুরে এক কোণে পৌঁছেই।

—‘তানপুরা...এত বিরাট তানপুরা! এ কি রূপ!’ সঙ্গিনী তার মেরাজের তানপুরার আধুনিক সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

—‘মহারাজা মানসিংহের কানে এ তানপুরা ঝংকার তুলতো।’ ডাঃ সত্যপ্রকাশ বলেন।

আবার ফিরে যাই আমের (অম্বর) প্রাসাদে। অমস্বণ পাথরের জমাট স্তম্ভতায় কার যেন উষ্ণীষ আজ কেঁপে কেঁপে ‘উঠছে। পাহাড়ী সন্ধ্যায় সুর-সাধনার আনন্দ-মুহূর্ত্ত কে এই পুরুষ? ইনি তো মানসিংহ! তানপুরার তাঁতে হাত রাখতেই স্বপ্নভঙ্গ হয়। আজ আর সুর ওঠে না, ধুলোয় হাত ভরে। বুঝতে পারি সে এখন শুধু ইতিহাস...অতীত এক যুগের সাক্ষ্য।

কাঠের ওপর হাতি দাঁতের নক্সা, বিভিন্ন আসনে ধ্যানমগ্ন ভারতীয় ঋষি-মুনিদের মূরয় রূপ, সাড়ে তিনফুট লম্বা ঘড়া, নটিংহাম আর্ট মিউজিয়ামের দান—মেশিন এমব্রয়ডারির নমুনার ভিড় ঠেলে রং তুলির দেশে পৌঁছই। এতক্ষণ বস্ত্রকেই ভাঙ্গা গড়া চলছিল; এবার বস্ত্র নেই,—আছে মানসচক্ষু আর রূপ-কল্পনা। প্রথমেই দেখা যায়—অসমাপ্ত রেখাচিত্র। সেদিন না ছিল আর্টিস্ট কার্টারিজ পেপার, না ছিল উইনসরের রং-তুলি। দেশী কাগজ, এমন কি মাছের ছালের ওপরও শিল্পীদের ছবি আঁকতে হতো। হাতির দাঁতের ওপর জয়পুর ও আমের রাজ এবং মোঘল বাদশাহের পোর্ট্রেটগুলি তাকিয়ে দেখবার মত। জানি না কতক্ষণ সেদিকে ঘুরছিলাম। ডাঃ সত্যপ্রকাশ তাড়া দেন। এখনো যে বহু ছবি দেখার আছে। কাংড়া শৈলী, মোঘল শৈলী, জয়পুর কোটা নাথদ্বারা, বিকানের বুদ্ধি, যোধপুরী—কত পদ্ধতিই না মাথা তুলেছে এই রাজস্থানে। রাজা-রাজড়ার পোর্ট্রেট তো শিল্পী আঁকবেনই। শিল্পীর ভবিষ্যৎ ছিল রাজসভায়। কিন্তু রাজা-বাদশার পোর্ট্রেটের বাইরে আসল শিল্পী বেঁচে আছেন। বারোমাসে ঋতুর ভাবনা-ব্যঙ্গনা ঘেরা বারোটি ছবি সেকালের শিল্পচেতনাকে করে রেখেছে অনির্বচনীয়। ছবির কোণে কোণে দৃষ্টি ঘোরে,—একটা নামও দেখতে পাই না। রেখা আছে রং আছে—কিন্তু যে মন তাদের রূপের মধ্যে সম্পূর্ণ করে তুলেছে তার কোন পরিচয় নেই। এমনভাবে কত শিল্পী যে এ দেশে হারিয়ে গেছেন এবং হারিয়ে আছেন—তার ইয়ত্তা নেই। আজ শুধু চোখে পড়ে নন্দের ফেরীওয়ালা।

সেদিন শিল্পীর কাঁধে আত্মপ্রচারের জয়ঢাক থাকতো না। তাঁদের আনন্দ ছিল সৃষ্টির তপস্যায়। আর আজ?—আনন্দ শুধু স্ততিতে। গাছ-গাছড়া, ফুল-পাতা, মাটি-পাথর নিংড়ে যে রং সেদিন শিল্পী পেয়েছিলেন—তার বর্ণচ্ছটা বর্তমানকালের উইনসরের আর্টিস্ট কোয়ালিটি ওয়াটার কালার (artist quality water-colour) কিম্বা অয়েল কালারের চেয়ে অনেক বেশী। সে সৃষ্টি ছিল—গভীর বেদনার; আজকের সৃষ্টি হলো অপার উত্তেজনার। কোটা পদ্ধতিতে আঁকা বাঘ শিকারের ছবিটির দিকে তাকিয়ে রেখার সূক্ষ্মতা, বলিষ্ঠতা ও ব্যঙ্গনার সম্মিলিত প্রকাশে অবাক হয়ে যেতে হবে রসগ্রাহী মনকে। ভাবনাহীন মুহূর্তের অনাবিল ঐশ্বর্যে কল্পনা পাখা খুলেছে শিল্পীর তুলিতে। জয়পুর পদ্ধতিতে রাগ-রাগিণীর ছবি, মেঘমল্লার, সেতমল্লার, গুজ্জরী, দীপক ও কেদারার ভাবচিত্র বারোমাসা ছবির মত শিল্পীকে

চিরকালের সম্মান দেবে। এখানে যে হৃদয়ে পৌছবার জন্তে বুদ্ধির প্রবেশপত্রের কোন প্রয়োজনই হয় না!

জয়পুর সংগ্রহালয়ে আধুনিক শিল্পীদের আঁকা জল-রঙ, শুকনো রঙ এবং তেল-রঙের ছবিগুলি দেখবার মত। কোন কোন রূপকার স্থির-রিয়ালিজমের পথে নিজের শক্তিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। চাইবেনই তো! সব হৃদয়ের সব অস্থিরতা যে হৃদয়েই বাসা বাঁধে! তবে অস্পষ্টতা মুখ ভেঙে চায় না। আকৃতি আছে—বিকৃতি নেই। শ্রীমতী আমিনা আহমেদের ছবির তত্ত্ব এবং দৃষ্টিকোণ বুঝতে পারিনি—কিন্তু এদের কাছে যেতে কোন বাধা আসে না। যারা মনে করেন ঘনত্ব আর গভীরত্ব দিয়ে ‘ইনার নিড্’ ফুটিয়ে তোলাই স্থির-রিয়ালিজম্ জাতীয় পদ্ধতির বড় কথা—তাদের বস্তু নিঃসারতার মতামত কেমন দুর্বোধ্য মনে হয়। রূপকে অপরূপ করাই শিল্পীর সাধনা, আমরা এমন যুগে বাস করছি যেখানে অপরূপের চেয়ে নৈরূপ্যবাদের দিকেই লোকে কৃতিত্ব দেখাতে চায়। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে আমার এক জার্নালিস্ট বন্ধুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

এলাহাবাদ সংগ্রহালয়ে আধুনিক শিল্পীদের কলা-প্রদর্শনী হচ্ছে। প্রেসের ঝামেলায় পৌছতে পারিনি। সন্ধ্যায় কফি হাউসে জার্নালিস্ট বন্ধুটিকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি প্রদর্শনীর কথা। ওরা তো খবর আর খবরের কাগজের মাহুস! বন্ধুটিকে এত বেশী বিরক্ত হতে আগে দেখিনি : বলে, “রামলীলা বরদাস্ত করতে পারি কিন্তু ওই সব প্রদর্শনী নয়।”

একজন মন্তব্য করে,—“ওকে ফেপাস নি আর। কুকুর জল দেখলে ভয় পায়, ও আঁতকে ওঠে আধুনিক ছবি দেখলে!”

—“বলি অত্যাটাকি কি করি? আমার ছোট ছেলেটা খাতার পাতায় কলমের কালি ছড়িয়ে অমন ছবি তো রোজই আঁকছে। আসলে লেখাপড়া শিখেই মাহুস নিজের সর্বনাশ করেছে। যুক্তির ঠেকা দিয়ে সব কিছুই দাঁড় করাতে চায়।”

জয়পুর সংগ্রহালয়ে আধুনিক শিল্পীদের রং-রেখা দেখলে বোঝা যায় আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরেই শিল্পের ব্যাপ্তি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মোহমুগেরে আর যাই হোক হৃদয়কে ধরে রাখা যায় না। প্রাণের রস-সন্নিবেশ করার অর্থ প্রকাশভঙ্গীর আধার-মুক্তি নয়। কবিগুরুর কথায়—“বলার বিকাশ সামঞ্জস্যে।”...লেঠেল রাজদণ্ড নিয়ে লাঠি খেলে, ওস্তাদ স্বর নিয়ে কসরৎ দেখায়। আমাদের আধুনিক চিত্রশিল্পে বস্তুবিদেষ্টা শিল্পীরা নৈরূপ্যবাদের

নামে প্রকাশভঙ্গীর আখড়ায় যে কৌশল বীরত্ব দেখাতে শুরু করেছেন—তাতে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এখানে কিন্তু নিখাস ফেলার যথেষ্ট অবকাশ। ডি. এন. ঘোষ, পরমানন্দ গোয়েল, গোবর্ধন যোশী, ভূর সিং শেখায়ৎ, রামগোপাল বিজয়বর্গীয় প্রভৃতির সম্বন্ধে রাখা ছবি বার বার দেখতে ইচ্ছা করে।

রামগোপাল বিজয়বর্গীয় গীতগোবিন্দের কাহিনী নিয়ে অনেকগুলি ছবি এঁকেছেন। দেওয়াল জুড়ে পর পর সে অনবদ্য ছন্দ কথা রঙে রেখায় মাথা তুলেছে। শুধু মন নয় প্রাণও ভোলায়। বিজয়বর্গীয় এবং শ্রীযুক্ত ঘোষ শিল্পী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত; সম্মানও অর্জন করেছেন দেশবাসীর কাছে। শুধু বুঝতে পারলাম না—শিল্পী ভূরসিং শেখাবৎ কেন তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা আজো পেলেন না! যতবার দেখি মনে হয়—দেওয়ালের কোন ছবিই তো তাঁকে আড়াল করতে পারছে না। ভেবে ঠিক করি—ফিরে গিয়ে গুলীর কথা আমার দেশকে শোনাব। প্রশ্ন করব শিল্পরসিক সমাজকে—“শেখাবতের প্রতি এ অত্যাঁয় কেন?”

পূরণচাঁদজী মনে করিয়ে দেন—‘চাঁর নিমন্ত্রণ আছে, রাজরত্ন প্রতাপরায়। গিরিধারীলাল মেহেতার বাড়ী চলতে হবে।

আবার কোন অপরিচিত পরিবেশে যেতে হবে। মন ‘কিন্তু...কিন্তু’ করে।

—‘জল থেকে ডাঙ্গায় ওঠার ভয় নেই ভাইসা’ব! শিল্পের ছনিয়া থেকে শিল্পরসিকের ঘরেই চলেছি। উনি অপেক্ষা করছেন!’

সত্যিই! পূরণজী মিথ্যা বলেননি। উনি অপেক্ষাই করছিলেন। প্রৌঢ় ভারী হয়ে এসেছে গোলগাল দেহে। কথা বলেন একটু তাড়াতাড়ি কিন্তু বেশ জোর দিয়ে। ভারী গলায় মোলায়েম স্বর মন্দ লাগে না প্রথম দর্শনে। সঙ্গে করে উপরে নিয়ে যান। বসবার ঘরে। গোল সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠি। সারা ঘরখানি তাঁর মুখের হাসির মতই শ্রীমাখান মনে হয়।

দেওয়ালে আমেরিকার ‘লাইফ’ কাগজের একটি বাঁধানো কভার ঝুলছে। একটি ভারতীয় মেয়ে দীপাশ্চিতা-অমাবস্তার উৎসব-রজনীতে মুগ্ধ চোখে দীপালোকের দিকে চেয়ে আছে। ছবিটি আমার অতিপরিচিত। প্রতি বছরই এ ছবি ভারতের শহরে-গ্রামে দেখা যায়। একটা ফটোগ্রাফ হলেও কথা ছিল কিন্তু—...

—“এ ছবি বাঁধিয়েছেন যে?”

—“উষার এ ছবি আমার বড় ভালো লাগে!” উষাকে চিনতে পারি না। “আপনাদের সে দেখতে পেলেন না, ছুঁচুগা! ছুঁচু মেয়ে আমার—উষা আর মীনাক্ষী। লাইফের ফটোগ্রাফার ১৯৫৫ সালে জয়পুরে থাকার সময় এ ছবি তুলে নিয়ে গেলেন।”

সত্যিই তো, মুখপৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে ছাপার অক্ষরে—‘৪ঠা এপ্রিল ’৫৫।’ আমেরিকার ফটোগ্রাফার ভারতের বুকে মুখপৃষ্ঠার বিষয়বস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে (!) —ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ লাগে। এ মেয়ের এ ছবি দেখে ভারতীয় প্রকাশক অথচ বলতেন—“আরে রামঃ...!” কভারের জন্তু—‘ব্রাইটি’ মার্কি অর্নল্ড নারীমূর্তির ছবি তাঁরা হুকুম করে আঁকেন। বোম্বাই ও পুনায়ে বিশেষ করে এই ধরনের শিল্পীরা কারখানা খুলেছেন। ডাঃ ফাউন্টের মত ষক্ষপতিদের হাতে নিজেদের বিক্রি করেছেন। উপায় কি! এ সভ্যতা যে সর্বভুক! দোকানে দোকানে এত সাজ-পোষাক বাজারে বাজারে এত রকমারী খাবার; পথভরা গাড়ী-ঘোড়া, এর আমোদ-আহ্লাদ—এর মধ্যে অভাব-দারিদ্র্য মাহুষের সহিবে কেন? পেটের ক্ষুধার সামনে সব আদর্শের কবর গড়ে ওঠে। আদর্শ নিয়ে ক্ষুধায় যারা কুঁকড়ে মরে তাদের বংশধররা জন্মতে পারে না। জন্মালেও তারা চোখ মেলে কংসের কারাগারে।

শ্রীমেহতা ছেলেদের জন্তু এক সংগ্রহালয় গড়তে চান। এ নিয়ে বসে বসে পরিকল্পনা তৈরী করছেন। ইতিহাস ও সমাজকে ছবিতে ছেলেদের উপযোগী করে তুলে ধরবার জন্তু শিল্পীদের বসিয়েছেন নিজের বাড়ীতে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান সব। পরিকল্পনার কথা আলোচনা করেন অনেকক্ষণ, প্রচুর আগ্রহ নিয়ে। দিল্লীর সরকারী মহলেও নাকি পৌঁছে দিয়েছেন এ পরিকল্পনা। ছেলেদের চোখ দুটিই যে শিক্ষার পক্ষে বড় মাধ্যমে তা বিশ্বাস করি আমি।

সঙ্গিনীর মুখ থেকে শুনেছি কেলভিন গ্রোভ আর্ট গ্যালারীর গল্প, শিশু সংগ্রহালয়ের কথা। শুধু গ্লাসগো কেন, সঙ্গিনী বলে, ‘আমি গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গায় শিশু সংগ্রহালয় দেখেছি।’ গোর কেলভিন গ্রোভের মতই শিশুমনকে শিশুর চোখ নিয়ে দেখবার চেষ্টা চলেছে শিক্ষার পৃথিবীতে। শ্রীমেহতার পরিকল্পনার সমর্থন তাই করতেই হয়। ছবি দিয়ে খুলে দেওয়া হোক শিশু-মনের বন্ধ দুয়ার—নেমে আসুক সে সারা পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে। রেখা খুঁজুক রূপ, রঙ খুঁজুক জ্ঞানানন্দ, কল্পনার জানালা দিয়ে আসুক জীবনের যাত্রাপথ।

দেশ-দেশান্তরে, শুনেছি নবজাতকের অভ্যর্থনার জন্তে মঙ্গলকলস পাঁতা হয়েছে। কিন্তু সাধ থাকলেও তো সাধ্য থাকে না। কখনো বা সাধ্য এবং সাধন মিলে-মিশে অজান্তে লক্ষ্যকে দূরদূরান্তে সরিয়ে দিচ্ছে। জীবনের সুখ-সুবিধার কথা ভাবতে ভাবতে জীবনযাত্রা বার বার থেমে যাচ্ছে। শিক্ষা চাই নতুন পদ্ধতিতে, তবেই আসবে সহজ দৃষ্টি, জেগে উঠবে অনাগত পৃথিবীর আলো। সঙ্গিনীর সঙ্গে দিনরাত কলহ করি এই নতুন পদ্ধতি ও নতুন মানুষদের কথা আলোচনা করতে বসে। পৃথিবীর সমস্ত সংস্কার, সকল মোহ পারলে এখনই আবর্জনার মত সরিয়ে ফেলে। কিন্তু কত কঠিন এক কাজ! উত্তেজনায় ফুরিয়ে গেলে বিরোধ সম্পূর্ণ হবে কি করে? বর্জন করে, সমালোচনায় তিক্ত হয়ে উঠে ওদের মুক্তির নাগালে পৌঁছে দিতে তো পারব না। সংস্কারে মোহে বন্ধনে বারে বারে বাঁধা পড়ে, পায়ে পায়ে দুঃখ সয়ে তাই প্রতি মুহূর্তে এগোছি, নিজের জীবনকে প্রস্তুত করে নিচ্ছি সেই মহাপ্রলয়ের সাথী হবার জন্তে। পথ ভিন্ন নয়, মত ভিন্ন নয়, লক্ষ্য ভিন্ন নয়—তবু কলহ করি। এতে লাভও আছে বইকি! কলহস্তারিতা প্রিয়াকে মধুর করে ফিরে পাওয়া কি কম কথা!

মনের এ খবর শুকে জানতে দিইনি। ভার ভার দুটি চোখে ঘুম-জড়ানো বিষাদ এইজন্তেই সরাতে পারি না। রাতে দূরের শয্যা থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে আসে। বাইরে ঝড়ঝিরে ঝুটি খামতে চেয়েও পারছে না।

দশজন শিক্ষক আছেন এদের জন্তে কেউ কেউ রয়েছেন সপরিবারে। বেড়ালাম, গল্প করলাম, খেলাম একসঙ্গে। সর্বক্ষণ এঁদের দিকে তাকিয়ে মনে হোল ‘এঁরা কি সবাই সমাজ-সেবার জন্তে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারবেন!’ অন্নকষ্টের তাড়নায় এ সব পথেও লোক ছুটে আসতে দেখেছি। এও দেখেছি নিজেদের ভবিষ্যত তো তারা হারাচ্ছেনই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও সেবাদর্শের বিরোধিতা করছেন আপন অজান্তে। সাধারণ মানুষের প্রেরণা আসে প্রয়োজনের তাড়নায়। কিন্তু আন্তরিকতা লইলে কোন প্রেরণাই বাচতে পারে না। প্রয়োজন শব্দটা বৈশ্বার, মানুষের শিক্ষার শব্দ হোল ‘অন্তর’। মানুষের রথ চলছে ‘আন্তরিকতা’র টানে।

গ্রামকে বড় করার স্বপ্ন মানে মানুষকে প্রতিষ্ঠা করা। সাতলক্ষ গ্রাম এই ভারতে দশজনের ন’জন মানুষ তো এই গ্রামেই আছে। অথচ গ্রাম বঁচে থাকে শহরের মুখ চেয়ে। কিন্তু কেন? গ্রামের দেবতা আগে একজনই ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। নিজেদের পরিশ্রম তাঁর আশীর্বাদেই গ্রামের

লোক বাঁচতো। কিন্তু সে তো আর একযুগের ইতিহাস। আজ তাদের দুই দৈশ্বরের উপাসনা করতে হয়। প্রথম দৈশ্বরকে চিনি, দ্বিতীয় দৈশ্বর হলেন ব্যবসায়ী—যাদের হাতে শহরের বাজার ভাঙ্গে গড়ে। বাপু বলতেন—‘দ্বিতীয় দৈশ্বরটিকে দূর থেকেই নমস্কার করো...পিছু ফেরো।’ ওরাই তো গ্রামলক্ষ্মীকে সবচেয়ে আগে বার করে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছে। গ্রামলক্ষ্মীকে গ্রামে রাখতে হলে ভক্ত গ্রহরীর প্রয়োজন। গ্রামোচ্ছোগ কর্মীদের সেই ভক্ত গ্রহরী হতে হবে। কাজেই ‘অন্তর’ ছাড়া ভক্তি, নিষ্ঠা আর কোথাও তো চাঁড়াতে পারে না!

ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে। বনস্থলী দূরে। বুষ্টি ধরতেই গাড়ী ছুটে চলে। বিকাল তিনটের সময় বনস্থলী এসে পৌঁছই। প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করছিল কুকুম তিলক, খাদির সূত্র উপবীত। এই ভারতবর্ষই তো হারিয়ে গেছে, এই ভারতকেই তো খুঁজে ফিরছি। কবিগুরু একে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন শাস্তিনিকেতনে আর, বুঝতে পারি, বাপু একে ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা ভারতে। তাঁর সারা ভারতে। তাঁর আদর্শ আমরা বাঙালীরা, চিনতে চাইনি, বুঝতে চেষ্টা করিনি। যৌবনের অন্ধ উত্তেজনায আমরা ভেসে গেছি। আমিও ভেসে গেসলাম। বাপুকে স্বীকার করেছিলাম তার মৃত্যুর দিন। মনে পড়ে জেলখানায় নির্মলদা (প্রফেসর নির্মল বোস) যখন গান্ধিজীর আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতেন তখন আমিই তত লজ্জা পাচ্ছি। শ্রদ্ধেয়কে না দেখলে বাপুকে এত পরিস্কার বুঝতেও তো পারতাম না!

অতিথিশালার দিকে সদলবলে চলি! মেঘের ছায়ায় মত্ত ময়ূর পাখা মেলেছে। নীলকণ্ঠের উন্নত গ্রীবাভঙ্গিতে শঙ্কা নেই, আছে আত্মীয়তার স্বাদ। স্ত্রীলা বাঈ দূর পাহাড়ের কোলে চেয়ে দেখতে বলেন। কপোতের মত, ঘুঘুর মত ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গিনী পালক কুড়োয়, হাতে না ধরতে পারলেও ক্যামেরায় বন্দী করে।

অভ্যর্থনা করে মেয়েরা রাজস্থানী নৃত্যের বন্ধারে, সংগীতের সুরে। আমরা যে অতিথি! তারা ঘুমুরের ঝংকার তুলে গায়—

“বনস্থলী মিলনে আপ আয়ে।

হমারী বনস্থলী হৈ গুণকারী এ জী, বনস্থলী গুণে,

শিক্ষা পানে, হম আয়ে ॥

দেখো ভালো আপ, জো য়হ তৈয়ারী সারী।

আপকী রক্ষা করে গিরিধারী জী ॥

হমারী সুননে আপ আয়ে।

বনস্থলী প্রতিজ্ঞা করেছে মন ভোলাবার নিয়ে চলে ছাত্র-নিবাসে, পড়ার ঘরে, রান্নাঘরে, হাসপাতালে, বাগানে, খেলার মাঠে। ছোট ছোট মেয়েরা পর্যন্ত খোলা মাঠে বোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

এ প্রতিষ্ঠানের আরম্ভ ছিল—বুনিয়াদী শিক্ষার ওপর। ধীরে ধীরে কিন্তু এসে গেছে চলতি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাব। খরচও বেড়ে চলেছে। নতুন নতুন ইমারত নানা দিকে উঁকি দিচ্ছে আজ বনস্থলীতে।

এ প্রতিষ্ঠান নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে চায়, নিজের স্বথ ও দুঃখের মধ্যেই সে আপন ভবিষ্যত গড়ে নেবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। জানি না বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ কতদিন আর বনস্থলীর জীবনে থাকবে। মানুষের অন্ধ অন্ধকরণ-প্রিয়তা সব সময় প্রগতির শত্রুতা করেছে। বৈষয়িক ও ভৌতিক স্বথের জন্তে পরের মুখ তাকাই। পরের কাছে হাত পাতি। এই দীনতা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই দৈন্তাই মনকে এখনো দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। নিজেদের চিনতে দিচ্ছে না। এইজন্ত পরমুখাপেক্ষী সমাজ ভাবে—বুনিয়াদী শিক্ষা চাষার ছেলের জন্তে! তারা জানে না বাপুর্ বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে আছে জাতির আত্মদর্শনের সৌভাগ্য। এ কথা না ভুললেই বনস্থলী বেঁচে থাকবে, নয়তো ব্যর্থতার ভিড়ে সে হারাবে একদিন। আর তার ব্যর্থতার চারপাশে শাস্তা বাঈয়ের দুঃখী আত্মা অন্তহীন বেদনার একখানি অটুট তারের মত চিরদিন মানুষের কানে বাজবে।

দিন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশও অন্ধকার হয়ে ওঠে। গুরুপক্ষের আকাশ মেঘে কালো হয়ে আছে। পার্বত্য পথ। শহর বেশ দূরে। জয়পুর ফিরে যেতেই হবে আজ।

বৃষ্টি যেন আমাদের যাবার অপেক্ষায় ছিল। হু হু শব্দে বাতাস আরাবলি পেরিয়ে ছুটে আসে, ঝামঝামিয়ে ভেঙ্গে পড়ে আকাশ। মোটর কিন্তু ছুটে চলে। মাথা তুলে বাইরের পথে তাকাই; দৃষ্টি এগোয় না। সহযাত্রীরা শ্রান্ত হয়ে কোন ফাঁকে চোখ বুজে নিয়েছে। খোলা চোখে আমিই শুধু অন্ধকারে তাকিয়ে থাকি। জীবনের যাত্রাপথে যাত্রী না দেখে ক্ষতি, না দেখে ব্যাধি, মৃত্যু, কিম্বা কোন দুঃখ। অন্ধকার তার দৃষ্টি-সওয়া।

রাতের কলহ কিন্তু প্রাতের আলোয় তত দুঃসহ মনে হয় না। একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ি বনস্থলীর পথে। রাজস্থানের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী হীরালাল শাস্ত্রীজীর গড়া এটি এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। আদর্শ হিসাবে দেশের লোক শ্রদ্ধায় নাম নেয়।

এ আদর্শের শুরুতেই লুকোনো আছে এক ব্যথা। হীরালালজীর একটি মাত্র মেয়ে শান্তাবাঈ এ বেদনার ফলশ্রোত, বনস্থলীর ইতিহাসে অন্তঃসলিলা হয়ে বইছে। তারও শিরায় ছিল দেশকর্মীর রক্ত। কৈশোর-সীমান্তে পা দিতে না দিতেই সে নিজের হাতে গড়েছিল গ্রাম্য শিক্ষায়তনের জন্তে একখানি ইঁট। ইঁট গড়েই বিদায় নিয়েছে শান্তা। আরো অল্প কোন দেশে নতুন কিছু গড়বার জন্ত তাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন বিধাতা। কিন্তু সেই ইঁটখানিকে ঘিরে উঠেছে ছড়ানো বনস্থলী। শহর থেকে বহুদূরে পাহাড় ও অরণ্যের কোলে ব্যাকুল। ময়ূরীর মত প্রীতি তুলেছে এই প্রতিষ্ঠান। তাকে না দেখে কখনো পারা যায় ?

সকাল ন'টা। বেরিয়ে পড়ি বনস্থলীর পথে। সঙ্গী হন শিবদাসপুরা খাদি গ্রামোছোগ বিদ্যালয়ের আচার্য। এঁর হাতেও আছে আমাদের জন্তে স্নেহপ্রীতির পরওয়ানা। টঙ্ক-জয়পুর রোড দিয়ে আপ্রাণ গতিতে গাড়ী ছুটে চলে। পথের দু'পাশে ছড়ানো পার্বত্য ভূমি, ভীল মেয়ের মিষ্টি হাসি, মধুর সচকিত দৃষ্টি, নিম্ন ও ঝাউয়ের ছায়া, ময়ূর ও মেঘের ডাক—সব মিলে-মিশে আজকের এ সকালটিকে কবিতার মত মধুর করে তোলে। ইচ্ছে করে পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধি ওই নীল পাহাড়ের কোলে বর্ষা ছায়ায় জাপানী বাবুলের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ ঘাসের আড়ালে যেখানে আপনহারা ময়ূরী মনের পেখম মেলে ধরে। জীবনে শুধু চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি জীবনের সহজ আনন্দটুকু হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সহজ আনন্দ তো ওখানে। সঙ্গিনী শুধু দূরের ইশারা ; মনের মাধুর্য হয়ে পরস্পরকে অহুভব করার মত অবসর পণ্য-সভ্যতা তো দিতে পারলে না ; পণ্যের জন্ত ছুটি আর পণ্য হয়ে বিকিয়ে যাই !

পথে শিবদাসপুরা আসে। খাদি গ্রামোছোগ বিদ্যালয় না দেখে আগে যাব কি করে ! ছাত্র ও শিক্ষক-কর্মীরা শ্রদ্ধের অপেক্ষায় বসে আছে। আমাদের সঙ্গে না খেলে আজকের দুপুরের অন্ন তাঁদের স্বাদহীন হয়ে যাবে।

নতুন প্রতিষ্ঠান। গড়ার কাজ শেষ হয়নি। ইঁটের বহু গাঁথুনি চারিপাশে মাথা তুলছে কিন্তু ভেতরে যাবার পথ এখনো তৈরী হয়নি। কম্পাউণ্ডের মধ্যে গাড়ীর প্রথম চাকা দুটি ঢুকতেই চর্চা শুরু হয়—কার কার গাড়ী বৃষ্টির দিনে এখানে কাদায় বসে গেছে। ড্রাইভার সাহস দিয়ে বলে—“আজ কিন্তু আমার হাতে স্টিয়ারিং ! গাড়ী উড়িয়ে নিয়ে যা—”

অলক্ষ্যে বিধাতা হাসছিলেন। স্নেহের কথা শেষ হয় না, ইঞ্জিন কেঁদে ওঠে। বালি-মাটির মধ্যে গাড়ী নেমে চলে। জল উঠে চাকার তলায় ছোট্ট দুটি স্রোত বইতে থাকে। সারা প্রতিষ্ঠান জুড়ে হৈহৈ পড়ে যায়।

খাদি গ্রামোত্তোগের প্রাদেশিক কেন্দ্র হিসাবে এ প্রতিষ্ঠান রাজস্থানে কাজ আরম্ভ করেছে। গ্রামোত্তোগ পরিকল্পনা কাজে লাগাবার জন্তে মানুষকে তৈরী করতে হবে। কঠিন এ সমস্যা। একে গ্রাম দুঃস্থ তায় গ্রামের সাধারণ মানুষ আত্মহত্যার জন্তে আত্মবিশ্বেষের ফাঁস তৈরী করে রেখেছে। কি বাংলা কি রাজস্থান গ্রামের অবস্থা সর্বত্র সমান। নিজের সামর্থের মধ্যে পরিশ্রম করে বড় হয়ে উঠব—এ স্বপ্ন দেখতে লোক ভুলে গেছে। উত্তোগের কোন চেষ্টা নেই! সম্বল শুধু একটি চাষ; তিনমাসে তার জন্তে কাজে কাটে তাও দেবতার ওপর নির্ভর করে। বাকী ন’মাস গ্রাম বেকার। শত্রুতা করে, ঘর পোড়ায়, খুন-জখম লেগে থাকে। বাঁচবার জন্তে ঋণ করে, ভিক্ষা করে, চুরি করে। অশিক্ষা কুসংস্কারের দোলা তাকে ভুলিয়ে রেখেছে। এই গ্রামকে বড় করার জন্ত—তার আর্থিক সঙ্গতি ফিরিয়ে আনার জন্তই গ্রামোত্তোগ।

গ্রামোত্তোগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মী চাই। তাদেরই তৈরী করবে এ প্রতিষ্ঠান, দেবে উচিত শিক্ষা। বর্তমানে তিনটি স্তরে এখানে শিক্ষা ভাগ হয়ে গেছে। প্রথমটি তিন মাসের। পনেরো-বিশজন ছাত্র এই স্তরে এখন রয়েছে। মাসিক তিরিশ টাকা মাথা পিছু ভাতার ব্যবস্থাও আছে। অম্বর চরখার জন্তে আলাদা-আলাদা ক্লাশে পয়তাল্লিশ জন ছাত্র শিক্ষা পাচ্ছে।

আচার্য জহরলালজী বলেন, “এ প্রতিষ্ঠানের বয়স মাত্র দু’বছর, জানি খুব বেশী কিছু করতে পারিনি; তবে দুশোর উপর গ্রামোত্তোগ কর্মী তৈরী করেছি এখানে কাজও পেয়েছে তারা।”

বলেন কি আচার্যজী! এদেশে কোনো ব্যাপারে ট্রেনিং দেওয়া মানে বেকারী বাড়ানো। শিক্ষার পর কর্মীরা যাবে কোথায়? কাজ দেবে কে? কোন উচিত ব্যবস্থা নেই। সারা দেশ জুড়ে আজ ব্যর্থতার এই নর রক্ত সত্য আত্মপ্রকাশ করেছে!

সাবান তৈরী, পটারি, চর্মোত্তোগ, অম্বর চরখা এবং গোপালনের কাজই শিখছে ছাত্ররা। প্রবেশিকা পরীক্ষা করেই সব এসেছে; এ শিক্ষার জন্তে এতটুকু লেখাপড়া শিখতেই হবে।

জয়পুর পৌছতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে যায়। কাল শেষরাতেই রওনা হব আজমের। দেহ ক্লান্ত, বিশ্রাম চাই। থেমে গেছে সব কোলাহল। স্বর্গশূলীর আলোটা আজ আর বাতাসে ছলছে না, পতঙ্গের পাখার ঝাপটে মাঝে মাঝে কেবল কেঁপে উঠছে। এই তো আমার স্তব্ধ নির্জন গৃহকোণ, এই তো আমার গুঞ্জনের অবকাশ। সঙ্গিনীর চোখে তাকাই। এক প্রচ্ছন্ন

বেদনা! আধুনিক নরনারী আমরা, সভ্যতার সদর রাস্তায় রোডরোলার
ঠেলতে ঠেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, হারিয়ে ফেলেছি মুঠো মুঠো সোনার দিন।
বাইরের পৃথিবীর ঋণশোধেই বুঝি জীবন কেটে যাবে! বিশ্রাম আর পাব না।
সব কাজ থেকে ছুটি-পাওয়া দিন স্তব্ধ রাত আসবে হারিয়ে যাবে; রাতজাগা
আর হবে না।

বাইরের বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দে ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। চারিপাশ থেকে শুধু
ভেসে আসে চাপা নিঃশ্বাস। এতো আমার কল্পনা নয়; বুক ঠেলা নিঃশ্বাসের
তাপ যে আমার সারা চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছে। কার সঙ্গে এই অস্থির
রাতের বোঝাপড়া চলছে? স্বর্গশূন্য আলো আর স্থির নয়। হাওয়ার
ঝাপটায় পতঙ্গের পাখা গেছে ভেঙ্গে—তুলছে আলো ঘন দোলায়। ছায়া কাঁপছে
আমার ঘুম ভাঙা ঘরে...গ্রহের।

দূরে পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজে। আর আধঘণ্টা। পাশের ঘরে দুবেজী
ও শ্রদ্ধের ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুয়ে আছেন। বৃষ্টি হোক আর ঝড় হোক
আজমের গাড়ী নিতেই হবে। দোর খুলি, সন্ধিনীকে জাগাই। তোড়জোড়
শুরু হয় যাত্রার। তিনটি মানুষ আমরা, বোঝা কিন্তু এগারোটি। করে যে
বোঝা ফেলে পথ চলতে শিখব! যাত্রার চলার অর্ধেক আনন্দ এই বোঝাই
নষ্ট করে দেয়।

এদিকে বৃষ্টি বেড়েই চলে, তীব্র থেকে হয় ভীষণ। জয়পুর ঘুমিয়ে থাকে।
অন্ধকার পথ দিয়ে আমরা স্টেশন পৌঁছই। অসম্ভব যাত্রীর ভিড়। পা রাখার
জায়গা নেই। রাজহানী, পঞ্জাবী, উত্তর প্রদেশের লোক, গুজরাটী, সিন্ধী,
বাঙালী—বহু প্রান্তের বহু ভাষাভাষীর এমন জট বেঁধে যাওয়া—খুব কমই
দেখা যায়। শুনতে পাই—পাঁচটা একুশের গাড়ী আসবে ছ’টা চল্লিশে।

ভিড়ের ধাক্কা খাই আর নীরবে দার্শনিক হয়ে উঠি। ভাগ্যের মার বুঝি
একেই বলে! হঠাৎ পূরণজী খবর আনলেন—রাষ্ট্রপতির স্পেশাল আসছে!
সামনের প্লাটফর্মে আমাদের মেল দাঁড়াবে না। যেতে হবে তিন নম্বরের
খোলা প্লাটফর্মে। একদিকে বৃষ্টি অত্ৰদিকে মালপত্র নিয়ে এই ব্যর্থ ছোটোছুটি।
ভোরের চা পর্যন্ত পাই না। রাষ্ট্রপতির জন্তে বিশেষ পুলিশ দল এসে ঘিরে
নিয়েছে এ প্লাটফর্ম। চা-ওয়ালারা চলে গেছে ব্যূহের মধ্যে। ঘণ্টার পর
ঘণ্টা ব্যূহের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি এবং চোখের জল বৃকে জমা হয়। বলতে
ইচ্ছা করে—‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে...!’

কিন্তু সব জিনিসেরই একটা শেষ আছে; এমন কি দুর্গতিরও। প্রায়

ন'টা আন্দাজ মেল ছাড়ে। সহযাত্রীদের অভিসম্পাত কুড়িয়ে মালপত্র তুলে ফেলি গাড়ীতে। চলেছেন অনেকেই। একজনের হাতে বাংলা বই দেখে চিনতে পারি তিনি বাঙালী। চেহারা দেখে বুঝতে পারিনি, গলার আওয়াজ শুনেও না। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের রেঁদা-করা কণ্ঠস্বর, ভাঙ্গা ভাঙ্গা অর্ধশ্রুট উচ্চারণ। তিনি মহিলা! ভাবছি তাই শিভলরাস বাঙালী পাঠকের কাছে এ প্রসঙ্গ স্থগিতই রাখি।

তবু দুঃখের কথা জানা জানা ভালো। বাংলার বাইরে বাঙালীরা এমন ভাবে অস্ত্রের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছেন। ইংরেজ শতাব্দীর ওপর এদেশে থেকেছে। কিন্তু নিজের আচার-ব্যবহার, পোষাক, ভাষা ও সাহিত্য হারিয়ে ফেলেনি তো। এক এক সময় নিজের কথা ভাবি। বলতে চাই 'উন্টোপান্টা'—মুখ দিয়ে বার হয়—হয় উৎপটাং। দশটি বছরে আমার মতন সচেতন মানুষেরও ভাঙন ধরেছে যখন—অস্ত্র বাঁচবে কি করে!

ভাঙনের কথা ভাববার মত এমন পরিবেশ জীবনে খুব কমই আসে। পুরোনো বি. বি. সি. আই রেলওয়ের ছোট ছোট ঐতিহাসিক গাড়ী। চলতে পায়ে বাধে। বৃষ্টির জলে চারিপাশে ভাসছে। ঠাণ্ডা বাতাস থেকে থেকে ঝড়ের বেগে আসছে ছুটে। বাইরে বন্ধ্যা ধরিত্রীর শূন্যতা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না।

✎ হঠাৎ আবার সে শূন্যতা কে যেন অন্তমনস্ক ভাবে ভরে দিতে থাকে।

শুয়ে আছে আরাবলি। অসংখ্য শিখরে সে এলায়িত। কাশ ও বাবলার শীর্ণ শ্রামশ্রীর পিছনে কোঁতুকমুখরা প্রিয়র মত মেঘেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে আরাবলির দূর শিখরে শিখরে। জড়িয়ে উঠেছে তারা, ছড়িয়ে পড়েছে। মেঘের ছায়ায় পাহাড়ী নদীর পাশ ঘেঁষে তাঁবু ফেলেছে যাবাবরের দল। চলিষ্ণু নারীর সবুজ চোলী আর লাল ঘাগরা বলমল করে ওঠে; নীবিবন্ধের কোল ঘেঁষা ওড়না বাতাসে ভেসে বেড়ায়। যেখানে তৃণাক্ষর সেখানেই তেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট, মোষ ও গরুর মেলা। রাজ্যস্থান নিজের পশুধন নিয়ে কেন যে ভাবছে না,—বুঝতে পারি না! ওদের দেখি আর মনে হয়—'রাজস্থানে নাই বা থাকলো কাপড়ের কল, নাই বা রইলো ইস্পাতের করখানা! দুধ, চামড়া, পশুলাম ও মাংসের বেনাতি করেই এদেশ কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে পারে। হল্যাও কি এই ভাবে নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতা পড়ে তোলেনি? কি দরকার মাড়োয়ার থেকে বাংলায় আসবার? কি দরকার ব্যবসা বাণিজ্যের ছল-চক্রান্তে নাম লিখিয়ে বদনাম কেনবার? কি প্রয়োজন নিজের জাত ও দেশকে ছোট করে দেবার? বিধাতা অনেক কিছু না দিয়েও প্রত্যেক দেশ ও জাতকে এমন কিছু দেন—যা সব অভাবের পরিপূরক।

চেচ্‌ কবি মাখা

শিবপ্রসাদ বিশ্বাস

চেচ্‌ রোমান্টিক কবি কারেল্‌ হাইনেচ্‌ মাখার জন্ম ১৮১০ সালের ১৬ই নভেম্বর পুরাতন প্রাগ শহরের না উজেজ্‌ডে অঞ্চলে। ঘন ঘন পিতার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে কবির বাল্যকাল বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। তবু সেই অবস্থায়ও কখনও বা সুসময় আসে। সে কথা চিন্তা করে কবি তাঁর “মে”* কাব্যে বলেছেন—“আমার জীবনবনেও সুসময় এসেছিল। আমার বাল্য সময়ের নিষ্ঠুর শ্রোতে বিলীন হয়ে গেছে! অতীতের স্বপ্ন-ছায়ার মতো তা হারিয়ে গেছে। মৃতের শেষ চিন্তার মতো অতীত যুদ্ধের কলরবের মতো—বেহালার তারের মতো—অতীতের সমাধির মতো—মেঘশূন্য আকাশে রামধনুকের মতো—এমনি হারিয়ে-যাওয়া যা কিছু সুন্দর, আমার শৈশবও তেমনি!”

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কবির বাল্যের সুখদুঃখ ছাড়াও অজ্ঞান যে সব চিন্তা তার বুদ্ধিদীপ্ত ও স্বদেশাভিরাগী মনে নাড়া দিয়ে যায় বোহেমিয়ার এককালীন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একদিকে বোহেমিয়ার অতীত মাহাভ্যার ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ আর একদিকে Rococo ও Baroque স্থাপত্যে সমৃদ্ধ জার্মান ধনকুবের ও জার্মান ভাবাপন্ন চেচ্‌ অভিজাতদের অথবা Hapsburg বংশের প্রিয়পাত্রদের রমণীয় প্রাসাদ। Hapsburg বংশেরই সম্রাট ২য় Ferdinand ১৬২০ সালে চেচ্‌দের ধর্মসঙ্কীর্ণ স্বাধীন মনোভাবের দাবীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে বোহেমিয়া জয় করেন। মাখার সময়ে দেশের অবস্থা বর্ণনা করে চেচ্‌ সাংবাদিক Havlicek বলেছেন—“জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এই ধ্বংসোন্মুখ বংশধরদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে এদেরই স্মরণীয় পূর্বপুরুষেরা অত্যাচারী পোপ বা পরদেশগ্রামী সম্রাটকে কখনও ভয় করেনি।”

কিন্তু এই জাতীয় নৈরাশ্র ও অনিশ্চয়তার ছায়াতেই চেচ্‌ পূর্ণজীবনের সঞ্চার হয়। Dobrovsky ও Jungmann-এর কঠোর ও প্রাণপণ চেষ্টায়

* “মে” কাব্যের বাংলা মর্মভাবাদ “আধুনিক কবিতা” (শারদীয় সংখ্যা ১৩৬৮) য় প্রকাশিত হয়েছে।

চেক্ ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দুশো বছরের নানা উৎপীড়নের পর চেকেরা আবার তাদের মাতৃভাষা ফিরে পায়। মাথা সেই ভাষাতেই স্বরের মুছনা রচনা করেন। বাস্তবিক এই যুগে মাথার আবির্ভাব চেক জাতির জীবনে এক অপূর্ব ঘটনা। সে সময়কার অগ্ন্যগ্ন দেশের কবিদের সৃষ্টির সঙ্গে মাথার সৃষ্টির তুলনা করা চলে। তবে শেলী, কীটস্, হাইটম্যান্-এর মত মাথার রচনাও জীবদ্দশা অপেক্ষা পরবর্তীকালেই বিশেষ সমাদৃত হয়েছে।

এই সময়েই কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ও জাতীয়তাদী চেক্ চেকসমিতি ও চেকনাট্যশালা স্থাপন করেন। এখানে চেক্ ভাষাতেই চেকনাটক অভিনীত হতো। এই সমিতির আর একটি কাজ ছিল চেক্ লোকগাঁথা ও ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা। তরুণ মাথাও এই সমিতিতে যোগ দেন। শহরে চেকেরা তখন এতই জার্মান-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলো যে এই সমিতির সভ্য ও উৎসাহীদের তারা বিকৃতমস্তিষ্ক গণ্য করতো। তখনকার জনপ্রবাদ যে— প্রাগে চার্লস পুলের ওপর চেকদের সংখ্যা সোনার হরিণের মতই বিরল। চেকদের তখন জীবিকা সংস্থানেরও খুব কম পন্থাই ছিল। মাতৃভাষার ব্যবহার না ভুলতে পারলে তাদের পক্ষে একমাত্র কৃষিকার্যই জুটতো। অষ্ট্রিয়ান্ শাসকরা একথা সম্যক উপলব্ধি করেনি যে নিজেদের মাতৃভূমিতে চেকদের ওপর যে অত্যাচার, তা তাদের দিনে দিনে দুর্বল করার পরিবর্তে দিনে দিনে তাদের শক্তিশালী করে তুলছে। কারণ মাতৃভূমির মাটিতেই তাদের মূল এবং সেই মাটিই তাদের শত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণশক্তির রসদ জুগিয়েছে।

মাথার প্রথম পাঠ গ্রামের স্কুলে। তখন স্কুলে ল্যাটিন্ ও জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। চেক্ ভাষার স্থান ছিল না। কবির ছাত্রজীবন স্তব্ধ হয়েছিল। এই অন্তর্ভূতিপ্রবণ, কল্পনাপ্রবণ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালকটির কোন সঙ্গী বা বন্ধু ছিল না। সবাই তাকে ভুল বুঝতো। তাই তার একমাত্র সঙ্গী ছিল বই এবং নিজের চিন্তা লিপিবদ্ধ করাই ছিল তার সাহায্য। দেশের নানা পৌরাণিক উপাখ্যান পড়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে থাকতো। সেন্ট্‌ভাখলাভ্, চতুর্থ চার্লস্, ইয়ান্ হুস্, বা জিজকার কাহিনী তার কাছে কল্পিত নয়, বাস্তব হয়েই দেখা দিত। বিদেশী শাসকদের দেশ হতে বিতাড়িত করে দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার পাশ হতে মুক্ত করতে সে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

মাথার অগ্ন্যাগ্ন প্রিয় পাঠের মধ্যে—Robinson Crusoe, The Lady of the Lake, গোথে, শীলার, মিল্টন ও বায়রন্।

বায়রণকে কবি সত্যিকারের বন্ধু ও বীর মনে করতেন। উভয়েই আদিম সৌন্দর্যের পূজারী, তীক্ষ্ণ অল্পভূতিসম্পন্ন, বিচিত্র কল্পনাবাদী। উভয়েই একা এবং উভয়কেই কেউ প্রকৃতভাবে বুঝতে পারে নি। কিন্তু মাথার বায়রণ-প্রীতির অন্য কারণও ছিল। বায়রণ যে লেখনী ত্যাগ করে তরবারি হাতে গ্রীসের স্বাধীনতায়ুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে মাথা প্রত্যাশ্রয় অবনত হয়ে পড়তেন। তার নিজেরও সেই আদর্শ ছিল। মাথার জন্মান্বশে যে নিঃসঙ্গ তারকার প্রভাব দৃষ্ট হয় তাকে “প্রতিভা” নামকরণ করা হয়। প্রতিভা যাদেরই স্পর্শ করেছে তারাই সমাজচ্যুত হয়ে দুঃখভোগ করেছে।

স্কুল-জীবনে মাথা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয়ে যান আইন পড়ার জন্য। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এতদিনে প্রথর ব্যক্তিত্বরূপে প্রকাশ পায়। দীর্ঘ স্নগঠিত চেহারা, মাথায় কাকের মত কাল কৌকড়া চুল, কিন্তু অত্যধিক বিষাদাচ্ছন্ন নীল চোখ দুটি দেখে মনে হত যেন সে সর্বদাই এক অপার্থিব বিচ্ছিন্নতায় ক্লিষ্ট। এবং যে অপার্থিব জগতে তাঁর বাস সেখানে বিরাজমান ছিল একমাত্র বিষাদদেবী। মাথা বলতো—“ফুল ভাল লাগে আমার কারণ ফুল বরে পড়ে। জীব ভাল লাগে আমার কারণ তাদের মৃত্যু হয়। মানুষকে ভাল লাগে আমার কারণ মানুষ জানে সে মরণশীল। ভগবানের আমি উপাসনা করি কারণ ভগবান নেই।”

একা একা মাথা পদব্রজে বোহেমিয়া ও স্লোভাকিয়ার ভগ্ন, পরিত্যক্ত দুর্গ ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখে বেড়াতেন। ইটালীও তিনি ঘুরে আসেন। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচীনের আকর্ষণ ছাড়াও কবির মস্তিষ্কে এক গোলকধাঁধা বিরাজ করতো। সেখানে বিষাদ ও নৈরাশের জমাট অন্ধকার। যাতকের হাতে দণ্ডিতের প্রাণদণ্ডও কবি দেখতে যেতেন দণ্ডিতের নির্জীব মুখ ও চোখ প্রত্যক্ষ করার জন্য—যেন সেখানেই জীবন-মৃত্যুর ধাঁধার সন্ধান মিলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছর মাথার জীবনে প্রেমের ফুল ফোটে। মাথা এই সময়ে চেক ভাষায় অভিনীত নাটকে অংশ গ্রহণ করতেন। এক দপ্তরীর মেয়ে লোরীর সৌন্দর্যে কবি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

লোরী বা অন্য কেউ মাথাকে কখনও স্তম্ভীত করতে পারতো কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভালবাসা সম্বন্ধে মাথার সন্দ্বিগ্নচিত্ততা ও দাবী বড় অল্প ছিল না। কখনও কখনও মাথা প্রেমে ক্লাস্ত হয়ে পড়েন এবং ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝির জন্য একা একা বের হয়ে পড়তেন—কখনও বা কবরখানা,

কখনও ভাঙ্গা ঐতিহাসিক দুর্গ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সন্ধানে। লোরীও একা থাকতো না, তারও প্রণয়কাজ্জীর অভাব ছিল না। একজন চব্বিশ বছরের প্রতিভাশালী অদ্ভুত অল্পভূতিশীল যুবক—বয়স অপেক্ষা মনের বয়স অনেক বেশী এবং মনের মাঝে সদাই এক আলো-আঁধার—আলো অপেক্ষা আঁধারই বেশী। আর একটি সতেরো বছরের স্বন্দরী মেয়ে, যার কাছে পৃথিবী তখনও জীড়াভূমি মাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্ব-শেষে মাথা কপর্দকহীন অবস্থার। নিজের সংস্থানের কোন উপায়ই করতে পারেন না। এমনি সময় তিনি জানতে পারেন যে লোরী তাঁরই সন্তানের মা হতে চলেছে। নিরুপায় হয়ে তিনি উত্তর বোহেমিয়ায় Litomerice শহরে এটর্নি অফিসে একটি কাজ নেন। মাইনে সামান্য, পরিশ্রম অত্যধিক। লাবে নদীর ধারে একটা পাহাড়ের ওপর বাড়ীতে মাথা দুখানি ঘর ভাড়া নেন।

অর্থাভাব হলেও মাথা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন সেই পরিবেশেই ফিরে এলেন। জানালা দিয়ে প্রভাতের ও অপরাহ্নের সূর্যালোক রঞ্জিত ও রাত্রির রূপালি চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত Haznburk ও Kostel দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেই অনির্বচনীয় দৃশ্য কবির কষ্টের জীবনেও সান্দ্রনা আনত। অদূরেই ডকুমি ও সেই হ্রদ যা তাঁর “মে” কাব্যে অমর হয়ে আছে।

“মে” কাব্য কবি অর্থ কর্ত্ত করে নিজেই প্রকাশ করেন ১৮৩৫ সালে কিন্তু প্রথম প্রকাশ সমাদৃত হয়নি। অল্পভূতিপ্রাণ কবির মনে এক প্রচণ্ড আঘাত আসে এবং মাথা আরও বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ‘কাব্যের আবেদন শুধু তাদেরই কাজেই যাদের দেখার চোখ ও অল্পভবের মন আছে। তখনকার চেক্ লেখকের লেখনীর সাহায্যে জনগণকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে জাগিয়ে তোলার যে চেষ্টা করছিল তাতে “মে”র অল্পভূতি ও সৌন্দর্য জনগণের কাছে সম্পূর্ণ নতুন মনে হল এবং তারা তা গ্রহণ করতে পারলো না।

আগেই সন্তানের জন্মসংবাদে, সন্তানের অস্বস্থতা ও লোরীর ঔদাসীন্তে মাথার মানসিক অশান্তি আরও বৃদ্ধি পায়। কবি উপলব্ধি করেন লোরী বোধ হয় কোনদিনই তাঁকে ভালবাসেনি। তবু মাথা শেষ কপর্দক পর্যন্ত তাঁর সন্তান ও ভাবী স্ত্রীকে পাঠিয়ে নিজে অনাহারে দিন কাটাতে থাকেন। কখনও কখনও লোরী ও সন্তানের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকবার জন্য মাথা পদব্রজে প্রাণে যাতায়াত করতেন। চল্লিশ মাইল পথ একদিনে যাতায়াত করা কম শারীরিক শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয় না। এই শক্তির উৎস ছিল কবির স্নায়বিক শক্তি।

একদিন সন্ধ্যায় মাথা Litomerice-এর নিকট ছোট পাহাড়ে বসে আছেন। দূরে গ্রামে রক্তিম আভা দেখা দেয়। প্রথমে অন্তায়মান সূর্যের রশ্মি বলে ভ্রম হয়—কিন্তু তা নয়, গ্রামে এক থামারে আগুন লেগেছে। মাথা ছুটে আগুন নিভাতে যান। কিন্তু সে কাজ সহজ নয়। জলের কুয়া অনেক দূরে। সারারাত ছুটাছুটি করে জল এনে গ্রামের সকলের সঙ্গে আগুন নিভিয়ে মাথা ভোরবেলা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। তারপরে নিমোনিয়াফ আক্রান্ত হয় তবু সেই অবস্থায় রোজ কাজে যাওয়া বন্ধ হয় না মৃত্যুর দিন ছাড়া।

জীবনের শেষ কদিন কবির মানসিক অশান্তি চরম হয়ে ওঠে। এই সময়ের তাঁর একটি চিঠিতে তাঁর মানসিক যন্ত্রণা যেন মুখর হয়ে ওঠে: “হায়! লোরী যদি আজ এখানে থাকতো তাহলে আমি কত সুখী হতাম! একা একা আমি আর অনিশ্চয়তা সহ্য করতে পারি না। আমি একা, সম্পূর্ণ একা। আমার কথা বলারও কেউ নেই। সমস্ত মনুষ্যজাতি আমাকে ত্যাগ করেছে...”

ডাক্তার মাথার অসুখ ধরতে পারলেন না। পিপাসায় ও জরে কাতর হয়ে মাথা বলতে লাগলেন—“আমি জানি, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে...” তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁর বাকশক্তি লোপ পেলো। শূন্যের দিকে চেয়ে তিনবার দুর্বল ভাবে হাতখানি তুলে কবি সেই রাজ্যে চললেন যেখানে চিরকালই “মে” বিরাজমান, চিরবসন্ত। সেদিন ৫ই নভেম্বর ১৮৩৬ সাল।

প্রাগে পরিবারের কেউই এ সংবাদ জানতে পারলো না। কবি চিঠি দিয়েছিলেন—

“আমি ৭ই নভেম্বর সোমবার প্রাগে আসবো। মঙ্গলবার সকালে সেন্ট স্টিফেন্স গির্জায় আমার বিয়ের অনুষ্ঠান হবে।”

সকলেই সেই প্রত্যাশায় আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনেও মাথা না আসায় তাঁর ভাই খবর নিতে আসেন। অনাথের কবরখানায় তখন কবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা শেষ হয়ে গেছে।

কবির মৃত্যুর পর অনেক “মে” এসেছে কিন্তু প্রতিবছরই মে মাসের প্রথম দিনটিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে পেট্রিন পাহাড়ে মাথার মূর্তির তলে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা প্রেমিক-প্রেমিকেরা সমবেত হয় কবিকে তাদের পুষ্পার্ঘ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। “মে” কাব্য থেকে তারা আবিষ্কার করে—

“গোধূলি। ১লা মে। মের সন্ধ্যা প্রেমের লগ্ন। স্বগন্ধি পাইনবন পায়রাদের মধুর প্রেমগুঞ্জে মুখরিত; বনের সবুজ শেওলা থেকেও প্রেমের শ্বাস-প্রশ্বাস বেরিয়ে আসে। গোলাপকুলকে নাইটেঙ্গল প্রেমের কথা শোনায়। সে তার জবাব দেয়।.....”

চীনা বর্বরতার বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠ

সত্যপ্রিয় ঘোষ

কমিউনিস্ট চীন সভ্যতার মুখে চুনকালি মাখাতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির এমনি পরিহাস যে সে চুনকালির হাঁড়ি তার নিজেরই মাথায় ফেটেছে। ফলে তার এমনি চেহারা বেগিয়েছে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকেও সে জাতিচ্যুত হয়েছে, একঘরে হয়ে গেছে। ব্যাপারটা হাস্যকর নয়, ভয়াবহ। কারণ এক-কান-কাটার লজ্জা আছে সে শহরের বাইরে দিয়ে যায়, কিন্তু দু-কান-কাটার সে-বালাই নেই। সে জানতে পেরেছে আপন কুলে সে কুলাঙ্গার আর বাইরের সমাজে বর্বর, সে তখন মহুয়াত্বের সমস্ত শালীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে দস্যু চেঙ্গিস খাঁর উত্তরপুরুষ বলে আত্মপরিচয় দেবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মুশকিল এই যে অসভ্যতার দয়া সামলাতে হয় সভ্যতাকেই। পশু সে তো নিরঙ্কুশ, অঙ্কুশ চালনার গুরুদায়িত্ব বর্তায় সামাজিক মানুষের ওপরে।

সে দায়িত্ব ভারতবর্ষ সমবেতভাবে গ্রহণ করেছে। বাংলার কবিরাও অগ্রমনস্ক নেই। চীনের সাম্রাজ্যলোলুপ নখদন্তবিস্তারের বীভৎস চেহারা দেখে সেই অপশক্তি বিনাশের ব্রতে দলমতনির্বিশেষে ভারতের জনমানসে যে-শপথ স্বতঃউৎসারিত হয়েছে তার বাণীরূপ পশ্চিমবাংলার কবিদের লেখনীতে কতকটা বিধৃত হল, বক্ষ্যমান প্রসঙ্গে সেইটেই আমার আলোচ্য।

বাংলা কবিতার চারটে পুস্তিকা আপাতত আমার হাতের কাছে আছে। প্রত্যেকটি আধ ফর্মা। অর্থাৎ মলাট সমেত আট পৃষ্ঠার এক-একটি বই। এর সবগুলিই সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; কেবল প্রথম সঙ্কলনটির কাজে তিনি কবি অতীন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতা পেয়েছেন। এগুলির মধ্যে সঙ্কলিত হয়েছে আঠারো জন কবির কবিতা, যুগ্য চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছন্দোবদ্ধ ধিক্কার। নানান মেজাজের সাতাশটি কবিতা নানাভাবে এই পুস্তিকাগুলির মধ্যে প্রতিকলিত করেছে ভারতবর্ষের আত্মাকে।

যে-আঠারো জন কবির কবিতা পুস্তিকাগুলিতে সঙ্কলিত হয়েছে তাঁদের নাম হল প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, স্বশীল রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অতীন্দ্র মজুমদার, পূর্ণেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, রামেন্দ্র দেশমুখ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, আশিস সান্যাল, বৈগুনাথ চক্রবর্তী ও শান্তনু দাস।

অধিকাংশ কবিতাতেই একটি কথা সোচ্চার হয়ে উঠেছে : সে হচ্ছে চীনের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা। সাম্যবাদী জনগণতন্ত্রের দেশ বলে যাদের পরিচিতি ছিল তাদের নৈতিক অধঃপতন এতদূর পর্যন্ত যাবে এটাই সবাইকে সর্বাপেক্ষা রুচ আঘাত দিয়েছে। বর্তমান চীনের এই স্বরূপকে প্রেমেন্দ্র মিত্র বর্ণনা করেছেন ‘বিষকীটচক্র কপটতা’ বলে, তার বৃশ্চিকপুচ্ছের আফালন দেখে তিনি বলছেন :

‘আমার চূর্ণ বিশ্বাসের প্রতিটি কণা থেকে উৎক্ষিপ্ত হবে
তোমার যুথবাহন দন্তের বিষ্ফোরক কালক্ষুলিঙ্গ।’

বিশ্বাসহস্তা চীনের উদ্দেশে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলছেন :

‘তুমি কলুষিত করে দিয়েছ বাতাস,
সেখানে কেবল ঘৃণা জন্ম নেয় সাপের মতন।’

দক্ষিণারঞ্জন বসুর কবিতায় এই কথাটা প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে :

‘বিপুল বিক্ষোভে হিমালয় আজ কাঁপছে,
অভাবনীয় এক বিশ্বাসঘাতকতায় দেবতাত্মা বুঝি দীর্ণ!
ইয়াংসিকিয়াং-এর জলে শুধু পোকা আর পোকা
অসংখ্য থেকে অসংখ্যের সৃষ্টি।’

যজ্ঞবাদীর্ণ কর্তে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলছেন :

‘আজকে সামনে ভীষণ

আততায়ী হৃদয় মুখোশ ছিঁড়ে পিশাচের মত

বুক চাপড়ায়, দশ আঙুলের বাঘনখে ছিঁড়তে চায় আমার স্বদেশ।’

তরুণ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তীব্র ধিক্কারে চীনকে তার ‘সাম্রাজ্যবাদী কেশর মোচন’ করার আহ্বান জানিয়ে বলছেন :

‘পৃথিবীর এই অতুজ্জ্বল স্তম্ভে তোমরা জানোয়ারের মতো মানুষের
আত্মা ও অস্তিত্ব ও মহত্ত্বের ওপর গোলাবারুদ রেখে যুদ্ধ করছ !

চীনের এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ সম্পর্কে যেমন প্রত্যেক কবিই কিছু না কিছু বলেছেন তেমনি এই অক্রমণের বিরুদ্ধে স্বদেশকে রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞাও সকলেই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছেন। সেই প্রতিরোধ-সংকল্পের কিছু কিছু উদ্ধৃত করি। স্বদেশরঞ্জন দত্ত বলছেন :

‘দেব না বিরুদ্ধ হতে তোর মুখ। • তোর দেহপদ্ম হতে
একটি পাপড়ি ওকে খসাতে দেব না।’

অতীন্দ্র মজুমদার বলছেন :

‘তার লোভে তীক্ষ্ণ বিষদাঁত ভেঙে দাও, তবে
পৃথিবীর সব সাপ আপনিই অবলুপ্ত হবে।’

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখছেন :

সিকিম-ভোটান-নেফাতে
এক ছটাকও ভুঁই দেব না
ডাকু চীনের হাতে।
মোড়লচাচা হুঁশিয়ার
কাশ্মীরের মতো আর
লড়াই খামার দাগ মেনো না
দেশের জমিটাতে।’

প্রতিরোধের প্রসঙ্গে স্থলীল রায়ের ‘সীমান্ত-সৈনিক’ শীর্ষক কবিতাটি সর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগ দাবি করতে পারে, প্রধানত এই কারণে যে এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল তিন বছর আগে—১৩৬৭ সালের শারদীয় ‘জনসেবক’ পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এমনও হয়তো হতে পারে যে ভারতের জমি গ্রাসের লালসায় লালচীনের খাবা বিস্তারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষায় এটিই হয়তো প্রথম কবিতা, কবিতায় প্রথম প্রতিবাদ। কবিতাটিতে বলা হয়েছে, ১৯৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের খবর-কাগজে দেখা গেল চীনারা ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন করে নেফার সুবর্ণসিঁড়িতে হানা দেবার প্রতিবাদে শহরপ্রান্তের ব্রজচুলাল ষ্ট্রীটের ছাত্রাবাসের একশটি ছাত্র রক্তের অক্ষরে দেশ-মাতৃকাকে রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করে এক চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছে :

‘শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের এ ভারতভূমি
যারা অপবিত্র করে, তাকে দূর করে দাও তুমি।
আমরা ছাত্রের দল রক্তের অক্ষরে লিখে নাম
তোমার পবিত্র কাজে আমাদের উৎসর্গ করলাম।’

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য চারটি সংকলনের কবিতাগুলির মধ্যে এই কবিতাটি বাদ দিলে সর্বাগ্রে রচিত হয়েছে যে কবিতাটি তার নাম ‘চীন : ১৯৬২,’ লিখেছেন অতীন্দ্র মজুমদার ২১ অক্টোবর ’৬২ তারিখে।

চীনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভারতের প্রতিরোধ বিষয়ে সকলেই কিছু না কিছু লিখেছেন ; সকলে না লিখলেও কবিতাগুলির মধ্যে তৃতীয় বক্তব্য

উপস্থিত ভারতের কমিউনিস্টদের উদ্দেশে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কমিউনিস্টদের
উদ্দেশ্য ক'রে বলছেন :

‘এখনও তোমরা অন্ধকারে বসে আছ কেন ?

এখনও তোমরা নিচু গলায় কথা বলছ কেন ?

এসো, তোমরা এই রোদ্দুরে এসে দাঁড়াও।

এসো, তোমরা এই রোদ্দুরে এসে দাঁড়াও।

নিজের মাকে একবার মা ব'লে ডাকো।’

বৈষ্ণবনাথ চক্রবর্তী লিখছেন :

‘বন্ধু এবার নতুন করেই ভাবো না

সাম্যবাদ কি দেশদ্রোহীর পর্ব ?

বুকে যদি বাজে নিজের মায়ের কান্না

মানবতাবাদ কোথাও হয় না খর্ব।’

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী আরো কোন কোন কবিতায় যেমন
উচ্চারিত হয়েছে তেমনি কমিউনিস্ট বিদ্বেষে অন্ধ আত্মকলহপরায়ণতার
বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি আছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় :

‘যদি দেশের মধ্যে আমরা ঘৃণার বিষ বয়ে

এ-ও'র চোখে তাকাই,

‘একজাতি একপ্রাণ’-এর শপথ তখন অসহায়ের মতো

সীমান্তের সৈনিকের বুকেও কোন বাতাস আনবে না।’

তাই ভারতবর্ষের পক্ষে এখন, এই মুহূর্তে, সব চাইতে মূল্যবান হচ্ছে ঐক্য,
আত্মসংহতি। সচেতন বিচারবোধের নিরিখে এখন প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ
করতেই হবে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাকেই বলা যেতে পারে :

‘মানুষের মতো আজ মাথা তুলতে হবে

মানুষের মতো ;

এখন সামনে ভয়াবহ অন্ধকার, ঈর্ষা, আক্ষালন ;

এমন সামনে

সত্যিকারের এক নরকের মুখ তার সুন্দর মুখোশ

হঠাৎ জ্বালাতে ছিঁড়ে ফেলেছে। এখন

দানবের মুখোমুখি দাঁড়াবার দিন।’ *

* (১) রক্তে ভাসা মুখ—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অজিত মজুমদার সম্পাদিত, মূল্য ৩০ ন. প.

(২) চীনের নামবিষ (২ম) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য ২৫ ন. প.

(৩) ঐ (২য়) ঐ ঐ

(৪) একজাতি একপ্রাণ ঐ ঐ

(পরিবেশক : ইণ্ডিয়ানা, ২/১, শ্রামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২)

শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত গ্রন্থ

স্বীরোদকুমার দত্ত	শরৎ-সাহিত্য-সমীক্ষা	৪'৫০
স্বীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ও রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়	} শরৎচন্দ্রের শিল্পচাতুর্ঘ্য	২'০০
ক্ষেত্র-গুপ্ত ও জ্যোৎস্না গুপ্ত		
জহরলাল বসু	শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা	২'০০
প্রমথনাথ পাল	বাংলা গল্প সাহিত্যের ইতিহাস	৩'৫০
নীলিমা ইব্রাহিম	দত্তা পরিচয়	০'৫০
মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শরৎ প্রতিভা	৭'০০
মাখনলাল মুখোপাধ্যায়	শ্রীকান্ত পরিচিতি	১'৫০
রেণু-মিত্র	শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের পটভূমিকা	১'২৫
সচ্চিদানন্দ পাঠক	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৩'০০
নরেন্দ্র দেব (সম্পাদিত)	দত্তা পরিচিতি	১'০০
ডঃ হুমায়ুন কবির	শরৎ-বন্দনা (সংকলন)	২'০০
	Sarat Chandra Chatterjee	১'২৫
যে গ্রন্থগুলির একাংশে শরৎসাহিত্যে সমালোচনা আছে :—		
অচ্যুত গোস্বামী	বাংলা উপন্যাসের ধারা	৬'০০
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ	বঙ্গসাহিত্যে হস্তরসের ধারা	১৪'০০
অজিত দত্ত	বাংলা সাহিত্যে হস্তরস	১২'০০
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	বাংলা গল্পের শিল্পসমাজ	৩'২৫
ডঃ অধীর দে	আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা	১২'০০
অনিল বিশ্বাস	বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য	৫'০০
অন্নদাশংকর ও লীলা রায়	Bengali Literature	২'০০
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা	৬'০০
কুমুদনাথ দাস	A History of Bengali Literature	২'০০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	বাংলা ছোটগল্প	৪'০০
নারায়ণ চৌধুরী	আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন	৩'৫০
প্রমথনাথ বিশী	বাংলা সাহিত্যের নরনারী	২'৫০
বীণা সেন	সাহিত্য দর্পণ	২'৫০

বুদ্ধদেব বসু	An Acre of Green Grass	৪'৫০
ভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৭'০০
" "	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	১৬'০০
ভোলানাথ ঘোষ	বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা	১০'৫০
ডঃ মনোমোহন ঘোষ	বাংলা সাহিত্য	১০'০০
" "	বাংলা গল্পের চার যুগ	৩'০০
মোহিতলাল মজুমদার	আধুনিক বাংলা সাহিত্য	৫'০০
বরণজিৎকুমার সেন	বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা	৪'০০
ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	বর্তমান বাংলা সাহিত্য	২'০০
লীলা রায়	A Challenging Decade	৩'০০
ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত	বাংলা সাহিত্যের নবযুগ	৪'৫০
ডঃ শান্তিকুমার দাসগুপ্ত	সাহিত্য ও আলোচনা	২'০০
ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়	উপন্যাস পাঠের ভূমিকা	৫'০০
শৈলেশনাথ বিনী	শরৎচন্দ্র জীবন উপন্যাস	৪'০০
" "	বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রবন্ধ	২'০০
শ্রীমল চট্টোপাধ্যায়	বাংলা গল্পের ক্রমবিকাশ	৬'০০
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা উপন্যাস	২'০০
" "	বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা	৭'০০
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা উপন্যাসের কালান্তর	২'০০
ডঃ সুরকুমার সেন	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)	১০'০০
" "	বাংলা সাহিত্যে গল্প	৪'০০
" "	Bengali Literature	১০'০০
হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত	সাহিত্যের কথা	৪'০০

সাহিত্যের খবর-এ প্রকাশিত তালিকার সংশোধন :—

মনোরঞ্জন জানার গ্রন্থটির নাম—শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও দর্শন

ক্ষীরোদকুমার দত্তের " " —শরৎসাহিত্যে নারীচরিত্র

কালিদাস রায়ের " " —শরৎসাহিত্য

উপহারে

‘বেঙ্গল’এর বই দ্বিতীয়বার !

অন্তরীক্ষের সঙ্গীত

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ চার ॥

বিজ্ঞানের আজকাল বেশ কিছু উন্নতি হয়েছে। মানুষ আণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছে; তাকে নানা কাজে লাগাচ্ছে, তার সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহে যাবার আশা পোষণ করছে; গিয়ে পৌঁছচ্ছে বলেও শোনা যাচ্ছে। একদা এরই সহায়তায় কত অসাধ্য সাধনই না মানুষ করতে পারবে। মানুষের মধ্যে যে-মন ও বিজ্ঞান-সত্তা আছে—যত দিন যাবে ততই তার জয় ঘোষিত হবে। এতে দিন দিন আন্তিক্যবুদ্ধি-ই বাড়বে। বাড়তে বাড়তে একদা বিজ্ঞানবুদ্ধি ‘বিজ্ঞানানন্দে’ রূপান্তরিত হবে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের চরম উন্নতি মানুষকে পরম ‘ব্রাহ্মস্থিতি’-লাভের ধর্মপথেই একদা টেনে নিয়ে যাবে। এটা অবশ্য হতে বহু লক্ষ যুগ লাগবে। আজ আমরা ব্রহ্মবিজ্ঞান নয়, প্রকৃতিবিজ্ঞানের সন্ধানী।

কিন্তু এতে-ও কাজ হচ্ছে। দেখতে তো পাচ্ছি—রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-দিয়ে-তৈরী এই দেহটার মধ্যে সূক্ষ্ম যে চেতনাময় সত্তাটা আছে তার শক্তি ক্রমশঃ জড় জগতে-ও প্রকাশিত হচ্ছে। নিতান্তই স্থূল এই জীবদেহটা নিয়ে-ও আজ আকাশে উড়ছি পাতালে নামছি। এক দেশের কথা আন দেশে মুহূর্তমধ্যেই প্রেরণ করছি। আনগ্রহের ছবি আমাদের গ্রহে, অবলীলাক্রমে নিয়ে আসছি—এতে জীবদেহের অন্তরস্থ শিবচেতনাই স্পষ্ট হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে শিব-চেতনার শক্তি-ও জীবজগতে প্রকাশ করা সম্ভব।...

মেনে নেওরা ভালো, বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত অতি অল্প সত্য-ই জানতে পেরেছে। একদিন অবশ্য বিশ্বভূমণ্ডলকেই সে জানবে। আবার এমন দিন-ও আসবে—যখন যন্ত্রযোগে আর জানতে হবে না, ইচ্ছামাত্র মন্ত্রযোগেই সবকিছু জানবে। চাদের ছবি আজ যন্ত্রযোগে আনছি, শুক্র-গ্রহের রহস্য কথা জানছি, একদিন স্বশরীরে সে-সব জায়গায় যেতে পারব বলে আশা। এই যাওয়া-আসায় আজ যন্ত্রের প্রয়োজন হচ্ছে, কিন্তু একদা কোন প্লেন, কোনো স্পুটনিক, প্রয়োজন হবে না। ‘যোগ’শক্তির আনন্দে আমরা অনন্ত রহস্যমণ্ডলে যেতে পারব, ইচ্ছাশক্তির মহিমায় বিশ্বভুবনের অশেষ মঙ্গল করতে পারব।

অবশ্য বর্তমানে, প্রাকৃতবিজ্ঞানের উন্নতির যুগে, অত্যন্ত এই যত যোগধর্মী অধ্যাত্মকথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়; আজ আমরা বুদ্ধিকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিচ্ছি। বুদ্ধির একনিষ্ঠ সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণে আজ আমরা সার্থকতা চাইছি। সেই যন্ত্র-ব্যবহারে জড়বস্তু-ও পৃথিবীর আকাশে সর্বত্র গতায়ত করছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরেও যেতে চাইছে। একদিন এক সৌরমণ্ডল থেকে আর এক সৌরমণ্ডলেও কি যাবে? আশা করুন, যাবে।

কিন্তু কত সৌরমণ্ডল এক জীবনে পরিক্রমা করবেন? করতে তো ইচ্ছা হয়? ইচ্ছা তো হয় আলোর চেয়ে-ও তীব্রতর গতিবেগে পরিক্রমা করি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কত রূপ, কত রহস্য, কত চিত্র, কত স্বর, কত সৌন্দর্য আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, একবার সন্ধানের সত্তা নিয়ে বার হই, দেখি, শুনি, দেখাই, শোনাই?

জীবদেহের শক্তি খুব সীমিত বলে' সূক্ষ্ম মনের শক্তি ও সংকল্পবলে আমরা যন্ত্র নির্মাণ করি। যন্ত্রের সাহায্যে জীবদেহ দূরকে কাছে আনে, অদৃশ্যকে দৃশ্যপথে রাখে, অশ্রুতকে শ্রুতিপথে আনয়ন-ও করে। জীবদেহের ওপর সূক্ষ্মমনের শক্তিই যখন প্রবলতর হবে, তখন যন্ত্রনির্মাণে সময় ব্যয় করতে মানুষ্য চাইবে না, কেননা যন্ত্রের যা' দান তা' বিনাযন্ত্রেই আয়ত্ত করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির রহস্যনিচয় যে ধীরে ধীরে যন্ত্রদ্বারা আবিষ্কার করে, আনছে—এতে মহত্তর মহাধর্মের মহিমাই প্রকটিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপ্ত সে মহাশক্তি সর্বত্র বিরাজিত, যা থেকে এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড, যার মধ্যে এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ও লয়, তাঁর কথা, তাঁর তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকদের যন্ত্রাবিস্কারের মধ্য দিয়ে-ও পরোক্ষ ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। আরো হবে। অল্প বিজ্ঞানের দস্তে নাস্তিক্যের আফালন; কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানের বিনয়ে পরম আস্তিক্যের অপাবৃত্ত আনন্দ। তখন এই উপলব্ধি, যে, দেশ ও কাল, শূন্য ও প্রাণ পরম এক সূক্ষ্ম চেতনার লীলাবিলাস। এই চেতনার অন্তরে গুহাহিত পরমাত্মা। বৃহত্তমোরা তিনি বৃহত্তর, মহত্তমোরা তিনি মহত্তর। তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মাকে জানা-ই জানা। যিনি ব্রহ্মবিদ সর্বতোভাবে তিনি-ই তিনি, অর্থাৎ ব্রহ্ম।

তাঁর লীলাবৈচিত্র্যভেই আমরা মুগ্ধ, বর্তমান জীবনে আমরা প্রকৃতির

পূজারী। জীবপালিনী এই পৃথিবী আমাদের মা। মা মৃন্ময়ী, আমরা-ও তাই মাটির তৈরী প্রাণবান পুতুল সব। পুতুলনাচের অন্তরালে নাচের নিপুণ ওস্তাদ যেমন থাকেন প্রচ্ছন্ন আমাদের পশ্চাতে আছেন মায়াময়ী বিশ্বপ্রকৃতি, আবার প্রকৃতির অন্তরে পুরুষ ব্রহ্মা—অর্থাৎ সৃষ্ণভাবে আমরা নিজেরাই।

বিশ্বপ্রকৃতি আমরা-ই। জীবদেহে প্রকৃতির আমরা ক্রীড়নক। সৃষ্ণমানস দেহে আমরাই বিশ্বপ্রকৃতি বলে' আমাদের জীবদেহের আমরা নিয়ন্ত্রক, তার কামনা-বাসনা পাপ-পুণ্যের আমরাই নিয়ন্ত্রক। সৃষ্ণদেহে আমরা যা করি, তা-ই হই। যা ভাবি, তা-ই হই। জীবদেহে আমরা অদৃষ্টের হাতে বন্দী; সৃষ্ণ মানসদেহে আমরা অদৃষ্টকে করি রচনা।

জীবদেহের মধ্যে সে সৃষ্ণ মানসদেবতাটি আছেন, তিনি যা করছেন, ভাবছেন, বলছেন—তারই দ্বারা পরবর্তীকালের অদৃষ্ট নির্মিত হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে জীবদেহে আবার যখন জন্মগ্রহণ করব তখন আমরা রচিত অদৃষ্টশক্তি আমাকেই নিয়ন্ত্রণ করবে। গতজন্মে যা করেছি, ভেবেছি, বলেছি তার দ্বারা এ-জন্মের জীবন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এ জন্মে নির্দিষ্ট সেই নিয়তির বন্ধন থেকে পার নাই। অতীতে যা করে' ফেলেছি, করে' এসেছি—তা হচ্ছে প্রাক্তন কর্ম, তার ফলভোগ করতেই হবে। তবে কি মুক্তি নেই জীবনে? না, আছে। আমার পরবর্তী জীবনকে সাধনার দ্বারা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এ-জন্মে দুঃখ সয়ে, বঞ্চনা সয়ে, অত্যাচার সয়েও মানুষের জন্তে, বিশ্বের জন্তে যে মঙ্গলস্বপ্ন আমি দেখে যাচ্ছি পরোক্ষভাবে তা' আমার অনাগত জীবন নির্মাণে অহরহ-ই সহায়তা করছে। আমার অনাগত শুভাদৃষ্ট রচিত হচ্ছে সমাগত জীবনের মঙ্গলস্বপ্নের ও কর্মের মাহাত্ম্যে—শাস্ত্রকারেরা একেই 'সৃষ্ণতি' বলেছেন। আগামী যুগে যখন আসব, দেখব সৃষ্ণতির ফলে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে, আমার কথার তাৎপর্য মানুষ গ্রহণ-ই শুধু করছে না, চরিত্রে প্রতিভাত করছে। তখন আমার যে-আনন্দ হবে সে-আনন্দ বলা বাহুল্য, অতীতেই আমি রচনা করে এসেছি অর্থাৎ সে আনন্দ এই আমি-রই সৃষ্টি। স্পষ্ট কথা এই, যে গতজন্মে যা করে এসেছি—সৃষ্ণাকারে সেই সব কৃতির বীজ এ জন্মের জীবন-বৃক্ষটিকে রূপায়িত করছে। বিশ্ববৃক্ষের বীজে বিশ্ববৃক্ষ হচ্ছে, অশখবৃক্ষের বীজে অশখবৃক্ষ হচ্ছে। প্রাকৃতিক এই অমোঘ সত্যকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কারোর নেই। এইজন্ত যারা জীবনরসিক, তারা এ-জন্মের জীবনে কী পেলুম না পেলুম—তা নিয়ে হৈ-চৈ, হাহাকার করেন না; নিভূতে আপনার সাধনার অন্তরালে পরবর্তী জীবনটিকে সত্য,

সুন্দর ও কল্যাণময় করার বাসনা করেন। ভোগের দ্বারা জীবনটাকে ব্যয়িত করে' বা ব্যথিত করার কামনা করে' অনাগত জীবনটিকে পুনর্বীর মলিনা বাসনার জীড়নক করে তোলেন না, বরং বিমুগ্ধ বাসনার শুভ সৌন্দর্যে অন্তর্জীবনটি শুচিমধুর করার প্রার্থনায় নিষ্কাম আনন্দে ইহলোকের কর্ম করে যান। বাইরে তাঁরা শুভব্রত সামাজিক থেকে ত্রায়সঙ্গত সকল কর্মই করে থাকেন, অন্তরে জাগেন সর্বভাগী সাত্বিক সন্ন্যাসীর আনন্দে। এমনতর মানুষ, এই বস্তুধর্মী জড়ভাবাপন্ন নাস্তিক যুগেও আছে, গুণলে তাদের সংখ্যা কম হবে না।

কিন্তু এই স্থলে বিজ্ঞ পাঠকের মনে জটিল যত প্রশ্ন উথিত হচ্ছে, আমি জানি। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দোষে-ই মানুষ যদি কষ্ট পায়, তবে আত্মত্যাগ করার কথা, দীনজনে সেবা দেয়ার কথা, বঞ্চিত জনকে বঞ্চনার অনাচার থেকে বাঁচানোর কথা ওঠে কেন? পূর্বজন্মেই যদি এ-জন্মের উন্নতি-অবনতি, শুভাশুভ নির্দিষ্টই হয়ে গিয়ে থাকে—তবে এ-জন্মের উন্নতি সাধনার কি কোনো অর্থ থাকে?

বস্তুবুদ্ধির বিচারে প্রশ্নগুলির যেন কোন উত্তরই নেই। একজন ধনীর সন্তান হয়ে জন্মাচ্ছে আর একজন নিতান্ত দুঃস্থ পিতামাতার সন্তান হয়ে জন্মাচ্ছে—এ ব্যাপারটাকে না-হয় মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে ব্যাখ্যা করব, সমাজে ধনবন্টনের বৈষম্যের দোহাই দিয়ে ব্যাপারটাকে সহজ করে আনব। কিন্তু নিতান্ত অজ্ঞ কৃষকের ঘরে জন্মেও একজন অসীম পাণ্ডিত্য দেখাতে শুরু করছে আর মহান পাণ্ডিত্যের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও একজন বহবার চেষ্ঠা করেও বহু শিক্ষকের সাহায্য নিয়েও স্কুল-ফাইনালটা কেন পাস করতে পারছে না—এটা বোধ হয় বস্তুতাত্ত্বিকরা ব্যাখ্যা করতে সহজে পারবে না। বার বছরের ছেলে তবলা বাজাচ্ছে প্রথিতযশা ওস্তাদের সূক্ষ্মতম গানের সঙ্গে, বার বছরে বেদবিদ্যায় পারংগম হচ্ছে গুরুকে বিম্বিত করে, উনিশ বছরের মেয়ে গণিত-বিদ্যার সূক্ষ্ম অধিগতি দেখিয়ে দেশ-বিদেশের পাণ্ডিত্য গণিতজ্ঞদের হতভম্ব করে দিচ্ছে—এমন সংবাদ আজও সংঘোষিত হচ্ছে। এগুলিকে শুধু প্রকৃতির খেয়াল বলে উদাসীন থাকলে মহৎ একটি জীবনসত্য সম্বন্ধেই চিরকাল অজ্ঞ থাকতে হয়।

পূর্বজন্মের স্মৃতি বা হৃষ্টি ইহজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে—এ-তত্ত্ব যেমন সত্য, তেমনি সহজ। এ-জন্মে যারা নাম করেছে, প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, সুখভোগ করেছে বা করেছে—ঈর্ষা করার কিছু নেই, এ-সব পূর্বজন্মেই তাঁরা অর্জন করার পথ করে এসেছে। এ-জন্মে আমার কিছুই হল না, শুধু দুঃখ করা,

আর লগিঠেলা আর বিড়ম্বনা সহ-ই মার হল—এ-সব ভেবে হাহাকার করেও কোনো ফল নেই, রক্ষাকবচ বা মাছলী-ফাছলী ধারণ করেও লাভ নেই, তবেই প্রশ্ন এই : ছুঃখী মানুষকে দয়া করার তা'হলে দরকার কি ? না, দরকার তার জন্ত নয়, দরকার আপনার নিজের জন্ত। স্বকৃতি সংক্ষেপে আপনাকে শয়দম দয়াপ্রেম প্রভৃতি ধর্মচর্চা করতেই হয়। ধর্মচর্চা করে' পরোপকার করে যদি ভেবে থাকেন আপনি খুব-ই করেছেন, খুব-ই করতে পারেন, তবে আপনি ভ্রান্ত। কেউ কারোর কিছু-ই করতে পারে না—শুধু পারে নিজের কর্ম ও ধর্ম সম্পাদন করতে বা এড়িয়ে যেতে। পূর্বজন্মের স্বকৃতি থাকে—আপনি দান দেয়ার, সেবা করবার, ভালোবাসবার স্বযোগ বা সৌভাগ্য পাবেন। এ স্বযোগ বা সৌভাগ্য যদি আপনার না থাকে, থাকলে-ও যদি গ্রহণ না করেন, অন্তরে গ্রহণ করতে পারছেন না বলে বেদনা যদি অনুভব না করেন—তবে একদিকে যেমন বুঝবেন যে, পূর্বজন্মের কোনো স্বকৃতি আপনার নেই, অপরদিকে তেমনি বুঝবেন—আগামী জন্মের জন্তেও কোনো শুভ-সূচনা আপনি করে যাচ্ছেন না।

কথাগুলোকে বুদ্ধির অহংকারে উড়িয়ে দিতে হয় দিন, কিন্তু এ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চয় যে, দান, দয়া, সেবা ও প্রেমের দ্বারা ইহজীবনকে আমরা যতোটা নির্মল করি, অনাগত পর-জীবনকে তারো চেয়ে আরো মহত্তর সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করার পথ-ও করে' যাই। এ-জীবনে প্রাণপণে শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য বা লোকসেবার সাধনা হয়তো করলেন, কিন্তু আপনার সহকর্মী সামান্য কিছু করেই সে লোক-সাফল্য পায়, আপনি তার শতাংশের একাংশও পেলেন না বলে ছুঃখই যদি করেন, তবে বুঝতে হবে—আপনার সহকর্মী পূর্বজন্মের স্বকৃতির ফলে ইহজন্মে সামান্য কিছু করেই সাফল্য পেলেন, এবং আপনি অনেক কিছু করেও ছুঃখ পেলেন, বিড়ম্বনা পেলেন। বিষয়টা শোনাচ্ছে বড় খারাপ কিন্তু সংসারে এ-রকম হামেশাই হচ্ছে—যুগে যুগে কালে কালে হবে। নিকামভাবে কর্ম করার তাৎপর্য এইখানে। কর্ম করে ফল পাব কিনা সেটা আমারই রচিত আমার প্রাক্তন সত্তা জানে। আমার আধুনিক আন্তর সত্তা তাই ফলের গ্রাহ্যই করে না। ফলে কর্ম তাকে বাঁধে না, উপরন্তু কর্মের শুভতা যদি কিছু থাকে, তা আগামী জন্মের সাফল্য-বীজে প্রাণসঞ্চার করে, অনন্তে মিশে অনন্তগতি লাভ করে।

এ জন্মে সাফল্য যদি কিছু পেয়ে থাকি তার জন্ত অহংকার যেমন মূঢ়তা, অনেক কিছু করেও কিছু হল না বলে' হাহাকারেই যদি মন ভরাই—তবে

তাও তেমনি মৃত্যু। জীবনের অনন্ত গতিতে যদি বিশ্বাস করি; তবে অনাগত জীবনকে ইহজীবনের অহংকারে বা হাহাকারে নামিয়ে আনব না। পরন্তু নিরলস কর্মসাধনায় ব্যাপ্ত নিকাম আনন্দে আগামীজন্মগুলির উত্তর পথকে প্রশস্ত করারই চেষ্টা করব।

এ-জন্মের চেষ্টার দ্বারা এ-জন্মেরই উন্নতি সম্ভব—স্পষ্টতর এ-কথা না বললে নিশ্চয়ই তর্ক উঠবে। এ-জন্মটাকেই আমরা বড় বেশি প্রাধান্য দিই। ‘Act, act in the living present’—এ-জন্মের তাৎপর্য ইহজন্মটাকেই শুধু লক্ষ্য করি। এ-প্রসঙ্গে আমি ইচ্ছা করেই নীরব থাকব। তর্ক করব না। কৈননা জানি, আপনি বলবেন, এ-জন্মে ভালো লেখাপড়া করে’ এ-জন্মেই ছেলে ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে, বিস্তর চেষ্টা করে’ ভোট-টোট সংগ্রহ করে’ অতি সাধারণ মানুষও মন্ত্রী হচ্ছে, মূর্খের ছেলে চেষ্টা করে’ হচ্ছে জননেতা, কৃষকের ছেলে চেষ্টা করে’ হচ্ছে স্বাধীন কোনো দেশের ভাগ্য-বিধাতা—এ-রকম উদাহরণ আপনারা আমার চেয়ে অনেক বেশী দিতে পারবেন। কিন্তু জানেন কি, সব ছেলেই তো ভালো হতে চায়; একাধিক ছেলে পড়াশুনা-ও করে, তার মধ্যে একজন কেন ফার্স্ট ক্লাস হল? প্রোফেসর বলবেন যে ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাস হল—তার চেয়ে বুদ্ধিমান ও মনোযোগী এবং ভালো লিখিয়ে ছিল সেকেও হয়েছে যে ছেলেটি, তবে বুদ্ধিতে যাকে সেকেও ভেবেছি সে কেন হল ফার্স্ট, আর ফার্স্ট বলে’ যাকে জানি—সে কেন সেকেও হল? অদৃষ্ট? বিস্তর চেষ্টা করেও একজন দেশ-সেবক নির্বাচিত হল না, আর একজন নির্বাচিতই শুধু হল না—মন্ত্রী হল, এ-ও কি অদৃষ্ট? মূর্খের ছেলে বা কৃষকের ছেলে জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হল, এ-ও তবে শুধু মাত্র চেষ্টার জোরে নয়? মূলে আছে অদৃষ্ট?

বলেছি, এ-অদৃষ্ট বাইরের কোনো ব্যাপার নয়। এ আমার, আপনার, এর-ওর-তার সকলের জীবন-বীজে আছে নিহিত। অসংখ্য জীবনচক্র জুড়ে অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা আছি। আমাদের একপারে অতীত লোক, আনুপারে ভবিষ্যৎ লোক। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ—এই তিন ইহলোক। ইহলোকই বিশ্বপ্রকৃতি। তখন থেকে মানবলোক পর্যন্ত আবার মানবলোক থেকে পিতৃলোক হয়ে দেবলোক অবধি—সবই ইহলোক, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি।

নিত্য-নিত্য পরিবর্তন এখানে। নিত্যগতি। গতি, তাই মৃত্যু। মৃত্যু, তাই নবজন্ম। নবজন্ম, তাই নবভরো আরো মৃত্যু। জন্মের শেষ নেই, মৃত্যুর শেষ নেই। প্রেতলোকে গিয়েও গতি। যদি ভোগে কামনা, তবে জীবলোকে গতি। যদি শুভজন্মে কামনা, তবে পিতৃলোকে গতি। সেখানে থেকে শুভতর জন্মমোহে ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রত্ব, দেবলোকে সহাস দেবত্ব। প্রেতলোকে গিয়ে পাখির প্রতিষ্ঠা, প্রেম ও ভোগ স্থখের বাসনায় কতবার কত জন্ম যে জীবদেহে আসব, তার কি সীমা পরিসীমা আছে? একদিন অবশ্য

বীর জওয়ানদের জন্যে
অস্ত্র যোজন জরুরী
কারখানার উৎপাদন
আর
কৃষিক্ষেত্রের ফলনও
তেমনি জরুরী

ভোগান্তে মুক্তি পাব মানবজন্ম থেকে। তখন স্কৃত-দুষ্কৃত সবই ত্যাগ করব। তখন পিতৃলোক থেকে আশীর্বাদ করব মানুষের সম্ভানদের। ইন্দ্রলোকে আমিই হ'ব ইন্দ্র। শুভশক্তি বিকিরণ করব বিশ্বভুবনে। দেবলোকে হব দেবতাত্মা। অপারূত আনন্দে ভোগ করব ব্রহ্মাস্বাদ। জীব-জন্মের এমনি সম্ভাবনা, এমনি মহিমা।

এ-ও কিন্তু প্রকৃতির লীলা। গতি আছে এর-ও। ব্রহ্মে ব্রহ্মা হওয়ার আগে পর্যন্ত আমি-লীলাময়ের আমরা লীলাসহচর। ব্রহ্মে যতকাল সিস্থক্ষা, ততকাল আমাদের গতাগতি। ব্রহ্মে লীন হলেই বোঝা সম্ভব এ-জগৎ, এ-জগলীলা আমারই, প্রকৃতি আমার-ই প্রকৃতি, অদৃষ্ট আমারই রচিত অদৃষ্ট। বর্তমানে ইচ্ছার বেগে আমি জন্মের পর জন্ম ঘুরছি। ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করে আমিই একদা জন্মজয়ে হব স্থির। তখন অর্জুনদের 'ব্রাহ্মী স্থিতি' উপদেশ করব। বলব:

এষা ব্রাহ্মী স্থিতি পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমূহতি
স্থিহ্যশ্চামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

রাণা বসু

গোরক্ষপুর। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। কিন্তু সম্মেলন বলে গোরক্ষপুরকে নতুন মাজে সাজাবার কোনো চেষ্টা নেই। গোরক্ষপুর যেমন ছিল তেমনি আছে। সম্মেলনের উত্তোক্তাদের অভিমত : আমরা বাইরের সজ্জা দেখাতে ইচ্ছুক নই। সারা দেশ থেকে আলোকশিখা সংগ্রহ করে যে আলো এখানে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, আপন প্রভায় তা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর নগরীর প্রতিটি গৃহকে উজ্জ্বল করবে।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। উত্তর প্রদেশেই এর জন্ম। কিন্তু আমেদাবাদ থেকে গোহাটি, মাদ্রাজ থেকে দিল্লি এরকম ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এর অধিবেশন বসেছে। সাহিত্যিক, কবি, চিত্রী, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সাহিত্যরসপিপাসু নর-নারী সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে একত্রিত হন। গত চল্লিশ বছর ধরে এই সম্মেলনের কর্মধারা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী স্ত্রী-পুরুষের ভেতর সাংস্কৃতিক ঐক্য ও মৈত্রী বৃদ্ধির পথে সহায়তা করেছে।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৬২ গোরক্ষপুরের গান্ধী কলেজের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টাঙ্গিশতম অধিবেশনের উদ্বোধন করে উত্তর প্রদেশের কারা ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ মহায় সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রতিরক্ষার প্রচেষ্টার প্রতি সারা দেশে যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকট হয়ে উঠেছে, তাকে সংহত করার আবেদন জানান। তিনি বলেন : যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে উদ্দীপ্ত করার পুরনো পদ্ধতি পর্যাপ্ত নয়। লেখকবৃন্দকে এই পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন উত্তমে ও নতুন পথে তা পরিচালনায় অগ্রণী হবার আহ্বান তিনি জানান। এরপর সম্মেলন ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। বহু গুণীজ্ঞানীর সমাবেশে ও কয়েকজন অবাঙালী সাহিত্যিক অহুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় এ বছরের সম্মেলন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সফল হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহুমানপ্রসাদ পোদারের স্বাগত ভাষণের পর সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ বলেন : সাহিত্যের প্রথম বাণী হচ্ছে স্বাধীনতা—শুধু চিন্তায় নয়, শুধু চেতনায় নয়, সামগ্রিক জীবনের।...বাংলা প্রথম কাব্যগাথা মানুষকে দিতে চেয়েছে মুক্তির স্বাদ। বাংলার আধুনিক নবজাগরণ স্বাধীনতার আকুল আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে নব দিগন্তের আবিষ্কার করেছে।

সম্মেলনের অষ্টাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের মূল সভাপতি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেছেন : সর্বাঙ্গিক যুদ্ধবিগ্রহের অপরিহার্য অঙ্গরূপে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে পরিবেশিত, অক্ষুণ্ণ মনোবল-বিধায়ক ও চরম আত্মোৎসর্গের প্রেরণাদায়ক কোন এক প্রকারের বলিষ্ঠ জীবননীতি প্রতিষ্ঠিত করার একান্ত প্রয়োজন। এই গুরুতর প্রয়োজনে সাহিত্য ও নীতিবোধের সঙ্গে জাতীয় জীবনের নতুন করে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেন যে, এই সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে যদি আমরা সাহিত্যের বৃহত্তর মানবিকতা ও জীবনকল্যাণবিধায়ক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হই, তা হলেই আমাদের সম্মেলন সত্যকার সার্থকতামণ্ডিত হবে।

বাঙলা সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক ডক্টর শশিতৃষণ দাশগুপ্ত মশায় তাঁর ভাষণে বলেন যে; এই বিষাদযোগের মুখে সাহিত্য আজ আমাদের দিককে ডাকিয়া কোন বাণী শুনাইতে পারে? সাহিত্য শুনাইতে পারে মানবতাবোধের অমৃত বাণী; কোনো বিপর্যয়ের মুখেই যদি আমাদের মানবতাবোধে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হই তবে বুঝিব, আমাদের সাহিত্য সাধনা আমাদের জীবনে সত্যমূল্য লাভ করিয়াছে। ডঃ দাশগুপ্ত আরও বলেন : সাহিত্য-তত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর লেখা প্রকাশিত হইতেছে—এবং এক্ষেত্রে আমাদের লেখা ক্রমেই একটা উচ্চমানে উন্নীত হইতেছে। কিন্তু আমাদের গল্প লেখা এখন পর্যন্ত সাহিত্যের একটি সংকীর্ণ পরিধি ত্যাগ করিয়া ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির বিপুলক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করিতেছে না। বিশ্বের সমৃদ্ধ সাহিত্যগুলির তুলনায় এক্ষেত্রে আমাদের দৈন্ত এখনও আমাদের ক্ষুদ্র পরিচয়ে আমাদের দিককে স্তান করে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং ভারতীয় ভাষা শাখার অধিবেশন হয়। ডাক্তার বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান শাখা, অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাস শাখা, ডক্টর শশিতৃষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য শাখা এবং ডক্টর প্রভাকর মাচোয়ে ভারতীয় ভাষা শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞান শাখা অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। আগ্রা কলেজের অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু চট্টোপাধ্যায় ভাষণ দেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় এবং উপাচার্য চট্টোপাধ্যায়ের স্বস্ত্র বিষয়ের ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ নেই। তাঁদের ভাষণ যে মনোগ্রাহী হয়েছিল তা স্বধীজন অনুমান করতে পারেন।

ভারতীয় ভাষা শাখার সভাপতি বিশিষ্ট মারাঠী লেখক ডঃ প্রভাকর মাচোয়ে তাঁর ভাষণে একটি অকপট সত্য কথা বলেন। তিনি বলেছেন, আমাদের সাহিত্যে এখন যুক্তিবাদের সূচনা হওয়া উচিত। তিনি আরো একটি সুন্দর কথা বলেন : সাহিত্যিকের ভাষা তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকেই উৎসারিত হওয়া উচিত। ভারতীয় ভাষা শাখার উদ্বোধন করেন হাবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্টার আইসেনবার্গ। ‘আজ ভারতীয় সাহিত্যে নতুন ভাব ও চিন্তাধারা, নতুন ভাষা ও আঙ্গিকের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তা একদিকে যেমন প্রশংসনীয় অতীতকে তেমনি আশাব্যঞ্জক। ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা রক্ষা করে সাহিত্যকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তোলা এবং পরস্পরের ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলো অনুবাদ করে তাকে বিশাল মানব সমাজে পরিব্যাপ্ত করে তোলার দায়িত্ব আপনাদের। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং জাতীয় ঐক্য এর দরুন আরো দৃঢ়তর হবে’—অধ্যাপক আইসেনবার্গ তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে উল্লিখিত মন্তব্য করেন।

সম্মেলনের তৃতীয় দিন প্রাতঃকালীন অধিবেশনে দর্শন শাখায় সভানেত্রীর ভাষণ দেন ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী। এই দিনই সকালে শিশু-সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। অধিবেশনের নির্ধারিত সভাপতি শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর অল্পপস্থিতিতে তাঁর প্রেরিত ভাষণ পাঠ করা হয়। সভায় শ্রীমত্যাঙ্কুর বরাট ও অত্যাঙ্কুর কয়েকজন বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নে উত্তর প্রদেশের সমষ্টি উন্নয়ন ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী সূচেন্দ্রা কুপালনী সংবাদ-সাহিত্য শাখার উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী কুপালনী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, বাঙালী সাংবাদিকদের কাজ চিরদিনই গৌরবোজ্বল। বাঙালী লেখকরা চান যে অত্যাঙ্কুর ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। এইজন্মেই তাঁরা থাটি ভারতবাসী। অত্যাঙ্কুর সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করা চলে যে সাহিত্য কর্ম, সেই তো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এইখানেই বাংলা সাহিত্যের সার্থকতা। বর্তমান সংকট প্রসঙ্গে শ্রীমতী কুপালনী বলেন যে, ভারত এক এবং অখণ্ড। ভারতের এই ঐক্য ক্ষুণ্ণ করা চলে না, বাংলাই ভারতকে তার দুটি জাতীয় সংগীত দিয়েছে। সংবাদ-সাহিত্য শাখার সভাপতি ডক্টর শচীন সেন সংবাদ-সাহিত্যের এক নতুন দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন। ভারতের বর্তমান সংকটে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে সংবাদ-সাহিত্যের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ডঃ সেন বলেন : সংবাদ-সাহিত্যিক গতিধর্মে বিশ্বাস করেন—সমস্তা সমাধানের শেষ কথা বলবার চেষ্টা

করেন না। অথচ সমস্তকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাও করেন না। সংবাদ যেমন গভীর, সমস্তাও তেমন গভীর। তাই চূড়ান্ত সমাধান বলে কোনো সমাধান নেই। কিন্তু যুগে যুগে সমাধানের অন্বেষণ চলতে থাকে। ডক্টর সেন তাঁর ভাষণের উপসংহারে বলেন : আমাদের সংবাদ-সাহিত্যে ব্যাখ্যা করা হোক চৈনিক আক্রমণে ভারতীয় সাধনা ও ঘোষণার রূপান্তর, কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন, পথে এগিয়ে যাবার উদ্দীপনা। সংবাদ-সাহিত্য শাখায় বক্তাদের ভেতর ছিলেন শ্রীশ্রীরেন্দ্রনাথ চন্দ এবং শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ।

এবারের সম্মেলনের চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনটি 'স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়। অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। তিনি তাঁর ভাষণে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে বাঙালী লেখকদের কাছে আবেদন জানান। এই অধিবেশনে স্বামী সাধনানন্দ, উত্তর প্রদেশের উপ-শিক্ষামন্ত্রী কেশভান রায়, ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৬২ রাত্রে ডঃ হরিবংশ রায় বক্তৃতা করে সভাপতিত্বে কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, দেবেশ দাস, হাসিরাশি দেবী, রাণা বসু প্রমুখ বাঙালী-কবি এবং প্রভাকর মাচোয়ে, আইসেনবার্গ ও অন্যান্য ভারতীয় ও বিদেশী কবিরা কবি-সম্মেলনে যোগদান করেন। ২৬ ডিসেম্বর রাত্রে কলকাতার অগ্রতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বৈতানিক' আলোচনা সহযোগে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সংগীত পরিবেশন করেন। ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর রাত্রে কলকাতার 'প্রাচ্যবাণী' সংস্কৃতি যথাক্রমে শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ নাটক মঞ্চস্থ করেন। সম্মেলন উপলক্ষে যে গ্রন্থ ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল তার উদ্বোধন করেন উত্তর প্রদেশের অগ্রতম মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ সহায়। সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীগোবিন্দগোপাল সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত "স্মরণী" গ্রন্থটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন গোরক্ষপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সে-বার মূল সভাপতি ছিলেন স্বর্গত অতুলপ্রসাদ সেন। তিরিশ বছর আগে সেন মশায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : ভারতের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে যে বাংলা সাহিত্য সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কি করে করবে? জগৎ যে সে-কথা স্বীকার করে বসে আছে। স্বর্গত সেনের এই বাণী স্মরণ করি ও সেই সঙ্গে বাঙালীর হাতে গড়া প্রাচীন সাহিত্য প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দীর্ঘজীবন কামনা করি ॥

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

“গত বিশেষ অক্টোবর চীন যেদিন আমাদের আক্রমণ করে সেই দিনই ভারতে নোতুন যুগের সূচনা হয়েছে এবং আজসত্ত্বটি থেকে আমাদের সচেতন করে তুলেছে। আজ নোতুন বছরের প্রথম দিন, কিন্তু আমাদের কাছে ‘নোতুন বছর’ শুরু হয়েছে প্রায় তিন মাস পূর্বে। আমি বলছি, চীন আক্রমণের কথা। চীনারা নেফা ও লদাখ সীমান্তে গোলাবর্ষণ করে আমাদের জাগ্রত করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা দূর হয় এবং সমগ্র জাতি দেশরক্ষায় মেতে ওঠে।”

গত এই জানুয়ারি লখনউর বেগম হজরত মহল পার্কে জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের পাঁচভাগের চারভাগই প্রতিরক্ষাখাতে খরচ করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ দুর্গম হিমালয়-সীমান্ত রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে। উক্ত জনসভায় শ্রীনেহরু বলেছেন, চীনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ পাঁচ বৎসর স্থায়ী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য আমাদের অর্থনীতি সমরায়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠবে। এবং দেশের যুবশক্তির একটা বৃহৎ অংশকে সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। আর প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্র থেকে দূরে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষেতে-খামারে-কারখানায়-বন্দরে-অপিসে সমরায়োজনকে যথাশক্তি সাহায্য করতে হবে। চীনের সামরিকবাহিনীতে নিয়মিত সৈনিকের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ, ভারতের সেখানে পাঁচ লক্ষ। চীনা-আক্রমণের পটভূমিতে অবিলম্বে এই সংখ্যাকে পনেরো লক্ষ পরিণত করতে হবে। অর্থনীতির বনিয়াদ দৃঢ় করতে হবে। খাদ্যশস্য ও কারখানার উৎপাদন ক্রমাগত বাড়তে হবে। সামরিক চাহিদা দেশেই মেটাতে হবে, সর্বোপরি মনোবল বাড়তে হবে। চীনা সাম্যবাদীর পক্ষে সকল চতুর প্রচারকার্য ব্যাহত করতে হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আজকের ভারতে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না তা যুদ্ধবিজয়ের সহায়ক হয়। এখানেই প্রশ্ন :

সাহিত্য, শিল্প, সংগীত কতটা যুদ্ধাভিমুখী হবে? রণোন্মাদনা জাগিয়ে তোলায় শিল্পীরা কতটা এগোবেন? শিল্পীর স্বাধীনতা কতটা খর্ব হবে? দেশমাতৃকার সেবায় শিল্প কতদূর এগিয়ে যাবে? লেখকদের কর্তব্য কী?

এইসব প্রশ্নের আলোচনা হয়েছে দুটি সভায়। ৩০শে নভেম্বর মহাবোধি সোসাইটিতে ও ৯ই ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে বাঙালী লেখকদের দুটি সভা হয়েছে। প্রবীণ নবীন প্রৌঢ় তরুণ সকল বয়সের লেখকরা যোগ দিয়েছিলেন।

প্রথম সভায় লেখকদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়—

“চীন আজ ভারতকে আক্রমণ করেছে। তার আঘাত নগ্ন ও সশস্ত্র। ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদী কমিউনিজমের দানবকে সে অধিষ্ঠান করাতে চায়। নিখিল এশিয়াকে গ্রাস করার মোহ তার। স্বদেশের গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার রক্ষা করাই ভারতীয়দের আদর্শ। আমরা ব্যক্তির স্বাধীনতা, সংস্কৃতির স্বাধীনতাকে মানবতার অমূল্য সম্পদ মনে করি। চীনের বর্বর আক্রমণে আমাদের আদর্শ ও বিশ্বাস আহত হয়েছে। চীন আমাদের গণতন্ত্রকে আঘাত করতে চায়, শাস্তি ও মৈত্রীর ধারণাকে উপহাস করতে চায়। আমরা মানুষের সর্বপ্রকার সংমূল্যবোধে বিশ্বাসী। মানবতা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কোনো প্রকার আঘাতই আমরা সহ্য করব না। এই সঙ্কটে আমরা নিজ দায়িত্ব পালন করব, মানুষের মনের শুভ বোধ ও চেতনাকে অধিকতর জাগ্রত করব।”

দ্বিতীয় সভায় ‘স্বদেশী সাহিত্য সমাজ’ গঠনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে বলা হয়েছে—

“আমরা স্বদেশপ্রেমে বিশ্বাস করি। মাতৃভূমির প্রতি প্রেমহীনতা অমানবোচিত ও অসত্য। মানুষ তার ঐতিহ্য থেকে এই প্রেম অর্জন করে এবং এই আবেগ তাকে অনেক শুভ কাজে প্রেরণা দেয়।”

এই ‘সমাজ’র আদর্শ ব্যক্ত করে প্রস্তাবে বলা হয়—“স্বাভাবিক মানবোচিত স্বদেশপ্রেম, স্বজাতির প্রতি মমতা, সংস্কৃতিরক্ষা। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতায়, বাক ও চিন্তার স্বাধীনতায়, বিশ্ববোধে, গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যে আমরা বিশ্বাসী।”

বাঙালী লেখকদের এই দুটি সভায় ঘোষিত সংকল্পের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

*

*

)*

ভারতীয় সাহিত্য-সমাজের নানা ক্ষেত্র থেকে মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়েছে। গত ২৫ ডিসেম্বর (১৯৬২) অন্তরাজ্যের গুন্টুরে অগ্রণী তেলুগু কবি

কাটুরি ভেক্টেশ্বর রাও পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮।

গত ২০ ডিসেম্বর গোঁহাটিতে আসামের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও অসমীয়া গল্পলেখক হোলিরাম ডেকা ৬২ বৎসর বয়সে মারা গেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পাস করেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ—‘অলকলই চিঠি’, ‘যংকিঞ্চিৎ’।

গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে তিনজন বাঙালী লেখককে আমরা হারিয়েছি।

“নবাস্কর” প্রভৃতি উপন্যাস-রচয়িত্রী সুলেখা সাত্তাল মধ্য বয়সে মারা গেলেন বর্ধমানে। “মোহিতলালের স্মরণরল—কবি ও কাব্য”-রচয়িতা কবি-অধ্যাপক তারাচরণ বসু, এম. এ., কাব্য-পুরাণ-দর্শন-শ্রায়তীর্থ মধ্যবয়সে মারা গেলেন খিদিরপুরে। আর পরিণত বয়সে মারা গেলেন কলকাতায় “গিরিশ নাট্যপ্রতিভা”-রচয়িতা কুমুদবন্ধু সেন।

এই তিনজন নিঃশব্দে বিদায় নিলেন। আমরা যেন না ভুলি, যেন বেদনা পাই তাঁদের অন্তর্দানে, এই হোক আজকের সংকল্প।

*

*

*

এবার পুরস্কারের সংবাদ—দেশে ও বিদেশে। ১৯৬২ সালের নানা সাহিত্য-পুরস্কার বৎসরের শেষভাগে ঘোষিত হয়েছে।

১৯৬২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন জনপ্রিয় মার্কিন উপন্যাসিক জন স্টাইনবেক, এ সংবাদ তিন মাস আগেই জানা গিয়েছে।

ফ্রান্সের রাজধানী ও বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী পারী নগরীতে নভেম্বর মাসে বহু পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। ফ্রান্সের জনপ্রিয়তম সাহিত্য-পুরস্কার হল ‘প্রিঁ গঁফুর’। ১৯৬২ সালে গঁফুর-পুরস্কার পেয়েছেন মহিলা-সাহিত্যিক শ্রীমতী আন্না লাংফুস্। দ্বিতীয় সাহিত্য পুরস্কার—রনোঅ পুরস্কার পেয়েছেন আরেক মহিলা-সাহিত্যিক—শ্রীমতী সিমঁ জাকুয়ার। ফ্রান্সের সাহিত্য-ইতিহাসে এ অভিনব ঘটনা।

গঁফুর পুরস্কার-বিজয়িনী শ্রীমতী লাংফুস্ (৪২) জাতে পোলিশ, ১৯২০-তে পোলাণ্ডে জন্ম। যুদ্ধের পর উদ্ধাস্ত হয়ে ফ্রান্সে আসেন। ফরাসী ভাষা শিখলেন এবং শেষপর্যন্ত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেলেন। পুরস্কৃত উপন্যাসটির নাম—‘লে বাগাজ ছ সারল’ (বালির বস্তা)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পটভূমিতে মারিয়া নান্নী এক পোল যুবতীর কাহিনী এর বিষয়বস্তু।

রনোদা-পুরস্কার বিজয়িনী শ্রীমতী জাকুয়ার (৩৮) লিখিত পুরস্কৃত উপন্যাসের

নাম “ল্য ভেইয়র ছ হুই” (রাতের গ্রহরী)। গঁফুর-পুরস্কারের কাঞ্চন-মূল্য মাত্র পাঁচ শ’ টাকা। কিন্তু পুরস্কার-বিজয়ী তাঁর বই থেকে লাভ করবেন প্রায় দেড় লাখ টাকা, তারপর ছায়াচিত্ররূপায়ণ ও নানা ভাষায় অনুবাদে পাবেন আরো লাখখানেক টাকা।

ফরাসী আকাডেমি প্রবর্তিত উপন্যাসের উপর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন মঁসিয় মিশেল মরুকে তাঁর ‘লা ব্রিজ’ ম্যারিটিম’ উপন্যাসের জন্য। পুরস্কারের মূল্য দশ হাজার টাকা।

গ্রাশনাল পুরস্কার (এটিও সরকারী পুরস্কার) পেয়েছেন মঁসি পিয়ের জঁ জুভ্। ইনি ঔপন্যাসিক-কবি-প্রবন্ধকার। তাঁর সর্বশেষ রচনা ‘ল্য তম্ব ছ বদলেঅর’ (বদলেঅর-এর কবর)।

সেইন জেলার (পারী যার অন্তর্গত) আধা সরকারী পুরস্কার পেয়েছেন মঁ আডম্ লালু। পুরস্কারের মূল্য চার হাজার টাকা। মেইন-এ-ওরাজ জেলার সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন জঁ জর্জ মঁগ্রদিয়ান। পুরস্কারের মূল্য চার হাজার টাকার।

সমালোচনা-সাহিত্য-রচনায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী স্জজান্-জঁ-বেরার। বালজাক্ সম্বন্ধে সমালোচনা লিখে তিনি এই পুরস্কার পান। বইটির নাম—‘ল্য জনেস্ দাঁ রোম্’ ছ বালজাক্।

চিকিৎসক-লেখকদের জন্য আলাদা পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এর মূল্য তিন হাজার টাকা। ডাক্তার শাভিরেক এটি পেয়েছেন তাঁর ‘লে পাশ’, (পথযাত্রী) উপন্যাসের জন্য।

প্যারীর সাংবাদিক সংঘ দিয়েছেন দশ হাজার টাকার ‘প্রিদেকুড্যার’ বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য।

শিশুসাহিত্যের জন্য এক হাজার টাকার দুটি পুরস্কার পেয়েছেন লাইলেন টেরি ও মাদাম ইভন্ মেইলিয়ের। ব্যঙ্গসাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন মরিস ললং ও গ্যাব্রিয়েলা মার্ক্।

* * * *

এবার দেশী পুরস্কারের সংবাদ। ১৯৬২ সালের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত এক হাজার টাকার নরসিংহদাস পুরস্কার পেয়েছেন ‘ইন্দ্রমিত্র’ (অরবিন্দ গুহ) ‘সাজঘর’-এর জন্য। এটি বঙ্গীয় নাট্যশালার সম্পূর্ণ ইতিহাস। কবিতার জন্য অপর পুরস্কারটি পেয়েছেন শ্রীহরিহরপ্রসাদ সাহা ‘তুলসীদাসী রামায়ণ’ বাংলা কাব্যানুবাদের জন্য।

১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ২২টি শিশুসাহিত্য গ্রন্থকে পুরস্কৃত করেছেন। এর তিনখানি বাংলা বই। পুরস্কৃত বাংলা শিশুসাহিত্যে গ্রন্থের নাম ‘সুন্দরবন’ (শিবশংকর মিত্র), ‘খেলাঘরের রাজ্যে’ (নির্মলেন্দু গৌতম), ‘বয়নকারের জীবনকথা’ (দীনেশ চট্টোপাধ্যায়)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত ১৯৬২ সালের নানা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। লীলা পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী পুষ্প দেবী। ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক পেয়েছেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী। ১৯৬০, ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালের সরোজিনী বসু পদক পেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

সমস্ত প্রকাশিত হল

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের অপূর্ব উপন্যাস

জাহাজ পাঁচ টাকা

বেঙ্গলের অনুপম কিশোর সাহিত্য

বাণভট্টের	তেজেশচন্দ্র সেনের
লালুভুগু (৩য় মুঃ)	৩'০০ ॥ হারানো ছেলে ১'২৫ ॥
বিক্রমাদিত্যের	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
খুলী দরওয়াজা (২য় মুঃ)	১'৭৫ ॥ প্রাণী ও প্রকৃতি ১'৫০ ॥
চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর (জরাসন্ধ)	নমিতা বসুর
রং চং	১'০০ ॥ পিকনিক ২'০০ ॥
দেবদাস দাশগুপ্তের	
পরাতুস্ত প্রকৃতি (ভারত সরকার পুরস্কৃত)	১'০০ ॥ প্রাণের কথা ১'০০ ॥
ননীশোপাল গোস্বামীর	
জীবে প্রেম করে যেই জন	১'২৫ ॥ আমাদের উৎসব ১'০০ ॥
আশা দেবীর	অমরেন্দ্র সেনের
যুগ্মতি নদীর তেউ (৪র্থ মুঃ)	১'০০ ॥ ডাকটিকিট ১'২৫ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

সাহিত্যের খবর

বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ৫ ॥ বিবেকানন্দ সংখ্যা ॥ মাঘ ১৩৬৯

Kali The Mother	স্বামী বিবেকানন্দ	১
রামকৃষ্ণ সংঘ-গঠনের পটভূমিকায় বিবেকানন্দ স্বামী তেজসানন্দ		৩
বিবেকানন্দের সাধনা	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	১৫
বিবেকানন্দের ধর্মমত	ভবানীগোপাল সান্যাল	২৪
বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারত	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
বিবেকানন্দের জাতীয়তা	স্বধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২
বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা	নির্মল বসু	৪৮
বিবেকানন্দ ও সংস্কৃতচর্চা	ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী	৬১
বিবেকানন্দের সাহিত্যসাধনা	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৭৩
উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনা : বিবেকানন্দ	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	৮৩
দেশে-বিদেশে	চারু দত্ত	৯৪
বিবেকানন্দের মৌল শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতি	স্বধীরকুমার নন্দী	১০০
বিবেকানন্দ ও মনের স্বারাজ্য	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	১০৭
বিবেকানন্দের কর্ণ-পরিণত বেদান্ত	পরেশনাথ ভট্টাচার্য	১১৩
বিবেকানন্দের সাধনা ও সিদ্ধি	হরপ্রসাদ মিত্র	১২০
নতুন বই		১২৭

নিয়মাবলী

সাহিত্যের খবর-এর বর্ষায়ত্ত আশ্বিন হইতে। তবে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক চাঁদা সভাক বার্ষিক ৬.০০ ন. প. ষাণ্মাসিক ৩.০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড— বঙ্কিম চ্যাটার্জে স্ট্রীট কলিকাতা—১২।

সম্পাদক—মন্মোহন বসু

শতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

১১, ভীম ঘোষ লেন, নবীন সরস্বতী প্রেস, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের
একত্র সমন্বয়ে প্ৰস্তুত

নিবে কালি শুকায় না ;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায় ।

রাঙের যথেষ্ট গভীরতা ; তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে ।

লেখা ধুয়ে - মুছে যায় না ;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে ।

সুলেখা কালি

অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে ।



সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বম্বে • মাদ্রাজ

সাহিত্যের খবর
বিবেকানন্দ সংখ্যা
বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ৫ ॥
মাস, ১৩৬৯

KALI THE MOTHER : SWAMI VIVEKANANDA

The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant
In the roaring whirling wind
Are the souls of a million lunatics,—
Just loose from prison-house,—
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path,
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves
To reach the pitchy sky—
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of Death begrimmed and black—
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy ;
Come, Mother, come !
For Terror is Thy name !
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er,
Thou Time, the all-Destroyer !
Come, O Mother, come !
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.



মৃত্যুরূপা মাতা : স্বামী বিবেকানন্দ

নিঃশেষে নিবিছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত; ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে বৃষ্টি-বায়ুবেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়িয়ে চলে পথে !
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে চেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্থল পরশিতে চায় ! যোররূপা হাসিছে দামিনী
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমা মাখা গায় ।
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে, মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃখাসে প্রথাসে
তোর ভীম চরণ-নিষ্ক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে ।
কালি, তুই প্রলয়-রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে ।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্ত্য চায়, মৃত্যুকে যে বাঁধে বাহুপাশে -
কাল-মৃত্যু করে উপভোগ, মাতুরূপা তারি কাছে আসে ।

[অনুবাদ : মতৌল্লনাথ দত্ত]

রামকৃষ্ণ-সংঘ গঠনের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী তেজসানন্দ

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বস্তুতাত্ত্বিক পাশ্চাত্যের বিপ্লবী চিন্তা ভারতের মর্মদুয়ারে এক প্রচণ্ড আঘাত করিয়া ভারত-ভারতীকে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। জাতির সেই সংকট মুহূর্তে পরাধীন ভারতের নিপীড়িত প্রাণ-শক্তি বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভারতকে পুনঃ আত্মস্থ ও স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে ভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণ আজ গৌরবের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। সেই সন্ধিক্ষণে প্রাচ্য চিন্তা-কৃষ্টি-প্রাঙ্গণে প্রতীচ্য সভ্যতার অল্পপ্রবেশের প্রতিক্রিয়ারূপে একে একে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও খ্রিওসফি সোসাইটি প্রভৃতি ধর্মীয় আন্দোলনসমূহ স্ব স্ব মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যরক্ষাকল্পে বিপুল প্রয়াস পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণতন্ত্রী যে উদাত্ত গম্ভীর স্বরে সাড়া দিয়া উঠিবে, সমগ্র জাতির বৈচিত্র্যবহুল ভাবরাশি যে অন্ত্যাদার আদর্শে উদ্দীপিত হইয়া জাতিকে নবযুগের জয়যাত্রার পথে প্রধাবিত করিবে—সেই সকল আন্দোলনে তাহার একান্ত অভাববশতঃ আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহা প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনে সম্যকভাবে কার্যকরী হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেই যুগসন্ধিক্ষণে এমন একটি সার্বভৌম আদর্শের প্রয়োজন হইয়াছিল যাহাতে শাস্তসমাহিত অধ্যাত্মজ্ঞানগম্ভীর প্রাচ্যের সঙ্গে কর্মচঞ্চল বস্তুতাত্ত্বিক প্রতীচ্যের সুমন্বয় সাধিত হইতে পারে। তাই দেখিতে পাই—সেই সংস্কার-ভুত্বানে আলোড়িত ও মথিত ভারত-সংস্কৃতির জঠর হইতে নূতন সাধনা লইয়া আবির্ভূত হইলেন প্রাচ্য-কৃষ্টির মূর্তিবিগ্রহ প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ; অপরদিকে অবতীর্ণ হইলেন পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানে গরীয়ান্ দৃষ্ট সিংহ-প্রাণী স্বামী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক শুভক্ষণে ভারতের এই দুইটি উজ্জ্বল প্রতিভা দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন—যেন প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের এক অভিনব ঐতিহাসিক সন্মেলন ঘটিল। এই যুগ-জীবনের মাধ্যমে ভারতের

অন্তর্নিহিত শক্তি শতধারে উৎসারিত হইয়া আত্মবিশ্বত নরনারীর প্রাণে যে প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস, নবীন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অকুরন্ত পাথেয় যোগাইয়াছিল এবং তাহাই লুপ্তপ্রায় ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প, সমাজনীতি ও জাতীয়তাবোধকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই সমন্বিত ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করিয়া সেই যুগে ভারতে যে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই কালক্রমে রামকৃষ্ণ-সংঘ নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে।

এই সংগঠনের স্বদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই— শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মহাপ্রস্থানের কিছুকাল পূর্বে হইতেই দক্ষিণেশ্বর, শ্রামপুকুর ও কান্দিপুর উদ্যানবাটীতে নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ কয়েকজন নির্মল চরিত্র ভক্তিমান তেজস্বী যুবককে ভারতের সর্বোচ্চ সনাতন আদর্শ ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করিয়া নানাভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ভোগবাদমুখর বর্তমান যুগে এমন একটি সন্ন্যাসি-সংঘের প্রয়োজন যাহা “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ”—এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। বলা বাহুল্য কান্দিপুর উদ্যানে সকলকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রথম সূত্রপাত করিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিলে সন্ন্যাসি-সংঘ সম্যকভাবে গড়িয়া তুলিবার গুরুদায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপরই অর্পিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের অত্যন্তকাল মধ্যে বরাহনগরে এক জীর্ণ ভাড়াটিয়া গৃহে উক্ত বৎসরই অনাড়ম্বরভাবে রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রথম মঠ স্থাপিত হইল এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অপরিমিত ধৈর্য, উৎসাহ, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রবল আকর্ষণী শক্তিদ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের কোমারবৈরাগ্যবান শিষ্যবৃন্দের প্রায় সকলকেই এই নবপ্রতিষ্ঠিত মঠে সংঘজীবন-যাপনোদ্দেশ্যে একত্র করিলেন। অতঃপর বরাহনগর মঠেই কোনো এক সময় ত্যাগী যুবকগণ আত্মসাৎভাবে আচার্য-শংকর-প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়োচিত নাম ও গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বৈরাগ্য, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, পূজা, ধ্যান, জপ ও স্বাধ্যায়াদির সহায়ে সকলে স্ব স্ব আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হইলেন। স্বামীজী পরবর্তীকালে বরাহনগর মঠের কৃচ্ছ্রসাধন উল্লেখ করিয়া জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, “বরাহনগর-মঠে এমনদিন গেছে যখন খাবার সংস্থান কিছুই

ছিল না। কোনদিন যদি বা চাল জুটত ত' হুন জুটত না। অনেকদিন ঐভাবেই কেটেছে কিন্তু এর জন্ত কেউ ভাবত না। মাসেব পর মাস আমরা তেলাকুচার পাতা সিদ্ধ হুন মিশিয়ে ভাত খেয়েছি। যাই কিছু হোক না কেন আমরা নির্বিকার। দিবারাত্র ধ্যানভজনের একটানা শ্রোতে আমরা যেন ভেসে চলতুম। সে কী দিনই গেছে! মানুষ ত দূরের কথা—এই কঠোরতা দেখলে ভূতও পালাত।”

.....পরম জননী মাতৃভূমিই
তোমাদের একমাত্র উপাস্ত্র দেবতা
হউন—অন্তান্ত্র দেবতাকে কয়েক
বর্ষ ভুলিলে ক্ষতি নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

এই বরাহনগর-মঠে তাঁহারা যতই কঠোর সাধনায় ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন, ততই নির্জন গিরিগুহার ও গভীর অরণ্যপ্রদেশে তপস্শ্রা করিবার সুভীষ আকাজ্জনা অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ বা তুষারকিরীট হিমালয়ের পাদদেশে, কেহ বা গহনারণ্যে স্ব স্ব অভিরুচি অনুযায়ী আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্ত মঠের সীমিত গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও মঠ হইতে বিদায় লইয়া পথে বারাণসী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, আগ্রা, লুক্কো প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিয়া ধ্যানগভীর হিমালয়ের পাদমূলে কঠোরতম তপস্শ্রায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু এই অত্যধিক কৃচ্ছ্রতার ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কিছুদিন পর পুনরায় তাঁহাকে বরাহনগরে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। দ্বিতীয়বার ১৮৮৯ সালে বহির্গত হইয়া তিনি গাজীপুরে প্রথ্যাত সাধু পণ্ডহারী বাবান্ন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেন। কঠোর যোগাভ্যাস ও নিরভিমানতার জন্ত তিনি স্বামীজীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এবারও তিনি অত্যল্পকালের মধ্যেই মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু তুহিনশীর্ষ হিমালয়ের নিরন্তর হাতছানি তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। শ্রীগুরু মহান ব্রত সাধনার উপযুক্ত প্রস্তুতির জন্ত নিরবচ্ছিন্ন তপস্শ্রায় মধ্যে নিজেকে ডুবাওয়া দিবার উদ্দেশ্যে ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে পুনরায় হিমালয়ের পথে যাত্রা করিলেন। ৬/বারাণসী ধামে ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রমোদাদাস মিত্রের বাড়ীতে অবস্থান-কালে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

“আমি এমন আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে যাচ্ছি যার সাহায্যে একদিন এই সমাজের বন্ধের উপর বোমার মত ফেটে পড়ব এবং সমাজ প্রভুত কুকুরের মত আমার অলুগামী হবে।” তাঁহার এই পরিব্রাজক-জীবন নানা শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া কপর্দকশূন্য স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে কখনও রাজা মহারাজাগণের রাজপ্রাসাদে অতিথি হইয়াছেন, কখনও নীচ, অন্ত্যজ, পারিয়া এবং হরিজনদের জীর্ণ পর্ণকুঠারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের দুঃখ-বেদনা, হাহাকার, কাতর আর্তনাদকে নিজের বিশালবক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন। শত গ্রন্থাগারের পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াও যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয় না, তিনি সকলের সঙ্গে সমভাবে মিলিত হইয়া ভারতের মর্মবাণী ও অখণ্ডতা, অন্তরের আকৃতি ও বেদনা, অভাব-অভিযোগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলেন এবং পরপদদলিত মৃতকল্প নিঃসহায় ভারতবাসীর মুক্তিযন্ত্রের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার মানসপটে সেই চিরন্তন ভারতের এক ভাস্বররূপ মহা প্রতিভাত হইল—সেই বৈদিকযুগের ঋষি মুনিসেবিত, জ্ঞানগরিমায় সমুজ্জ্বল ভারতভূমি, তাহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অগণিত দেবদেবী ও রোমাঞ্চকর বীরত্বকাহিনী। তিনি দেখিলেন— আর্থ, মোগল, জাবিড় সকলেই এক অচ্ছেদ্য সুবর্ণস্থত্রে গ্রথিত এবং অলুভব করিলেন ভারত ও এশিয়াখণ্ডের আধ্যাত্মিক অখণ্ডত্ব ও একপ্রাণতা।

এই প্রযুক্তাকালে নব্যভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ একে একে বীর-প্রসবিনী রাজপুতনার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান এবং গুজরাট, বোম্বাই, মহীশূর, মালাবার, মাদ্রাস প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করিয়া অবশেষে দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তরথণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’ দেশমাতৃকার চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার নির্মলচিত্তদর্পণে মাতৃভূমির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগপৎ ভাসিয়া উঠিল। তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন বর্তমান ভারতের নগ্ন কংকালমূর্তি—একদিকে মোহমদিরমত্ত গর্বাঙ্ক বণিকগণের নিষ্ঠুর নিপেষণ ও শোষণনীতি; অপরদিকে জীর্ণবসন, নিরাশা-মথিত কোটি কোটি নরনারীর কাতর আর্তনাদ। ধর্ম কেবল প্রাণহীন আচার-নিয়ম ও কুসংস্কারে পর্যবসিত। নৈতিক বল নাই। বিশ্বাস নাই, উচ্চাশা নাই। অগণিত ভারতবাসী কুসংস্কারে, অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত। ফলে, আশা-উত্তম ও আনন্দের কংকালস্বরূপ বর্তমান ভারতের মহাশ্মশানে বসিয়া ভারতবাসিগণ প্রতিক্ষণ

মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। সমাধিসিদ্ধ সম্যাসী বিবেকানন্দের বজ্রকঠোর বিশাল হৃদয় করুণায় দ্রব হইল, নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইল, গভীর হইতে গভীরতর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সহসা নৈরাশ্রের ঘনাক্ষারের পারে আশার দিব্যজ্যোতি তিনি নিরীক্ষণ করিলেন। বোধি-ক্রমতলে যোগাসনে সম্যাসীন করুণাঘন শাক্যকুমারের ত্রায় বিবেকানন্দ অথও মানবের কল্যাণকল্পে শ্রীগুরুর অমোঘ-আশিস স্মরণ করিলেন। অল্পভব করিলেন, মহানগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ এবং প্রত্যক্ষ করিলেন অদ্বৈত-বেদান্তের ভেরীনিমাদে সুষুপ্তভারতের পূর্ণজাগরণ। প্রশান্তবক্ষে নূতন তরঙ্গ উঠিল। সংসার-বিরাগী সমাধিধান যোগী অস্ত্র অত্যাচার-পীড়িত উপেক্ষিত লক্ষ কোটি দেবঋষির বংশধরগণের কল্যাণকল্পে সত্যের তরবারি হস্তে সমরাস্রমে অবতীর্ণ হইলেন। তুরীয় নির্বিকল্পসমাধি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিবেকানন্দ জন্মভূমি ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নবযুগপ্রবর্তনকল্পে বিবেকানন্দ বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নিরন্ন ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ পাশ্চাত্য দেশে গমন করিবার অভিনব সংকল্প গ্রহণ করিলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পোরবন্দর ও জুনাগড় পরিভ্রমণকালেই স্বামীজী গুনিতে পাইয়াছিলেন যে আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি ধর্মমহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। স্বামীজী অন্তরে অল্পভব করিলেন তদীয় গুরুদেবের মহতী ইচ্ছা পূরণের জন্তই এই রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইতেছে। তিনি খাণ্ডোয়ার প্রখ্যাত উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিথিরূপে অবস্থানকালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “কেহ আমাকে সমুদ্রযাত্রার জন্ত অর্থ-সাহায্য করিলে, আমি পাশ্চাত্য দেশে গমন করিব।” অতঃপর মহীশূরের রাজসভায় মহারাজের নিকট বেদান্ত প্রচারের জন্ত পাশ্চাত্য গমনের সংকল্প প্রকাশ করিলে মহারাজও ঐ প্রস্তাবকে উদ্দীপনার সহিত স্বাগত জানাইয়া-ছিলেন এবং তাঁহার যাত্রার প্রয়োজনীয় সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কলিকাতার শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানাবস্থায় যখন তাঁহার ইচ্ছা পবিত্র সংকল্প রূপে পরিণত হইল, তখন তিনি মাদ্রাজে আসিয়া কতিপয় উচ্চশিক্ষিত অমরাগী যুবকদের নিকট এই বিষয়ের প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করিলেন। তাহারা স্বামীজীর উদারত্ব, ত্যাগ, গভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া প্রবল উৎসাহের সহিত এই মহৎ সংকল্পের সাহায্যের জন্ত অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিল। স্বামীজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করিয়া ও মহাশক্তিরূপিনী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশিস শিরে ধারণ করিয়া ১৮৯৩

সালের ৩১শে মে বোম্বাই হইতে ‘পেনিনসুলা’ জাহাজে প্রতীচ্য জগতের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এই যাত্রাপথে স্বামীজী একে একে কলম্বো, ক্যান্টন, নাগাসিকি, ইয়োকোহামা, ওসাকা প্রভৃতি নগরী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ইয়োকোহামা হইতে জাহাজ ভাংকুবার বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখান হইতে ট্রেনযোগে তিনি কানাভার মধ্যদিয়া শিকাগো শহরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সময় শিকাগো শহরে একটি আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছিল। স্বামীজী গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া সাময়িকভাবে এক হোটেলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরবর্তী দিবস সেই আন্তর্জাতিক মেলাতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ এবং শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন নানা দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

কিন্তু যখন শুনিলেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে না এবং আনুষ্ঠানিক অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে এই সম্মেলনে যোগদান করা সম্ভব হইবে না, তখন স্বামীজীর সমস্ত আনন্দ মুহূর্তে স্তিমিত হইয়া গেল। তিনি আরও শুনিলেন যে, প্রতিনিধিগণের নাম লিপিবদ্ধ করিবার শেষ তারিখটিও অতিবাহিত। এদিকে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। ব্যয়নির্বাহের দিক হইতে বোস্টন অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া স্বামীজী নিরুপায় হইয়া শিকাগো ত্যাগ করিয়া বোস্টনে চলিয়া গেলেন। সেখানে এক ধনাঢ্য মহিলার সহায়তায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক জে. এচ. রাইট মহোদয়ের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। অধ্যাপক রাইট স্বামীজীর গভীর পাণ্ডিত্য ও অসামান্য প্রতিভাদর্শনে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া ধর্মমহাসম্মেলনে যাহাতে স্বামীজী যোগদান করিতে সমর্থ হন, তজ্জগৎ প্রতিনিধি-নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যানকে একখানি পরিচয়পত্র লিখিয়া স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি লিখিলেন, “দেখিলাম এই অজ্ঞাতনামা হিন্দুসন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতগুলিকে একত্র করিলে যাহা হয় তাহা অপেক্ষাও অধিক পণ্ডিত।” এই পত্রসহ স্বামীজী পুনরায় শিকাগো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বিরাট শিকাগো শহরে মহাসভার অফিস তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ না হইয়া এবং কোন স্থানে আশ্রয় নী পাইয়া দুঃসহ শীত ও প্রচণ্ড তুষারপাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত অগত্যা তিনি সে রাত্রিতে রেলওয়ে ওয়াগনের সম্মুখে পতিত একটি প্যাকিং-বাক্সের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অসীম উৎকণ্ঠায় রজনী যাপন করিয়া প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় কাতর স্বামীজী দ্বারে

দ্বারে খাণ্ডভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহ ভৎসনা করিল, কেহ উপেক্ষা-মিশ্রিত ঘৃণায় দ্বার রুদ্ধ করিল। অবসন্ন দেহে রাজপথিপার্শ্বে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সহসা সম্মুখস্থ স্ববৃহৎ এক প্রাসাদোপম গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং এক অপূর্ব স্তন্দরী রমণী আসিয়া অতি মধুর কণ্ঠে স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন,—“মহাশয়, আপনি কি ধর্মসভার একজন প্রতিনিধি?” স্বামীজী সংক্ষেপে স্বীয় অবস্থার কথা ব্যক্ত করিলে এই দয়াদ্রু মহিলা স্বামীজীকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক সর্বপ্রযত্নে তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিলেন এবং অচিরে এই মহিলার স্বামী মিঃ ডব্লিউ হিলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে ধর্মমহাসভায় পরিগৃহীত হইলেন এবং প্রতিনিধিবর্গের জ্ঞান নির্দিষ্ট বাটীতে অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন।

১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা ১০টা হইতে শিকাগোর বিখ্যাত কলম্বাস হলে ধর্মমহাসভা আরম্ভ হইল। জগতের ইতিহাসে ইহা একটি অবিস্মরণীয় দিন। প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ একত্র সম্মিলিত। এই বিরাট সভায় সহস্র সহস্র উন্মুক্ত নরনারীর সম্মুখে নবযুগের বার্তাবহ ভাস্করমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন শাস্তির বাণী উচ্চারণ করিবার জ্ঞা আজ দণ্ডায়মান। অগ্নি যেমন বস্ত্রাবৃত থাকে না, সেইরূপ জ্যোতির্ময়ললাট গৈরিক-উষ্ণীষমণ্ডিত বিবেকানন্দের সৌম্যমধুর মূর্তি মূহূর্তমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। গুরুবলে বলীয়ান এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে গরীয়ান বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের উদারগন্তীর তত্ত্ব বিশ্বসভায় দিনের পর দিন বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিলেন। হিন্দুধর্ম-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, পৃথিবীর এই প্রাচীনতম ধর্মের অঙ্গনে বেদান্তদর্শনের সূক্ষ্মতম অহুভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈচিত্র্যময় পুরাণকাহিনীসহ মূর্তিপূজার পদ্ধতি পর্যন্ত সমস্ত কিছুই বর্তমান। একত্বের অহুসন্ধানই বিজ্ঞানের ধর্ম। যেদিন সেই একত্বের সন্ধান मिलিবে, সেদিন বিজ্ঞানের অভিযান শেষ হইবে। তেমনি সত্য-পরিবর্তনশীল এই নব্বয় বিশ্বমাঝে যে দিন ঋষতারাসদৃশ আত্মস্বরূপে বিद्यমান মহিমময় সেই দিব্যপুরুষকে আবিষ্কার করিতে পারিবে, সেইদিন ধর্ম হইবে সম্পূর্ণ। হিন্দুগণ ভ্রান্তি হইতে সত্যে উপনীত হয় না, তাহাদের যাত্রা নিম্নতম হইতে উচ্চতর সত্যে; নিম্নতম মূর্তিপূজা হইতে শ্রেষ্ঠতম অদৈতবাদ পর্যন্ত সমস্ত কিছুই তাঁহার নিকট অনন্তকে উপলব্ধি করিবার এক-একটি পর্যায় মাত্র। প্রতিটি জীবাত্মা তাহার পূর্বকর্মফল, পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার-অহুযায়ী যথানির্দিষ্ট পথে এক-একটি স্তর অতিক্রম করিয়া

ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যের পথে তাহার চরমতম যে জীবন-শ্রেয়স্ তাহার অনুধ্যান করিয়া চলিয়াছে এবং এই পথেই সে একদিন অবশেষে সেই সত্যের মহিমায় সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইবে। হিন্দুর নিকট বিভিন্ন জীবাত্মার কর্মফল-অনুযায়ী সেই সত্যের অভিমুখে এক অভিনব যাত্রা। গীতায় শ্রীশ্রীভগবান বলিয়াছেন, ‘সূত্রে মণিগনা ইব’—অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের মধ্যেই আমি সেই অল্পসূত সূত্র, যাহা সমস্তকিছুকেই বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। যদি পৃথিবীতে কোন ধর্মকে সার্বভৌম ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাকে দেশকালের ঊর্ধ্বে, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া সমস্ত মানবের পবিত্রতম, এবং শ্রেষ্ঠতম ভাবসমূহের বিকাশোপযোগী যোগ্যতা অবশ্যই অর্জন করিতে হইবে।

খৃষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; হিন্দু বা বৌদ্ধগণকে খৃষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অল্প ধর্মের সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক নিজের প্রকৃতি-অনুসারে পরিবর্তিত হইবে। যদি এই সর্বধর্মসম্মেলন জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তবে তাহা এই : পবিত্রতা, চিন্তাশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কল্পনা করে যে, অত্যাশ্রয় ধর্মের বিনাশ হইয়া কেবলমাত্র তাহার ধর্মই জীবিত থাকিবে, তবে সে বাস্তবিকই রূপার পাত্র। তাহার জন্ম আমি বড়ই হুঃখিত; আমি তাহাকে স্পষ্টাঙ্করে বলিতেছি যে, তাহার শ্রায় লোকেরা বাধা দিলেও অদূর ভবিষ্যতে প্রতি ধর্মের পতাকায় এই মহাবাক্যগুলি লিখিত থাকিবে—“দ্বন্দ্ব নহে, সহযোগিতা; ধ্বংস নহে সহকারিতা। বিভেদ ও কলহ নহে—শান্তি ও সমন্বয়।”

ধর্মমহাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে বেদান্তধর্মের অত্যাশ্রয় আদর্শ পরিবেশন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আজ শুধু বিশ্ববরেণ্য হইলেন তাহা নহে, ভারতের ধর্ম ও কুণ্ডিকে তিনি গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভারতের মুখোজ্জ্বল করিলেন। সমুদয় পাশ্চাত্য খৃষ্টাধর্মাবলম্বী সভ্যজাতি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে, এই মহাসভায় খৃষ্টধর্মেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে। কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, কপর্দকশূন্য ভিক্ষাজীবী এক হিন্দুযুবক-সন্ন্যাসী পরাধীন ভারতের উপেক্ষিত সনাতন হিন্দুধর্মকে পুরোভাগে এইভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে। স্বামীজী মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন ভারতের প্রাণপুরুষ তদীয় আচার্য-শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ

আশীর্বাদ স্বদূর পাশ্চাত্যের ধর্মমহাসভায় তাঁহাকে বিজয়মালায় ভূষিত করিয়াছে। তিনি কৃতজ্ঞতাভরা অন্তরে দেশবাসীকে জানাইলেন এই অসামান্য সাফল্য ভারতকুণ্ডিরই সাফল্য এবং এই বিপুল গৌরব ও সম্মান তাঁহার স্বদেশবাসিগণেরই প্রাপ্য, তাঁহার নিজের নহে।

ধর্মমহাসম্মেলনের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া স্বামীজী সমগ্র মানবজাতির প্রতি যে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দান করিলেন তাহার ফল হইল স্বদূরপ্রসারী। অখ্যাত এই ভারতীয় সন্ন্যাসী একদিনেই জগদ্বিখ্যাত হইয়া ভাবীযুগের আচার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ সমগ্র আমেরিকা প্রকম্পিত করিয়া ভারতে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহা পত্র-পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিভিন্ন স্থানে, শহরে জনসভাসমূহ অহুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ভারতের সঙ্গে বঙ্গদেশও তাহার প্রিয় সন্তানের এই গৌরবময় সাফল্যে আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী স্থিতি ও অভিনন্দনেও স্বামীজী মনে শান্তি খুঁজিয়া পাইলেন না। দারিদ্রপ্রাপীড়িত ভারতের সহিত ঐশ্বর্যের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকাবাসিগণের তুলনা করিয়া তাহার মন দুঃখ-বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সুখশয্যা কণ্টকশয্যা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমেরিকার প্রাসাদোপম সুসজ্জিত গৃহে দুষ্কেননিভ সুকোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে স্বামীজী মর্মবেদনায় গৃহতলে বিনিদ্ররজনী কাটাইলেন। তাঁহার ঐ কালের সমস্ত পত্রগুলিতে দেশবাসিগণের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, অপার সমবেদনা প্রতি বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি প্রভুর বার্তাবহ মাত্র। তোমরা যাহারা দুর্বল, যাহারা পদপদলিত, কিন্তু যে-তোমরা প্রভুর প্রতি বিশ্বাসবান, তোমাদের মধ্যেই সমস্ত আশা নিহিত। লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের হৃদয়ের বেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব কর; আর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা কর,—সাহায্য অবশ্যই আসিবে। রক্তক্ষরিত হৃদয় লইয়া আমি অর্ধপৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিচিত্র দেশে সাহায্য-ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি,—প্রভু অবশ্যই সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে শীতে, অনাহারে মরিতে পারি। কিন্তু হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িত হৃদয়ের জন্যই এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। তোমরা এই ত্রিশ কোটি নরনারী উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন গভীরতম অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবিতেছে। প্রভুর নাম জয়যুক্ত হউক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব। এই চেষ্টায় শতজন প্রাণত্যাগ করিতে পারে, আবার

সহস্রজন এই কর্মের জন্ত প্রস্তুত হইবে। চাই বিশ্বাস—সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস,—জ্বলন্ত সহানুভূতি—অগ্রসর হও।”

প্রতীচ্যখণ্ডে বেদান্তধর্মের বীজ বপন করিয়া ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অচিরে বরাহনগর হইতে স্থানান্তরিত নূতন আলমবাজার মঠে গুরুভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতাবাসিগণের পক্ষ হইতে স্মার রাধাকান্ত দেব মহোদয়ের শোভাবাজারস্থিত সুবিস্তৃত প্রাসাদপ্রাঙ্গণে স্বামীজীর সম্বর্ধনার জন্ত একটি অভিনন্দনসভা আহূত হইল। স্বামীজী সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র সমবেত জনতা মন্ত্রমত্তের আসন হইতে উখিত হইয়া জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিল। সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর রৌপ্যাদারে স্বামীজীর হস্তে অভিনন্দন-পত্র অর্পণ করিলেন। স্বীয় জন্মভূমিতে সহস্র সহস্র স্বদেশবাসী এবং বিশেষতঃ যুবকগণ কর্তৃক প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থিত হইয়া আবেগের সহিত তিনি যে অপূর্ব অভিনন্দন-প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন সমগ্র জনতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শ্রবণ করিলেন। তিনি সর্বশেষে উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বঙ্গীয় যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“উদ্ভিষ্টত জাগ্রত প্রাপ্য বরাগ্নিবোধত”—উঠ, জাগ, যতদিন না অভীষিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত তনুদেশে চলিতে ক্ষান্ত হইও না। উঠ, জাগ, কারণ শুভ মুহূর্ত আসিয়াছে। সাহস অবলম্বন কর; ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানে “অভীঃ” এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে “অভীঃ”, নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব। উঠ, জাগ, কারণ, তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। ‘যুবা, আশিষ্ট, দ্রুতিষ্ট, বলিষ্ট, মেধাবী’—তাহাদিগের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শতসহস্র যুবা রহিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ আমি কিছু কার্য করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে আমিও একসময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম—আমিও একসময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মত খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতদূর করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমাপেক্ষা কত অধিক কার্য করিতে পার। উঠ, জাগ, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অগ্ন্যাগ্ন স্থানে বুদ্ধিবল আছে,

ধনবল আছে কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিद्यমান। হৃদয়ে এই উৎসাহ-বহি জালিয়া জাগরিত হও। তোমাদের ভিতর হইতেই শতশত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যসকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত,— এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করিবে। ভয় পাইও না—ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মূখ্য কারণ; ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার, নিভীক হইলে এক মুহূর্তেই স্বর্গপর্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব ‘উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত’।

এখন হইতে স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া মানবকল্যাণে সমর্পিত একটি শক্তিশালী ধর্মসংঘ গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইলেন। ধ্যান তপস্যাাদি সহায়ে মুক্তিনাভের চেষ্টাই সন্ন্যাস-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ—এই চিরাচরিত পন্থাই তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ এতদিন অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদের মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন— যুগধর্মের প্রচারকার্যে বদ্ধপরিকর না হইলে, ঠাহরের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইবে। মন্দির ও প্রতিমার গণ্ডী হইতে ভগবানকে বাহির করিয়া আনিয়া—“যত্র জীব তত্র শিব”—মস্ত্রে বিরাটের পূজায় অগ্রসর হইতে হইবে। সংসারের কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর অজ্ঞতা ও হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে হইবে। ভারতের কল্যাণ-কামনায় এমন একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহারা মানব সেবার্থে মুক্তির কামনা তো পরিত্যাগ করিবেই, অধিকন্তু প্রয়োজন হইলে সানন্দে নরকে পর্যন্ত গমন করিতে প্রস্তুত হইবে। “বহুজনস্থায় বহুজনহিতায়” শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য হইয়া আমরা যদি পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে না পারি, তাহা হইলে সাধারণ ব্যক্তি ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ কি?

ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর নির্দেশকে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই আদেশরূপে গণ্য করিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ ঐ নির্দেশ শিরোধার্য করিলেন। ভারতের দিকে দিকে ত্যাগের নিশান লইয়া নূতন নূতন সেবাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। গুরুভ্রাতাগণকে কর্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বামীজী অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন। নিজ শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ”—আমাদের জন্ম। কি করছিস্ সব বসে? ওঠ, জাগ্ নিজে। নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর। নরজন্ম সার্থক করে দিয়ে চলে যা। “উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত”।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে স্বামীজী কর্তৃক আহৃত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-শিষ্য ও গৃহীভক্তবৃন্দ অপরাহ্নে কলিকাতার বাগবাজার পল্লীস্থ বলরাম বসুর ভবনে সমবেত হইলেন। তিনি সমাগত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন— নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। আমরা যার নামে সন্ন্যাসী হয়েছি এবং আপনারা যাকে আশ্রয় করে সংসারাত্মকে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যার দেহাবসানের দশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সংঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। উপস্থিত সকলে স্বামীজীর এই প্রস্তাব সর্বস্বান্তঃকরণে অল্পমোদন করিলে সংঘের নামকরণ হইল “রামকৃষ্ণ প্রচার” বা রামকৃষ্ণ মিশন”। ইহার উদ্দেশ্য—(১) সকল ধর্মকে একই সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা; (২) উন্নত চরিত্র কর্মী তৈরী করা—যাহারা বিজ্ঞান ও উন্নতি বিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবে; (৩) ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলাদির উন্নতি ও বিস্তার সাধন; (৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অগ্রাগ্র ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার, এবং (৫) জাতিধর্ম নির্বিচারে নরনারায়ণ জ্ঞানে আত্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বহুকালপোষিত সংঘগঠনের এই পরিকল্পনা গুরু-ভ্রাতাগণের সহায়তায় রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারিয়া বিশেষ শান্তি বোধ করিলেন এবং সংঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বামীজীর মহতী ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য বিপুল উৎসাহে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বাঁপাইয়া পড়িলেন। নিম্নরূপ ভারতের জনসমুদ্রে বিবেকানন্দ যে প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলিলেন, তাহা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎবেগে প্রবাহিত হইয়া বহুশতাব্দীর গতিহীন মৃতকল্প জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল। গতানুগতিকতার পাষণ্ডভার বিদূরিত করিয়া নব্য ভারতের মন্ত্রগুরু স্বামী বিবেকানন্দ স্বদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ দৃষ্টি লইয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।”

সরলাবালা সরকারের

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

(সচিত্র) ৪:৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২

বিবেকানন্দের সাধনা

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

১

চিরকালের ভারতবর্ষ প্রমূর্ত হয়েছে বিবেকানন্দের কথায় কর্মে, ধর্মে ও ধ্যানের মহিমায়, চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যে।... “ভারতবর্ষকে যদি জানতে চান, তবে বিবেকানন্দকে চেতনার আনন্দে অহুধ্যান করুন”—রৌলাকে একদিন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : “If you wish to know India, study Vivekananda for everything in him is positive.”

বিবেক-জীবনে-ই নিহিত আছে শাস্ত ভারতবর্ষের চেতন-বাণী। ভারতবর্ষকে যদি জানতে চাই, তবে ভারত-আত্মার এই ‘দিব্যমহিমা’টি আজ জানব।

কিন্তু প্রশ্ন এই : জানতে চাইলেই কি জানা যায়? সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, কর্মী বিবেকানন্দ, বাগ্মী বিবেকানন্দ, স্বাদেশিক বিবেকানন্দ, মানব-প্রেমিক বিবেকানন্দ—এ-সব জানা-ই কি বিবেকানন্দকে জানা?

সকলবিধ কর্ম-সাধনা ও জ্ঞান-সাধনা তথা ভাব-সাধনার একটা প্রস্তুতি থাকে। বিবেকানন্দের মত বিরাট ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বকে জানতে হলে প্রস্তুতি চাই।

বিবেকসাধনার মূলকথা হচ্ছে ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্ম-দর্শন। ব্রহ্মাত্মভাবে প্রদীপ্ত যিনি নন, বিবেকসাধনার পূর্ণোপলব্ধি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মূলটিকে উপেক্ষা করে শাখা-প্রশাখার বিচার-বিশ্লেষণ প্রাকৃতবিজ্ঞান সহায়ক হতে পারে, কিন্তু জেনে রাখা ভালো, যে ব্রহ্মবিজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত প্রাকৃত বিজ্ঞানও অসম্পূর্ণ।

২

ব্রহ্মবিজ্ঞানই সারবিজ্ঞান। ভারতমাতার বাণী এই—ব্রহ্মকে জানলেই সব জানা সম্ভব : নিজেকে জানা, দেশকে জানা, বিশ্বকে জানা, ব্রহ্মাণ্ডকে জানা, সম্ভব। ব্রহ্মবিৎ সব-ই জানেন, কেননা ব্রহ্মবিজ্ঞান আনন্দ-সাধনায় তিনি ‘ব্রহ্মৈ ভবতি’।

‘জানা’, ‘হওয়া’ ‘করা’—এই তিন-সাধনাই বিবেক-সাধনা তথা ভারত-সাধনা : ব্রহ্মকে জানো, ব্রহ্ম হও, ব্রহ্ম করো—“First let us be Gods and then help others be Gods. Be and make—let this be our motto.”

নিজে ‘হয়ে’ না উঠলে অন্তরে ‘করা’ কিন্তু কথার কথা মাত্র। আগে হতে হয়, তারপর করতে হয়। বৃহত্তের সাধনায় অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মসাধনায়, হও জ্ঞান-প্রদীপ্ত, ভক্তিপ্রসন্ন, কর্মপ্রস্তুত। হয়ে উঠলেই করা সম্ভব। কী করতে হবে? না, ব্রহ্মসাধনায় নিজে যা হয়েছি, দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মদর্শন ও জীবন-চরণের তত্ত্বে তা’ সঞ্চার করতে হবে। মানব-সেবার মধ্য দিয়ে করতে হবে মাধবসেবা, দেশের মধ্য দিয়ে, বিশ্বের। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই ভারতের আদর্শ। ব্রহ্মবাদী বিবেকানন্দের আদর্শ : “জীব সেবা করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর”।

৩

বৃহত্তের সাধনা হ’ল ‘পূর্ণের’ সাধনা। যে মুহূর্তে মানুষ পূর্ণের উপাসক, অন্ততঃ পূর্ণের উপাসনায় আন্তরিক, সেই মুহূর্তেই তিনি মোহমুক্ত দিব্যপুরুষ : দেশ, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা—সমস্তই তাঁর আত্মসম্বিতের আনন্দ। পূর্ণত্বে প্রাণবান্ হলেই মানুষ একাধারে জ্ঞানী, কর্মী, যোগী ও ভক্ত। এমন মানুষই ভারতের আদর্শ; কেননা এমন মানুষ-ই ব্যক্তিস্বাভাব্য রক্ষা করেই স্বদেশ-সেবায় নিষ্কাম নিরলসকর্মী, বিশ্বসেবায় আন্তরিক আগ্রহী, ব্রহ্মযোগে সদানন্দ-সন্মানী; অর্থাৎ ‘ধর্ম’ সংস্থাপনে উত্তোঙ্গী থেকেও ‘মোক্ষ’পথযাত্রী।

আধুনিক ভারতে বিবেকানন্দ এমনি একজন অভিনব মানুষ। তাঁকে জানলে সত্যসত্যই ভারতবর্ষকে জানা সম্ভব। তাঁর সাধনতত্ত্ব চরিত্রে প্রতিভাত করলে ব্রহ্মদর্শনও সম্ভব।

৪

ব্রহ্ম ছাড়া ‘তত্ত্ব’ নেই, ‘ধর্ম’ নেই। আন্তিক্যদর্শনে ‘আত্মার’ উপলব্ধি, নাস্তিক্যদর্শনে ‘অহং’-এর আক্ষালন। যতদিন নাস্তিক্য, ততদিনই অর্বাচীনতার অহংকার। অহংকারে অহং-এরই প্রাধান্য, ছোট-আমিটার প্রাধান্য। তখন ‘ছোটত্ব’-প্রকাশে, নীচতা প্রকাশে লজ্জা থাকে না। বরং সেটাকেই ‘সত্য’ বলে, ‘বাস্তব’ বলে, ‘প্রগতি’ বলে, প্রচার করার জাগে দম্ব।

ভারতবর্ষে গত তিরিশ বছর ধরে' এই দস্ত-দর্শনের আফালন দেখেছি কিছুই কিছু না, সত্য শুধু 'আমি', আমার দল, আমার কর্মপন্থা, আমার চাতুর্য, আমার যুক্তি, আমার জেদ, আমার জবরদস্তি। ভারতবর্ষকে, বিশেষ করে বাংলাদেশকে, তথাকথিত এই 'অতিবাস্তব' আমিবোধ (নাকি সমাজতন্ত্রী প্রগতিবোধ?) নানাভাবে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করেছে, কোথাও কোথাও সফলও হয়েছে।...শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, দুর্ভিসন্ধি—এই যত অতিহীন বিকারগুলিকেও তর্ক-সমাজে তাই হামেশাই প্রশ্রয় পেতে দেখেছি। এমনকি স্বদেশকে অস্বীকার করে'—স্বদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মদর্শন ও সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করে' বৈদেশিক তাঁবে-দারিত্বের অন্ধকারে 'আলোকপ্রাপ্ত' হতেও দেখেছি অনেককে। বিবেকানন্দকে বোঝার অল্পকূল পরিবেশ এটি নয়।... ব্রহ্মানুভাব নেই তো ভারতবর্ষই নেই, সেই হেতু বিবেকানন্দও নেই।

৫

ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়ে যদি দেশকে ভালোবাসি, এবং সেই ভালোবাসার ঔদার্যে বিশ্বদেশকেও স্বদেশ বলে করি গণ্য; যদি স্বজাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি এবং স্বজাত্যবোধের বিজ্ঞানেই বিশ্বজাতির সেবাকর্মে হই উদ্দীপ্ত; যদি মানুষকে জানি আত্মবদ্ধ এবং সেই জানার পূর্ণত্বের আনন্দে সঙ্গোপনে লাভ করি ব্রহ্মজ্ঞান—তবেই, আমার বিশ্বাস এই, যোগিবর শ্রীবিবেকানন্দের জীবনবাণী ও তত্ত্ব-দর্শনের সম্যক উপলব্ধি সম্ভব। ব্রহ্মবাদী ছিলেন বলেই বিবেকানন্দ স্বাদেশিক হয়েও ছিলেন বিশ্বদেশীয়; জাতীয়তাবাদী হয়েও অন্তরে-বাহিরে আন্তর্জাতিক; মানবপ্রেমের অবতার হয়েও মাধবপ্রেমের পূর্ণোপাসক। বিবেকজীবনেই এটি পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, অথও সত্যের যিনি যথার্থ উপাসক তিনিই সমন্বয়ের শান্ত ধর্মকে চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে প্রতিভাত করতে সমর্থ।

চালাকির দ্বারা নয়, সত্যসাধনার দ্বারাই আত্মোপলব্ধি, বিশ্বোপলব্ধি, সম্ভব। সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই আত্মা, সত্যই বিশ্ব, সত্যই জগন্মায়ার শক্তি-মহিমার প্রাণকেন্দ্র। চালাকির দ্বারা, ব্যক্তিস্বার্থ, দলগত বা দেশগত স্বার্থ কখনো কখনো সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মকর্ম, মহৎকর্ম, কখনই সাধিত হয় না। বিশ্বমঙ্গল কর্মই মহৎকর্ম। কায়েন মনসা বাচা সত্যধ্যান, সত্যজ্ঞান ও সত্য-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই তা সম্ভব। শাস্ত্রের উপদেশ: 'সত্যান্ প্রমদিতব্যম্'—সত্য

প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিনয় ঘোষ-কৃত
বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকরগ্রন্থ

সাময়িকগত্রে বাংলার সমাজচিত্র

(প্রথম খণ্ড—১২'৫০)

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণ তদানীন্তন বাংলা সাময়িকপত্র থেকে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড এবং কবি ইখরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনাবলী এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল। অতি দুস্ত্রাপ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য পত্রিকা যেটে বাংলার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা সংযোজিত। ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরো ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থ-প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্য বৃহৎ রয়েল অক্টোবো সাইজের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বই, আর্টপ্লেট ও বোর্ড-বাঁধাই সমেত নামমাত্র করা হয়েছে।

ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজকর্মী সকলের পাঠযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিজ্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
সচিত্র সংস্করণ ৫'৫০ ॥

[প্রতীচির মহাকাব্যগুলি থেকে চয়িত অল্পম কথামাহিত্য-সংগ্রহ]

AFRICANISM : Rs. 16/-

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

নবগোপাল দাসের

ব্যান ও বন্যা ৩'০০ ॥

এক অধ্যায় (২য় মুঃ) ৩'০০ ॥

অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বসুর

ভারতের চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১টি আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মুঃ) ৪'০০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর

প্রমথনাথ বিশীর

ইংলণ্ডের ডারেরী ৪'০০ ॥ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয়ে না। যিনি সত্যপরায়ণ—সর্বকর্মেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন—‘সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্’। সত্যেরই জয় হয়; অন্যতর, মিথ্যার নয়, ‘সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্’। কেন? না, ‘সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্’। সত্যই বাক্যের প্রতিষ্ঠা—তথা বিশ্বের প্রতিষ্ঠা—সত্যবাণী ও সাধনাই সর্বত্র সমাদৃত।

বিবেকানন্দের জীবনবাণী ও সাধনবাণী এই ‘সত্য’। বলেন তিনি: ‘Truth is infinitely more weighty than untruth. So is goodness, If you possess these, they will make their way by sheer gravity’. স্বতরাং সনাতন শাস্ত্রকারদের মত বিবেকানন্দেরও উপদেশ এই: ‘Follow truth wherever it may lead you; carry ideas to their utmost logical conclusions. Do not be cowardly and hypocritical.’ বিবেকবাণীর তাৎপর্য এই: সত্য জানা, মানা ও হওয়া সম্পূর্ণ হলেই জীবনমুক্তি। জীবনমুক্ত পুরুষই সর্বধর্মে সমন্বয় আনতে পারেন, সর্বকর্মে নিকাম আনন্দে নিয়োজিত হতে পারেন; ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও গোষ্ঠীগত হয়েও বৃহত্তর জাতি ও বিশ্বজাতির মঙ্গলবিধানে হতে পারেন তৎপর; জ্ঞানকর্ম প্রেম ও যোগের সমন্বয়ের অত্যাস্তর্ঘ্য এক মহান জীবনতত্ত্ববিকাশে হতে পারেন সার্থক-কাম। স্বামী বিবেকানন্দ এমনি এক সার্থককাম যোগ-প্রতিভা।

৬

সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় সত্যর্ষি বিবেকানন্দের জীবনদর্শনে চারটি সনাতন যোগসুস্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত: কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রূপযোগ এবং জ্ঞানযোগ।

জীবনের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মগুলি যখন ব্রহ্মদর্শনের অর্থাৎ সত্যদর্শনের উপায়স্বরূপ হয়, তখন তা আর বন্ধন হয় না, হয় কর্মযোগ। নিকাম কর্মের দ্বারা যে যোগসাধনা, তাইই কর্মযোগ-সাধনা। সংসারে যা কিছু করি, সবই যেন তাঁর পূজা উদ্দেশ্যে করি, এই ভাব কর্মযোগের ভাব। ‘যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্’—কর্মযোগীর এই মন্ত্র।

সর্বভূতে প্রেমদর্শন ও বিশ্বকল্যাণে নিত্য মনন ও নিদিধ্যাসন—ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য। ভক্তিযোগের সাধন-দ্বারাই বিচিত্রবিশ্বে একত্বের অল্পরাগ প্রকটিত

হতে পারে। কুল, বংশ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, আত্মস্থ, দলগত প্রভৃতি, জাতিগত প্রবঞ্চনা—ব্রহ্মানন্দে লীন হতে পারে **ভক্তিয়োগের** সাধনায়। যথার্থ ভক্ত যে, কারোর উপর সে দ্বেষ করে না, সর্বজনে তার সমদৃষ্টি, মৈত্রীভাব তার সর্বজাতিতে, নিন্দায় সে টলে না, গলে না প্রশংসায়। ‘তুল্যানিন্দাস্ততিমৌনী’ সেই ভক্ত, ভগবানের ‘অতীবপ্রিয়’ সেই মহাত্মা।

ধ্যান-ধারণা ও একাগ্রতার নিত্য সাধনাই **রূপযোগের** বিষয়। চঞ্চল চিত্তকে শান্ত করা, দেহকে সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্ত রাখা, নিয়মিত ‘প্রাণায়াম’ অভ্যাসে শক্তি, সাহস, ও বীর্য সঞ্চয় করা রূপযোগের গূঢ় উদ্দেশ্য। আত্মসংযম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ রাজযোগ-সাধনায় সহজ হয়।

আর **জ্ঞানযোগে** কি হয়? সর্বজ ব্রহ্মাদর্শন হয়। সমাধির আনন্দ ও ব্রহ্মচৈতন্তের মহাস্থ অচিরায় আস্তাধীন হয়।

বিবেকানন্দ এই যোগচতুষ্টয়ের মহাসাধক। তিনি নিজে ‘হয়েছেন’—হয়ে আমাদের ‘করতে’ চেয়েছেন। বলেছেন তিনি : Manifest the Divinity within you, and everything will be harmoniously arranged around it.

৭

আমাদের কালে এমনতর একজন লোকোত্তর ব্রহ্মমানবকে কি সত্যকার মর্যাদা দিতে পারব? আমাদের জীবনবোধ কি পূর্ণাদর্শের তত্ত্বটি স্বীকার করে?...মাটি সত্য, আকাশও সত্য, বস্তু সত্য, ভাবও সত্য, দেহ সত্য, আত্মাও সত্য—এই যে তত্ত্বসত্য, মনেপ্রাণে আমরা কি মানি না জানি? যদি জানি, তবে তো আকাশের ঐদার্য নিয়ে আমাদের মানতে হয় যে, মাটির পৃথিবীতে যারা আছে, যেখানে আছে, সবাই সত্য, সেই-হেতু আমার আপনজন? তবে তো সমাজে যারা হীন হয়ে আছে, দীন হয়ে আছে—তাদের আর্থিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ-বিধানে জীবনপণ আমাকে করতেই হবে? এবং সেই হবে বর্তমান যুগের ‘কর্মযোগ’?

বৈশ্বযুগে মানুষকে আজ আমরা টাকাকড়ি, বাড়ীগাড়ী এবং উচ্চপদের পরিচয়েই মান দিই, মর্যাদা দিই। •কিন্তু সকল মানুষই নারায়ণ, এ-তত্ত্ব কি বিশ্বাস করি? সর্বজীবে শিবজ্ঞান কি নারায়ণ-দর্শন অধ্যাত্মসাম্যতাবের ফলশ্রুতি। এটি হয়তো মানবপ্রেমে সম্ভব হয়, ‘ভক্তিয়োগ’ জীবনের গভীরে সার্থকতা লাভ করে। রাজনৈতিক মানব-প্রেম নয়, অধ্যাত্মিক মানব-প্রেমই

বিশ্বসংসারে স্থায়ী শান্তি আনয়ন করতে পারে। কিন্তু এ-তত্ত্ব আজ আমরা কি মানতে পারব ?

রাজনৈতিক সমাজচেতনার তত্ত্বপ্রচারে নিত্য অসন্তোষ ও অসংযমকে আমরা প্রশ্রয় দিই, আধ্যাত্মিক জীবন-চেতনার তত্ত্ব-সাধনায় আমরা কেউই আজ সংযত হতে চাই নে, ঐশ্বর্য ও ধৈর্যের সাধনা করি না। ‘রাজযোগে’র বাণী জাতীয় জীবনে আজ ব্যর্থ। নিজে হই না, করি না, হওয়ার সত্যটি তাই মনকে স্পর্শই করে না। বস্তুবাদী এই যুগে ব্যক্তিগত স্মৃতি ও দলগত প্রভুত্বের কথাই আমাদের প্রেরণাশীত করতে পারে, আত্মত্যাগ ও সেবাশান্তির আদর্শ বক্তৃতা মঞ্চেই শুধু শোনা যায়। রাজনৈতিক দলাদলির যুগটা যে নিত্যন্তই অন্ধকার যুগ, পেছিয়ে পড়ার যুগ, যুগান্তের আগে আমরা কেউই বুঝব না। এমন যুগে এই অজ্ঞতাচ্ছন্ন রাজনৈতিক বিজ্ঞানের যুগে—বৈদান্তিক ‘জ্ঞানযোগের’ কথা, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের কথা, হান্তকর বলে উপেক্ষিতই হবে। এমন যুগে ব্রহ্মধর্মী সাম্যবাদী বিবেকানন্দের কথা কেন ?

৮

অন্তরে-বাহিরে যথার্থ ব্রহ্মবাদী ছিলেন বলেই কখনো তাঁর কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা দলগত স্বার্থ ছিল না, প্রেমে বা ভক্তিতে ছিল না প্রতারণা, সংযম ও ত্যাগব্রতে ছিল না অনীহা, জ্ঞানযোগে ছিল না সন্দেহ। ব্রহ্মদর্শ, ভারতবর্ষের বিচারে, প্রণীদর্শ, সত্যাদর্শ। ‘সত্যের জন্তই আমি আছি’ বলেছেন স্বামীজি : ‘I stand for truth. Truth will never ally itself with falsehood. Even if all the world should be against me, truth must prevail in the end.’

এই সত্য বেদান্ত থেকে আমরা পেয়েছি—প্রাচীন ঋষি ও সন্ন্যাসীদের জীবনে এবং বর্তমানকালে রাম-বিবেকের কর্মে, ধ্যানে ও জীবনে প্রমূর্ত হতে দেখেছি। এই সত্যাদর্শন ভারতের হয়েও বিশ্বভারতের, রাম-বিবেকের হয়েও আমার, আপনার; বিশ্বমানবজাতির।...সনাতন এই নিত্যসত্যের মর্যাদা যদি রাখতে পারি তবেই ব্যক্তিহিসেবে শান্তি পাব, পরিবারের একজন হিসেবে থাকব প্রসন্ন, সামাজিক হিসাবে সদাচরণে ও সদাচারে থাকবে সুজন-সুন্দর, স্বাদেশিক হিসাবে কর্ম করব সকল শ্রেণী ও সমাজের সুখ-সামান্যের, বিশ্বের একজন হিসাবে কামনা করব সর্বজাতির শুভবুদ্ধি, সর্বমঙ্গল। মনে-প্রাণে জানব, ‘All expansion is life, all contraction is death. All love is

expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life.'

ব্রহ্মসন্ধানে, ইহজীবনে, প্রেমই সাধ্য। প্রেমই পুরুষার্থ। 'প্রেমিক' হওয়ায় শুধু নয়, 'প্রেম' হওয়াতেই পরম প্রাপ্তি। নিকাম নিরলস কর্মে হব অগ্রসর, যত হব, ততই পাব। শিবজ্ঞানে জীবকে করব সেবা, যত করব, ততই পাব। চিত্তবৃত্তিনিরোধ করার আনন্দে যোগারূঢ় হব নিভুতে, ধ্যানে জানব পূর্ণমহিমা, যত জানব, ততই পাব।...স্পষ্ট করে বলো, কী পাব? পাব প্রেমানন্দ। ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ হলোই জ্ঞান পূর্ণ হবে। বেদান্তে বিজ্ঞানানন্দকেই 'বিজিজ্ঞাসিতব্য' বলে ধারণ করা হয়েছে।...

৯

জীবন-চেতনার এই ভাবদ্রব্য উত্তরাধিকার নাস্তিক যুগে আমরা হারাচ্ছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের আন্দোলনে এই উত্তরাধিকারকে আমরা ফিরেই যেন পেয়েছিলাম। হঠাৎ আবার বিংশতির রাজনৈতিক স্বার্থ ও বৈষয়িক বিজিগীষার মোহে হারাতে বসেছি। লজ্জার কথা এইঃ হারানোটাকেই প্রগতিবাদ বলে মনে করছি।

এমনি এক অন্ধকার যুগে বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। চারিদিকে অন্ধকার। আলো কি পাব? মেঘের আড়ালে আলো তো আছে, মেঘ সারানোর ধৈর্য কি আছে চরিত্রে? যা দেখলে ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সত্য বলে প্রতিভাত হবে, তা দেখার সাধনা কি করব?

সাধনা পরের কথা, আগে বিশ্বাস। ভারতের একটি বিশিষ্ট বাণী আছে, জীবনচর্যা ও জীবনধ্যান আছে, বিশ্বনিখিলে তা দান করে মহিমা লাভ সম্ভব, এ বিশ্বাস কি আমাদের আছে? এই বিশ্বাসটির অভাবেই আজ আমরা যোগভ্রষ্ট,

বর্তমানের প্রয়োজন

বেশী কাজ

বেশী সঞ্চয়

বেশী উৎপাদন।

পরমুখাপেক্ষী, আত্মবিশ্বস্ত, সেই হেতু দলগত প্রভুত্ববিস্তারে ছলেবলে কৌশলে বিজিগীষু। আজ অক্ষম উত্তরাধিকারী আমরা সভায়-সমিতিতে স্বামীজির নাম নেব, শতবার্ষিক-উৎসব উপলক্ষ্যে দু-এক জায়গায় বক্তৃতা করতেও যাব কিন্তু

ভেবে দেখব না, তাঁর আদর্শানুসারে কর্ম করার রুচি আমাদের নেই। আমাদের স্বার্থোদ্দেশ্যে কর্ম ও আত্মত্যাগ বা শিক্ষাপ্রচার, সেই হেতু তা সমস্ত মূর্তির উপায় নয়, বন্ধনের রজ্জু বিশেষ। আমাদের ভক্তি মোসাহেবী বৃত্তি মাত্র, সেই হেতু তা অধ্যাত্মপন্থের বিঘ্নস্বরূপ। আমাদের জ্ঞান বৈষয়িক জ্ঞান—সেই হেতু তা তামসিকতার, বড় জোর রাজসিকতার, আত্মস্বায়ক।

যুগচার্য বিবেকানন্দ আমাদের কালে শূন্যগর্ত পূজা পেয়েই কি ফিরবেন? ব্রহ্মসাধনায় না হয় আজ মন নেই, যথার্থভাবে মানব-সাধনাতেও কি আছে? গুপ্ত কোনো কূটনৈতিক স্বার্থ-সাধনের জন্ত নয়, নিকাম কর্মাদর্শের ভাবানন্দে আমরা কি মানবসাধনায় হব তৎপর? অর্থাৎ জীবের সেবায়, জাতীর কল্যাণে ও মানবের মুক্তি-প্রয়োজনে প্রেমের আনন্দেই কি আর একবার লাগতে পারব? বৈদান্তিক ব্রহ্ম না-হয় এ-যুগেও থাকুন আকাশের অন্তরালে, মাটির পৃথিবীতে মানবিক ব্রহ্মগুলিই হ'ক না উপাস্য :

‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি’ কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।’

‘Worship the living God, the Man God—every being that wears a human form—God in his universal as well as individual aspect.’

বেশ তো মানুষকেই করুন পূজা। কিন্তু মনে রাখবেন, মানব-পূজা বা সেবা গুপ্ত কোনো স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য যেন না হয়। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—নিকাম মানবসেবাই ব্রহ্মোপসনার সূচনা। যতক্ষণ সেবা, ততক্ষণই বৈষয়িকতা, ততক্ষণই চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, নিন্দা, অসূয়া, জিগীষা। যেই নিকাম, সেই ব্রহ্মানন্দ। তখন ‘দিয়ে’-ই আনন্দ, ‘করে’-ই আনন্দ, এককথায় ‘হয়ে’-ই আনন্দ।

এ আনন্দের বাণী আমাদের কালে কেউ বুঝবে না। আচ্ছা, বর্তমানে বাস্তববাদীই হন আপনি : ভালবাহুন জ্ঞাপুত্র, কন্যাশ্রম, আত্মবন্ধু জ্ঞাতি-কুটুম্বদের, পাড়া-প্রতিবাসীদের, স্বদেশবাসীদের। শুধু এইটুকু কথা : আপনার ভালবাসাটি যেন শ্রেয়োদীব্য স্তম্ভরের ওজ্জ্বল্য বিকিরণ করে। আপনার আচরণের আলোয় যেন নারায়ণকে দর্শন করি।...হ্যাঁ, এইভাবে ব্রহ্মোপসনা সম্ভব হবে, বিবেক-পূজা সার্থক হবে।

বিবেকানন্দের ধর্মমত

ভবানীগোপাল সান্যাল

পৃথিবীতে যত প্রাচীন ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তারা মানুষের যুক্তিবাদ থেকে সৃষ্ট নয়। বরং যা অতিপ্রাকৃত তা থেকে তাদের সৃষ্টি।

ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে দুটি মতবাদ আছে। প্রথমটি হলো পূজা আর দ্বিতীয়টি হলো প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা। মিশর, ব্যাবিলন ও চীনে পূর্বপুরুষদের পূজার প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। মিশরবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি অতিরিক্ত আত্মা বাস করে। মানুষের দেহের যখন মৃত্যু ঘটে তখন এই অতিরিক্ত আত্মা মুক্তিতে চলে। তার মৃত্যু ঘটে না। এইজন্য সে দেশের নিয়ম পিরামিডের মধ্যে মৃতদেহকে রক্ষা করা। ব্যাবিলনবাসীদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে এই অতিরিক্ত আত্মার জন্ত খাত্ত-পানীয় দিতে হয়। চীন দেশেও অল্পরূপ রীতি ছিল এবং নিঃসন্দেহে তা পূর্বপুরুষদের পূজার প্রমাণ দেয়।

ভারতবর্ষে এই জাতীয় বিশ্বাস মোঙ্গল বা কিরাত জাতির মধ্যে একদা প্রচলিত ছিল। বোড়ো-কাছারীদের মধ্যে কবর দেওয়া ও মৃতদেহ ভস্মীভূত করবার রীতি ছিল। সাধারণতঃ নদীর তীরে কবর দেওয়া হতো। নদীর ওপারে স্থান নির্বাচন করলে একটি দড়ি বা স্নতো জলের উপর দিয়ে বা নীচ ফিরে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো। এর উদ্দেশ্যে যাতে জিওয়া বা আত্মা তার বাড়ী-ঘরে আসতে পারে। কবর দেবার পরে একটি ফাঁপা নলখাগড়া বা ঘাসের একটি শীষ মাটির উপর থেকে মৃতের নাক পর্যন্ত দেওয়া হতো যাতে মৃতের আত্মা নিঃশ্বাস নিতে পারে। কবরের চারপাশে চারটি খুঁটি পোতা হতো, যাতে অল্প কোন মৃতের আত্মা সেখানে না আসতে পারে। কবরের উপরে একটি খোড়ো ঘর তোলা হতো, যাতে শীত-বৃষ্টিতে আত্মার কোন কষ্ট না হয়। গারোরা এই ঘরের নাম দেয় দোলাঙ। তারা ঐ চার খুঁটির সঙ্গে ধানের শীষ বেঁধে রাখে। একটি খুঁটি থেকে একটি বুড়ির মধ্যে চাল, জউ (মদ.), কাপড়-চোপড় ও ফল রেখে তাকে বুলিয়ে দেওয়া হয়। আত্মার আনন্দ ও মুক্তির জন্ত চাল, তরকারি, মদ

একমাস পর্যন্ত দেওয়া হয়। গারোদের মধ্যে একটি বড় উৎসব হচ্ছে ওয়াংগালা। গারোদের গ্রাম নতুন সাজে সজ্জিত হয় ও এক অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দন তখন লক্ষ্য করা হয়। এই উৎসবের সময়ে পূর্বোক্ত সকল দোলাও পুড়িয়ে ফেলা হয়। ডাফ্লা জাতির মধ্যেও অনুরূপ অহুষ্ঠান প্রচলিত। মৃতের মাথার সামনে একটি লাউয়ের খোলের মধ্যে জউ ও মাটির পাত্রে চাল, লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হয়।

মৃতের জন্তু যেমন শোক করা হয় তেমনি বলা হয় সে যেন ফিরে এসে জীবিতদের দুঃখ না দেয়, ভীত না করে। কবরের উপরে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে চালা তৈরী করা হয়। কোথাও কোথাও বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বেঠেনী রচনা করা হয়। মাহুঘের জীবিত আত্মার নাম ইয়ালো ও মৃত্যুর পরে তাকে বলে ওরাম। ডাঃ ফুরার-হাইমেনডরফ ব্যাখ্যা করেছেন যে মাহুঘের যে সন্তা মৃত্যুলোকে যায় তার নাম ইয়ালো আর ওরাম জীবিত ব্যক্তিদের প্রদত্ত খাণ্ড-পানীয় গ্রহণ করে। কিন্তু অল্প এক লেখক লিখেছেন যে ইয়ালো আত্মার সারভূত রূপ।

আর্য-সভ্যতার আছে প্রকৃতি-পূজা, যার পরিচয় আমরা গ্রীকদের মধ্যে দেখতে পাই। এই ধারা আরো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেব-দেবী অর্থাৎ ধর্মের সৃষ্টির সঙ্গে শস্ত্র উৎপাদনের গভীর সম্পর্ক আছে। এর প্রভাবে পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস ও রোমে এডোনিস, ফিরজিয়াতে 'এটিস ও মিশরে ওসিরিস অহুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতবর্ষেও অষ্টিক ও কিরাত জাতির মধ্যেও এই জাতীয় শস্ত্র-কেন্দ্রিক ধর্মবোধের পরিচয় উদ্ভূত হয়েছিল। কিরাতদের মধ্যে আছে শস্ত্রের উৎপাদনের জন্তু বৃষ্টি বা হকুম দেও পূজা, সমৃদ্ধি ও যৌবনের প্রতীক বদনকামের পূজা ও শস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী আইনাওর পূজা।

স্বামীজীর মতে ধর্মের প্রকৃত পরিচয় মাহুঘের পার্থিব সীমা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে অতিক্রম করবার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত। পূর্বপুরুষদের পূজা অথবা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সীমা উত্তীর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়েছে। স্বপ্রাবস্থায় মাহুঘ ধর্মের প্রথম পরিচয় পেলো।^১ নিদ্রায় দেহ অশাড় হয়ে পড়ে কিন্তু মাহুঘের মন ক্রিয়াশীল থাকে। অবশ্য

1. To me, it seems very natural that first glimpse of religion should come through dreams. The first idea of immortality man may well get through dreams : The Necessity of Religion.

স্বপ্নকে মনস্তাত্ত্বিকরা পার্থিব জীবনের প্রতিফলিত অবস্থারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই স্বপ্নাবস্থাতে মানুষ উপলব্ধি করলো আত্মার অবিনশ্বরত্বের পরিচয়। এই অবস্থায় মানসিক প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব। তখন বোধির সাহায্যে জীবন ও জগতের তাৎপর্য, দেহ ও আত্মার নিগূঢ় সম্পর্ক সহজে অন্বেষিত হলো। সকল ধর্মে দেখা যায় যে মহাপুরুষ ও প্রবর্তকরা বোধির দৃষ্টিতে সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। জাগ্রত অবস্থায় এই ধরনের সত্যানুভূতি সম্ভব হতো না। ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এই বোধির অবস্থাকে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন : ‘Serene and blessed mood.’ এই পর্যায়ে আমরা :

By the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things.

বৌদ্ধরা ঈশ্বর স্বীকার করেননি বটে কিন্তু তাঁরাও নৈতিক ধর্ম বা নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তথাগত বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে একদা মহাসত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। স্মৃতরাং তিনিও বিচার-বুদ্ধি অথবা বিশ্লেষণের সাহায্যে অগ্রসর হননি। মানুষের জীবনে এমন একটি পর্যায় আসে যখন সে মনের আলোকে, হৃদয়ের দৃষ্টিতে সত্যকে জানতে পারে। এই জানার মধ্য দিয়ে সে মর্ত্যসীমাকে ছাড়িয়ে চলে যায়।

এই যে সত্য তা নির্বাক, বিজ্ঞানের উপলব্ধির মত প্রমাণমাপেক্ষ ও বস্তুনির্ভর নয়। প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে যে তিনি গুণাতীত ও জ্ঞানাতীত অথবা নৈতিক ধর্মের সারভূত রূপ। ঈশ্বরের পরিচয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি সারাৎসার, জীবনের আদর্শ প্রকাশ। এই আদর্শে পৌঁছবার জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যিনি অসীম তাঁকে সীমার সাহায্যে অর্থাৎ নিছক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে পাওয়া যায় না।

নীতিশাস্ত্র বলে যে আত্মকে বিসর্জন না দিতে পারলে শ্রেয়কে লাভ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিসত্তায় জীবন যদি বিধৃত থাকে তবে পরমত্বকে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিজীবনে আছে অহংকার, ভোগাকাজ্জ্বা ও বাসনার প্রতি সংস্কার। তেনে ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ, এই ত্যাগের আদর্শ জীবনে গ্রহণযোগ্য। এইজন্তু টি.এস. এলিয়টের একটি কবিতায় তীর্থযাত্রীরা তীর্থপরিক্রমা শেষে

বললেন, I should be glad of another death. এর তাৎপৰ্য হলো যে ভোগ-মলিন জীবনের অবসানে মহত্তম পরিণাম নিহিত।

অসীমের প্রতি এই যে আকৃতি কবিরা সৌন্দৰ্য-সাধনার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। কিন্তু যারা সাধক তাঁরা প্রকাশ করেন আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে। হিতবাদের সমর্থকরা সমাজের কল্যাণের কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এই যে কল্যাণ তা গোঁণ অর্থাৎ উপায় মাত্র। একে অবলম্বন করে মানুষ উদ্ধর্তনের পথে এগিয়ে চলে। তা' ছাড়া এই যে, সমাজ, তাও চিরস্থায়ী নয়। এরও পরিবর্তন ঘটবে। সমাজ অর্থ ব্যক্তির সমষ্টি। ব্যক্তির কল্যাণে সমাজের উন্নতি। সুতরাং ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির উন্নতিসাধনের মধ্যদিয়ে সমাজের উন্নয়ন সাধনে করা। মানুষের পূর্ণ রূপের প্রকাশ ঘটে তখন যখন মানুষ অন্তরের ও বাহিরের সকল বাধা জয় করবার চেষ্টা করে। জ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক বাধা জয় করা মানুষের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও বড় গৌরব যদি সে তার ভোগাকাজ্ঞা, অসংযম ও প্রবৃত্তিসমূহকে দমন করতে পারে ও মানসিক প্রশান্তির অধিকারী হয়। এই যে প্রচেষ্টা তা ধর্মের বিষয়।

ধর্মবোধ যখন একটি সমাজকে আশ্রয় করে তখন তার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যুরোপের যে অসাধারণ উন্নতি তার মূলে কেবল বস্তুবাদ নয়, আছে খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের মতে নিছক ভোগবাদের পরিচয় যুরোপে থাকলে সে-দেশ কদাপি উন্নতি করতে পারত না। সুতরাং স্বামীজীর মতে প্রত্যেক জাতি আধ্যাত্মিক পথ গ্রহণ করে প্রকৃত উন্নতি লাভ করে থাকে।

সাধারণ মানুষ, যারা প্রাণী-পর্যায়ের স্তর অতিক্রম করেনি, তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন, পার্থিব জীবনের ভোগাকাজ্ঞা নিয়ে পরিতুষ্ট। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছাড়া ইন্দ্রিয়ের পারবশতা অতিক্রম করে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। ধর্মবোধের মাধ্যমে মানুষ সার্থক জীবন-বাঁপনের প্রেরণা লাভ করে থাকে।

Earth changes, but thy soul and God stand sure ;

What entered into thee,

That was, is, and shall be :

Time's wheel runs back or stops ; potter and clay endure.

বিশুদ্ধ ধর্মই মানুষকে প্রেরণা দিয়ে থাকে। সুতরাং ধর্মের সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও রীতিগত সংস্কার বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। সুতরাং ভবিষ্যতে ধর্ম

হবে মানুষের সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের ধারক। মানুষ অদ্বৈতবাদী হোক বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হোক কিংবা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নীতিধর্মে বিশ্বাসী হোক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। মানুষের সকল প্রকার প্রগাঢ় বিশ্বাসকে ধর্ম নামে অতিহিত করা যাবে।

ধর্ম হতে সর্বজনীন। এর অর্থ এ-নয় যে একটিমাত্র ধর্ম পৃথিবীতে থাকবে। ধর্মবিশ্বাসের যত বৈচিত্র্য থাকবে ততই তাদের মধ্যে মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রত্যেক ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা অপরিহার্য। অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে গেলে কিছুটা হয়ত আপনার মতের ও মনের সঙ্কীর্ণতা পরিহার অপরিহার্য হবে। এতে বিভিন্ন জাতির মিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হবে।

অথচ এই ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে যত রক্তপাত ঘটেছে তার তুলনা পাওয়া বিরল। উগ্র জাতীয়বাদের চাইতেও ধর্ম মানুষকে যেন আরও হিংস্র ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে।

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে, স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনটি অংশ আছে। প্রথমটি হচ্ছে তত্ত্ব। এর সাহায্যে ধর্মের মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও সিদ্ধিলাভের উপায় ব্যাখ্যা করা হয়। দ্বিতীয় অংশকে বলা যায় পুরাণ। এর মধ্যে থাকে নানা কাহিনী বা উপকথা। তত্বকে সার্থকরূপে বোঝাবার জন্য এদের অবতারণা। তৃতীয় অংশ হচ্ছে রীতি। এখানে বাহ্যিক কতকগুলি অল্পষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। যদি এই অল্পষ্ঠানগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করে তবে এদের অতিক্রম করে যাওয়াতে মনের সার্থকতা। এখন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সকল ধর্মের এইগুলির মধ্যে বিভিন্নতা আছে। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা আছে। প্রত্যেক ধর্ম মনে করে যে তার তত্ত্ব, পুরাণ ও অল্পষ্ঠান একমাত্র সত্য। সুতরাং ধর্মকে কেন্দ্র করে সঙ্কীর্ণতা ও অল্পদার মনোভাব সৃষ্ট হয়।

তত্ত্বের দিক থেকে প্রত্যেক ধর্মে বিভিন্নতা আছে। পৌরাণিক বিশ্বাসেও আছে। খৃষ্টীয় মতে ঈশ্বর ঘুঘুপাখীর রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন। হিন্দুরা অশ্বখ বৃক্ষ বা গাভীকে ঈশ্বরের প্রতিক্রম বলে মনে করে। ইহুদিরা মনে করে যে একটি বাস্কাক্রতি বস্তুর ছুঁইয়ে দেবদূতের মূর্তি থাকলে তাকে ভগবানের রূপ বলে গ্রহণ করা যাবে। স্বভাবতঃ দেখা যাচ্ছে যে পৌরাণিক বিশ্বাসের মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ভিন্নতা আছে। অপর দিকে অল্পষ্ঠানের মধ্যেও এই জাতীয় ভিন্নতাকে দেখা যায়। হিন্দুরা লিঙ্গপূজা করে।

খৃষ্টানরা সাক্রামেন্টে বিশ্বাসী। লিঙ্গপূজাকে অশ্রদ্ধা ধর্মাবলম্বীদের আপত্তিকর বলে মনে করবে অতীতকালে খৃষ্টীয় অলুষ্ঠানকে বর্বরতার প্রতীক রূপে উপহাস করা স্বাভাবিক। কিন্তু যারা এই অলুষ্ঠান পালন করেন তাঁরা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে করে থাকেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সমতার কথা বলে থাকি। কিন্তু এই আদর্শের মধ্যে সর্বজনীন মনোভাব নেই। এ-ভ্রাতৃত্ব নিজেদের ধর্মাবলম্বীদের জন্ত, বিধর্মীদের জন্ত নয়। আসলে আমাদের সমতার আদর্শ কথার কথা মাত্র। আর সমতা (equality) মঙ্গল আনয়ন করবে না, বৈচিত্র্য বিশ্বের প্রাণ। যেমনি জাতিগত বিভিন্নতা আছে তেমনি আছে মানুষের মধ্যেও ভিন্নতা। তবে মানুষের মধ্যে একতার পরিচয় এই ক্ষেত্রে যে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্ট। সুতরাং সমতার চিন্তা ক্ষতিকর; সে সমতা আদর্শের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক। তাই স্বামীজীর বক্তব্য হলো যে এই সমতা পৃথিবী ধ্বংস না হলে আসবে না।

স্বামীজী বলেছেন যে আদর্শ সর্বজনীন ধর্মের অর্থ এ-নয় যে ধর্মে, এক তত্ত্ব, এক পৌরাণিক কাহিনী ও এক জাতীয় অলুষ্ঠান প্রবর্তন করতে হবে। বৈচিত্র্য যে সৃষ্টির ধর্ম এ-কথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। যাকে বলি এক তাকে পৃথক স্থান ও পরিবেশের মধ্যে দেখলে বিভিন্ন বলে মনে হবে। বর্তমানে গুরুগ্রহে যাবার চেষ্টা চলছে। এই গ্রহের বিভিন্ন অবস্থা থেকে চিত্র তোলা হলে দেখা যাবে যে আমরা যেন বিভিন্ন গ্রহের ছবি দেখতে পাচ্ছি। স্বামীজী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে জল বিভিন্ন আধার অলুয়্যায়ী বিভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে। ধর্মও তাই। আমাদের মনও আধার; সেই অলুয়্যায়ী ধর্ম ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় করবার কোন উপায় নেই। যদি বিভিন্ন ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে একটি ধর্ম গড়ে তোলবার প্রয়াস করা হয় তাতে আর একটি নূতন ধর্মের সৃষ্টি হবে মাত্র।

ধর্মের যারা গুরু তাঁরা সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়ে আধ্যাত্মিক করে তুলতে পারবেন, সে-চেষ্টা অলীক প্রয়াস। স্বামীজী এই ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ কথা বলেছেন, *There is no other to you than your own soul. Recognise this.* মননশীল বলে মানুষের গৌরব। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে আপন সার্থকতার পথ অলুসন্ধান করতে হবে। গুরু মাত্র পথ-প্রদর্শক হতে পারেন। সকল মানুষের প্রবণতা ও আদর্শ এক হতে পারে না। কর্মী আছেন যারা কর্মের মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথ অলুসন্ধান করছেন।

আছেন ভক্ত যার পথ ভক্তিসাধনায়। তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বা খৃষ্টের লোকোত্তর জীবন ও আদর্শ বরণীয়। যারা মরমী সাধক যারা আপন মনের ভাওে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দর্শন করেন। এঁদের জন্ম ধর্ম অথও না হয়ে বিচিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকলের জন্ম দ্বার উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

স্বামীজী এই ক্ষেত্রে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সার্থকতার কথা উল্লেখ করেছেন।

কর্মযোগের মধ্যে কর্মের সার্থকতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কর্মের আদর্শ বড়, তা গ্রহণযোগ্য। তবে সেক্ষেত্রে দেখা প্রয়োজন যে কর্ম যেন আমাদের প্রভু না হয়ে বসে। কর্মযোগী অনাসক্ত চিত্তে কাজ করে যান। বৈরাগ্যের নির্মল দীপ্তি তাঁর কর্মকে সার্থক করে যেন তোলে। জ্ঞানযোগী সাধারণ জ্ঞান আহরণে সন্তুষ্ট নন। পার্থিব জগতের জ্ঞান তাঁর অন্তরকে তৃপ্ত করে না। তিনি চান সত্যের পরিচয় লাভ করতে। এই সত্যোপলব্ধি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করলে ঘটে। ঈশ্বর ছাড়া সত্যের পৃথক অস্তিত্ব নেই। গাছের ডালে দুটি পাখী বসে আছে। উচু ডালের পাখীটি শান্ত, স্তব্ধ ও সংযত। নীচের ডালের পাখীটি যখন স্বাচ্ছন্দ্য ফল খায় তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু যখন তাকে তিক্ত ফল খেতে হচ্ছে তখন সে হুঃখিত হয়ে উপরের পাখীটির দিকে তাকায়। তার শান্ত, সংযত রূপ তাকে মুগ্ধ করে। সে অল্পশোচনা ভোগ করে। সংসার-সমুদ্রে বাত-প্রতিঘাতে মাহুষ এমনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সত্যলাভের জন্ম, জ্ঞানলাভের জন্ম ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবানের প্রতি হৃদয়ের অহুরাগ প্রকাশ করে। ভগবান পরমানন্দ মাধব। প্রীতির মধ্য দিয়ে ভক্ত ভগবানের আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করে থাকে।

স্বামীজীর মতে মাহুষের পক্ষে প্রত্যেক ধর্মের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা কর্তব্য। এই স্বীকৃতির মধ্যে গৌরব আছে।^১ ঈশ্বরের সৃষ্টি দ্বারা আজও অব্যাহত আছে। এই পৃথিবী ঈশ্বরের মহাপ্রসন্ন। সুতরাং এর মধ্যে তাঁর প্রকাশ, তাঁর সৃষ্টির গৌরব ও তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য।

1. I accept all religions that were in the past, and worship with them all ; I worship God with everyone of them in whatever form they worship him.

বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারত

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র—মননের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ-কালের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এ প্রভাব প্রায়শই একতরফা নয়, অনেকটা অত্যাশ্রয় সম্পর্কের মতো। বিশেষতঃ একটা জাতি যখন নানাবিধ পরস্পরবিরোধী পূর্বহেতুর মধ্য দিয়ে যায়, তখন তার মানস-সংস্থানের তৃচ্চিত্রাবলী যে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদল করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? একচঞ্চু রণজিৎ সিংহ নাকি ভাবী ভারতের মানচিত্র সম্বন্ধে বলেছিলেন, “সব লাল হো যায়েগা।” ভূগোলের প্রতি একথা প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু কালের সঙ্গে যে মনের যোগ, তা কখনও একরঙা থাকতে পারে না। বহু বর্ণের বিচিত্র বিলাস মানুষ্যের মনের যেমন ধর্ম, তেমনি একটা জাতিরও মনের কথা। ধর্মতত্ত্বই হোক, আর কর্মতত্ত্বই হোক—বায়ুমণ্ডলের চাপ এড়িয়ে কোন তত্ত্বসাধনই চলতে পারে না। তা নইলে বেদান্তকেশরী বৈরাগ্যব্রতী স্বামী বিবেকানন্দ -নিরন্ন ভারতবাসীর মধ্যে নারায়ণকে খুঁজবেন কেন, কেনই-বা প্রাণায়াম-নিদিধ্যাসন ছেড়ে মানবহিতে আত্মদানের জ্ঞান ব্যাকুল হবেন?

ভারতবর্ষে সনাতন কাল থেকে ধর্মোপাসনা, সাধকজীবন এবং কর্মোচ্ছোগ—ইহজীবনের সঙ্গে সবসময়ে এর ঐক্য ধরা যায় নি, বা সাধকেরা ধর্ম ও কর্মকে একসূত্রে গাঁথতে চান নি। প্রতিদিনের অপরাবিচ্ছালক শিশ্নোদরপরায়ণতা ও পরাবিচ্ছালক মোক্ষের মধ্যে যোগ ঘটাতে গেলে, সমানুপাত রক্ষা করতে হলে রাজর্ষি জনকের মতো হতে হবে; সংসার, ইহজীবন, প্রত্যক্ষকে পরিত্যাগ না করে, তাকে অবলম্বন করেই মায়া-তিমির অতিক্রম করতে হবে। এটাই আর্থধর্মের যথার্থ আদর্শ। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, এই দুইয়ের মধ্যে যারা যথার্থ ভারসাম্য রাখতে পারেন, তাঁরা সংখ্যায় ‘কোটিকে গোটিক’। তার ওপর আবার জীবনপলাতক বৌদ্ধধর্মের সর্ববৈনাশিক নাস্তিক্যবাদ—এর ফলে উত্তরকালে ভারতবর্ষে জীবনবিমুখ অনীহবাদ সাধকদের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ হয়। যিনি পরাবিচ্ছার অনুশীলন করবেন তাঁকে অপরাবিচ্ছা বিষবৎ

পরিভ্রাণ করিতে হবে ; মোক্ষসাধনার জন্ত গৃহকোটর ত্যাগ করে গিরিকন্ডর
 অবলম্বন করিতে হবে, এবং যৌবনেই বানপ্রস্থের পথে প্রস্থান করিতে হবে,—
 এক কথায় বস্তু-তন্মাত্রজাত জগৎ-প্রপঞ্চ এবং অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে অহিনকুল
 সম্বন্ধ, এ সম্পর্কে এদেশের সনাতন-পন্থীদের মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।
 বোধ হয় এ যুগে সর্বপ্রথম রামমোহন ভোগায়তন ও দেবায়তনের মধ্যে সন্ধি
 স্থাপন করলেন ; তিনি বেদান্তমুদ্রোদিত ব্রহ্মবাদকে একেশ্বরবাদ বলে প্রচার
 করেছেন, সেই আদর্শ নিজে গ্রহণ করে অপরকে পৌরাণিক আদর্শ ও দেববাদ
 পরিভ্রাণ করিতে উপদেশ দিয়েছেন, নিজেও ঘোরতর পুরাণ-বিরোধিতা
 করেছেন। কিন্তু মোক্ষের জগৎ ও কর্মের জগৎকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এককায়
 করেন নি। ধর্ম ও তদাত্মক আচরণবাদ তাঁর অমূল্যবস্তুর বস্তু হলেও পার্থিব
 ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি প্রথর। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের শাস্ত্র-
 সোম্পদ ভক্তির মধ্যে ডুবে ছিলেন বটে, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে বিষয়ী না হলেও
 উদাসীন ছিলেন না। পিতার পর্বতপ্রমাণ ঋণ-শোধেই তাঁর বাস্তববুদ্ধির
 তীক্ষ্ণতা সুপ্রমাণিত হয়েছে। আর বিদ্যাসাগরের কথা তো স্বতন্ত্র। তিনি
 কোন বাকপথাতি পারমার্থিক সত্যায় বিশ্বাস করতেন কিনা সন্দেহ।
 পুরোপুরি ষ্টোয়িক, এপিকিউরিয়ান বা পজিটিভবাদী বিদ্যাসাগর ইহজীবন
 নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না যে, পরকালের কথা ভাবার অবকাশ
 পান নি।

উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে দেখা যাচ্ছে, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সামাজিক
 আচার-আচরণ-আন্দোলন মুক্তিকা স্পর্শ করিতে শুরু করেছে। জর্জ টমসনের
 শিল্পের দল প্রথমে রাজনীতিকে ভেবেছিলেন আদর্শলোকের স্বর্ণগোলক।
 যে বিশ্বাস শিথিল হল সিপাহি বিদ্রোহ ও ইংরেজের পশুৎ নির্মম ব্যবহারের
 ফলে। ব্রাহ্মসমাজের ঘরভেদী গণ্ডগোলের ফলে ধর্মনীতিগত নির্বিকল্প
 চিন্তাপ্রণালী বাধা হয়েই কঠোর বাস্তবের কলকোলাহলের মধ্যে নেমে এল,
 এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে সামাজিক আন্দোলনও ক্রমে ক্রমে
 ছায়াময় ধূম্রজ্যোতিসলিল পূর্ণ কলেবর ত্যাগ করে জীবনসমস্তা-সংক্ষুদ্ধ কঠিন
 কায়া গ্রহণ করল। বস্তুতঃ উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে তার পরবর্তী
 কালে বাঙালীর ভাবসমৃদ্ধ মন বক্ষয়বীর চিন্তাপ্রণালী ত্যাগ করে কঠোর
 জীবনবাদের সম্মুখীন হয়েছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত আলোচনার ক্ষেত্র,
 বিশেষতঃ ধর্মালোচনা ও সমাজতত্ত্বে সহনশীল বাস্তববুদ্ধির দ্বারাই প্রণোদিত
 হয়েছেন। তাঁর পরিকল্পিত অমূল্যধর্ম বাস্তব মানবধর্মেরই নামান্তরমাত্র।

এই পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যটির জীবন, ধ্যানধর্ম ও কর্ম আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিনিও বর্তমান বিশ্বের বাস্তববোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই কাষায়বস্ত্র ও দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করেছিলেন, দুর্বল মানুষকে বাস্তব দৃষ্টিকোণের দিক থেকেই বিচার করেছেন, পরাবিত্বকে অপরাবিচার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

২

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের কর্ম, ধ্যান ও সাধনাকে আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং ব্যবহারিতাকে পরিহার না করে উপযোগকে যোগক্ষেমের সঙ্গে মেলাতে পেরেছিলেন। তাই বর্তমান ভারতের জীবনধর্মে তাঁর প্রভাব সুদৃঢ় প্রত্যয়রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। জীবন ও পরিণাম সম্বন্ধে তাঁর এখন একটা বাস্তবনিষ্ঠ সংযুক্তি ছিল যে, হৃষীকেশের গুহাংগহরে ধ্যানসাধনায় আত্মমগ্ন না হয়ে, তিনি দুঃখশূন্য জন-সংঘের মধ্যে নেমে এসেছিলেন, সর্বহিতের জন্য ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রশ্ন করা, সংশয় প্রকাশ করা, অটল সত্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা—সর্বোপরি সাড়ে তিনহাত উচ্চ মানবকে সৃষ্টিচক্রের চক্রধারী বলে স্বীকার করা, এ হল উনিশ শতকী আধুনিকতার ধারা। স্বামীজী গেক্সার ধারণ করলেও উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব বিশ্বে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন, উনিশ শতকের উত্তম নিখাস তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তাই ধর্মাচার, কর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, জীবননীতি—সব বিষয়ে তিনি বলিষ্ঠ, আশাময়, ক্রিয়াবান মত ব্যক্ত করেছেন; সেই মতানুযায়ী তিনি নিজে কর্মযোগের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছেন, সকলকে জীবনের চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন, এবং বহুমুখীনতাকে পরিহার না করে তাকে জীবনের সঙ্গে মেলাবার উপদেশ দিয়েছেন। আধুনিক ভারতে তিনি দেবকুমার সৃষ্টি করতে চান নি, বলিষ্ঠ বীরাচারী মানুষই তাঁর আদর্শ। আধুনিক ভারতে এই তাঁর সর্বোত্তম দান।

বিবেকানন্দ বেদান্তকে ধ্যান ও ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন, যে-বেদান্ত মূলতঃ অনীহ, বেদান্তরস্পর্শশূন্য, নিষ্ফল চেতনামাত্র। শংকরাচার্য-ব্যাখ্যাত বেদান্তসূত্রের প্রভাবে এদেশে ইহবিমুখী বৈরাগ্যসাধনা^{*} মানুষের পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। সমগ্র সত্তার মূলকথা যদি ব্রহ্মতত্ত্ব হয়, যে ব্রহ্মতত্ত্ব হচ্ছে আপোষরকা-হীন অময়বাদ, এবং যে অময়বাদ জীবের পৃথকসত্তাকে লোপ করে দেয়, ইন্দ্রিয়ময় জগৎপ্রত্যয়কে অধ্যাস ব্যতীত আর কিছু ভাবতে পারে না—তার

দ্বারা আর ঘাই হোক, জীবসেবা চলে না। কারণ কুস্তের মৃদাবরণ ভগ্ন হলে অপরিমেয় সমুদ্রজল ও কুস্তগর্ভলীন গণ্ড-পরিমেয় জল—কে কার পরিমাণ করবে? কিন্তু স্বামীজী যুগযুগব্যাপী ধর্মসাধনাকে এক অভূতপূর্ব উপযোগ-বাদের সোপানের ওপরে স্থাপন করেছেন। বেদান্ত তাঁকে বাস্তবজীবনে উদাসীন করে নি, দেহপিঞ্জরের মধ্যে বন্দী মানুষকে নিষ্কামভাবে জগৎহিতে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবকে শিব বলে microcosm ও macrocosm-এর ভেদ ভুলিয়ে, ঘরের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করে এবং ভীরুহৃদয়ে প্রচণ্ড পৌরুষ জাগিয়ে স্বামীজী বর্তমানকালের সঙ্গে বেদান্তকে সমন্বিত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, “বেদান্ত ভারতীয় ধর্মজীবনকে অতি অবশ্যই ধারণ করে থাকবে।” (অনুবাদ-)। এই বেদান্তের অর্থ—‘Dynamic religion’। সেই প্রচণ্ড প্রাণবান ধর্ম, যা আধুনিক ভারতে তামসিকতা ও জাড্য দূর করে প্রাণসঞ্জীব মন্ত্র দান করবে সে সম্বন্ধে তাঁর উক্তি স্মরণীয় :

শুধু বেদান্ত পড়ে কি হবে? আমাদের বাস্তবজীবনে বিপুল অদ্বৈততত্ত্বকে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এতদিন ধরে অদ্বৈতবাদ বনেজঙ্গলে আর গিরিকন্দরে বন্দী হয়ে ছিল। আমি একে নির্জনতা থেকে বার করে নিয়ে আসব, আর প্রতিদিনের কর্মে ও বাস্তবজীবনে এর মহৎবাণীকে ছড়িয়ে দেব। অদ্বৈত-দ্রুত্বে প্রতি গৃহকোণে ধ্বনিত হোক, পথেপ্রান্তরে, পাহাড়েপর্বতে অদ্বৈতবাণী বিচ্ছুরিত হোক। এস ভাই, আমাকে সাহায্য কর, কেবল কাজ করে যাও। (অনূদিত)

শিষ্য বললেন, “কিন্তু মশায়, ধ্যানসাধনার মধ্য দিয়েই যে আমার মন অদ্বৈতানুভূতি উপলব্ধি করতে চায়, কাজ-টাজ বড় একটা করতে মন চায় না!” তার উত্তরে স্বামীজী সিংহগর্জনে বলে উঠলেন :

কি? জড়সমাধিতে হতজ্ঞান হয়ে থাকার কি দরকার?.....ধরে নিলাম, ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হলে তোর মুক্তি হল। কিন্তু তাতে জগতের কি? সারা দুনিয়ার লোককে মুক্তি এনে দিতে হবে। আমরা মায়ার জগতে দাবানল জ্বালিয়ে দেব। তবেই তুই অনন্ত সভ্যসম্মত হবি। সে সূত্রে নিষিদ্ধ উপলব্ধি, সে আকাশের মতো অসীম অনন্তবোধ—কে তার মাপ করতে পারে? সে রকম মনের ভাব এলে তোর বাক্য হরে যাবে, নিজের নিজস্ব কোথায় ডুবে যাবে, তখন তুই প্রত্যেক, প্রাণীর মধ্যেই নিজেকে দেখবি, প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাবি। এই অনুভূতি এলে, জগতের সবাইকেই ভালবাসতে হবে, সকলের প্রতি অপরাধ প্রেম ও করুণার উদয় হবে। এর নাম যথার্থ বেদান্ত। (অনূদিত)

এই কথাটাই তিনি আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন :

কি জানি, এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য—পরম পুরুষার্থ, তবে মানুষ ত আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না। ব্যুত্থানকালে কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে।

তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের আয়োলাভ হয়। এইজন্তই তোদের বলি, অভেষবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর।

(‘স্বামিশিষ্ট সংবাদ’)

যথার্থ জ্ঞানলাভ হলে তখন মানুষের সমস্ত কর্ম ‘জগদ্বিতায়’ হয়ে দাঁড়ায়। “আত্মজ্ঞানীর চলনবলন সবই জীবের কল্যাণসাধন করে।” এদিক থেকে তিনি বেদান্তকে ‘জগদ্বিতায়’ অর্থে প্রয়োগ করে উনিশ শতকের হিউম্যানিজমকেই একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তা নইলে এরকম বলবেন কেন—“ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কুর্মাণতারের পূজা চাই; পেট হচ্ছেন সেই কুর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না কল্লে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না।...ধর্মকথা শুনতে হলে আগে এ দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা লেকচার-টেক্চারে বিশেষ কোন বল হবে না।” (‘স্বামিশিষ্ট সংবাদ’)।

আধুনিক ভারতে অনন্যদেবতার উজ্জীবন প্রয়োজন, প্রয়োজন মহাশূদ্রসজ্জের, “যারা একমুঠো ছাতু খেয়ে ছুনিয়া উল্টে দিতে পারবে।” বেদান্তকে তিনি তাই আধুনিক ভারতের মানুষগড়ার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ইহকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনা একপ্রকার তামসিক স্বার্থপরতা; কূটস্থ অবস্থা ও মূর্খার মধ্যে তফাৎ কোথায়, যদি বিশ্বসংসারের হিতে মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দিতে না পারে? তাই তিনি বলেছেন, “অন্যভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি কচ্ছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্রফাজ্জ গঙ্গাজলে। ‘দেশের লোকগুলোকে আগে অনন্যস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবৎ পড়ে শুনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথার কেউ কান দেবে না।” (‘স্বামিশিষ্ট সংবাদ’)। এই হচ্ছে আধুনিকতার বাণী, বর্তমান ভারতের জীবনাদর্শ।

আধুনিকতার যে প্রধান উদ্দেশ্য মানবতার মন্থবোধনা, জ্ঞানবিজ্ঞানময় বিশ্বকে সত্য বলে চিনে নেওয়া, এবং ধর্মকর্ম—সমস্ত কিছুকে মানুষের বাস্তব জীবনের কল্যাণে প্রয়োগ করা—এক কথায় উপযোগবাদকে উপদ্রব বলে না মেনে তাকে বাস্তব জীবন ও মনের জীবনের সঙ্গে এক করে দেখার নব-সমন্বয়-বাদই বিবেকানন্দের নব-বেদান্তবাদ। আধুনিক তামসিক ভারতে এ এক নতুন সমন্বয়বাদ, যার মূল হচ্ছে প্রচণ্ড রাজসিকতা।

শুধু মাহুঘের শীলসদাচার নয়, ধর্মকর্ম নয়, আধুনিক ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাদেশিকতা—সমস্ত কিছুকে স্বামিজী আন্তিক্যধর্ম ‘পজিটিভ’ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। জনতাকে এতটা ভালবাসা, নিরন্তর মুখে অন্ন দিয়ে তার দেহটাকে বাঁচানো, শিক্ষা সম্প্রসারিত করে জড় মনকে চেতন করে তোলা, ব্যাষ্টির হাত থেকে সমষ্টির উদ্ধার—এই হল বিবেকানন্দের ঐহিক সাধনা। বেদান্তবাদী সর্বভাগী এই সন্ন্যাসী উনিশ শতকের শেষাংশে যে পরিমাণ মানবপ্রেম প্রচার করেছেন, অহুশীলন করেছেন, অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতিদিনের জীবন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন, এবং বার বার যেভাবে তামসিক বৈরাগ্য ত্যাগ করে রাজসিকভাবে জীবনভোগের কথা বলেছেন, তাতে যেকোন এপিকিউরিয়স চমকে উঠবেন। স্বামিজীর সেই উক্তি—“এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যেসব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনেচ্ছি—তাদের ভিতর পনের আনা লোকই ঘোর ভ্রমোভাবাপন্ন। এক-আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো চের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা।” (‘স্বামিশিষ্ট-সংবাদ’)। এই রজোগুণের অর্থ—বাস্তব মাহুঘের সর্বাদীর্ণ বিকাশসাধন। মিলের হিতবাদ, কৌতের ধ্রুববাদ, রেনেসাঁস ও উত্তর-রেনেসাঁসের মানবতাবাদ, আধুনিক ঐতিহাসিক বিকাশ-বিবর্তনবাদ—সবকিছুর সূত্র মিলবে এই রজোগুণের প্রাধান্যে। তাই তিনি জাত-পাতের ভেদ লুপ্ত করে দিয়ে মাহুঘের সর্বাদীর্ণ কল্যাণসাধন করতে চেয়েছেন, ব্রাহ্মণ্য-অধ্যুষিত হিন্দুসমাজে মহাশূদ্র-তন্ত্রের অধিরোহণ কামনা করেছেন। এদিক থেকে তিনি আধুনিকতার শুধু প্রচারক নন, বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক আধুনিকতাকেই সমগ্র জাতির পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর স্বাদেশিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক অসংখ্য উক্তির মধ্যে এই আধুনিক মনোভাব যে-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাতে তাঁকে ভাবী ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি বলে গণ্য করতে হয়। শ্রেণীসংস্কার, সমাজসংস্কার, জাতীয় ভাবের উদ্দীপন, মাহুঘগড়ার শিক্ষাপ্রচার,—সর্বোপরি নিকাম, নির্মোহ, স্বার্থলেশহীন উদার মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা—আধুনিক যুগে ও জীবনে তাঁর এই দান একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্য। বিশ শতকের গোড়া থেকে পরবর্তীকালে যারা রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চা করেছেন, সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তাঁরা কোন-না-কোন দিক দিয়ে এই বীর সন্ন্যাসীর উক্তি, আদর্শ ও আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর বাণীর দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, প্রেরণা

পেয়েছিলেন। বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা ষাটগোপাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, তাঁরা স্বামীজীর পত্রাবলী, ‘স্বামিশিষ্যসংবাদ’ এবং ‘কলম্বো-আলমোড়া’ বক্তৃতাগুলি পাঠ করে দেশের কল্যাণে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হতেন।^১ সে যুগে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা বিপ্লবীদের বাড়ী খানাতল্লাসী করতে গিয়ে প্রায়ই তাঁদের কাছে বিবেকানন্দের গ্রন্থ আবিষ্কার করতেন। সেইজন্ম স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর সরকারী ‘কুপাদৃষ্টি’ পড়েছিল—সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেবেন কিনা তাও ভাবছিলেন।^২ বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন সভ্যতা, নতুন মানবজীবনবাদ পাশ্চাত্যদেশ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে গোটা পৃথিবীকেই প্রাবিত করবে। আগামী দিনের মানবমুক্তির কথা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেছেন :

জনসাধারণ-অর্জিত নতুন প্রভাত ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যজগতে আসতে আরম্ভ করেছে, সোশ্যালিজ্‌ম্, এ্যানার্কিজ্‌ম্, নিহিলিজ্‌ম্—এরকম আরও কত দল এসেছে, এরা নতুন সমাজবিপ্লবের ধ্বজা ধরে আসছে। (অনূদিত)

তিনি এই জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছেন—“আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তোমাদের অন্তরে সংগ্রামী স্পৃহা জাগিয়ে তোলা।” এই মুক বেদনাহত জনতার দিকে তাকিয়ে তিনি শিক্ষিত সম্ভ্রদায়কে বলেছেন :

তোমরা কি ভেবে দেখেছ, লাথো লাথো নিরন্ন মানুষ, যারা প্রাচীন যুগের দেব-ঋষিদের বংশধর, তারা আজ কোথায় নেমে গেছে? তোমরা কি অনুভব কর, কোটা কোটা মানুষ আজও উপোস করে মরে, যুগ যুগ ধরে তারা উপোস করেই আসছে। ভেবে দেখেছ কি, গোটা দেশের ওপরেই অজ্ঞতা-কৃষিকার কালো মেঘ নেমে এসেছে? এতে কি তোমাদের প্রাণমন অশান্ত হয়ে উঠে না? এতেও কি তোমরা নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে থাকতে পার? মানুষের এই অধঃপতন তোমাদের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে স্পন্দিত হয় না? এতে তোমারা পাগল হয়ে যাও না? তোমরা এমনই অধঃপতনের বশীভূত হয়েছে যে, নামধাম, প্রীপূর্তসংসার—এমন কি নিজের দেহটাকে পর্যন্ত ভুলে বসে আছে। (অনূদিত)

মহাত্ম্যের এই অপমানই যে সর্ববিধ অকল্যাণের কারণ, সে সন্ধ্যা স্বামীজী বলেছেন :

তাদের ছুঁলে পাগ হয়, তাদের সঙ্গে বসলে অপবিত্র হতে হয়, নৈরাশ্রের মধ্যে তাদের জন্ম—সারা জীবন তারা সেই নৈরাশ্রের মধ্যেই থাকবে। ফলে তারা ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে—বতদূর মানুষ নামতে পারে। পৃথিবীতে এমন দেশ কোথায় আছে,

^১ B. N. Datta—Swami Vivekananda—Patriot and Prophet, P 218

যেখানে মানুষ গোরু ছাগলের সঙ্গে থাকে, ঘুমায় ?...এর জন্ত কে দায়ী ? আমরাই ।
 উঠে দাঁড়াও, সাহসী হও, সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নাও । অপর
 পক্ষের দিকে কান্দা ছোঁড়ার কোন দরকার নেই । তোমরা নিজের দোষেই কষ্ট পাও ।
 তোমাদের সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ—তোমরা নিজেরাই । (অনুদিত)

জনসাধারণকে তমোগুণের জড়ত্ব থেকে কি ভাবে রক্ষা করতে হবে ? এ
 সম্বন্ধেও তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন :

তাদের ধর্মের ওপরে হাত না দিয়ে তাদের তুলে ধরতে হবে ।.....সাধারণ মানুষই
 ভারতের একমাত্র আশাভরসা স্থল । ওপরের সমাজের লোকেরা দেহ ও মনের দিক
 থেকে জাহান্নামে গেছে ।.....জাতি হিসেবে আমরা আমাদের স্বাভাব্য হারিয়ে ফেলেছি,
 সমস্ত দোষত্রুটির এই হচ্ছে একমাত্র কারণ । সেই স্বাভাব্য আবার দেশবাসীকে ফিরিয়ে
 দিতে হবে, সাধারণ লোককে তুলে ধরতে হবে । হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান—সকলেই এই
 সাধারণ মানুষগুলোকে পায়ের তলায় পিষে মেরেছে । তোমরা দেশের ছোট জাতকে
 ঘৃণা করে এসেছে, ফলে সারা দুনিয়ার থেকে তোমরা নিজেরাই ঘৃণার পাত্র হয়েছ ।

(অনুদিত)

আধুনিক ভারতের মহুগ্ৰস্তহীন দরিদ্রসমাজের কথা এতটা প্রেম, আবেগ ও
 নিষ্ঠার সঙ্গে আর কোন দেশেনেতা বলেছেন, অল্পভব করেছেন জানি না ।
 মহুগ্ৰস্তকে প্রাণাশ্রয় দিয়ে বাস্তবজীবনের ওপর যখন যথাযথ মূল্য আরোপ
 করে, রাষ্ট্র ও সমাজে এক বলিষ্ঠ আশাবাদ, মানবতাবাদ, জনকল্যাণবাদ
 প্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠা করেছেন । পরের
 শতকের সমাজসেবী ও রাজনৈতিক নেতারা সেই পথ ধরেই চলেছেন, কিন্তু
 নিকামভাবে জনসেবা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন বলে তাঁরা দরিদ্র মানুষের মনে
 প্রচণ্ড আত্মশক্তি জাগাতে পারেননি । তাই একচক্ষু হরিণের মতো আমাদের
 সমাজসংস্কার বা রাষ্ট্রান্দোলন একপেশে হয়ে গেছে ; স্বাধীনতা এসেছে,
 কিন্তু মহুগ্ৰস্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি । ভোটপত্রের সাহায্য যেখানে যেনতেন-
 প্রকারেণ ক্ষমতা অধিকার করাই একমাত্র রাজনীতি, এবং সে ভোটভিক্ষু
 রাজনীতির জন্তই যেখানে সমাজ-আন্দোলনের ক্রিয়াকৌশল অবলম্বিত হয়,
 সেখানে মহুগ্ৰস্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূরপর্যন্ত ।

তাঁর সবচেয়ে বড় কথা—জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে, তবেই শ্রুতধর্মের
 নব বিজ-সংস্কার লাভ করবে । শ্রম আর শিক্ষা—একটা দেহকে বাঁচায়,
 আর-একটা মনকে ক্রিয়াশীল করে, এই দুয়ের অভাবের নাম তামসিকতা ।
 এই ঘোর তামসিকতা থেকে ভারতকে বাঁচাতে হলে একদল নিকাম, নিঃস্বার্থ,
 দেশপ্রেমিক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর প্রয়োজন ; স্বামীজী সেইজন্তই সারা ভারতে

সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গড়তে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, আধুনিক ভারতকে মনুষ্যদ্ব দিতে হলে, পার্থিব জীবন ও ইহমুখী সভ্যতার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে; যুরোপের কাছ থেকে সেই ধরণের শিক্ষাদীক্ষা নিতে হবে, যাতে তমোগুণকে সত্ত্বগুণ বলে ভুল না হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে কোন এক শিষ্ট্র তাঁকে প্রমত্ত করলে তিনি বলেছিলেন :

আমি কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি বিশেষ মন দিইনি বটে। আমার কাজ অন্তর। কিন্তু আমিও এই আন্দোলনকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি, এর আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই আমার আন্তরিক কামনা। নানা জাতের সংমিশ্রণে ভারতে এক-জাতীয়তা গড়ে উঠেছে...। এর দ্বারা ভারতের ঐক্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। বাক্যে আমরা গণতান্ত্রিক ভাষাধারা বলি, এর উদ্দেশ্য তাই। এখন শিক্ষার ব্যয়বাহ্য হচ্ছে, এর পর বাধ্যতামূলক শিক্ষা সকলের মধ্যে প্রসারিত হবে। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে, তাকে স্বাধাৰ্ণ ব্যবহার করতে হবে; ভারতের অন্তরে প্রচুর শক্তি নিহিত আছে, আর তাকেই জাগাতে হবে। (অনুদিত)

এখানে লক্ষণীয়, রাজনীতি, শিক্ষা, গণতন্ত্র—এসবের মূল লক্ষ্য যে, ভারতের ঐক্যসাধন, জনসাধারণের কল্যাণ, সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়। ভারতকে কি আবার সেই বৈদিক যুগে, কি বৌদ্ধযুগে ফিরে যেতে হবে? না সেকালের ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করে জন্মগত জাতির বেড়া তৈরি করতে হবে? তাঁর কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের অবনত শিরে স্বীকার্য :

এখন তা হলে কি করণীয়? আমাদের বা নেই, পূর্বপুরুষদেরও বা ছিল না, ববনদের বা প্রচুর পরিমাণে আছে, তাই আমাদের চাই। তা হচ্ছে স্পন্দমান জীবনপ্রবাহ, যা যুরোপের বিদ্যুৎকেল্ল থেকে ঘন ঘন বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা জগৎকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তুলছে। আমরা সেই শক্তি চাই, স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ চাই, আত্মবিশ্বাস চাই, চাই অটল সাহস, চাই কর্মে নিপুণতা, চাই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত ঐক্যবোধ, আর চাই নব নব উন্নতির জন্ত আকর্ষণ পিপাসা—অতীতের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে নির্ভর করে থাকার ইচ্ছেকে মাঝে মাঝে পরখ করে বাজিয়ে দেখতে হবে। আমরা চাই সেই বিশাল আত্মদৃষ্টি, যা আমাদের সামনের দিকে অগ্রবর্তী করবে অপরিমেয়ভাবে। আমরা চাই কর্মোদ্ভোগী রজোগুণের তীব্রতা, এই রজোগুণ যেন আমাদের শিরায় শিরায় আগদমন্তক সঞ্চরণ করে। (অনুদিত)

এই হচ্ছে নব ভারতের প্রবুদ্ধ বাণী। উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে সমাজসংস্কারক, রাজনীতিক, দেশসেবক—সকলেই এইভাবে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত যুগচিন্তা, আধুনিক ভারতের 'চরৈবেতি' বাণী, বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয় স্বামীজীর ধ্যান ও কর্মে অধিকতর প্রচণ্ডবেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমাজ-আন্দোলন, শ্রেণীভেদের প্রতি বৈমুখ্য, সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রতি

বিক্রপ, দরিদ্র মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, মানুষগড়া। শিক্ষারীতির প্রচলন, আর জীবকে শিববোধে বিশ্বহিতে আত্মসমর্পণ—স্বামীজীর জীবনের এই হল ধ্রুব আদর্শ ভাবী ভারতের পথ-নির্দেশ। আধুনিক ভারতের প্রতি উদ্দিষ্ট তাঁর মতামত ও বক্তব্যকে এইভাবে কয়েকটি সূত্রে নির্দিষ্ট করা মেতে পারে :

১। বেদান্ত অল্লশীলনের দ্বারা ক্ষুদ্র বর্জন, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা, নিকামভাবে বিশ্বহিতে প্রাণ সমর্পণ।

২। যুরোপীয় জীবনবাদী আদর্শকে বর্জন না করে ঐতিহাসিক স্বাভাবিক ও স্বস্থ জীবনমার্গ বলে গ্রহণ—শূন্য জঠরে তত্ত্বচিন্তার চেয়ে পূর্ণ জঠরে জীবনভোগ অনেক বেশি কার্যকর।

৩। ব্রাহ্মণশাসিত ও অভিজ্ঞাত-নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবহার স্থানে সর্বমানবের, বিশেষতঃ শূদ্র-পারিয়া-হেট্টরের কল্যাণ সাধন ও প্রাধান্য বিস্তার।

৪। তমোগুণের বদলে রজোগুণের দ্বারা কর্মোত্তম সৃষ্টি।

৫। শিক্ষাদীক্ষা সমাজসংস্কারকে ভারতের সমষ্টির কল্যাণে নিয়োগ।

৬। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মান্দোলন প্রভৃতির মূল কথা—মানবতা। মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মনুষ্যত্ব সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

আজকের দিনে স্বামীজীর আদর্শ ভারতবর্ষের যথার্থ জীবনাদর্শ বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে, পাশ্চাত্য জাতির বলিষ্ঠ জীবনবাদকে গ্রহণ করা অপরাধ নয়। তা বলে তিনি ‘হেডোলিস্ট’ ছিলেন না; ঐহিক সুখসাধনাই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য তা তিনি বলেন নি। পরহিতে আত্মদান তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। ঐহিকতা বর্জন করে কোন জাতি কখনও বেঁচে থাকতে পারে না, এই হচ্ছে তাঁর উক্তির তাৎপর্য। ঐহিকতার অর্থ—মানবতা, ঐহিক সুখের অর্থ বাইপ্পত্য বীজমন্ত্র নয়। স্বামীজীর জীবন ও সাধনা মানবিক কল্যাণময় ঐহিকতার অলুকুল—এবং উনিশ শতকের ভারতবর্ষ সে আদর্শ কথঞ্চিৎ স্বীকার করেছিল। অধুনাতন ভারতভূমি কোন্ মন্ত্র জপ করছে জানি না; কিন্তু তা যদি স্বামীজী-নির্দিষ্ট জীবনসাধনা না হয়, তা হলে এ জাতিকে বিনষ্টির হাত থেকে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও বাঁচাতে পারবেন না। ইদানীন্তন কালের দেশনেতাদের বোল পার্টালেও ভোল পার্টায় নি। পাশ্চাত্য জীবনের পরিদূষণ, আর প্রাচ্যদেশের বৈরাগ্য-ত্যাগ-তিতিক্ষা-অহিংসার জয়োচ্চারণ, ধ্বজদণ্ডে ‘সত্যমেব জয়তে’ লিখে নিকামভাবে

অনুতাচার করা—আজকের ভারতের কর্মকৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না, নিকৃষ্ট কর্মেরও স্বরাহা হয় না। এই স্বার্থপর, নির্বীৰ্য, পরস্পর-বিবদমান, সংশয়াকুল, ভীৰু ভারতবাসীর স্থলে স্বামীজী যে ভারতকে জাগাতে পেরেছিলেন, তা হচ্ছে যথার্থ বীর ভারত, বাস্তব ভারত, স্বস্থ, স্বস্থ ও স্বাভাবিক ভারত। তাঁর ভারতবর্ষ শূণ্য বৈরাগ্যের ঝুলি খুঁজে চিন্তামণি আবিষ্কারের চেষ্টা করে না। দেহকে স্বীকার করে, বস্তুপ্রত্যয়কে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে, প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে জীবসেবার ব্রত নিয়ে নেমে এসে বর্তমান ভারতের যে আদর্শ স্বামীজী দেখিয়েছেন—আসন্ন মহামারীর মধ্যে সেই পথই একমাত্র জীবনের পথ, শ্রেয়োপথ। সেই শক্তি; ত্যাগ, ভোগ, বৈরাগ্য ও হিতবাদী মনুষ্যত্বের পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা ক্লীবতা আশ্রয় করেছি, বিনাশের সাধনা করে চলেছি, তাই আজ বায়ুকোণে প্রলয়ের দেবতা জেগে উঠেছেন। বিবেকানন্দের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে কবির ভাষায় বলা যায় :

রে মৃত ভারত,

শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

॥ বেঙ্গলের বরণীয় সাহিত্য সম্ভার ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

রাশিয়ার ডায়েরী

কমিউনিস্ট জগৎ ও জীবনের নির্মম হার্ম্য
বিচিত্র রূপায়ণের বিরাট আলেখ্য।

প্রথম খণ্ড : ১৪'০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : ১২'০০ ॥ দুটি খণ্ড একত্রে : ২৫'০০ ॥

দেবতাত্মা হিমালয়

১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯'০০ ॥
২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০'০০ ॥

স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

প্রদক্ষিণ ২য় মুঃ

৪'০০ ॥

• দিকশূল (৩য় মুঃ)

৪'৫০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

নীলকণ্ঠের

মহাকাল (২য় মুঃ)

৩'৫০ ॥

হরেকরকমবা ২য় মুঃ

২'৫০ ॥

নারায়ণ সান্যালের

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

মনামী

চার টাকা ॥

• মার্কসবাদ

৩'০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের

দিলীপ মালাকারের

যুদ্ধের ইয়োরোপ

৪'০০ ॥

মেনপোলিয়নের দেশে

২'০০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

বিবেকানন্দের জাতীয়তা

স্বধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ বলতেই আমার মনে, জেগে ওঠে পর পর ছুটি ছবি। একটি হৃদে দণ্ড হাতে পরিব্রাজক চলেছেন দেশে-বিদেশে জগজ্জয়ী চেতনা নিয়ে ফুটে-উঠেছে একটা দৃষ্টভঙ্গী, একটা অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, একটা সহজ সরল বৈশিষ্ট্য যার ভিত্তিতে ছিল অমেয় প্রেমে অকুণ্ঠ ভালবাসা, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, বীর্যশৌর্য। আর একটি ছবি যেন একালের এক ধ্যানী বৃদ্ধ মৌন সমাসীন, নীরব শান্ত সমাহিত ধ্যাননিমগ্ন আপনি মগ্ন—অমিত যার আভা, যিনি ক্ষোভহীন—অমিতাভ অক্ষোভ্য। কবির ভাষায় তিনি যেন বলেছেন :

আরাম হতে ছিন্ন করে

সেই গভীরে লওগো মোরে

অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি স্মহান

দেখেছি তাঁকে কুমারিকার তিন রুদ্র সমুদ্রের বাহুঘেরা অর্ধমগ্ন শৈলে বসে ভারতবর্ষের ধ্যান করতে, যে ভারত ফুটে বেরবে ভূনাওয়ালার চুপড়ি থেকে, মুটে-মজুর-মুদফরাসের বুড়ি থেকে, ভাঙীর ঘর থেকে। দেখেছি তাঁকে চলেছেন হিমগিরির তুষার মৌলীর শীর্ষে অমর আত্মার সন্ধান, ভবানীর ছায়ায় অমৃতক্ষীর খেতে—মায়ের কোলে মায়ের ছেলে—ওরে আমি আমি করিসনি, কে কাকে রাখছে, কে কাকে দেখছে—বিশ্বের প্রতিটি অণুতে রেণুতে যে শক্তি, সেই মহাশক্তির কাছে নিজেকে সঁপে দে। দেখেছি একে বিদেশে কষুকণ্ঠে ভারতবর্ষের সত্যকে তুলে ধরতে, মিথ্যাকে মোহমুক্ত করতে, যীশুর মত অগ্নিবিচ্ছুরিত করে (pentecostal fire) মন্ত্র দিতে। তাঁরই মুখে শুনেছি—“আগামী পঞ্চাশবর্ষ ধরিয়া তোমরা কেবলমাত্র স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা কর; অত্যাগ্র অকেজো দেবতাগণকে এই কয়বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই। অত্যাগ্র দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা—তোমার স্বজাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার জাগ্রত কর্ণ, সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছি, সেই

বিরাতের উপাসনা করিতে পারিতেছে না.....এই সব মাহুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার দৈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসীগণই তোমার উপাস্ত্র”—

ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীর পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার জাতীয় ইতিহাসে বিবেকানন্দের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। তাঁকে নব্যভারতের একজন বিশিষ্ট শ্রষ্টা বলে অতিহিত করি আমরা। তাঁর অগ্নিদীপ্ত বচন, অশোক-অভয় মন্ত্র, উদাস্ত বাণী, চিন্তার ধারা (Thought pattern) অনেক স্বাধীনতাকামী তরুণকে অপূর্বভাবে উদ্ভূত, উদ্বোধিত, উন্মোচিত করেছে একথাও অকাট্যভাবে সত্য। তাই বিবেকানন্দের জাতীয়তা বলতে আমরা কি বুঝি সেটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। সে জাতীয়তার জ্ঞোতনা (concept) কী, তার ভাবরূপ সমাজে কোন স্থিতিরূপ (content) নিলে, সেটা কি শুধু একটা নৈবক্তিক মানবিক (humanistic) মূল্যবোধ না বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় (utilitarian) বিচার-বুদ্ধি। তাঁর জাতীয়তা কি একটা বিশিষ্ট জীবনবেদ (way of life) না করুণাঘন ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ গঠনের সাময়িক প্রচেষ্টা না গণচেতনার প্রতিষ্ঠা না আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ। আরো প্রশ্ন আছে যে এই ধরনের জাতীয়তাবোধ প্রগতির পথ কতোটা এগিয়ে দিয়েছে, ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সমাজ চেতনাকে কতদূর অগ্রসর করেছে। এমন কি বলা হয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ক্যাথলিক জগতের জগতের কাউন্টার রিফর্মেশনের মত, পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকার একটা বিশিষ্ট চেষ্টা।

জাতীয়তা কথাটাই আবার প্রহেলিকাময়—এক এক যুগে এক এক পরিবেশে তার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। জাতীয়তা বলতে কখনো আমরা বুঝি রাষ্ট্র-চেতনা (statehood), কখনো বুঝি জাতিকে (nation), কখনো চিন্তার ধারায় আসে একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক সীমা (geographical limits), কখনো মনে হয় তাঁরাই একজাতি একপ্রাণ একতা যাদের ভাববিনিময়ে চিন্তার ও কার্যপ্রণালীর সমদর্শিতা আছে (Intellectual or Credo ঐক্য)। আবার এককালে কোমচেতনা রক্তগত কোলিগ, গোষ্ঠীচিন্তাকেই জাতীয়তার জ্ঞোতক মনে করা হতো। ইতিহাসের নানা স্তরে নানা দেশে এই চেতনার নানা ক্রিয়া দেখা যায়, নানা রূপে স্থখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে বিপ্লবে বিরোধে এই চেতনার বিস্তারণ ও বিক্ষোভ হইয়াছে।

বিবেকানন্দের জাতীয়তাবোধের স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে ডুব দিতে হবে ভারত ইতিহাসের গভীরে—যে চেতনার রাজ্যে world of facts আর

world of values এক হয়ে গিয়ে একটি স্মহান জীবনবীক্ষার (Wellens chung) পরিচয় দেয়। জানি এখনি একদল পাথুরে-প্রমাণের বাতিকগ্রস্ত ঐতিহাসিক ও তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যিকের দল জোর গলায় বলবেন যে কল্পনাপ্রবণ কণ্ঠনবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলেই হার্ডক্যাক্টের ইতিহাস গড়ে ওঠে না। বিবেকানন্দের ‘জাতীয়তা’-চেতনা “Curious mixture” একথাও বলতে শুনেছি সমালোচকদের, তাঁর মঠমন্দিরাশ্রয়ী মন “medieval”. যুগকেও স্মরণ করিয়ে দেয় একথাও কেউ কেউ বলেছেন, আবার তাঁকে প্রলেটরিয়াট-পন্থী বলে অভিহিতও করেছেন অনেকে। আসলে ভারত-চেতনার মূল কথাটাকে কেউ কেউ প্রাধান্য দেননি বা তার সামগ্রিক রূপটি ধরেন নি। ইতিহাসকে ভাবানু ও ঘোরালো বা রঙীন করে তোলার সার্থকতা নেই জানি কিন্তু ইতিহাস শুধু তাম্রশাসন, শিলালিপি-শাসক সম্প্রদায়ের কাহিনী বা জয়-পরাজয়ের ইতিবৃত্ত নয়। দেশের জীবনের গতিশীল মনটিকে যদি অথও ভাবে ধরতে না পারা যায় তবে সে ঐতিহাসিককে খণ্ডদৃষ্টি নিয়েই ভূষ্ট থাকতে হবে। জাতীয়তা শুধু বহিরঙ্গের নয়, অন্তরঙ্গেরও, অন্তর্দ্বন্দ্বেরও। ইতিহাস একটা অসমাপ্ত ধারা—তার যাত্রা নিব্বারের স্বপ্নভঙ্গের মত অতীতের গুহাকন্দর থেকে, বর্তমানের পটভূমি হয়তো কখনো সে ছুফল প্রাপ্তি করে কখনো বা ফল্গুধারার মত গুপ্ত ও স্বপ্ন থাকে, কিন্তু ভবিষ্যতের ভিত্তিভূমির রচনা তারই উর্বর পলিমাটিতে। ভারতবর্ষের মত প্রাচীন ও স্মহান ঐতিহ্যবান দেশের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রযুক্ত্য একথাটা আমরা আজ ভুলতে বসেছি। আমাদের ইতিহাস আজকাল-পরশু আরম্ভ হয়নি, এই ইতিহাস কালপরশু তরশুও শেষ হবে না—একটা হচ্ছে অনাঘস্তুবান্। জানি, বলি হবে, যেখানে রাষ্ট্রীয় একতা ছিল না। যেখানে এতোগুলি ভাষা, যেখানে এতো বিভেদ, যেখানে এতো দূরত্ব, সেখানে ঐক্য কোথায়। ভারতবর্ষের ঐক্যচেতনা গ্রীকোলাতিন প্যাগান সভ্যতাপুষ্ঠ ইউরোপীয় মধ্যযুগের Christian unityর মত শ্লথ নয়। ঐতিহাসিক যুগেই হাজার বছর আগে আচার্য শঙ্কর প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতবর্ষের জনগণমন-ঐক্যবিধাতা আর-এক চেতনাকে সিংহাসনে বসিয়ে চারিটি ধামে বদরিকা থেকে কুমারিকা, দ্বারকা থেকে পূর্বপ্রান্তের সমুদ্রতীর পর্যন্ত দেশকে এক অথও ধর্মরাজ্যে বেঁধে দিয়েছিলেন। ধর্ম নামটিই এমন যে তার সরব সোচ্চার নামকরণেই হয়তো আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। ধর্মকে আমি তার ব্যুৎপত্তিগত গভীর অর্থেই ব্যবহার করছি—যে সংস্কার বিচারবুদ্ধি চেতনা আমাদের ধারণ করে আছে, যে অন্তর্নিহিত বোধ

আমার জীবনের সমস্ত রসাতাস, সমস্ত অভিব্যক্তি, সমস্ত কামকামনা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রচেষ্টাকে নূতনভাবে রূপায়িত করে মূল্যবোধ দেয়। বিবেকানন্দের জাতীয়তা সেই আলোড়নকারী স্তরের। সেখানে স্বাভাৱ্যবোধ, স্বদেশপ্ৰীতি, পশ্চিমের মানবতাবোধ, আতঁতপ্ত-দুঃখী দরিদ্রের জহ্ন মমতা, যুক্তিবাদী স্থনিষ্ঠ চিন্তা এক করুণাঘন প্রজ্ঞাঘন দীপ্তিতে মিশে এক হয়ে অক্ষুট ভারত-চেতনাকে খণ্ড থেকে অখণ্ডে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়েছে। সেই ভারতবর্ষ কবিকল্পনার মহামানবের সাগরতীর। আজকের যুগে জাতীয়তার এই সর্বাঙ্গীণ রূপায়ণকে অনেকেই Romantic extravaganza বলে অভিহিত করতে পারেন কিন্তু বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দেশমাতাই ছিলেন মাতা— দেশের হৃদয় থেকেই জননী বেরুতেন। অত্র দেশের ইতিহাসেও এই ‘idolisation’, ‘deification’ বা ‘divinisation’ যে নেই তা নয়। বেনেদাতে ক্রোচে (Benedette Croce) ফরাসী ঐতিহাসিক মিচেল্যাট (Michelat) সম্বন্ধে লিখলেন যে তাঁর লেখার মধ্যে আমরা পাই “fantastic idealization of France as a physical, intellectual and moral person.” ইংলেণ্ডেও দেশমাতা ব্রিটানিয়া (যিনি তরঙ্গদলকে শাসনে রাখেন) ভাবরসিক মূর্তি পেলেন ফাউড (Froude) ও ফ্রিম্যানের (Freeman) ইতিহাসচিন্তায়। আমেরিকাতেও শ্রাম খুড়ো (Uncle Sam) দেশের প্রতীক। জার্মানীতেও পিতৃভূমি (Fatherland বা Deutschland) সম্বন্ধে গত শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতার পর ঐক্যের ভিত্তিতে একটা ভাবগদগদ চেতনা ফুটে উঠেছিল যার অসহ্যহার করেছিল নাজী হজুরেরা নর্ডিক রক্তকোলাতের দাবী তুলে এবং ইহুদীদের উপর অত্যাচার করে। কিন্তু এই সব চেতনার মধ্যে জাতীয় চেতনা খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে একটা উদ্ধত (aggressive) বা গর্বোন্নত ভঙ্গীতে। কিন্তু ভারত-চেতনার মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐক্যসূত্র থাকায় তার করুণাময়ী চিরকল্যাণময়ী রূপও প্রকটিত। একজন মনীষী লেখক বললেন—স্বামী বিবেকানন্দ একটা জাতির দীর্ঘ এক বিচিত্র বিক্ষিপ্ত শতাব্দীর যোগফল। আমরা বলবো—বহু শতাব্দীর যোগফল, যোগজ ফল, ধ্যানমূর্তি।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্বন্ধে দুটো কথা গত শতাব্দীতে পশ্চিম মহাদেশে বিশেষ চালু হয়েছিল। একটা রাডইয়ার্ড কিপলিংএর তথাকথিত মহৎ বাণী—

The East is East, and the West is West

And the twain shall never meet.

আর একটি ম্যাথু আরনল্ডের—

The East bowed low before the blast

In patient deep disdain

She let the legious thunder past

And plunged in deep thoughts again.

বর্তমান ভারতবর্ষের প্রথম পুরোধা হিসাবে রামমোহন, তারপরে বিবেকানন্দ ও পরে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের গভীর মিলনকেই জাতীয়তার একটি ছন্দ বলে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন—মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর, সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ নিয়ে আজ আমাদের মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করে তুলতে হবে—গণ্ডিবন্ধ থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র না করে তুলি। তারপর তিনি বললেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষীরা একথা বুঝেছেন এবং এই মনীষীদের মধ্যে মুক্তকণ্ঠে রামমোহনের সমান আসন তিনি বিবেকানন্দকে দিলেন (রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড ৬:২ পৃঃ)। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—সিংহাসনে সমাসীন নৃপতি থেকে ওই যে কুলি কাজ করছে, সন্ধ্যা-বন্দনায় উর্ধ্বনৈত্র্য ব্রাহ্মণ থেকে ঐ যে অদৃশ্য পঞ্চম দূরে পালাচ্ছে, সবই ভগবান। জাতির শক্তি হচ্ছে জনগণ—মহিষমর্দিনীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল কারা—লক্ষ লক্ষ দেবতার শৌর্ধবীর্ষই তো আশ্রয় নিয়েছিল সেই আধারে। আজ সেই ভবানী ভারতমাতা তমসাম্ভ্রম, তাঁকে ব্রহ্মতেজে উদ্ধুদ্ধ করতে হবে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা তো তাই, বিচিত্রবীর্ষ বিবেকানন্দের সিংহসম কণ্ঠে সেই বাণীই বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই বোধের জন্মই ভারতবর্ষকে জাগাতে হবে, বাচতে হবে, তার এই বোধিচেতনা, তার এই পশুস্তম্ভী বাণী, এই তার

সত্তাঃস্মৃট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে

... ..

পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর।

বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ জাতীয়তা দেশকালপাত্রকে নিয়ে অথচ তার সীমানা অতিক্রম করে এক বলিষ্ঠতর মনুষ্যত্বের সাধনা। বেদান্তের সূত্র শুধু মুখে নয় বক্তৃতায় নয়, জীবনের নিত্য পরিক্রমায়, বিরাটের উপাসনা শুধু ধ্যানে নয়, চিন্তায় নয়, কাজে—ফেলে দে ধ্যান, মুক্তি যুক্তি, হাজার হাজার বিবেকানন্দ গড়ে উঠবে।

Stand up, assert yourself, proclaim the God in you.
Do not deny him. It is a manmaking religion that we want,

manmaking theories that we want. And here is the test of truth—anything that makes you weak, physically, spiritually, reject as poison. Truth is strengthening. Truth is purity.

আবার বেদান্তকেশরীর গর্জন শোনা যায়—Faith, faith, faith in ourselves. Do you feel that millions are starving today ? millions have been starving for ages ? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud ? Does it make you restless ? Does it make you sleepless ? Has it made you also mad ?

এই হলো বিবেকানন্দের জাতীয়তা ;—রাজনীতির পাঠ্যপুস্তকের ছক্কাটা ফর্মুলা মিলিয়ে একে ধরা যাবে না—কিন্তু উদ্দেশ্য ও আদর্শে মহান্। আবার যেদিন খেতরীর রাজদরবারে নৃত্যবাসরে নর্তকী স্মরণ করিয়ে দিলে—

প্রভু মেরা অবগুণে চিত না ধরো
সমদরশী হৈ নাম তিহারো
চাহত পার কবো
এক লোহা পূজামে রাখত,
এক রহত ব্যাধ ঘরপর,
পরশকে মন দ্বিধা নহী হৈ
তুহ এক কাঞ্চন করো

বীর সন্ন্যাসী বুঝেছিলেন—জানী কাছে ভেদ করো ।

এই বাণীই ত ভারতের সনাতন বাণী—আয়ত্ত্ব সর্বতঃ স্বাহা ।

এই মন্ত্র জগদ্ধিতায়—শুধু আত্মানং বিদ্ধি নয়, ক্লেব্যং মাশ্ম ।

ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস, আত্মের হাহাকার, নিঃসহায়ের বেদনার মাঝে একটি আশার দীপ তিনি জেলে দিয়েছেন । তাঁর ভারতচেতনা শৌর্যবীৰ্য জ্ঞানবিজ্ঞান তপতপস্তা প্রেমভালবাসার মাঝখানে কল্যাণতমের শিবচেতনায় পৌঁচেছে । এই তাঁর জাতীয়তা—এর মন্ত্র হচ্ছে—উত্তীৰ্ণত, জাগ্রত ।

উপহারে ‘বেঙ্গল’এর বই দ্বিতীয়বহিত

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা

নির্মল বসু

স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানত একজন সমাজসংস্কারক ও ধর্মীয় নেতাক্রমে পরিচিত হলেও, রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কম নয়। প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা রাষ্ট্রচিন্তাবিদ (Political thinker) বলি, স্বামী বিবেকানন্দ তা ছিলেন না। রুশো, হেগেন বা গ্রীণের মত প্রণালীবদ্ধ রাষ্ট্র-আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করেন নি, তথাপি তাঁর বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা, বিশেষ করে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের বিচার একান্ত আবশ্যিক।

স্বামীজী নিজে বারে বারে বলেছেন, রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই,^১ তবু দেখা যায় তাঁর কার্যকলাপ রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁর চিন্তা ও কর্ম পরবর্তীকালে দেশের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাবে বিস্তার করেছে। বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবপ্রচেষ্টার প্রধান উৎস স্বামীজী, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সময় পুলিশ যেখানেই তল্লাস করতে গিয়েছে, সেখানেই তারা স্বামীজীর রচনাবলীর সন্ধান পেয়েছে। রোমা রোল্যাঁ মথার্থই বলেছেন, বাংলার বিপ্লবী সংগ্রাম পরবর্তীকালের তিলক ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলন এবং জনসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, সব কিছুর মূলেই রয়েছেন বিবেকানন্দ।^২

১ I am no political agitator...I have said a few words in honest criticism of Christian Governments in general, but that does not mean that I care for, or have any connection with Political." (See *Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples*, Vol II, পৃঃ ৪০৭)

২ 'If the generation that followed, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India to-day has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the initial shock, to the mighty 'Lazarus, come forth! of the Message from Madras.' *The Life of Vivekananda*, রোমা রোল্যাঁ : পৃঃ ১২৫)

স্বামীজীর রাষ্ট্রচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথর ইতিহাস-চেতনা, সাম্য ও স্বাধীনতার ধারণা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট ছিল। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, উভয়ই তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন, এবং তাঁর সমগ্র চিন্তার মূলে রয়েছে গভীর দার্শনিক অহুত্ব। একদিকে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লব-সাধনা, এবং অপরদিকে সাধারণ মানুষের জন্ত গভীর সহানুত্ব, শ্রেণীচেতনা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস, স্বামীজীর রাষ্ট্রচিন্তার এই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী নতুন করে বেদ ও বেদান্তের বিশ্লেষণ করেছেন এবং বেদান্তের আদর্শকে অস্পষ্ট ‘মায়’তে পর্যবসিত না করে জাতীয় অগ্রগতি ও সমাজকল্যাণের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও লোকাশ্রিত আদর্শ এবং স্বামীজীর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর দার্শনিক ধারণাকে পুষ্ট করেছে। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, অধ্যাত্মবাদকে জীবনে প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছেন, এবং যোগ-উপাসনার পথ স্বীকার করেছেন। তথাপি ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছেন, মানুষের সেবা, প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর কাছে ভারতীয় দর্শনের মূল শিক্ষা। সকল মিথ্যা, অনাচার ও অত্যাচার বিরুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এই হল তাঁর দর্শন।

সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বামীজী সকল মানুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী। ধনবৈষম্যে পীড়িত, উচ্চবর্ণের অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা রোগে জর্জরিত ভারতীয় জাতির নিকট তিনি সামাজিক ঐক্য ও সাম্যের আদর্শ তুলে ধরেছেন। তিনি বর্ণপ্রথার বিরোধিতা করেছেন, এবং অধিকারভেদের ধারণাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, জ্ঞানার্জন থেকে শুরু করে সমাজের সকল কর্মে নিম্নতম শূদ্রেরও অধিকার আছে। এদিক থেকে তিনি উপনিষদের ধারণাকেও অতিক্রম করে গেছেন। ইসলামের সামাজিক ঐক্যের আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। বেদান্তের চিন্তাশক্তি ও ইসলামের সামাজিক আদর্শের সমন্বয়ে—
“an Islamic body with a Vedantic heart”—আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার কল্পনা তিনি করেছেন। তবে সাম্যের ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঐক্যসাধনে তিনি বিশ্বাসী নন। প্রত্যেককে উন্নতির চরম শিখরে স্থাপন করা, অর্থাৎ সর্বোত্তম বা ‘ব্রাহ্মণে’ উন্নীত করাই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর ভাষায়, “কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সকল সুবিধা।”^২

১ ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা; ভারতে বিবেকানন্দ, পৃ: ২৪০

আধুনিক সাম্যের ধারণার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তার পরিপূর্ণ মিল দেখা যায়।

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উপায় শিক্ষা। আধুনিককালে প্রাচ্যের তুলনার পাশ্চাত্যের অধিকতর উন্নতি, এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট, এ সূত্রের প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। স্বামীজী বলেছেন, “প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিত্তাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে-জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ এইটি—দেশীয় সমগ্র বিত্তাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দস্তবলে আবদ্ধ করা।”^১ সুতরাং, “তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। বাকিটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে।”^২

সমাজের পরিবর্তনে স্বামীজী বিশ্বাসী ছিলেন। নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞায়ে ভরা সমাজের আমূল পরিবর্তন বা সংস্কার তিনি চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, “সংস্কার করিতে হইলে উপর উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশে পর্বন্ত যাইতে হইবে।...মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ উর্দ্ধদেশে উঠিতে থাকুক, একটি অথও ভারতীয় জাতি গঠন করুক!”^৩ পূর্ববর্তী সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে এইখানে তাঁর পার্থক্য। পূর্ববর্তীরা “একটু-আধটু” সংস্কার চেয়েছেন, আর স্বামীজী চেয়েছেন “আমূল সংস্কার”। তবে সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন “স্বাভাবিক উন্নতিতে” বিশ্বাসী।

‘স্বাধীনতা’ সম্পর্কে স্বামীজীর অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তিনি সকল আচারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি চেয়েছেন। তিনি এমন কথা বলেছেন, “আমি বরং তোমাদের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধ দেখিতে চাই না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, সে মৃত নহে।”^৪ তাঁর লক্ষ্য সামগ্রিক মুক্তি—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি। যে-সব আচার-ব্যবহার স্বাধীন চিন্তার পথে বাধা, তা দূর করতে হবে। স্বাধীনতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, “উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, বিবাহ ও অজ্ঞাত সকল

১ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, ১০৯-১০

২ “ ” পৃঃ ১৭৪

৩ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ১২০

৪ আমাদের উপস্থিত কর্তব্য, ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৮৩

বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।”^১ স্বাধীনতা সম্পর্কে অত্যাধুনিক ধারণার সঙ্গে এই বক্তব্যের অভূত মিল দেখে বিস্মিত হতে হয়। কেবল ব্যক্তির জ্ঞান নয়, জাতির জ্ঞানও তিনি স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে মার্কিন স্বাধীনতা-দিবস ৪ঠা জুলাই উপলক্ষে যে ইংরেজী গান (“To The Forth Of July”) রচনা করেন তা স্বাধীনতার উচ্চ ভাবে সমৃদ্ধ। তিনি এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে ৪ঠা জুলাই-এর আলো বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

ইতিহাস-বিশ্লেষণে স্বামীজী স্পষ্টতই দ্বন্দ্বাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্ব প্রাচীন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে নতুন সমাজচেতনার দ্বন্দ্ব; বুদ্ধ, এমন কি রাম ও কৃষ্ণের আবির্ভাবও এই দ্বন্দ্বের ফল। ১৮২৬ সালে স্বামীজী লণ্ডন থেকে জনৈক মার্কিন বন্ধুকে লেখেন, “মহুত্বসমাজে পর্যায়ক্রমে চারিটি শ্রেণী আধিপত্য করিয়া থাকে, পুরোহিত, যোদ্ধা, বণিক এবং শ্রমিক। প্রত্যেক শাসনাধিকারে গৌরব ও ক্রটি বিद्यমান। যখন পুরোহিতকুল শাসন করেন, তখন বংশানুক্রমের ভিত্তিতেই তাঁহারা ই সর্বসর্বা হইয়া উঠেন, তাঁহাদের অধিকার বহুবিধ বিধি-নিষেধের রক্ষাকবচ দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। সর্ববিচার তাঁহাদেরই অধিকারী; জ্ঞানদানের অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই একচেটিয়া। ইহার সফল এই যে, এইকালে বিবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূচনা। পুরোহিতরা মানসিক উৎকর্ষসাধনে যত্নবান, এই মানসিক বলের সাহায্যেই তাঁহারা শাসন করেন। ক্ষত্রিয়ের (সামন্ততান্ত্রিক যুগ) শাসন স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর, কিন্তু তাঁহারা অপরাপরকে বাদ দিয়া বিশেষ মণ্ডলীতে আবদ্ধ নহেন, ফলে এই যুগে শিল্পকলা ও সামাজিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ বিকাশ হয়। তাহার পরেই বৈশ্ব-শাসন (বণিক ও শিল্পপতি)। ইহার নিঃশব্দ পেষণ এবং শোণিত শোষণ করিবার ক্ষমতা ভয়াবহ। ইহার সুরবিধা এই, বণিক সকল দেশেই যায়, এবং সে বাহন হইয়া পূর্বোক্ত দুই যুগের ভাবধারা সর্বত্র প্রচার করে। ইহারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অধিকতর সামাজিক, কিন্তু এই যুগে সংস্কৃতির অধঃপতন আরম্ভ হয়। ইহার পর আসিবে শ্রমিক (শূদ্র) শাসন। ইহার সুরবিধা এই, বাহুসম্পদ ও দৈহিক স্বাস্থ্যবিধা সমাজের সর্বস্তরে বিতরিত হইবে, ইহার অসুরবিধা (সম্ভবতঃ) সাংস্কৃতিক অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটবে, কিন্তু অসাধারণ

॥ শিশু ও কিশোরদের জন্য 'বেঙ্গল'এর স্মরণীয় সাহিত্য-সম্ভার ॥

অমরেন্দ্র সেনের বানভট্টের
ডাকটিকিট ১'২৫ ॥ লালুভুন্সু (৩য় মূদ্রণ) ৩'০০ ॥
চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর (জরাসন্ধ) গোপাল ভৌমিকের
রং চং এক টাকা ॥ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী (২য় মুঃ)
১'২৫ ॥

জ্যোতিপ্রসাদ বসুর ননীগোপাল গোস্বামীর
বিপ্লবী কানাইলাল ১'৫০ ॥ আমাদের উৎসব এক টাকা ॥
বিক্রমাদিত্যের বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
খুশী দরওয়াজা (২য় মুঃ) ১'৭৫ ॥ প্রাণী ও প্রকৃতি ১'৫০ ॥
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের রেবতীভূষণ ঘোষের
চরণিক তিন টাকা ॥ সবুজ টিয়া ০'৭৫ ॥

দেবদাস দাশগুপ্তের
আকাশের কথা প্রাণের কথা পরাজুত প্রকৃতি এক টাকা ॥
০'৭৫ ॥ এক টাকা ॥ (রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তেজেশচন্দ্র সেনের
পৃথিবীর ইতিহাস (১ম খণ্ড) ৮'০০ ॥ হারানো ছেলে ১'২৫ ॥
কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দ ঘোষের
টান্দের দেশে এক টাকা ॥ লোহার কথা ০'৬২ ॥
ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের সমর বন্দোপাধ্যায়ের
এবংপুরের টিকটিকি ১'০০ ॥ নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে ০'৬২ ॥
তারাপদ রাহার ননীগোপাল চক্রবর্তীর মোমাছির
রক্তধুলির পথ-বিপথে চামড়ার কাজ টুনটুনি আর ঝুলঝুলি
এক টাকা ॥ ০'৬২ ॥ (২য় মুঃ) ১'৩৭ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো

প্রতিভা বিরল হইবে।”^১ যদি এই চার যুগের শ্রেষ্ঠ গুণ নিয়ে কোন সমাজ গড়া যায় তবে তাই হবে আদর্শ কিন্তু স্বামীজীর নিজের মনেই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে; “কিন্তু ইহা কি সম্ভব?” তবে তিনি নিশ্চিন্ত, “প্রথম তিনটি যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সর্বশেষ যুগের সময় উপস্থিত। তাহার (ঈশ্বরের) নিশ্চয়ই ইহা পারিবে—কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।”^২ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, লেলিনের কত আগে, রুশ বিপ্লবের বিশ বৎসর পূর্বে তিনি এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। আরও বিস্ময়কর, ভগিনী ক্রিষ্টিন লিখেছেন, ১৮৯৬ সালে স্বামীজী তাঁকে বলেন, “পরবর্তীকালে যে বিরাট আলোড়নে আর একটি যুগের সূচনা হবে, তা রাশিয়া থেকে, অথবা চীন থেকে আসবে আমি স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু এই দেশের একটিতেই ঘটবে।”^৩ ইতিহাস-বিশ্লেষণে স্বামীজীর ওপর মার্কসীয় পদ্ধতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে একটি বিষয়ে তিনি মার্কসীয় মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, বরং এক্ষেত্রে তিনি হেগেলের অত্যন্ত নিকটবর্তী। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক জাতির একটি উদ্দেশ্য আছে। আর ধর্মই হল ভারতের উদ্দেশ্য। অবশ্য এ ধর্ম তথাকথিত ধর্মনেতার আচারসর্বস্ব ধর্ম নয়—মানুষকে উন্নত করার ধর্ম, জনসেবার ধর্ম।

ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, এবং তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি মঙ্গোলীয় জাতির প্রশংসা করেছেন, এবং “তাতার রক্তকে” জীবনীশক্তি বলে অভিহিত করেছেন। জাতিগত সঙ্কীর্ণতা ও নর্ডিক জাতির প্রাধান্যের ধারণার বিরুদ্ধে তিনি সমগ্র যুগে আদর্শকে সমর্থন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও ভারতের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সময়কেই বড় করে তুলে ধরেছেন। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগকে স্বামীজী বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করেন, এবং ভারতীয় যুবকদের এ সব দেশে গিয়ে প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক জীবনধারায় যোগসাধন করার জ্ঞান আহ্বান জানিয়েছেন। আলেকজান্ডার, চেন্সিস থা, নেপোলিয়ন প্রভৃতির যুদ্ধাভিযানের ভয়াবহ দিককে উপেক্ষা না করেও তিনি অহুভব করেছেন, এ সবের দ্বারা জগতের ঐক্যের সম্ভাবনা নিকটবর্তী হয়েছে।

১ বিবেকানন্দ চরিত; সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পৃ: ২০২

২ ” ”

৩ ” ”

পৃ: ২০১

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি ভারতের প্রতিটি “ধূলিকণা”কে পর্যন্ত ভালবেসেছেন। তাঁর অসংখ্য বক্তৃতা, লেখা ও উক্তির মধ্যে দেশপ্রেমের পরিচয় স্পষ্ট। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যে তিনি গর্ববোধ করেছেন, এবং আধুনিক যুগোপযোগী করে একে সমগ্র জগতের সম্মুখে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ভারতের পরাধীনতা, জাতীয় হীনতা, মাহুষের দারিদ্র্যে তিনি কঁদেছেন, এবং নিশিদিন এর সমাধানের জন্য চিন্তা করেছেন, কাজ করেছেন। কতাকুমারীর সর্বশেষ শিলায় ধ্যানভঙ্গের পর অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে স্বামীজী জননী-জন্মভূমিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “জননি, আমি মুক্তি চাই না; তোমার সেবাই আমার জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট কর্ম।” দেশবাসীর প্রতি তাঁর আহ্বান: “আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়৷ তোমরা কেবলমাত্র স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা কর; অত্যাশ্রিত অকেজো দেবতাগণকে এই কয় বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই।”^১ দেশসেবাই ছিল তাঁর ধর্ম। স্বামীজীর মৃত্যুর কিছু পূর্বে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও রাজনীতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি ধর্ম সম্পর্কে একটিও কথা বলেন নি। জর্নৈক পাণ্ডাবী ভদ্রলোক এই আলোচনায় সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, অনেক আশা নিয়ে তিনি স্বামীজীর কাছে ধর্মের আলোচনা শুনতে এসেছিলেন, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলেন না। স্বামীজী আবেগের সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, “মহাশয়, যতদিন আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকিবে ততদিন তাহাকে আহার প্রদানই ধর্ম। ইহা ছাড়া আর যা কিছু—অধর্ম।”^২ এ কি নিছক ধর্মনেতার উক্তি? এই সব বাণী দেশবাসীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অহুপ্রাণিত করেছে।

দেশপ্রেমের সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে যে রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে ওঠে তাই জাতীয়তাবাদ। আত্মবিস্মৃত ভারতীয় জাতির সম্মুখে তিনি প্রাচীন গৌরবকাহিনী ও বেদান্তের আদর্শ তুলে ধরেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মবোধ। স্বামীজীর ভাবধারা থেকেই জন্মলাভ করেছে অধ্যাত্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদ। যা ছিল বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন। ঐকদিকে নিবেদিতা ও অরবিন্দ এবং

১ ভারতের ভবিষ্যৎ, ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৩৩৬

২ বিবেকানন্দ চরিত, পৃঃ ২৮১

অপরদিকে দেউরার ও পরে তিলক এই আদর্শেরই রূপ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে স্বভাষচন্দ্রের মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্বামীজী জাতির সৃষ্টিভঙ্গ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তিনি ইংরেজশাসনের অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন, এবং স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। এ বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নেই যে বিপ্লবী পরিকল্পনা স্বামীজীর ছিল। ১৯০০ সালে স্বামীজী শেষবারের মত ইউরোপ-ভ্রমণের পর কলিকাতায় ফিরে আসেন। এই সময় কয়েকজন তরুণ তাঁর সঙ্গে বেলেডে দেখা করে। তাদের তিনি বলেন, “ভারতে এখন বোম্বার প্রয়োজন।” মনে হয়, ক্রপত্কিনের বিপ্লববাদ ও আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বারা স্বামীজী প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারী যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, সেইরূপ স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী নিজেই বহুবার বলেছেন, নিবেদিতা যেমন তাঁকে বুঝেছেন, আর কেউ তেমন পারেন নি। ১৯০২ সালের ৫ই জুলাই স্বামীজীর মৃত্যু হয়, আর ৭ই জুলাই “অমৃতবাজার পত্রিকা” মন্তব্য করে, এবার তাঁর কাজের ভার নিবেদিতার ওপর পড়বে।^১ নিবেদিতা কি ভাবে এই কাজের দায়িত্ব পালন করলেন? তিনি স্বামীজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বরোদা যান, এবং সেখানে অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথমে সাক্ষাৎ হয়। পরে নিবেদিতা ও অরবিন্দ কলিকাতায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। বেলেডমঠের কোন কোন সন্ন্যাসী নিবেদিতার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করলেও মঠ-কর্তৃপক্ষ নিবেদিতার কাজকে সমর্থন করেন নি, এবং তাঁদের ধর্মকর্মে ব্যাঘাত হবে—এই আশঙ্কায় নিবেদিতার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তারপর থেকে ক্রমে ক্রমে বেলেড মঠের সঙ্গে রাজনীতির পার্থক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ, বাংলায় বিপ্লববাদের আদি যুগে বেলেড মঠ সরকারের বিশেষ আশঙ্কার বস্তু ছিল। শোনা যায়, মঠে তল্লাসী পর্যন্ত হয়েছে। অনেকের এমন ধারণা হয়েছিল, বঙ্কিমের আনন্দমঠের মত স্বামীজী বেলেডমঠ গড়ে তুলেছেন। নিবেদিতা সর্বত্র এই কথা বলেছেন, স্বামীজীর আদর্শমত দেশসেবার পথ স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করা এবং বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া। স্বামীজীর মানসকল্প এই পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি।

সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত, অশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষের কথা স্বামীজীর চিন্তায় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল “নরনারায়ণের

১ “Possibly his mantle will fall upon his adopted daughter Nivedita”

সেবা”—“যত্র জীব তত্র শিব”। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “এ সব আন্দোলন ও আলোড়ন ছিল মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণীয় শিক্ষিতসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ইহা লোকসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু ভদ্রসমাজ ও উচ্চবর্ণের গভীর বাইরে লক্ষ কোটি নরনারীর হুঃখ, ক্লেশ, অবুদ্দি, কুসংস্কার ও তামসিক জড়ত্ব এ সব কিছু যে মানুষ তাদেরই মধ্যে ‘ভস্মাচ্ছাদিত বহিরি গ্রায়’ আমাদের পূর্বপুরুষগণের শক্তি প্রযুগ্ত আছে। তাহাদের জাগাইবার জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে।” দেশের সকল মানুষের জন্য তিনি কাজ করতে চেয়েছেন। নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, সকলের মুক্তি তাঁর কাম্য। যখন স্বামীজী নরেন্দ্রনাথ, তখন একদিন তিনি নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “নরেন, তুই কি চাস্?” নরেন্দ্রনাথ উত্তরে বলেছিলেন, “শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকতে চাই।” রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, “বার বার ঐ কথা বলতে তোর লজ্জা হয় না। কোথায় কালে বটগাছের মত বর্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা না তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস, এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর!” তবু অধীর নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। সমাধি থেকে জেগে উঠে কি হল? তিনি উপলব্ধি করলেন, নিজের মুক্তি নয়, সমগ্র জগতের মানুষের হুঃখ দূর করার চিন্তা ভিন্ন তাঁর মধ্যে আর কিছু নেই। সেদিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কল্যাণচিন্তাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান।

সমাজব্যবস্থার বৈষম্য স্বামীজীকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, এবং ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব ছিল অত্যন্ত তীব্র। খেতরি বা সেতুপতির রাজার গ্রাম কয়েকজন নৃপতি ও কলিকাতার কিছু ধনীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, এবং তাঁরা স্বামীজীর কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন, তবু দেখা যায়, শ্রেণীগতভাবে ধনীদের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। ভ্রমণকালে তিনি সাধারণত ধনীদের গৃহে অতিথি হতে অস্বীকৃত হতেন। পাশ্চাত্য গমনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি দরিদ্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত খেতরির রাজার নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁর অর্থও তাঁকে নিতে হয়েছিল। ধনিক শোষণের রূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিপেষিত নরনারীর বুকের

রক্তধারা অর্জিত অর্থে বিদ্যার্জন করিয়া ও বিলাসিতায় আকর্ষণ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না— তাহাদিগকে আমি ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলিয়া অভিহিত করি।”^১ আদর্শ সমাজের যে চিত্র স্বামীজী অঙ্কন করেছেন, তাতে ধনীদেব স্থান নেই। এদের “অতীতের কঙ্কালচয়” আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, “তোমরা (উচ্চ শ্রেণীরা) শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাক্ষল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের বুড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালায় উল্লনের পাশ থেকে, কারখানা থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝাড় জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে।”^২

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী। ১৮৯৬ সালে তিনি ঘোষণা করেছেন, “আমি নিজে একজন সমাজতন্ত্রী (সোশ্যালিষ্ট),—এই ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভাল।”^৩ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসের ভিত্তি-স্বরূপ ইতিহাসবোধ ও শ্রেণী-চেতনা স্বামীজীর ছিল। ইতিহাস-বিশ্লেষণ, দরিদ্র মানুষের দুর্দশার বিষয়ে অল্পভূতি এবং ‘বিশ্বাসঘাতক’ ধনীদেব সম্পর্কে বিরাগ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু স্বামীজী যে শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, “এরা (নিম্নশ্রেণীর লোক) মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের হায়ে একইভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে—আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই একরূপ হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই। ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের গ্রাযাগণা আদায় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার ইতরজাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে—ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত যে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ কথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না।”^৪ ভারতে সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠার বহু পূর্বে, সমাজতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে আলোচনা শুরু

১ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, পৃ: ২৭৫

২ বিবেকানন্দ চরিত, পৃ: ২১৭

৩ জনৈক মার্কিন বন্ধুকে লিখিত পত্র; বিবেকানন্দ চরিত, পৃ: ২০২

৪ স্বামী-শিষ্যসংবাদ, পূর্বকাণ্ড, পৃ: ১৭৪

হবার অনেক আগে স্বামীজী এই সব কথা বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ ছিল না, এবং পূর্ণ শ্রেণীচেতনায় স্বামীজীর মধ্যে ছিল—এ সিদ্ধান্তও এর থেকে করা যায় না। তথাপি এই সামান্য মন্তব্য থেকে তাঁর চিন্তার গতি লক্ষ্য করা যায়।

স্বামীজী দেশবাসীর মনে শক্তির সঞ্চার করেছেন। তিনি “অভীঃ” মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। কোন কিছুকে গ্রাহ্য না করে, মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে “কুছপরোয়া নেই” এই ভাব তিনি সকলের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যুবকদের আহ্বান করে তিনি বলেছেন, “ভয় পাইও না, কারণ মহত্ত্বজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তি-প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে, আর ইতিহাসে একবার যাহা ঘটয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিবে। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে। সেই মুহূর্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মূখ্য কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার, নির্ভীক হইলে এক মুহূর্তেই স্বর্গ পর্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব “উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্যবরণ নিবোধত।”^১ তিনি বারে বারে বলেছেন, “বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়।” আত্মবিশ্বস্ত জাতির স্বপ্নভঙ্গের জন্য এই অভয়মন্ত্রের, এই আশার বাণীর প্রয়োজন ছিল। তাঁর উদাত্ত আহ্বান প্রাণে শিহরণ জাগায়: “আমি চাই এমন লোক—যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের ত্রায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইম্পাতনির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটা মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মহত্ত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।”^২

স্বামীজী হিন্দু ধর্মের কথা বলেছেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য দেশেবিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার ফলে সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে, এবং পরবর্তীকালে দেশের হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য এমনকি দেশবিভাগের জন্য এই মতবাদ অনেকাংশে দায়ী, এমন কথা কেউ কেউ বলেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এ কথা আজ প্রমাণ হয়েছে, কৃত্রিম উপায়ে জোড়াতালি দিয়ে ঐক্য হয় না। সমাজতন্ত্রের আদর্শে, সাধারণ

১ কলিকাতা-অভিনন্দনের উত্তর; ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৩৭৫

২ বিবেকবাণী (ছোট), পৃঃ ১২

মানুষের স্বার্থের প্রশ্নকে ভিত্তি করে আমরা মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পারি নি বলেই ধর্ম, ভাষা প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করে বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়েছে। বিবেকানন্দের বাণী নিপীড়িত মানুষের ঐক্যের বাণী। তাছাড়া ধর্মের দিক থেকেও কোন সঙ্কীর্ণ মতের প্রচার তিনি করেন নি। চিকাগো ধর্মসম্মেলনে একমাত্র তিনি বলতে পেরেছেন, “সকল ধর্মই সত্য”। স্বামীজীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “যত মত তত পথ”—যে-কোন ধর্ম অহুশীলনের দ্বারা মুক্তি সম্ভব। স্বামীজী বলেছেন, “মদীয় আচার্যদেবের নিকট আমি আর একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি—উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অভূত সত্য যে, জগতের ধর্মসমূহ পরস্পরবিরোধী নহে। উহার এক সনাতন ধর্মের বিভিন্ন ভাব মাত্র।”^১ স্বামীজীর মুখ থেকেই এমন কথা বেরিয়েছে, “যদি কখন পৃথিবীর সর্বলোক এক ধর্মমতাবলম্বী হইয়া এক পথে চলে তবে বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও প্রকৃত ধর্মভাব একেবারে বিনষ্ট হইবে।...যতদিন চিন্তাপ্রণালীর বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন আমরা বর্তমান থাকিব।”^২ এত উদার ধর্ম ধর্মমত তাঁর আদর্শ থেকে কখনও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হতে পারে না।

সময়ের আদর্শ থেকেই আসে আন্তর্জাতিকতা। স্বামীজী ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া পরিভ্রমণ করেছেন, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কুপমণ্ডুকতার আশ্রয় নিয়ে কোন জাতি বাঁচতে পারে না। তিনি বলেছেন, “সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—স্বার্থই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে অপর জাতি সকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হইল।” তাই তিনি বলেছেন, “ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর তাহা ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে অপরের বাহা কিছু দেয়, তাহারই গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে।”^৩ এই প্রসঙ্গে ভারতপথিক রামমোহনের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে

১ মদীয় আচার্যদেব, পৃঃ ৪৭

২ বিবেকবাণী, পৃঃ ৬০

৩ পত্রাবলী ; ১ম ভাগ, পৃঃ ২৭৯

৪ ” ” ” ” ”

স্বরণ করে স্বামীজী বলেছেন, “যেদিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্ঘীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিলেন, সেই দিন হইতে—আজ ভারতের সর্বত্র যে একটু স্পন্দন, যে একটু জীবন অনুভূত হইতেছে—তাহার আরম্ভ হইয়াছে।”^১ ভারতের অধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্যে প্রচার করতে হবে এবং পাশ্চাত্যের নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সে যুগেই তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তায় সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের মিলন ঘটেছে, বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরস্পরনির্ভরশীলতা ও আন্তর্জাতিকতার ধারণার যোগ সাধিত হয়েছে, এবং একদিকে প্রাচীন ও বর্তমান, ও অপরদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহাসম্মেলন হয়েছে।

স্বামীজীর চিন্তার মধ্যে প্রগতিশীল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ পেলেও, তাঁর এই রূপ আজ জনসমক্ষে স্পষ্ট নয়। তাঁকে নিছক একজন ধর্মীয় প্রচারক রূপে তুলে ধরা হচ্ছে, মন্দিরের ভেতরে ধূপধূনার আড়ালে তিনি ঢাকা পড়ে গেছেন। স্বামীজীর জীবনাদর্শে যিনি নিজের জীবন গড়ে তুলেছেন, এবং স্বামীজীর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, বিপ্লববাদ ও সমাজতন্ত্র ধার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, সেই নেতাজী স্বভাষচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছেন, স্বামীজীর নিজের গড়া প্রতিষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তাঁর শিক্ষাকে উপেক্ষা করেছে; স্তুরাং রাজনৈতিক কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে স্বামীজীর আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য।^২ নেতাজী এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন।

আজ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কিন্তু অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, শিক্ষাহীনতা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কোন কিছুই দূর হয় নি। স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে এ সব সমস্যা সমাধান সম্ভব। সমগ্র বিশ্ব আজ নিশ্চিত সমাজতন্ত্রের পথে। রুটির সমস্যা মিটেছে, তবু জীবনের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। যুদ্ধের আশঙ্কা মানবজাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে। এর কারণ কি? সমাজতন্ত্র, বিশ্বশান্তি, মানবকল্যাণ, সব কিছুই কৃত্রিম ধারণার ওপর; বহিঃরক্ষ কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত; এর সঙ্গে অন্তরের কোন যোগ নেই। আত্মিক শক্তির বিকাশের দ্বারাই কেবলমাত্র যথার্থ মুক্তি ও ঐক্য সাধন সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বহু পূর্বে সমগ্র জগতের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করেছেন।

১ কলিকাতা-অভিনন্দনের উত্তর; ভারতে বিবেকানন্দ, পৃ: ৩৬৮

২ “Vivekananda's teachings have been neglected by his own followers—by the Ramkrishna Mission which he had founded—and we are going to give effect to them.” (Autobiography, পৃ: ৬৮) শ্রীঅরবিন্দও “Karamayogin”—এ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

বিবেকানন্দ ও সংস্কৃতচর্চা

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

উনবিংশ শতকে কর্মজ্ঞানভক্তির সমন্বয়-বিগ্রহ জগদ্বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যবির্ভাব বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতীচ্য ভূখণ্ডে সংঘটিত হ'য়ে গেছে যুগান্তকারী বিপ্লব। ফলে জাগতিক বস্তুবিজ্ঞান এবং ভূতবিজ্ঞান নব নব আবিষ্কার ও নিয়ত অন্বেষণের ফলে উদ্ঘাটিত হ'ল প্রকৃতির দুর্জয় শক্তি। তারই অমিত প্রভাবে মানুষের ভোগের ভাণ্ডার সেখানে উপচায়মান। বিস্তারিত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ; কিন্তু, চিত্তের ভাণ্ডার একান্ত রিক্ত। মানুষের দেহ ভোগে ক্ষীণ; কিন্তু, আত্মা বৃত্তান্ত, ক্রিষ্ট। বিষয়-বিষ-জর্জর, অশান্ত, কামক্রান্ত মানুষ সেখানে শান্তির সন্ধানে ঘুরে মরছে। এমনি সময়ে চিকাগোর ধর্মসম্মেলনকে উপলক্ষ্য ক'রে প্রতীচ্য খণ্ডে স্বামীজীর কণ্ঠে উদ্গীত হ'ল ভারতীয় ধর্মীদের বাণিনির্বোধ—
“নাগ্নে স্থমন্তি, ভূমৈব স্থম্”।—আত্মিক উপলব্ধির দুর্গমপথেই রয়েছে শান্তি, ভূমার সাধনাতেই স্থম; দেহের জন্তে নিত্য নতুন ভোগাহরণে নয়। ভারতের বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মেঘমল্ল মস্তোচ্ছারণে সেদিন পাশ্চাত্যবাসী সচকিত হ'ল, মুক্তিপথের সন্ধান পেলে, শাস্ত্রত স্থম ও শান্তির সরিক হ'ল। বরণ করল বীর সন্ন্যাসীকে বরণ্য গুরুরূপে। রাজসিকতার লীলাভূমিতে তিনি বপন করলেন সাত্বিকতার কল্যাণবীজ।

এদিকে স্বামীজীর জন্মভূমি ভারতবর্ষ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ। তারই পরোক্ষ প্রভাবে সাংস্কৃতিক পরাধীনতার অন্ধ-কারায় ভারতবাসী স্থপ্তিমগ্ন। জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ তখন রুদ্ধ। তামসিকতার ঘোরে আচ্ছন্ন দেশবাসীর মনের আকাশ। নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম সম্বন্ধে একটি আত্মলাঘবপূর্ণ ধারণা (inferiority complex) পোষণ ক'রে আত্মবিস্মৃত ও পরাহ্নকরণই তখন আমাদের জীবনাদর্শ হ'য়ে উঠেছে। অহ্নকরণের চোরাবালির ওপর নতুন সাংস্কৃতিক বনিয়াদ গড়ে তোলাই হ'ল তখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আত্মিক মৃত্যুর লক্ষণগুলি তখন একে একে আমাদের জীবনে প্রকটিত হ'তে চলেছে। ঠিক এমনি সময়ে এই যুগন্ধর মনীষী দীপ্তস্বর্ষের মতো আবির্ভূত হ'য়ে আমাদের জাতীয়

জীবনের অন্ধতমসাকে বিদূরিত ক'রে নিয়ে আসেন অভ্যুদয়ের আলোকচ্ছটা। জীবনব্যাপী কর্মসাধনার দ্বারা এই দেশবাসীর আত্মিক ও আধিভৌতিক সমুন্নতির শুভ সূচনা ক'রে গেছেন তিনি। দুর্গত ভারতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণাদাতা এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিসংগ্রামের বীৰ্যবান নায়করূপে এই মুক্ত সন্ন্যাসীর অবিনশ্বর কীর্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্গভারতের নবজাগরণের তিনি অগ্রতম বলিষ্ঠ নায়ক।

স্বামীজীর সমগ্র জীবনসাধনার মর্মমূল প্রোথিত হ'য়ে আছে ভারতের চিরন্তন সাধনার সুদৃঢ় অধ্যাত্মভূমিতে। ভারতীয় সংস্কৃতির সংহত-মূর্তি এই ধর্মপ্রতিষ্ঠা লোকনায়ক। ভারতের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় যুগে যুগে জনসাধারণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ ক'রে এসেছেন। বীৰ্যবান্ সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিখিল ভারতে পরিচালনা করেছিলেন অভিনব ধর্মাবিধান। অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় মহারাষ্ট্রপতি ছত্রপতি শিবাজীর গুরু সন্ন্যাসী রামদাস স্বামীর অবদান অবিস্মরণীয়। “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্বিতায় চ” আত্মনিয়োগ করেন ভারতের সন্ন্যাসী। সেই ধারারই পরমরূপ প্রত্যক্ষ করি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে।

যে শাস্ত্র ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক এবং প্রচারক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সেই সংস্কৃতি ছিল সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত। প্রসঙ্গতঃ, ফরাসী মনীষী ডাঃ লুই রেণোর কথাটি মনে পড়ে—“There is no living culture without a living tradition.....Indian culture is embodied above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians.” তাই, স্বামীজী সমগ্র জীবন ধরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন অক্লান্তভাবে করে গেছেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁর অতুলনীয় অধিকার জন্মেছিল বলেই ভারতীয় দর্শনে ছিল তাঁর সুগভীর জ্ঞান। সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠনে ও প্রচারে ছিল তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ। অতি শৈশবেই সংস্কৃত মুদ্রবোধ ব্যাকরণের অনুশীলন আরম্ভ করেন তিনি। চিরসমাধির দিনও তিনি অনেকক্ষণ ধরে সংস্কৃত সাহিত্য ও পাণিনি ব্যাকরণের অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন। পরিব্রাজকরূপে সারা ভারত পরিক্রমাকালে তিনি নিয়তই সংস্কৃত অধ্যয়ন করতেন। খেতড়ীতে জনৈক পণ্ডিতের কাছে তিনি নিয়মিতভাবে পাণিনি ব্যাকরণ ভাষ্যাদিসমেত শিক্ষা করতেন। পরে বৃহৎ পত্রে সেই পণ্ডিতমহাশয় সম্বন্ধে তিনি সশ্রদ্ধভাবে “মদীয় অধ্যাপক”রূপে

উল্লেখ করেছেন। বেদচর্চার প্রসার হ'লে আমাদের দেশে যেমন কুসংস্কার তিরোহিত হবে, তেমনি হবে আত্মিক উন্নতি। এইজন্তে বেলুড়ে বেদবিজ্ঞার পঠনপাঠনের জন্তে একটি বিজ্ঞায়তনের প্রতিষ্ঠা তাঁর আজীবন সংকল্প ছিল। বরাহনগর মঠ থেকে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর বারাণসীর ৬প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একটি পত্রে তিনি মঠের সন্ন্যাসীদের বেদপ্রচারে আত্ম-নিয়োগের বাসনা প্রকাশ করেন।—

“...বেদান্তপ্রেরণদ্বারা মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরন্তু, ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমুদায় সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলীকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই। প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃতশাস্ত্রের বহুল চর্চা হইয়া থাকে।...এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদিভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ।...পাণিনির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এবং এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক।...গুরুর কৃপায় এই মঠের সন্ন্যাসীরা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন, ভরসা করি।” (পত্রাবলী ৩য় খণ্ড : পৃ-৪)।

স্বামী অখণ্ডানন্দকে বহু পত্রে সংস্কৃত শিক্ষা করার জন্তে তিনি বারংবার নির্দেশ দিচ্ছেন।

“তুমি সংস্কৃত পড়িতেছ কি? কতদূর অগ্রসর হইলে?”

“...পরকে মারিতে গেলে ঢাল খাড়া চাই, অতএব ইংরাজী ও সংস্কৃত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবে।”—(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড : পৃ: ১৩৪)

“...আর সংস্কৃত, ইংরেজী সযত্নে অভ্যাস করিবে...তাহার সাহায্য সংস্কৃত শিখিবে।”—(পত্রাবলী ২য় : পৃ: ৬৮)

বিদেশে প্রচারকরূপে যারা প্রেরিত হবেন, তাঁদের ইংরাজীজ্ঞানের সঙ্গে স্বগভীর সংস্কৃতজ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড হতে লিখছেন—

—“একজন উত্তম ইংরাজী ও সংস্কৃত জানা সন্ন্যাসী এখানে আবশ্যক।”

—(পত্রাবলী ২য় : পৃ: ৬৮)

“প্রথমতঃ একরূপ লোক চাই, যাহার ইংরেজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ বোধ।”

—(পত্রাবলী ২য় : পৃ: ৬৮)

১৮৯৪-এর ৩০শে নভেম্বর মাদ্রাজবাসী জনৈক শিষ্যকে তিনি লিখছেন—

“খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর আর খুব সাধনভজনের অভ্যাস কর।—(পত্রাবলী ২য় : পৃঃ ৮৪)

স্বামীজী শিক্ষাবিস্তারে ধর্মপ্রচারকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর মতে ভারতের তথা এশিয়ার মূল স্বর হচ্ছে ধর্ম।—“The voice of Asia has been the voice of Religion, the voice of Europe is the voice of Politics.”

তিনি আরও বলেছেন—

“I do not mean to say that political and social improvements are not necessary ; but what I mean is this and I what you to bear it in mind, that they are secondary here, and that religion is primary.”

ভারতের ধর্ম সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত। তাই শিক্ষাবিস্তার তথা ধর্মপ্রচারে সংস্কৃত গ্রন্থাদির পঠন-পঠনের স্পষ্ট নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন। দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বলেছেন—

“—ভারতে যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক—প্রথমতঃ ধর্মপ্রচার আবশ্যক।...প্রথমতঃ আমাদের কাছে এই কার্যে মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের উপনিষদ, আমাদের পুরাণ, আমাদের অগ্ন্যগ্নি শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব মত্য নিহিত আছে, তাহা...সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে। যেন ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত মহাকাব্যের ধ্বনি উদ্ভব হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ গুনাইতে হইবে। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক বিজ্ঞা ও অগ্ন্যগ্নি বিজ্ঞা বাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আপনিই আসিবে। কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়া লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছি, ভারতে তোমাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে—লোকের হৃদয়ে উহা প্রভাব বিস্তার করিবে না। প্রথমে আত্মবিজ্ঞা প্রচার করিতে হইবে।” (শিক্ষাপ্রসঙ্গ পৃঃ ১৫৬-১৫৭)

মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সংস্কৃত শিক্ষার অপরিমিত প্রভাবের কথা তিনি ঘোষণা করেন। যে সব প্রবক্তা ভারতে সংস্কৃতকে বর্জন করে ধর্মপ্রচার করেছেন, কালক্রমে তাঁরা ব্যর্থ হ'য়ে গেছেন বলেই তাঁর ধারণা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

“সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা চলিবে। কারণ, সংস্কৃত শিক্ষায় সংস্কৃত শব্দগুলি উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব আসিবে। ভগবান রামাহুজ, চৈতন্য ও কবির ভারতের নিয়জাতিগণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্ভুত ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু, পরে তাঁহাদের কার্যের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, তাহারও নিশ্চিত কিছু কারণ আছে। তাঁহারা নিম্ন-জাতিসমূহের উন্নতি করিয়াছিলেন বটে, তাহার উন্নতিতর সর্বোচ্চ শিখরে আরুঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্বসাধারণের মধ্যে, সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের জন্ত শক্তিপ্রয়োগ করেন নাই। এমন কি, এত বড় যে বুদ্ধ, তিনিও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতবিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া এক বিষয় ভুল করিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তখন তখনি যাঁহাতে কর্মের ফললাভ হয়, তাহার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষানিবন্ধ ভাবসমূহ অল্পবাদ করিয়া তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে প্রচার করিয়াছিলেন।...কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে “গৌরববুদ্ধি” ও “সংস্কার” জন্মিল না। তোমরা জগৎকে কতকগুলি জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে উহার বিশেষ কল্যাণ হইবে না। ঐ জ্ঞান আমাদের মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই।” (ভারতে বিবেকানন্দ : ১৩শ সং-৩২২)

তিনি আরও বলেছেন—

“আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা। সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকিলেই ভারতে সমানভাজন হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না।” (শিক্ষাপ্রসঙ্গ—১৫৯)

সংস্কৃতকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত তৎকাল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ততোধিক গৌণ স্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে নেতিভাবপূর্ণ শ্রদ্ধাবিশ্বাসবর্জিত প্রচলিত শিক্ষার বিষময় ফল সম্বন্ধে দূরদর্শী স্বামীজীর উক্তি বর্তমান শিক্ষানায়কদের স্মরণ করতে অহরোধ করি।

“...বর্তমান শিক্ষায় আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে। আর এই দোষ এত বেশী যে, গুণভাগ ইহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথমতঃ, এই শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না। ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবাপন্ন। এইরূপ শিক্ষায়...

সব কিছু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যায়। তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্থ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন ‘না’ এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।

মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া সারাজীবন হজম হইল না—অসম্বন্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। ছেলেবেলা হইতে আমরা নেতিমূলক শিক্ষা পেয়ে এসেছি। আমরা কিছু নই—এ শিক্ষাই পাইয়া আসিয়াছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখনো জন্মিয়াছে, তাহা আমরা জানিতেই পাই না। Positive (অস্তিত্বাবপূর্ণ) কিছু শেখান হয়নি। হতে পারে ব্যবহারও জানিই না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে (শ্রদ্ধাবিশ্বাসবর্জিত) প্রায় সবই দোষ। কেবল চূড়ান্ত কেরাণিগড়া কল বইতো নয়। কেবল তাই হ’লেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধাবিশ্বাসবর্জিত হচ্ছে; গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে, বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে, তার নাড়ি নক্ষত্রের খবর আছে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক তিন পুরুষের নামও জানে না। তাইতো বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধাও নেই—আত্মপ্রত্যয় ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম।”

(শিক্ষাপ্রসঙ্গ, ৬২—৬৩)

সংস্কৃত উচ্চারণ ছিল তাঁর অতি বিশুদ্ধ এবং আবৃত্তি ছিল স্বমধুর। যথোপযুক্ত প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত-উদ্ধৃতি তাঁর বাকভঙ্গি ছিল অগ্ন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

“সে অপরাহ্নের পর আজ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং সেদিনকার কথোপকথনের একটু-আধটু মাত্র এখন মনে পড়িতেছে। কিন্তু, তিনি আমাদেরকে সেই বিষয়কর প্রতীচা স্মর সহযোগে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহা কখনো ভুলিবার নহে।”

(স্বামিজীর যে রূপ দেখিয়াছি—৫)

তাঁর জীবনের সঙ্গে সংস্কৃত এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল যে বাংলায় চিঠি লিখতে লিখতে অজানতেই কিছুটা অংশ সংস্কৃতই রচনা করে ফেলতেন আর বাংলার মতো তাঁর সেই সংস্কৃত ভাষাও হ’য়ে উঠতো অত্যন্ত ওজস্বী। চিকাগো হ’তে তিনি পত্রে একজনকে লিখেছেন—

“...এতে চটে যাওয়া ম-র ছেলেমানুষি। যাক্ উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং
ভবংসদৃশানাং মহাত্মনাম্। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ
তদ্ধৃদয়কধিরপোষিতাঃ ? অলোকসামান্যমচিন্ত্যাহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্রিতং
মহাত্মনাম্ ইত্যাদীনী সংসৃত্য ক্ষন্তব্যো’য়ং জ্ঞানঃ। প্রভুর ইচ্ছা—।

(পত্রাবলী, ২—৫—২৯)

তেমনি আর একটি পত্রে লিখলেন—

“...কার সাধ্য বাধা দেয় ? কুর্মস্তারকচর্চণং ; ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো
বলাৎ। কিং ভোন বিজনাশ্মান্-রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।...ডর ? কার ডর ?
কাদের ডর ?

ক্ষীণা স্ম দীন। সৰুপা জল্পন্তি মুঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যস্বিদন্ত অহহ দেহাদ্বাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যস্বিদন্ত চিত্তমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥
পীত্বা পীত্বা পরমমৃতং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকল কলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিক্তিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা গুরুবরপদং সৰ্বকল্যাণরূপম্
নত্বা নত্বা সকল ভুবনং পাতুমামশ্রায়মঃ ॥
প্রাপ্তং যদৈঃ স্বনাদিনিধনং যদোদধিং মণিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহর ত্রাসাদিদৈবকলম্।
পূর্ণং যত্ত, প্রাণসারৈ র্ভৌম নারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তুত্বং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ ॥ (পত্রাবলী, ২-৫৪)

দার্জিলিং হতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ লিখিত সংস্কৃত

পত্রটি বঙ্গাহুবাদ সমেত উদ্ধৃত করি। অত্যন্ত সয়ল, ওজস্বী অথচ সাহিত্য-
গুণমণ্ডিত ছিল তাঁর সংস্কৃতভাষা। তাঁর বিষয়বস্তুর গাভীর্য অথচ ভাষার সারল্য
শ্রীমৎ শংকরাচার্যের রচনাশৈলীকেই মনে করিয়ে দেয়।

দার্জিলিং

১৯শে মার্চ, ১৮৯৭

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শুভমস্তু। আশীর্বাদপ্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে।
পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিং স্তম্বতরম্। অচলগুরোহিমনিমণ্ডিত-
শিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মত্তে। শ্রমবোধোপি কথঞ্চিৎ
দ্রুতীভূতেত্যলুভবামি। যত্তে হৃদয়োদগেকরং মুমুক্শ্বং লিপিবদ্ধ্যা ব্যক্তিভং, তন্ময়া

অনুভূতং পূর্বম্ । তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মাণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি । “নাত্মা পন্থাঃ
 বিত্ততেহয়নায় ।” জলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্নাধিগতানামেকান্তক্ষয়ঃ
 কৃতাকৃতানাম্ । তদনু সহসৈব ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্ত সহ সমস্তবিষয়প্রাধান্যসৈঃ
 আগামিনী সা জীবনুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া । যাচে পুনস্তং
 লোকগুরুং মহাসমম্ময়াচার্য ১০৮ শ্রীরামকৃষ্ণম্ আবিস্তবিতুং তব হৃদয়োদ্দেশং যেন
 বৈ কৃতকৃতার্থত্বম্ আবিস্কৃতমহাশৌর্যঃ লোকান্ সমুদ্ধতুং মহামোহসাগরাং সমাগ
 যতিত্বসে । ভব চিরাদিষ্ঠিত ওজসি । বীরানামেব করতলগতা মুক্তির্নৈব
 কাপুরুষাণাম্ । হে বীরাঃ, বন্ধপরিকরাঃ ভবতঃ ; সম্মুখে শত্রবো মহামোহরূপাঃ ।
 ‘শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি’ ইতি নিশ্চিত্যেপি সমধিকতরং কুরুতযত্নম্ । পশ্যতঃ
 ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহস্তান্ । শূণ্যত অহো তেবাং হৃদয়ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং
 শোকনাদম্ । অগ্রগাঃ ভবত অগ্রগাঃ হে বীরাঃ ; মোচয়িতুং পাশং বন্ধানাম্
 স্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাম্ জ্যোতস্মিতুং হৃদয়ান্ধকূপম অজ্ঞানাম্ অভীরভীতি
 ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ । ভূয়াং স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বেষাং
 জগন্নিবাসিনামিতি ।

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ

(পত্রাবলী, ২—১০০)

[বঙ্গানুবাদ]

শুভ হউক । আশীর্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্বক পত্রখানি তোমায় স্মৃতি করুক ।
 এখন আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্বাপেক্ষা কিছুটা স্নেহ আছে । আমার
 মনে হয়, পর্বতরাজ হিমালয়ের হিম-রিমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবগণকেও
 সজীব করে তোলে । রাস্তার শ্রমও কথঞ্চিৎ লাঘব হয়েছে বলে মনে হয় ।
 লিখনভঙ্গিতে তোমার হৃদয়াদবেগকর যে মুমুক্শ্ব প্রকটিত হয়েছে, তা আমি
 পূর্বেই অনুভব করেছি । সেই মুমুক্শ্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্ম মনের একাগ্রতা
 এনে দেয় । মুক্তিলাভের আর অন্তপন্থা নেই । সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর
 বর্ধিত হোক, যতদিন না সমুদয় কর্মের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় । তারপরে তোমার
 হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা নষ্ট হয়ে
 যাবে । তোমার অনুরাগের দৃঢ়তার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে তোমার পরম
 কল্যাণসাধিকা সেই জীবনুক্তি অবস্থায় তুমি সত্বরই লাভ করবে । এখন সেই
 মহাসমম্ময়াচার্য ১০৮ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যে, তিনি যেন
 তোমার হৃদয়ে আবিস্কৃত হন । তার ফলে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহাশৌর্যশালী
 হয়ে মহামোহসাগর হতে মানুষকে উদ্ধার করতে সম্যক যত্নপরায়ণ হবে ।

চিরদিন তেজস্বী হও। মুক্তি বীরদেরই করতলগত, কাপুরুষের নয়। হে বীরগণ, বন্ধপরিষ্কার হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহু বিঘ্ন ঘটলেও তার জন্ত সমধিক যত্ন অবলম্বন কর। দেখ, জীবগণ মোহরূপ হান্সরের কবলে পড়ে কি রকম কষ্ট পাচ্ছে? অহো, তাদের হৃদয়ভেদকর কারুণ্যপূর্ণ আত্নানাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বন্ধদের পাণমোচন করতে, দরিদ্রের ক্লেশভার লঘু করতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্বিত দূর করতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ শুন বেদান্তদুন্দুভি ঘোষণা করছে—“ভয় নাই, ভয় নাই।” সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিলজগদ্বাসিগণের হৃদয়-গ্রন্থিভেদে সক্ষম হোক।

তোমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ

আলমোড়া হ’তে লিখিত তাঁর অপর একটি পত্রে সংস্কৃতের ক্লাসিকাল স্থপণ্ডিত ভাষ্যকারদের সমুন্নত রচনাশৈলী দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষার অনন্ত সমুদ্রে সুদক্ষ নাবিকের মতো তিনি তাঁর ভাবতরণীকে পরিচালিত করেছেন—

আলমোড়া

৩রা জুলাই, ১৮৯৭

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

যশস্বীর্য্যেণ ক্লতিনো বয়ঞ্চ ভুবনানি চ

রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বংস্বতন্ত্রমীশ্বরম্ ॥

প্রভবতি ভগবান্ বিধিরিত্যাগামিনাঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্ত্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয় প্রতিকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহ-নিবন্ধনঃ কলহ ইতি মন্ত্য যতস্বায়ুশ্চন্ শরচ্ছন্দ আক্রমিতুং জ্ঞানগিরিগুরোরগরিষ্ঠং শিখরম্। যদুক্তং ‘তদ্বনিকষগ্রাবাপিদিতি’ উচ্যেততদপি শতশঃ “তৎ তদ্বমসি” তদ্বাধিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। যন্ত্যাং কস্তাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তম্। অরোচিষ্কু অপি নির্দিশামি পদং প্রাচীনং—‘কালঃ কশ্চিং প্রতীক্ষ্যতাম্’ ইতি। সমারুঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্বাহিতো বেগঃ পারং নিশ্চ্যতি নাবম্। তদেবোক্তং—“তৎস্বয়ংযোগসংসিদ্ধঃ কালেনোদ্বিনি বিন্দতি।” “ন ধনে ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ” ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। অদ্বৈরাগ্যং বস্তৃশৃং বস্তৃভূতং বা প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোপি কীটভক্ষিতমস্তিক্বেণ বিনা; যত্বপরং তদেদম্ আপততি;—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনম্ অস্ত্রাস্রাং বস্ত্রনং, পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্ব্বেশ্বরস্ত ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নারহতি, সমষ্টিবিত্যেব গ্রহণীয়ম্।

আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতিনাপত্ততো পরন্তু সর্বগঃ সর্বাস্তব্ধ্যামী
 সর্বস্বাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সৰ্বেশ্বরঃ এব লক্ষ্যীকৃতঃ । স তু সমষ্টিরূপেণ সৰ্বেষাং
 প্রত্যক্ষঃ । এবং গতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদাভাবাং তয়োঃ সেবা প্রেম-
 রূপকৰ্মণোরভেদঃ । অয়মেব বিশেষঃ—জীবৈ জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা, সা
 দয়া, ন প্রেমং যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎপ্রেম । আত্মনা হি প্রেমাস্পদস্তং
 ঋতি-স্মৃতিপ্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ । তং যুক্তমেব যদবাদিং ভগবান্ চৈতন্যঃ—প্রেম
 ঈশ্বরে, দয়া জীবৈ ইতি । দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তো জীবেশ্বরয়োর্ভেদ
 বিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ । অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধিবুদ্ধনায় ইতি ।
 তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া । জীবৈ প্রযুক্তঃ দয়াশঙ্কোপি সাহসিকজন্মিত
 তু প্রেমানুভবং স্বানুভবং সর্বস্মিন্ ।

সৈব সর্ববৈষম্যাসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রপঞ্চবশস্তাব্যাক্রিতাপহরণকরী
 সর্ববস্ত্ত্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বান্তবিশ্বংসকরী আত্মকৃত্ত্বপৰ্য্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটন-
 করী প্রেমানুভূতিবৈরাগ্যরূপাভবতু তে শৰ্ম্মণে শৰ্ম্মন্ । ইত্যনুদ্বিবসং প্রার্থয়তি—
 অয়ি ধৃতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ”

(পত্রাবলী, ২—১১৮)

সংস্কৃতভাষায় নানা ছন্দে তিনি ভগবান পরমহংসদেবের বহু বন্দনা রচনা
 করেছেন । ভাব এবং ভাষায় সেগুলি অনবত্ত । প্রসঙ্গতঃ তার দুটি
 মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল ।—

“আচণ্ডলিপ্রতিহতরয়ো যস্ত প্রেমপ্রবাহো
 লোকাতীতোপ্যহং ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ।
 ত্রৈলোক্য’প্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
 ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥

স্তবীকৃতপ্রলয় কলিতর্ঘ্যহবোখং মহান্তং
 হিঙ্গ্বা রাজিৎ প্রকৃতি সহজামন্ধতামিশ্রামিশ্রাম্ ।
 গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগজ্জ
 সো’য়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্বিদানীম্ ॥”

এই মহামনীষী যুগন্ধর সন্ন্যাসীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর প্রচারিত
 ভাবাদর্শের বাস্তব রূপায়ণে দেশবাসী, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিমণ্ডলী ও
 সরকার যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ ক’রে চলেছেন । এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন

ভারতে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে স্বামীজীর সংস্কৃত বিষয়ক বাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার এখনো কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়নি। আশ্রমের অঙ্গনে শিল্প বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চললেও সেই অল্পপাতে সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা জানিনা। আশ্রমের মহাবিদ্যালয়গুলিতে অন্ততঃ কলাবিভাগে হ'লেও সংস্কৃত অবগুপাঠ্য হয়েছে কিনা এখনো শুনিনি। দেশের শিক্ষানায়কদের সংস্কৃত বিষয়ে “অ্যালার্জি” দর্শনে স্বামীজীর বিদেহী আত্মা আজ বিষন্ন বলেই মনে হয়। ভারতাত্মার মূর্তিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের গৌরবময় উত্তরাধিকারকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হ'লে ভারতীয় সংস্কৃতির ধাত্রী সংস্কৃত ভাষাকেও আমাদের জীবনে সাদরে বরণ করা প্রয়োজন। এই সত্যটিকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করার কথা আজ যেন আমরা বিস্মৃত না হই!— এই প্রার্থনা। মহাপুরুষকে বিকৃতভাবে প্রচার ক'রে তাঁর আদর্শের অঙ্গহানি ঘটিয়ে আমরা যেন পাপাচরণে বিরত হই—এই কামনা। “ওঁ ন নো বুধ্যা শুভয়া সংযুক্তু।”

দেশপ্রেমের প্রমাণ দেবার

সময় এসেছে আজ,

স্বদেশরক্ষা পণ করে

সবাই করুন কাজ।

॥ বেঙ্গলের বই মানেই সেবা লেখকের শ্রেষ্ঠ বই ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চাঁপাডাঙ্গার বউ



ধাত্রী দেবতা

৫ম মুঃ ৩০০ ॥

৯ম মুঃ ৮০০ ॥

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা

৭ম মুঃ ৮০০ ॥

মনোজ বসুর

সমরেশ বসুর

বৃষ্টি, বৃষ্টি !

বি. টি. রোডের ধারে

৩য় মুঃ ৬০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩০০ ॥

শত্রুপক্ষের মেয়ে

শ্রীমতী কাফে

৫ম মুঃ ৪০০ ॥

২য় মুঃ ৬০০ ॥

সতীনাথ ভাট্টাচার্য

বনফুলের

সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী

জঙ্গম ১ম (৭ম মুঃ) ৫০০ ॥

৩য় মুঃ ৩৫০ ॥

২য় (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪৫০ ॥

৩য় (৫ম মুঃ) ৭৫০ ॥

সংকট ২য় মুঃ ৩৫০ ॥

মানদণ্ড ৪র্থ মুঃ ৪৫০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

সৈয়দ মুজ্জতবা আলীর

শিলালিপি ৫ম মুঃ ৬৫০ ॥

চতুরঙ্গ ৩য় মুঃ ৪৫০ ॥

অসিধারা ৩য় মুঃ ৩৫০ ॥

অবিশ্বাস্য ৯ম মুঃ ৩০০ ॥

বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের

হুমায়ুন কবিরের

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

২য় মুঃ ৭৫০ ॥

৩য় মুঃ ৩৫০ ॥

আনন্দকিশোর মুন্সীর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

রাঘব বোয়াল ৩০০ ॥

আয়ুর্বেদ সংক্ষেপে ২০০ ॥

রমাপদ চৌধুরীর

স্ববোধ ঘোষের

মুক্তবন্ধ ৩০০ ॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য় মুঃ ৫০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

বিবেকানন্দের সাহিত্যসাধনা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি, তিরোভাব ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ জুলাই। উনচল্লিশ বৎসর পরমায়ুর প্যাডস্টোন ব্যাগের মধ্যে আশী বৎসরের কর্মজীবন ঠেসে ভরে দিয়ে স্বামীজী দ্রুত ছুটে চলে গিয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ত পরমায়ুর মধ্যে তাঁকে অনেক কাজ করতে হয়েছে। হিন্দু ধর্ম ও সাধনাকে পূর্ণগৌরবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। খুব সম্ভবত তিনিই একমাত্র সন্ন্যাসী যিনি বৈরাগ্যসাধনে মুক্তিসন্ধান করেন নি। স্বামীজীর বিদেশী জীবনীকার শ্রীমতী লুই বার্ক বিবেকানন্দের জীবনের অদম্য তারুণ্যের উল্লেখ করে লিখেছেন,

“স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর কথা যখন আমরা স্মরণ করি, পাত্রী প্রভৃতিকে কি রকম কঠোর ধাক্কা তিনি দিতে পারেন তা যখন মনে পড়ে, প্রচণ্ড বাধা ও ঈর্ষাতাড়িত বিরোধিতার মধ্য দিয়ে কী অদম্য তেজে ও রাজকীয় মহিমায় আমেরিকায় তিনি বিচরণ করেছেন তা যখন চিন্তা করি, যখন ভাবি ধ্যানের নীরব অসীমে তিনি কিভাবে তলিয়ে যেতেন ক্ষণে ক্ষণে, তখন ভুলে যাই, সকলেই ভুলে যায়—তিনি কত তরুণ ছিলেন, সমুদ্রে হাঁসের মত ডুব দিতে বা প্রিয়পাত্রদের মধ্যে প্রাণ খুলে হাসতে তিনি কত ভালবাসতেন! তিরিশের কোঠার একেবারে তলার দিকে তাঁর বয়স ছিল বলেই যে তিনি এমন করতেন তা নয়। আরও কারণ, তিনি অসীমের সীমায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখানে জগজ্জননীর নিত্য উৎসব। স্বামীজী গভীরভাবে নিত্যভাবে তরুণ।”

স্বামী বিবেকানন্দের সকল কর্মসাধনায় এই নিত্য তারুণ্য অনিবার্হভাবে বর্তমান। কলকাতার উত্তরাঞ্চলে সিমলা-পল্লীর প্রসিদ্ধ দত্তপরিবারে নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনের বিবেকানন্দের বীজ এখানেই উদ্ভূত হয়েছিল। স্বামীজী নিজেও তা স্বীকার করেছেন। আমেরিকা বিজয়-অন্তে কলকাতার সংবর্ধনা-সভায় তিনি তরুণদের উদ্দেশে বললেন, “আমি কলকাতারই ছেলে। এখানকার যে ধূলোয় বসে বসে খেলেছি আমি, তার ওপর বসেই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

কলকাতার ছেলে কলকাতার ভাষাতেই কথা বলতে চেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই বাসনা তাঁর সকল বাংলা রচনার মূলে বর্তমান। দুঃখের

বিষয়, তাঁর বাংলা রচনার পরিমাণ বেশী নয়। ‘বর্তমান ভারত’, ‘পরিব্রাজক’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘ভাববার কথা’, কিছু বাংলা চিঠি ও বাংলা কবিতা—এই তাঁর বাংলা রচনা। ইংরেজিতেই তিনি বেশী লিখেছেন ও বক্তৃতা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে সাহিত্যসাধনার স্থান বিশেষ ছিল না। তিনি সচেতনভাবে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন নি, সাহিত্যিক-ব্রতও তাঁর ছিল না। তথাপি বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

যতদূর জানা যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যের ওজস্বিতা ও ধ্বনি-গাঙ্গীর্ষ্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের শব্দচাতুর্য ও লঘুতার তিনি বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কোনো বক্তব্য আমার চোখে পড়ে নি।

বিবেকানন্দ যখন লিখতে বা বক্তৃতা দিতে শুরু করেন, তখন বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একচ্ছত্র প্রভাপ। বিদ্যাসাগর-পরবর্তী বাংলা গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে চালিত হয়েছিল। বঙ্কিম-অনুবর্তীরাই গত শতকের শেষপাদে সাহিত্যের আসর জুড়ে ছিলেন। কাব্যক্ষেত্রে হেম-নবীনের জয়জয়কার। শতকের শেষ দশকে কবি রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ধীরে ধীরে স্বীকৃত হতে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গদ্য রচনা ও কবিতায় কি বঙ্কিমচন্দ্র কি হেম-নবীন, কাকুর দ্বারাই প্রভাবিত হন নি।

কলকাতার সিমলে-পাড়ার ছেলে নরেন্দ্রনাথ স্থানীয় উপভাষার ভক্ত ছিলেন। তাঁর সকল বাংলা রচনা ও ভাষণে উপভাষার প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। খাটি কলকাতাই ভাষা বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠাভূমি।

ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীর সচেতন চিন্তার একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় ‘ভাববার কথা’ গ্রন্থে [১৩১৪]। স্বামী লিখেছেন :

“চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি—কিছুতকিমাকার—উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও সকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? ‘স্বাভাবিক’ যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে

উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন শাফ্ ইম্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা হচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাইলঙ্গরি চাল—ঐ একচাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।” [১৯০০ খৃষ্টাব্দে উদ্বোধন-সম্পাদককে লিখিত]।

বাংলা গল্পের মুক্তি কোন্ পথে—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ গত শতকেই দিয়ে গিয়েছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের গুরুচণ্ডালী আলালী ভাষার আন্দোলন (১৮৫৮) বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়ে যায়। তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহের হতোমী ভাষা (১৮৬২)। লোকমুখের ভাষাকে কালীপ্রসন্ন গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা সার্থক অহুসরণের মধ্য দিয়ে বিচিত্র ফলদান করেছে। যে ভাষারীতি হতোমে, তারই পরবর্তী রূপ বিবেকানন্দের গল্পরীতি। সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপে ও ব্রহ্মবাক্য উপাখ্যায়ের সাংবাদিক-রচনায় তার সার্থক অহুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যোগেশ বিজ্ঞানিধি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এই ভাষারীতি বিচিত্র ফল প্রসব করেছে। এই সব রচনার ভিত্তিভূমি “কলকাতার ভাষা”।

এঁদের পরে—আগে নয়—প্রমথ চৌধুরী তাঁর সবুজপত্র (১৯১৪ খৃঃ) চলতি ভাষার সপক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু তাঁর বীরবলী ভাষা—সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হয়—কৃত্রিম শিষ্ট অতিমার্জিত বিদগ্ধ নাগরিক ভাষা। তা লোকমুখের ভাষা নয়।

কলকাতার লোকের নিত্য-ব্যবহার্য ভাষায় যে অফুরান্ প্রাণশক্তি নিহিত রয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ তাকেই আবিষ্কার করেছিলেন। একদিকে তিনি তমসাবৃত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলেছেন, অপরদিকে লোকমুখের ভাষাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাস করতেন না যেমন তাঁর বিশ্বাস

ছিল না সন্ন্যাসীর স্বার্থপর মুক্তিসাধনায়। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-হিতৈষণা তাঁর সকল কর্মের মূলে। তাঁর সাহিত্যসাধনায় মূল একই মনোভাব বর্তমান।

বিবেকানন্দের গল্পরচনার চাল কেবল লঘু নয়, প্রয়োজনমত তা গুরুচিন্তার ভারবহনেও সক্ষম। বস্তুত যে কোনো গল্পভাবার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় তার ক্ষিপ্ততা, নমনীয়তা, গুরুভারবহন ক্ষমতা ও ধাবৎশক্তির দ্বারা। বিবেকানন্দের গল্পরীতি এই বিচারে সার্থক গল্পরীতি।

‘বর্তমান ভারত’ গ্রন্থের গল্প এবং ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘পরিব্রাজক’, ‘ভাববার কথা’ গ্রন্থত্রয়ের গল্পের এক জাতীয় নয়। ‘বর্তমান ভারত’-এ সমাসবন্ধ পদের ভূরি প্রয়োগ, ক্রিয়াপদের যথাসম্ভব বর্জন, সূত্রাকারে সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা, স্বল্লাক্ষরে গ্রথিত বাক্যবন্ধ লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হৃদমনীয় গতিবেগ। রচনার অন্তরালে যে বজ্রবিদ্যাময় পুরুষসত্তা বর্তমান এই ভাষা তাঁরই পরিচায়ক। এই ভাষারীতি অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ, নিপুণ বিশ্লেষণে প্রথর, রচনাকারের দিব্যদৃষ্টিতে উজ্জল। ‘বর্তমান ভারত’-এর নিম্নস্থত অংশটি এই মতের পোষকতা করে :

“একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি সংগ্রহরূপ প্রমাণবাহন, শত সূর্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতিপ্ৰভা, অপরদিকে স্বদেশী-বিদেশী বহু মনীষী উদ্যোগিত যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্তসঞ্চারী, বলদ, আশাশ্রদ্ধ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবতুল্য অধ্যাত্মকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়স্থখ, বিজাতীয় ভাষার মহা কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপর দিকে এই মহা কোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে, পূর্বপুরুষদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবকুল, কাষায়, কোপীন, সমাধি, আত্মহুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্থ সমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষয় সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিত্ত, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।”

এই বিদ্যাময়ী ভাষা আবেগানুভূতির চরম শিখরকে স্পর্শ করেছে পরবর্তী

অংশে—মনে হয় কষুকণ্ঠে স্বামীজী ডাক দিয়েছেন—সমস্ত ভারতবর্ষের গিরিকন্দরে প্রান্তরে নদীমুখে সাগরমোহানায় তা প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশজোড়া স্বগম্ভীর ধ্বনি জাগিয়ে তুলেছে :

“হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্ত্র উমানাথ সর্বভাগী শংকর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়স্থখের—নিজের ব্যক্তিগত স্থখের জ্ঞান নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই ‘মারে’র জ্ঞান বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র ; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।”

এই অংশের ছন্দোপ্পন্দন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই নিয়মিত ছন্দোপ্পন্দনযুক্ত বিবেক-বাণী আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করে তা বাক্যপথাভীত। তবু স্বামীজীর ছন্দের কারণ কত নিখুঁত, শিল্পচেতনা কত গভীর, পদাঙ্ক ও বাক্যবিভাগ কত ছন্দোময়, তার প্রশংসা এখানেই পাই।

স্থখের বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ ছন্দমোহে আবদ্ধ হন নি। মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ পতিত পীড়িত ভারতবাসীর, সেবক বিবেকানন্দের ভাষা তাদের কাছাকাছি এসেছিল। ‘ভাব্‌বার কথা’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থে চর্চা ভাষার প্রাণশক্তি মুক্তিলাভ করেছে। লঘু চালের গল্পরীতি প্রাণচঞ্চল অথচ ওজস্বিনী হতে পারে, তার পরিচয় এইসব রচনায় পাই।

স্বামীজীর উচ্ছল তারুণ্যের ঢেউ লেগেছে তাঁর গল্পভাষায়। ‘পরিব্রাজক’ গ্রন্থের নিম্নস্থ অংশে যৌবনচঞ্চল আত্মপ্রত্যয়ী আনন্দময় লেখকের সার্থক পরিচয় বিদ্যুৎ হয়েছে :

“আর্থ-বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতেয় গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর আর যতই কেন তোমরা ভ্রম্‌ম্‌ বলে ডম্‌ফই কর, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি !! যাদের চলমাশ শ্মশান বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতের যা কিছু বর্তমান জীবন আছে তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্ছ তোমরা।.....এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মক্ক-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা ! তোমরা ভূত কাল,

লুণ্ড্, লুণ্ড্, লিট্ সব একসঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখ্‌চি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণজনিত দুঃস্থপ্ন। ভবিষ্যতে তোমরা শূণ্ণ, তোমরা ইং লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেবী কর্‌চ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল-কূল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?.....তোমরা শূণ্ণে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাস্কল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে। জেলে, মালা, মুচি, মেথরের রুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উল্লনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাই পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে ছুনিয়া উটে দিতে পারে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি, ফেলে দাও, এদের মধ্যে যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও। কেবল কান খাড়া করে রেখো; তোমার ঘাই বিলীন হওয়া অমনি শুনবে কোটি জীমূতশুদ্ধী ত্রৈলোক্যকম্পকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি, ওয়াহ্ গুরুজীকে ফতে!”

এই গদ্যাংশ পড়লে আমরা চোখের সামনে প্রাণচঞ্চল আত্মপ্রত্যয়ী বলিষ্ঠ তরুণ বিবেকানন্দকে দেখতে পাই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সহজ অধিকার, তত্ত্ব ও তৎসম শব্দের সচ্ছন্দ ব্যবহার, চল্‌তি বুলি ও প্রবচনের অবাধ প্রয়োগ, কথ্য-ভঙ্গীর উপর সহজ অধিকার—সবটা মিলিয়ে এক গছুরীতি। তা সজীব, স্বতঃস্ফূর্ত, ধাবৎশক্তিসম্পন্ন এবং আবেগস্পন্দিত। ‘বহজনমুখায় বহজনহিতায়’ স্বামীজী তাঁর কর্মসাধনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। গছুরচনাতেও সেই দৃষ্টিই বর্তমান, তিনি সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষের জগ্‌তে লিখেছেন।

তাঁর পত্রাবলীতে ও ‘পরিব্রাজক’ ভ্রমণ-গ্রন্থে স্বামীজী বহু চল্‌তি বুলি ও প্রবচন ব্যবহার করেছেন, যথা—হালে পানি পাওয়া, কিস্তি বানচাল, মোন্দা কথা, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, ওহলপাছল, টালমাটাল, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, গদাই লক্ষরী চাল, বেকোমো (imbecility), গুপ্তির পিণ্ডি,

আটকুড়ির বেটা, চেন্সরামো, কচুপোড়া খাও, উড়ধামারা। চলতি বাংলার শব্দসম্পদ সম্পর্কে স্বামীজীর সচেতনতা, এই সব বুলি ও ব্যবহারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্যাসী-ভ্রাতাদের কাছে লিখিত এক পত্রের খানিকটা উদ্ধৃতি করছি :

“Idea ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম হবে। নইলে চিং হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। Independent, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ—অমুক তত্ত্বের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি ? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোড়-তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি কাজ করে দেখাতে পারিস, যদি এক বৎসরের মধ্যে ছু চার লাখ চেলা ভারতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিস। তবেই বুদ্ধি।

সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোকরা মাথা মুড়িয়ে রামেশ্বর যায়, সে বলে আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য!! না দেখা, না শোনা—একি চেন্সরামো নাকি ? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোন কাজ হয় না—ছেলেখেলা নাকি ? উড়ধামারা আমি শিষ্য—কচুপোড়া খাও ! সে ছোড়াটা যদি দস্তুর মত পথে না চলে, দূর করে দেবে। গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্টে আসে, আবার তাঁর শিষ্টে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য—একি ছেলেখেলা নাকি ? আমাকে জগমোহন বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরুভাই, আমি এখন ঠাউরে ধরেছি, এই ছোকরা। গুরুভাই কিরে ?.....হাঁ, চেলা বলতে লজ্জা করে ! একদম গুরু বনবে ! দূর করে দিও যদি দস্তুর মত পথে না চলে।”

অন্তরঙ্গ পত্রভাষণে স্বামীজীর যে মূর্তি, বহির্ভাষণে ও রচনায় সেই একই মূর্তি। সেই উচ্ছল প্রাণচঞ্চল হৃদমনীয় তারুণ্য। বিবেকানন্দের বাংলা রচনা সেই তারুণ্যেরই প্রতিবিম্ব। তাঁর অজ্ঞাতেই তিনি বাংলা গণ আন্দোলনের এক শক্তিশালী আন্দোলনের শরিক হয়ে গেলেন। লোকমুখের ভাষাকে সাহিত্যের শিরোপা দিলেন। এই লোক যেমন ঘরোয়া, এই স্বামীজীও তেমন অন্তরঙ্গ। তিনি আমাদেরই লোক,* এই কলকাতার ছেলে, কলকাতার ধুলোয় বসে, ‘কলকাতার ভাষা’তেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, এর চেয়ে আনন্দ আর কি হতে পারে ! বাংলা-গণের পক্ষে পরম লাভ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করে এসে কলকাতার ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অপর পরিচয়, তিনি কবি। সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজীতে রচিত কবিতার সংকলন 'বীরবাণী'। 'বর্তমান ভারত'-এর আবেগধর্মী গানের ছন্দস্পন্দনে যে কবিস্বভাব লক্ষ্য করা যায়, তা কবিতায় পূর্ণভাবে বিকশিত। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কবিতায় কাব্যরস অপেক্ষা তত্ত্ববস্তুই প্রাধান্য লাভ করবে, কলাটেকবল্যবাদের মুক্তি বা রোমান্টিক কাব্যবিলাস তাতে থাকবে না, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কয়েকটি বাংলা কবিতা, কাব্যরসহীন নয়। যদি গভীর আন্তরিকতা ও আবেগস্পন্দন উচ্চতর কবিতায় মানদণ্ড হয় তবে স্বীকার করতেই হবে স্বামী বিবেকানন্দও কবি। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বভাবে কবি, শিষ্টও স্বভাবে কবি।

রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দ কবি কোন্ অর্থে? শাস্ত্র বলেছেন, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ। কবি হচ্ছেন বেদবিৎ, বিপশিৎ, কোবিদ। কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী, যিনি শেষ পর্যন্ত দেখেন, প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করেও দেখেন। কবির আর এক অর্থ সবিভা অর্থাৎ রচয়িতা, জনয়িতা—যার থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম, সমস্ত কিছুর যাত্রা, সমস্ত কিছুর ভূমিকা। তাই আদিকবি ঈশ্বর। রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ এই অর্থেই কবি।

রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় উক্তি—‘আমাকে রসে-বশে রাখিস মা ; আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস্ নে।’ এই হ’ল নিত্যকালের কবির প্রার্থনা। স্বামী বিবেকানন্দেরও একই প্রার্থনা : ‘আমি শান্ত মায়ের ছেলে। মা জগদম্বা, হে গুরুদেব। তুমি চিরকাল বলতে ‘এ বীর’।’ তাঁর বিখ্যাত ইংরাজি কবিতা *Kali the Mother* সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘মৃত্যুরূপা মাতা’ নামে অনূদিত করেছিলেন। স্মীরভবানীতে রচিত এই কবিতা রচনার যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় স্বামীজী পায়চারি করতে করতে বলেছিলেন, ‘আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি। বর্ষে বর্ষে সত্য এ কথা। নিজের চোখে দেখেছি মৃত্যুরূপাকে।’ তাই তিনি লিখলেন,

Come, Mother, come !
For Terror is Thy name !
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e’er
Thou Times, the all-Destroyer !
Come, O Mother, come !

মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !

করালী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;

তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে ।

কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে ।

এই মৃত্যুভাবনা যদি কাব্যভাবনা না হয়, তবে কাব্যভাবনা কী, তা জানি না ।

কবিতা যদি হয় একটা প্রকাশ, অনাবরণ, প্রস্ফুটন, তবে এই 'ত' কবিতা ।

কবি শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত শিষ্য কবি শ্রীবিবেকানন্দ ।

স্বামী বিবেকানন্দের গুটি-দশেক বাংলা কবিতা পাওয়া যায় । সেগুলিতে কবিস্বরূপের এই পরিচয় প্রকাশিত ।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায় ।

নিরঞ্জন, নররূপধর নিগুণ গুণময় ॥

['শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাট্রিক']

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি ।

যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি ॥

উর্ধ্ব জলন্ত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল ।

সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী ॥ ['শিব-সঙ্গীত']

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সূন্দর

ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ।

অস্ফুট মন-আকাশে জগতসংসার ভাসে,

ওঠে ভাসে ভোবে পুনঃ অহং-শ্রোতে নিরন্তর ॥

['প্রলয় বা গভীর সমাধি']

এই সব কবিতাংশের ছন্দোন্নৈপুণ্য, ভাবগাম্ভীর্য ও প্রকাশচাকুরতা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না । স্বামীজীর প্রিয় কবি মধুসূদনের ওজস্বিতা, হেমচন্দ্রের ভাব-সমৃদ্ধি ও গিরিশচন্দ্রের মুক্তছন্দের প্রভাবে এগুলিতে অস্পষ্ট নয় । তবু একথা সত্য যে, কবি বিবেকানন্দের বিশিষ্ট পরিচয় এগুলিতে বর্তমান ।

স্বামীজীর জীবনদর্শন কাব্যরূপ লাভ করেছে দুটি অনতিক্ষুদ্র কবিতায় ।

'সখার প্রতি' ও 'নাচুক তাহাতে শ্রামা' কবিতা-দুটির আন্তরিকতা মুহূর্তমধ্যে পাঠকচিহ্নকে স্পর্শ করে । 'সখার প্রতি' কবিতাটি স্বামীজীর আত্মপরিচায়ক কবিতা । জানিনা তিনি তাঁর প্রিয় কবি মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ'-এর দ্বারা

উদ্বোধিত হয়েছিলেন কিনা। হয়ত এ অল্পমান ভ্রান্ত, কেননা মধুসূদনের ‘আত্মবিলাপ’ রোমান্টিক আত্মবিলাপ, ব্যর্থ জীবনের হাহাকার ধ্বনিতে তা সমাপ্ত, আর ‘সখার প্রতি’ আত্মপ্রত্যয়ী মুক্তিসন্ধানীর দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত। কবি বিবেকানন্দ এখানে আমাদের আহ্বান করে বলেছেন :

ছাড় বিদ্যা জপ-যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম হে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম,—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটধর্ম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়।
হে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।.....
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥

এই কবিতার অন্তিম শ্লোকটি প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে। কবিতার যে চরম লক্ষ্য, বহু মানবের কণ্ঠে অগণিত আবৃত্তি, সেই তুল্লভ সৌভাগ্য লাভ করে এই শ্লোক তর্কাকীত সফলতা লাভ করেছে।

আর ‘নাচুক তাহাতে শ্রামা’ কবিতাটিতে স্বামীজীর জীবনদর্শন কাব্যরসে সিন্ধু হয়ে সার্থকতায় উপনীত হয়েছে। ললিত মধুর, রূঢ় কঠোর, বিষম ভাবরাজির সমাবেশে এই কবিতা ললিত-কঠোর রূপ লাভ করেছে। মৃত্যুরূপা কালীকে কবি এখানে বন্দনা করেছেন : ‘সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ায় ছায়া।’ বাঙালীকে ও বাংলা কাব্যকে কবি ললিত মধুর তান থেকে রুদ্র বিষাণধ্বনির দিকে আকর্ষণ করেছেন। বিবেকানন্দের সকল সাধনার মূলমন্ত্র—হও আগুয়ান—এই কবিতার ছন্দে স্পন্দিত হয়েছে। কর্মী বিবেকানন্দ ও কবি বিবেকানন্দ এখানে মিলিত হয়ে কণ্ঠকণ্ঠে আমাদের ডাক দিয়েছেন :

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
ছুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তার প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ কর স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্রামা ॥

বীর্ষসাধনায়, মহুগুপ্তসাধনায়, সত্যসাধনায় কবি বিবেকানন্দ আমাদের ডাক দিয়েছেন। শব্দের মধ্যে যিনি প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন, ছন্দের মধ্যে তড়িৎশক্তি, বাক্যের মধ্যে বিদ্যুন্ময়ীবাণী, তিনিই কবি। স্বামী বিবেকানন্দ সেই অর্থেই কবি, মনীষী ও স্রষ্টা। রম্য রচনার কথায়, ‘সঙ্গীতের মতো তাঁর কথাগুলি, বীঠোফেনের মতো তাঁর রচনা, হেঙুলের ঐকতানের মতো তাঁর উদ্দীপ্ত ছন্দ।’ তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনা : বিবেকানন্দ

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

মহৎ ব্যক্তিত্বের পরিচয় তাঁর মানসিক ও আত্মিক সম্প্রসারণে। সে সম্প্রসারিত আত্মিক শক্তির সাহায্যে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তিনি যেমন অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করেন তেমনি গড়ে তোলেন প্রচুর সম্ভাবনাময় একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংঘাতময় ধর্মভাবনার ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের স্বার্থ স্থান নির্ণয় করতে হলে আমাদের উক্ত সত্যটি মনে রাখা দরকার। মনে রাখা দরকার শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের ধর্মচেতনায় যে উদার মানবিকতার স্রস্র ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল বহু আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে স্রস্রই একটি স্রস্রমগ্ন স্রস্রের পরিণতি লাভ করে বিবেকানন্দের ধর্মভাবনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনার সে বিবর্তন ও সমন্বয়ের ইতিহাস বড়ই জটিল। বর্তমান আলোচনার সীমাবদ্ধ পরিসরে সে ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব। শুধু একটা রূপরেখা অঙ্কনই ঐ প্রয়াসের মুখ্য লক্ষ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনার ইতিহাস সংস্কার ও সমন্বয়ের ইতিহাস। পূর্ব শতাব্দীর সর্বপ্রকার সংস্কারাঙ্কতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন প্রথমে মনীষী রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের নব-উপলব্ধ ধর্মচেতনাকে নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাসমত একটি সংস্কার-আন্দোলনে রূপ দেবার চেষ্টা করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার দেবেন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র সেন। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র প্রথমে রামমোহনের অনুগামী হলেও শেষ পর্যন্ত স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ এবং স্বাধীন কর্মপন্থা গ্রহণ করায় ভাবগুরু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মর্মাস্তিক বিচ্ছেদ ঘটে। বস্তুত ধর্মোপলব্ধির জগতে কেশবচন্দ্রের নবতর আদর্শ অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনের পরিণতি ঘটে এবং সমন্বয়ী ভাবধারার সূত্রপাত হয়। কেশবচন্দ্রে যে সমন্বয়ী নতুন চিন্তার সূত্রপাত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে তার বিকাশ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শতাব্দীর শুরু হল রামমোহনের বিদ্রোহী ধর্মভাবনায় বহু দিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, তা অবশেষে স্থিতিলাভ করল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তায়। এ আবর্তনশূল ধর্মভাবনার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট স্থান কি এখন তাই হবে আমাদের আলোচ্য।

রামমোহনের যে নবীন ধর্মচিন্তার আঘাতে সে যুগের বাঙালী অকস্মাৎ চকিত হয়ে উঠেছিল তার পরিপূর্ণ রূপ কী, একথা আজ নিশ্চিত করে বলা শক্ত। এর কারণ, যে সমস্ত ধর্মালোচনামূলক পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থে রামমোহন তাঁর নব-উপলব্ধ ধর্মমতকে প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার অধিকাংশ আজ বিশ্ব্তির অতলে হারিয়ে গেছে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে পর্যন্ত রামমোহনের ধর্মজীবনে যে অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায় তাকে বলা চলে অল্পসঙ্কানের যুগ। এ সত্যাপ্রসঙ্গ সর্বপ্রথমে তাঁকে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। চেতন। যেখানে বিদ্রোহী আঘাত করবার ইচ্ছা সেখানে স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধকে আঘাত করবার ইচ্ছা জাগল রামমোহনের মনে সে শতাব্দীরই শেষভাগে যখন তিনি বোল বৎসরের যুবক মাত্র। ঐক্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের আবহাওয়ায় বর্ধিত রামমোহন সে সময় হিন্দুর পৌত্তলিক ধর্মকে আঘাত এবং ইসলামের একেশ্বরবাদকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে একখানি পুস্তিকা রচনা করলেন। ইসলামের প্রভাবে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠা করবার জ্ঞান তিনি এ সময় এত ব্যগ্র হয়ে পড়েন যে ১৮০৩ বা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফার্সী ভাষাতেই একখানি গ্রন্থ রচনা করে বসেন। এ সমস্ত গ্রন্থে রামমোহনের পরবর্তীকালের দার্শনিক ভাবনা নেই। আছে বহুকাল প্রচলিত হিন্দুর ধর্মসংস্কারের প্রতি একটি সংশয়ী মনোভাব। সংশয় শূণ্যতাবোধী সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সংশয়ের মধ্য দিয়েই মানুষ উপনীত হয় পরিপূর্ণ সত্যোপলব্ধির রাজ্যে।

যে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস বহুকাল যাবৎ হিন্দুর ধর্মবোধের প্রধান অঙ্গ ছিল তার বিরুদ্ধে রামমোহনের এ বিদ্রোহ কেন? রামমোহন মনে করতেন বিভিন্ন প্রতীকোপাসনার মধ্য দিয়ে হিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের এ বিভিন্নতা হিন্দু জাতির মধ্যে এনে দিয়েছে চরম অর্নৈক্য যার অবশুস্তাবী পরিণতি ভারতবাসীর সমকালীন দুর্বস্থা। রামমোহন সেজ্ঞ অল্পভব করলেন অন্ততঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধালাভের জ্ঞান হলেও ভারতবর্ষে সার্বভৌম একটি ধর্মমত প্রতিষ্ঠার দরকার। কর্মজীবনে মিঃ ডিগবীর সাহচর্যে এসে ইংরেজী শিক্ষায় ব্যাপ্ত হবার পর রামমোহন যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন তখন লোকশ্রেণ্যের আদর্শকেই ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে মনে হল তাঁর।

এ তো গেল ধর্মের প্রকৃত রূপসঙ্কানে রামমোহনের পরাশ্রয়-প্রয়াস।

ভারপর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার পর শুরু হল তাঁর ব্যাপকতর ধর্মাম্বুসন্ধান। শাক্তর বেদান্তের অদ্বৈতবাদের মধ্যে খুঁজে পেলেন তিনি বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত ধর্মাদর্শকে। “বেদান্ত প্রতিপাত্ত সত্য-ধর্ম”ই হল তখন থেকে তাঁর উপাস্ত বস্তু। ব্রহ্ম সম্পর্কীয় এ সত্যধর্মের আলোচনা গবেষণার জন্ত ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলেন তিনি ‘আত্মীয় সভা’। এরপর রামমোহনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল খৃষ্ট ধর্মের সহজ আবেদনের দিকে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের উক্তি সংকলন করে প্রকাশ করলেন তিনি— “The Precepts of Jesus.” ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় আদর্শে উপাসনার জন্ত স্থাপন করলেন তিনি ইউনিটারিয়ান সোসাইটি। এ সোসাইটিতে উপাসনা জনপ্রিয় না হওয়ায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলেন তিনি ‘ব্রহ্মসভা’। রামমোহনের এ ‘ব্রহ্মসভা’র দ্বার উন্মুক্ত ছিল হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মাবলম্বী লোকের জন্ত।

তাহলে দেখা গেল রামমোহনের ধর্মচেতনা বিকাশের পথ খুঁজছিল জগতের মুখ্য ধর্মসমূহের সারসংকলনের মধ্য দিয়ে। প্রথর যুক্তি ও মনীষার সাহায্যে সমকালীন কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে ধর্মকে তিনি একটি সার্বজনীন ও যুগোপযোগী রূপ দিতে সক্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মসংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল লোকহিত। এ লোকশ্রেয়ের প্রেরণায় ‘বেদান্ত প্রতিপাত্ত সত্যধর্ম’ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শঙ্করের মায়াবাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। নানা বর্ণ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত পরস্পর-বিবদমান দেশবাসীর মনকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে সকলের সামনে তুলে ধরলেন তিনি নিগুণ পরমব্রহ্মের ধারণা। সমকালীন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ প্রভাবিত শিক্ষিত মন এ সুস্পষ্ট ঈশ্বরধারণার মধ্যে তার সংশয়বাদী ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেল। ‘বেদান্ত প্রতিপাত্ত সত্যধর্ম’কে লোকপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে যুক্তির জাল বিস্তার করে তিনি আরো বললেন : উপাস্ত ব্রহ্ম যদি সত্য হন তাহলে তাঁর সৃষ্ট মানুষ বা জগৎ কখনও মিথ্যা হতে পারে না। উপাসক মানুষ যদি মিথ্যা হয় তাহলে ধর্মজগতে কে কার উপাসনা করবে? স্মরণ্য সত্য ব্রহ্মের মত তাঁর সৃষ্ট মানুষও সমানভাবে সত্য।

শতাব্দী-শেষে বিবেকানন্দের ধর্ম-উপলব্ধিও রামমোহনের অহরূপ।

সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী ধর্মের নামে যখন গুপ্ত উপাসনা ও মানবতাবিরোধী নানা হৃদয়হীন কর্মে লিপ্ত ছিল সে সময় মানবতার এত উচ্চ আদর্শের কথা রামমোহন ব্যতীত কোন

বাঙালী উচ্চারণ করেননি। এর ফলে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন-প্রভাবিত সংশয়াচ্ছন্ন বাঙালী রামমোহনের ধর্মদর্শনের ভেতর খুঁজে পেলেন বিশ্বাসের একটি বড় অবলম্বন। নব্যশিক্ষিত বাঙালীর সংশয়াচ্ছন্নতার স্বযোগ নিয়ে যে সমস্ত বিদেশী ধর্মযাজক এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী হয়ে উঠছিলেন তাঁদের স্রোতও বাধা পেল রামমোহনের ধর্মলোচনার নিকট।

রামমোহন যে যুক্তিবাদী ধর্মাদর্শের প্রবক্তা তার যুগোপযোগিতা সম্পর্কে কারো মনে সন্দেহ থাকতে পারে না। সত্যের সার্বভৌম রূপসন্ধানই যে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসার প্রধান লক্ষ্য ছিল—এ বিষয়েও সকলে হয়তো একমত হবেন। তথাপি রামমোহনের উচ্চাদর্শের তার স্ব-যুগে কিংবা তার পরবর্তীকালে সর্বস্তরব্যাপী না হয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল কেন একথা স্বভাবতই মনে আসে। কোন কোন সমালোচক তো ব্রাহ্মধর্মকে সে যুগের সংস্কার-বিলাসী অ্যারিস্টোক্র্যাট হিন্দুর ধর্ম বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেননি। অথচ শতাব্দীর শেষে অদ্বৈত বেদান্তকে আশ্রয় করে স্বামী বিবেকানন্দ যে নব্য হিন্দুধর্ম প্রচার করেন তার প্রভাব অল্পভূত হয়েছিল সমাজের প্রায় সর্বস্তরে। এর কারণ কী?

এর কারণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতিকে এক সার্বভৌম অদ্বৈত বেদান্ত ধর্মে দীক্ষিত করতে গিয়ে রামমোহন হিন্দুর চিরশ্রদ্ধেয় পুরাণ ভাগবত প্রভৃতি সনাতন শাস্ত্রকে শুধু উপেক্ষাই করেননি—আঘাতও করেন। যুক্তিতর্কের সাহায্যে একদিকে তিনি পুরাণের অবতারবাদকে নিরসন করার চেষ্টা করেন আর একদিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বৈষ্ণবীয় ধারণাকে ধিকৃত করেন। তিনি বললেন হিন্দুর পুরাণে বা ভাগবতে প্রতীকতার মধ্য দিয়ে যে ভগবৎ-ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা বেদান্ত ধর্মের সূক্ষ্ম মর্মগ্রহণে অক্ষম নিম্নাধিকারীর জন্ত। পুরাণাদিতে বর্ণিত যে আদর্শ দেবোপম চরিত্রগুলি যুগে যুগে জাতিকে আদর্শচেতনায় সজীবিত করেছে কিংবা ভাগবৎ-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গের ভিতর বৈষ্ণব মহাজনেরা ভগবৎ-অল্পভূতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ উপলব্ধি করেছিলেন—সে মহৎ অধ্যাত্মবোধের ওপর এরূপ প্রচণ্ড আঘাত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ খুব সুস্থভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তান্ত্রিক গুরু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী অবধূতের শিষ্য হয়েও তত্ত্বোক্ত মূর্তিপূজাকে রামমোহন কখনও সমর্থন করেন নি। এ ছাড়া প্রচণ্ড বেদান্তবাদী হয়েও রামমোহন পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদীদের মত ভোগিকাজ্ঞাকে স্ব-জীবনে চরম মর্যাদা দিতেন। এ সমস্ত কারণে

রামমোহন-প্রচারিত বেদান্ত-প্রতিপাত সত্যধর্ম-ত্যাগাদর্শে বিশ্বাসী জাতীর চিত্তে কোন গভীর প্রভাব মুদ্রিত করতে পারেনি। ধর্মোপলব্ধির জগতে রামমোহন বৈদান্তিক জীবন-দর্শনের জন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের জীবনদর্শন তাঁর চিন্তা ও কর্মকে ঐহিক স্ব্থ ও ভোগের পথে আকর্ষণ করেছিল। শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহনের এ স্বভাববিরোধী ধর্মভাবনা শতাব্দীশেষে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মসাধনায় বিরূপ প্রতিক্রিয়াশীল রূপ পেয়েছিল—তা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের সংমিশ্রণে রচিত রামমোহনের এ অভিনব ধর্মদর্শন রক্ষণশীল জাতির চিত্তে যে সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি তার প্রমাণ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিদেশ গমনের পর তাঁর নবপ্রচারিত ধর্মের ছরবস্থা। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্ত্রীযুক্ত বারবৎসর পর্যন্ত রামমোহনের ভাবশিষ্ট রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ কোনমতে একটি সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে এ নবধর্মকে বাঁচিয়ে রাখেন। তারপর দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশের নিকট বেদান্তধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন থেকে রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মাদোলন নতুন শক্তি অর্জন করল। ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের প্রায়-বিপরীত। তিনি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী, জীবনব্যাপী সৌন্দর্যের উপাসক, ভোগবিমুখ এবং সাধনার সাহায্যে হৃদয় ও মনের বিশুদ্ধ অনুশীলনে তৎপর। ইতিমধ্যে স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা যুক্তিবাদী ডিরোজিওর শিক্ষায় একদল নব্য-শিক্ষিত যুবক ধর্মভাবনায় সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে শুধু যে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছিল তা নয়—খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্ররোচনায় কেউ কেউ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। একটি ধর্মসংগঠনের সাহায্যে এ বিজাতীয় ধর্মস্রোতকে বাধা দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং এ উদ্দেশ্যে প্রগতিবাদী কয়েকজন হিন্দুকে নিয়ে বিজ্ঞাবাগীশের কাছে বেদান্তধর্মে দীক্ষা নিয়ে গঠন করলেন তিনি ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহনের বেদান্ত প্রতিপাত সার্বভৌম সত্যধর্ম এভাবে পরিণতি লাভ করল একটি গোষ্ঠীবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ধর্মে। এ ধর্মের রূপদানে দেবেন্দ্রনাথ মুখ্যত আশ্রয় গ্রহণ করলেন উপনিষদকে। “আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়”ই হল সে উপনিষদোক্ত ব্রহ্মোপলব্ধির ভিত্তিভূমি। রামমোহন যেখানে তাঁর সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন শাস্ত্র ও প্রবল যুক্তির ওপর, দেবেন্দ্রনাথ সেখানে

তঁার ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশুদ্ধ হৃদয়কে । কোন কোন সংস্কৃতি-সমালোচক মনে করেন ব্রাহ্মধর্মের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণে এ আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শ ফরাসী কার্টোসিয়ান দর্শনের ওপর স্থাপিত । এ দার্শনিক ভিত্তির ওপরের চিন্তাশীল দেবেন্দ্রনাথ সগুণ ব্রহ্মবাদমূলক উপনিষদ-বাক্যগুলো আহরণ করে ব্রাহ্মধর্মের স্থাপনা করেন । এ ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্র-অদ্বৈতকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন তঁার ‘আত্মতত্ত্ববিদ্যা’ গ্রন্থে । শুধু দেবেন্দ্রনাথ নন, সংস্কার যুগের অন্যতম নায়ক দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী রাজনারায়ণ বসু ও তঁার ‘ধর্মতত্ত্বদীপিকা’য় ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর জোর দিয়েছেন বেশী ।

এভাবে রামমোহন-পরবর্তী সংস্কার যুগের ব্রাহ্মধর্ম তার আদি বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত হয়ে পাশ্চাত্য দর্শন-ঘেষা একটি ধর্মমতবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল । দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রাহ্মধর্মের রূপদানে মহর্ষির অন্যতম সহকর্মী ছিলেন মনীষী অক্ষয়-কুমার দত্ত । ধর্মসংস্কারে অক্ষয়কুমার মহর্ষির সহকর্মী হলেও তঁার মন ছিল বিজ্ঞানীর । সেজন্য রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের মত কোন দর্শনকে ধর্মের ভিত্তি না করে বিজ্ঞানকে ধর্মের ভিত্তি করবার জ্ঞান তিনি আগ্রহী ছিলেন । ‘আত্মীয় সভা’য় ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করতেন তিনি ভোটের সাহায্যে । ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় তিনি বিশ্বাসী না হলেও প্রত্যক্ষবাদীর মত বিচিত্র শক্তিকে তিনি বিশ্বাস করতেন । সমীকরণের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করতেন যে ঈশ্বরস্বরূপ উপলব্ধি করবার উপায় হিসাবে প্রার্থনায় কোন শক্তি নেই । যথার্থ বিজ্ঞানীর মত জগৎ-ব্যাপারে প্রাকৃতিক নিয়মকেই তিনি স্থান দিতেন সবার উপরে । “ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের” দ্বিতীয়ভাগের উপক্রমণিকায় তিনি বলেছেন : “মানবকুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা ।” বেদের অপৌরুষত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না । ধর্মজিজ্ঞাসায় সব চাইতে বড় স্থান দিয়েছেন তিনি লোকহিতকে । তঁার এ মনোভাবের ওপর অষ্টাদশ শতাব্দীর হিতবাদী ও মানবতাবাদী দার্শনিকদের প্রভাব অতি-প্রত্যক্ষ । তঁার নিষিদ্ধ যুক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথও ঈশ্বরতত্ত্ব ও শাস্ত্রবিচারের কোন কোন বিষয়ে মতপরিবর্তন করতে বাধ্য হন । তবে মূর্তিপূজা বিষয়ে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো একই মত পোষণ করতেন । বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও মনে করতেন ঈশ্বর যখন “নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ” তখন তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারেন না । অতএব কোন মূর্তির মধ্যে তঁার প্রকাশ ঘটতে পারে না ।

দেবেন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় ভগবৎ ধারণা এভাবে অক্ষয়কুমার দত্তে এসে পাশ্চাত্য মানবতাবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী দর্শনে স্থিতিলাভ করল।

সংস্কার-যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেবেন্দ্রনাথ ও তার সহকর্মীদের হাতে রামমোহনের ‘বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম’ এভাবে নবতর রূপ পেল। নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রামমোহন হিন্দুর অতি-পুরাতন শক্তি ও বৈষ্ণব ধর্মের যে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যায় তা একেবারে অলুপস্থিত। দেবেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বেদের অপৌরুষেয়তাকে অস্বীকার করলেন না, সে জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি আত্মপ্রত্যয়কে। এছাড়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করতে গিয়ে রামমোহনের মতোই তিনি মূর্তিপূজা স্বীকার করলেন না।

তাহলে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজে মূর্তিপূজা বর্জিত হয়েছে, বেদের অপৌরুষেয়তা হয়েছে ‘অস্বীকৃত, স্মৃতি-নির্দেশিত ক্রিয়াকাণ্ডের কথাও নেই, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের কোন আলোচনা নেই—এ সমস্ত পূর্বসংস্কার বর্জন করে দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন শুধু উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মবাদ ও সে ব্রহ্মের উপাসনা। এভাবে দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মসমাজ দেশের বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি মননপ্রধান স্বাতন্ত্র্য অর্জন করল। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র সমাজ-চেতনা দেখা যায় ব্যক্তিগত চরিত্রকে বিদেশী সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত প্রভাব থেকে মুক্তি করবার প্রয়াসে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’র মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের ধর্মাস্তরকরণের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ ফ্রন্ট গঠনে।

সংস্কার-যুগের তৃতীয় পর্যায়ের সব চাইতে বড় নায়ক হলেন কেশবচন্দ্র সেন। কোন কোন সংস্কৃত-সমালোচকের মতে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে তাঁরও মতবাদের ভিত্তি স্কটল্যান্ডের ‘সহজ জ্ঞানবাদ’। কেশবচন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন তারও ভিত্তি নাকি জার্মানীর হেগেল দর্শনের ইংলণ্ডীয় সংস্করণ। স্মৃতিরাং-দেখা যায় সংস্কার-যুগের ব্রাহ্ম-নায়কগণ বৃহত্তর জাতীয় ঐতিহ্য থেকে অনেকাংশে সংযোগ হারিয়ে বিদেশী ভাবপ্রেরণায় ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। শুধু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-প্রচেষ্টা কেন, কেশবচন্দ্রের সমন্বয়মূলক ধর্মসংস্কারের যে মহত্তম পরিণতি সে ‘নব-বিধান’ও ছিল বিভিন্ন ধর্মের সার-সঙ্কলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমন্বয়ের অস্ত্র হিসেবে ‘নব-বিধানের’ উপযোগিতা অবশ্য-স্বীকৃত হলেও কোন গভীর দার্শনিক ভিত্তির অভাবে এ উদার ধর্মবোধও বাঙলার মাটিতে শিকড় গাড়তে পারেনি। এ

সমস্ত কারণেই এত সন্তাবনা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তি হারিয়ে একটি কালচার-বিলাসী ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

সংস্কার-আন্দোলনের দুর্বলতার কারণ-নির্ণয় প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক ধর্মআন্দোলন বেগ ও বলিষ্ঠতা লাভ করে একমাত্র তখনই যখন আন্দোলনকারী জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদকে একনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেন। অথচ ব্রাহ্মনেতাদের মতবাদ ও জীবনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় মতোবিরোধ দেখা গেছে। প্রচণ্ড বেদান্তবাদী হয়েও রামমোহন হিন্দু প্রথাভাষায় পিতৃশ্রদ্ধ করতে দ্বিধা করেননি। মেরী কার্পেন্টার জানিয়েছেন যুতুকালেও তিনি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেননি। ব্রহ্মজ্ঞানকে তত্ত্ববিচারের চরম জেনেও তত্ত্বোক্ত উপাসনার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৈদান্তিক রামমোহনের শৈব বিবাহে আপত্তি ছিল না। ধর্ম-জিজ্ঞাসায় বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন হয়েও মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহনের পায়ণমূর্তি নির্মাণ করবার আবেদন জানিয়ে পৌত্তলিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর এ প্রস্তাবের সমর্থনের মধ্য দিয়ে রাজনারায়ণেরও একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। পিতার শ্রাদ্ধের সময় দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুপূজিত শালগ্রাম শিলা আনতে নিষেধ করলেও হিন্দুমতে পিতার কুশপুতলিকা দাহ করেছিলেন। এক কথায় ব্রাহ্মসমাজের নেতারা যুগপ্রয়োজনে বুদ্ধির সাহায্যে হিন্দুর পৌত্তলিকতা বর্জন করলেও জীবনের ক্ষেত্রে পৌত্তলিক সংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি।

হতে যে পারেননি তার সর্বশেষ পরিচয় সংস্কার-যুগের শেষ নেতা কেশব-চন্দ্রের অধ্যাত্মজীবনের বিবর্তনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ শিষ্য হিসেবে নিগুণ ব্রহ্মোপাসনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অধ্যাত্মজীবন শুরু করেন। তারপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে সগুণ ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে তাঁর ধর্মমতের বিবর্তন ঘটে। (‘ফেরারওয়েল টু বেদান্ত’)। অতঃপর আবার তিনি ফিরে এলেন বেদান্তধর্মে—তবে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ (‘আওয়ার রিটার্ন টু বেদান্ত’)। এখানেও কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের বিবর্তন শেষ হয়নি। খ্রীষ্ট-কৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই তাঁর ধর্মাত্মত্বের আবার বিবর্তন ঘটে। আত্মস্তিক আগ্রহের সঙ্গে তিনি হিন্দুর দ্বেদেবীর রূপক ব্যাখ্যা শুরু করেন। খ্রীষ্ট বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবন (‘গ্রেট মন’) আলোচনা-প্রসঙ্গেও তিনি অবতারবাদ বিশ্বাসেরও পরিচয় দেন। কেশবচন্দ্র স্ব-জীবনে সগুণ ব্রহ্মবাদ, অবতারবাদ, আদেশবাদ প্রভৃতি মতবাদকে যেভাবে সক্রিয় সাধনার মধ্যে রূপ

দিতে চেষ্টা করেছিলেন তাতে দেখা যায় সংস্কার যুগের নিগুণ ব্রহ্মোপাসনা ক্রমশঃ রূপময় ভগবৎ-উপাসনার পথে অগ্রসর হচ্ছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন-ভাষ্যকার রম্যা র'লা মনে করেন ঈশ্বরকে পিতৃভাবে ধারণার থেকে মাতৃভাবে সাধনার দিকে কেশবচন্দ্রের প্রবণতা আসে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্শে আসার পর থেকে। ব্রহ্মজ্ঞানী কেশবচন্দ্রের মাতৃভাবে তন্ময়তা ও অবতারবাদে বিশ্বাসের মধ্যে সংস্কার-যুগের অবসান ও সমন্বয়-যুগের সূচনা দেখা দিয়েছে।

জগতের মূখ্য ধর্মাদর্শের আশ্রয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার মধ্য দিয়ে সে সুসমঞ্জস ধর্ম-সমন্বয় যুগের শুরু। সংশয়বাদী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্তের সে উদার ধর্মগ্রহণ ও বিশ্বব্যাপী প্রচারের মধ্য দিয়ে সে সার্বভৌম ধর্মের বিকাশ। প্রায় সমস্ত সংস্কৃতি-সমালোচকই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এ সামঞ্জস্যময় ধর্মভাবনার যুগকে বলেছেন সমন্বয়-যুগ। কিন্তু কোন কোন চিন্তাশীল লেখক এ যুগের ধর্মভাবনায় পৌত্তলিকতার পুনরুজ্জীবন-প্রয়াস দেখে এ যুগকে অভিহিত করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল সমন্বয়-যুগ বলে। শতাব্দীর প্রারম্ভে জ্ঞানযোগী রামমোহনের সংস্কারকামী ধর্মচিন্তায় বাঙালীর যে মজ্জাগত পৌত্তলিকতা-প্রীতি বিসর্জিত হয়েছিল, শতাব্দী-শেষে কুচ্ছুতপা তপস্বী শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনায় জড় পাষণপ্রতিমার ভিতর অনন্ত-চৈতন্যের সজীব প্রাণস্পন্দন আবিষ্কার শুধু সংশয়বাদী যুবক নরেন্দ্রনাথের সকল জিজ্ঞাসাকে নিরস্তুর করল তা নয়—সে সংস্কার-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা কেশবচন্দ্রের বিস্মিত অশ্রদ্ধাও আকর্ষণ করল। বস্তুত পক্ষে এ মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পরম উপলব্ধির কথা সংস্কারকামী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত করেন তাবপ্রবণ ব্রহ্মবাদী নেতা কেশবচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ভাষ্যকার রম্যা র'লা কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয়, সর্বসংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র এ মূর্তিপূজকের প্রায় শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েন। সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ এ মূর্তিপূজকের প্রকাশ্য শিষ্যত্ব গ্রহণের পর মূর্তিপূজার সমর্থনে পরবর্তীকালে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে তো দ্বিধাই করেন নি : “যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম।” পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর রচনায় বক্তৃতায় ও উপদেশে মূর্তিপূজার সমর্থনে অনেক কথা বলেছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মসমূহের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ করে তিনি এটাও প্রমাণ করেছেন যে মূর্তি বা প্রতীকের উপাসনার মধ্য দিয়ে সমস্ত ধর্মই বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে। মূর্তিপূজাকে যুগমানব রামমোহনের মতো শুধু নিম্নাধিকারীর ধর্ম

বলে তিনি উপেক্ষাই করেন নি, বরং মূর্তিপূজার মধ্য দিয়ে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম উপলব্ধির বিকাশ ঘটতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শতাব্দীর প্রারম্ভে চিন্তানায়ক রামমোহন যেখানে মূর্তিপূজাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের নিদর্শন এবং জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলে মনে করেছেন, শতাব্দীর শেষে সর্বভাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সে মূর্তিপূজাকে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসার পরম পরিণতি বলে স্বীকার করেছেন। একেই মনে হয় সংস্কার-যুগের ধর্মভাবনার বিরুদ্ধে পরবর্তী যুগের প্রতিক্রিয়া। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগকে সেজন্ত সর্বসংস্কারমুক্ত (?) কোন কোন লেখক রি-অ্যাক্শনারী অর্থাৎ প্রগতিবিরোধী যুগ বলতেও দ্বিধা করেননি। যে বিবেকানন্দ এ হতভাগ্য দেশের সমষ্টিমুক্তির সাধনায় তাঁর ত্যাগব্রতী জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর ধর্মান্দোলনের বিরুদ্ধে এ ধরণের অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই। সত্যই কী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমন্বয়ী ধর্মাত্মভূতি প্রগতিবিরোধী এবং বিবেকানন্দ কী প্রতিক্রিয়াশীল?—এ প্রশ্নের আজ মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।

বিবেকানন্দকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করবার প্রধান কারণ হল এই যে—যে মূর্তিপূজাকে রামমোহন কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থূল ধর্ম বলে মনে করেছেন এবং সংস্কার-যুগের ধর্মনেতারা যে সংস্কারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ সে ধর্মপ্রণালীকে স্ব-জীবনে শুধু অহুসরণ করেন নি, সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাও দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বিবেকানন্দ কি শুধু মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্তি-পূজকদের মত প্রাণহীন পাষণ-পূজাকেই ঐশ্বর্য দিয়েছেন? বিবেকানন্দের জীবনী-পাঠকেরা জানেন যতদিন পর্যন্ত তিনি ‘পাষণময়ী কালীপ্রতিমার মধ্যে ইচ্ছাময়ী ভগবংশক্তির অনন্ত বিভূতি উপলব্ধি করতে পারেন নি ততদিন পর্যন্ত তিনি নিরক্ষর মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণকে গুরু বলেই স্বীকার করেন নি। এ পরম উপলব্ধির পর বিবেকানন্দ মৃতিকে ভগবংশক্তির প্রতীক হিসেবেই উপাসনা করবার নির্দেশ দিয়েছেন—ইট, কাঠ, পাথর হিসেবে পূজা করতে বলেন নি। মূর্তিপূজা সম্পর্কে রামমোহনের সঙ্গে বিবেকানন্দের ধর্মসাধনার বড় পার্থক্য হল এই : রামমোহনের মতো যুক্তি-প্রয়োগে তিনি মূর্তিপূজাকে শুধুমাত্র ‘বিশ্বাধিকারীর ধর্ম’ বলে উপেক্ষা না করে সাধনার সাহায্যে হিন্দুর ঐতিহ্যশ্রিত এ ধর্মপ্রণালীর গুরুত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনের মতো ভিন্নতর ধর্মাদর্শের প্রভাব স্বীকার না করে হিন্দু-ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার চেয়েছিলেন। এজন্ত

বিবেকানন্দের ধর্ম-সংস্কারের প্রভাব জাতীয় জীবনে যে স্তূরপ্রসারী হয়েছিল, আমাদের ধর্মান্দোলনের পাঠকমাত্রই তা জানেন।

কিন্তু একথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে মূর্তিপূজার বিশ্বাস স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমতভূতির প্রথম স্তর মাত্র। আসলে বিবেকানন্দের ধর্মসাধনার চরম বিকাশ ঘটেছিল অদ্বৈতব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে। এখানে রামমোহন ও বিবেকানন্দের ধর্ম-উপলব্ধি প্রায় এক। তবে জীবের মধ্যে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিকে বিবেকানন্দ শুধুমাত্র সূক্ষ্ম ধর্মালোচনার সীমায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি। আচার্য শঙ্করের পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের সঙ্গে আচার্য রামানুজ এবং মানবপ্রেম-বিগলিত মহামানব শ্রীচৈতন্তের হৃদয়ধর্মের সংমিশ্রণে তিনি অদ্বৈতব্রহ্মবাদকে এমন একটি সার্বভৌম রূপ দিতে পেরেছিলেন—যা একটি সজীব ও সক্রিয় সমাজধর্মরূপে জাতীয় চিন্তে বল ও বীর্ষের সঞ্চার করেছে। সাধারণতঃ স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী-মহলে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-বর্ণ নির্বিশেষে জীবমাত্রকেই ব্রহ্মবোধে সেবাকে বিবেকানন্দের ধর্ম উপলব্ধির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বলে মনে করা হয়। বর্তমান মানব-মাহাত্ম্য উপলব্ধির যুগে এরূপ একটি সাম্যবাদী চেতনা বুদ্ধিজীবী মানুষের মনকে সহজে আকর্ষণ করে বলে স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শকেই তাঁরা বড় করে দেখেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মভাবনার মহত্তম পরিণতি হল মানুষের মধ্যে ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য, শক্তি ও বীর্ষের অহুভব—যে অহুভবের সাহায্যে মানুষ জীবনে দুঃসাধ্য কর্মকেও সহজ করে তুলতে পারে। স্বামীজীর আত্মপ্রত্যয়ান্বিত এ মহৎ জীবনবোধ ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মভাবনা ও সমাজচিন্তার জগতেই শুধুমাত্র একটি সজীব প্রেরণারূপেই দেখা দেয়নি—বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের জটিল সংকটের দিনেও জাতীয় সর্বাঙ্গীণ বন্ধনমুক্তির নির্দেশক একটি উজ্জ্বল আলোকরেখার মত পথ দেখাচ্ছে।

প্রমাণ-পঞ্জী :

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী

কলিকাতা, ১৩৬৩

ডক্টর হুশীলকুমার গুপ্ত : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার নবজাগরণ, কলিকাতা, ১৯৫৯

কাজী আবদুল ওহুদ : বাংলার নবজাগরণ, কলিকাতা

Romain Rolland : The life of Ramkrishna : Advaita Asram, Almora.

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

“রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবার এবং তাঁহার চিন্তার বীজ বিশ্বময় বপন করিবার দায়িত্ব তাঁহার যে মহান শিষ্যের উপর পড়িয়াছিল, তিনি ছিলেন দেহ ও মনের দিক হইতে রামকৃষ্ণের ঠিক বিপরীত।.....

“বিবেকানন্দের দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মত স্নদূঢ় ও শক্তিশালী। তাহা রামকৃষ্ণের কোমল ও ক্ষীণ দেহের ছিল ঠিক বিপরীত। বিবেকানন্দের ছিল স্নদীর্ঘ দেহ (পাচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি), প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, স্নদূঢ় গঠন, কঠিন পেশল বাহ, শ্রামল চিক্ণ ত্বক্, পরিপূর্ণ মূখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল, আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়িত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায, পরিহাসে, করুণায় দৃষ্ট প্রথর ছিল সে চক্ষু; ভাবাবেগে ছিল তন্ময়; চেতনার গভীরে তাহা অবলীলায় অবগাহন করিত; রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী; সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রাজকীয়তা; তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসেন নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।...

“রামকৃষ্ণের ও তাঁহার এই মহান শিষ্যের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ষোল বৎসর। কিন্তু এই কয়েক বৎসরেই বিবেকানন্দ আগুন জ্বলাইয়া দিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসরেরও কম বয়সে এই মল্লবীর চিতাশয্যা গ্রহণ করেন।.....

“কিন্তু সে চিতাগ্নি আজও নির্বাপিত হয় নাই। প্রাচীকালের ফিনিক্স পক্ষীর মতই তাঁহার চিতাভস্ম হইতে নূতন করিয়া ভারতের বিবেক—সেই ঐন্দ্রজালিক পক্ষী—উখিত হইয়াছে। উখিত হইয়াছে ভারতের ঐক্য ও তাঁহার মহান বাণীতে মানুষ্যের বিশ্বাস। এই বাণীর কথা ভারতের প্রাচীন স্বপ্ন-দ্রষ্টারা বৈদিক যুগ হইতে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন; এই বাণীর হিসাব-নিকাশ আজ ভারতবাসীকে অবশিষ্ট মানব জাতির নিকট দিতে হইবে।”

[স্বাধি দাস অনুদিত]

ফরাসী মনীবী রম্মা র'লার এই শ্রদ্ধাঞ্জলির সঙ্গে আজ জগৎব্যাপী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবে আমাদের কণ্ঠক্ষেপ করছি। 'উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত': এই মহান আহ্বান-মন্ত্রে আজ সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবী জেগে উঠেছে। 'সাহিত্যের খবর'-এর বর্তমান সংখ্যা এই মহান বীর সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে নিবেদিত হ'ল।

চীনা আক্রমণের ফলে যে জাতীয় সংকট দেখা দিয়েছে, এই সংকট-লগ্নে স্বামীজীর আদর্শ-আজ আমাদের রক্ষা করুক, এই প্রার্থনা করি। স্মরণ করি তাঁর বাণী : "আমি তোমাদের মরতে দেখলেও বরং খুশী হব, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সেপাইর মত আজ্ঞাপালনে জান কবুল করে নির্বাণ লাভ করতে হবে, তবু ভীকৃতাকে আমল দেওয়া চলবে না।"

* * * *

এই শুভ মুহূর্তে দেশব্যাপী নেতাজী-জয়ন্তী উৎসবও পালিত হচ্ছে। স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের সপ্তষষ্টিতম জন্মদিবসে আজ স্মরণ করি নেতাজীর বাণী :

"একদিন কটকে আমাদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই পড়ছি হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলুম এই জিনিষই আমি এতদিন ধরে চাইছিলুম। বইগুলি বাড়ী নিয়ে এসে গোপ্রাসে গিলতে লাগলুম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয় মম আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। এতদিন পর্যন্ত এমন আদর্শের সন্ধান কেউ আমাকে দিতে পারেন নি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলুম। আমার সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল স্মৃতি আমি বুঝতে পেরেছি। মানবজাতির, সেবা ও আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশেরও সেবা বুঝেছিলেন।" (৩০/৩/৬)

আজ জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের জীবন ও বাণী অপেক্ষা আর কোন ফলপ্রসূ বাণী আছে যা আমাদের কর্তব্যপথে চালনা করতে পারে? তাই আমরা প্রথম নিষ্ঠা ও গভীর শ্রদ্ধায় বারবার এই দুই ভারত-সন্তানকে স্মরণ করি।

* * * *

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের নাম 'বাঙ্গলা'য় পরিবর্তিত করার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। আমরা এই প্রস্তাব সর্বাঙ্গতঃ করণে সমর্থন করি। ইতিহাস-বিধাতার ইচ্ছায় বাংলাদেশ আজ দ্বিখণ্ডিত। আমাদের দেশমাতৃকার এক অঙ্গ আজ বিদেশে—পূর্ব-পাকিস্তান বলে গণ্য। পূর্ববঙ্গ নাম আজ উঠে গেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ নামেরও সার্থকতা নেই। অবশিষ্ট ভারতে ও ছুনিয়ায় আমাদের পরিচয় পূর্ববঙ্গী বা পশ্চিমবঙ্গী বলে নয়, বাঙ্গালী বলে। সে কারণেও 'বাঙ্গলা' বা 'বঙ্গদেশ' নামটি গ্রহণযোগ্য। বৌদ্ধ যুগ (পালবংশ), হিন্দুযুগ (সেন বংশ), মুসলিম যুগ (পাঠান ও মুঘল শাসন), ইংরেজ যুগ—প্রতি যুগে বাঙ্গলার মানচিত্র বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। তবু 'বঙ্গদেশ' ও 'বাঙ্গালী' নামেই আমরা পরিচিত। 'রাঢ়ী', 'বারেন্দ্রী', 'ঘটি', 'বাঙাল', 'বাহে' প্রভৃতি অভিধার পিছনে যে অবজ্ঞা ও উন্নাসিকতা, সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিক মনোভাব বর্তমান, আজ তা সর্বথা বর্জনীয়। একারণেও 'বাঙ্গালী' ও 'বঙ্গদেশ' বা 'বাঙ্গলা' নাম গ্রহণীয়। আমরা বাঙ্গালী, এই আমাদের সার্থক পরিচয়। এ কারণেই এই পরিবর্তনের প্রতি আমাদের সমর্থন।

* * * *

গত কয়েক মাসে ভারতীয় সাহিত্য সংসার থেকে কয়েকজন বর্ষিয়ান সাহিত্যসেবক চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন।

উড়িষ্কার প্রবীণ কবি শ্রীশ্বপনেশ্বর দাস 'কবিভূষণ' গত ৩ জুন (১৯৬২) তাঁর মাতৃভূমি সম্বলপুর জেলার করগড়ে ৮৭ বৎসর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিন। 'কবিভূষণ' বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ—নানা বিষয়ে তিনি লেখনী চালনা করেছেন। অনুবাদকরণেও তাঁর কৃতিত্ব পরিচয় বর্তমান। 'তুলসী রামায়ণ' ও 'কামায়নী'র অনুবাদ তিনি করেছেন। উড়িষ্কার, গত আশী বৎসরের সামাজিক ইতিহাস তাঁর আত্মজীবনী মূদ্রণের অপেক্ষায় আছে। 'ব্যাকরণ স্তব' ও 'বৈজ্ঞানিক মূদ্রণের অপেক্ষায় রয়েছে। তৎকৃত শংকরাচার্য গ্রন্থাবলীর ওড়িয়া কাব্যানুবাদ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় মূদ্রণ করেছেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থনিচয় : 'মাসচিত্র', 'কৃষ্ণাঙ্কুর', 'সম্বল মানস', 'প্রবচন তরঙ্গ', 'কবিতা বাটিকা'।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্যসাধনায় রত ছিলেন। তিনি স্বর্গত

ওড়িয়া কবি গদাধর মেহেরের সমসাময়িক ছিলেন। ‘হীরাখণ্ড’, ‘উৎকল সেবক’ ও ‘সাধনা’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

* * * *

প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক আচার্য শিউপূজন সহায় পদ্মভূষণ, গত ২১ জাভুঅরি পাটনায় ৭০ বৎসর বয়সে মারা গিয়েছেন। ১৮৯৩ সালে শাহাবাদ জেলার উনসোয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আচার্য সহায় কয়েকটি হিন্দী পত্রিকা সম্পাদনা করেন : ‘মাতোয়াল’, ‘আদর্শ’, ‘উপন্যাস তরঙ্গ’, ‘জাগরণ মাধুরী’, ‘বালক’, ‘গঙ্গা’, ‘সাহিত্য’, ‘হিমালয়’। ‘দ্বিবেদী অভিনন্দন গ্রন্থ’ ও ‘রাজেন্দ্র অভিনন্দন গ্রন্থ’ও তিনি সম্পাদনা করেন।

বিহার রাজ্য হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন (১৯৪১) ও জয়পুরে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৪৪) তিনি সভাপতিত্ব করেন।

তঁার রচনাবলী :—‘বিহার-কা-বিহার’, ‘বিভূতি’ (গল্প), ‘দেহাতী ছুনিয়া’ (উপন্যাস), ‘মিটিকে সপুট’ (ব্যক্তিক নিবন্ধ), ‘ভীম’ ও ‘অর্জুন’ (কিশোর সাহিত্য)।

* * * *

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের পত্নী ও বর্তমান সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের মাতা শ্রীযুক্তা নিরঞ্জনী সরকার গত ৮ জাভুয়রি ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাংলা দেশের সাহিত্য-রাজনীতি ও সমাজসেবা-ক্ষেত্রে তঁার দান অদ্বার সঙ্গ কীর্তিত হবে। ভগ্নী নিবেদিতার প্রথম ছাত্রীদের অগ্রতমা ছিলেন তিনি।

* * * *

গত ২০ জাভুঅরি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৮৭৯ সালে বিক্রমপুরের বিদগাঁওএ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি দেশবন্ধুর সহকর্মী ছিলেন। দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, স্ত্রীভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক সহকর্মীরূপে তিনি দেশসেবা করেছেন ও ১৯২২ সালে কারাবরণ করেন।

তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন নিরলসভাবে। দেশবন্ধুর ‘নারায়ণ’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ও ‘ফরওয়ার্ড’ পত্রিকার নাট্য সমালোচক ছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ‘ভারতীয় নাট্যমঞ্চ’, ‘ইণ্ডিয়ান স্টেজ’, ‘গিরিশ-প্রতিভা’, ‘দেশবন্ধু’ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা হেমেন্দ্রনাথ অজস্র রচনা দ্বারা বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ

করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আত্মজীবনী রচনা শেষ করেছেন। হেমেন্দ্রনাথ শেষজীবনে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্যনাট্য সংগীত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সাহিত্য-পেনশন পেয়েছিলেন।

* * * *

বিখ্যাত ওড়িয়া কবি গঙ্গাধর মেহেরের শতবার্ষিক উৎসব পালিত হয়েছে কটকে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে গত ২ ও ৪ নভেম্বর (১৯৬২)। ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, এম. পি. উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, উৎকলের আধুনিক যুগ গঙ্গাধর মেহেরের রচনায় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক শ্রীগোপীনাথ মহান্তি, গল্পকার শ্রীশ্বরেন্দ্র মহান্তি, কবি ডঃ কুঞ্জ-বিহারী দাস, শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। গঙ্গাধরের কাব্যে রস ও নীতির যোগপত্ত মিলন ঘটেছিল বলে বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

* * * *

গত ১৭ জাছুঅরি (১৯৬২) পৃথিবীর নানাদেশে রঙ্গালয়ের কর্মীরা আধুনিক থিয়েটারের জনক কনস্টানটিন সার্গিয়োভিচ স্টানিস্লাভস্কির জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালন করেছেন। গত ২২ জাছুঅরি কলকাতায় ‘সোভিয়েৎ দেশ’ আপিসে এই অমর নাট্য-প্রযোজকের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতারূপে, নাট্য-প্রযোজক ও পরিচালকরূপে ১৮৯৭ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরব্যাপী নাট্যান্দোলনে সমগ্র ইউরোপে তিনি যে প্রচণ্ড আলোড়ন আনেন, তার গুরুত্ব অপরিমীম। তাঁর নবনাট্যধারাকে বলা হয় ‘স্টানিস্লাভস্কি সিস্টেম’। এই রীতির মূল কথা সারল্য ও নাট্য-চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ। তাঁর ‘মাই লাইফ ইন আর্ট’ বইটি নাট্যকর্মীদের কাছে মূল্যবান।

* * * *

১৯৬৩ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের খেতাববিতরণ-তালিকায় ভারতীয় মনীষী ও সাহিত্যিকদের যোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। তালিকার শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান ‘ভারতরত্ন’ উপাধিধারী ডক্টর জাকীর হোসেন (উপ-রাষ্ট্রপতি) ও ডক্টর পাণ্ডুরং বামন কান্নে। প্রথমজন উর্দুভাষার মনীষী। দ্বিতীয়জন সংস্কৃত ভাষার মনীষী। বিজ্ঞান-কলাসাহিত্য-জনসেবার ক্ষেত্রে অনন্তসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে ‘ভারতরত্ন’ উপাধি দেওয়া হয়। সন্দেহ নেই, ডঃ হোসেন ও ডঃ কান্নের বিত্তাবস্থা ও মনীষা এর ফলে রাষ্ট্রস্বীকৃতি পেল।

আমাদের বিশেষ আনন্দের কথা, আচার্য ডক্টর শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় “পদ্মভূষণ” উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ইতিপূর্বেই তিনি ‘পদ্মভূষণ’ খেতাব পেয়েছিলেন। আচার্যের এই সব সম্মাননায় বাঙালীমাত্রেই গর্ববোধ করবেন। বিহারের হিন্দী লেখক পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মধ্যপ্রদেশের হিন্দী লেখক পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদী, উত্তরপ্রদেশের হিন্দী লেখক ডঃ রামকুমার বর্মা “পদ্মভূষণ” খেতাব পেয়েছেন। উর্দু লেখক অধ্যাপক রসিদ আমেদ সিদ্দিকী ও বাঙালী অভিনেতা-লেখক-নাট্যবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ‘পদ্মশ্রী’ খেতাব পেয়েছেন।

খেতাব-তালিকায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু কীর্তিমানের নাম আছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সম্পর্কিত উপরোক্ত খেতাবধারীদের তালিকা লক্ষ্য করার মতো। হিন্দী-উর্দুভাষী লেখকদের প্রাধান্য দেখে মনে করা যেতে পারে ভারতবর্ষে বর্তমানে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও গবেষণাকর্ম হিন্দী-উর্দুতেই হচ্ছে।

*

*

*

ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে ‘আধুনিক ভারতের স্রষ্টা’ সিরিজে তিনখানি ইংরাজী পুস্তক অত্ৰাবধি প্রকাশিত হয়েছে। (১) ‘লোকমাত্র বালগঙ্গাধর তিলক—এন্ জি জোগ। (২) ‘দাদাভাই নওরোজী’—আর পি মাসানী। (৩) ‘দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ’—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রতিটির মূল্য দু’ টাকা। আর-একটি বাংলা বই বেরিয়েছে : ‘বঙ্কিমচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য’—শ্রীপ্রমেন্দ্র মিত্র, দাম ৭৫ ন. প.।

*

*

*

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকল্পিত তোরো খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর আট খণ্ড গত দু বছরে পাওয়া গিয়েছে। বাকি পাঁচ খণ্ড কবে পাওয়া যাবে তার কোনো খবর জানা যায় নি। মফঃস্বলে বহু গ্রাহক এখন পর্যন্ত পাঁচ বা ছয় খণ্ডের বেশী পান নি বলে অভিযোগ জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উদ্বোধন-পরিকল্পিত দশ খণ্ড বিবেকানন্দ-রচনাবলীর ছয় খণ্ড বিতরিত হয়েছে। বাকি চার খণ্ড শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমান বৎসরে বিবেকানন্দ-রচনাবলী সাতটি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে ॥

বিবেকানন্দের মৌল শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতি

ডঃ সুধীরকুমার নন্দী

জীবনদর্শন যেমন মানুষের সমগ্র জীবনধর্ম এবং জীবনচর্চার মধ্যে নিহিত থাকে ঠিক তেমনই শিক্ষাদর্শন শিক্ষকের সমগ্র ধারণাকে এবং ধ্যানকে পরিশীলিত করে। শিক্ষাদর্শকে জীবনদর্শনের প্রত্যঙ্গ বললে সত্যের ব্যত্যয় ঘটবে না ; অনৃতভাষণদায়মুক্ত স্বস্থ চিন্তে একথা বলা চলে। স্বামীজীর মহৎ জীবনের দিগ্বলয় অনন্ত-আশ্রয়ী ; একদিকে মুক্ত-পুরুষের লভ্য অলৌকিক আনন্দ যে জীবনবলয়কে স্ফুট করছে : সে অলৌকিক আনন্দের দ্ব্যতিতে সন্ন্যাসীর জীবন দেদীপ্যমান ; অগ্নিদিকে জীবজগতের দুঃখের দাহ সন্ন্যাসীকে নিরন্তর পীড়িত করেছে। সন্ন্যাসী ভেবেছেন এই লক্ষ কোটি দুঃখী মানুষের কথা ; সে মানুষেরা তাঁর দেশের মানুষ, তাঁর আত্মার আত্মীয়। তারা খেতে পায়নি, পরতে পায়নি ; আশ্রয়হারা হয়ে তারা আশ্রয় খুঁজেছে। স্বামীজী বিরাট বটবৃক্ষের মত তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে ; ভীত ব্রহ্ম নরনারীর বিশৃঙ্খল মিছিল দেখেছেন স্বামীজী তাঁর মহাদেশের সর্বত্র। ভারত-পথিক বিবেকানন্দ হিমালয় থেকে কন্তাকুমারিকা পর্যন্ত পদব্রজে পদচারণ করেছেন ; দেখেছেন তাঁর স্বদেশবাসীকে ; অকারণ ভয়ে ভীত ; পরমুখাপেক্ষী তামসিক নিষ্ক্রিয়তাসমাচ্ছন্ন তাঁর দেশের মানুষকে। এদেশের মধ্যে লুপ্ত আত্মপ্রত্যয়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। তিনি শোনালেন সেই অমৃত মন্ত্র—তুমিই সেই আত্মা, তুমিই ব্রহ্ম। পঙ্গু, অক্ষম, দুর্বল মানুষ সেই মন্ত্র শুনল। বৈদান্তিকের আহ্বান ধ্বনিত হ'য়ে উঠল সারা দেশের আকাশে বাতাসে। মানুষ আত্মবিশ্বস্ত ; বিশ্বস্তির অতলে শায়িত দেবত্বের বোধটুকু উজ্জীবিত করতে চাইলেন স্বামীজী। তিনি বললেন 'উত্তীর্ণত জাগ্রত' আত্মবিশ্বস্তি নরনারী, তোমরা জাগো, নিদ্রাআলস্য ত্যাগ কর। মানুষের মধ্যেই শিব বিরাজ করছেন ; তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; তাঁর আত্যন্তিক মর্যাদাটুকু রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব ব্যক্তি-মানুষের।

শিক্ষার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বললেন যে, শিক্ষা হ'ল আপন আত্যন্তিক পূর্ণতাটুকুকে পরিস্ফুট করার পন্থা। অর্থাৎ যে দেবত্বটুকু তামসিকতার অন্তরালে অবলুপ্ত হয়েছে তাতে আবার স্বপ্রকাশ করতে হবে ব্যক্তিজীবনের পটভূমিতে। ভয়, দুর্বলতা, আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব—এরা যুক্ত

হয়েছে ষথার্থ জ্ঞানের অভাবের সঙ্গে এবং তার ফল হয়েছে ভয়াবহ। মানুষ আত্মার সব ঐশ্বর্য হারিয়ে পশুর মত ব্যর্থ জীবন যাপন করেছে। তারা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যে সব রকমের দুঃখ বরণ করে নিচ্ছে, এটা স্বামীজীর পক্ষে অসহ্য। পূর্ণতার অর্থ সব রকমের পূর্ণতা; তাঁর দেশের মানুষের জন্তু অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, ঐশ্বর্য চাই। অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্য রাজসিক জীবনবাদকেও আশ্রয় করতে পারে। পূর্ণ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঐশ্বর্য সমাক্ হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে, তাঁর অনন্ত বীর্ষের কিছুটাও ধারণার মধ্যে আনতে হ'লে, আমাদেরও বীর্ষবান হওয়া চাই। ষড়ঐশ্বর্যশালী ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা কেমন ক'রে আমরা বুঝব যদি না আমরা কিছু পরিমাণ সেই দৈব ঐশ্বর্যের আত্মাদান করি? অনন্তবায় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতার অমৃতরসধারায় স্নানপান সবই আমাদের জীবনে নিরর্থক হ'য়ে পড়বে যদি না আমরাও আমাদের অতি-সীমিত শক্তির চর্চা না করি। তাই ত স্বামীজী আমাদের দেশের ছেলেদের ফুটবল খেলতে বললেন; গীতাপাঠ এবং তার চর্চা পরে করলেও চলবে। প্রথমে ছেলেরা শরীরচর্চা করুক; স্বস্থ দেহ এবং নিরোগ স্বাস্থ্য তাদের আয়ত্তে আসুক। রোগে পঙ্গু ভারতবর্ষের মানুষ আগে রোগমুক্ত হোক, এটা স্বামীজী কায়মনোবাক্যে চাইলেন। অধ্যাত্মশক্তির পীঠস্থান হ'ল মনুষ্যদেহ; সে দেহ যদি রোগাকীর্ণ পঙ্গু হয়, তা হ'লে পূর্ণতাপন্ন অধ্যাত্ম মানুষ কাকে আশ্রয় করবে? সাহসবিস্তৃত বক্ষপটেই ত দুর্মদ দুর্জয় মন বাসা বাঁধে। যে ত্যাগী মানুষ সত্রাট আলেকজান্দারের রক্ষচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারে তার অলোক-সামান্য নির্ভরতা আশ্রয় করবে বিশাল বক্ষকে। তাই আমরা দেখি স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনে শরীরচর্চার যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য এ কথা এই প্রসঙ্গে অনুধেয় যে স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায় যে কারণে শরীরচর্চা প্রাধান্য পেয়েছিল সেই কারণে স্বামীজী তাঁর শিক্ষাদর্শনে শরীরচর্চাকে গ্রহণ করেন নি। স্পার্টা চেয়েছিল স্বস্থ, সবল, দীর্ঘদেহী স্পার্টান তৈরী করতে; এই স্পার্টানেরা যাতে বিজিত মানুষদের তাঁবে রাখতে পারে তার জন্তুই স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায়, তাদের শিক্ষাদর্শনে শরীরচর্চার এতো সমারোহ। আর স্বামীজী চাইলেন ভয়ে ভীত, তামসিক নিষ্ক্রিয়তায় পঙ্গু লক্ষ কোটি মানুষের বন্ধনমুক্তি। সে মুক্তির উপায় হ'ল মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মশক্তির পুনরুজ্জীবন। যা ঘুমিয়ে ছিল বহুদিন ধরে তাকে জাগিয়ে তোলার সাধনা হ'ল স্বামীজীর; তাই তাঁর শিক্ষাদর্শনে, তাঁর সমাজদর্শনে সেই একটি মূল সুর বারবার ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—‘আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার মানুষ কর।’

স্বামীজী-কথিত শিক্ষা হ'ল মানুষ তৈরী করার শিক্ষা। বৈদান্তিক বলবেন রজ্জুতে যে সর্প তুমি ক্ষণিকের জ্ঞান অবলোকন কর তা পুরোপুরি মিথ্যা নয়। তা 'আকাশকুহুম' এবং বহ্মানারীর সন্তানের মত একেবারে 'অসৎ' নয়, একেবারে মিথ্যা নয়। কাজে কাজেই ব্যবহারিক জীবন, তার তাগিদ, তার দাবী, তার প্রয়োজন স্বামীজীর চোখে মিথ্যা নয়; তারা সত্য, তারা নির্গমভাবে সত্য। সেই নির্মম রূঢ় বাস্তব সত্যকে বৈদান্তিক স্বামীজী স্বীকার করেছেন বলেই ঐশ্বরের লীলাভূমি আমেরিকার ধনীগৃহে আতিথ্য পেয়েও তাঁর দেশের বুভুক্ষু মানুষের দুঃখে অব্যাহত ধারে তিনি কঁদেছেন। ধনী গৃহস্বামীর সম্বরণ-রচিত স্বকোমল শয্যা তাঁর কাছে কণ্টক মনে হয়েছে। তিনি নিজে মুক্তি চান নি; লক্ষ লক্ষবার তিনি এই দরিদ্র নিরন্ন দেশে জন্ম নিতে চেয়েছেন তাঁর দেশের মানুষের কষ্ট লাঘব করার জ্ঞান; তিনি এই হতভাগ্য দেশের প্রতিটি নরনারীকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করতে চেয়েছেন, ভালবাসতে চেয়েছেন সকলকে। তিনি নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করেছেন সমস্ত মানুষের মধ্যে। তাই ত বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সেবার মন্ত্র, প্রেমের মন্ত্র প্রচার করলেন। এই সেবা এবং প্রেমের পথেই মানুষের দেবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটবে এবং সেইটুকু সজ্জটন করলেই হ'ল স্বামীজী-কল্পিত শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষা অর্থে তথ্য-আহরণ এবং তত্ত্ব-পরিবেশন নয়। আশার দেবত্বলাভের পথে সকল বাধা-বিমুক্তি ঘটানোই হ'ল শিক্ষার কাজ। হিমালয় থেকে কত্য়াকুয়ারিকা পর্যন্ত সারা দেশের মাটি পায়ে পায়ে পার হলেন স্বামীজী আর দেখালেন দেশজোড়া ভয়ের বিকট মূর্তিটাকে। তার নানান ছদ্মবেশ; কখন রাজভয় রূপে, কখন দেবভয় রূপে, কখনো বা লোকভয় রূপে তাঁর প্রকাশ। আমরা সেদিন ভয়ের মুখোসটাকে দেখে ভীত হয়েছি, পঙ্গু হয়ে পড়েছি; একটা তামসিক নিষ্ক্রিয়তা সমস্ত জাতির মেরুদণ্ডটাকে অচল করে রেখেছিল। মানুষ পশুর ভূমিকা নিয়েছিল; জড়ত্বলাভ করেছিল আমাদের অত্যন্তিক দেবশক্তিটুকু। স্বামীজী বিমূঢ়, বিম্বৃত স্বদেশবাসীর কর্ণে 'অভী'র মন্ত্রটি বারবার উচ্চারণ করলেন। ভয় থেকে মুক্ত হ'তে হবে সে যে ভয়ই হোক না কেন। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন যে সকলেই দেবতার সন্তান, অমৃতের পুত্র। জোলা, তাঁতি, মেথর, মুচি, কেউই অন্ত্যজ নয়, অস্পৃশ্য নয়। মানুষই দেবতা, নরই নারায়ণ। মানুষের মধ্যে এই দেবত্ব আনতে হ'লে প্রথমে তাকে ভয়কে পরিহার করতে হবে। কেমন ক'রে ভা পরিহার করব? এটি খুবই বড় প্রশ্ন। স্বামীজী বললেন যে প্রথমে শরীরচর্চা কর, সবল স্বস্থ

শরীরের অধিকারী হও। সাহসবিস্তৃত বক্ষপটের অধিকারী হ'তে হবে -
 ভারতবর্ষের প্রতিটি নবনারীকে। বলশালী হলে ভয়কে কিয়ৎ পরিমাণে
 জয় করা যায়। তবে শরীরচর্চার মাধ্যমে পুরোপুরি ভয়কে জয় করা যায় না ;
 কেননা আমি বলবান হ'লেও বলবন্ত ব্যক্তির অসদ্বাব ত নেই। তা হ'লে
 কেবলমাত্র শরীরচর্চার মাধ্যমে ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায় না ; প্রয়োজন
 আত্মজ্ঞানের। আমাকে উপলব্ধি করতে হ'বে যে দেহটা থেকে আমি পৃথক ;
 আমি দেহী বটে, তবে আমি দেহটা নই। দেহের মোহ থেকে যদি একবার
 মুক্ত হওয়া যায় তা হ'লে দেহের ক্ষতিটা আর আমার ক্ষতি বলে
 পরিগণিত হয় না। ভয় আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে তার প্রায় সবটাই
 দেহগত। দেহগত দুর্বলতা আমাদের মানসিক দুর্বলতার ভিত্তিভূমি ;
 স্বামীজী বললেন যে আমাদের সমস্ত দুঃখের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশের জন্ম
 আমাদের দুর্বলতাই দায়ী। এই দুর্বলতাকে জয় করতে হবে দ্বিতীয় পথে।
 প্রথম কথা হ'ল শরীরটাকে মজবুত করতে হ'বে। স্নায়ুগুলোকে ইম্পাত-স্নায়ু
 ক'রে তুলতে হ'বে, তবেই ইচ্ছাশক্তি দুর্জয় হয়ে উঠবে। এটি হ'ল আমাদের
 প্রথম কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের উপলব্ধি করতে হ'বে যে দেহগত
 বিকার আত্মার বিকার নয়। তবেই দেহগত ক্ষতি-সংশ্লিষ্ট সকল ভয় অপগত
 হবে। আমরা, মৃত্যুকেও জয় করতে পারব যেমন পেরেছিলেন অতীত
 ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় অনেক নরনারী। এই ত সেদিন স্বামীজী এবং তাঁর
 মন্ত্রণায় নেতাজী স্বভাষচন্দ্রকে আমরা দেখেছি। মৃত্যুভয়কে এঁরা জয়
 করেছিলেন ; এইটুকু জেনে মৃত্যুকে স্বভাষচন্দ্র তুচ্ছ করেছিলেন যে মানুষ ত
 দেহটা নয়। মানুষ হ'ল অবিনাশী আত্মা। তাই ত শত্রু-বোমা-বিধ্বস্ত
 বনজঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন যে এমন কোন
 বোমা তৈরী হয়নি, যা তাঁকে আঘাত করতে পারে। মূর্খ সমালোচকেরা একে
 একে দস্তোক্তি বলে উপহাস করলেন। এর অন্তর্নিহিত মহাসত্যটুকুকে
 অহুধাবনের প্রয়াস পেলেন না। স্বামীজীর শিক্ষা নেতাজীর জীবনে সত্য
 হ'ল ; স্বামীজীর মাহুগড়ার শিক্ষা বিমূর্ত হ'ল নেতাজীর জীবনে। বীজ
 যথাযোগ্য আধারে উদ্ভূত হ'ল। স্বামীজীর অধ্যাত্মশিক্ষা সত্য হ'ল নেতাজীর
 জীবনের সুবিপুল পরিমরে।

(মাহুগড়ের এই অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণবিকাশ ঘটবে তখনই, যখন তার যোগ
 ঘটবে সকলের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কনমুক্তির জন্ম সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্ম
 তাঁর জীবনদেবতার কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন :

“যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে

যুক্ত কর হে বন্ধ”

স্বামীজী বললেন ভয়ের বন্ধনটুকু কাটাতে পারলেই সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়। সকলকে ভালবাসার পথ সুগম হবে। অবশ্য এই ভয়টুকুর প্রাক-অবস্থা হ’ল বিভেদবোধ; আমি আমার থেকে যাকে পৃথক্ ক’রে দেখি, সে-ই হল ‘অপর’; যাকে অপর মনে ভাবি, সে-ই হল আমার ভয়ের উৎস। যাকে ‘অপর’ ভাবি না তার থেকে আমার ভয়ও নেই; এবং যেখানে ভয় নেই; সেখানে হিংসাও নেই। কেননা ভয় পেলে তবেই না আমি আঘাত করার কথা ভাবি; আর আঘাত করলেই তার সহচর প্রত্যাঘাতও আসে।

“এ একদিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু... আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে।... বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত।

পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। অগ্রসর হও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।”

—স্বামী বিবেকানন্দ

এরই ফলে অশান্তির সূত্রপাত। তা হ’লে দেখা গেল যে সকল অশান্তির মূলে রয়েছে আমাদের বিভেদবোধ। তাই আমাদের মূলগত আধ্যাত্মিক জীবনের একমুদ্রটি স্বামীজী আমাদের শিখিয়ে দিলেন। যীশুখ্রীষ্টও প্রতিবেশীকে ভালবাসার মন্ত্রটুকু দান ক’রে আমাদের সেই একই শিক্ষা দিলেন। স্বামীজী বললেন :

“জীবে প্রেম করে যেই জন,

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

সত্যগ্রহীত-জীবনদর্শনও এই প্রেমভিত্তিক; গান্ধীজী ছিলেন সত্যগ্রহী। তাঁর

জীবনেও এই সত্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখেছি। তিনি সবাইকে আপন জ্ঞান করেছেন। তাই ত তিনি কাউকে ভয় করতেন না। জীবনের সায়াহ-বেলায় তাই ত প্রার্থনা-সভায় তিনি কোন শাস্ত্রী চাইলেন না; প্রত্যাখ্যান করলেন শাস্ত্রী বিভাগের সাহায্য। ফল হ'ল দেহের পাতন। আত্মার ত পাতন হয় না; সে নিত্য উদ্ধার্তাভিমুখী। ব্যষ্টি-মানুষ হ'ল এই আত্মা। সে অবিনাশী।

ব্যবহারিক জীবনে আপন কর্তব্য পালন ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার জন্ত স্বামীজী আমাদের বললেন। আর্ত মানুষ, অসহায় মানুষ, পীড়িত মানুষের সেবা করতে হ'বে তাদের দেবতা জ্ঞান ক'রে। উপর থেকে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে যেন আমরা আর্তের সেবা না করতে যাই। একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবের মধ্যে বলেছিলেন : 'দূর শালা, তুই কাকে সাহায্য করবি? তুই যাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিস সে-ই ত নারায়ণ।' স্বামীজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরের এই কথার মধ্যে মহত্তম সত্যের সন্ধান পেলেন এবং প্রচার করলেন সেই সত্যটুকুকে। তিনি কর্মের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বকে জীবন্ত করে তুললেন। দেবজ্ঞানে মানুষের সেবা করতে হবে। তবেই সে সেবা সার্থক হ'বে। এই সেবার মধ্য দিয়ে সেবকের যে অলৌকিক শক্তি লাভ হয়, সে কথা স্বামীজী বলেছেন। যারা যোগ-যোগ জানেন না, জপ-তপে যাদের নিষ্ঠা নেই, তাঁরাও যোগজ শক্তির অধিকার পেতে পারেন, এ কথা তিনি বললেন, তিনি একটা গল্প বলেছেন, সে গল্পের বিষয় হল এই যে একজন যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী যোগ করে যে শক্তি লাভ করেন, সেই শক্তিই লাভ করেছিলেন একজন গৃহবধু কায়মনোবাক্যে তাঁর স্বামী-স্বজনের সেবা ক'রে। সেবা করী, কর্তব্য করা এটি হল স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের প্রধান নির্দেশ। মহাদার্শনিক ব্রাডলি তাঁর নীতিশাস্ত্রে এই কর্তব্য করার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর আলোচনা বুদ্ধিআশ্রয়ী। আর স্বামীজীর কথা বুদ্ধির আবেদনকে অতিক্রম করে আমাদের চেতনার মর্মমূল আশ্রয় করে।

স্বামীজী ব্যবহারিক জীবনকে পুরোপুরি স্বীকার করেছিলেন, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাই সেই জীবনকে স্বস্থ, সহজ, স্বন্দর, এবং দীপ্তিমান ক'রে তোলার জন্ত তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করলেন পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানকে। পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে বিজ্ঞানকে জানতে হ'বে, তাকে আমাদের কাছে লাগাতে হবে। ওদের টেকনোলজিকে আমার দেশ থেকে দারিদ্র্য-নির্বাসন যজ্ঞের হোতা করতে হবে। ব্যবহারিক জীবনকে স্বস্থ এবং সহজ করতে হ'লে ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। আমেরিকার ঐশ্বর্য দেখে,

তার মানুষদের সুন্দর স্বচ্ছল জীবনযাত্রা দেখে স্বামীজী কেঁদেছেন তাঁর দেশের মানুষদের জন্ত। এই অমিত বিত্তের কিছুটা পেলেও স্বামীজী তাঁর দেশের মানুষদের মহারুদ্ধক্ষা কিয়েপরিমাণে দূর করতে পারতেন। তাই তিনি বিজ্ঞানের শিক্ষাকে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের জন্ত অবশ্যগ্রাহ্য বিষয় হিসেবে নির্দেশ করেছেন। বিজ্ঞানকে আয়ত্ত ক'রে পশ্চিম দেশ ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে; আমাদেরও ঐশ্বর্য চাই। সুতরাং বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষা অপরিহার্য তবে মানুষের ব্যবহারিক জীবনটাই ত তার সবটুকু নয়। তারপরে তার পারমাণবিক সত্তা; সেখানে সে অধ্যাত্মলোকের অধিবাসী; সে-ই ব্রহ্ম। আমাদের সব যাত্রা, সব অভিযাত্রা, জীবাত্মার সর্ব-প্রয়াসের শান্তি ঐখানে। শিক্ষকের লক্ষ্য অধ্যাত্মমূল্যে শিক্ষার্থীর চিত্ত-সংস্থাপন। যথার্থ বৈদান্তিকের মতই স্বামীজী পরম অধ্যাত্মলক্ষ্যটুকুকে তাঁর শিক্ষাদর্শনের চরম প্রতিবেশরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন। শিক্ষকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভক্তি-যোগে তিনি বললেন যে গুরু “তিনিই যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যিক। আর যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।”

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামীজী অধিকারবাদকে স্বীকার করলেন। অধিকার অর্জন-সাপেক্ষ; জন্মগত অধিকার অধিকার নয়। এই অর্জনটুকুই হল শিক্ষার্থী-জীবনের প্রেয় এবং শ্রেয়। আমাদের অস্তিত্বের পরম লক্ষ্য উপনীত হ'বার এটি হল একমাত্র পন্থা; নাগ্র পন্থা বিঘ্নতে অয়নায়। একে আমরা শিক্ষা বলতে পারি। স্বামীজী কল্পিত শিক্ষাদর্শন অধ্যাত্ম লক্ষ্য আশ্রিত এবং বৈদান্তিক নীতিশাস্ত্রসম্মত।

ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

* উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য	৮'০০
* রবীন্দ্র-সমীক্ষা	৩'০০
* রবীন্দ্র-বিতান	৫'০০
* রবীন্দ্র-মনীষা	৫'০০
* বীরবল ও বাংলা সাহিত্য	৪'০০
* রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ	৬'০০
* বাংলা গদ্যের শিল্পসমাজ	৩'২৫

বিবেকানন্দ ও মনের স্বারাজ্য

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আমরা যাহাদিগকে বলি লোকান্তর পুরুষ, তাঁহাদের দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ ও ভবিষ্যতে প্রসারিত। তাঁহারা যুগের প্রতিনিধি ও যুগস্রষ্টা। আত্ম-কাচে যেমন সূর্যের রশ্মি সংহত করা যায়, তেমনই তাঁহাদের চিত্তে একটা সমগ্র যুগের বিক্ষিপ্ত ভাবধারা কেন্দ্রীভূত হয়। তাই তাঁহারা শুধু বর্তমান সমস্য়ারই সমাধান করেন না, ভবিষ্যতের মানুষকেও কল্যাণের পথ নির্দেশ করেন। তাঁহারা শ্রদ্ধাবান হইয়াও ক্ষমাশীল, জ্ঞানবান হইয়াও বিনীত, অমানী হইয়াও মানব, নির্ভীক হইয়াও প্রশান্ত। তাঁহারা উদারচিত্ত তাই তাঁহাদের ‘বহুধৈব কুটুম্বকম্’, অথচ স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতি-বৎসল, তাঁহারা অমেয়াত্তা, তাই তাঁহারা অনলস কর্মযোগী, অথচ অন্তর আকাশের চায় স্তব্ধ। নানা বিরুদ্ধ আদর্শ তাঁহাদের মধ্যে সমন্বয় লাভ করে, সমুদ্রে যেমন নানা নদীর জলধারা আসিয়া মিলিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এইরূপ একজন লোকান্তর পুরুষ। তিনি কার্লাইলের Hero, এমাস'নের Representative Man, ও ক্রীস্টাবিন্দের Superman (নাইটসের Superman নহেন।) সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের ত্রিবেণীধারায় স্নান করিয়া তিনি হইয়াছেন ধাত।

স্বামিজীর চিন্তা ও কর্মধারা ছিল বহুমুখী। ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজদর্শন, শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি আলোকসম্পাত করিয়াছেন। আজ আমরা মনোবিজ্ঞানের আলোকে স্বামিজীর বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশের ঋষিগণ মনোবিজ্ঞানের অনেক গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সব তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় উপনিষদে, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে, পুরাণে, তন্ত্রে, আয়ুর্বেদে। ভারতবর্ষে অবশ্য মনোবিজ্ঞান দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু শুধু ভারতবর্ষে কেন, প্রাচীন কালে পাশ্চাত্য দেশেও মনোবিজ্ঞান ছিল দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। প্রতীচ্যের সকলেই জানেন, মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে স্বামিজীর পরিচয় ছিল গভীর, কিন্তু প্রাচ্যের ঋষি ও মনীষীগণও যে মানুষের

মনের গহনে আলোকপাত করিয়াছেন, ইহা স্বামিজী গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বামিজীর মতে সাংখ্যকার কপিল মুনী ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ। এই মনোবিজ্ঞান অবশ্য যোগদর্শনেরও ভিত্তি। স্বামিজীকে পাশ্চাত্য দেশে এই যোগদর্শনের ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল। মহর্ষি পতঞ্জলি ছিলেন মানুষের মনের অন্তঃসুন্দরী—চিন্তাবৃত্তি, চিন্তাভূমি, সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ের নিপুণ বিশ্লেষণ যে তিনি করিয়াছেন, ইহাও স্বামিজী গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। একালের মনোবিদ জানেন, আমাদের মনের যেমন চেতন স্তর আছে, তেমনই অবচেতন ও অচেতন স্তরও আছে। শুধু তাহাই নহে, মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহার অচেতন মনের সংস্কারের দ্বারা, অন্তর্গূঢ় কামনা, বাসনা প্রভৃতির দ্বারা এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনেও পাওয়া যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি শুধু যে মানুষের মনের অচেতন স্তরের রহস্য অবগত ছিলেন, তাহাই নহে মনকে জয় করবার কৌশলও তিনি আমাদের শিখাইয়াছেন। তিনি যে ষ্টাঙ্গযোগের কথা বলিয়াছেন, তাহার সাহায্যে মানুষ চিন্তের বৃত্তিসমূহকে একটি লক্ষ্যের অভিমুখ করিতে পারে, ইন্দ্রিয়সমূহের উপর পরম বশতা লাভ করিতে পারে।

স্বামিজী বলিয়াছেন—পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বহিঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া প্রয়োজন সাধন করিতে চাহিয়াছে, আর ভারত অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিবার সাধনা করিয়াছে। মানুষ কিভাবে অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিতে পারে যোগ-শাস্ত্র তাহারই পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের দিক হইতে দেখিতে গেলে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যিনি অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিয়াছেন, তিনিই তো বিশ্ব-জয়ী। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—‘জিতং জগৎ কেন মনোহি যেন’। স্বামিজীর কণ্ঠে আমরা ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। ‘He conquers all who conquers self’। জ্ঞানযোগে স্বামিজী বলিয়াছেন—‘আমরা হৃদয়ের রাজ্যে বাস করিতেছি। এখানে যে হাসে তাহাকেই কাঁদিতে হয়, আর যে ক্রন্দন করে, তাহারই মুখে পুনরায় হাসি ফুটিয়া উঠে। ইহার নাম মায়া। মানুষ যে পরিমাণে নিজের সুখকে বর্ধিত করিতে চায়, দুঃখকে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে বর্ধিত করে। ইহারই নাম মায়া।’ একালের পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে Law of Relativity স্বীকৃত হইলেও মানুষ যে হৃদয়ের রাজ্যে বাস করে, এ কথাটা তেমন স্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে নাই। মানুষ যে পর্বন্ত হৃদ্বাতীত হইতে না পারিবে, সে পর্বন্ত দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে

না। ইহা গভীর সত্য। তাই গীতা, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র আমাদেরকে নির্বন্দ্য হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যিনি দ্বন্দ্বাতীত, একমাত্র তিনিই আত্মজয়ী বা স্থিতধী হইতে পারেন। প্রতীচ্যের মনোবিজ্ঞানে মানুষের ইচ্ছাশক্তি বা মনঃশক্তির (will-force) কথা বলা হইয়াছে, মানুষ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, একথাও স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে মানুষ তাহার দেহ-মনের রূপান্তর সাধন করিতে পারে, তেমন কোন পদ্ধতি পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। মানুষের দিব্যজীবন-লাভের স্থনির্দিষ্ট সাধন পদ্ধতি রহিয়াছে ভারতের যোগদর্শনে ও তন্ত্রশাস্ত্রে। পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত ইয়ুং (Jung) ভারতের যোগদর্শনের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ‘আমাদেরকে (অর্থাৎ পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে) দেশকালের উপযোগী অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে যাহার সাহায্যে আমরা মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারি (we shall have to invent our own yoga)।’ বাস্তবিক, পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতরা যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতীয় যোগশাস্ত্রের আলোচনা করেন তবে তাঁহারা মনোবিজ্ঞানের উপর নূতন আলোকপাত করিতে পারিবেন।

আমরা সকলেই জানি, দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এ সম্পর্কটি কিরূপ? এ বিষয়ে নানা মূনির নানা মত। এ বিষয়ে জড়বাদীদের মত অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। জড়বাদীরা বলেন, যাহাকে আমরা মানস ক্রিয়া বলি, তাহা মূলত মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া। যত্ন হইতে যেমন পিত্ত নিঃসৃত হয়, তেমনই মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিঃসৃত হয়। (The brain secretes thought as the liver secretes bile). স্বামীজী বলেন, জড়বাদীদের মত প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতেরই প্রতিধ্বনি। উপনিষদে তো স্পষ্টই বলা হইয়াছে, মন অন্নময়। একটি আখ্যায়িকার সাহায্যে ঋষি প্রমাণ করিয়াছেন, দীর্ঘকাল অনাহারের ফলে দেহ দুর্বল হইলেও মনও চিন্তায় অক্ষম হয়, আবার আহার গ্রহণের পর দেহ সবল হইলে মনের চিন্তাশক্তিও ফিরিয়া আসে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে আমরা যে আহার গ্রহণ করি, তাহারই সূক্ষ্ম অংশ মন। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগৎ হইতে যাহা আহরণ করি, তাহারই নাম আহার। আচার্য শঙ্কর ‘আহার’ কথাটির এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবদ্ গীতায়ও এই অর্থে ‘আহার’ কথাটির প্রয়োগ আছে, যথা—

‘বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে’ ॥

ক্লোকটি মনোবিজ্ঞানীর নিকট অত্যন্ত মূল্যবান । তিনি জানেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিলেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি যায় না । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, একমাত্র আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হইলে এই আসক্তি দূর হইতে পারে ।

—পার্থসারথির মতেও ইন্দ্রিনিগ্রহ বা Repression কল্যাণের পথ নহে । নিগ্রহ আর সংযম যে এক কথা নহে, ইহা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না ।

উপনিষদে ‘আহার’ সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কথা আছে । ‘আহার-শুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইতে শ্রুতি বা আত্মস্বরূপের জ্ঞান নিশ্চল হয়, আর ইহার ফলে সকল গ্রন্থি বা বন্ধন হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করে ।’ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । রামানুজ অবশ্য খাত্ত অর্থে আহার কথাটিকে গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি জাতিদুষ্ট, নিমিত্তদুষ্ট ও আশ্রয়দুষ্ট খাত্তের কথা বলিয়াছেন । শঙ্কর ও রামানুজের এই ব্যাখ্যার উল্লেখ স্বামিজীর বক্তৃতায় আছে । তিনি আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন । এই ব্যাখ্যাটিও মনস্তত্ত্ববিদের প্রণিধানযোগ্য । উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা আহরণ করি, তাহাই আমাদের মনকে নির্মাণ করে । অতএব যিনি চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে আহারশুদ্ধির প্রয়োজন আছে । আর আমরা তো শুধু রসনার দ্বারাই আহার করি না, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আহার করি । তাই চিত্তশুদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমের একান্ত প্রয়োজন । আবার, রামানুজ বলেন, আশ্রয়দুষ্ট খাত্তও মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে । যাহারা আমাদের আহার্য রন্ধন বা পরিবেশন এমনকি, স্পর্শমাত্র করে, তাহাদের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয় । শ্রীরামকৃষ্ণ গতানুগতিক জাতিভেদ মানিতেন না কিন্তু তাঁহার মধ্যে এমন একটি অন্তর্দৃষ্টি ছিল যাহার ফলে তিনি আশ্রয়দুষ্ট দ্রব্য দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন । আশ্রয়দুষ্ট খাত্ত যে মনকে মলিন করে, একথা স্বামিজীও স্বীকার করিয়াছেন । সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহার সম্পর্কে ভারতের ঋষিগণ যে বিচার করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এই সকল কথা এ কালের মনোবিজ্ঞানীদের পক্ষেও হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতো নয় ।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন । কারণ, ইহাতে আমাদের

আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হইবে এবং আমরা মনের স্বরাজ্য লাভ করিব। কাজেই আমাদের সর্বদা চিন্তা করিতে হইবে, ‘অহং ব্রহ্মস্মি’, ‘আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত’, ‘আমি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা’। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এইরূপ চিন্তনের নাম ভাবনা বা auto suggestion। প্রতিদিন প্রভাতে সুপ্তোখিত হইয়া আমাদের তাই বলিতে হয়—

‘অহং দেবো ন চাশ্রোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।

সচ্চিদানন্দ রূপোহহম্ নিত্যমুক্ত স্বভাববান্’ ॥

স্বামিজী বলিয়াছেন—

“তুমি যে কর্মই করনা কেন, তোমার জন্ত বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের মহান তত্ত্ব অরণ্যে বা গিরিশৃঙ্খায় আবদ্ধ থাকিবে না, বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটারে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে, সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক বালিকা, যে যে কার্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। অতি অল্প কর্মও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অদ্ভুত ফললাভ হয়; অতএব যে যতটুকু পারে করুক। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে, বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে।”

বাস্তবিক, ভাবনার দ্বারাই মানুষের দেহ ও মনের রূপান্তর ঘটে। মানুষ ভাবনার অনুরূপ সিদ্ধিই লাভ করে। যোগসাধনা, তান্ত্রিক সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, সকল সাধনারই লক্ষ্য কামকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া নবজন্ম লাভ করা। মহাপুরুষ ঈশাও এই নবজন্মলাভের কথা বলিয়াছেন। ‘Unless you are born again, you cannot enter into the kingdom of God.’ তান্ত্রিক সাধকের ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ত্র্যাস প্রভৃতি প্রক্রিয়াও এই একমাত্র লক্ষ্যের অভিমুখ। তান্ত্রিক সাধক বলেন—দেবো ভূত্বা দেবং যজ্ঞে। দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত হওয়াই তাঁহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য।

মহর্ষি চরকও বলেন—রজোগুণ ও তমোগুণই মানসিক ব্যাধির কারণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্থিতি ও সমাধির সাহায্যে মানুষ মানসিক ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

তাই স্বামিজী বলিয়াছেন—

‘ভোগবাসনা সংযমের ফল অতি শুভ। যৌন শক্তিকে আত্মিক শক্তিতে

রূপায়িত করিতে হইবে। শক্তি যত প্রবল হইবে তাহা দ্বারা তত বেশী কাজ সাধিত হইতে পারে। খরস্রোত জলধারাকে সংযত করিবার ফলেই হয় প্রচণ্ড হাইড্রলিক শক্তির উদ্ভব।’

এই যে কামের উদগতি, মনোবিজ্ঞানে ইহাকে বলে Sublimation of the libido। আমরা বলিয়াছি, এই উর্ধ্বমুখীকরণের পন্থা পাশ্চাত্য দেশ আবিষ্কার করিতে পারে নাই, আবিষ্কার করিয়াছে সনাতন ভারত। ভারতের যোগী, ঋষি ও সিদ্ধ পুরুষগণই মনের স্বারাজ্য বা স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। অবশ্য, পাশ্চাত্য দেশেও মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে কিন্তু তাঁহারা যে প্রাচ্যের ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিমল দত্তের

কাণ্ডার প্রিজেস

হৃত্যুভয়াল বিচিত্র কাহিনী
৩য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের	প্রফুল্ল রায়ের	
বিষকুন্ত ২য় মুঃ	৪'০০ ॥	সিন্ধুপারের পাখি ২য় মুঃ ৯'০০ ॥
চক্রী ৩য় মুঃ	৩'৭৫ ॥	পূর্বপার্বতী ২য় মুঃ ৮'৫০ ॥
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	সরোজকুমার রায়চৌধুরীর	
রাতভোর ২য় মুঃ	২'০০ ॥	কুশাণু ২য় মুঃ ৬'০০ ॥
মাথুর ২য় মুঃ	৪'০০ ॥	নীলাঞ্জন ২য় মুঃ ৪'০০ ॥
স্ববোধকুমার চক্রবর্তীর	রমাপদ চৌধুরীর	
মণিপদ্ম ২য় মুঃ	৪'০০ ॥	পিয়্যাপসন্দ ৫ম মুঃ ৩'০০ ॥
তুঙ্গভদ্রা ২য় মুঃ	৪'০০ ॥	মুক্তবন্ধ তিন টাকা ॥
রূপদর্শীর	রঞ্জিৎকুমার সেনের	
কথায় কথায় ২য় মুঃ	৩'০০ ॥	দৈতসঙ্গীত ৪'০০ ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

কয়লাকুঠির দেশে ২য় মুঃ ৩৫০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

বিবেকানন্দের কর্ম-পরিণত বেদান্ত

পরেশনাথ ভট্টাচার্য

আধ্যাত্মিক কৃপমণ্ডুকতা বিবেকানন্দকে স্পর্শ করে নাই। বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার অন্তঃসারটুকু যথাশক্তি শোষণ করিয়াছেন, আবার উহার বহিরাবরণকেও অনুতবোধে পরিহার না করিয়া সত্যবোধে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সত্যের হিরণ্ময় পাত্রকে উন্মোচন করিয়া উহার কল্যাণতম রূপকে নিজবোধরূপে উপলব্ধি করাই ছিল তাঁহার আজন্ম তপস্বীতা। কিন্তু নিজবোধরূপ আত্মসঙ্গায় অবস্থান করিয়াও তিনি উহাতে লীন হইয়া থাকিতে চাহেন নাই। রামকৃষ্ণবর্ণিত সমুদ্রলীন লবণ-পুত্তলিকার মত পরম সত্যো নিরবশেষ-সত্তা হইয়া থাকা তাঁর কাম্য ছিল না। সমাধির ও ব্যাখ্যানের, অন্তরের ও বাহিরের, তত্ত্বোপলব্ধির ও ব্যবহারিক প্রয়োগের, একমেবাদ্বিতীয়ত্বের ও অনৈক্যবিজ্ঞপ্তিত জগতের একান্তরতা, পর্যায়ক্রমিকতা এবং পারস্পর্যই ছিল বিবেকানন্দের অধ্যাত্মসাধনার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ পরম সত্যের উভয় কোটিকে স্বীকার করিয়া সেই ভিত্তিতে ব্যবহারিক জীবনের বিভ্রাস ও সংগঠনই বিবেকানন্দের সর্বাদ্বীন ও ব্যাপক অধ্যাত্মদৃষ্টি।

সুতরাং সত্যের উভয় কোটির একটি কোটিকে তত্ত্বরূপে গ্রহণ এবং অপরটিকে অনুতবোধে বর্জন করিবার একদেশদর্শিতা বিবেকানন্দের অধ্যাত্মদৃষ্টিকে স্থাঙ্ক এবং পঙ্কু করে নাই। মত এবং পথের, তত্ত্ববোধ এবং তত্ত্বাহুশীলনের একতানতা তাঁহাকে একধারে কর্মিষ্ঠ এবং তত্ত্বনিষ্ঠ করিয়াছে। সত্যের উভয়-লিঙ্গতা, শিব-শক্তির অবিণাভাব, পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্মতা, সত্তা-প্রকাশের যৌগপত্ত এবং ব্রহ্ম-জগতের অবিচ্ছেদ্যতা—এক কথায় অধ্যাত্মদৃষ্টির ব্যাপকতা ও সর্বাদ্বীনতা বিবেকানন্দকে শুধু গুহাহিত চেতনা করিয়া রাখে নাই, কিন্তু লোকসংগ্রহের অথবা জনকল্যাণের ব্রতে নিয়োজিত করিয়াছে। যদি তত্ত্বের একটি কোটিতে তাঁহার দৃষ্টি পর্যবসিত হইত তাহা হইলে হয়ত তিনি শুধু তত্ত্বদৃষ্টা অথবা কর্মবীর, সত্তালীন অথবা প্রকাশচঞ্চল পুরুষ হইয়াই থাকিতেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ-নির্দেশিত মূল-কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত মহা-মহীকহটি হইয়া দাঁড়াইতেন না এবং ত্রিতাপতপ্ত জীবের অভয়-আশ্রয় হইতেন না। স্বচ্ছ তত্ত্বদৃষ্টির সহিত বলিষ্ঠ তত্ত্বাহুশীলনের, স্বচ্ছ সত্যোপলব্ধির সহিত সাহসিক সত্যপ্রয়োগের প্রয়াসই বিবেকানন্দ-জীবনের বৈশিষ্ট্য।

একটি গৌরবময় ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতির লুপ্ত সংবিৎ ফিরাইয়া আনিতে হইলে চাই উহার ধারক এবং বাহক এমন একজন পুরুষ যিনি জাতির অতীত ঐতিহ্যকে বর্তমান ও বাস্তবের সহিত পুনরুপযোজন করিতে পারেন। বিবেকানন্দ সেই ভারতীয় পুরুষ যাহার মধ্যে এই জাতিমানসের নিষ্কর্মান বা বিশ্বতগৌরব বাস্তবের আলোকে চেতন হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নবতর বাস্তব পরিস্থিতির নূতন সমাধান, নূতন ভাষা এবং নূতন উপযোজনের উদ্ভাবয়িতা ছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁহার মতে বেদান্তের পুনরুজ্জীবনই মরা গাঙে বান তুলিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই বেদান্ত শুধু ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্র, উহার সারীরক প্রভৃতি ভাষ্য, ভাসতী প্রভৃতি টীকা এবং বেদান্তকল্পতরু প্রভৃতি টিপ্পনীর পঠন-পাঠন নয়। শুধু পঠন-পাঠনের ফল সীমাবদ্ধ থাকে মুষ্টিমেয়সংখ্যক পণ্ডিতের মধ্যে। এই ফল আপামর জনসাধারণকে স্পর্শ করে না। স্বতরাং দেশের অগণিত মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যায়। এই সকল মানুষ শত শতাব্দীর করুণ কাহিনী স্নানমুখে ধারণ করিয়া নতশির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারা কোনো প্রকারে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচাইয়া রাখে মাত্র। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে ইহাদের মধ্যেই রহিয়াছে ভারতের স্বপ্ত শক্তি। কর্মপরিণত বেদান্তের স্পর্শে এই স্বপ্ত শক্তিকে জাগাইতে এবং ক্লিষ্ট জনগণের মোহনিদ্রা ঘুচাইতে হইবে। এই জন্য চাই বেদান্তের মৃত সঞ্জীবনী বাণী।

বিবেকানন্দ আক্ষেপ করিয়াছেন যে ভারতে বেদান্ত কর্মপরিণত রূপ গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ বেদান্তের অদ্বৈতশিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বাস্তব আকার ধারণ করে নাই, অথবা উহা সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই। এই আক্ষেপে তিনি সঠিকভাবে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন বলা কঠিন। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই যে বেদান্ত হিন্দুর জীবনকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত, শুধু তাহাই বা কেন, হিন্দুর জীবনসত্তার জন্মের পূর্ব অবস্থা হইতে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত—এক কথায় তাহার সমগ্র সত্তাকে অথবা তাহার ইহকাল-পরকালকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় ঋতি-স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ যে দিকেই তাকানো যায় সেইদিকেই দেখা যায় যে উহার মূল প্রতিষ্ঠা বেদান্ত। হিন্দুর দশবিধ সংস্কার, তাহার আহার, বিহার, ব্রত, পার্বন, পূজা, উপাসনা—অর্থাৎ তাহার জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বেদান্তের শাসনে অনুশাসিত। আহার আরম্ভে পঞ্চদেবতার উদ্দেশে আহার্যের উৎসর্গ, আবার আহারান্তে অমৃতদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া পাত্রভ্যাগ বেদান্তের

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পূজার বিবিধ অঙ্গ, যেমন আসন, আচমন, সূর্যার্ঘ, সন্তিবাচন, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন, সামাগ্ধ্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি, করতাস, অঙ্গতাস, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিসর্জন, শান্তিমন্ত্র প্রভৃতি একটি অল্প সময়কে অর্থাৎ বৈদান্তিক তত্ত্বকে বুঝিবার বা উপলব্ধি করিবার উপকরণ মাত্র। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। বেদান্ত-প্রতিপাত্ত ব্রহ্মই দেবতার আকারে উপাসিত হইয়া থাকেন।

তাহা হইলে মনে হয় যে বিবেকানন্দ বেদান্তকে যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা যথার্থ নয়। বেদান্ত হিন্দুজীবনের সমগ্র সত্তাকেই কর্মপরিণতরূপে প্রভাবিত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে বিবেকানন্দের এই দোষারোপ উড়াইয়া দিবার মত নয়। বেদান্ত যদি সত্যই হিন্দুর সমগ্র জীবনসভায় অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে তাহা হইলে হিন্দুর বর্তমান দৈনন্দিন্যের কারণ কি? বেদান্তের অদ্বৈতমন্ত্র যদি হিন্দুসমাজের সকল স্তরেই কর্মপরিণত হইয়া থাকে, “অহং ব্রহ্মস্মি”, “চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্” অথবা “জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ” প্রভৃতি মন্ত্রের উত্তরাধিকারী হিন্দু পরাধীন হয় কেন, কেনই বা আপামর হিন্দু জনসাধারণ তাহার সমাজের বিধি-ব্যবস্থার সমান অংশীদার নয়, কেন আর্থিক বণ্টনের ও নানা অধিকার-ভোগের বৈষম্য ঘটে? স্তত্রাং স্বীকার করিতে হয় যে “সকলেই অমৃতের সন্তান” এই বাণী শুধু পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—কর্মপরিণতরূপ লইয়া দেখা দেয় নাই। অথবা এই সকল বাণী শুধু মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি দিয়াই মনন করা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তব জীবনস্পর্শে উপলব্ধ হয় নাই।

একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপই আব্রহ্মস্বত্বপর্বন্ত সকল বস্তুকে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত, যিনি প্রত্যেকটি ধূলিকণায় তিনিই জীবাত্মায় প্রকাশিত—ইহাই বেদান্তের মূল তত্ত্ব। নেহ নানান্তি কিঞ্চন—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি স ইহ নানৈব পশুতি—এই অদ্বৈতদর্শনই বেদান্তের মর্মকথা। যোমাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি, শুধু তাহাই নয় প্রতিটি জড় বা চেতন পদার্থই আমি, আবার আমিই প্রতিটি জড় বা চেতন পদার্থ—ইহাই মূল বৈদান্তিক শিক্ষা। এই শিক্ষা অনুসারে প্রকৃতভাবে সমদর্শী ব্যক্তিই বৈদান্তিক। বিভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী। শুনি চৈব স্বপাকে চ মণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। অর্থাৎ বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে ব্রহ্মজ্ঞানিগণ সমদর্শী অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করেন। এইরূপ বৈদান্তিক সমদর্শনের সহিত ব্যবহারিক আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেই এই সমদর্শনকে কর্মপরিণত বেদান্ত অথবা প্রায়োগিক অর্থে বৈদান্তিক

দৃষ্টিভঙ্গী বলা যাইতে পারে। উপরোক্ত কর্মপরিণত বেদান্তের প্রধান লক্ষণ হইল ভালবাসা বা প্রেম। “জীবে দয়া করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।” এইরূপ বিশ্বজনীন অর্থে জীবপ্রেম, শুধু জীবপ্রেমই নয় প্রতিটি সত্তাবান পদার্থের প্রতি প্রেম বা বিশ্বপ্রেমই যদি কর্মপরিণত বেদান্তের প্রধান লক্ষণ হইয়া থাকে তবে তাহা হইলে ইহা যে বিবেকানন্দকালীন ভারতে সক্রিয় ছিল না তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ সমদর্শনের পরিচয় সাম্য-নিয়ন্ত্রিত জীবনে। অথচ হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থা নানাপ্রকার বিশেষ অধিকার বা প্রিভিলেজ্-এর দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট। কাহারও মন্দিরে প্রবেশ এবং দেবপূজার অধিকার রহিয়াছে, কাহারও বা তাহা নাই। ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমান দৃষ্টিকে দেখা দূরে থাকুক, চণ্ডালকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে কুকুরের মত অথবা তদপেক্ষা বেশী অবজ্ঞা দেখাইয়াছে তৎকালীন হিন্দুসমাজ।

স্বামীজী “বেদান্ত ও বিশেষ অধিকার” শীর্ষক একটি বক্তৃতায় বলিতেছেন, “আমাদের কোনো ভারতীয় পুরোহিতকে যদি জিজ্ঞাসা করি, ‘আপনি কি বেদান্তে বিশ্বাস করেন?’ তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘বেদান্তই আমার ধর্ম; আমি অবশ্যই উহাতে বিশ্বাস করি; উহাই আমার জীবন।’ ‘আচ্ছা বেশ, আপনি কি সকল প্রাণীর এবং সকল বস্তুর সমতা স্বীকার করেন?’ এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেন, ‘নিশ্চয়ই করি।’ কিন্তু পরমুহূর্তেই হয়ত কোন নীচ জাতির লোক ঐ পুরোহিতের নিকটে উপস্থিত হইল, আর তৎক্ষণাৎ উনি ঐ লোকটিকে বর্জন করিবার জন্ত পথের এক পার্শ্বে লাফাইয়া সরিয়া গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনি লাফাইলেন কেন?’ তিনি বলিলেন, ‘কারণ ঐ লোকটির স্পর্শ আমাকে অপবিত্র করিত।’ আমি বলিলাম, ‘কিন্তু আপনি যে এইমাত্র বলিলেন আমরা সকলেই সমান এবং আত্মার সহিত আত্মার পার্থক্য নাই।’ তিনি বলিলেন, ‘হাঁ এটি গৃহীর পক্ষে একটি তত্ত্ব বা মতবাদ মাত্র; আমি যখন বানপ্রস্থে যাইব তখন সকলকে সমান চক্ষে দেখিব।’

উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি শুধু উল্লিখিত পুরোহিতের আচরণেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহা অল্লাধিকভাবে সকল হিন্দুর পক্ষেই সমান সত্য। বিবেকানন্দকালীন ভারতে কর্মপরিণত বেদান্ত আচরিত হয় নাই, ইহা অনস্বীকার্য। বিবেকানন্দ আলমোড়া হইতে শ্রীযুত মহম্মদ সফরাজ হোসেনকে লিখিত পত্রে বলিয়াছেন, “কর্মপরিণত বেদান্ত যাহা সহস্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্বজনীন ভাবে কখন পুষ্টিলাভ করে নাই।” এই উক্তিযে স্বামীজী বলিতে চাহিয়াছেন

যে কোনকালেই বেদান্তের মূলমন্ত্র বা শিক্ষা আপামর হিন্দু জনসাধারণের জীবনে আচরিত হয় নাই। বেদান্ত একেবারেই বা কোনকালেই বা কাহারও দ্বারাই কর্মপরিণত হয় নাই—এইরূপ কোন বক্তব্য উপরোক্ত আক্ষেপে বর্ণিত হয় নাই। জনক যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি হয়ত তাঁহাদের জীবন কর্মপরিণত বেদান্তের আলোকে রূপায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত সাধনার ফল জনসাধারণের মধ্যে অথবা সমষ্টিগত স্তরে নামিয়া আসে নাই। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে উপনিষদের ঋষি হয়ত উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চই ঐ অমৃত-স্বরূপের প্রকাশ। কিন্তু জনসাধারণ এই আর্ষ উপলব্ধির অংশীদার বা ফলভাগী হয় নাই।

সে যাহা হউক, উপরোক্ত ভঙ্গীর আলোচনার বিশেষ লাভ নাই। স্বামীজী কর্মপরিণত বেদান্ত বা প্রাকটিক্যাল বেদান্তিজম্ বলিয়া যাহা বুঝাইতে চাহেন তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করা যাউক। আমরা সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ, স্তত্রাং সকল জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের উত্তরাধিকারী। আমরা অল্প নই, কিন্তু ভূমা বা বৃহৎ। ‘পাপোহং পাপকর্মাং পাপাত্মা পাপদম্বরঃ’ এইরূপ চিন্তা বা আচরণ কর্মপরিণত বেদান্তের বিপরীত। আমরা নিত্য, শুদ্ধ, অপাপবিন্দ। অজ্ঞানের আবরণজাল আমাদের এই সত্যস্বরূপ অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করিতে পারে না। তাহা হইলে কর্মপরিণত বৈদান্তিক বুঝিবেন সে তিনি শুদ্ধ এবং অপ্রতিহত শক্তি—পাপ বা দুর্বলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেদান্তের প্রধান বাণী হইল অদ্বৈত বা একত্বের বাণী। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। স্তত্রাং ধূলিরেণু হইতে বিরাট আকাশ পর্যন্ত, কোন বস্তুই ধ্বংস নাই। উহাদের রূপ-পরিবর্তন বা বিকার ঘটিতে পারে মাত্র—কিন্তু উহাদের সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই। “কিছু নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয়, তব মহিমায়।” মামুখ হইতে কীটানুকীট পর্যন্ত সকল প্রাণী এই ব্রহ্মে অবস্থিত। স্তত্রাং অহিংসা, প্রেম, সেবা অথবা এক কথায় সমদর্শনই কর্মপরিণত বেদান্তের লক্ষ্য। ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি একত্বদর্শনের পরিপ্লবী, স্তত্রাং পরিণত বেদান্তে ইহাদের স্থান নাই। তাহা ছাড়া যখন মৃত্যু নাই, তখন ভয় কিসের? কর্মপরিণত বেদনা মৃত্যুভয় দূর করিবে এবং সঞ্চয় করিবে অমিত বীৰ্য ও সাহস। আত্ম-বিশ্বাস কর্মপরিণত বেদান্তের সহচর। ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এই বোধের সহিত আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকিতে পারে না।

স্বামীজী পুনঃপুনঃ মানুষকে সাবধান করিয়াছেন কেহ যেন অপর কাহাকেও দুর্বল না বলে। বীরভোগ্যা বহুদ্বরা। ভারতীয়রা দুর্বল নয়। তাহারা কর্মপরিণতর বেদান্তের অভয় ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইলেই পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে। তাহারা স্থপ্ত সিংহ, জাগ্রত মেঘশাবক নয়। বেদান্তের অদ্বৈতমন্ত্র শুধু দর্শনেই সীমাবদ্ধ নয়। জড়বিজ্ঞানও দেশ ও কালের গণ্ডী প্রসারিত করিয়া এক-বিশ্ব বা যুনিভার্স রূপ লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে। আত্মতত্ত্বই কর্মপরিণত তত্ত্ব। আত্মবিশ্ব বা আত্মবিশুদ্ধ হইলে এই বিশ্ব অর্থহীন এবং সত্যবিহীন হইয়া দাঁড়ায়। এই আত্মাকে ছাড়িয়া মুহূর্তকাল থাকিতে পারি না। স্তবরাং আত্মবিদ্যাই প্রকৃত কর্মপরিণত বিদ্যা। আবার বেদান্ত আত্মবিদ্যারই নামান্তর। যে ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে বহুরূপে, অর্থাৎ আব্রহ্মস্বপ্নস্বপ্ন সকল বস্তুরূপে, বিশেষ করিয়া মেথর ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী অথবা নরনারায়ণরূপে, বিরাজমান সেই জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনাই কর্মপরিণত বৈদান্তিক উপাসনা। এই জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনার কেন্দ্রমন্দির হইল এই আত্মা। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। আবার সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাও কর্মপরিণত বেদান্তের মূল শিক্ষা। সকল ধর্মই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা। যত মত তত পথ। সকল ধর্মই সহজ অথবা কুটিল পথ ধরিয়া একই ঈশ্বরলক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রয়াস। সত্য সকলের জন্মগত অধিকার। এই জন্মগত অধিকার পরিপূর্ণ করে কর্মপরিণত বেদান্ত।

দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত কর্মপরিণত হয় বেদান্তজুশাসিত আচরণে। আত্মবেদং সর্বম্। স্তবরাং বহুধৈব কুটুম্বকম্। বেদান্তের আত্মোপলব্ধিতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মবৎ অল্পভূত হয়। আর এই আত্মোপলব্ধি কর্মপরিণত হয় আপামর ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর সহিত একাত্মতাবোধে যাহার ফলে প্রত্যেকের প্রতি সমবেদনা অথবা সহানুভূতি জাগিয়া ওঠে। স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, ঘেঁষা, হিংসা, লোভ প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমের সর্বপ্রাণী প্রবাহে ভাসিয়া যায়। দুঃখীর দুঃখ, আত্মের আত্মনাদ হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাজিয়া ওঠে। সকলের দুঃখ বা ব্যথা নিজ বলিয়া অল্পভূত হয়। কর্মপরিণত বৈদান্তিক সেবাব্রতী হইয়া ওঠেন। ঈশ্বর জানে, সকলের সেবাই তাঁহার ধর্ম হইয়া দাঁড়ায়। অজ্ঞানান্ধকার এই আত্মবোধকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাই কর্মপরিণত বৈদান্তিক প্রকৃত শিক্ষকের মত জ্ঞানাজ্ঞানশলাকার সাহায্যে মানুষের অজ্ঞান নাশ করিবার জন্ত সচেষ্ট হন। একাত্মপ্রত্যয়সার উপলব্ধিতে মৃত্যুভয় পরাস্ত হয়। সত্যম্ জ্ঞানমনস্তম্ উপলব্ধিতে আত্মার অসীমত্ব এবং অমরত্ব

সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না। তাই কর্মপরিণত বৈদাস্তিক অকুতোভয়। শিকাগো বিশ্ব-ধর্ম-সভার বক্তৃতামঞ্চে বক্ষকপাটে হাত দুইখানি নিবদ্ধ করিয়া পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের অল্পম ও দৃপ্তভঙ্গী এই অকুতোভয়তার জাজ্জল্যমান চিত্র।

বলা বাহুল্য যে কর্মপরিণত বৈদাস্তিক শান্ত দান্ত ও সমাহিত। তিনি শান্ত মনে ও প্রেমনয়নে তাঁহার চিৎসন নিরঞ্জনসত্তাকে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার দান্তভাবে নিকট ষড়রিপু পরাজিত হয়। রামকৃষ্ণের মতই তিনি কামকে প্রেমে পরিণত করেন। তিনি স্বস্বরূপে নিত্য সমাহিত থাকেন। স্বরূপেই তিনি উপলব্ধি করেন বিশ্বভুবনের স্বরূপ, আবার বিশ্বভুবনে তিনি শুধু নিজ আত্মাকেই দেখেন। সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। বাহির তাঁহার নিকট অন্তর, আবার অন্তর তাঁহার নিকট বাহির। অথবা অন্তর তাঁহার নিকট বাহিরের ভেদ নাই, উভয়ই সমান। স্তূতরাং আবার আত্মদর্শন, অথও সচ্চিদানন্দ-অনুভূতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। কর্মপরিণত বৈদাস্তিক জীবমুক্ত। শুধু লোকসংগ্রাহের জন্ত তিনি সকলের মুখে হাসেন আবার দুঃখে কাঁদেন।

অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
শত্রুর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

কর্মপরিণত বেদান্তের যে সূচনা স্বামীজী করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা আজ মহামহীরূপের মত অগণিত নরনারীর আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন নিখিল বিশ্বে ইহার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। অজ্ঞান, ভীতসন্ত্রস্ত, আর্ত-পীড়িত মাহুষকে বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠান জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণী স্রোতে অভিস্রাত করিতেছে। তাহাদিগকে অভয়বাণী শুনাইতেছে বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত কর্মপরিণত বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও আশ্রম। ইহার সেবাব্রত আর্ত ও পীড়িত মাহুষকে দিতেছে নূতন প্রাণ ও শক্তি।

বিবেকানন্দের সাধনা ও সিদ্ধি

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

সূত্রে যেমন মণিহারের মণি, মানব-সমাজের বিভিন্ন জ্ঞান, জগৎ-ব্যাপারের অশেষ বিচিত্রতাও তেমনি। সব ধর্মই সত্য। জগতে জাতিতে জাতিতে আদর্শ বিনিময়ের সময় এসেছে। এই ছিল বিবেকানন্দের বিশ্বাস। ১৮২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা এসব। তার আগের পর্বে, ১৮৬৮-তে পরমহংসদেবের লোকান্তর-প্রাপ্তির সময় থেকে ১৮৯৩-এ শিকাগো-যাত্রা অবধি নানা ভ্রমণ ও বহুল অধ্যয়নের পথেও এই উপলব্ধিই তিনি পেয়েছেন। ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনেছিলেন-সিফটার নিবেদিতা। ইংলণ্ডে স্বামীজীর বক্তৃতা তখন প্রসিদ্ধ ব্যাপার। নিবেদিতা ভারতে আসেন আরো পরে,—২৮এ জানুয়ারি, ১৮৯৮। ১৮৯৫-এ স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে যান, সে-সময়ে এইসব বিশ্বাসের কথাই তাঁর বক্তৃতায় এবং আলোচনা-সভায় তিনি বার-বার বলেছেন। ১৮৯৬-এর জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর কেটেছে সেভিয়ার-দম্পতি আর কুমারী মুলারের সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে। ডিসেম্বরে কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে রোম হয়ে তাঁকে ভারত-প্রত্যাবর্তনের পথে অগ্রসর দেখা যায়। ১৮৯৭-এর ১৫ই জানুয়ারি তিনি কলকাতা পৌঁছেছিলেন।

নিবেদিতা তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মধ্যে তিনটি প্রধান বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন। প্রথম, ইংরেজি আর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অধিকার; দ্বিতীয়, গুরু রামকৃষ্ণদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধায় অলৌকিক মহিমাময় তাঁর চরিত্র-মাদুর্য; তৃতীয়, ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ, সান্নিধ্য তথ্যজ্ঞান। ত্যাগই তাঁর সাধনা, কর্মই তাঁর সিদ্ধি।

সকলেই জানেন, রামকৃষ্ণঠাকুর নরেন্দ্রকে জিগেস করেছিলেন, ‘তোমার জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ কি?’ উত্তরে স্বামীজী বলেন—সর্বদা সমাধিস্থ থাক। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছায় আর বিধাতার বিধানে লোকশ্রেয়ের জন্তেই নিত্য সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ঈশ্বরচিন্তার ফলে মানুষের সংকীর্ণ আমিষ্ববোধ বশীভূত থাকে। সকল অবস্থায়, সকলের পক্ষেই কর্ম শ্রেয়; কর্ম ব্যতিরেকে মুক্তি দুর্লভ,—এই হোলো কর্মযোগের আদর্শ। বিবেকানন্দের সাধনা আর সিদ্ধি এই নিত্য ঈশ্বরচিন্তাময় অথও কর্মপরায়ণতায়। দেহবুদ্ধির

একান্ত অভাবই যথার্থ সাধুর লক্ষণ। সেই অর্থে, ছিলেন তিনি সাধুশিরোমণি। সাধু-সজ্জনেরা সংসারের মায়া সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। তাই স্তূথে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ধচিত্ত হওয়াই কর্তব্য। সংসার স্তূথ-দুঃখের হাট। বিবেকানন্দ লগুনে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘আমরা যে সামান্য স্তূথ ভোগ করিতেছি, অল্প কোথাও সেই পরিমাণে দুঃখ উপন্ন হইতেছে। ইহাই নিয়ম। যুবকেরা হয়তো ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু ষাঁহারা দীর্ঘদিন জীবিত আছেন, অনেক যত্না ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া।’ এ তাঁর কথার হুবহু বঙ্গানুবাদ।

আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা একেবারেই জাগে না, জগতে এ-রকম মানবমন আছে কি না, বলা শক্ত। তবে, মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ মন যে অসম্ভব নয়, সে অভিজ্ঞতা সুপরিচিত। আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্তূথ বোধও যেমন জাগে, দুঃখ অনুভব করার সম্ভাবনাও তেমনি বেড়ে যায়! উন্নতির সঙ্গে স্তূথদুঃখের এই অনুভববৃদ্ধিও মায়া। বেদান্ত এই স্তূথ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল, আশা-নৈরাশ্যের মিশ্র পরিব্যাপ্তিকে মেনে নিয়েছে। অতএব স্তূথ-সন্ধান নয়, কর্মনিযুক্তিই বেদান্তের নির্দেশ! কর্মই যথার্থ বৈরাগীর সাধনা। স্বামীজী তাই বলে গেছেন—‘বৈরাগ্যই ধর্মের সূচনা’। বিষ্ণুপরাণ থেকে তিনি শ্লোক গুনিয়ে গেছেন তাঁর লগুনের শ্রোতৃমণ্ডলীকে :

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে ব ভূয় এবাভিবর্ধতে।

অর্থাৎ, আগুনে ঘি পড়লে আগুন যেমন বেড়েই যায়, কামনার আগুনে বাসনার বস্ত্র ধরা দিলে কামনা তেমনি আরো উদ্দীপিত হয়।

কিন্তু পরা বিচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে-লাভ কী? মানুষের সামর্থ্য তো মন আর কয়েকটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমিত! অনন্তকে জানবার চেষ্টা অহমিকা বলে মনে হওয়া কি অস্বাভাবিক?

এই সব তর্ক-জিজ্ঞাসার সূত্রে স্বামীজী বলে গেছেন, স্পেন্সার প্রভৃতি অজ্ঞেয়বাদী বিদ্বজ্জনের এই ধরনের কথায় ভুললে চলবে না। কারণ,—‘জীবন বলিলে সর্বোপরি আদর্শ-অন্বেষণের—পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায়।’ আমাদের এই আদর্শ লাভ করিতেই হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয় সেভাবে উহাকে

গ্রহণ করিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদী জীবনের আদর্শভাগ বর্জন করিয়া বাকীটুকু সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন।’ বলা-বাহুল্য, মানুষের এই স্বভাবও জগৎ-স্বভাব। এও মায়া! তিনি ‘মায়া’ ত্যাগ করতে বলে গেছেন।

পশু-মানব আর আধ্যাত্মিক-মানব,—মানুষের এই দুই সত্তার মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছে। সাহিত্যে যেমন ‘স্মৃতি’ আর ‘কুস্মৃতি’ কলহ, জীবনে সেই রকম ‘প্রেম’ আর ‘শ্রোয়ের’ দ্বন্দ্ব। সূদূর অতীত থেকে শুরু করে নিকটতম বর্তমান পর্যন্ত প্রবাহিত চৈতন্যের এক অনবচ্ছিন্ন ধারাতে আমরা জেগে আছি। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানকে মানা চলে না। অতীতের বহু দুঃখের অভিজ্ঞতা বাতিল করে দিয়ে, স্মৃতিকে উপেক্ষা করে। শুধু এই আপাতজ্ঞাত বর্তমান জগৎকেই চূড়ান্ত বলা সাজে না। সে দৃষ্টি শূন্যবাদীর দৃষ্টি। স্বামীজী তা মানেন নি। মানুষ মৃত্যু-ভাবনা বাদ দিয়ে চলতে পারে না। নিশ্চয়বাদী কোম্‌ প্রভৃতি ভেবেছিলেন যে, মানুষের মননশক্তি তার শরীর-যন্ত্রেরই দান। কিন্তু বিবেকানন্দ হিন্দু দর্শনের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে জানিয়ে গেছেন যে, এক অখণ্ড, অনন্ত আত্মাই জ্যোতির্গয় মনোদেহ অবলম্বন করে আমাদের স্থূল শরীরের গঠন-পরিচর্যায় নিযুক্ত আছেন। আত্মার আকৃতি নেই। আত্মা দেশ-কালে সীমিতও নন, দেশ-কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও নন! অতএব, দেহী যখন দেহাভিমান ত্যাগ করে নিজেকে স্বাধীন, বিমুক্ত ও সর্বাধিত ‘এক’ রূপে দেখলেন, তখনই যথার্থ আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হয়েছে বলা চলে। আত্মজ্ঞানীর কাছে এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ শুদ্ধস্বরূপ! সত্য অকুতোভয়! সত্যই পথ, সত্যই লক্ষ্য, সত্যই সাধনা!

১৮৮৬তে রামকৃষ্ণঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক মাস মাত্র আগে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে জিগেস করেন,—‘তোমার ত শরীর দিন কতক পরেই যাবে, আমার কি করে দেবে দাও।’ রামকৃষ্ণ বলেন, ‘ওরে, আমি মরছি, এই সময়ে তোর যত উৎপাত।’ কিন্তু অহুরাগের ব্যাকুলতার কাছে তাঁকে হার মানতে হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের অন্তরে তিনি শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল, নরেন্দ্রনাথ তখন অনেক তর্ক করেছেন। সেই কাশীপুর থেকেই কালী আর তারকনাথের সঙ্গে নরেন্দ্র গয়ায় গিয়েছিলেন। কাশীপুরে বাইবেল পড়তে পড়তে সেন্ট জনের স্নসমাচার থেকে ইহুদি-শাসক নিকোডিমাসের যীশু-অহুরাগের কাহিনীটি নরেন্দ্রনাথের মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণঠাকুর তখন অচিরেই দেহত্যাগ করবেন। তারপর? তারপর রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর কর্ম-সাধনায় আরো বলসঞ্চার দরকার! যীশুর শরীর যখন কবর দেওয়া হয়, তখন

নিকোডিমাস এসে সেই শরীরে গন্ধদ্রব্য অঞ্জলি দেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধকালে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বুদ্ধ, যীশু, শঙ্করাচার্য, এই তিন সাধকের সন্ধানের আলোচনায় গভীর আবেশ জেগেছিল। তখন তাঁর কাকা তারকনাথ দত্তের মৃত্যুকাল আসন্ন। হাইকোর্টে মামলা চলছে। সেই সময়ে, মহেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে একদিন একটা খার্ডক্লাস ঘোড়ার গাড়িতে সিমুলিয়ার বাড়িতে চলেছেন। কালী বেদান্তীকে শঙ্করাচার্যের সূত্র শোনাতে শোনাতে নরেন্দ্রনাথ বিভোর! ‘চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্’—এই কথা বলতে বলতে নরেন্দ্রনাথের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে! মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন—‘ভাবটা যেন প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেছে; ইহা গাত্রে যেন স্পর্শ করিতে লাগিল। ইহাকেই বলে নাদ-ধ্বনি।...নরেন্দ্রনাথ বিভোর, মাঝে মাঝে মাথা নাড়িতেছে, যেন ঘাড় মাথাকে স্থির করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চক্ষু কখন নিমীলিত, কখন বিক্ষারিত,.....কিন্তু সকল পরিবর্তনের ভিতর এক গভীর মহা আকর্ষণী ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, একটা মহাভাবে নিমগ্ন ও সংজ্ঞাহীন। জোর করিয়া যেন মনটা ফের দেহের ভিতর নামাইয়া আনিতেছে।’

সংসারে ব্যবহারিক জগৎ-পরিবেশেই মন আচ্ছন্ন থাকে। তাই সত্য-সাধনা বড়োই দুর্লভ কথা বলে মনে হয়। ১৮৯৬-এর ২৯এ অক্টোবর লণ্ডনের বক্তৃতায় বিবেকানন্দ কঠোপনিষদ থেকে যম-নচিকেতা কাহিনী আলোচনার সময়ে সেই কথার ইঙ্গিত করেছিলেন। মন প্রস্তুত না হলে ধর্মের কথা কানে ঢুকলেও মনে ঢোকে না। বুধা তর্ক নয়, ধর্ম প্রত্যক্ষের বিষয়। কাশীপুরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মন যেমন বিভোর ছিল, দশ বছর পরে লণ্ডনেও নরেন্দ্রনাথের মন সেই রকমই ব্যাকুল, প্রত্যক্ষজ্ঞানী, অধ্যাত্মচিন্তাময় ছিল! ১৮৯৬-এর এপ্রিল-মে মাসে তিনি আমেরিকা থেকে লণ্ডনে যান। তার কিছুদিন আগেই, মার্চের শেষে বা এপ্রিলের প্রথমে সারদানন্দ লণ্ডনে যান এবং শিবানন্দের বন্ধু, আগে থিওজফিক-সম্প্রদায়ভূক্ত,—পরে, আলমোড়ায় যোগাভ্যাস-অভিজ্ঞ ই. এফ. স্টার্ডি তাঁকে রেডিং শহরে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। এই স্টার্ডির সঙ্গে আগে থেকেই বিবেকানন্দের পত্রালাপ ছিল। সে-সময়ে জে. জে. গুডইইন নামে এক ইংরেজ যুবক বিবেকানন্দের কথাবার্তা, বক্তৃতা ইত্যাদি সংকেত-লিপিতে লিখে রাখবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ‘যে সকল ইংরাজি গ্রন্থ বক্তৃতারূপে স্বামীজীর নামে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্তই গুডউইনের পরিশ্রমের ফল।’ গুডউইনের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। মহেন্দ্রনাথের লেখা থেকেই এ তথ্য জানা যায়। গুডউইন বাথ নগরের সন্নিহিত ফ্রোম গ্রামে বাস করতেন। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন : ‘স্বামীজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে গুডউইনের সঙ্গে আসেন। তিনি নানা কারণে মাদ্রাজ প্রদেশে চলিয়া গেলেন ; তাঁহার ইচ্ছা ছিল অবসর পাইলে তাঁহার করচা হইতে প্রচলিত লিপি করিয়া স্বামীজীর কথোপকথন ও ভাষণের অংশ প্রকাশ করিবেন। সেই সকল বিষয় প্রচলিত লিপিতে লিখিত হইলে প্রায় সাত খণ্ড গ্রন্থ হইত। নানা কারণে তাহা হয় নাই এবং গুডউইনও মাদ্রাজ প্রদেশে দেহত্যাগ করেন। মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা প্রভৃতি স্বামীজীর কয়েকজন ভক্ত গুডউইনের দ্রব্যাদি ও কাগজপত্র তাঁহার মাতার নিকট প্রেরণ করেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ক্ষিপ্ৰলিপির কিছু বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দেন।’

গুডউইনের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই ভগিনী-নিবেদিতা ইংলণ্ডে যান। মহেন্দ্রনাথ তাঁকে গুডউইনের মায়ের ঠিকানা দিয়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু নিবেদিতা ফিরে এসে জানান যে, গুডউইনের মা এবং দুটি বোন—সকলেই অল্প কোথায় চলে গেছেন। এইভাবে গুডউইনের লেখা হারিয়ে যায়। মহেন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছেন : ‘স্বামীজী যখন লণ্ডনে বক্তৃতা দিতেন, তখন নার্সের পরিচ্ছদে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া স্বামীজীর দিবাভাগের বক্তৃতাসমূহ ক্ষিপ্ৰহস্তে লিখিয়া লইতেন। তিনি আমাদের সহিত কখনও মেশেন না বা আমরা কেহ তাঁহার ঠিকানা জানিতাম না ; তাঁহার কাছে স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা পাওয়া দুর্ভাষার বিষয়।’

এইসব কাগজপত্র নিরুদ্দেশ হয়েছিল বলেই মহেন্দ্রনাথ নিজে তাঁর ‘লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ’ বইখানি লিখেছিলেন। ১৩৩৮ সালের রাসপূর্ণিমা তিথিতে তাঁর সে বইখানির ভূমিকা লেখা হয়। সেই ভূমিকাতেই তিনি লিখে গেছেন— ‘গুডউইনের লিখিত কাগজের সহিত এই গ্রন্থ তুলনা করিলে হিমালয় পর্বতের সহিত বালুকণার যে সম্বন্ধ ইহা তদ্রূপ হইবে।’

সারদানন্দের বিলেত-যাত্রার সপ্তাহকাল পরেই মহেন্দ্রনাথ লণ্ডনে যান। বিবেকানন্দ তাঁকে আইন পড়তে নিষেধ করেছিলেন। তাই সেখানে তাঁর অল্প বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু হয়।

লগনে বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, জে. জে. গুডউইন ইত্যাদি সকলেই অল্পদিনের মধ্যে অল্প একটি বাড়িতে উঠে যান। সে বাড়ি লেডি মাগুর্সনের। স্টার্ডি সে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের চেহারা তখন বদলে গেছে। চীপসাইডের এক চৌমাথার কোণে সারদানন্দ আর গুডউইনের সঙ্গে তাঁকে একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহেন্দ্রনাথ হঠাৎ চিনতে পারেন নি। কারণ,—‘কলিকাতা বা বাংলা দেশে যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে লোক আর তখন নয়, তিনি স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি হইয়াছেন। গায়ের বর্ণ অনেকটা উজ্জ্বল বা যাহাকে ইংরাজিতে fair brown বলা যায়, শুধু white নয়। মাথায় যদিও অর্ধচন্দ্রাকৃতি লখনউর তাজের মতন কালো মোটা কাপড়ের টুপি ছিল, কিন্তু মাথার সম্মুখেতে সিঁথি-কাটা দেখা যাইতেছিল। পরিধানে কালো রঙের ইজের, কালো রঙের ভেস্টা এবং গলায় কলার ছিল, কিন্তু টাই ছিল না। চক্ষুদ্বয়, সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত, চক্ষুর পাতার নিম্নস্থল ক্ষীত এবং অক্ষিপুট সাধারণ লোকের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুদীর্ঘ ও বিক্ষারিত এবং নেত্র হইতে মহাতেজ ও আকর্ষণী শক্তি বাহির হইতেছে। চক্ষুদ্বয় স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ এবং শব্দস্রোত বহুদূরগামী।’

এই সাক্ষাতের পরদিন, কৃষ্ণমেনন নামে এক মাদ্রাজী যুবকের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ ৫৭ নং সেন্ট জর্জ স্ট্রিটের বাড়িতে বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। সেই বাড়িতে বিবেকানন্দ তাঁকে একটি নির্জন ঘরে নিয়ে গিয়ে মহেন্দ্রনাথের তখনকার যা কিছু চিন্তা সবই ‘পড়া পুঁথির’ মতন বলে দেন! সেই কাজটুকুর পরেই আবার তাঁরা নিচের বৈঠকখানায় ফিরে আসেন এবং সাধারণভাবে আগেকার নরেন্দ্রনাথ হয়েই হাসিতামাসা করেন। এই সময়েই মহেন্দ্রনাথের মনে হয় যে—‘পূর্বতন নরেন্দ্রনাথ আর নয়, পূর্বদেহে বিবেকানন্দ নামক এক মহাশক্তি প্রবেশ করিয়াছে। এক দেহের ভিতর কখন বা কলিকাতার নরেন্দ্রনাথ বাস করেন কখন বা বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ বাস করেন।’ বিবেকানন্দের মনের ভাব তখন স্পষ্ট, নির্দিষ্ট, নির্ধারিত; তাঁর গলার স্বর তখন ‘দ্বন্দ্বাতীত আজ্ঞাপ্রদ’!

এই এক ছবি,—আর, কাশীপুর থেকে শিমুলিয়ার পথে খার্ডক্লাস ঘোড়ার গাড়িতে ‘শিবোহহ’ নাদ-আস্বাদনের অল্প যে বিভোর ভাবের ছবি এখানে

উল্লেখ করা গেল, এই ছটি ছবিরই ইঙ্গিত এই যে, লৌকিক কামনা-
 বাসনার যে গণ্ডীতে মানুষ বন্দী আছে, সেই গণ্ডীর বাইরে যাবার সাধনায় মগ্ন
 ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই তিনি সর্বসাধারণের মতন নন। তিনি
 অনন্তসাধারণ! তাঁর মন্ত্র—‘নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু’। অর্থাৎ ‘আমি’ ‘আমি’
 নয়,—বলো ‘তুমি’ ‘তুমি’! আমি-তাই মায়া, তুমি-বোধই ত্যাগের জনক। ‘ত্যাগ’
 মানে কর্মত্যাগ নয়, দুঃখমগ্নতা নয়, অবসাদ নয়। তাঁর ইংরেজি বক্তৃতার
 বঙ্গানুবাদে তাঁর এই কথাও দেখা গেছে—‘যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ,
 ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব; তখন আমরা যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম
 সেই দিক হইতে ফিরিয়া মূল অবস্থা—অনন্তের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব।’
 ‘ইহারই নাম ত্যাগ।’

—বেঙ্গলের নানান ধরণের অজস্র বই—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের	সৈয়দ মুজতবা আলির	
একতলা ৩য় মুঃ	২'৫০ ॥ অবিষ্টান্ত ২ম মুঃ	৩'০০ ॥
অসিধারা ৩য় মুঃ	৩'৫০ ॥ ময়ূরকণ্ঠী ১৪শ মুঃ	৪'০০ ॥
মৌলানা খাফি খানের	সতু বতির	
যদুদ্রুং	আড়াই টাকা ॥ সতু বতির গল্প	২'৫০ ॥
অনাদিনাথ সিংহের	চিরঞ্জীব বিশ্বাসের	
কুটিরশিল্প ও পরিকল্পনা	২'৫০ ॥ ঠাকুর শ্রীশ্রীরাগকৃষ্ণ	১'৫০ ॥
অজিত মুখোপাধ্যায়ের	দীপেন রাহার	
অমৃতমন্ডন	৪'০০ ॥ কাঁচা মাটি পাকা পথ	৪'৫০ ॥
তারাশ্রম চট্টোপাধ্যায়ের	নমিতা বহুর	
ঝড় ও বিহঙ্গ	৩'৫০ ॥ পিকনিক	২'০০ ॥
নবেন্দু ঘোষের -	বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
ডাক দিয়ে যাই ৬ষ্ঠ মুঃ	৩'০০ ॥ দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ	৬'৫০ ॥
শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের	নলিনী দাশগুপ্তের	
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান	৪'০০ ॥ বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা	৩'০০ ॥
	নীলকণ্ঠের	
চিত্র ও বিচিত্র ৪র্থ মুঃ	৩'৫০ ॥ অদ্য ও প্রভুত্ব ২য় মুঃ	৫'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো



মাহিত্যের খবর
বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ৬ ॥
ফাল্গুন, ১৩৬৯

শান্তির প্রস্তাব

রবীন্দ্রনাথ

লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেইজন্তে যে নীচে আছে তাকে চিরকালই চেপে রাখতে চায় এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।..... যতক্ষণ লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে, পীস্ কন্ফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিষ তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি নে।...সবলপক্ষীয়েরা যখন আপোষ-নিষ্পত্তির যোগে শান্তি কামনা করে, তখন তারা নিজেদের পারে পাকা বাঁধ বেঁধে এবং অন্যদের পারে পাকা খাদ কেটে লোভের প্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। বহুস্বরকে এমন জায়গায় পরস্পর বখরা করে নিতে চায় যে জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে নখ তার শোধ তুলতে পারে।..... শান্তি? শক্তির দরবার সত্যসত্যই কে ত্যাগ করতে পারে? ত্যাগের জন্য যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল করছে, তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শক্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদ খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।”

—বাতায়নিকের পত্র

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

রঞ্জিত সিংহ

জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এলিয়টের বিখ্যাত উক্তি যাদের মনে আছে জনপ্রিয় কবিকে বন্ধিম কটাক্ষে না দেখে তাঁদের উপায় নেই। কারণ সংকবির মত সংপাঠকও হামেশা জন্মগ্রহণ করেন না। বস্তুত, পাঠক-অনটনের এই দারুণ সমস্যা মেটানোর জন্য পাউণ্ডকে একদা কোমর বাঁধতে হয়েছিল। তাঁর নানা প্রস্তাবের মধ্যে যেটি আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে শ্রণ্য তা হচ্ছে কবিতার বিচারে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক ও তথাকথিত মতামতের কোনো দাম নেই। সমালোচনার ভাস্কর্য পরিভাষার অলিতে-গলিতে ঘুরে না বেড়িয়ে স্পষ্টভাবে যিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে পারেন কাব্যবিবেচকের উপাধি তাঁরই সাজে।

অবশ্য জীবনানন্দের কবিতার বিচারে পাউণ্ডের উক্তির উপযুক্ততা কোথায় সে সম্পর্কে তিনিই সন্দিগ্ধ হবেন—এ যাবৎ জীবনানন্দের ওপর যে সব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে সে ব্যাপারে যিনি সম্পূর্ণ সজাগ নন। অবশ্য বর্তমান লেখক একথাও কখনোই মনে করে না যে এই লেখা পাউণ্ড-উক্ত সেই কাব্য-বিবেচনার সাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুত, জীবনানন্দ সম্পর্কে এত বেশী কথাবার্তা কানে এসেছে কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আসনটি চিনে নেওয়া যে-কোন আলোচকের পক্ষেই দুর্লভ কাজ।

কারণ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রূপালক’ যখন ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন সূর্য্যবর্তের অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বাস্তঃকরণ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। অবশ্য মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে যার সাক্ষাৎ তাঁদের মিলল তিনি রবীন্দ্রনাথ। অতঃপ্রান্তে স্বধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী তাঁদের কাব্যান্দোলন সবে শুরু করেছেন। যতীন্দ্রনাথের মরুভূমির উষ্মতা, নজরুলের ভাঙ্গনের গান বা প্রেমেন্দ্রের অ্যামিবা বা ইলকটন ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাৎকালিক কাব্য-প্রসঙ্গের প্রথাবিরুদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু ধারণা ও ধূনির অমোঘ যোগফল যেহেতু ভালো কবিতা জন্মগ্রহণের শুভমুহূর্ত তাই এরা বুঝতে পারেন নি যে শুধু প্রসঙ্গের পরিবর্তনেই ভালো কবিতার সন্ধান মেলে না। এবং বাংলা কবিতায় রোমান্টিক্স ও নব্য-ক্লাসিক্সদের মধ্যবর্তী কবি হিসেবে জীবনানন্দের

স্থাননির্ণয় করতে গিয়ে স্বীয় নাম আমার মনে পড়ে তিনি মার্কিন প্রতীকী কবি এড্‌গার অ্যালেন পো। অবশ্য কাব্যাত্মার মিল খুঁজে পেয়ে জীবনানন্দ প্রশংসে যে পো'র নাম স্মরণ করি নি বিবেকী পাঠক অন্তত তা উপলব্ধি করবেন। ও ধরনের তুলনা বা বিভাগকল্পনার জগ্রে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা নিযুক্ত আছেন।

যুগসন্ধির কবি হ'লেও এড্‌গার অ্যালেন পো'র কবিপ্রতিভা অবিসংবাদিত। পঞ্চান্তরে জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বহুর মত প্রগতিশীল ভক্ত জুটিয়েছিলেন এবং লোকপরম্পরায় শুনেছি রক্ষণশীল মোহিতলালের পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন নি। সজনীকান্ত দাশ তাঁর নামকে বিকৃত ক'রে পর্যন্ত বিদ্রূপ ক'রে গিয়েছেন। সমসাময়িক স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব এবং সাম্প্রতিক কবিদের অধিকাংশ জীবনানন্দের গুণমুগ্ধ। অধিকন্তু, সিগনেট প্রকাশিত জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' প্রবন্ধগ্রন্থ তাঁর আত্মসৃষ্টির যে গন্ত-সমর্থন—শুধু একথা বললে নিশ্চয়ই এই মৃত কবির প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ তাতে এমন সব মতামতও স্থান পেয়েছে যা কেবল প্রমাণ করে যে ভাগ্যদেবী চিরকালই পরিহাসনিপুণ। আসলে 'প্রেরণা', 'স্বভাবকবিত্ব' ইত্যাদি শব্দ শেষপর্যন্ত ধোপে ঢেকে নি। কারণ আবেগের মুগ্ধপাত ক'রে একটানা লিখে যাওয়ার কৃতিত্ব সম্পর্কে জনসাধারণ যে-জনশ্রুতিরই আশ্রয় নিক না কেন, সংকবি মাত্রেই জানেন যে কবিতা বহু সংস্কারের ফলশ্রুতি, কলাকৌশলের অভিনব বহু পরিশ্রমের পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনে তাঁর পাণ্ডুলিপির যে আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে তা কিন্তু প্রমাণ করে যে প্রেরণা, আবেগ ইত্যাদি শব্দ তাঁর অভ্যন্তর চৈতন্যের প্রাপ্তি, সমালোচনা-সাহিত্যের বহু-ব্যবহৃত তথা পূর্বপুরুষপ্রদত্ত শব্দাবলী। আসলে ও সব শব্দের পেছনে কতখানি চিন্তাযুক্ত আছে তা খতিয়ে দেখবার এই পরিশ্রমবিমুখতা অবশ্য আমাকে সাহিত্যবিবেচক সম্পর্কে পাউণ্ডের বিখ্যাত উক্তিকেই মনে করিয়ে দেয়। যাই হোক 'কবিতার কথা' থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যস্বভাবে আত্মস্বতার অল্পপস্থিতি জীবনানন্দকে পীড়িত করেছিল। এবং জনপ্রিয়তার নিরন্তর করতালির মধ্যে এ যাবৎ অবশ্য লক্ষ্য করা আমাদের সম্ভব হয় নি যে সেই দুর্ভাগ্য আত্মস্বতা তাঁর কবিতায় কতখানি বজায় থেকেছে তবু এ কথা সত্য যে 'জনপ্রিয়তা' শব্দে ধার না থাকলেও তার আছে। কিন্তু জনপ্রিয়তায় কর্ণপাত ক'রে কবিতা রচনার ব্যাপারে যে-কবি পূর্বপরিকল্পনার আশ্রয় নেন তিনি যে চিরকালের জন্য পথে বসেন সে ধারণায়

বিবেকেরা দ্বিমত নন। যুগসন্ধির কবিদের কাছে পাঠকের কী অভিপ্রেত তার অল্পসন্ধানে বসলে ইংরেজী কবিতায় দেখি হলকিন্স ও পাউণ্ডের চেয়ে এলিয়টের কবিতা নিঃসন্দেহে অনেক পরিণত, এমন কি অডেনের কবিতাও। এবং এই ঘটনা প্রমাণ করে যে উত্তরসূরীর কৃতিত্বে পূর্বসূরীর স্থায়িত্বই পাকাপাকি হয়। বস্তুত, যুগসন্ধির যিনি কবি তাঁর দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ— এই সব তুলনার দ্বারা আমি বলতে চেষ্টা করছি। কারণ ভিত্তোরীয় কবিদের প্রথা অনুমোদিত ছন্দে হপকিন্স যে-আস্থা খুঁয়েছিলেন তার প্রধান কারণ এই নয় যে সেকালে এই ছন্দের কোনো আকর্ষণ ছিল না। আসলে ছন্দের বিধিনিষেধকে বিচলিত করে দিয়ে হপকিন্স যে-‘স্প্রাং রিদম’-এর জন্ম দিয়েছিলেন তাতে কথ্যছন্দের ধ্বনিগুণকে মর্যাদা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ছন্দের খাতিরে শব্দের সুবিধাবাদী বিকৃত যে জোলুস আলুক না কেন, মিল্টন অথবা রোমান্টিক্সদের চাইতে শেক্সপীয়রের শ্রুতিবোধই যে প্রকৃত মর্যাদাবান স্প্রাং রিদম-এর স্রষ্টা হিসেবে হলকিন্সের কবিচৈতন্য তা অলুভব করেছিল। এবং এলিয়ট স্প্রাং রিদমকে গ্রহণ করেন নি বটে কিন্তু ঐ ছন্দসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভবপর ছিল—

“Grishkin is nice ; her Russiam eye
Is underlived for emphasis ;
Uncorseted, her friendly bust
Gives promise of pneumatic bliss.”

সমস্ত দেশের ইতিহাসেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি সামান্য লক্ষণ পাওয়া যায়—ইতিহাসের ছাত্রেরা তা জানেন। সাহিত্যের ইতিহাস ও উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম নয়। ফলত এক সাহিত্যের ইতিহাস অনেক সময় অন্য সাহিত্যের ইতিহাস বোঝায় সাহায্য করে। এবং ধারণা ও ধৃতির যে যোগফল ভালো কবিতার পক্ষে আবশ্যিক অক্লান্ত চেষ্টাতেও তার সন্ধানে পান নি যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-প্রমোদ্র মিত্র। পক্ষান্তরে পো বা হপকিন্সের বিবেক-বিবেচনা না পাওয়া গেলেও যুগসন্ধির কবি হওয়ার মত নিষ্ঠা ও প্রবণতা জীবনানন্দের মধ্যেই ছিল।—

“পৃথিবীর গভীর গভীরতর অস্থখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর-ই কাছে।”

বস্তুত, এই সব পংক্তিতে আবেগবিরোধী শ্রুতি ও যথার্থের সমবায় যখন আবিস্কার করি, তখন ভাবতে অবাক লাগে যে এই কবিচিন্তাই আবার অর্গলমুক্ত

আবেগপ্রবাহে অবগাহন করে যথেষ্ট আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি পেয়ে গিয়েছেন।
 বিশেষভাবে ‘গভীরতর’ ও ‘তবু-ও’ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগে কথ্যচ্ছন্দের প্রতি কবির
 আগ্রহকে লক্ষ্য করি। ‘আজ এই রাস্তার গান গাইব’—এই ধরনের অভ্যস্ত
 সাদামাঠা শব্দপ্রয়োগ ক’রেও প্রেমেন্দ্র মিত্র কথ্যচ্ছন্দ তথা আধুনিকতার
 সঠিক রাস্তা চিনে নিতে পারেন নি। অধিকন্তু একটি দুঃসহ ও নিঃসহ
 ব্যর্থতাবোধে উটের গ্রীবার সাদৃশ্যচিন্তা যে প্রতীকী চিত্রকল্পের উদাহরণ রেখে
 গিয়েছিল তা নিশ্চয়ই জীবনানন্দকে স্মরণীয় ক’রে রাখবে। কিন্তু জানি,
 ভাগ্যদেবী চিরকালই পরিহাসনিপুণ। ফলত, যে বিক্ষিপ্ত গুণাবলীর জন্তে
 জীবনানন্দ আজ আমাদের স্মরণে আছেন, ‘ওয়েস্টল্যান্ড’ কবিতাবলী সেইসব
 গুণের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। অথচ সে-আধুনিকতা জীবনানন্দকে যথেষ্ট পীড়িত করেছে
 এমন কি সে-কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে একথাও তিনি বলেছেন—“বিশেষ সময় চিহ্নের
 ছাপ তার উপর এমন জাজ্জল্যমান যে আজ না হোক, কাল অন্তত ফিকে হয়ে
 যাবে। অবশ্য আলোচ্য মন্তব্যে সাহিত্যপাঠকের মন মজুক বা না মজুক,
 এ ধরনের কথাবার্তা মনোবিকলনের পণ্ডিতের কাছে যে বিশেষ উপাদেয়
 তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আর যাই হোক, নিজের নাক কেটেও অপরের
 যাত্ৰাভঙ্গের নীতি জীবনানন্দের মুখে যে শুনব—তা অন্তত আশা করি নি।
 কারণ ষাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের দু’একজনের মুখে শুনেছি
 তিনি নাকি সর্বপ্রকার রিহর আক্রমণের উর্ধ্বে ছিলেন। অথচ আমাদের
 প্রাচীন আলংকারিকরাও এটা বুঝতেন যে সঞ্চারীর সহযোগ ব্যতীত কোনো
 স্থায়ীভাব-ই কাব্যরসবস্তুতে পরিণত হতে পারে না। উপরন্তু, জীবনানন্দের
 ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার যে-চিত্রকল্প নিয়ে এত কথা উঠল, সেই
 কবিতার আত্মস্তু পাঠে এমন সব কথাও মনে জাগতে পারে যা হয়ত ‘ওয়েস্ট
 ল্যান্ড’ সম্পর্কিত কবির মতামতের বিরোধিতা সাধে না। ফলত, জীবনানন্দ-
 পাঠে নিজের নাক কাটার প্রবচনটি ততটা যথার্থ নয় যতখানি প্রকাশ পেয়েছে
 তাঁর পূর্বপরিকল্পনার অশৈল্পিক প্রবৃত্তি। অবিমিশ্র অহুত্ব আামাদের স্রষ্টা
 কল্পনায় আসে না এবং এও দেখেছি ~~স্রষ্টা~~ কাব্যমাত্রই মিশ্রাহুত্বের প্রাপ্তি।
 সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, আলোচ্য কবিতাটিতে মিশ্রাহুত্বের যে
 সংঘট্ট দেখানো হয়েছে তাতে কবির অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে এবং পাঠকের
 আকাজক্ষা কি চরিতার্থ? উটের গ্রীবার দুঃসহতার পরেই—

“গলিত স্থবির ব্যাং আরে দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে

আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অহুমেয় উষ অহুরাগে।”

আলোচ্য পংক্তি কখনোই প্রমাণ করে না, অল্পভূতির যে-সামগ্রিকতার পারবশ্তে বিভিন্ন ভাবানুযুগ্ম অথও রসবস্তুতে পরিণত হয় তার কোনো চিহ্ন এসব ক্ষেত্রে অবশিষ্ট আছে। বঞ্চনাবোধ ও তৎপরবর্তী মূর্ত্ত্যবেষণা তাঁর মিশ্রানুভূতির প্রাপ্তি নয়। ফলত কবিতাটির অমোঘ পরিণামে এই ধারণা আরোপিত, চূড়ান্ত রসভাসের উদাহরণ। বস্তুত, কবিদের মৌলিক চিন্তায় এলিয়ট কেন যে নিরুৎসাহ দেখিয়েছিলেন তার তাৎপর্যও হয়ত বা এই জাতীয় ব্যর্থতার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্কেই জীবনানন্দ প্রকৃতিবর্ণনায় এত উৎসাহী। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলী-কীটসের প্রভাবে তিনি যে নিতান্ত বঞ্চিত—তাঁকে এমন ভাগ্যহীন মনে করা উচিত নয়। ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র ‘মৃত্যুর আগে’ অথবা ‘অবসরের গান’ কবিতায় প্রকৃতিপর্যবেক্ষণের নৈপুণ্য লক্ষণীয় উপরন্তু রোমাটিক কাব্যান্দোলনের প্রকরণবিমুখতাও এই সব কবিতার ভূষণ। না মেনে উপায় থাকে না, জীবনানন্দের এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের হেতুসন্ধানে তাঁর ‘কবিতার কথা’ গ্রন্থটি বিশেষভাবে কাজে লাগে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভৌগোলিকবোধ, বিজ্ঞান-অনুসন্ধিসন্ধিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এবং যে আকর্ষণীয় শব্দকোশল এবং জনপ্রিয় ধ্বনিস্পন্দন তিনি তৈরী করেছিলেন তার পেছনে আর যেই থাকুন-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। ‘মানসী’র থেকে ত বটেই, কবিতালেখার গোড়ার থেকেই রবীন্দ্রনাথ বরাবর প্রমাণ করেছিলেন যে নতুন অল্পভূতির স্পন্দনের সঙ্গে নতুন ভঙ্গির কোনো কলহ নেই। ফলত, মাত্রাবৃত্ত বা স্বরাঘাত ইত্যাদি ছন্দের কথা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র অক্ষরবৃত্তের সম্ভাবনা যে কতখানি সুদূর-প্রসারী, ‘কবিতার কথা’য় জীবনানন্দ যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেও আমি যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামই আমাদের মনে পড়ে যারা অক্ষরবৃত্তের বিচিত্র ধ্বনিস্পন্দন আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য জীবনানন্দও সারাজীবন অক্ষরবৃত্তেই কবিতা লিখেছিলেন। উপরন্তু, রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলাকবিতার ঐতিহ্যে অনবধান স্পর্শকে আধুনিক কবিতা যদিও জীবনানন্দের ভৎসনাজনন হয়েছেন কিন্তু যে-কাব্যবিবেচক নৈব্যক্তিক বিচারে অপেক্ষাকৃত সক্ষম তিনিই বলবেন, জীবনানন্দের কবিতা পড়ে কখনো মনে হবে না যে তিনি উত্তরসূরী।

পক্ষান্তরে এলিয়টের কাব্যচর্চা ‘কাব্যপ্রচেষ্টার’ নামান্তর—এ হেন কথা বলে জীবনানন্দ আমাদের অনেক উপকার সোধেছেন। কাব্যেতিহাসে

জীবনানন্দের স্থান কোথায়—ভবিষ্যৎ পাঠকদের একথা বোঝার পক্ষে আলোচ্য
 মন্তব্য বিশেষ আবশ্যিক। রোমান্টিক্সদের আবেগপ্রধান রচনার গুরু
 হয়েছিল ক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধতা ক'রে এবং ক্লাসিসিজমের প্রত্যাভর্তনও
 রোমান্টিক্সদের বিরোধিতায়। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যরীতি এই দুই রীতির
 মধ্যবর্তী ঘটনা। অবশ্য আত্মসচেতনার অভাববশত ক্লাসিসিজমের দু'একটি
 গুণ অল্পবিস্তর আয়ত্তে এনেও শেষপর্যন্ত জীবনানন্দ সত্যেন্দ্রনাথ বড় জোর
 প্রেমেন্দ্র মিত্রের পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। 'অবসরের গান' বলুন
 আর 'তিমিরহননের গান' বলুন—এমন কি বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতার
 কথাই ধরা যাক—প্রত্যেকটি কবিতাই আলোচ্য মন্তব্যের উদাহরণ। যারা
 স্বভাবগুণে অপরের যে কোনোরকম মতামতেই অনীহ জীবনানন্দের পাশাপাশি
 প্রেমেন্দ্র মিত্র পড়তে আমি বিশেষভাবে তাঁদের অনুরোধ করছি। আধুনিকতা
 প্রসঙ্গনির্ভর নয়, সেটা একটা মর্জির ব্যাপার। কিন্তু এ কথা কি 'বেনামী
 বন্দর' বা 'রাত্রি' কবিতা পড়ে জানবার উপায় আছে না 'শাশ্বতী' কবিতা
 সে ধারণা জন্মাতে অধিকতর সাহায্য করে? আসলে যে স্বভাববৈগুণ্যে
 প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রোতার আসর শূন্য হ'তে বসেছে, জীবনানন্দের কাব্যস্বভাবও
 কি তার-ই অংশভাক? অন্তত, প্রসঙ্গাদ্বেষণে বিশ্বরন্ধাও তোলপাড় না
 ক'রে নিজের চোখ ও মন দিয়ে জীবনানন্দ যদি পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখতেন
 তা হ'লে 'হায় চিল' ও 'আট বছর আগের একদিন'-এর মত কবিতাদ্বয়
 এক গ্রন্থভুক্ত হওয়া দূরের কথা, এক কবির দ্বারাই রচিত হত না। আসলে
 চোখ-কানের বাগড়া মেটাতে-মেটাতেই জীবনানন্দের সারাজীবন কেটে
 গিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝি যে সবসময়ে এবং সকলের কাছে সব
 সত্য খুব প্রীতিকর ঠেকে না। ফলত তিরিশের দশকের কবিদের বিদেশী
 কাব্যপ্রীতির নিদেয় জীবনানন্দ পঞ্চমুখ হলেও রোমান্টিক্সদের শত প্রভাব
 সত্ত্বেও এলিয়েটের 'কাব্যপ্রচেষ্টা' তাঁকেও আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তাতেই
 তাঁর মন স্থস্থির হয় নি। এক দুঃসহ নৈরাশ্র ও বঞ্চনার খেদ অল্পভব করতে
 শিখেছিলেন এলিয়েটের পদাঙ্কে। ইয়েটস্ দিয়েছিলেন তাঁকে কেন্টিক
 গোধুলির বিষাদ। রোমান্টিক্সরা তাঁকে শিখিয়েছিলেন আবেগ—বাবাধবন্ধহীন
 আবেগ। তিল তিল সংগ্রহ ক'রে সংস্কৃতকবি তিলোত্তমা পড়েছিলেন বটে,
 জীবনানন্দ কিন্তু এঁদের বিরোধী লক্ষণগুলোকে তাঁর মনন বা চৈতন্যের মধ্যে
 মিলাতে পারেন নি। 'বনলতা সেন' লিখতে যে-ধরনের মননকে কাজে লাগানো
 হয়েছে 'স্ববিনয় মুস্তাকী' কবিতার স্বাপারে তা অগ্রদূতের। এবং এর থেকেও

যা মর্যাস্তিক ও শোকাবহ তা হচ্ছে যখন তিনি তাঁর প্রাক্কাব্যপ্রকরণকে পরিত্যাগ ক'রে নতুন কাব্যপ্রকরণের অন্বেষণে বেরিয়েছেন এবং পাঠক যখন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে তখন এমন দু'একটি লিখে ফেললেন যা তাঁর পূর্ব কাব্যপ্রকরণের কথা স্মরণে আনে। 'মাতটি তারার তিমির'-এর পরবর্তী কবিতাগুলোর কথাই আমি বলছি। যে কাব্যধারায় লোকেন বোসের 'জর্নাল' বা 'যাত্রী' কবিতা লিখতে হয়েছে সে ধারাতে 'তোমাকে ভালবেসে' বা 'সে' কবিতাও লেখা হল। সারাজীবন প্যারে লিখে কেন যে জীবনানন্দ 'তোমাকে ভালবেসে' কবিতায় স্বরাষাতের আশ্রয় নিলেন, তার কোনো কার্য-কারণ-সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। এর আগে প্যার ছাড়া যাকে লিখতে দেখিনি এবং এর পরেও যাকে প্যার ছাড়া আর কোনো ছন্দ ব্যবহার করতে দেখা গেল না, তাঁর পক্ষে এই কবিতাটি লেখা নিশ্চয়ই একটি মুহূর্তের তাড়না তাতে সন্দেহ নেই। উপরন্তু যে অধ্যায়ে কথোপকথনের চংকে আয়ত্তে আনার জন্তে তিনি কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন তখন হঠাৎ এই পুরোনো মর্জির কবিতা বিবেকী পাঠককে রীতিমত বিচলিত ক'রে তুলবে। তাঁর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যে সজ্ঞান-চৈতন্য-প্রভব নয়—এই কথাই কি প্রমাণিত হয় না? 'পূরবী'র কবিতার ধারায় 'ক্ষণিকা'র কাব্যভঙ্গীর প্রত্যাবর্তন আপনি কি ভাবতে পারেন? সুধীন্দ্রনাথের 'দশমী' কাব্যহস্তিকাটি যিনি পড়েছেন তিনি সেখানে আশাই করতে পারেন না তাঁর 'অর্কেষ্ট্রা'র 'নাম' কবিতাটির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের ছব্ব পুনরাবৃত্তি। কারণ 'নাম' কবিতায় অক্ষরবৃত্তের যে পরীক্ষা করা হয়েছে 'দশমী'র অক্ষরবৃত্ত সেইসব প্রাক-পরীক্ষা-নিরীক্ষারই ক্রমবিকাশ। ফলত পাঠকের মনে জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই প্রচ্ছন্ন।

উপরন্তু, শেষজীবনে 'বিশ্ববোধ' নামক দার্শনিক চিন্তায় তিনি বিশেষভাবে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। এবং সে-চিন্তার ফলশ্রুতি যে কাব্যরীতির জন্ম দেয় তা স্বাভাবিকক্রমেই পাঠকের অনাদর কুড়িয়েছে। কারণ 'সংবর্ত', 'যযাতি' অথবা 'ক্রেসিডা' ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের পর বাঙ্গালী পাঠকের অজ্ঞাত নেই যে এই জাতীয় রূপকল্পের উৎকর্ষ নাটকীয় মুহূর্তের উপস্থিতিনির্ভর। এবং পুনর্বীর স্মরণে আসে এলিয়টসাহেবের অমোঘ বাণী। মৌলিক চিন্তা করতে কবিদের তিনি বারণ করেছিলেন। কারণ 'বিশ্ববোধ'-এর চিন্তা ব্যস্ত করার জন্ত কবিতার বিড়ম্বনায় যাওয়ার প্রয়োজন কোথায়!

“ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায় ;

তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে ; মানুষের মন

জানে জীবনের মানে ; সকলের ভালো ক’রে জীবনযাপন।”

এই ধরনের তত্ত্ব পরিবেশনের সঠিক মাধ্যম কি গঠন নয় ? কারণ পৃথিবীর বাহনে হিতোপদেশ শোনানোর প্রচেষ্টা যে-কোন কবির পক্ষেই লজ্জাকর এবং কবিতার পাঠকের কাছে এ সব রচনার অনাদরও তাই অনিবার্য।

আসলে আধুনিকতা কোনোদিনই বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রে চিহ্নিত নয়। নয় ব’লেই শেক্সপীয়ার আধুনিক। আবার ‘ওয়েস্ট ল্যাণ্ড’ রচয়িতাও আধুনিক। তাহলে আধুনিকতার সামান্য লক্ষণটি কী ? আমার বিশ্বাস, যে-কবির স্রষ্টাবোধ আমাদের কথোপকথনের ভঙ্গিকে অনুসরণ করতে পারে তাঁর রচনাই আধুনিক তথা কালজয়ী। ফলত মনেটের সংহত রূপকল্পের চর্চা ক’রেও শেক্সপীয়ার শব্দের স্রষ্টাবাদী বিকৃতি ঘটান নি। তাঁর মনেটগুলো পড়তে পড়তে আমাদেরো মনে হয়—“that is how I should talk if I could talk poetry.” এবং এলিয়টের প্রসঙ্গের নতুনস্রষ্টা জীবনানন্দের মনকে টানলেও অপূরণীয় কাব্যপ্রসঙ্গের মত এলিয়টের প্রসঙ্গও সাম্প্রতিক। কিন্তু যে-প্রকরণের সমান্তরালে তা প্রাণমন রসস্রষ্টা তা আধুনিক তথা কালজয়ী। বস্তুত এলিয়ট যখন বলেন—

“Half-past one,

The street-lamp sputtered,

The street-lamp muttered,

The street-lamp said, ‘Regard that woman....’”

তারপর এই পুনরাবৃত্তিময় ভঙ্গির নজির যেন আবিস্কৃত হয় নিম্নোক্ত অংশে—

“অথবা নাইকো ধান খেতে আর ;

ব্যস্ততা নাইকো আর ;

হাঁসের নীড়ের থেকে খড়

পাখীর নীড়ের থেকে খড়

ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।”

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটালেও জীবনানন্দ এলিয়টের এই বিশিষ্ট ভঙ্গির উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। যে-প্রেরণালব্ধ ‘দিব্যানুভূতি’-কে মর্বাদা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন জীবনানন্দ সে-ধারণা সর্বান্তঃকরণে প্রকরণবিরোধী। রোমাণ্টিকরা সেসব ধারণার পূর্বপুরুষ। ফলত

পুনরাবৃত্তিময় পংক্তির হৃষ্যদৈর্ঘ্য এলিয়টের কাছে কথ্যচ্ছন্দের যে-ধ্বনিগুণকে নিয়ে এসেছে, সেই প্রসারসঙ্কোচ বা পুনরাবৃত্তির ঢং জীবনানন্দের কাছে অর্থহীন আবেগমাত্র অথবা তাঁর নিজের ভাষায়, ‘বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগ’। পক্ষান্তরে এও সত্যি যে জীবনানন্দের ‘রাত্রি’ বা ‘ঘোড়া’ কবিতার “কুকুরের অস্পষ্ট করলে হিম হ’য়ে ন’ড়ে গেল ও-পাশের পাইস-রেস্তুরাতে” ইত্যাদির মত পংক্তিতে যে-দুঃসহ, নিঃসঙ্গ ও অসহায় জীবনের আতি প্রতীকত্ব লাভ করেছে সে-চৈতন্ত্যের কাব্য-ঐতিহ্য খুঁজতে বসলে এলিয়টসাহেবের—“The yellow fog that rubs its back upon the window-panes” অথবা ‘Rhapsody on a Windy Night’-এর মত কাব্যপংক্তি বা কবিতার কথা মনে আসে। এবং কাব্যের ঐতিহ্যের অর্থ এই নয় যে তার পরিধি দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিদেশী কবির পুনর্মূল্যায়ন ঘটতে পারে স্বদেশের মাটিতে। বস্তুত, এলিয়টকেও তাঁর কাব্যঐতিহ্যের সন্ধান পেতে হয়েছিল ফরাসী কবি লাফগের মধ্যে। এ ব্যাপারে নিন্দের কোনো কিছু নেই বরং এ মনোবৃত্তিকে যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর বলা যেতে পারে। তবে ‘কবিতা কথা’ পড়ে জানতে পারি, জীবনানন্দ নিজে এ প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট নিন্দার মনে করতেন।

যাই হোক, জীবনানন্দ এইটুকু বুঝেছিলেন যে ‘বনকতা সেন’ যতই জনপ্রিয়তা লাভ করুক না কেন, জনপ্রিয়তার আয়ু কোনোকালেই দীর্ঘ হ’তে পারে না। ফলত ভঙ্গির পরিবর্তন তাঁর কাছে নিতান্ত অনিবার্য ঠেকে। ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যগ্রন্থে পুনর্বীর পয়ারকে যেভাবে কাজে লাগাতে তিনি যত্নবান হয়েছিলেন এবং যে-রূপকল্পের আশ্রয় তাঁর কাছে আবশ্যিক মনে হ’য়েছিল তাতে যদিও পাঠকের অভ্যস্তচৈতন্ত্যে নাড়া দেওয়াই কবির অভিপ্রেত কিন্তু ফলশ্রুতি যা দাঁড়াল ‘কবিতার কথা’-য় সে-ব্যাপারের তিনি গণ্ডগমর্থন রেখে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। “‘অগ্রসর’ মানে এক পর্যায়ের থেকে পরবর্ত্তের গমন, ফলে মহত্তর কবিতা পাওয়া যেতে পারে, নাও পাওয়া যেতে পারে, কবিতা আগের চেয়ে খারাপও হ’য়ে পড়তে পারে, কিন্তু কবির কবিতার পরিবর্তন হয়েছে বলা যেতে পারে।” অবশ্য এই অকাটা যুক্তির স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে কবিতা লিখে জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বঙ্গুর মত বুদ্ধিমান ভক্ত জুটিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। তবে এ ব্যাপারে এলিয়টসাহেবের শিক্ষা ছিল ভিন্নধরনের। তাঁর মতে, প্রকাশকৌশল সম্পর্কে কবির ঘন ঘন মতিপরিবর্তন অভিপ্রেত ত নয়ই এমন কি এ ধরনের পরিবর্তন, তাঁর মতে, পূর্বসূরীর কাব্যপ্রযুক্তির

অন্ধাঙ্কুরের মতই নিন্দার্হ। অবশ্য এলিয়টসাহেব বিদেশী ; তাছাড়া জীবনানন্দ আমাদের শিখিয়েছেন তাঁর কাব্যচর্চা ‘কাব্যপ্রচেষ্টা’রই নামান্তর। এবং জীবনানন্দের যুক্তি অল্পযায়ী তাঁর শেষের দিকের রচনার আলোচনায় আমাদের বিরত থাকলেই ভালো হত। কিন্তু কবিতাগুলোকে যেকালে ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থের তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন তখন আমরা পাঠকেরা নিতান্ত নিরুপায়। অল্পভূত রসবস্তুর পাঠকের মনে সঞ্চার করাকে যদি কবির প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব বলে সবাই স্বীকার করেন তবে একথাও মেনে নিতে হবে যে তাঁর অতিভক্ত ও শেষের দিকের কবিতাগুলোকে পড়ে উঠতে পারবেন না। অবশ্য আমি জানি সত্যের অপ্রিয় অন্বেষণ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পক্ষান্তরে এও ঠিক, মাহুষের ছুটি দুর্বল হাতে স্বর্ধালোকের প্রবাহ ঢাকা পড়ে না। ফলত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি তুলে জীবনানন্দ পয়ারের মাহাত্ম্য যতই প্রচার করুন না কেন, একথাও তাঁর বিন্মত হওয়া উচিত ছিল না যে এই রবীন্দ্রনাথই মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তকেও জাতে তুলেছিলেন। তাঁর কবিম্ন গভীরভাবে অল্পভব করেছিল যে এর দ্বারা বাংলা কবিতার অনেক উপকার করা হবে এবং তা হচ্ছে, পাঠকের ত বটেই, কবিদেরও মুখবদলানোর উপায় থাকবে। মুখবদলানোর কথা ছেড়ে দিলেও, ‘সংবর্ত’ বা ‘যযাতি’র মত কিছু কিছু কবিতা থেকে যায়। আগাগোড়া পয়ারে লেখা হ’লেও তাতে অন্ত্যাহুগ্রামে ও পর্বের হ্রাসবৃদ্ধি তত্পরি যেসব নাটকীয় মুহূর্তের সংঘট্ট দেখানো হয়েছে তার ফলে অত দীর্ঘ কবিতাও পড়তে পড়তে কোনোদিন চোখে ঢুল আসে না। কবিতার যিনি পাঠক তিনি নিশ্চয়ই অল্পভব করবেন—“বুদ্ধির অল্পমতি পাবার বহুপূর্বেই তার মুখ্চৈতন্ত কবিতাহুটির মহত্ব নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে।” জীবনানন্দের শেষের দিকের কবিতাগুলোর মধ্যে এমন সব বিচ্ছিন্ন পংক্তি র’য়ে গিয়েছে যাতে আশ্চর্যভাবে কথ্যচ্ছন্দের ধনিমাধুর্য আবিষ্কৃত। কিন্তু তাঁর প্রধান দোষ, আগাগোড়া কবিতার সেই সমতাকে তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। এতে কবিতার সামগ্রিক আবেদন অনেকটা স্তিমিত হ’য়ে পড়ে। অবশ্য এও ঠিক পর্বের যে-হ্রাসবৃদ্ধি প্রভব নাটকীয়তায় স্বধীন্দ্রনাথ কৃত্ত্ব দেখিয়েছিলেন তা জীবনানন্দের ধাতে সওয়ার কথা নয়। উপরন্তু, বড়ো কথা বলার শোকাবহ প্রবণতা তাঁকে প্রায় পেয়ে বসেছিল।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো পয়ারে জীবনানন্দ সাংগাজীবন কবিতা লিখলেও ছন্দের আইনরক্ষায় কেমন একপ্রকার ওদাসিন্ত তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন। অবশ্য জানি, এহেন মন্তব্যে তাঁর গুণমুগ্ধেরা অল্পবিদ্যা ভয়ংকরের উদাহরণ খুঁজে

পাবেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, জীবনানন্দ লিখছেন—“কালো চোখ মেলে ‘ওই’ নীলিমা দেখেছো।” আমার ত মনে হয়, বিহারীলালও এমন ভুল করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ছন্দোরক্ষার জগ্নে কবিকে দৃষ্টির সাহায্য নিতে হয় না শ্রুতির? ‘ওই’ শব্দটি যদি দুমাত্রা হয়, কবিতা লিখতে তাহলে কি শ্রুতির সহযোগ অপ্ৰয়োজনীয়? তাকিকের সমর্থনে অমিয় চক্রবর্তীর নাম রয়েছে। ‘নীহারিকা পড়ে বোনা, বিদ্যুতি জ্বির উদ্ভবে’। ‘বিদ্যুতি’ শব্দটিতে যুক্তাক্ষরের স্তবিধে থাকায় পাঠকের শ্রুতিতে যে-আঘাত জাগানো হয়েছে, ‘বৈদ্যুতিক’ বললে সে-ধ্বনি খানিকটা প্রসারিত হ’য়ে আকাজ্জিত রসসৃষ্টিতে বিঘ্ন আনত, যদিও জানি ‘বৈদ্যুতিক’ বললে ছন্দের আইন বজায় থাকে। অমিয় চক্রবর্তী নানা জায়গায় এই ধরনের ছন্দ-বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন কিন্তু কোথাও তা অসতর্কতা বা অসাবধানতালব্ধ নয়। কিন্তু ‘ওই’ শব্দটিকে যদি ‘ঐ’ লেখা হত তাতে কি আমাদের শ্রুতি কোনো তারতম্য অনুভব করত! প্রতিবেশী সমস্ত কবির থেকে নিজেকে যিনি স্বতন্ত্র ব’লে মনে করতেন এবং যার মতে, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করা রবীন্দ্রোত্তরদের আত্মকৃত্য ব’লে পরিগণিত হয়েছে তিনি কেন যে এত অসতর্ক তা ভেবে ওঠা যায় না। অন্তত কবিতা লিখতে এটা ভোলা অমার্জনীয় অপরাধ যে তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো আধ্যাত্মিক কবি হ’য়েও রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ছন্দ ভুল করেন নি। পক্ষান্তরে এইসব প্রমাদকে যারা জীবনানন্দের অতীন্দ্রিয় প্রীতির লক্ষণ ব’লে থাকেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত। কারণ ইতিহাসের পাতা ওন্টালে রবীন্দ্রনাথ ত বটেই, হপকিন্স, মালার্মে, এমন কি এলিয়টের নাম জীবনানন্দের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে।

অধিকন্তু, সাধু ক্রিয়াপদ ও ছন্দের বিকৃতি ঘটিয়ে জীবনানন্দ যে-মৃতভাষা আমাদের পরিবেশন ক’রে গিয়েছেন তার নগদমূল্য বড় কম নয়। মধুসূদন এককালে এ ব্যাপারে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মত অনুকারক জুটিয়েছিলেন তিনি। পরিণামে ছাত্রপাঠ্য হিসেবে মর্ধাদা পেয়ে শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন মহাশয়ের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছেন। জীবনানন্দেরও অসংখ্য অনুকারক তৈরী হয়েছে। আশা করি, তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিশিষ্ট আত্মকৃত্যগুলোকে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও গরিষ্ঠ পুছানুগ্রাহীর দল আকাজ্জিকরূপে আকার দিতে বিশ্বস্ত হবেন না।*

* আধুনিক কবিতাসংসারের নায়ক-কবিদের সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রঞ্জিত সিংহের স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে।—স. সা. খ.

রাধাপ্রেমের অলৌকিকত্ব

চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়

বৈষ্ণব কবি শুধু মধুমক্ষিকার আয় বাণীর চরণকমলের মকরন্দবিন্দু আশ্বাদন করিয়া তৃপ্ত হন নাই। যাহার ঐশ্বর্যময়ী সত্তা বিশ্বভুবনের অণুতে অণুতে ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিত, যাহার লীলার অসমোদ্ধমাধুরী ত্রিলোকের অন্তর অনির্বচনীয় আনন্দস্বৰূপে ভরিয়া রাখে, সেই অবাঙমানসগোচর লীলাময়কে আপন হৃদয় দিয়া অল্পভব করা ও সেই অপার্থিব অল্পভূতির অপরিমীম হ্লাদধারকে বিশ্ববাসীর মধ্যে নিঃশেষে বিতরণ করাই বৈষ্ণব কবির অন্তরের একমাত্র দীপ্তি। বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কবিতায় প্রেমের যে বিচিত্রলীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কোন লৌকিক নায়ক-নায়িকার বিলাস-বর্ণনা নহে। পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ ও আরাধিকা শিরোমণি শ্রীরাধার প্রণয়লীলা তাঁহারা আপন হৃদয়বৃন্দাবনে অল্পক্ষণ অল্পভব করিতেন। সেই অল্পভূতিকেই কবিতার স্বর্ণপাত্রে ঢালিয়া দিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিগণ লীলাময়কে স্নেহের পুস্তলী বা পরম প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন। সেইজন্তই আপনাকে স্নেহময়ী জননী ও প্রেমবিধুরা প্রণয়িনী কল্পনা করিয়া মনের অল্পভব কবিতায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাই বৈষ্ণব কবিতায় বাৎসল্য ও মধুর বা প্রেম এই দুই রসই প্রধান।

আবার এই দুই রসের মধ্যে মধুররসই বৈষ্ণব পদাবলীতে সমধিক স্ফুটিলাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মহিমা বর্ণনায় সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছেন। ব্রজেশ্বরী ও ব্রজসুন্দরের মিলন ও বিরহ, মান ও অভিমানের কথা বহুভাবে বলিয়াও যেন তৃপ্তি পান নাই। কিন্তু মাতা যশোদার বাৎসল্যভাব বর্ণনা করিতে তাঁহাদের যেরূপ আগ্রহ দেখা যায় নাই। সেইজন্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে মধুররস অপেক্ষা বাৎসল্য রস হীনপ্রভ। তাই বলিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্যরস মাধুর্যবিহীন—ইহা বলা যায় না। স্নেহের ছুলাল গোপালের জন্ত মাতা যশোদার যে বিচিত্র হৃদয়াল্পভূতি বৈষ্ণব কবি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় নহে। মধুররসের মাধুর্য যেন মণিমাণিক্যের দ্যুতি, স্ননির্মল ওজ্জ্বল্যে অন্তরবাহির উদ্ভাসিত করিয়া রাখে। বাৎসল্য-রসের মাধুর্য যেন প্রদীপশিখার স্নিগ্ধপ্রভা—শান্ত জ্যোতিতে অন্তর প্রাণানের

প্রখ্যাত সাহিত্য-কর্মী ও গবেষক বিনয় ঘোষ-কৃত
বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের প্রাথমিক আকরগ্রন্থ
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

(প্রথম খণ্ড—১২'৫০)

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির উপকরণ তদানীন্তন বাংলা সাময়িকপত্র থেকে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড এবং কবি ইন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনাবলী এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল। অতি দুঃপ্রাণ্য, জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য পত্রিকা যেটে বাংলার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাবতীয় উপকরণ এই সংকলনে বিষয়ভেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত সম্পাদকীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও টীকা সংযোজিত। ১৮৪০ সন থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত বিষয় সংকলিত। এই ধরনের আরো ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থ-প্রকাশনে ভারত ও বাংলা সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্য বৃহৎ রয়েল অক্টোভো সাইজের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার বই, আর্টপ্লেট ও বোর্ড-বান্ধাই সমেত নামমাত্র করা হয়েছে।

ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, সমাজকর্মী সকলের পাঠযোগ্য অতুলনীয় গ্রন্থ

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
সচিত্র সংস্করণ ৫'৫০ ॥

[প্রতীচির মহাকাব্যগুলি থেকে চয়িত অল্পম কথাসাহিত্য-সংগ্রহ]

AFRICANISM : Rs. 16/-

শশিভূষণ দাশগুপ্তের	নবগোপাল দাসের
ব্যান ও বন্যা ৩'০০ ॥	•এক অধ্যায় (২য় মুঃ) ৩'০০ ॥
অশোক মিত্রের	বুদ্ধদেব বহুর
ভারতের চিত্রকলা	স্বদেশ ও সংস্কৃতি
৪১টি আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥	(২য় মুঃ) ৪'০০ ॥
শিবনাথ শাস্ত্রীর	প্রমথনাথ বিশীর
ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪'০০ ॥	বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

ক্ষুদ্র পরিসরটুকু আলোকিত করিয়া রাখে, প্রাঙ্গণদীপার বাহিরে তাহার রেশ পৌঁছায় না। যিনি আনন্দনিলয় ভগবানকে ক্ষুদ্র শিশুরূপে দেখিয়াছেন তিনি তাহারই আনন্দে সমাহিত হইয়া থাকেন। পুত্ররূপী ভগবানের প্রতি তাঁহার স্নেহ আড়ম্বরহীন। তাহা গভীর হইয়াও উদ্দাম নহে, তীব্র হইয়াও উদ্ভাসিত নহে, তাহা অতল সাগরের গায় শান্ত ও সুগভীর। কান্ত্যভাবান্বিত বৈষ্ণব সাধক ভগবানকে প্রিয়তমে পরিণত করিয়া বিচিত্রভাবে তাঁহার মাধুর্য আশ্বাদন করেন। তাই কান্ত্যভাবান্বিত বৈষ্ণব সাধকের ঈশ্বরপ্রীতি অনন্ত বৈচিত্র্যযুক্ত। কখনও মিলন কল্পনায় তাহা আনন্দে উল্লসিত, কখনও বা বিরহ চিন্তায় তাহা বিষাদে ম্লান। এই বৈচিত্র্যই মধুররসকে চরম প্রকর্ষ দান করিয়াছে ও নিখিল মানবের চিত্তাকর্ষী করিয়া তুলিয়াছে।

ভক্তিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে রাগাঙ্গিকা ভক্তি ঈশ্বরপ্রাপ্তির পরমোৎকৃষ্ট ও মধুরতম পন্থা। যিনি অসীম, রূপাতীত ও নিরূপার্থিক তাঁহাকে এই রাগাঙ্গিকা ভক্তির দ্বারাই মর্তের বন্ধনে লাভ করিতে পারা যায়। চিত্তের স্বতঃউচ্ছাসিত গাঢ়তৃষ্ণা বা দুর্দমনীয় মিলনাভিলাষ ও একান্ত তন্ময়তাই রাগাঙ্গিকা ভক্তি।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাহজ রাগাঙ্গিকোদিতা ॥

(ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ, পূর্ববিভাগ ২৬২)

এই রাগাঙ্গিকা ভক্তিই যে বৈষ্ণব কবি-বর্ণিত শ্রীরাধার পিরীতি বা প্রেম তাহাতে সন্দেহ নাই। যে রাধা-মাধবের প্রেম বৈষ্ণব কবির হৃদয় মোহিত করিয়াছিল তাহা বিপুল, সহজ, নির্মল, নিত্য ও আনন্দস্বরূপ—

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণং বর্ধমানম।

অবিচ্ছিন্নঃ স্খলিতরমহুতাবেগম্ ॥ (নারদভক্তি সূত্র : ৫৫)

এই পরম স্খল অথচ পরম মহান প্রেম ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ইহা হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়। এ প্রেম বাত্যাবিস্কৃত সমুদ্রের মত উত্তাল, বর্ষার ক্ষুরধার জলধারার গায় দুর্দমনীয় ও মৌন গিরিরাজের মত শান্ত, সর্ববিকৃতিরহিত ও অনন্ত গাভীরে সমাচ্ছন্ন। বিভাপতির একটি সুন্দর পদে প্রেমের এই স্বরূপটি প্রকাশিত হইয়াছে—

যোদ্ধলু সকল মহীতল গেহ।

ক্ষীর নীর সম ন হেরল নেহ ॥

যব কোই বেরি আনল মুখ আনি।

ক্ষীর দন্ত দেই নিরসত পানি ॥

তবহু ক্ষীর উমতি পত তাপে ।
 বিরহ বিয়োগে আগ দেই ঝাঁপে ॥
 যব কোই পানি আনি তাহি দেল ।
 বিরহ বিয়োগ অবহি দূর গেল ॥
 ভনই বিতাপতি এহেন স্নেহে ।

রাধা মাধব ঐশন নেহ ॥

—(বিতাপতি)

সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলাম, জল ও দুধের মধ্যে যে প্রেম তাহার তুলনা দেখিলাম না । কেহ যদি জল মিশ্রিত করিয়া দুধ আগুনে চাপাইয়া দেয় এবং জল শুকাইয়া দেয় তাহা হইলে দুধ উতলাইয়া জলের বিরহে আগুনে ঝাঁপ দেয় । তখন যদি উহাতে জল দেওয়া হয় তখন বিরহ দূরে যায় ও দুধ শান্তভাবে লাভ করে । ইহাই স্নেহ, বা প্রেম—রাধা-মাধবের প্রেম এইরূপ ।

এইরূপ মহনীয় হৃদয়প্লাবী প্রেমের মূর্তবিগ্রহ বৃষভানুন্দিনী শ্রীরাধিকা ।
 তিনি কৃষ্ণপ্রেমময়ী কৃষ্ণপ্রেমাঙ্গিকা—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।

সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পরা ॥

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেম অনির্বচনীয় । কোন তুলনীয় বস্তুর মানদণ্ডে ইহার গুরুত্ব পরিমাপ করা যায় না । ইহা এক হ্রবগাহ অননুমেষ হৃদয়ানুভূতি—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি ।
 পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি ॥
 দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।
 আধ তিল না দেখিলে যায় সে মরিয়া ॥
 জল বিহু মীন যেন কভু নাহি জীয়ে ।
 মানুষ্যে এমন প্রেম কোথা শুনিযে ॥
 ভানু কমল বলি সেহো হেন নয় ।
 হিমে কমল মরে ভানু স্নেহে রয় ॥
 চাতক জলদ কহি—সে নহে তুলনা ।
 সময় নহিলে সে না দেয় প্রেম কথা ॥
 কুসুমের মধুপ কহি সেহো নহে তুল ।
 না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
 কি ছার চকোর চাঁদ দুহু সঁম নহে ।
 ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥

—(চণ্ডীদাস)

প্রেম যত প্রগাঢ় হয় তত প্রেমাস্পদকে একান্তভাবে পাইবার তৃষ্ণা তীব্র হইয়া উঠে। এই তৃষ্ণাই প্রেমিকার চিত্ত তন্ময়তার আবেশে সম্মোহিত করিয়া রাখে। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল। নিখিল ত্রিলোকে কৃষ্ণরূপ ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার নয়নে উদ্ভাসিত হইত না, কর্ণে মুরলীরব ভিন্ন আর কোন ধ্বনিই শ্রবিত হইত না। এই তন্ময়তা ব্যতীত যথার্থ প্রেমের উদয় সম্ভব নহে। ভেদ প্রতীতি প্রেম-প্রতিবন্ধক। প্রেমিকা আত্মবিশ্বত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে পারিলেই যথার্থ প্রেমের উন্মেষ ঘটে। দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া

পরেতে মিলিতে পারে।

পরকে আপন করিতে পারিলে

পিরীতি মিলয়ে তারে ॥

ছুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও

থাকিলে পিরীতি আশ।

পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

শ্রীমতীর প্রেম সর্ববিশ্ময়ি গন্ধ, মাল্লতম। আত্মাভিমানের ক্ষীণতম স্পর্শ ইহাকে কলুষিত করে নাই। তদীয় স্ব ও মদীয় স্বের ভেদ তাঁহার তিরোহিত হইয়াছে—শুধু এক অনির্বচনীয় আনন্দের আবেশ তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

তোমার পিরীতি স্তম্ভ সায়েনের মাঝ।

তাহাতে ডুবিল মোর কুলশীললাজ ॥

কি দিব দিব বন্ধু মনে করি আমি।

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন আমার তুমি।

তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার।

তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার ॥

—(যতুনাত দাস)

তাঁহার এই অন্তহীন স্বগভীর প্রেমপ্রবাহ হৃদয়ের ছই কূল প্রাবিত করিয়া গিয়াছে। লোকধর্ম, বিধিধর্ম, স্বজন আত্মপথ কল্লিত কোন বাধাই ইহার

গতি রুদ্ধ করিতে পারে নাই। যে শ্রোতস্বিনী অন্ধ আবেগে সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া চলে ; দুর্লভ্য শিলার বন্ধন তাহাকে কি রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ?

কাহ্ন অলুরাগ বাগ যব পৈঠল
মন খন কানন মাঝ ।
মান গজেন্দ্র দরজন দূরে রহ
গন্ধে ভাগল কবিরাজ ॥
ধরম কুরঙ্গ রঙ্গ করি ভুষল
কুল হয় পলায়ন ত্রাসে ।
ধৈর্য মেঘ দেশ তঁহি ছোড়ল
স্বামী বরত অজা নাশে ॥
পরশীক বাক কাকসম কলকলি
ননদিনী জম্বুকী বোলে ।
গুরুজন জাল মান তঁহি কেবল
দুরজন নয়ান বিশানে ।
নিয়ম বোল ঢোল সম ঘোষই
নিন্দা ত্রিশূল সম হানে ।
শাদূল চিত ভীত নাহি হোয়ত
কবি বিছাপতি ভণে ॥

—(বিছাপতি)

এ প্রেমের গতি বিচিত্র, দুরল্লভ্য। ক্ষণকালের জন্ত বিচ্ছেদ সহ হয় না। নিরবচ্ছিন্ন মিলনেও বিরহের শঙ্কা উদ্ভিত হয়। অভিমানের ছায়া চন্দ্ৰের কলঙ্কের মত নিকলুষ মিলনানন্দকে কলুষিত করে। রম্যপ্রস্থানে প্রেমের এই অবস্থার নাম ‘প্রেমবৈচিত্র্যম্য’। ইহাই প্রেমের চরম পরিপক্বতার ফল স্বরূপ।

প্রিয়স্ত সন্মিকর্ষেহনি প্রেমোৎকর্ষস্তভাবতঃ ।

যা বিশ্লেষ ধিয়্যার্তিস্তত প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥

(উজ্জলনীলমণিঃ স্বপ্নার ভেদপ্রকরণম্)

শ্রীরাধার প্রেমে এই চরম পরিপক্বতা আসিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—

কি পুছসি রে সখি কাহ্নক নেহ ।

এক জিউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ ॥

কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি ।
 না জানি কি পায়ই মধু মুখ হেরি ॥
 বিনি মঝ দরশ পরশে নাহি জীব ।
 সো বিহু পিয়াসে পানি নাহি পীব ॥
 ভয় বিহু লেজ পরশ নাহি পাই ।
 চীরহি বিন তাহুল নাহি খাই ॥
 ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ ।
 মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস ॥
 আন সতে কাহিনী না সহে পরাণ ।
 আস সম্ভাষণে হরায় গেষান ॥

—(কবিরঞ্জন)

এইরূপ স্বার্থবিলোপী বন্ধনহীন প্রেমের আকর্ষণ প্রেমময় শ্রীভগবানকে
 মর্ত্তভূমিতে টানিয়া আনে । প্রেমময় প্রেমিকার অন্তরে একাত্ম হইয়া বিধাতা
 বিরাজ করেন—

হৃদয় মন্দিরে মোর কাহ্ন ঘুমন্তল
 প্রেম গ্রহরী রহ জাগি ॥

—(গোবিন্দদাস)

শ্রীরাধার প্রেম স্বস্থখবাসনার স্পর্শে কলুষিত নহে । যদি কখনও সন্তোগেচ্ছার
 উদয় হইয়াছে তাহা কৃষ্ণস্বখেচ্ছাকে ফলবতী করিবার জন্ম । শ্রীরাধা
 নিজাঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণসেবা করিতে চান, কৃষ্ণসেবার দ্বারা আত্মস্থখোৎপাদনের
 ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় তাঁহার নাই—

প্রিয়া যব আঁওর এ মঝু গেহে ।
 মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
 কনয় কুস্ত ভরি কুচযুগ রাখি ।
 দরপন ধরব কাজর দেহ আঁখি ॥
 বেদী বলব হাম আপন অঙ্গমে ।
 ঝাড়ু কবর তাহে চিকুর বিছানো ॥
 কদলি ঝোপক হাম গুরুয়া নিতম্ব ।
 আত্ম পল্লব তাহে কিঙ্কিনি মুকুট ॥

—(বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধার প্রেমে পরিতৃপ্তি নাই। যতই শ্রামরূপ স্বধা আশ্বাদন করেন ততই আশ্বাদন স্পৃহা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারহু

নয়ন না তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু

তবহু হিয়া জুড়ল না গেল ॥ —(বিদ্যাপতি)

শ্রীকৃষ্ণের পিরীতিস্বথসায়রে শ্রীরাধা ডুব দিয়াছেন, অমূল্য রত্নের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহার জ্ঞাত কুল, শীল, লজ্জা, মান সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছেন। নারীজীবনের চরমতম দুঃখ কুলত্যাগিনীর কলঙ্ক সগর্বে মণিমালোর হ্রায় শিরোভূষণ করিয়াছেন।

তুয় অহুরাগে হাম হলাম কলঙ্কিনী। —(জ্ঞানদাস)

আলোর দ্বার যাহার সম্মুখে উন্মুক্ত কুজ্ঝটিকাতে তাহার কি ভয়? কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা পান করিয়া শ্রীরাধা মাতাল হইয়াছেন। বাহ্যিক জগতের দুঃখের রেখা তাহার অহুত্বতির রাজ্যে পৌছায় না। শুধু প্রিয়দর্শন যখন দুর্লভ হয় তখন দুঃখের অবধি থাকে না। প্রিয় বিরহের দুঃখ মর্যাস্তিক, হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে দুঃখের ভারে।

সখি হে, হমারি দুখক নাহি ওর।

ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর

শুভ্র মন্দির মোর ॥

বাম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি

ভুবন ভরি বরিযন্তিয়া।

কান্ত পাহল কাম দারুণ

সঘনে খর শর হস্তিয়া ॥

কুলিশ কত শত পাত মোদিত

ময়ুর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাহুরি ডাকে ডাহকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া।

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী

অথির বিজুরিক পাতিয়া

কহয়ে শেখব কৈসে গমায়ব

হরি বিহু ইহ রাতিয়া ॥ —(রায়শেখর)

ভাদ্রের অবিশ্রাম বারিধারার ভ্রায় শ্রীমতীর নয়নে ধারা বহিতেছে। তিনি গৃহ সাজাইয়া বসিয়া আছেন প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষায়। কিন্তু কোথায় সেই পরাণের পরাণ ব্রজেন্দ্রহুলাল? স্ত্রীতর বেদনায় বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে। বিরহ রজনীর অবসান কিরূপে হইবে? বিরহিনী নারীর প্রেমবিহ্বল এই চিত্র সাহিত্যে সত্য অতুলনীয়।

শ্রীরাধার প্রেমের চরম প্রকট অভিব্যক্ত হইয়াছে অভিসারের পদগুলিতে। বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিসারের পদগুলি সে মাধুর্যে ও ভাবসৌন্দর্যে অতুলনীয়। প্রেমের সে তীব্রতা অভিসারের পদগুলিতে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বোধকল্পি একমাত্র বৈষ্ণব কবিবর্ণিত শ্রীরাধার প্রেমেই সম্ভব। রাধামাধবের প্রেম লৌকিক প্রেম নহে, তাই লৌকিক প্রেমের ক্ষুদ্রতা ও অসম্পূর্ণতা ইহাতে নাই।

বর্ষার ঘনায়মান মেঘপুঞ্জ আকাশে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বৃষ্টির বেগ হ্রাসহ। ঘন ঘন বান্ বান্ শব্দে বাজ পড়িতেছে, চতুর্দিকে বিদ্যুতের জ্বালা। পঙ্কিল পথ প্রতিপদে আশঙ্কাজনক। তথাপি শ্রীমতী কান্তের উদ্দেশে সংকেতকুঞ্জে চলিয়াছেন। কারণ

• ছুটল বাণ কিয়ৎ যতনে নিবার ॥

শ্রীমতী কিরূপে নিবৃত্ত হইবেন?—

আজু ছরদিন ভেল।

কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি

সংকেত কুঞ্জে হি গেল ॥ —(রায়শেখর)

যে প্রেমানন্দ আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে চিত্ত অধিকার করিয়া আছেন তিনি এই দুর্দিনে সংকেত কুঞ্জ হইতে শ্রীমতীকে আহ্বান করিতেছেন। শ্রীমতী ঘরে থাকিবেন কিরূপে? সকল বিষ উপেক্ষা করিয়া কান্তসকাশে শ্রীমতী চলিয়াছেন—

কুল মরিয়াদ কপাট উদ্ঘাটলু

তাহে কি কাঠিহি বাধা।

নিজ মরিয়াদ • সিন্ধু সঞে পভরলু

তাহে কি তটিনী অগাধা ॥

সহচারি মঝু পরিমল কর দুর।

যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি

সোঙরি সোঙরি মন বুর ॥

কোটী কুসুম শর বরিষয়ে যছু পর

তাহে কি জলদ জল লাগি !

প্রেম দহন দহ থাক হৃদয় সহ

তাহে কি বজরক আগি ॥ —(গোবিন্দদাস)

এই অভিসারের জন্ত দীর্ঘকাল শ্রীমতী আপনাকে প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহাকে কাঁটাবনে, পিছল পথে, অন্ধকার রাতে যাইতে হইবে, তাই বহুদিন হইতে তিনি এইরূপ সওয়া অভ্যাস করিতেছেন।

কণ্টক গাঢ় কমল সম পদতল

মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি ॥

গাগরি বারি চারি করি পিছল

চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

হরি অভিসারক লাগি ।

দূতর পছ গমন ধনী সাধয়ে

মন্দিরে যামিনী জাগি ॥

করযুগে নয়ন মুদি চলু ভাবিনী

তিমিরি পয়ানক আশে ।

মণি কঙ্কণ বাণ করি মুখ বন্ধন •

শিখই ভূজগ গুরু পাশে ॥ —(গোবিন্দদাস)

যে ঐকান্তিক দুর্দমনীয় দর্শনস্পৃহায় গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী স্বদূর পর্বতঅরণ্যে ছুটিয়া চলেন, আনন্দোচ্ছল জগতের মোহনীয় আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করেন না, সেই দর্শনস্পৃহাই শ্রীমতীর অভিসারের উদ্দীপক। শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অভিসার ভক্তের ভগবত প্রাপ্তির জন্ত গৃহত্যাগ ভিন্ন আর কিছু নহে।

শ্রীকৃষ্ণ অথও রসস্বরূপ, শ্রীরাধা অথও রসবল্লভা, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, শ্রীরাধা শক্তিরূপিনী কান্ত্যশক্তিরূপা। হলাদিনীর মূর্তবিগ্রহ রূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আশ্বাদন করান।

হলাদিনী বা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী ।

ততসার ভাবরূপেয়মিতি তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতা ॥

স্বচ্ছ কান্ত্যস্বরূপেয়ং সর্বদা বার্যভানবী ।

ধৃত ষোড়শ শৃঙ্গারা দ্বাদশভরণাশ্রিতা ॥

(উজ্জলনীলমণি, রাধা প্রকরণ ৬)

কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমময়ী। কৃষ্ণ ভিন্ন তিনি আর কিছু
জানেন না। মোক্ষকামী যোগী যেমন সর্ব চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের
ধ্যানে মগ্ন থাকেন, কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধাও সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি প্রেমাম্পদের ধ্যানে
সমাহিত করিয়া প্রেমসমুদ্রে ডুব দিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়লোকে ব্রজেন্দ্রনন্দন
জুড়িয়া রহিয়াছেন, বহির্জগতের অস্তিত্ব তাঁহার কাছে বিলুপ্ত। তাঁহার

বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে

ভিতর দুয়ার খোলা।

শ্রীরাধার প্রেম সমর্থারতির সর্বোত্তমা অভিব্যক্তি। ইহা মহাভাবসংজ্ঞ কারণ
আলংকারিকগণ বলেন সমর্থারতির চরমতম পরিণতিই মহাভাব

ইয়মেব রতিঃ প্রোচা মহাভাবদশাং ব্রজেত্

(উজ্জলনীলমণি, স্থায়ী প্রকরণ)

মহাভাব অগ্ৰাণু কৃষ্ণপ্রেমসী ব্রজদেবীগণেও বিরাজিত। শ্রীরাধাতে মহাভাব
লাভ করিয়াছে চরমতম উৎকর্ষ—গাঢ়তর পরম পরাকাষ্ঠ—মাদনাবস্থা।
মাদনাত্ম মহাভাব শ্রীরাধা ভিন্ন অত্র কোন কৃষ্ণপ্রেমসীতে নাই। শ্রীরাধাতে
প্রেম-বিকাশের চরম পরাকাষ্ঠা আছে বলিয়া শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্ষ
চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপতা শ্রীরাধার প্রেমের স্পর্শে
চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

॥ বেঙ্গলএর বরণীয় সাহিত্য-সম্ভার ॥

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

বাংলা ছোটগল্পের
অভিজ্ঞাত সংকলন

শতবর্ষের শতগল্প

১ম খণ্ড : ১৫.০০ ॥
২য় খণ্ড : ১২.০০ ॥

সরলাবালা সরকারের

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (সচিত্র)

৪.৫০ ॥

কালকূটের

অমৃতকুন্তের সন্ধানে (২ম মুঃ) ৫.০০ ॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নীলকণ্ঠের

মধুমতী (২য় মুঃ) ২.৫০ ॥

এলেবেলে

২.৫০ ॥

মাধুর (২য় মুঃ) ৪.০০ ॥

অগ্র ও প্রত্যহ (২য় মুঃ) ৫.০০ ॥

বিনয় ঘোষের

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩.০০ ॥

২য় খণ্ড : ৭.০০ ॥

৩য় খণ্ড : ১২.০০ ॥

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো ॥

জর্জ টম্পসন ও নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চার দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে মানিকতলার বোমার আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশ স্বদেশী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সহজে যে গোপন তথ্য উদ্ঘাটন করেন—সে চাঞ্চল্যকর কাহিনী বাঙালীর ইতিহাস-পাঠকের অজানা নয়। কিন্তু তারও পঁয়ষট্টি বছর আগে এ মানিকতলা অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে নব্য-শিক্ষিত বাঙালী একজন ভারতপ্রেমিক ইংরেজের নেতৃত্বে রাজনীতি-চর্চার যে প্রথম সূত্রপাত করেন সে কাহিনী বাঙালী আজ ভুলে গেছে। অথচ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আধুনিক রাজনীতি-চর্চার এরূপ সমবেত প্রয়াস ইতিপূর্বে বাঙালীর জীবনে আর দেখা যায়নি। যে উদার রাজনীতি-বিদকে কেন্দ্র করে নব্যবঙ্গ রাজনীতি-চর্চায় মেতে উঠেছিলেন তিনি হলেন ইংলণ্ডের মানবতাবাদী বিখ্যাত বাঙালী জর্জ টম্পসন। বাঙালীর ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কলকাতায় এসে তিনি নব্যবঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি সাধারণ অধিবেশনে। তারপর নব্যবঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রশেখর দেবের গৃহে ছোট ছোট বৈঠকে মিলিত হন। কোন ব্যক্তির গৃহে সমবেত রাজনীতি-চর্চা সম্ভব নয় বলে বিবেচিত হওয়ায় অতঃপর নব্যবঙ্গ সভার স্থান ঠিক করেন মানিকতলার শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে। কলকাতার জনসাধারণের জ্ঞান কোন সভাগৃহ তখনও তৈরী হয়নি।

জর্জ টম্পসনকে নিয়ে নব্যবঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে সমসাময়িক রাজনীতি-বিষয়ক চারটি আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী, দ্বিতীয় সভা ১৩ই ফেব্রুয়ারী, তৃতীয় সভা ২০শে ফেব্রুয়ারী এবং চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয় একই বৎসরের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। নব্যবঙ্গের মুখপত্র ‘বেঙ্গল স্পেকটেটর’ থেকে জানা যায়

৬ই ফেব্রুয়ারীর প্রথম সভায় মিঃ জর্জ টম্পসন ও ছজন যুরোপীয় ভদ্রলোক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুশো জন দেশীয় ভদ্রলোক, ১৩ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় সভায় কয়েকজন যুরোপীয় ভদ্রলোক এবং দুশো জনের বেশী দেশীয় ব্যক্তি, ২০শে ফেব্রুয়ারীর সভায় দুশো জনের মত দেশীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ সভায় উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা কত ছিল 'বেঙ্গল স্পেকটেটরে' তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মানিকতলার বাগানবাড়ীতে অনুষ্ঠিত চারটি সভারই প্রধান বক্তা ছিলেন জর্জ টম্পসন। প্রথম তিনটি সভায় তিনি সাধারণভাবে নব্যবঙ্গকে রাজনীতি সচেতন হবার জন্য উপদেশ দেন। চতুর্থ সভায় তিনি সমসাময়িক ভারত শাসন-ব্যবস্থার প্রকাশ্য সমালোচনা করেন। পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্মে সভার কার্যধারার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হলো।

প্রথম সভা, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩

প্রথম সভার তরুণ বাঙালী সমাজকে জর্জ টম্পসন আহ্বান করেন সংস্কারমূলক মন নিয়ে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান আহরণ করবার জন্যে তিনি জোরের সঙ্গে একথা বলেন, দেশের কাজে লাগতে হলে দেশ সম্পর্কে আগে জানতে হবে। নব্যবঙ্গকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন :

'What is the end at which you aim? Is it not to represent fully, fairly and impartially, the condition and claims of the various classes of your countrymen? Is it not to understand the nature, extent and causes of their grievances and to suggest appropriate and practicable remedies?'

সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ-চেতনায় জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে উত্তেজিত করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার ফলে ভারতবাসী যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে শিক্ষিত ভারতবাসী প্রথমে তার বিবরণ সংগ্রহ করুক, তারপর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্যে যে সমস্ত অসুবিধার কারণ দূরীভূত করে নিপীড়িত ভারতবাসীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হোক। এ উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করবার জন্ম সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি। যে সকল দুঃসময় সমসাময়িক ভারতীয় জীবনকে দুঃসহ ব্যথায় জর্জরিত করেছে তার উৎ

শুধু ব্রিটিশ কুশাসনের মধ্যে নিহিত নেই, কিংবা ভূতপূর্ব যে শাসনশক্তিকে উৎখাত করে ইংলণ্ডবাসী ক্ষমতা লাভ করেছিল সে রাজশক্তির মধ্যেও নিহিত ছিল না—ভারতীয় জীবনে এ দুর্বলতার উৎস খুঁজতে হবে আরো প্রাচীনকালে। বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষে শাসনক্ষমতা লাভ করবার বহুকাল পূর্ব থেকেই জাতীয় জীবনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার উৎস কোথায় সর্বপ্রথমে শিক্ষিত যুবকদের তা নির্ণয় করতে হবে।

জর্জ টম্পসন বলেন, যে যুগসন্ধিক্ষণে ভূতপূর্ব রাজশক্তি থেকে শাসনক্ষমতা ব্রিটিশের কাছে হস্তান্তর হল তার কারণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। না হলে বর্তমান সরকার ভারতবাসীর প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোন অত্যাচার করছে কিংবা অসাবধানতার ফলে কোন অত্যাচারের অনুষ্ঠান করছে—তা নির্ণয় করা সহজ হবে না। ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির উদ্ভব-বিকাশ এবং সংহতির ইতিহাস শিক্ষিত যুবকদের ভাল করতে পড়তে হবে। সে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত না হলে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রভাবের রহস্য কোথায় এবং ভারতবাসীর দুর্বলতার কারণ কি তা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। যে উপায়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে তার সঙ্গে পরিচিত হলে ভারতবাসী বুদ্ধি, স্বদেশপ্রেম, মিলিত শক্তি, দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার মূল্য কি সে সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ শিক্ষাও লাভ করতে পারবে জাতি যদি অজ্ঞ থাকে, তাদের শক্তি যদি বিভক্ত হয়, তারা যদি চরিত্রহীন হয়, একের প্রতি অপরের সন্দেহ যখন তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, এবং তাদের চিন্ত যদি স্বদেশের প্রতি প্রীতিহীন হয়—যে স্বদেশপ্রীতি মহত্ত্বলাভের পক্ষে একটা বড় অনুপ্রেরণা এবং স্বাধীনতালাভের অগ্রতম উপায়—তাহলে তাঁদের পরিণতি কি দাঁড়ায় ?

সেজগ্ত জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে বলেন :—যে পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে তোমরা এখন বাস করছ সে অবস্থায় ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করে সে দেশের সংবিধান এবং সরকারী রীতিনীতির সঙ্গে যেমন তোমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন তেমনি ব্রিটিশ জনসাধারণের প্রতিভা এবং মনোভাবের সঙ্গেও তোমাদের পরিচিত হতে হবে। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজেদের শক্তির অপব্যবহার করে ব্রিটিশ জাতির মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছে। কিন্তু একথাও তোমাদের জানা দরকার ইংলণ্ডেই আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাদের ন্যায়নীতিবোধ তীব্র এবং তীক্ষ্ণ, অসহায় এবং নিপীড়িতদের প্রতি যাদের সহানুভূতি

অপরিসীম। স্বল্পসংখ্যক ইংরেজের কুকীর্তি দেখে সমস্ত জাতির বিচার করা তোমাদের উচিত হবে না। ইংলণ্ডের অন্তর থেকে শ্রায়ে প্রতী প্রীতি এখনও স্তিমিত হয়নি। দরিদ্রের জন্ত সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করতে তাদের বাহ এখনও নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির চাইতেও তোমাদের পক্ষেও বেশী প্রয়োজন বোধ হয় তোমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তোমাদের বিস্তৃত দেশ, তার নানা বিভাগ, দেশের লোকের নানা বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য, দেশীয় রীতিনীতির বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞানলাভ করা যেমন তোমাদের পক্ষে অপরিহার্য,—তেমনি তোমাদের জানতে হবে, কোন পদ্ধতিতে এদেশে ব্রিটিশ শাসন চলছে, সে শাসনের নীতি কি, কর্মপন্থা কি, এবং দোষগুণই বা কি? তোমাদের দেশের প্রকৃত অভাব-অভিযোগ কি দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করে তোমরা তা নির্ণয় করো। স্পষ্ট করে সে অভাব-অভিযোগ তোমরা ঘোষণা করো এবং কি উপায় অবলম্বন করলে তা দূর করা যায় তাও তোমরা নির্দেশ করো। পেচকের মত নিজের চোখকে বন্ধ করে কোন জাতি বড় হতে পারে না। জনসাধারণের অজ্ঞতার ভিত্তির ওপর একটি দেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ওপর। সর্বশেষে জর্জ টম্পসন বললেন, যারা তোমাদের প্রতি এ অন্তায় বিচার দূর করবার ক্ষমতা রাখেন তাঁদের কাছে তোমাদের স্বপক্ষে আমার ওকালতি ব্যর্থ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তোমাদের আমি ভালোবাসি। সেজন্যই তোমাদের উপদেশ দিতে সাহসী হয়েছি। তোমাদের প্রতি যে বিচার অলুপ্ত হচ্ছে সে সম্পর্কে যদি তোমরা সচেতন হও তাহলে তোমাদের শাসকজাতিও তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধ্য হবে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জর্জ টম্পসনের এ বক্তৃতা নব্য-বঙ্গের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'বেঙ্গল স্পেকটেটরে'র পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকীয় আলোচনায়। সে সংখ্যায় দেখা যায় জর্জ টম্পসনের বক্তৃতা শুনে ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ কিছু সংখ্যক শ্রোতাও উপস্থিত ছিলেন। জর্জ টম্পসনের বক্তৃতা শেষ হবার পর বানু হরচন্দ্র লাহিড়ী বাংলা ভাষায় সে বক্তব্য তাদের কাছে উপস্থিত করেন। ইতিপূর্বে চন্দ্রশেখর দেবের বাসভবনে ইংলণ্ডের ভারত-বন্ধুদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্ত কলকাতায় একটি সমিতি স্থাপনের যে প্রস্তাব হয়েছিল এ সভায়

তার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পর্কে বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী বিশদভাবে আলোচনা করেন।

যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হলে এ দেশের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব অতঃপর বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তার সবিস্তার আলোচনা করেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি তদানীন্তন ভারত সরকারের দুর্নীতিমূলক শাসনের ফলে ভারতবাসী যে অপরিদ্রায়ায় ছুঁথ এবং অস্ববিধার সম্মুখীন হয়েছিল তা বর্ণনা করেন এবং সে শাসন-ব্যবস্থার নিন্দা করেন। সরকারকে তিনি পবিত্র চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্তও করেন।

বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুরের একটি জিজ্ঞাসার উত্তরে জর্জ টম্পসন প্রস্তাবিত সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন : এ সমিতির প্রতিষ্ঠা হলে শুধুমাত্র রাজস্ব সংক্রান্ত সংবাদ ছাড়াও তা আরো বহু বিষয়ে সংবাদ-সংগ্রহ এবং সে সংবাদ-প্রচার করবার চেষ্টা করবে। এছাড়া প্রস্তাবিত সমিতির কর্মধারা শুধুমাত্র বাংলা দেশের 'সমস্তা-সম্পর্কিত' অল্পসংখ্যক নীতিবদ্ধ থাকবে না। যারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞানবিতরণ করতে চান তাঁরা যে কোন কাজেই লিপ্ত থাকুন না কেন—তাঁদের কাছে এ সমিতির দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। বস্তুতঃ ভারতের কল্যাণ-সম্পর্কীয় যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত এ সমিতি চেষ্টিত হবে। এ সমিতি 'ভূস্বামী সমিতির' (Landholders Association) একটা প্রতিপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান হবে না। বরং উভয় সমিতিই ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্ত পরস্পরের সহায়ক হবে। এরপর বাবু দক্ষিণারঞ্জন সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলায় একটি ভাষণ দেন।

একই সাম্রাজ্যের অধিবাসী হলেও ভারতীয় এবং ইংরেজ প্রজার মধ্যে রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনে স্বেচ্ছাস্ববিধা দান বিষয়ে ভারত সরকার যে বৈধম্যমূলক আচরণ করছিলেন তার জন্ত নব্যবঙ্গের মনে ক্ষোভের সীমা ছিল না। কোন কোন তেজস্বী নব্যবঙ্গ বিচ্ছিন্নভাবে মনে মনে তাঁদের এ অসন্তোষের অভিব্যক্তি দিচ্ছিলেন। কিন্তু সংহতভাবে নিজেদের স্বাধিকারের দাবীকে উপস্থিত করবার জন্ত কোন প্রেরণা ইতিপূর্বে তাঁরা পাননি। জর্জ টম্পসনের আলোকিত পেয়ে এখন তাঁরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। একটি রাজনৈতিক সমিতি গঠন করে জর্জ টম্পসনের পরামর্শমত দেশের বাস্তব অবস্থার অল্পসংখ্যক এবং সমবেতভাবে ভারত সরকারের এ বৈধম্যমূলক আচরণ ও শাসন-সংক্রান্ত দোষত্রুটির প্রতিবাদ করতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। ভারত সরকার নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মহালুভূতিশীল নয়

বলে জর্জ টম্পসনের উপদেশ মত তাঁরা নিজেদের দাবি-দাওয়াকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলেও স্থির করলেন। এ অভিপ্রায়ে অচিরেই গঠিত হল বাংলা দেশের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—The Bengal British India Society. এ সমিতির কর্মধারা ক্রমশঃ আলোচ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের শিক্ষিত বাঙালী-চিন্তে যে রাজনৈতিক অসন্তোষের বহিঃস্ফূর্তি ধুমায়িত হয়ে চাঞ্চল্যকর অসহযোগের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল তার প্রথম অঙ্গুর দেখা যায় নব্যবঙ্গের এ অপরিণত রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে। তবে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধালাভের জন্য নব্যবঙ্গের কর্মপন্থা ছিল একেবারে আলাদা, ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগের নীতিকেই তাঁরা স্বাধিকারলাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দেশের মধ্যে অধিকাংশ লোক তখনও আধুনিক শিক্ষার আলোক পায় নি, আধুনিক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন ধারণা তাঁদের ছিল না। এ অবস্থার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অসহযোগী কর্মপন্থা গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এ ছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ইংরেজদের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বরাজ্য-লাভের কল্পনা তখনও তাঁদের মনে জাগেনি। বরং ইতিপূর্বকার মুসলমানদের স্বৈরাচারী মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা থেকে ইংরেজদের শাসনব্যবস্থায় অনেক প্রগতির চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন তাঁরা। সেজন্য রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্বন্ত উনবিংশ শতাব্দীর সকল বাঙালী মনীষীই প্রগতিশীল ইংরেজের সহায়তায় জাতির উন্নতি কামনা করেছিলেন। নব্যশিক্ষিত বাঙালী নিয়মতান্ত্রিকতার পথে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধালাভের জন্য সমবেতভাবে প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে।

॥ দুই ॥

দ্বিতীয় সভা ॥ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভারতের নানা বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের দিকে। আবেগোচ্ছসিত কণ্ঠে তিনি বলেন :

‘At the mention of the word India, there lives stretched out before us a realm whose beauty, whose diversity, whose

riches, whose grandeur and whose sublimity has no superior, if indeed, it has any rival, upon the face of the whole earth.”

ভারতের প্রতি এরূপ অনুরাগ সে যুগে কোন ইংরেজের মনে কেন খুব কম বাঙালীর মনেও ছিল দুর্লভ। শুধুমাত্র বর্তমান ভারতের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যই যে ভারতপ্রেমিক টম্পসনের চিত্তকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তা নয়, ভারতের ইতিহাসের সজীব প্রবহমানতায় এবং সমকালীন অধঃপতিত ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ উজ্জীবন স্বপ্নে তিনি ছিলেন প্রবল আশাবাদী। ভারতবাসীর অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

‘At the mention of this word, I see rise before me a hundred millions of the human race, each one of them a being with sympathies, faculties, destinies, like my own ; with hopes, fears, sorrows, joys like other mortals. If ignorant, capable of enlightenment, if crude capable of being cultivated ; if helpless, entitled to succor ; if oppressed, entitled to pity and prompt deliverance.’

এরূপ ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ সন্তানবাপূর্ণ ভারতের সঙ্গে জর্জ টম্পসন পরিচিত করতে চাইলেন নব্যবঙ্গকে। স্বদেশপ্রেমের জলন্ত বহি প্রজ্জ্বলিত করে দিতে চাইলেন তিনি নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনে। শাসক জাতির লোক হয়েও নিপীড়িত অনগ্রসর ভারতবাসীর জগৎ কেন তাঁর এ মহানুভূতি? এর কারণ জর্জ টম্পসন মানবপ্রেমিক—বিশ্বপ্রেমিক—জর্জ টম্পসন মানবধর্মে বিশ্বাসী। একই বিশ্বশ্রুতি স্থাপন করেছেন পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষকে। সে হিসেবে পৃথিবীর মানুষমাত্রই এক পরিবারভুক্ত। “The world is my country, all mankind are my country men.”—বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথের মনে যে উদার মানবতার বাণী ধ্বনিত হয়েছিল বহু বৎসর পরে সে উচ্চকিত মৈত্রীর বাণী আমরা শুনতে পাই জর্জ টম্পসনের কণ্ঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। যে বর্ণ-বৈষম্যের দৃষ্ট প্রভাবে জগতের ক্লমকায় জাতিদের ওপর তাঁর স্বদেশবাসী নিপীড়ন চালিয়েছে মানবতার মূল্যমান বিচারে তারাও জর্জ টম্পসনের কাছে সমান প্রিয়।

শ্রোতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে জর্জ টম্পসন বললেন : “Man is man, whether an African or Indian sun has bronzed his complexion or the frigid north has bleached him, white as the wintry snow, that falls at his feet.”

এ উদার মানবতাবাদিত্তিক সাম্যের সম্পর্ক ছাড়াও জর্জ টম্পসন ভারতবাসীর সঙ্গে আর-একটি নিকট-সম্পর্ক অনুভব করেছিলেন যার ভিত্তি রাষ্ট্রিক। ইংলও এবং ভারতবর্ষ যখন একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তখন এক হিসেবে দেখতে গেলে ইংরেজ ও ভারতবাসী জাতি হিসেবেও এক। এদিক বিচার করতে গেলে ইংলণ্ডের প্রজারা ব্রিটিশ সংবিধান-অনুযায়ী যে সমস্ত স্বযোগ-সুবিধা ভোগ করে ভারতবাসীরাও ঠিক সে সমস্ত স্বযোগ-সুবিধার অধিকারী।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-পরিচালকদের মধ্যে এ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ঘটেছিল বলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রাজনীতি-সচেতন বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে স্বাধিকারের দাবী মুখর হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইংরেজ প্রজার মত রাজনৈতিক অধিকার দাবী করতে হলে ভারতবাসীর পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন জনমত সৃষ্টি করবার জ্ঞান একটা ঐকান্তিক প্রবাস। জর্জ টম্পসন তাই নব্যবঙ্গকে উপদেশ দিলেন : সংবাদ-পত্রে তোমরা এ বিষয়টি নিয়ে বারবার আলোচনা করো, দেশের সর্বত্র সভাসমিতির অনুষ্ঠান করো, পার্লামেন্টে তোমাদের দাবী-দাওয়া উপস্থিত করো, ব্রিটিশ সংবিধান-রচনাকারী সভাকে তোমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করাও। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হবার জ্ঞান তাঁরা বাস্তবিকই উৎসুক। তোমাদের অভিযোগের সঙ্গে পরিচিত হলে আগে হোক পরে হোক তাঁরা তা দূর করবার জ্ঞান প্রয়াসী হবেন। তোমাদের প্রকাশ্য অভিযোগ দূর করবার জ্ঞান তাঁরা যে পরিমাণে উৎসাহ বা উত্তমের পরিচয় দেবেন সে পরিমাণেই তাঁরা তোমাদের আস্থা বা অনাস্থাভাজন হবেন।

তোমাদের স্বার্থের পরিপন্থী যে সমস্ত দুষ্ট প্রভাব বিद्यমান আছে তার প্রতিকার কী করে সম্ভব? এর একমাত্র উত্তর ভারতবাসী তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা নিজেরাই বলুক। এ সমস্ত অভাব-অভিযোগের কথাকে সমন্বরে স্বনিত করে তোলবার জ্ঞান সর্বপ্রথমে প্রয়োজন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুই ধরনের মতামত প্রকাশিত হবে। একধরনের মত আসবে সে সমস্ত লোকের কাছ থেকে যারা বিশেষ কোন অভাব-অভিযোগের চাপে পীড়িত, আর-এক ধরনের মত আসবে আর-এক শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে যারা নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র মানবিক সহানুভূতির প্রেরণায় এ সমস্ত অভাব-অভিযোগ দূর করবার জ্ঞান উদ্গ্রীব।

প্রশ্ন ওঠে যদি এদেশবাসী তাদের সম্পত্তি, ভূমি-স্বত্ব, পৈতৃক বা স্বোপার্জিত

অর্থের আদানপ্রদান, স্বাধীনতার প্রসার বা সংকোচ, অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়, ন্যায়ের প্রয়োগ, শাস্ত্য গ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্কিত গুরুতর বিষয়ে প্রস্তাবিত আইনের কথা সমবেত ভাবে আলোচনা করে তাহলে তা কি অভিসন্ধিমূলক মনে করা হবে? জর্জ টম্পসন বললেন : ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহা মনে করি না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রস্তাবিত পরিবর্তন, নতুন আইন ও নতুন পদ্ধতির কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ, আশ্চর্যের কথা সরকারকে তোমরা সে সম্পর্কে কোন পরামর্শ দাও না। প্রয়োজন হলে সরকারী কর্মপন্থার বিরুদ্ধাচরণ করবার ভয় দেখাও না, কিংবা সংশোধিত কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করবার জন্ত তোমরা সরকারের নিকট সুপারিশও কর না। সরকারের ইচ্ছা অভিরুচি ও মতানুসারে সকল সভা মিলে বিধানসভায় আইন পাশ করে—যাদের জন্ত আইন পাশ হয় তাদের দিকে লক্ষ্য থাকে না। এ অবস্থায় প্রজার যদি কোন ক্ষতি হয় কিংবা তারা যদি কোন স্বযোগ-স্ববিধা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সরকার কি শেষপর্যন্ত প্রজাদেরই দায়ী করবে না? জর্জ টম্পসন জোরের সঙ্গে বললেন : এ অবস্থায় সরকার যদি তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করেন তোমাদের কী বলবার থাকে?

শিক্ষিত ভারতবাসীকে স্বাধিকারবোধে সচেতন করে তুলবার জন্ত জর্জ টম্পসন যে-ভাবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যুক্তির পর যুক্তির অবতারণা করছিলেন তা ছিল ভারতীয় মনে প্রায় অল্পপস্থিত। ‘You offer no advice, you threaten no opposition, you recommend no modification’—শুধুমাত্র সরকারকে উপদেশ দেওয়া বা সংশোধিত প্রস্তাব আনা নয়—প্রয়োজন হলে তিনি শিক্ষিত ভারতবাসীকে সরকারী স্বৈরাচারী কর্মপন্থার বিরোধিতা করতেও বললেন। স্বাধিকারলাভের জন্ত এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ সে যুগের রাজনীতি-সচেতন রামমোহন বা তাঁর ভাবশিষ্য দ্বারকানাথ বা ‘Grandfather of Indian Nationalism’ রাজনারায়ণও তাঁদের স্বদেশ-বাসীকে দেননি।

জর্জ টম্পসন অতঃপর নব্যবঙ্কে উদ্দেশ্য করে বললেন : সরকারী শাসন-নীতির সমালোচনা করবার জন্ত প্রথম গুঁড়ে নিতে হবে একদল যুবককে। সরকারী শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে যেমন তাদের অবহিত করে তোলা দরকার তেমনি স্বেচ্ছবোধের জগতেও তাদের উত্তীর্ণ করে দিতে হবে। মহৎ ও উদার ভাবানুভূতির দ্বারা তাদের তরুণ চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে। তাদের চেষ্টায় দেশ কিভাবে ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে সেদিকে তাদের

সচেতন করে তুলতে হবে। শুধুমাত্র কর্মপ্রয়াসের দিকে নয়—দেশের জন্তু আত্মত্যাগ এবং স্বার্থত্যাগের পথেও তাদের আকর্ষণ করতে হবে। এ দেশের একটি মাত্র যুবককেও যদি তিনি ঔদাসিন্য ও আরামের পথ থেকে স্বদেশসেবার মহত্তম আত্মত্যাগের পথে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন—তাহলে সেই হবে এ-দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার !

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে জর্জ টম্পসন বললেন : তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন হলেও বলো, ‘আজ থেকে নিজের সক্ষীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্তু শুধু আমি বাঁচতে চাই না—আমি বাঁচব আমার প্রিয় স্বদেশের কল্যাণের জন্তু । দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে, যে আইনের দ্বারা দেশ শাসিত হয় সে আইনের সঙ্গে, দেশের লোকের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে, যে নীতির ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার সে নীতির সঙ্গে, যে সমস্ত উপায়ের সাহায্যে দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি পেতে পারে সে সমস্ত উপায়ের সঙ্গে আমি পরিচিত হবো এবং আমার স্বদেশ-চিন্তা যাতে কার্যকরী রূপ পায়, ধৈর্যের সঙ্গে সে বিষয়ে আমি সচেতন হবো। শুধু আমি নিজের অন্তরকে যে স্বদেশ-চিন্তায় জাগ্রত করে তুলব তা নয়, যাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করি তাদের মনকেও আমি একই চিন্তার আলোকে আলোকিত করে তুলব এবং আমার কর্মপথ অনুসরণ করবার জন্তু অনুপ্রাণিত করব।’

এরকম সঙ্কল্প যদি তোমরা গ্রহণ করো তাহলে কয়েক বৎসরের ব্যবধানে তোমাদের দেশের অবস্থা কি দাঁড়াবে তা তোমরা চিন্তা করে দেখো। এ অকৃত্রিম মানবতা ও স্বদেশপ্রেমের পথে অগ্রসর হবার জন্তে কারো ওপর জোর করা চলবে না—দেশের সত্যিকারের উপকার করতে হলে সকলকে স্বেচ্ছাবৃত্ত সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র স্বীয় কর্তব্যের ওপর স্বগভীর অহুসার এবং অকুণ্ঠ বিশ্বাসের প্রভাবেই সকলকে স্বদেশসেবায় অবতীর্ণ হতে হবে। আমি দেখতে চাই প্রত্যেক ভারতবাসী নিজের দায়িত্ব শক্তি এবং কর্তব্য সঙ্ক্ষে সচেতন হয়ে উঠুক, তাদের নিপীড়িত স্বদেশবাসীর ওপর অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন হোক, নিজেদের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করুক। দেশের অবস্থার সংস্কার এবং সংশোধনের এ হল বাস্তব পথ। আমার স্বদেশ ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে কৌতূহল ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠছে তা আর বর্ধিত হবে এ পথ অনুসরণ করবার ফলে।

যে সমস্ত সং ব্যক্তি ভারতের উজ্জীবনের জন্তু এ-ভাবে সাহায্য করবেন ভগবান তাঁদের সাহায্য করুন, মধ্যদিনের গঙ্গাবক্ষে উজ্জল সূর্যরশ্মি পতিত হয়ে

॥ বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥

ভারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরোগ্য নিকেতন ॥ মহাশ্বেতা ॥ চৈতালি ঘূর্ণি

৭ম মুঃ ৭'৫০ ॥

৩য় মুঃ ৫'৫০ ॥

১০ম মুঃ ২'৫০ ॥

মনোজ বসুর

মানুষ গড়ার কারিগর ॥

নবীন যাত্রা

৩য় মুঃ ৫'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৪'০০ ॥

বনফুলের

সে ও আমি ॥

দ্বৈরথ ॥

স্বপ্নসম্ভব

৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৩'০০ ॥

৩য় মুঃ ৩'০০ ॥

সতীনাথ ভাট্টাচার্য

অপরিচিতা ॥ পত্রলেখার বাবা ॥ গণনায়ক

২য় মুঃ ৩'০০ ॥

চার টাকা ॥

২য় মুঃ ২'৫০ ॥

সমরেশ বসুর

বি. টি. রোডের ধারে ॥ গঙ্গা ॥ বাঘিনী

৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥

৫ম মুঃ ৫'৫০ ॥

২য় মুঃ ৭'০০ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুতুলনাচের ইতিকথা ॥ প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান

৮ম মুঃ ৫'৫০ ॥

২য় মুঃ ২'০০ ॥

সৈয়দ মুজ্জতাবা আলীর

চতুরঙ্গ

॥ অবিশ্বাস ॥

ময়ূরকণ্ঠী

৩য় মুঃ ৪'৫০ ॥

৯ম মুঃ ৩'০০ ॥

১৪শ মুঃ ৪'০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

সূর্যসারথি ॥

একতলা

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

৩য় মুঃ ২'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

যে ভাবে ঝিকমিক করে ভারতের আকাশে তার চাইতেও উজ্জ্বল জ্ঞানের সূর্য উদ্ভিত হোক, ভারতের অন্তরাঙ্গকে সে উজ্জ্বল জ্ঞানের রশ্মি আলোকিত করে তুলুক, আর চালিত করুক তাদের সুখ ও মৃত্যুর পথে। সঙ্গে সঙ্গে আমি এ কামনাও করি সরকারও সকলের ওপর সহানুভূতিশীল হোক, সকলকে রক্ষা করুক, সকলের ওপর শান্তির আশীর্বাণী ছড়িয়ে দিক। সরকার যদি এ পথে অগ্রসর হয় তাহলে তাদের শাসনভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রজাদের মানুস্যাগ রাজানুগত্য এবং সন্তোষপূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল জনসাধারণের সন্তুষ্টি প্রীতির ওপর।

নবভারতের প্রতিনিধি নব্যবঙ্গের প্রতি জর্জ টম্পসনের শেষোক্ত উপদেশের ভেতর একটি সত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে : ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের বিরোধী তিনি ছিলেন না। কিন্তু উচ্চতর জ্ঞান ও শক্তিসামর্থ্য নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতের অনগ্রসর প্রজাপুঞ্জের ওপর স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর শাসন চালাক—এও তাঁর কাম্য ছিলো না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবঙ্গকে তাই তিনি আহ্বান করলেন ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের বাণীকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবার জন্তে এবং তাঁদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবীকে নির্ভয়ে শাসক-জাতির সামনে উপস্থিত করবার জন্তে। তৎকালীন ভারত-সরকারের হায়-বোধের ওপর তাঁর আস্থা না থাকলেও সমসাময়িক ইংলণ্ডের উদারনৈতিক রাজনীতিবিদদের সহায়তায় তিনি ভারতের প্রতি শাসন-সংক্রান্ত অবিচার দূর করতে পারবেন—এ ভরসা তাঁর মনে প্রবল ছিল। তাঁর এ প্রচেষ্টায় নব্যবঙ্গের সমবেত সহযোগিতা তাই তিনি কামনা করেছিলেন। দেখা যাক, নব্যবঙ্গ তাঁর এ উদ্যম আহ্বানে কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন।

নব্যবঙ্গের মুখপত্র ‘বেঙ্গল স্পেকটেক্টরে’র সংবাদ-বিভাগ থেকে জানা যায় ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতি ছিলেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল। এ সভায় জর্জ টম্পসন যে প্রাথমিক ভাষণ দেন তার থেকে জানা যায় সভায় উপস্থিত দুশোর বেশী ব্যক্তি তাঁর রাজনৈতিক মতামত শোনাবার জন্য এবং দেশের কল্যাণমূলক আলাপ-আলোচনায় যোগ দেবার অভিপ্রায়ে মানিকতলার বাগানে সমবেত হন। এ ছাড়া এ সভার উদ্বোধনরাও ছিলেন কলকাতার একশ্রেণীর নাগরিক।

‘স্পেকটেক্টরে’র সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে জানা যায় জর্জ টম্পসনের মূল্যবান উক্তিগুলো যাতে পরবর্তীকালে হারিয়ে না যায় সেজন্য সম্পাদকেরা পত্রিকায় ছাপিয়ে তাদের স্থায়িত্ব দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধুমাত্র উদ্ভেজনা

প্রকাশ না করে গঠনমূলক কাজের প্রতি নব্যবঙ্গের এ অলুরাগ লক্ষ্য করবার মত। এ ছাড়া দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির জন্ত নব্যবঙ্গ জর্জ টম্পসনের অলুপ্রেরণায় আর একটি বিষয়ে সক্রিয়তার পরিচয় দেন। তাঁরা পরবর্তী সংখ্যা থেকে 'স্পেকটেক্টর'কে পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে পরিবর্তিত করেন। পত্রিকাটি যাতে জনপ্রিয় হয় সেজন্ত তাঁরা অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশের জন্ত কোনও মূল্যবৃদ্ধিও করেন নি।

এ সভার বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে 'স্পেকটেক্টরে'র সম্পাদকীয় বিবরণীতে। সে বিবরণী থেকে জানা যায় জর্জ টম্পসনের বক্তৃতার পর বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিচার-বিভাগের দোষত্রুটি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে ওকালতি করবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করবার জন্তও তিনি উক্ত প্রবন্ধে প্রস্তাব করেন।

বাবু শ্রামাচরণ বসুও একটি প্রবন্ধে শ্রোতৃবৃন্দকে দেশের কল্যাণের জন্ত বর্তমান প্রয়াস অব্যাহত রাখবার আবেদন জানান। ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের কথাকে আরো সবিস্তারে আলোচনার জন্ত তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব করেন।

তারপর বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সভাকে জানান যে প্রস্তাবিত সমিতির অলুষ্ঠান-পত্র যখন তৈরীর পথে তখন উপরোক্ত দুজন বক্তার প্রস্তাব আগামী সভা পর্যন্ত স্থগিত থাক।

বাবু গণেন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতের কল্যাণমূলক কাজে সভ্যদের বর্তমান উত্তম অক্ষুর রাখার জন্ত তাঁদের নিকট আবেদন জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জমিদারী প্রথা এবং ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনের কতকগুলো ত্রুটির দিকে সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অতঃপর বাবু গিরিশচন্দ্র দেব একটি প্রবন্ধে দেশসেবার মহত্তম কাজে শিক্ষিত দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্বীপনা যাতে স্তিমিত না হয় সেজন্ত আবেদন জানান।

ভারতবর্ষে পদদলিত ন্যায়নীতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রেসের ভূতপূর্ব এবং বর্তমান কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকেরা আন্দোলন করেছেন বলে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্তমান সভা এবং দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে কিছু মন্তব্যও করেন।

জর্জ টম্পসনের সমর্থনে এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সভার কার্য স্থগিত হয়।

সভার উক্ত বিবরণী থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নব্যবঙ্গ একদিকে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকারহীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে প্রকাশ্য সভায় নির্ভয়ে তা আলোচনা করেছেন, আর একদিকে তাঁদের রাজনৈতিক অধিকারকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি সংহত সংস্থা গঠনের জন্য সক্রিয় হয়েছেন। দেশের সে রাজনীতি-চেতনা-শূন্যতার যুগে নব্যবঙ্গের এ পদক্ষেপ কম প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়।

॥ তিন ॥

তৃতীয় সভা ॥ ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৩

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে নব্যবঙ্গের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সভায় জর্জ টম্পসন মুখ্যতঃ আলোচনা করেন দেশের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে। জর্জ টম্পসনের মতে সমসাময়িক ভারতবাসীর অনগ্রসরতা এবং রাজনৈতিক চেতনাহীনতার প্রধান কারণ আধুনিক শিক্ষার অভাব। নব্যবঙ্গকে উদ্দেশ্য করে জর্জ টম্পসন বলেন : বন্ধুগণ, যৌবনের স্বাভাবিক প্রলোভনের ওপর জয়ী হতে হলে, ভারতবাসী হিসেবে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তোমাদের বাস করতে হয় তার উর্ধ্বে উঠতে হলে তোমাদের সামনে একটা স্থিরলক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। তোমাদের মনকে সে স্থিরলক্ষ্যাভিমুখী করতে পারে একমাত্র শিক্ষা।... ভবিষ্যতের বিচক্ষণ লোক সৃষ্টির জন্য তোমাদের শিক্ষার ভার নিতে হবে বর্তমানের যুবকদের।

কিন্তু ভারতবর্ষে বর্তমান শিক্ষার অবস্থা কী? ভারতবর্ষের বিবরণী লেখকেরা সকলেই বিদেশী, ভারতবর্ষের শাসনকর্তা বিদেশী, উপদেষ্টা বিদেশী, সমালোচকেরা বিদেশী,—এমন কি দুঃখের সঙ্গে আমাকে একথাও স্বীকার করতে হয় যে স্বীয় অবস্থার উন্নতি বিষয়ে ওকালতি করবার জন্যও ভারতবর্ষকে বিদেশীর সহায়তা নিতে হয়। ভারতের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য টাউন-হলে যদি এদেশবাসীর একটি সভা আহ্বান করা যায় তার বক্তারাও হবেন বিদেশী। ভারতের স্বপক্ষে ইংলণ্ডে বলবার জন্য যদি একজন প্রতিনিধি নিয়োগের প্রশ্ন ওঠে—সে প্রতিনিধিও হবেন একজন বিদেশী।

এ রকম হওয়া কী বাঞ্ছনীয়? তোমরা নিশ্চয়ই বলবে—না। এ অবস্থা কী অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে থাকবে? তোমরা জোরের সঙ্গে নিশ্চয়ই

বলবে—না। কিন্তু এ অবস্থার অবসান ঘটবে কখন? তা সম্ভব হবে তখনি যখন ইংরেজী শিক্ষায় এবং বিজ্ঞানে শিক্ষিত এ দেশের প্রগতিশীল যুবকেরা অপরিণীত দৈর্ঘ্য ও পরিশ্রমের সাহায্যে দেশের বাস্তব সমস্যা-সম্পর্কিত বড় বড় সমস্যাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবেন, সে অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করবেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

অতঃপর জর্জ টম্পসন সংক্ষেপে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা করে নব্যবঙ্গকে বললেন : ষাঁরা তোমাদের জন্ম এ মহানগরীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁদের আঁকাজ্ঞা তোমরা পূর্ণ করেছ। এখন তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ নবলব্ধ শিক্ষার সাহায্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তোমরা পরিচয় লাভ করতে শেখ। সমাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তোমরা জ্ঞানলাভ করো, তোমাদের ওপর অগ্রায় অবিচার অল্পুষ্ঠিত হচ্ছে বলে তোমরা যে দুঃখিত তার নৈতিক ও তাত্ত্বিক কারণ অল্পুসন্ধান করো; দেশের আইন ও শাসনরীতির সঙ্গে পরিচিত হও; স্বদেশবাসীর জীবনরীতি, ভাবানুভূতি ও জীবিকার উপায় কি নির্ণয় করো; ভারতের বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন মৃত্তিকা আবহাওয়া ও উৎপন্ন দ্রব্য কি তার হিসেব নাও; যে কারণে ভারতের কৃষিকার্যের প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে তা নিরূপণ করো; করদ্বারের পদ্ধতি, যে একচেটিয়া উপায়ে রাজস্ব আদায় হয় তার স্বরূপ; বিচার-প্রয়োগের রীতিনীতি; পুলিশী ব্যবস্থা; কারাবিভাগের অবস্থা; দেশে দলবদ্ধ ডাকাতি; অজ্ঞতার সীমা; যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে দেশের অধিকাংশ অংশ বিধ্বস্ত হয় তার কারণ; এ দেশে ইক্ষুর চাষে আত্মনিয়োগ না করে মরিশাস দ্বীপে এ দেশীয় লোকের প্রলুব্ধ হওয়ার কারণ; যে সমস্ত ব্যক্তি কিছুকাল আগে পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিবেকহীন দাসপ্রথার সমর্থক ছিল তাদের বর্তমান সদবিবেচনা ও সহৃদয় শাসনের কাছে কেনই বা এ দেশীয় লোকেরা আত্মবিক্রয় করে—তারও কারণ নির্ণয় করবার জন্ম তোমরা চেষ্টা করো।...বিলেতে আমাদের সরকারের শাসনযন্ত্র কেমন তা আমি তোমাদের বলবো এবং আমি তোমাদের দেখাবার চেষ্টা করবো কি করে অবিলম্বে তোমরা নিজেদের এবং আমাদের কর্মপ্রয়াসে সাহায্য করে মইং স্বদেশপ্রেমের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারো।

.. দরিদ্র ও অসহায়ের ওপর অগ্রায় অল্পুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা সব সময় অভিযোগ করি, কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং অভাবগ্রস্তের ওপর আমরা যেন সক্রিয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অকৃত্রিম সহানুভূতি দেখাই। বিদেশীর দোষত্রুটি দেখাতে আমরা মুখর হই, কিন্তু সে সঙ্গে স্বদেশবাসীর দোষ দুর্বলতা ও অসদাচরণের

নিন্দা করতে আমরা যেন পশ্চাদ্দপদ না হই। আমাদের লেখায় বা বক্তব্যে সম্পূর্ণ সত্যপ্রকাশের দিকেই যেন আমাদের লক্ষ্য থাকে। শুধুমাত্র সংশোধন নয়, রোগের কারণ কি সেদিকেও যেন আমাদের অনুসন্ধান কার্য নিযুক্ত হয়।

স্বদেশপ্রেমিকের মহৎ গৌরব অর্জন করবার জন্ত কথা নয়—কাজই হোক তোমাদের অভিষ্ট...তোমাদের সভাসমিতি অনুষ্ঠানের জন্ত একটি স্থায়ী গৃহ পাবে বলেই আমি ভরসা করি। যতদিন পর্যন্ত না এরকম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় ততদিন তোমাদের আরন্ধ কার্যধারা তোমরা চালিয়ে যাও। এ সমস্ত সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ছাড়াও তোমাদের স্বদেশহিতৈষীদের মধ্যে মর্বাদার আসন লাভ করবার জন্ত তোমরা অক্লান্তভাবে কাজ করে যাও।...

নব্যবঙ্গের মুখপাত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেক্টরে'র সংবাদ-বিভাগে দেখা যায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন বাবু চন্দ্রশেখর দেব। বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করবার পর জর্জ টম্পসন বক্তৃতা দেন।

জর্জ টম্পসনের বক্তৃতার পর কিশোরীচাঁদ মিত্র সভাকে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে এবং যে কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলেও নিরুৎসাহ না হতে অনুরোধ করেন।

প্রস্তাবিত সমিতির উদ্দেশ্য সমর্থন করে বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

যে পদ্ধতিতে জমিদারী পরিচালিত হয় তার কুফলগুলো উল্লেখ করে বাবু গণেন্দ্রমোহন ঠাকুর একটি প্রবন্ধ পড়েন।

এর পর বক্তৃতা দেন বাবু অভয়চরণ বসু। দেশবাসীর অভাব-অভিযোগকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা এবং একটি বলিষ্ঠ ও আপসহীন কর্মপন্থা গ্রহণ করবার জন্ত তিনি সকলের নিকট আবেদন জানান।

একটি উত্তেজিত ভাষণে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতবাসীর প্রতি বিদেশীর রুঢ় ব্যবহার এবং কটুক্তির বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। ইংরেজের পক্ষে এ রকম ব্যবহার অত্যাচার এবং ঐতিহ্য-বিরোধী বলে তিনি অভিহিত করেন। কোম্পানীর সনদের ৮৫ ধারা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে কারো পক্ষে একরূপ আচরণ আইন-বিরোধীও বটে। প্রসঙ্গক্রমে যে উদার নীতির ভিত্তিতে কোম্পানীর সনদ রচিত হয়েছিল তিনি তার প্রশংসা করেন।

সভার নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্ত প্রস্তাব করা হয় :

(ক) পুলিশী শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রস্তাব আনেন মিঃ স্পীড,

(খ) জমির চাষীদের সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রস্তাব আনেন মিঃ জর্জ টম্পসন।

সভার কার্য স্থগিত হয় রাত্রি এগারোটার সময়।

জর্জ টম্পসনের উৎসাহ পেয়ে নব্যবঙ্গ ভারতবাসীর গ্রাম্য অধিকার সম্পর্কে মতপ্রকাশে কিরকম সাহসী হয়ে উঠেছিলেন এ সভার কয়েকজন বক্তার ভাষণ থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিশোরীচাঁদ মিত্র যে প্রতিকূল অবস্থার ইঙ্গিত করেছেন তা স্বাধীন মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে সরকারী বিরোধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। গণেন্দ্রমোহন ঠাকুর সরকার-সমর্থিত স্বৈরাচারী জমিদারী প্রথার সমালোচনা করেন। অভয়চরণ বসুর বক্তব্যের ভেতর নবযুগের স্বদেশী মনোভাবের দূরাগত ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। দক্ষিণারঞ্জনের বিশ্লেষণী মনোভাবের মধ্যে নব্যবঙ্গের তীক্ষ্ণ আত্মমর্ষাদাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে দেশের উল্লেখযোগ্য বৃহত্তর সমস্তার প্রতি নব্যবঙ্গকে সচেতন করার চেষ্টা করলেন দুজন বিদেশী, নব্যবঙ্গের মন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্তার দিকে তখনও আকৃষ্ট হয়নি। জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গের রাজনীতি-সচেতন মনকে দেশের জটিল ভূমি-সমস্তার দিকে আকর্ষণ করলেন।

॥ চার ॥

চতুর্থ সভা ॥ ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৩

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে নব্যবঙ্গের উদ্যোগে যে চতুর্থ সভা অহুষ্ঠিত হয় সে সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে জর্জ টম্পসন সমকালীন শাসন-সংক্রান্ত বাস্তব পরিস্থিতির দিকে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে অবহিত হতে বলেন। পুলিশী জুলুম ও বিচারের নামে গ্রহসনের ফলে ভারতবাসী তখন যে অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল জর্জ টম্পসন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে তা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। বাংলা দেশের মফঃস্বল অঞ্চলে অসহায় প্রজাদের ওপর তখন পুলিশের অত্যাচার এবং বিচার-গ্রহসন পূর্ণোন্মমে চলছিল। এ পুলিশী জুলুমের রিপোর্ট পেয়ে তার স্বরূপ নির্ণয় করবার জন্য সরকার ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করেন। সে বৎসর টাউনহলে অহুষ্ঠিত একটি সভায় উক্ত কমিটি ক'জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির কন্ঠ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। জর্জ টম্পসন সর্বপ্রথমে বিশিষ্ট বাঙালী নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাক্ষ্য উদ্ধার করেন :

‘মফঃস্বল আদালতে মামলা পরিচালনার জন্তু আমাকে অনেক সময় ব্যাপৃত থাকতে হয়।...সেজন্তু সে সমস্ত আদালতে মামলা পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। একটি মামলা পরিচালনার খরচ বাবদ সরকারকে যা দিতে হয় তার চাইতে কুড়ি গুণের বেশী উৎকোচ দিতে হয় আদালতের আমলাদের।’

কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেটের যোগ্যতা সম্পর্কে দ্বারকানাথ কমিটির সম্মুখে বলেন :

‘মফঃস্বল আদালতের প্রথম ও প্রধান বিচারক হল আমলারা। অনভিজ্ঞ বিচারকদের তারা নিজের খুশীমত পরিচালনা করে। মফঃস্বল আদালতে যে ডিক্রী দেওয়া হয় তা আদায় করবার জন্তু কোনরকম আইন নেই বললেই চলে। কালেক্টর হয়ত জজের ভাই। তাঁর ওপরেই অর্থ আদায় করবার ভার স্তম্ভ থাকে। ভূমি-পুনর্গ্রহণ নীতি অলুঘায়ী যে সমস্ত মামলা হয় (resumption cases) তার রাজস্ব আদায়ের জরুরী কাজে তাঁরা এত ব্যস্ত থাকেন যে ডিক্রীদারকে ডিক্রীর অর্থ দেবার তার কোন সময়ই থাকে না। ফলে দরখাস্তের পর দরখাস্ত করেও কালেক্টরের ড্রেজারী থেকে ডিক্রীদারেরা সারাজীবনই কোন অর্থই পান না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অতঃপর জর্জ টম্পসন ডব্লু. পি. গ্রাণ্টের মতামত উদ্ধার করেন :

‘একথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কোম্পানীর রাজস্ব চলবার একমাত্র কারণ হল এ রাজস্ব ভূতপূর্ব মোগল শাসন থেকে ভাল। মোগল শাসন-ব্যবস্থাকে বাদ দিলে কোম্পানীর শাসনের মত এত অপদার্থ শাসন-ব্যবস্থা আমি আর কোথাও দেখিনি।’

মফঃস্বল আদালতের বিচার-বিভাগীয় অব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ স্পীডও সাক্ষ্য দেন এভাবে :

‘একটি মামলার জন্তু খরচ হয় যদি এক হাজার, উৎকোচ বাবদ খরচ হয় ছয় হাজার। মফঃস্বলে ছায় বিচারের স্বরূপ হল এই।’

পুলিশী জুলুম সম্পর্কে দ্বারকানাথ কমিটির সামনে বলেন :

‘দারোগা থেকে পিওন পর্যন্ত সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। ঘুষ না দিলে তাদের কাছ থেকে কোনরকম কাজ পাবার আশা নেই। ফলে অর্থশালীদের আসে পৌষমাস দরিদ্রদের সর্বনাশ।’

অতঃপর জর্জ টম্পসন উইলিয়ম এভামের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন। উচ্চনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং দেশবাসীর সঙ্গে অবাধ মেলামেশার জন্তু তিনি

ছিলেন সকল বাঙালীরই প্রিয়। তিনি তাঁর শাক্ষ্য সমসাময়িক মফঃস্বল দারোগা ও চৌকিদারদের দুর্নীতিমূলক আচরণের ভয়াবহ বর্ণনা দেন।

বিবেকহীন পুলিশী শাসনের নির্মমতার বিরুদ্ধে জর্জ টম্পসন তারপর উদ্ধার করেন ডক্টর স্পাই-র তীক্ষ্ণ সমালোচনা :

“ইংরেজ যদি ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয় তাহলে তারা পশ্চাতে এমন কোন স্থিতি রেখে যেতে পারবে না যা একটি মহান ও উন্নত জাতির উপযুক্ত” —বার্কের এ তীব্র ভৎসনা এখনও সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।”

পুলিশী জুলুম ও বিচার-বিভাগীয় প্রহসনের এ বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত করে জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে বললেন :

‘উন্নততর পুলিশ-শাসন-পদ্ধতি এবং বিচারের ব্যবস্থা না হলে দেশের উন্নতির জন্ত মূলধন বিনিয়োগে কেউ উৎসাহী হবে না, যুরোপীয়েরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করতে চাইবে না, নানারকম স্থযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রায়তেরা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্ত সচেষ্ট হবে না।’

মফঃস্বল অঞ্চলের অসহায় দেশবাসীর অবর্ণনীয় দুর্দশার দিকে লক্ষ্য রেখে জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে উদ্দেশ্য করে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন :

My heart bleeds for the millions of my fellow subjects, who, prevented by the power of sword from asserting their rights, are from year to year compelled to live under a system which converts into plunders the very men who should be their protectors, and makes them regard with horror, as the worst of all foes, those who should be ministers of justice. I regard as wholly without excuse the Government of this country, who having bound the population hand and foot, have left them knowingly and wilfully a prey to merciless oppressors.’

এ অত্যাচারী সরকারের প্রভুত্বপ্রিয় ও স্বার্থান্বেষী-রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে জর্জ টম্পসন বলেন :

‘জাতীয় পুলিশী শাসন-পদ্ধতির লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির কথা জানাজানি হবার পরও এ সরকারই ভারতে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্ত প্রতি বৎসর সৈন্যখাতে ব্যয় করেন নয় লক্ষ স্টার্লিং। এক কোটি স্টার্লিং তাঁরা ইতিমধ্যেই ব্যয় করেছেন অপ্রয়োজনীয় অহেতুক এবং অর্থহীন যুদ্ধের জন্ত। কিন্তু এ পর্যন্ত চার কোটি প্রজার প্রতি যে অন্ডায় অস্থিতি হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া তাঁরা

প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। দেশের প্রত্যেকটি কুটির থেকে সরকারের উদ্দেশ্যে এ আর্ত বাণী উথিত হয়েছে : ‘শত্রুদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো, নির্দয় পুলিশের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও, বিচারের নামে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ করো না, যান্ত্রিক দস্যবৃত্তির ঘণিত স্বৈরাচার থেকে আমাদের উদ্ধার করো...’

‘শক্তিদম্বস্পর্ষিত শাসকের কানে প্রজাদের এ আর্তকণ্ঠ প্রবেশ করেনি। কিন্তু ভগবানের দরবারে তাদের এ ব্যাকুল আবেদন ব্যর্থ হবে না। দৃঢ়ভাবে আমি বিশ্বাস করি যারা একরূপ অত্যাচারে এদেশ শাসন করছে একদিন তাদের জবাবদিহি করতে হবে।’

‘কিন্তু আমার আর একটি জিজ্ঞাসা আছে—এ দেশবাসীরাও কি তাদের কর্তব্য সম্পাদন করছে?...তারা কি সভা-সমিতি করে সরকারের দরবারে তাদের অভিযোগ জানিয়েছে?...যদি তোমরা এ না করে থাক তা হলে সরকারকে শুধু দোষ দিলে চলবে না। দারোগা বা জমিদারই শুধু অপরাধী নয়—তোমরাও সমান দোষে দোষী। গ্রামের বিকৃতি তোমরা দেখেছ কিন্তু প্রতিবাদ করনি। প্রতিকারের শক্তি তোমাদের ছিল কিন্তু ব্যবহার করনি। অসংখ্য যুক্তি তোমাদের স্বপক্ষে ছিল, তোমরা তা প্রয়োগ করনি।...’

উদাত্ত কণ্ঠে জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে আহ্বান করে বললেন : ‘ঐদাসীন্দ্ৰ ও আত্মকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করে গ্রাম ও যুক্তির ভিত্তিতে তোমরা দণ্ডায়মান হও, দেশের প্রতি তোমরা কর্তব্য করো। নিপীড়িতদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও, তাদের স্বপক্ষে তোমরা প্রতিনিধি প্রেরণ করো। গ্রামের দুয়ারে তোমরা আঘাত করো—দৃঢ়ভাবে বারবার আঘাত করো। যদি এ দেশী সরকার তোমাদের আঘাতে সচেতন না হয় তাহলে সমুদ্র-পারে তোমাদের অভিযোগ প্রেরণ করো, তোমাদের প্রয়াসে ইংলণ্ডবাসী যাতে জাগ্রত হয় সে চেষ্টা করো। তোমাদের সকল উত্তমকে নিয়োগ করবার পক্ষে এর চাইতে ভাল কাজ আর কিছু হতে পারে না। তোমাদের কর্মতৎপরতা, তোমাদের ঐকান্তিক ও অধ্যবসায়ী প্রয়াসের দ্বারা তোমরা নিজেদের ও সরকারের কলঙ্ককালিমা মুছে দাও—বিকৃতি ও পাপের রাজত্বের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হোক গ্রাম শৃঙ্খলা ও আইনের রাজত্ব।’

এ ভাবে তথ্যপ্রমাণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে সমকালীন ভারতশাসনের ক্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে স্বাধিকার-বোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাইলেন। সরকারের স্বৈরাচারী শাসনকে বাধা

দিতে বললেন তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্যে। গ্রায নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারলাভের অঙ্গ হিসেবে সমবেত আন্দোলনের ফল কতখানি সকল পরাধীন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। মানবতার পূজারী জর্জ টম্পসন নব্যবঙ্গকে আহ্বান করলেন নিপীড়িত জনসাধারণের দুঃখ দূর করবার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের গতিরেখা অনুসরণ করবার জন্তে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চের 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' থেকে জানা যায় জর্জ টম্পসনের সহায়তায় এ পাক্ষিক পত্রিকাখানি দ্বৈভাষিকরূপে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়েছে। উদ্দেশ্য, নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চার খবরাখবর সুলভমূল্যে যথাসম্ভব শীঘ্র জনসাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। পত্রিকার প্রকাশসংখ্যা বাড়ানো হলেও গ্রাহকদের ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে পূর্বের মত মূল্য রাখা হয়েছে মাসিক এক টাকা ও বার্ষিক দশ টাকা।

বতমানের প্রয়োজন

বেঙ্গী কাজ

বেঙ্গী সংগঠন

বেঙ্গী উৎপাদন

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখের 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'র সংবাদ-বিভাগে উক্ত সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়। সে বিবরণীতে লেখা হয় : জর্জ টম্পসন প্রথমে পুলিশী শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন, দ্বিতীয়তঃ, যে পদ্ধতিতে সে শাসন প্রয়োগ করা হয় তার প্রক্রিয়া ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বিচার করেন। তাঁর মন্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল গাঙ্গেয় প্রদেশগুলি সম্পর্কে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সরকারী কাগজপত্রের ওপর ভিত্তি করেই তিনি উক্ত বিষয়ে মন্তব্য করেন। তদানীন্তন শাসনের দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী রূপকে ফুটিয়ে তোলবার জন্ত সে দলিলপত্র থেকে তিনি বহু অংশ পাঠ করেন এবং সমকালীন গভর্নর জেনারেলের সংস্কার-পত্রিকল্পনার আপাত অভিপ্রায়ের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্ত তিনি নব্যবঙ্গকে অনুরোধ করেন।

জর্জ টম্পসনের কলিকাতা আগমনের পর থেকেই নব্যবঙ্গ তাঁদের এ সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা সংহত রূপ দেবার জন্ত সচেষ্ট

ছিলেন। সে বাঞ্ছিত সুযোগ এল যখন তাঁরা রীতিমত রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠানের জন্ত ৩১নং ফোজদারী বালাখানার দ্বিতলে একটি প্রশস্ত ঘর পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে জর্জ টম্পসনের চতুর্থ বক্তৃতার পর তাঁরা প্রস্তাব করলেন : (ক) অতঃপর ৩১নং ফোজদারী বালাখানার দ্বিতলে রাজনৈতিক সভাগুলো অনুষ্ঠিত হোক (খ) সভার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়, প্রতি সপ্তাহে সভা অনুষ্ঠান এবং জর্জ টম্পসনের বক্তৃতাগুলো পুস্তকাকারে ছাপবার জন্ত স্বচ্ছামূলক দানগ্রহণ এবং মাসিক চাঁদা তোলা হোক। এ ছাড়া সভায় স্থির হয় জর্জ টম্পসনের বক্তৃতাগুলো বিশপ্‌স কলেজ প্রেস থেকে মুদ্রিত হবে।

জর্জ টম্পসনকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে নব্যবঙ্গের রাজনীতি-চর্চার যে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল তা এখানেই শেষ হল। তারপর ফোজদারী বালাখানার দ্বিতলে সুপরিকল্পিত ভাবে শুরু হল তাঁদের রাজনীতি-চর্চার তৃতীয় পর্যায়।*

* জর্জ টম্পসনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত তাঁর বক্তৃতাগুলি থেকে। সর্ভাঙ্গুর বিবরণ, নব্যবঙ্গের মনোভাব ও অন্ত্যন্ত আনুশঙ্গিক তথ্য ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ‘বেঙ্গল স্পেকটেক্টর’ থেকে গৃহীত। ভাষান্তর লেখকের।—

॥ বেঙ্গলের বরণীয় সাহিত্য সম্ভার ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

রাশিয়ার ডায়েরী

কমিউনিষ্ট জগৎ ও জীবনের নির্মম হার্দ্য
বিচিত্র রূপায়ণের বিরাট আলোচ্য।

প্রথম খণ্ড : ১৪.০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : ১২.০০ ॥ তৃতীয় খণ্ড একত্রে : ২৫.০০ ॥

দেবতাত্ত্বা হিমালয়

১ম খণ্ড (১০০ পৃঃ) ২.০০ ॥
২য় খণ্ড (৬৪ পৃঃ) ১.০০ ॥

স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

প্রদক্ষিণ ২য় পৃঃ ৪.০০ ॥ দিকশূল (৩য় পৃঃ) ৪.৫০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

নবেন্দু ঘোষের

মহাকাশ (২য় পৃঃ) ৩.৫০ ॥ ডাকু দিয়ে বাই (৬ষ্ঠ পৃঃ) ৩.০০ ॥

নারায়ণ সান্যালের

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

অনামী চার টাকা ॥ মার্কসবাদ ৩.০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের

দিলীপ মালাকারের

যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪.০০ ॥ মেপোলিনিসনের দেশে ২.০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

অশীতিপর মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট গত ২৯ জাছুঅরি, ১৯৬৩ বস্টনে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর জন্ম হয় ২৬ মার্চ ১৮৭৫।

চারপার পুলিটজার-পুরস্কার-প্রাপ্ত রবার্ট ফ্রস্ট পাশ্চাত্য জগতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮। ছায়া হাশ্মশায়ারের প্রাক্তন চাষী ও শিক্ষক রবার্ট লী ফ্রস্টের জীবনে খ্যাতি এসেছিল অনেক দেরীতে। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে খ্যাতির শীর্ষে উপনীত হয়েছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডী কার্যভার গ্রহণমুহূর্তে এই বৃদ্ধ কবিকে একটি কবিতা পাঠের জগ্ন আহ্বান করেছিলেন। লংফেলোর পর আর কোনো মার্কিন কবি তাঁর মত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি।

ফ্রস্ট জনতার কবি, জনতা-সম্ভাষণে তিনি যে আনন্দ পান তা আর কিছুতেই নয়। ধর্মভীরু এই কবি জীবনের মহৎ মূল্যবোধকে সমস্ত জীবন অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এক গৃহহারী মৃত্যুপত্রযাত্রী চাষীর কণ্ঠে—

Nothing to look forward with hope,

Nothing to look back upon with pride.

এই শাস্ত সমাহিত স্বর ফ্রস্টের কবিতায় বেজে উঠেছে। চাষীর ছেলে ফ্রস্ট গিয়েছিলেন সাগর-পারে—ইংল্যাণ্ডে। এখানেই তাঁর কবিতা প্রথম স্বীকৃতি পায়। ১৯১৩ সালে বেরোয় ‘এ বয়েজ উইল’, ১৯১৪তে ‘নর্থ অফ বস্টন’। জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর তাঁর কোনো খ্যাতি হয় নি। তারপর তিনি মার্কিন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরস্কার পুলিটজার পুরস্কার লাভ করেন। মোট চারবার পেয়েছিলেন।

ফ্রস্টের ৮৮তম জন্মদিনে (মার্চ ২৬, ১৯৬২) প্রেসিডেন্ট কেনেডী তাঁকে এক বিশেষ পদক উপহার দিলেন। মার্কিন কংগ্রেস ফ্রস্টের সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিতে ভোটে এই পদক স্বপারিশ করেন। জীবনের শেষ বছরে তিনি রাশিয়া ভ্রমণে যান। ১৯১৫ সালে ফ্রস্ট ইংল্যাণ্ড থেকে মার্কিন দেশে ফিরে

আমেন। তখন “হ্যু পোয়েট্রি”-আন্দোলনকারী, সমালোচক, সম্পাদক এই কবিকে নোতুন করে চিনলেন।

ফ্রন্টকে ‘প্যাস্টোরাল’ এবং ‘রিজিওনাল’ কবি বলা হয়েছে। তিনি যতটা ‘লিরিক্যাল’ ততটাই ‘ড্রামাটিক’। তাঁর কবিতায় আছে মাটির ভ্রাণ, গ্রামের স্পর্শ, সাধারণ চাষীর বেদনা ও আনন্দ। তাঁর অগ্নাত কবিতা-গ্রন্থ :— ‘মাউন্টেন ইন্টারভাল’ ১৯১৬; ‘হ্যু হ্যাম্পশায়ার’ ১৯২৩; ‘ওয়েস্ট-রানিং ব্রক’ ১৯২৮; ‘কালেক্টেড পোয়েম্‌স্’ ১৯৩০, ১৯৩২; ‘এ ফাঁদার রেঞ্জ’ ১৯৩৬; ‘এ উইটনেস ট্রি’ ১৯৪২; ‘এ মাস্ক অফ্‌ রীজন’ ১৯৪৫; ‘এ স্টিপল বুশ’ ১৯৪৭; ‘এ মাস্ক অফ্‌ মার্সি’ ১৯৪৭; ‘কমপ্লীট পোয়েম্‌স্’ ১৯৪২।

ফ্রন্ট প্রায়ই জীবন সম্পর্কে নৈরাশ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন ‘We are all doomed to broken-off careers.’ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিফলকে একথাই লিখতে চেয়েছিলেন—

‘I had a lover’s quarrel with the world.’

*

*

*

‘সাহিত্যের খবর’-এর পাঠকদের অজানা নেই যে, স্ট্যানলি উল্‌পার্ট-রচিত উপন্যাস অবলম্বনে মার্কিন চিত্র-প্রযোজক-পরিচালক মার্ক রবসন “রামনামে নয় ঘণ্টা” [নাইন আওয়ার্স টু রাম] নামে একটি ছবি তুলছেন। সে ছবি শেষ হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারির শেষে লণ্ডনে তা প্রকাশে প্রদর্শিত হয়েছে। ভারত সরকার, এই চিত্রের প্রদর্শনী ভারতে নিষিদ্ধ করেছেন। গান্ধীজীর জীবনের শেষ ‘ক’টি ঘণ্টা ও নাথুরাম গড্‌সে-কর্তৃক গান্ধী-হত্যা এই ছবির মূল বিষয়।

গান্ধীজীকে আধুনিক যীশুখুঁটরূপে রূপায়ণ, অথবা, যোনাবেদন-সংবলিত দর্শকচিত্তহারী ছবি তৈরী—দুটির মধ্যে মার্ক রবসন শেষোক্ত পথটিকে বেছে নিয়েছেন। তার ফলে এই ছবির নায়ক এ যুগের মহাতাপস সত্যব্রতী গান্ধী নন, যোনাহুত্বিত অবদমিত প্রকাশবাহন গড্‌সে। গান্ধী-হত্যার নায়ক আধুনিক মহিলার প্রেমিক ও বৈশ্বাসক্ত। এই ব্যক্তির কাষাবলী ছবিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। তার ফলে রবসনের সকল প্রয়াস, ভারতীয় দৃষ্টিতে, বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই ছবির নাম “রামনামে নয় ঘণ্টা” না হয়ে “গড্‌সের দু’ঘণ্টাব্যাপী উন্নততা” হলেই ঠিক হত, একথা অনেকে বলেছেন। মোট কথা, এই ছবি সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য যতটা, ব্যর্থতা-বোধ ঠিক ততটাই!

*

*

*

১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ এই সময়-সীমায় প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্যগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্য প্রদত্ত “সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার” (১৯৬১ সাল) সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। পুরস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতাকে তাম্রফলকে উৎকীর্ণ প্রশংসাপত্র ও পাঁচ হাজার টাকা নগদ দেওয়া হয়। এই বৎসর তা জাতীয় প্রতিরক্ষা মার্টিফিকেটে দেওয়া হবে।

পুরস্কৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তার নাম :—বাংলা

“জাপানে” (ভ্রমণ)—অন্নদাশংকর রায়

গুজরাতি “উপায়ণ গ্রন্থ” (সমালোচনা)—ভি. আর. ত্রিবেদী

কন্নড়—“মহাশক্তি” (উপন্যাস)—দেবুচ নরসিংহ শাস্ত্রী

মরাঠী—“অনারীকাছি চিন্তনিকা” (দর্শন)—পি. দেশপাণ্ডে

পঞ্জাবী—“রঙ্গমঞ্চ” (ভারতীয় নাট্য-ইতিহাস)—বলবন্ত গগী

তামিল—“অন্ধরাই চিমাইল” (ভ্রমণ)—এম. সোমসুন্দরম

তেলেগু—“বিশ্বনাথ মধ্যস্করলু” (কাব্য)—বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ।

উর্দু—“ইয়াদেন” (কাব্য)—আখতারুল ইমান। কোনো হিন্দী রচনা পুরস্কার লাভ করতে পারে নি।

*

*

*

কারীগরী শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা বাবদ ১৯৬৩-৬৪ সালে রাজ্যসমূহে ৫৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানা গিয়াছে। দিল্লীর খবরে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য, বিশেষত বৈজ্ঞানিক ও কারীগরী বিষয়ে উপমানের পুস্তক প্রকাশ ও বন্টনের উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন। শিক্ষামন্ত্রক, গ্রামাঞ্চল বুক ট্রাস্ট, বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থা প্রভৃতির প্রতিনিধিদের বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য ছাত্রসমাজের জন্য ভাল বই সহজলভ্য করা ও সেই সঙ্গে সাধারণ পাঠকের জন্য ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় উচ্চমানের গ্রন্থপ্রকাশ ও গ্রন্থমূল্যে বন্টন। বর্তমানে মার্কিন দেশ ও ইংল্যান্ডের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সাধারণ পাঠকদের জন্য স্বল্পমূল্যের পুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছে। সম্প্রতি ইংরেজিতে বিজ্ঞান ও কারীগরী বিভাগ সম্পর্কে সোবিয়ৎ পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের একটি প্রস্তাব ভারত সরকার পেয়েছেন।

*

*

*

কেন্দ্রঅধিবেশে বিখ্যাত রুশ ভারতবিদ্যারিৎ অধ্যাপক এ. এম. দিয়াকর্ক

সোবিয়ৎ দেশে ভারতবিচ্ছাচচার প্রসার সম্পর্কে এক সাংবাদিক বৈঠকে আলোচনা করেন।

তিনি জানান, সোবিয়ৎ ভারতবিদেরা বর্তমানে কন্নাড ভাষা ছাড়া ভারতের সকল প্রধান ভাষা অল্পশীলন করছেন। রাশিয়ায় ভারত সম্পর্কে আধুনিক ও সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে দুখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। জর্নৈক গবেষক ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করছেন। গবেষকগণ এখন ভারতের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সমস্তাবলীর অল্পশীলন করছেন এবং সেই সঙ্গে নাগাজুনের গ্রায় প্রাচীন ও শ্রীঅরবিন্দ, তিলক, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির গ্রায় আধুনিক দার্শনিকদের রচনাবলী অল্পশীলন করছেন। মহাভারত পর্বে পর্বে অনুদিত হচ্ছে।

*

*

*

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এক বিজ্ঞপ্তি-মারফৎ জানিয়েছেন, প্রামাণিক বাংলা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ “ভারত কোষ” শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হবার শেষ তারিখ—৩১ মার্চ ১৯৬০। “ভারত-কোষ” চার খণ্ডে বের হবে। ঐ তারিখের মধ্যে ষায়া পত্র লিখে গ্রাহক হবেন, তাঁদের পক্ষে মূল্য চার খণ্ডে চল্লিশ টাকা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। প্রথম খণ্ড প্রকাশের আহ্বানমূলক তারিখ ডিসেম্বর ১৯৬০। ষায়া গ্রাহক হবেন না এরূপ ক্রেতাদের জন্ত পুস্তকের মূল্য চল্লিশ টাকার অধিক হবে। বর্তমানে পত্র লিখলেই হবে, মূল্য গ্রহণের তারিখ পরে জানান হবে।

*

*

*

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কলিকাতার অঙ্ক-সাহিত্য পরিষদ এক বিশেষ অধিষ্ঠানে হুজুর ভারতীয় লেখককে সংবর্ধিত করেন। কেন্দ্রীয় বেতার-ভাষ্য-দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ গোপাল রেড্ডী সভাপতিত্ব করেন।

প্রবীণ তেলেগু সাহিত্যসাধক কবিসম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ বেজওয়াডা থেকে এই সংবর্ধনা উপলক্ষে কলকাতায় আসেন। তিনি বর্তমান বৎসরে “সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার” পেয়েছেন “বিশ্বনাথ মধ্যকরলু” কাব্যের জন্ত।

অপরজন বাঙালী গবেষক শ্রীপুলিনবিহারী সেন। তিনি সমগ্র জীবন রবীন্দ্র-সাহিত্য গবেষণা-সম্পাদনা কর্মে নিরত আছেন। বর্তমানে ‘বিশ্বকোষ’ সম্পাদনা করছেন।

ডক্টর রেড্ডী উভয়কে মাল্যবিভূষিত করেন। তিনি উভয়কে অভিনন্দিত

করে বলেন, চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তবেই জাতীয় সংহতি সাধিত হবে। সা রে গা মা পা ধা নি—স্বর সপ্তকের মিলনে যেমন গীতধ্বনি সৃষ্ট হয়, সেইভাবে এইসব ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য ও সম্পর্কের দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির মিলন সুর বেজে উঠবে।

উভয়কে তেলেগু ও বাংলাভাষায় মানপত্র দেওয়া হয়। অভিনন্দনের উত্তর অন্ধ্র-কবিসম্মিটি সংস্কৃত ভাষাকে ‘ভারত-জননী’ বলে আখ্যা দেন। সংস্কৃত চর্চার দ্বারাই জাতীয় সংহতি-সাধন সম্ভবপর বলে তিনি মনে করেন। শ্রীমেন বলেন, রবীন্দ্র সাহিত্য-গবেষণাকর্মে আরো নির্ভা ও পরিশ্রম প্রয়োজন, এখনো বহু কাজ বাকি। অন্ধ্র-সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীকপিল কাশীপতি এবং পণ্ডিত শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীও বক্তৃতা করেন।

*

*

*

তামিল কবি সুরাক্ষণ্য ভারতীর ৮১তম জন্মদিবস গত নভেম্বরে সাড়ম্বরে ভারতের নানাস্থানে পালিত হয়েছে। কবির “শতবিশাখম্ দিবস” রূপে এই দিনটি মহাসমারোহে বর্তমান বৎসরের মার্চ মাসে সারা ভারতে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে মার্চের গোড়ায় অখিল-ভারত তামিল লেখক সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। এরূপ কর্মসূচী আমরা পূর্বেই জেনেছি। তামিল লেখক সংঘের সভাপতি অধ্যক্ষ এ. শ্রীনিবাস রাঘবন এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন।

১৮৮২ সালে তামিলনাড়ে কবির জন্ম। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। জীবনের বহু দুঃখ বাধা অতিক্রম করে কবিভারতী কাব্যসাধনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতের তামিল অনুবাদ তিনি করেন। তিনি জাতীয় আন্দোলনের শরিক ছিলেন। ব্রিটিশ রাজরোষ এড়াবার জন্তু তিনি পণ্ডিচেরী চলে যান। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। এখানেই তাঁর কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়। জাতীয় ভাব ও অধ্যাত্মচিন্তায় মিশ্রিত তাঁর কবিতা তামিল-ভাষীদের কাছেই খুবই প্রিয়।

*

*

*

গত ৩০ জানুয়ারি বসন্তপঞ্চমীর পুণ্য প্রভাতে প্রয়াগতীর্থে দুদিন ব্যাপী ভারতীয় লেখক সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। এলাহাবাদের ‘সাহিত্যকার সংসদ’-এর পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা মহাদেবী বর্মা ও শ্রীবালকৃষ্ণ রায় এই সম্মেলন আহ্বান করেন।

এই প্রয়াগতীর্থে একদা হিউ-এন-সাং স্নান করেছিলেন, ভারততীর্থকে

প্রণাম জানিয়েছিলেন। আজ চৈনিক আক্রমণের অন্তত ছায়াতলে ভারতীয় লেখকেরা এই তীর্থে সমবেত হয়েছিলেন। স্থানীয় ও আগত প্রতিনিধি নিয়ে দু'শ লেখক অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল—‘ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য’। শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা আলোচনার সূত্রপাত করেন। শ্রীরামকুমার বর্মা, শ্রীপ্রহ্লাদ প্রধান (ওড়িয়া), শ্রীবিজয়দেব নারায়ণ সাহী, শ্রীজৈনেন্দ্রকুমার আলোচনায় যোগ দেন। এই অধিবেশনের সভাপতি অক্সের মহাকবি বিশ্বনাথ সত্যনায়ায়ণ আলোচনা পরিচালনা করেন।

রাত্রে এক কবিগোষ্ঠীর আসর বসে। ডঃ প্রভাকর মাচোয়ে অধ্যক্ষ ছিলেন। সর্বশ্রী সিয়ারাম শরণ গুপ্ত, মহাদেবী বর্মা, নরেশ মেহতা, রাজগোপালন (তামিল), অরুণকুমার শর্মা (অসমীয়া), রাজমুর্তি রেণু (তেলুগু), জীবন চানী-আক্রমণ সম্পর্কিত কবিতা পাঠ করেন। কবিগোষ্ঠীর মঞ্চালক ছিলেন ডঃ জগদীশ গুপ্ত।

৩১ জানুয়ারি সকালের অধিবেশনের বিষয় ছিল—‘যুদ্ধ তথা ভারতীয় জনমানস’। শ্রীজৈনেন্দ্রকুমার সভাপতিত্ব করেন। ডঃ ভগবতশরণ উপাধ্যায় আলোচনার সূত্রপাত করেন। শ্রীবালকৃষ্ণ বোরকর (গোয়া-কঙ্কণী), ডঃ প্রভাকর মাচোয়ে, আচার্য জগন্নাথ প্রসাদ ভিণ্ডা, নাট্যকার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, শ্রীললিতমোহন অবস্ঠী, অমৃত রায় আলোচনায় যোগদান করেন। শেষে জৈনেন্দ্রকুমার আলোচনার উপসংহার করেন।

বিকল্পের অধিবেশনের বিষয় ছিল—‘আজকের পরিবেশ ও সাহিত্যের দায়িত্ব’। শ্রীবালকৃষ্ণ বোরকর সভাপতিত্ব করেন। শেঠ গোবিন্দদাস, শ্রীবালকৃষ্ণ রায়, শ্রীভগবতীচরণ বর্মা, শ্রীইলাচন্দ্র জোশী, শ্রীহনুমন্ত শাস্ত্রী (অন্ধ্র), শ্রীজৈনেন্দ্রকুমার, ডঃ জগদীশ গুপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলার প্রতিনিধি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থতা-নিবন্ধন তাঁর ভাষণ পঠিত হয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যদি সংস্কৃতি বাঁচে তবে রাষ্ট্র বাঁচবে। মার্কসবাদ ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। তাই তা আমরা ত্যাগ করব। আজ লেখকমাত্রের কর্তব্য দেশকে বাঁচানো, তাহলে সংস্কৃতি তথা রাষ্ট্র রক্ষা পাবে। সম্মেলনের আহ্বায়ক শ্রীবালকৃষ্ণ রায় আলোচনার উপসংহার করেন; তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই মিলন ও সহচিন্তনের ফলে ভারতীয় লেখকরা দেশকে চীন-আক্রমণের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলবেন।

* * * *

গত ২১ মাঘ প্রয়াগে বাঙালী লেখক অবনীনাথ রায়ের মৃত্যু ঘটেছে
৬৮ বৎসর বয়সে।

*

*

*

*

বর্তমান বৎসরের ‘রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার’ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন।
শ্রীস্ববোধকুমার চক্রবর্তী কয়েক খণ্ডে ভ্রমণ-ভায়েরি “রম্যাণি বীক্ষ্য” গ্রন্থের
জন্ম ও উক্তের সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী” প্রবন্ধগ্রন্থের জন্ম
পুরস্কার পেয়েছেন।

গত সমাবর্তন উৎসবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল সাহিত্যসাহকদের
পুরস্কৃত করেছেন, তাঁদের নাম গত পৌষ সংখ্যায় দিয়েছি। একটি নাম বাদ
পড়েছে বলে আমরা বিশেষ দুঃখিত। প্রখ্যাত লেখক উক্তের নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
‘জগন্তারিণী পদক’ পেয়েছেন।

শিশুসাহিত্য পরিষদ ১৩৬৮ ও ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যপুরস্কার
“ভুবনেশ্বরী পদক” ঘোষণা করেছেন। ১৩৬৮ সালের জন্ম শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ও
১৩৬৯ সালের জন্ম শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে এই পুরস্কার দেওয়া হবে
আগামী বৈশাখের এক বিশেষ অহুষ্ঠানে।

বর্তমান বৎসরের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন [বাংলা ভাষায়
গত তিন বছরে রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্ম] স্বনামধন্য লেখক শ্রীঅন্নদাশংকর রায়।
এঁদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*

*

*

*

ভারতরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি উক্তের রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি
পাটনা সদাকং আশ্রমে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। কেবল রাষ্ট্রজীবনে
নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর তিরোধানে শূন্যতার সৃষ্টি হলো। উক্তের প্রসাদ
হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় স্থলেখক ছিলেন। তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র ও প্রথম
কর্মজীবন কলকাতায়। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সমগ্র দেশের সঙ্গে শোকপ্রকাশ
করছি ও আত্মীয়বিরোগ বেদনা অনুভব করছি। তাঁর লেখা ‘ইণ্ডিয়া
ডিভাইডেড’ ও ‘অটোবায়োগ্রাফি’ দুটি মূল্যবান ইংরেজি গ্রন্থ।

যদি পড়তেই হয় ত

তবে বেঙ্গলের বই পড়ুন।।

পথ চলে গেছে

সমর সোম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

— আ জ মে র —

আজমের এসে পড়েছে। গাড়ী থেকে নামব কি! স্টেশনে পুলিশ-পেয়াদা, সরকারী লোক-লস্কর, ওপরওয়ালাদের ভিড় দেখে দূর থেকেই চমকে উঠি। বেসরকারী ভিড় কম নয়। একপাশে বাঙালী বন্ধুদের মুখও চোখে ভাসে। চারিপাশের জনতা ঠেলে এগিয়ে আসেন এক প্রোঁচ। স্ত্রী, গৌরবর্ণ, ঝজু-দেহ তাঁর। পরণে খদ্দেরের ধুতি, গায়ে গলাবন্ধ কালো পট্টর কোট। হাতে খাদিস্তোর মালা। ছুটে এসে শ্রদ্ধেকে জড়িয়ে ধরলেন। মনে হোল বহুদিন পর যেন কোন আপনজন পেলেন। তারপর এলেন আমাদের কাছে, নামিয়ে নিলেন গাড়ী থেকে।

ইনি আর কেউ নন—শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায়, আজমের রাজ্যের শেষ মুখ্যমন্ত্রী, গান্ধিজীর মন্ত্রশিষ্য। নিজের খাস গাড়ীতে আপন ভাইপোর হাতে আমাদের তুলে দিচ্ছেন দেখে প্রশ্ন করি—‘আপনি?’ পেছনের জিপে, যাতে আমাদের মালপত্র তোলা হচ্ছিল, দেখিয়ে হাসতে হাসতে জবাব দেন—‘মাল নিয়ে আমি যাচ্ছি!’

—‘সে কি!’

এবার আর উত্তর আসে না। আজমের শহর পার হয়ে গাড়ী ছুটে চলে হাটুগির দিকে।

পাহাড়ের কোল দিয়ে পথ ঘুরে যায়। দেখতে দেখতে সাত মাইল পথ শেষ হয়। ছবির বইয়ের ক’খানা পাতা যেন কে খুব তাড়াতাড়ি উন্টে গেল। হাটুগির মহিলা-শিক্ষা-সদনের মধ্যে গাড়ী পৌঁছয়।

মুকুল উপাধ্যায় বলে—‘এইখানে আমরা থাকি। নামুন।

বুঝতে পারি বাপুর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। হরিভাউজী ঐশ্বর্য চান নি। মুখ্যমন্ত্রীর জন্তে সরকারী স্বত্ব-স্ববিধা, বিলাস-বৈভব তো কিছু কম নেই আজমের শহরে। সব ছেড়ে তিনি বসে আছেন এই আশ্রমে। এই তাঁর

ঘর। সরকারী গ্রহরী ছুটে এসে সঙ্গীন কাঁধে পাহারায় দাঁড়িয়েছে। পাহারার কিন্তু তিনি কোন পরোওয়া করেন না।

সদনের প্রবেশপথে শ্রীমতী উপাধ্যায় ও আরো দুটি মেয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। শ্রদ্ধেয়র গলায় পরালেন যত্নে গাঁথা মালা, আমাদের হাতে দিলেন স্নেহ-প্রীতিতে গড়া তোড়া। মেহেদী, হাসতুহানা ও চাপার গন্ধে কাঁছের বাতাস দেখতে দেখতে ভারী হয়ে ওঠে।

জানি এসব কথাই কোন মূল্য নাই। কোথায় মালা আর তোড়া, কোথায় কুসুম ও চন্দন—এ দেখার জন্তে, এসব কথা মনে রাখবার জন্তে পথে বার হইনি। চলেছি নিজের দেশ, নিজের জনকে চিনতে, জানতে। যারা দেশান্তরের মাটিতে ছড়িয়ে আছে তাদের কথা, হৃৎ-হৃৎের সংবাদ সকলের মনে পৌঁছে দিতে চাই। আবিষ্কার করতে চাই—মহ্মুদেয়র বনিয়াদ ইতিহাস কেমন ভাবে গেঁথেছে...গাঁথতে চাইছে। তবু এসব কথা না বলে পারছি না। আত্মীয়ের প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখানোর নামই কি মহ্মুদেয়?

শ্রীমতী উপাধ্যায়, বোন শকুন্তলা সকলেই আছেন এই শিক্ষা সদন নিয়ে। শ্রীমতী বলেন—‘নিজের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আজমের শহরে থাকব কি করে? মন টিকবে কেন? আজ মন্ত্রীও আছে...কাল থাকবে না।’ জনসেবারও তো একটা সাময়িক রূপ। কিন্তু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান?—এ তো সারা জীবনের স্বপ্ন!

আজ আছি এখানে,—কাল পথ আবার সামনে টানবে। বসে বসে প্রোগ্রাম তৈরী হয়। সর্বপ্রথম অবশ্য চায়ের প্রোগ্রাম। সঙ্গিনীর চা জোটেনি। ওর অনেক সহিষ্ণুতা। চা খেয়ে স্নান সারা হয়। ইতিমধ্যে আমাদের আদার খবর চারিদিকে দৌড়ে ফেরে। হরি ভাউজী নিজে হাতে টেলিফোন ধরে মাঝে মাঝে এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবাঁক হয়ে দেখছিলাম। শ্রদ্ধেয় আজ কংগ্রেসে নেই, কিন্তু বন্ধুত্ব কত বড় জিনিস। গুরুভাই কত আপনায়। জানতে পারিনি সেদিন আমাদেরও তিনি কত আপন ভেবে নিয়েছেন। তার খোঁজ পাই এলাহাবাদে। ভাইয়ের বাসায় হরিভাউজী এসেছেন—কাজের বামেলি নিয়ে। কথা বলতে বলতে রাত প্রায় এগারোটো বাজে—ছাড়তে তবু চান না। যখন উঠে আসি বলেন—‘বেটা, য়হা আপনা ঘর সমঝ্ কর আনা। তুম তো অপনে হী হো।’ সেদিন শ্রদ্ধেয় বর্তমান অবস্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন মুখোমুখি বসে। সে আলোচনা হাশ্ব-পরিহাসের মধ্যে ছ’জনই উপভোগ করছেন। বিচ্ছেদের জন্ত কেউ

কখনো প্রস্তুত নন। আর আমাদের?—এতটুকু মতান্তরে সহজেই মনান্তর ঘটে। মুখ ফিরিয়ে বসে থাকি।

খাবার ঘরে সঙ্গে নিয়ে চলেন—বাপ-মেয়ে। হরি ভাউজী সঙ্গে বসেন, বোন শকুন্তলা দেখাশুনা করেন। মেবোর উপর পিঁড়ে সামনাসামনি চাদর মুড়ে রাখা। টেবিল নেই, চেয়ার নেই, ডিকেণ্টার, ছুরি-কাঁটা কিছুই নেই। কিন্তু স্বাদ আছে আহাৰ্য্যে। ভাত, রুটি, টিণ্ডা, আলুশাক, সালাদ, দই ও ফল দিয়ে সেদিনের মধ্যাহ্নভোজন শেষ করি। হরি ভাউজী খাচ্ছেন। দেখি আর ভাবি—কে মন্ত্রী আর কে ইনি! অধর্নগ্ন ভারতীয় ফকির বাপুকে রাষ্ট্রপতি করে দিল্লীর মসনদে বসালে—তিনি কি নিজের মত করে ভোল পাণ্টে নিতেন না?—পতির দল আর পিতার দলে—তফাৎ এইখানে! মান রাখতে মন্ত্রীদের মাইনে কমাতে যাঁরা ইতঃস্তত করেন—তাঁদের মধ্যে বিনা ঐশ্বৰ্যের হাওদায় এঁর মন্ত্রীত্ব চলবে কি করে? সেদিনই বুঝেছিলাম—পণ্ডিতজী দিল্লীতে ডাকলে কি হবে—সম্পূর্ণ রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রীত্ব ইনি নেবেন না; শ্রী স্মৃথাডিয়্যার পথ নিঃকণ্টক।

থাওয়া চলে, গল্পও এগোয়। সাতরাজার ধন এক মানিক—মাহুষ। হরিভাউজী দুঃখ করেন—এই মাহুষের মনে কেমন যেন এক পরিবর্তন আসছে। সামাজিক স্তরে মাহুষে মাহুষে যে তফাৎ বাড়ছে তার ভয়াবহতার কথা কেউ তো ভাবছে না। অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে বলে একদিন এগিয়েছিলেন। সারা জীবন বাপু অস্পৃশ্যদের মধ্যে কাটিয়ে গেলেন। কিন্তু আজ আর এক ধরণের ছোঁওয়া ছুঁত মাথা তুলছে।

১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে এ আশ্রম আরম্ভ করেন তিনি। ইচ্ছে ছিল সেবার জন্তে তৈরী করবেন নিজেকে। কিন্তু ১৯২৭-এর মধ্যে এ নিভৃত প্রান্তে দেখতে দেখতে বাড়লো মাহুষের আনাগোনা। কংগ্রেসের স্বাধীনতাকামী সদস্যদের রচনাগ্নক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠল হাটুগির এ আশ্রম। সত্যগ্রহের বাড় এলো। কাঁপিয়ে দিলে আশ্রমের বলিষ্ঠ প্রাণগুলি ইংরেজ শাসকের অস্থি-পঙ্কর। ভেঙ্গে দিলে জালিয়ে দিলে সত্যগ্রহীর ঘর। হরি-ভাউজী পরিহাস করে—বিশাল এক নীম দেখিয়ে বলেন—‘পুলিশ নে যব হমারা ঘর জালা দিয়া তো হম ইস পেঁচ পর কায়ম রকখা। ইসে ভুলো মত্!’

সংগ্রামের শেষ এগিয়ে আসছিল। ১৯৪৫-এ দেখা গেল আর সত্যগ্রহের প্রয়োজন হবে না। বাঁধা ঘর পুড়ে যাচ্ছে—এ দুঃখের শেষ হয়েছে। এসেছে

শান্তির সময়। ভাঙ্গনের লাঞ্ছনা এড়িয়ে তাই মাথা তুলতে চাইলে নবজাতক।
শ্রীমতী ভাগিরথী দেবী বলেন—‘এবার আমি স্থায়ী কিছু গড়ব!’

ভাগিরথী দেবীই শ্রীমতী উপাধ্যায়।

তৈরী হোল হাটুগি গান্ধী আশ্রমের বিতালয়। সামনে বাপুর আদর্শ।
জ্ঞান, কর্ম ও বলার সংমিশ্রণে শিক্ষা কেমন করে সম্পূর্ণ হতে পারে—তারই
গবেষণা চলেছে এ প্রতিষ্ঠানে। সর্ব ধর্ম, সর্ব জাতির সমন্বয় হয়েছে এ শিক্ষায়।
সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী, কৃষি, কলা, গো-পালন সব কিছু নিয়ে ডুবে
আছে ছাত্র, পাশে আছেন শিক্ষক। ভারতবর্ষে শ্রমের মর্যাদা নেই। যতদিন
শ্রম না মর্যাদা পাচ্ছে ততদিন শিক্ষাও প্রতিষ্ঠা পাবে না। দেখে মনে হলো
—শুধু ছাত্রদের মধ্যে নয়, কেবল প্রতিষ্ঠানে নয়,—সমগ্র পারিবারিক জীবনও
এখানে এই নক্সায় পড়েছে।

আজমের প্রায় ছ’হাজার বছরেরও ওপর পুরানো শহর। বলতে পারব
না হিন্দু রাজা আজমের কোন আজমের করেছিলেন প্রতিষ্ঠা। তবে
বুঝতে পারলাম,—বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বেও, বর্তমানের নক্সা এঁকেছিলেন
সম্রাট আকবর ও তাঁর রাজসন্তা। দিল্লী গ্যেট আজো দাঁড়িয়ে আছে।

মোঘল বাদশারা মনের মত করে কতবার সাজিয়েছেন একে। নানান
ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে রঙে রূপে মনোহর হয়ে উঠেছে আজমের। শিল্পী কবি
সম্রাট জাহাঙ্গীর তিনটি বছর ছিলেন এ শহরে। হুজুংহা হার সঙ্গে স্বপ্নমুগ্ধ
সেই দিনগুলি তাঁর গড়ে গেছে বহু স্বপ্নকোণ এ রাজ্যে।

আজমের থেকে মাত্র আট মাইল দূরে বহুশ্রুত পূর্ণতীর্থ পুষ্কর। আর
একমাস পরে—কার্তিক পূর্ণিমার দিন এ জায়গায় দেখা দেবে জনপ্রাণ।
‘তু’শ নয় পাঁচ শ’ নয়, ‘তু’হাজার নয় পাঁচ হাজার নয়—আড়াই লক্ষেরও বেশী
লোক পাহাড়ের এই কোণটুকুতে ছড়িয়ে পড়ে। মুখর করে তোলে।
তাছাড়া—পড়েই তো আছে সারা বছর। দূর-দূরান্তর, দেশ-দেশান্তর থেকে
বারো মাস আসছে কত নরনারী। মাথা গুলে পাঁচ লক্ষ পার হয়ে যাবে।
পুষ্করের জীবনে তবে আছে একটিমাত্র দিন—কার্তিক পূর্ণিমা। সেদিন
জেগে উঠবে এই ঘুমন্ত ধরিত্রী কোন্। শুধু জনপ্রাণ নয়—জানোয়ারেরও
বসছে বিরাট মেলা। শোন মেলার পশু-সমাবেশ জানি—কিন্তু এ খবর
রাখতাম না।

বাইরের দিক দিয়ে মফঃস্বল শহরেরও হীনতম সংস্করণ এই পুষ্করভূমি।
তবু মনে হয়—সমস্ত শূন্যতা, দীনতার মধ্যেও কোথায় যেন প্রাণের সংবাদ রয়ে

গেছে। হয়তো তা—পুষ্করতীর্থের সবুজ প্রনারিত জলভাগে, কিম্বা ওই ব্রহ্মা মন্দিরের শিখরচূড়ায়।

ভক্তের মনকে আঘাত করতে চাই না। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি পুষ্করতীর্থের ঘাটে পা দিতেই মন কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে। সারা ঘাট জুড়ে, সমস্ত সোপান জুড়ে পড়ে আছে মার্কেল পাথরের খণ্ড খণ্ড অংশ। নানা নাম অসংখ্য ঠিকানা। জন্ম-মৃত্যুর বহু তিথি সরীসৃপের মত নড়ছে সেই শুভ্রতায়। অগ্নের আরাধ্য প্রণম্যদের নামের ওপর পা ফেলতে সংকোচে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যাই। কিন্তু করব কি! উপায় কি! নিজের পিতৃপুরুষ আপন-জনদের যারা পরের পায়ের তলায় শুইয়ে দিয়েছে তাদের বিবেকহীনতা আমায় কি তীর্থস্থানে পৌঁছতে দেবে না? এক রকম চোখ বুজেই পা চালাই।

তীরে পৌঁছে অবাক হয়ে তাকাই। ছড়ানো হ্রদ অজস্র ঘাট।—“বাহান? মন্দির কত?

বুদ্ধ পাণ্ডা উত্তর দেয়—“পাঁচশো!”

—“আর ধর্মশালা?”

—“তেইশটি বাবু! এ যে সত্যযুগের তীর্থ! কলির লক্ষ লক্ষ প্রাণী এখানে ছুটে আসছে। তেইশটি ধর্মশালাতে কুলোয় না।”

হ্রদ নয় তো, আধখানা চাঁদ! ঘাটগুলি একের পর এক মাথা তুলেছে বিরাট হ্রদ জুড়ে। জয়পুর, যোধপুর, গোয়ালিয়র এমনি কত দেশীয় রাজা, যখন তাদের স্বদিন ছিল, তৈরী করেছে এক-একটি ঘাট। আশ্চর্য, তবু মেয়েদের জন্তে একটি ছাড়া ছুটি স্নানের ঘাট নেই! এটিও আমাদের দেশের কেউ তৈরী করে দেননি। লজ্জার কথা, তবুও বলতে হচ্ছে আমাদের মেয়েদের আকুর কথা আমরা ভাবিনি, সে চিন্তা করেছিলেন মহারাণী মেরী। ১২১১ সালে পুষ্করে এসে এ দুঃখ এ অভাব তিনি বুঝেছিলেন।

হ্রদের সবুজ জলে, সোপানের গায়ে গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছেদের ভিড়। রাজপুত মেয়ে মাথার ঘড়া জলে নামাতেই চোখের ওপর তারা ছুটে আসে। সিঁড়ি বড় পিছল। দাঁড়াব কি (!) ফুল তুলসী জলে দিয়ে ভেসে যাই তীর ছেড়ে। শরতের আমেজে প্রলুব্ধ জল। হঠাৎ কানে আসে ভয়ানক পাণ্ডার চীৎকার—“মা’ব লোট আইয়ে! মায়েব ফিরে এসো!”

বুকের বলে হাতের তাড়নায় জল সরিয়ে প্রশ্ন করি—“কৈও?”

—“অগর বঁচনা চাহতে হৈ…….”

বাঁচতে নিশ্চয়ই চাই! তীরে এসে শুনি—হৃদে নাকি কুমীর আছে!
দূর পাহাড়ে ডুবো ফাটলের মধ্যে তারা অপেক্ষা করে শিকারের।

বেশীর ভাগ তীর্থের মত এখানেও বানরকুলের সংখ্যা ওজনদার। তবে তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখলে বন্ধুর মত ব্যবহার পাওয়া যায়। সন্ধিনীর হাতের মুঠো ধরে ছোলায় শেষ দানাটি পর্যন্ত ওরা নিয়ে যায়। দেখে হাসি চাপতে পারি না। কিন্তু সে হাসি কেড়ে নিলে রুঢ় বাস্তব। চার বছরের ছেলে মেয়েদের পর্যন্ত ভিখারী সাজানো হয়েছে। বাপ পাণ্ডাগিরি করে, ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা চায়—“টুকু না দো বড়া শেঠ, দো আনা দো!”

ব্রহ্মঘাটের ওপর থেকে ফেরার আয়োজন করছি। লক্ষ্মীনারায়ণ দেবশর্মা ওরফে লালুহরি পাণ্ডা এসে দাঁড়ালেন,—“বাঙালীদের ধর্মশালা একবার দেখে যাবেন না?...আমি তার ম্যানেজার!”

ধর্মশালা সবই তো একরকম! এলাহাবাদে থাকি, ধর্মশালা চিনব না! ওদের সম্বন্ধে খুব একটা কৌতূহল নেই তাই। লালুহরি তবু ছাড়বে না।—বছরে প্রায় দশ হাজার বাঙালী আমার ধর্মশালায় আসে। একবার তো পায়ের ধুলো দিন!”

ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়কদের গোলগাল চেহারা যেমন চোখে পড়ে বুঝতে পারি তাঁরা আরামেই আছেন। বরুফি ও মালাইয়ের গন্ধ তাঁদের সারা দেহে। কাজেই হাজার অহুরোধ সম্বন্ধেও পায়ের ধুলো খরচ করি না। পরিস্কার ধারণা নিয়ে আসি—ধর্মশালার ম্যানেজারীতে শ্রীমান লালুহরি স্বধর্ম রক্ষাই করছেন।

পুষ্করের সোপানসার ভেঙ্গে ভেঙ্গে পথ আসে এগিয়ে। ব্রহ্ম মন্দিরের সামনে এসে থামি আবার। পুষ্কর ব্রহ্মমন্দির এক সদানিষ্ঠ ধর্ম-কেন্দ্র। বছকালের পুরানো মন্দির। কত পুরানো অহুমান নেই, শুধু জানা গেছে শংকরাচার্যের সময় এর সংস্কার হয়। শংকরাচার্য তো আর আজকের কি গত দিনের মানুষ নন! অনেক ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাসের এ নীরব দ্রষ্টা। পাঁচশো বছর ধরে ফের জমা হয়েছে এর দেহে কাল-প্রহরণের নানা চিহ্ন।

প্রবেশপথ থেকেই হাত নাড়ছিল—মন্দির-অভ্যন্তরের বকুল ছায়া। লোভ এড়াতে পারি না। বাংলা দেশের বাইরে বকুল-গন্ধভরা এতদূর ছায়ায় যে কী মূল্য তা এখানে না এলে অহুমান করতে পারা যাবে না। বসি সাদা পাথরের আসনখানিতে। কিন্তু বসবার উপায় কোথায়! সাথীরা

টেনে নিয়ে যাবেই। ঘর থেকে লোটা-কঞ্চল নিয়ে যদি কোনদিন পালিয়ে আসতে পারি তবে সেদিনই পাব নিরঙ্কুশ বিশ্রাম।

সামনে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা। পাশে অধিষ্ঠিতা ব্রহ্মাপত্নী দেবী গায়ত্রী। নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষ সত্যিই কি সম্পূর্ণ নয়? পিতামহ ব্রহ্মা—পুঙ্করে এসেছিলেন যজ্ঞ করবার জন্তে। মানুষের দেব-দেবী মানুষের মত চলা-হাঁটার অভ্যাস রাখতেন। স্বর্গ-মর্তের সে পথ আজ নানা পথের ভিড়ে আত্মগোপন করলেও সেদিন ছিল। স্বর্গ থেকে সেই পথে মর্তে পৌঁছতে সময়মত পারলেন না দেবী গায়ত্রী। হয়তো কৈলাসের মোড়ে কোন ল্যাণ্ড স্লাইড হয়ে থাকবে। এদিকে পত্নীকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ হয় না। এ যে নিয়ম। সৃষ্টির কলকাঠি তাঁর হাতে থাকলেও তিনি ছিলেন নিয়মের মধ্যে। আইন গড়ে যারা এখন—তারা সব চাইতে আগে আইন ভাঙছে ঠিকই কিন্তু সেদিন এমন ছিল না।

সেদিনকার আবহাওয়াই ছিল অল্প ধরণের। রাজা ছিলেন সেবক। কাজেই দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহের আদেশে যজ্ঞরক্ষার জন্তে স্থলক্ষণা পত্নীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। ফিরে এলেন গোয়ালার বাড়ীর মেয়ে গায়ত্রীকে নিয়ে। কিন্তু গায়ত্রী যে মানবী। পিতামহের পাশে বসে পত্নীরূপে যজ্ঞভাগ নেবার পবিত্রতা তো তার নেই। তাই গোমাতার মুখ দিয়ে গর্তে এবং গর্ত থেকে আবার বাইরে এসে নবজন্ম পেলেন, পবিত্র হলেন।

সারা ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ব্রহ্মামন্দির নেই। কেন যে নেই—তার জবাব শুধু একটি গল্পাংশ যা ওপরের কাহিনীকে সম্পূর্ণ করছে। দেবী সাবিত্রী ব্রহ্মার নতুন বিবাহের কথা শুনে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন—“পুঙ্করের বাইরে কোথাও তুমি স্থান পাবে না, তোমার মন্দির কেউ গড়বে না।” নারীর অভিসম্পাত এমনই! পিতামহ থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণ পর্যন্ত এর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। বুদ্ধি ঐসব মানতে চাইবে না; যুক্তি হেসে উড়িয়ে দেবে। হৃদয় কিন্তু তবুও বলবে কথা হলেও মনের অতুভূতি দিয়েই তো এ কাহিনীর সৃষ্টি। সে মন কি জীবন-নিরপেক্ষ?

ব্রহ্মামন্দিরের বর্তমান পুরোহিত স্বামী বিভূতিপুরী। ব্রহ্মচারী। বয়স অল্পমান করলাম—আশী বছর। তাঁকে যেখানেই দেখি না—হাসিটুকু চিনিয়ে দেবে। পাঁচশো বছরের ইতিহাস বলে—এ মন্দিরের পুরোহিতদের এক পরম্পরা চলে আসছে। সংস্কৃতে বললেন—“কোথা থেকে আসছ তুমি? এলাহাবাদ?”

—“হাসছেন?”

—“আমার মনটাকে পঞ্চাশ বছর পিছনে যে টেনে নিয়ে যাচ্ছ তুমি !
তখন ছাত্র ছিলাম, স্বামী বিভূতিপুরীর তখনও জন্ম হয়নি। ঝুঁসি চেনো ?
সেইখানে সন্তুরামের বাগিচায় থেকে পড়তাম !

—“আজো সে বাগিচা আছে ! আজো ঝুঁসি আছে !”

—“নেই শুধু সেই ছাত্রটি !” স্বামী মন্দের চোখে উত্তর দেন।

পাশে আসেন আর এক যুবক সন্ন্যাসী। গেকরায় গৈরিক হয়ে আছে
মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি। বিভূতিপুরী পরিচয় করিয়ে দেন—

“ব্রহ্মচারী প্রকাশন ! আমার মন্ত্রশিষ্য !”

প্রকাশন হাত জোড় করে বলে—“সেবক !”

—“আবার ?

—“অপরাধ ?

—“তুমি আমার সেবক নও। এ মন্দিরের ভাবী পুরোহিত ব্রহ্মার সেবক
প্রকাশন !” আমার দিকে চেয়ে বলেন,—“ছেলেটি বড় ভালো। এ সম্প্রদায়
এর হাতেই দিয়ে যাব।...দিয়েই তো যাব ! যাওয়াই এ জীবনের নিষ্ঠুর সত্য।”

ব্রহ্মামন্দিরের ইতিহাসের সঙ্গে নানা ঘটনা বহু মাহুকের নাম আছে
জড়ানো। মন্দির-শীর্ষে থাক না স্বর্ণচূড়ার ছায়া। নীরবে নিভুতে ত্যাগের
গুদামিগে হারিয়ে গেছে সমস্ত বৈভব-স্বপ্ন। শঙ্কর, দয়ানন্দ সরস্বতী—এমন কি
কস্তুরবার নাম পর্যন্ত এ মন্দিরের সঙ্গে জড়ানো।

দয়ানন্দ সরস্বতী, আজ তো ইতিহাস ! আছে তাঁর ‘সত্যার্থ প্রকাশ’।
পুঙ্করের এই নিভৃত প্রান্তে বহু ছুঃখে বহু ব্যথায় পৌঁছেছিলেন তিনি। সংরক্ষণ-
নীলতার তাড়নায়—সংস্কারভ্রষ্ট বিচারের হিংস্র দৃষ্টি বাঁচিয়ে আড়ালে বসে সত্যের
স্বরূপ চেনবার জন্তে, সত্যকে তুলে ধরবার জন্তে প্রয়োজন ছিল তাঁর এক
নিশ্চিত আশ্রয়ের। পুঙ্কর ছাড়া আর কোথাও তা পাননি। ব্রহ্মামন্দিরই
দিয়েছিল—নিভৃতি, শান্তি ও নিরাপত্তা। মন্দিরের প্রবেশপথে একাধারে বসে-
তিনি লিখে গেছেন, নতুন ধর্মবোধ, নতুন সমাজ-চেতনা—‘সত্যার্থ প্রকাশ’।

বিভূতিপুরী হাসতে হাসতে বলেন—“পৃথিবীতে কোথাও যদি ঠাঁই না
পাও তো এসো এ মন্দিরে। দরজা এখানে খোলা পাবে !”

যেখানে বসে সত্যার্থপ্রকাশ লেখা হয় সে দালান দাঁড়িয়ে আছে। ধুলো
তুলে মাথায় দিই। মাটিতে হাত রেখে অহুঁভব করতে চাই মহান পুরুষদের
পাদস্পর্শ। স্বামীজী দেখেন আর মুহূমন্দ হাসেন। থেকে থেকে তাঁর দৃষ্টি
নিম্পলক ভাবে কোথাও যেন নিরুদ্দেশ হয়।

জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেছেন। গোধূলি-আলোয় মন্থর হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ-মুখ। অনেক দেখেছেন, অনেক ভেবেছেন। কনট প্লেস, হজরতগঞ্জ, চৌরঙ্গী কিম্বা চৌপাটিতে না থাকলেও জীবনকে দেখার অস্ববিধা হয় না, জীবনকে চিনতে কষ্ট হয় না স্বামীজীর। গুরু কেশবপুরী তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন—শুধু ধর্মের নয়, জীবনেরও। শৈশবে গৃহচ্যুত যে শিশু ছিটকে পড়েছিল গৈরিক জীবনপথে সে আর কোনদিন ফিরতে পারেনি। পরিণত বয়সে লোকে ঘর ছাড়ে, সন্ন্যাস নেয় কিন্তু বিভূতিপুরীকে ঘর ছাড়ানো হয়েছিল, সন্ন্যাসী করা হয়েছিল। গোড় ব্রাহ্মণ কানাইরাম বাপ হয়ে তাঁকে সঁপে দিয়েছিলেন শঙ্কর সম্প্রদায়ের কাছে। ঘরে তো ছেলে বাঁচে না, সে ভগবানের হয়েই বাঁচুক। ক্ষুদ্র স্বার্থের সংসার থেকে ভবিষ্যৎ বিভূতিপুরীকে তাই তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন বুক বেঁধে। স্বামীজী আজো অদ্বৈত সত্যকে আঁকড়ে আছেন; আপস নেই।

ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরের ডান পাশের উঠানে এসে পড়ি। মন্দিরের নীচে স্বেতপাথরের সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে। অন্ধকারে হেসে উঠেছে মশালের লাল আলো। ভাসছে অর্ধক্ষুট মস্তকবনি আর প্রদীপের পোড়া তেলের গন্ধ। মাঝখানে পাথরের কালো শিবলিঙ্গ। বহু ভক্তের চন্দনে চিহ্নিত হয়েছে, স্নগন্ধিত হয়েছে, কালো পাথর। লিঙ্গের নিঃসঙ্গতার সাথী হয়েছেন গণেশ আর পার্বতী। জানি না দেবতা এখানে আছেন কিনা—কোথাও আসলে আছেন কিনা তাও আমার জানা নেই—তবু দেশে দেশে মঠে-মন্দিরে, প্রার্থনায় মত্তে মানুষ্যের যে ভক্তি উদাত হয়ে উঠেছে তা দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় দেবতা আছেন। তিনিই যেন পরম নির্ভরতা! চলমান ক্ষয়িষ্ণু জীবনের স্থিতিশীল অক্ষয় আশ্রয়; যেখানে ঠাই পেলে—হয়তো আর কিছু চাইবার থাকে না। দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, মনে মনে তিনি মধুর হয়ে ঘনিয়ে উঠেছেন। আর আমরা?—পাগলের মত কস্তুরী মৃগের মত কস্তুরী বৃকে রেখেই বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ভারতবর্ষ কেন?—এক-একটি কাল সব দেশে সব সমাজেই অধিকার করেছে দেব-চেতনা কিম্বা অবতার-কল্পনা। শিবমন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টায় অতীতের মুখরিত মুহূর্তগুলি স্মন্দর ছিল, না, আজকের অবিধানী মনের বাকপটুতা ও সন্দেহ বাঁচা সহজ করে দিয়েছে—এর বিচার কি আমরা করব না?

চোখের ওপর দেখেছি আমার বিবর্ণ বাংলায়, আজ তো মুখে সোনার

বাংলা আসে না, গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে মায়ের লীলায়—বসন্তে ।
ডাক্তার বৈজ্ঞানিক শহরে ডিম্বেন্দ্রারী খোলেন, গ্রামে থাকলেও দুমূল্য...দুস্ত্রাপ্য
তারা । দুঃখী মানুষের দেবতা ছাড়া আর কেউ ভরসা দেবার নেই । যত মরে
ততই বেড়া কীর্তন করে দেবতাকে ডেকে ফেরে ।

স্বর্গের ঠাকুরকে মর্তের গরীব দুঃখীর কুঁড়ে ঘরে আসতে হলে...মানুষ হয়েই
আসতে হয় । মানুষের মধ্যেই ভরসাহীনেরা দেবতার দেখা পায় । দূর গ্রাম
থেকে ডাক আসে । মায়ের পুরোহিত অভয় চায় ; শুরু করে কুচ্ছ সাধনা—
নির্জলা উপবাস ।...চোখের পাতা আর বুজতে চায় না ।

দেবী প্রসন্ন হন ।

আজ তিনি মানবী । জয়গান দিয়ে রাত্রির অন্ধকার আকাশ কাঁপিয়ে
সাগরের-হাওয়া ঠেলে মানবীরাশিনী দেবী পৌছন ছমছমে থমথমে গ্রামে ।
হুঙ্কতির ওপর কঠিন তিরস্কারে ভেঙ্গে পড়েন তিনি । জলে ওঠে দৃষ্টি, ফুলে ওঠে
নিঃশ্বাস ।

তবু আছে ক্ষমা । সভ্য জগতে থেকেও সভ্যতার আশীর্বাদ বঞ্চিত মানুষ
চিরন্তন আশীষে বেঁচে ওঠে । মৃত্যুর হার কমে । গ্রামের বাতাসে থমথমে
ভাব কেটে আসে ।

একে কি বলব ? নিজেই বুঝে উঠতে পারি না । তবে শ্রদ্ধা করি এই
বিশ্বাসকে । খাজনা দিয়েও যে সমাজে মানুষের দুঃখ-বেদনা বিনা সাহায্যে
সহানুভূতিতে খারিজ হয়ে যায়—সেখানে এই নির্ভরতাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে
রাখে । ঐ শিবলিঙ্গের চন্দন গন্ধ, পার্বতী ও গণেশের সিন্দূর-শোভা
জীবনকে শিষ্ট করবে, ক্লান্তি জুড়াবে ।

মন্দির শুধু দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেনি এ ভারতবর্ষে—সংস্কৃতিকেও
ধরে রেখেছে । ব্রহ্মামন্দিরে তাই সযত্ন রক্ষিত কতকগুলি পুঁথিও দেখতে
পাই । কাছে-এগোতেই স্বামীজী হাত ধরে থামিয়ে দেন । বুঝতে পারি না ।
এ কিসের পুঁথি ? এ কি কোন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ? ভারত ইতিহাসের কোন
বিস্মৃত মন্ত্র এখানে রয়ে গেছে ?

—এ মন্দির ভারত-সংস্কৃতিকে ধরে আছে ভদ্র !

—ভারত-সংস্কৃতি ?

—হ্যাঁ ! আমাদের সংস্কৃতি তো নাহিত্য ! এই দেখ রঘুবংশ...
কুমারসম্ভব...কত প্রাচীন পুঁথি ! এই হোল বেতাল পঞ্চবিংশতি...বাদশাহ
আকবরেরও চার বছর আগেকার হাতে-লেখা পুঁথি !

সুদূর প্রসারিত এ আকাশ। ‘জিওফিসিক্যাল’ বৎসরের সূর্যবিক্ষোভের সংবাদ-কল্পনার বাঁইরে ছিল বাদশাহের। চন্দনলিপ্ত অন্ধকারে তিনি এক দূরান্তের গ্রহ। তাঁর জীবন রাজকাহিনী। যুদ্ধ-সন্ধির ইতিহাস। সভ্যতার গ্রহর পার হতে হতে ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু কুমারসম্ভব, রঘুবংশের হাতে-লেখা পুঁথির অক্ষর এখনো স্নান হয়নি।

কত দেশে কত ঘরে কত অসংখ্য পুঁথি এইভাবে ছড়ানো। বহু রঙের সমারোহ, বহু রেখার কারুকার্য অনাদরে অনভিজ্ঞতায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কে তার হিসাব রাখে!

বাইরে এসে আর একবার মন্দিরের দিকে তাকাই। হঠাৎ মনে হয়—এক দুর্গ থেকে যেন বেরিয়ে এলাম। আবর্জনা ঢেকে নিয়েছে যাত্রিকের পদচিহ্ন। এ মন্দিরের সঙ্গে ষাঁদের কর্মময় চৈতন্যময় জীবন জড়িত—তাঁদের কেউ নেই। সামনের পথে স্বাধীন ভারতবর্ষের ভিক্ষুরা দাঁড়িয়ে। ওরা কেউ জাত-বাবসায়ী, কেউ বা সত্যিই দারিদ্র্য-তাড়িত। ওদের মুখে শুধু একটি মন্ত্র—“টককা ন দো বড়া শেঠ, দো আনা দো!”

তীর্থভূমিতে যেকিকে চলেছে পায়ে চলার পথ—সেদিকেই মাথা তুলেছে মন্দির। দূর থেকে চূড়া দেখতে পেয়েছিলাম। কাছে যেতেই সিংহদ্বার দেখতে পাই। ব্রহ্মামন্দিরের কাছে পথ ছিল সংকীর্ণ। উটের দড়ি ধরে জোয়ান চলেছিল বুক ফুলিয়ে সে পথে। আর এ পথে ছুটেছে মোটর। এ যে আধুনিক যুগের মন্দির, মাত্র একটা মহাযুদ্ধ দেখেছে। গোবিন্দজীর এ মন্দির এক দিক দিয়ে কুলীন।

তার কৌলীগ্র-যুগের কৌলীগ্র, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সেরে কৌলীগ্র। এ কালের দেবতাদেরও হাত করছেন তহবিল-ওয়ালারা। তাদের ভক্তিতেই স্বগন্ধ জলে স্নান করেন শালগ্রাম শিলা, পান চন্দন কস্তুরী মাখানো আরতির আড়ম্বর। নহবৎ বসিয়ে, ঘাঁ পুড়িয়ে তহবিল-ওয়ালারা পাড়াপড়শীর কাছে দেবতাকে মহিমায়িত করে তোলেন। গরীব জনসাধারণ প্রাণধারণের সমস্তায় উৎকণ্ঠিত। তাদের কাছে ভগবান শুধু পেতে পারেন—চোখের জল ও দীর্ঘশ্বাস।

তাই রঙ্গনাথ—শেঠ মাগ্নিরাম রামকুমার বাংড়ের মত ভক্তের অক্ষয় অরুণণ ভক্তির মূলধনেই এখানে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত থাকুন না—কলকাতার বাশতলা স্ট্রীটে—লাভ লোকসানের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত, দেবতার হাত আশীর্বাদ নিয়ে পৌছে যাবে সেখানে।

এ মন্দিরে সোনা-রূপোর কোন মূল্য নেই। কত স্তম্ভ মোড়া আছে সোনার পাতে। এখানে-ওখানে সারিতে-সারিতে ঝুলছে রূপোর ঝাড়। দক্ষিণী প্রথায় সারা মন্দির সাজানো। প্রতিটি পাথর বসানো হয়েছে দক্ষিণ ভারতের শৈলীতে।

মন্দিরের ভিতরে প্রাচীর জুড়ে রং ও রেখার ছড়াছড়ি। কলা-ভবনের প্রাচীরকেও এতখানি সাজিয়ে তুলতে কেউ চায়নি। ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াই। কোথাও প্রব ভগবান দর্শন করছেন, কোথাও রঙ্গনাথ শায়িত আছেন শেষ শয্যায়া। ধ্যানমগ্ন দক্ষিণ ভারতীয় সাধকদেরও স্মৃতিচিত্র এ প্রাচীরের শোভা বাড়িয়েছে। অদ্ভুত এ প্রাচীর সজ্জা এক কথায়—এ মন্দিরে দাঁড়ালে সারা ভাগবত খানি শিল্পীর রং ও রেখায় পড়ে ফেলা যায়।

গৌসাইজী বলেন—“এ সবই রামচন্দ্রের।”

—“রামচন্দ্র?”

—“হাঁ সখা, রামচন্দ্র! শিল্পী এসেছিল—সুদূর চিদাম্বরম থেকে।”

—“আপনি তাঁকে দেখেছেন?” প্রশ্ন করি।

—“দেখব না?—আমি যে তখন এই মন্দিরেরই প্রাঙ্গণে বসে প্রভুর বনমালা গাঁথি।”

—“সে কি অনেক দিনের কথা?”

—“নীলাধরের লীলার কাছে এতো অল্প সময় সখা!...অল্পদিন হলেও... ভাবলে মনে হয় অনেক দিন। আমি গাঁথতিম বনমালা আর সে ডুবে থাকতো ভাগবতের লীলায়। আজ ভাবি সেদিন আমাদের তাঁকে কাছে পান্নার ফুরসৎ ছিল...ভিড়ে প্রভুকে হারাবার ভয় ছিল না।” গৌসাইজীর অপ্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাসে মন্দিরের বাতাস কেঁপে ওঠে।

আমি তাকিয়ে থাকি তাঁর মুখে। ভারত সেবকসমাজের অগ্রতম কর্মী গোড়জী হাত ধরে টানেন,—“এ ছবিটি একটু তাকিয়ে দেখবেন।

—“এ তো ব্রজমোহন!”

—“এ দিকে আস্তন...এবার দেখুন।”

সত্যিই তো; এ কি রূপের ছলনা।

—“এঁকে পাবেন নাথবায়ার! ইনি শ্রীনাথ!”

—“কিন্তু এ রূপের ছলনা কেন?”

এবার জবাব দেন গৌসাইজী,—

“সেবকের পরীক্ষা নেন ঠাকুর।”

—“আমারও?” গৌড়জী প্রশ্ন করেন।

মুহূর্তের জন্ত গৌসাইজী চূপ করে যান। চোখ দুটি বুজে নিজের অন্তরে উত্তর খোঁজেন। বুঝি আমরা কথা বলি বুদ্ধির ধার নিয়ে, আর তিনি বলেন হৃদয়ের তাপ দিয়ে।

—“আমরা সবাই তাঁর সেবক! নানা ভাবে, নানা পথে সেবাটুকু তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছি! কেউ কর্মে, কেউ ধর্মে—এই যা!”

গর্গজীর পুরো নাম—শ্রীবালকৃষ্ণ গর্গ। হরিভাউজীর এক বিশ্বস্ত সহকর্মী। ভূতপূর্ব আজমের রাজ্যে ভারত-সেবক সমাজের ইনিই পরিচালক। পতিত জাতির পুনর্বাসন, তাদের জীবনযাত্রা উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, নেশা-বিরোধী আন্দোলন, কুটিরশিল্প, ছাত্র ও যুবকসংগঠন নিয়ে আজমের রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে তিনি পৌঁছান। তাঁর সেবাশিবির দেখবার জন্তে দিয়েছিলেন আমন্ত্রণ কিন্তু ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে পারিনি। স্বর্ষোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে যাত্রীর কাফেলা এগিয়ে চলে। নতুন নতুন সরাইখানার ডাক আসে তার অনাগত স্বর্ষাস্তের কানে।

যাত্রীর সময় কোথা!

অনেকেই এইভাবে পিছিয়ে পড়ে। সামনের পথে স্মৃতি ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাই না। তাদের দেখেছি, মনে হয়েছে আপন, স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়বার জন্তে তাদের সঙ্গে অলুভব করেছি এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা—কিন্তু বার বার কারো পানে ফিরে চাহিবার নাহি যে সময়। সমস্ত সঙ্কল্প-ভার কখনো এ তীরের দিনান্তে কখনো ওপারের নিশান্তে ফেলে শুধু এগিয়ে চলেছি। তবে স্মৃতি যাবে কোথায়! সে আসে স্মরণের গলিপথে বহু উন্মনা মুহূর্তে।

এদিকে বৈকুণ্ঠনাথ তো দেখছি—নির্বিকার বসে আছেন মন্দিরে। এক-পাশে শ্রীদেবী অপর পাশে ভূদেবী। সামনে দীপাধার, পূজা-নৈবেদ্য। তিথি আছে পার্বণ আছে, সমারোহ আছে, শোভাযাত্রাও বাদ পড়ে না। তিনি তাই নিয়ে খুশী। সত্যই কি দেবতা সন্তুষ্ট? তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার অধিকার হারিয়েছি নয়তো প্রশ্ন করতাম।

প্রধান পুরোহিত শ্রীভেংকটাচারীর সঙ্গে মালা হাতে আসেন আর এক গৌসাই। যত্নের মালা গলায় পরি। কিন্তু একি—আর মালা কোথায়? সঙ্গিনীর গলা কি শূন্য থাকবে? দুঃখে ওর মুখখানা মস্বর হয়ে ওঠে। ব্যথায়

চোখের পাতা ভারী হয়ে আসি-আসি করছে। গুরু ভেংকটাচারী বুঝতে পারেন বোধ হয়; বলেন, —“মহিলায়ঁ কো মালা নহাঁ দী জাতী!”

সত্যিই তো, মালাদান কি যে সে করতে পারে! সকলের সে অধিকার না থাকাই ভালো। ব্যাপারটা বুঝতে পারি। হাসি। নিজের মালা গোপনে ওর গলায় পরিয়ে দিই।

আজমেরে আজ অষ্টমী পূজার ঢাক বাজছে। ঢাকের কাঠিতে কি আছে জানি না। ওর কাঁপন যেন রক্তের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। মনে পড়ে দেশের কথা। ভেসে ওঠে মহানগরীর উৎসবপাগল পূজা-মণ্ডপের ছবিটি। আবাস দেখা দেয় চুঁচুড়ার বাড়ীর গোকুল কুমারের স্বর্দীর্ঘ যত্নে-গড়া মায়ের সেই মিষ্টি মিষ্টি মুখখানি। চক্ষের নিমেষে ছলে ওঠে বেল লর্চন। ঝলসে ওঠে সেজ-বাতি। এমন কি কানাই ঢাকির চেরাবেতের কাঠি এবং তামা-বাঁধানো ঢাক দেখতে পাই মানস চক্ষে।

আজ সে সব কিছুই নেই।

মা নেই, মায়ের হাসি নেই। আজ নগেনকাকাও ফিরবেন না কলকাতা থেকে তাঁর ক্যান্সিসের ব্যাগ হাতে। বৈঠকখানার ছড়ানো জাজিমের ওপর অষ্টমীর দিন সকালে আর তাঁকে খুঁজে পাব না। ‘মধুস্বতীর’ টুকরো কথা, মাইকেল থেকে আবৃত্তি করে শোনাবার সে মুহূর্ত আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আজ তিনি ৬নগেন্দ্রনাথ সোম।

স্মরণের গোলকধাঁধায় বহু পথে ঘুরে ফিরি। মাত্র পনেরো-ষোলো বছর আগেকারই তো কথা!

এটা ১৯৫৭ সাল। ছুটি মহাযুদ্ধ পার হয়েছে সমাজ। নাগাসাকির মৃত্যু-ভয়ও লেখা হয়েছে ইতিহাসে। কিন্তু মনের যুদ্ধ তো এখনো জারী। স্রোতের পরিবর্তন হয়, সূর্যও পাল্টায়। সেদিনের সে শব্দ কি ঢাকে আছে?

—“নিজাম গ্যেট দেখ লিজীয়ে সোমজী!”

—“নিজাম গ্যেট?”

—“জী ই্যা! আগে হজরৎ খাজা মৈমুদ্দীন চিন্তি কা সমাধি হৈ। আজমের দরগা...”

আজমের দরগা? তাই তো এ নাম—যেন কবে বিশেষ স্থরে শুনেছি! ই, মনে পড়ছে। সেটা ছিল ১৯৪৮ সাল। কোন এক মাসের কোন এক সংবাদপত্রের একটি খবর মনে পড়ছে আজ। এদেশেও সেদিন জ্বলছিল সংহারের ভয়াবহ নৃশংসতা। নাগাসাকির মতই জেগেছিল হাহাকার।

মৃত্যুভয়ে দৌড়ে ফিরেছে মানুষ। সারা ভারতবর্ষের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল হিরোশিমা নাগাসাকির মত। কলকাতা, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর, এলাহাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম—কোথায় না! এই আজমের দরগায়... অহিংসার, শান্তির এই মন্দিরে মৃত্যুভীত সংখ্যা-লঘিষ্ঠরা সেদিন আশ্রয় নেয়।

বাঁটোয়ারার আগে এখানে থাকতো—প্রায় পঁয়ষাট হাজার সংখ্যালঘিষ্ঠ। আজ তাদের পঞ্চাশ হাজার দেশত্যাগী।

হিংসা, ঘেবে মানুষ বাঁচতে পারে না। যারা এ দুটি জিনিস মন থেকে তাড়াতে পেরেছিল তারাই পৌছেছিল, পেয়েছিল নিরাপত্তা এই শান্তির মন্দিরে। চিস্তের দরবেশও যে একদিন জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তির ঐশ্বর্য খুঁজতে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলেন।

সে আজকের কথা নয়। পৃথিবীরাজ চৌহানের রাজত্বকাল।

হিংসা-বিদ্বেষের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ক্লান্ত দুঃখী মৈহুদ্দীন বেরিয়ে এসেছিলেন স্বদূর ইরানের খোরসান থেকে। মানুষকে শান্তি না দিলে হীরা-জহরতের কোন মূল্য নেই। তরবারিরও কিছু মর্যাদা নেই। সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে যারা কাড়াকাড়ি করেছে—তাদেরই দলে দিন কেটেছে তাঁর। ১১৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে এর শুরু হয়। কিন্তু তিনি তো মিথ্যার বৃদ্ধ হয়ে মিলিয়ে যেতে পৃথিবীতে আসেন নি! অস্ত্র ফেলে পয়গম্বরের নাম নিয়ে পা বাড়ালেন। যোদ্ধা হল দরবেশ। এবার আর ক্ষমতা নয়—বড় হোল মমতা। সারা জীবন ধরে সাধনা চলে সত্য, প্রেম ও অহিংসার। কত সন্ধ্যাদীপ জলে আর নেভে, কত দিবসান্তে গোধূলিআলোক রাত্রির ঘন অন্ধকারে লুকিয়ে যায়। কে তার খোঁজ রাখে? পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শাণিত তরবারির অহংকার তো ঠিক ঐভাবেই মুছে যায়! তারা তো স্থায়ী নয়, সত্য নয়!

মানুষের জীবনের সেই স্থায়িত্ব, সেই সত্যকে অমূল্যমান করেই বাকী জীবন কাটে তাঁর। আর সবশেষে একদিন চিরবিশ্রাম নেন—পাষাণের নিরাভরণ শূন্যতা ও স্তব্ধতায়—এইখানে। চিন্তী মৈহুদ্দীনের দেহত্যাগের পর প্রায় আড়াইশো বছর এখানে ছিল কেবল তাঁর মন্ত্র-শিষ্যরা সাধনা নিয়ে। সমাধির উপর কোন ঐশ্বরের ছাপও পড়েনি। কিন্তু তাঁর আদর্শকে মূল্য না দিয়ে, তাঁর স্মৃতিকে সম্মান না দিয়ে যাবে কোথায় মানুষ! দরবারকে ছুটতে হয় দরবেশের পিছনে!

চিন্তী মৈহুদ্দীনের জীবনাদর্শ হঠাৎ একদিন নতুন পথ দেখালে সেখ জালালুদ্দীন বোখারীকে। ছুটে এলেন, তিনি শাস্তিদূতের শূন্য সমাধির পাশে।

এবার আরম্ভ হোল সম্রাটের আসা-যাওয়া। দুর্ধর্ষ পাঠান ও মোগলের জীবনে রক্ত সিক্ত তরবারির গান ছিল। তাদের সমস্ত অহমিকার মধ্যেও হৃদয় কুণ্ঠামুক্ত ছিল না। উত্তেজনা শেষ হয়ে গেলে সকল বীরত্বই হত্যা ও লুণ্ঠনের পাপে ছুঁবিমহ ঠেকে। সে মুহূর্তে দরবারে কেউ সাহসনা দিতে পারে না সম্রাটকে, তাকে ছুটে আসতে হয়—দরবেশের কাছে। তাঁর পা ছুটি খুঁজে না পেলে কবরে মাথা রেখে কৈঁদে বুক খালি করতে হয়। ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে এমন করেই এসেছিলেন মালাবার জুলতান মহম্মদ খিলজী। দরবেশের সমাধি পাশে রেখে তিনিই গড়ে গেছেন এক অল্পম মসজিদ। তারপর এলেন জাহাঙ্গীর, আলমগীর.... আরো কতজন।

দরগা সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রীহোসেন এবং এডমিনিষ্ট্রেটর সাহ সাহেব গল্প করতে করতে নিয়ে চলছিলেন—দরগার এক প্রাস্ত থেকে আর এক প্রাস্তে। কত খিলান, কত গম্বুজ, কত পাথর, কত রং! ভারতের বহু ঐতিহাসিক চরিত্রই এই শাস্তিমন্দিরের সোপান ভেঙ্গেছে। ক্ষুব্ধ অশান্ত অগণিত হৃদয় ছুটে এসেছে কবরের পাশে। জানিয়েছে মনের আর্তি। কিংখাপের আবরণে, আতর ও গোলাপের ঘন গন্ধে দরবেশের সমাধি জেগে আছে।

দরবেশ তো ফকির! গেরুয়া মানে তো সিন্ধের গেরুয়া নয়! ত্যাগের মধ্যে আড়ম্বর নেই মোহন্তরানা নেই,—শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—‘টাকা মাটি মাটি টাকা!’ ঐশ্বর্যের তুলনায় শুদ্ধাভক্তিই ধর্মকে মহত্ত্ব দেয়। সাধক ত্যাগী; কিন্তু ভক্তের ভক্তি বলতে আড়ম্বর বড় হয়ে ওঠে।

একদিকে এ সমারোহ অতীতের আধি ব্যাধি প্রত্যাভিত, প্রত্যাভিত দুঃখী মানুষের চাপা কান্না। দরবেশের আত্মা এদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দুঃখ আর অহুতাপ নিয়ে সবাই এখানে বুক খালি করতে আসে। জাত নেই, ধর্ম নেই, শ্রেণী নেই, আভিজাত্য নেই, অর্থ ও পদের অহংকারও নেই। মালিক-শ্রমিক, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, হিন্দু-শিখ মুসলমান-খৃষ্টান—সকলেই এসেছে দেখলাম। আসবেও সকলে।

জাহানারার তৈরী দালান পার হয়ে এগিয়ে চলেছি। সামনে শাহজাহার জমা মসজিদ। সমস্ত দরগা শরীফের মধ্যে—এক আধটি নয়, পাঁচটি মসজিদ আছে। কোণে কোণে উঠছে আজান, দেখা যাচ্ছে নামাজ।

সমস্ত মসজিদই ধ্যানমগ্ন। তবু একটু যেন তফাত আছে জমা মসজিদে। শ্বেত-পাথরের স্তম্ভতায় এ আরো বেশী আত্মমগ্ন। বহু গ্রীষ্মের উত্তাপে, বহু বরষার ধারায়—এরা বিধ্বস্ত হয়েছে। কালের প্রহারচিহ্ন এখানে-ওখানে।

চোদ্দ বছরের পরিশ্রমে সত্তেরো লক্ষ টাকা খরচ করে যে মসজিদ গড়া হয়েছিল তার সংস্কার করবে কে ?

সাহ সাহেব বলেন—“সরকার !”

—“এ তো পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যে পড়ে না ! তাড়াতাড়ি হবে ?”

পান্টা প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলেন সাহ সাহেব। উত্তর দেন—“আড়াই লক্ষ টাকা খরচের হিসাব দিয়েছি সরকারকে। কাজ হবে এবং কেন শুষ্ক হচ্ছে না—তা বলতে পারব না।”

কাছাকাছি কোথাও ঘণ্টা বাজে। যেন কোন স্থূল বসলো। স্বপ্ন ভাঙ্গে। ওই তো ফেজ্-পরা ছেলের দল দূর মসজিদের গম্বুজ লক্ষ্য করে হনহনিয়ে চলেছে। সামনে তাদের পাঁচশো বছরের পুরানো আকবর-ই-মসজিদ। নতজাহ্নু সম্রাট দীন-ইলাহির কাছে আজ আর সেখানে প্রার্থনা করেন না। গম্বুজে প্রাচীরে সম্রাটের শাহী প্রার্থনা এ যুগে প্রতিধ্বনিত হয় না। আকবর-ই মসজিদের নবীনতম ইতিহাসে মক্তবের মৌলবীজীই নায়ক, ‘আলিফ বেপেতেরই—প্রতিধ্বনি ওঠে। ইতিহাসের নিয়মই এই; আজকের প্রয়োজনের সঙ্গে আগামীকালের মিল নেই।

ভারত ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা জুড়ে আছে আজমের। পাতা উন্টাতেই আসে নতুন দৃশ্যপট। আকবর-ই-মসজিদ আড়ালে পড়ে। কোথায় তার পবিত্র স্মৃতি! এ পথের চেহারাও আর এক রকমের। এ পথের কোলে স্পর্ধায় মুখর হয়ে উঠেছে দুর্গতোরণ।

এ দুর্গ মোঘল সাম্রাজ্যের এক ঘাঁটি। ইংরাজ তখনও ভারতের গদী দখল করতে পারেনি। সেদিন সে সেলাম দেয়, পায় না। ভাগ্যাস্থেষী ঘুরে বেড়াচ্ছে বাণিজ্যের লোভে, মশলা ও মসলিনের সন্ধানে।

এই তো সেই ঐতিহাসিক দুর্গ যেখানে—প্রথম জেমসের হয়ে সনদ চাইতে এসেছিলেন টমাস রো। খুঁজে বেড়াই—কোথায় সে অলিন্দ—১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী সম্রাট জাহাঙ্গীর নতজাহ্নু শ্বেত বর্ণিককে সনদ দিয়েছিলেন যেখানে দাঁড়িয়ে।

কোথায় আজ ‘এম্পায়ার’। কোথায় সেই অতীত গোরবের অনন্ত মুহূর্তগুলি। ইম্পিরিয়ল রোডের ওপর কেবল দাঁড়িয়ে আছে কাল-বিক্ষস্ত দুর্গ-প্রাচীর, সাজানো আছে স্থির কঠিন স্তম্ভ পাষাণ। এরা যেন সেই মোঘল অস্তঃপুরের মুক পাহারাদার। দেখবে শুনবে—শুধু বলতে পারবে না। শাহী

পদক্ষেপের পরিবর্তে আজ সেখানে পুলিশ দারোগার বুটের শব্দ বাতাসে ভাসে।

দৌলতবাগ হয়ে আবার এগিয়ে চলি। মন্থর স্নান হয়ে আসছে সূর্যালোক, শূন্য হয়ে যাচ্ছে দিনের উত্তাপ। স্তব্ধ পাষাণের গায়ে গায়ে ঝরে এ দিনের শেষ আরক্ত উষ্ণতা। ছড়ানো উচু-নীচু পাহাড়ী পথে রঙীন মেঘেরা মাথা মুড়ছে বিশ্রামের আনন্দে। কিন্তু কোথায় সে বিশ্রাম। পথ তো খালি চলেছে। আমরা চলি না তাই নিজের মধ্যেই পৃথিবীর শেষ সীমা দেখি, হারিডাস্ রাই (হরিদাস রায়) কে ভাবি ভারতবর্ষ। বিশ্বাস করি কাপে করে না খেলে চায়ের স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু কলার খোলায় কেমন স্নন্দর চায়ের পাত্র হতে পারে—তা দেখবার জগ্রে একবার শুধু ব্রহ্মপুত্র তীরের গ্রামে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, উত্তর গোঁহাটি হয়ে রঙ্গিয়ার দিকে এগোতে হবে। ভারতবর্ষ সত্যিই অপকুপা।

আজ নবমী। মাত্র একটি দিন বাকী তারপরই তো নিভবে উৎসবের আলো। আমরা সাগরের তীরে এই যে সূর্যাস্ত দেখছি—এর মধ্যে বাঙালীর জীবনের উৎসবাস্তবের বিষণ্ণতাই চোখে পড়ে। আগামী কাল প্রবাসী বাঙালীরাও আমরা সাগরে প্রতিমা ভাসিয়ে যাবে। কিন্তু কালকের জগ্রে এখানে অপেক্ষা করা চলবে না। আজ রাত্রেই ছেড়ে যাব আজমের। পড়ে থাকবে অরণোরাজের এই কল্লনা বিস্তার—হৃদের সবুজ জলরাশি আর তীরের অসম্পূর্ণ বারদারী ও স্বেত-শুভ্র পাষাণ ঢুলছে হৃদের বুকে। শেষ করতে পারেননি শাহ জাঁহা এই বারদারী। রাজদণ্ড কেড়ে নিয়েছিল তাঁর স্বপ্নরাজ্য। প্রকৃতি নিজের হাতেও সাজিয়েছে আমরা সাগরকে। রাজকন্ঠা ছড়িয়ে দিয়েছে নীল পাহাড়ের গুড়না আর সবুজ জলের মেখলা। শেষ সূর্যকিরণের মোনাক্ষরা আরক্ত আভা অসংখ্য আভূষণের মত চমকে উঠছে আমরা দেহজুড়ে।

ওপরেই চীফ কমিশনরের বাড়ী। ঠিক বাড়ী নয়,—প্রাসাদ। গর্গজীর মুখে শুনেছিলাম—চীফ অববাহিত। এও জানতে পারি—এ প্রাসাদে আছে ছাত্রশ্রমিক ঘর। একা এক বিরাট এসেকায় ভেবে পাই না কেমন ভাবে আছেন তিনি। সেখানে তাঁর মন ঢেঁকে কি করে। হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা রাতের প্রহরে নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতার ক্লান্তিকর বিভীষিকা কোনদিনও তাঁকে গ্রাস করতে আসে না? ইচ্ছে ছিল—এ কথার উত্তর চাইব তাঁর কাছে।

ব্রহ্মান্দিরের পুরোহিত বিভূতিপুরী বলেছিলেন—আমরা সাগরের তীরেই

সাজানো হয়েছিল স্বামী দয়ানন্দের চিতা। তীরের মাটি তুলে দেখি কোথায় সেই চিতাভস্ম! মাটি কথা বলে, জানিয়ে দেয়—মহতের জীবন মানে এক চিরন্তন বেদনা। সক্রটিসকে হেমলক নিতে হয়, খুঁট ফ্রুশে যান, সভারানোলা, বাপু—এদের হত্যা করা হয়। স্বামী দয়ানন্দকেও তাই বিষ দেওয়া হয়েছিল। তর্কে পণ্ডিতরা সেখানে হার মানলেন, এষণা যেখানে সাথী হল না, শক্তি যেখানে সীমিত মনে হয়,—কুপমণ্ডুক সংকীর্ণতা সেখানে অহংকারে উদার মানবতা সব কিছু অস্বীকার করে। দয়ানন্দের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। ভ্রষ্ট সংকীর্ণ সমাজপতি কল্যাণের চেয়ে অহংকারকে বড় বলে হিন্দুধর্মের মালিক হতে চেয়েছিল, গণিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামী সরস্বতীকে দিয়েছিল বিষ। প্রলুপ্ত সেবিকা সেজে দেশে যে ক্ষতি করে—মৃত্যুর পূর্বে নিজের মুখেই তার স্বীকৃতি রেখে যায়। অল্পশোচনার অশ্রুজলে আত্মাকে পবিত্র করতে চায়... আত্মহননে উত্তত হয় সে কলঙ্কিনী।

মহাপুরুষের চিতাভস্মে মাথা ঠেকিয়ে মেনে নিই মহতের জগ্রে আছে দুঃখ আছে বঞ্চনা। মনে মনে বলি—জীবনের সমস্ত দুঃখ সকল বঞ্চনা পার হয়ে মৃত্যুপণ করে আদর্শের পথে এগিয়ে চলেছো বলেই তুমি মহান, তুমি দ্রষ্টা।

এ তীর ছেড়ে যেতে হবে। সূর্য তো অস্ত গেল। দেখতে দেখতে গাঢ় হবে অন্ধকার। জনমানবহীন আশ্রয় সাগরের বুকে জাগবে বাতাসের কান্না।

ভালো লাগে না সে চাপা কান্নার সুর। হারিয়ে যেতে দেবো না মনের সহজ আনন্দের সুর। ফিরতে চাই এ পৃথিবী থেকে।

ওদিকে গান্ধী-অধ্যায়ন কেন্দ্রে যাবার সময় হয়ে আসছে। সভার আয়োজন করেছেন উত্তোত্তারা; শ্রদ্ধেয়র মুখ থেকে গান্ধীবাদ সম্পর্কে কিছু শুনতে চান। তাঁদের বিশ্বাস বাপুর সহকর্মী হিসাবে তাঁর আদর্শের নিগূঢ় সত্যটি প্রগাঢ় হয়ে আছে শ্রদ্ধেয়র জীবনে। মিথ্যা অল্পমান নয়। মহাত্মার ইঙ্গিতকে যারা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তুলে নিয়েছিলেন—ইনি তাঁদেরই একজন। মনে পড়ছে এঁর মুখে শোনা গল্প। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কোন এক প্রস্তাবে বাপু স্বাক্ষর দিচ্ছেন আর তা দেখে প্রস্তাবের মূল্য নির্ণয় করে তিনি বলছেন—‘বাপুর স্বাক্ষর থাকলেই সব প্রস্তাব মানতে পারা যায় না।’ বাপু দেখে হাসছেন সন্তোষের হাসি; এমন মালুষ, এমন সহকর্মীরই তো প্রয়োজন যে হবে না অন্ধ ভক্ত, ব্যর্থ স্তাবক।

সাহিত্যিক, কবি, আইনজীবী, ঐতিহাসিক, যুবক-প্রৌঢ় নর ও নারী সবাই

বসেছে এক হয়ে এ সভায়। পরিচয়ও হয় বহু মানুষের সঙ্গে। সকলের নাম আজ মনে করতে পারছি না। শুধু ঐতিহাসিক পণ্ডারীজী আর কবি শ্রী-সুভাগ যোশীর মুখই মনে আসছে। শ্রদ্ধেয়ও অনেক কথা বলেছিলেন সে সভায়। সাংবাদিক নই, সব কথা তাই মনে পড়ে না। কিন্তু কিছু কথা স্মরণ করতে পারি।

সভাগৃহের চারিপাশে মাজানো ছিল গান্ধী ও তাঁর আদর্শের প্রচারকদের বহু বই...বহু লেখা। শ্রদ্ধেয় ঘরের চারিপাশে তাকিয়ে আরম্ভ করেন— পাঠাগার গড়লেই গান্ধীবাদের অধ্যয়ন সার্থক হবে না। চিনতে হবে গান্ধীজীর পথকে, চলতে হবে, করতে হবে সেই অনুযায়ী। দরিদ্র নারায়ণের সেবা করবার জন্তেই উৎসর্গ করতে হবে এ জীবন—ঠিকই! কিন্তু দরিদ্রকে দারিদ্র্যের কলঙ্কে ডুবিয়ে দিয়ে নয়, নারায়ণের মত প্রতিষ্ঠিত করে। দরিদ্র নারায়ণের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। জুঃথের বিষয় গান্ধীর নাম আজ শুধু একটা প্রচারের চাপরাশ। নিজের স্বার্থ তাঁর আদর্শের শিলমোহর দিয়ে চড়া স্বদে বাজারে খাটিয়ে ফিরছি। দেবতাকে ভোগ চড়াচ্ছি নিজেদের রসনা পরিতৃপ্তির জন্তে। আমাদের শাস্ত্র অথচ মানুষকে সতর্ক করছে—“নিজের জন্তে যে রাঁধে সে চোর! পচন্তি যো আত্মকারণাং স্ত্যোন এব স...”।

কোন এক বিখ্যাত নেতা, শ্রদ্ধেয় হাসতে হাসতে বলেন, একদা তাইন-স্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে গেসলেন। বিজ্ঞানবীর তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, —“গান্ধীজী বলতেন হিংসার দ্বারা যে স্বাধীনতা আসতে পারে আমি তা চাই না। আপনিও কি এই কথা বলতে পারেন? বলতে পারেন স্বাধীনতা বিপদাপন্ন হলেও আপনারা হিংসার আশ্রয় নেবেন না?”

জবাব এসেছিল,—না, “পারি না।”

আইনস্টাইনকে জবাব দিতে হয়েছিল, “এইখানেই গান্ধীজীর মহত্ব। নিজের আদর্শের জন্ত সবকিছু ত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।” আজ পাঁচ বছর আগে যখন আমেরিকা ও ইউরোপ তিনি ঘুরছিলেন সে সময় সারা ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মনীষীর সঙ্গে ভারতবর্ষ নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়। ডাঃ কিলগ্যাট্টিকের কথা উল্লেখ করে—শ্রদ্ধেয় বলেন, —“তাঁর মুখে শুনেছিলাম ভারতের সংগঠনের কাজ, নব নির্মাণের দায়িত্ব ভারতকেই তুলে নিতে হবে। আমরা সহায়তা করতে পারি মাত্র। এ কথার মধ্যে আসল ইঙ্গিতটা লজ্জার, দুর্বলতার। আজ প্রায় তিন হাজার ছেলে পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা পাচ্ছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই সব ব্রতীদের কাজে

আনতে পারছি না কেন ? বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ডেকে এনে কেন আমাদের নির্মাণের কাজ চালাতে হচ্ছে ? অথচ এই দেশের ছেলে বিদেশের মাটিতে, গবেষণাগারে নাম কিনছে, প্রশংসা কুড়োচ্ছে । বিদেশী এক্সপার্টদের প্রয়োজন কি ? এদেশে তাহলে কি মন্ত্রী ও আইন সভার সদস্য হওয়ার এক্সস্পার্টস্‌ ছাড়া আর কেউ নেই ?

‘উপনিষদে আছে—নামের মোহ ত্যাগ করো । নামের মোহ থেকে মুক্তি পেলেই ভগবান ও জীবের মধ্যকার ব্যবধান মিলিয়ে যায়...আড়াল ভেঙ্গে পড়ে । আমাদের সে মোহমুক্তি কবে ঘটবে ? বাপুর জীবন কি মনের আকাশে আজ শুধু জ্যোতিহীন নক্ষত্র ? বর্তমান সমাজব্যবস্থা নিয়ে তাই নতুন পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে । হিংসার ওপর সমাজ দাঁড়াতে পারে না । অজ্ঞের অহংকারে রাষ্ট্রের বিকাশ নেই । অজ্ঞের অহংকার সুসংগঠিত হিংসারই নামান্তর । ফৌজ নিয়ে, সন্ত্রাস জাগিয়ে কোন জাত ইতিহাসে বেঁচে থাকতে পারে না । হিটলার চেয়েছিলেন । কয়েক হাজার সৈন্যের সংগঠিত হিংসায় রাজ্যের অধিকার তিনি কায়ম রাখতে চেয়েও কি পেরেছেন ? হিংসার এই অভিশপ্ত পৃথিবী থেকে বাপু আমাদের বেরিয়ে আসার পথ দেখিয়ে গেছেন । সে পথে না এগোলে গান্ধীবাদকে আমরা তো বুঝতে পারব না ।

উদ্দেশ্যহীনতা নয়—চাই

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

জাতীয় প্রস্তুতির জন্যে

দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে

কাজ করুন ।

নবমীর রাত্রে আরতির ঢাক বেজে ওঠে । আর ভালো লাগে না এ সভা । মনের এক একটা মুহূর্ত আছে যার ওপর মাছুষ বেঁচে থাকে, ছড়িয়ে ধরে নিজেকে । সে মুহূর্ত হারিয়ে ফেলি বলেই আমরা বাঁচার আনন্দ পাই না । সভা থেকে বেরিয়ে পড়ি পূজা-মণ্ডপের উদ্দেশ্যে । ডাঃ ভট্টাচার্য সকালে এসেছিলেন নিমন্ত্রণ দিতে, বারোয়ারী কমিটিও অতুর্বাধ করে গেছেন । কত আপনজন এঁরা । আপন হয়ে না এলে তো মাছুষকে আপন করা যায় না ।

পথে বিরাট জনশ্রোত। এতো বাঙালী যে এ শহরে আছে অল্প সময়ে এলে বুঝতে পারা যায় না। পূজা-মণ্ডপের দিকে যত এগোই ভিড় তত বাড়ে। সঙ্গিনী তো ভিড়ে হারিয়ে যাবার উপক্রম করে। সঙ্গী-সাথীর অভ্যর্থনা থাকলেও দেবীর কাছে পৌঁছতে সাহস পাই না। দূর থেকেই দশভূজাকে প্রণাম জানাই। ঠেলা-দেওয়া আর ঠেলা-খাওয়া, বুঝতে পারি আমাদের জাতের এক বিশেষত্ব।

রাত্রি দশটা চল্লিশে আমাদের গাড়ী। হাটুগুি ফিরে যাওয়া চলবে না। ওদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। ডেপুটি কমিশনার অশোক মুস্তাফীর বাড়ী মাছ মাংস খেয়ে মুখ পান্টাব...তারপর এখান থেকেই ট্রেন। হাটুগুিতে মালপত্র উঠবে।

এইভাবে আজমের গেল...হাটুগুি গেল...। ওদের সকলের যত্ন স্নেহ-প্রীতির মধ্যে কিছু যেন ফেলে যাচ্ছে হৃদয়...। মন থেকে থেকে কাতর হয়। গাড়ী ছুটে চলেছে। পুরানো দিনের সেলুনে একটি কামরায় শুধু আমরা তিনজন। বিছানা বিছাই...জানালা বন্ধ করে দিই। আর দেখব না ফেলে-যাওয়া পথ। ভালো নয় যাত্রিকের পিছন টান। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ গ্রন্থ

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর	শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাট্টার
আজব জীবিকা	৩.০০ ॥ মায়াবত্তী ২.৫০ ॥
জীবন-মুহুর্ত ২য় মুঃ	২.৫০ ॥ অভিসার ৩.৫০ ॥
অরুণা হালদারের	রণজিৎ রায়ের
তারার	২.০০ ॥ ফসল ৩.৫০ ॥

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সেই আশ্চর্য রাত	৩.০০ ॥ শাদা-কালো ৩.০০ ॥
-----------------	-------------------------

বিমল দত্তের

ঋষি দাসের

কাশ্মীর প্রিমেস

৩য় মুদ্রণ
৪.০০ ॥

মা ৩য় মুঃ

২.৭৫ ॥

পরিমল গোস্বামীর

(বারট্রাউ রাসেলের
The Conquest of Happiness)

সুখের সন্ধানে

পাঁচ টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো



জাহ্নবী সভ্যতা ও সিনেমা

রবীন্দ্রনাথ

এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। দেখলুম, তার প্রধান জিনিসটাই হচ্ছে দ্রুত লয়। ঘটনার দ্রুততা বারে বারে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা। ছেলে বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন এতে মতিয়ে রেখেছে। তার মানে হচ্ছে সকল বিভাগেই বর্তমান যুগে কলার চেয়ে কারদানি বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন-সাধনের মুগ্ধ-দৃষ্টি কারদানিকেই পছন্দ করে। সিদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে সাক্সেস্ বলে, তার প্রধান বাহন হচ্ছে দ্রুত নৈপুণ্য। পাপকর্মের মধ্য দিয়েও সেই নৈপুণ্যের লীলাদৃশ্য আজ সকলের কাছে উপাদেয়। সুখমাকে কল্যাণকে উপলব্ধি করবার মতো শাস্তি ও অবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হতে চলল; সিদ্ধির ঘোড়দৌড়ে জুয়োখেলার উত্তেজনা পশ্চিমদিগন্তে কেবলই ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমমহাদেশের অন্ধকার পটের উপর আবর্তমান পলিটিক্সের দৃশ্যটাকে একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্ছবির মতো দেখতে হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, দ্রুতলয়ের প্রতিযোগিতা। জলে স্থলে আকাশে কে একটুমান্ন এগিয়ে যেতে পারে তারই উপর হারজিত নির্ভর করছে। গতি কেবলই বাড়ছে, তার সঙ্গে শান্তির কোনো সম্বন্ধ নেই। ধর্মের পথে ধৈর্য চাই, আত্মসম্মরণ চাই। সিদ্ধির পথে চাতুরীর ধৈর্য নেই, সংযম নেই; তার হস্তপদচালনা যতই দ্রুত হবে ততই তার ভেলকি বিস্ময়কর হয়ে উঠবে—তাই জাহ্নবীর সভ্যতায় বেগের পরিমাণ সকল দিকেই এত বেশি ত্বরান্বিত যে, মানুষের মন অসত্যে লজ্জিত ও আপাতসম্ভাবনায় শঙ্কিত হবার সময় পাচ্ছে না।

—৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫।

জাহাজ ক্রাকোভিয়া।

পশ্চিম-ঘাতীর ডায়ারি। পরিশিষ্ট।

সংবাদ ও সাহিত্য

শচীন্দ্রলাল ঘোষ

আমি সাংবাদিক, অভ্যাস ও আচারবশে সাংবাদিক। এবং সাংবাদিক হতে হলে যতটুকু সাহিত্যিক হওয়া দরকার, ততটুকুই সাহিত্যিক। অর্থাৎ, মৌলিক কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্যসৃষ্টি আমার কর্ম নয়, পেশা নয় এবং নেশাও নয়।

সংবাদপত্রের মুখ্য কাজ দৃশ্যতঃ সংবাদ-পরিবেশন করা। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন, সংবাদপত্রে সংবাদ সমালোচনার স্থানও ছোটো নয়। বস্তুতঃ, সংবাদপত্র দৈনিকই হোক অথবা সাময়িকই হোক, এর সমালোচনার অংশটিই সাহিত্যের সীমানায় পড়ে। এ সমালোচনা জীবনের সকল দিককেই জড়িয়ে—কেবলমাত্র ঘটনার সংবাদে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের জীবনের জটিলতা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে—এবং স্বাধীনতালাভের পর দ্রুতবেগেই বেড়ে চলেছে। সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ব্যক্তিজীবন—তার কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু সমাজের ভিত্তিভূমি স্বাধীনতার আবহাওয়ায় এবং চাপে যতই বিস্তৃত উদার হচ্ছে সমস্তার সংখ্যা ও জটিলতা ততই বেড়ে চলেছে। আমাদের আগের যুগের বাসিন্দারাও অনেক বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। বৈপ্লবিক চিন্তা তাঁদেরও ছিল, একদিকে যেমন রক্ষণশীলতার অচলায়তন রক্ষার জন্তু তীক্ষ্ণধার কলম নিয়ে একদল উত্তত ছিলেন তেমনি সংস্কারকের দলও কবচকুণ্ডল পরে তৈরি ছিলেন। উভয়পক্ষেই কিন্তু একটি জিনিসের অভাব ছিল না—সেটি হল নিজেদের সংকল্প এবং সিদ্ধান্তের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস। আজ সমস্যা বাড়ছে এবং পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠছে কিন্তু পূর্ববর্তীদের বিশ্বাসের বর্মটি নেই। অন্নসংকট বস্ত্রসংকট ইত্যাদি দুকুড়িসাতের সংকটের চেয়ে গুরুতর এই বিশ্বাসের সংকট। আত্মাং সততং রক্ষ্যে দারৈরপি ধনৈরপি—এই একটি বিশ্বাস ছাড়া সমাজের সকল বিশ্বাসের বাধনই শিথিল হয়ে পড়েছে। প্রাচীন বহু বিশ্বাস—যথা জাতিভেদ, বর্ণভেদ, ভূস্বামীর অধিকার, পিতামাতার অধিকার, যৌথপরিবারের মাধুর্য এবং অসামান্যতা, সতীত্ব, ধনিকের বিশেষ মর্যাদা ইত্যাদি সংস্কারমূলক বিশ্বাস তো নতুন অবস্থার ক্রমবিবর্ধনশীল চাপে তলিয়ে গেছে কিন্তু তার জায়গায় অল্প কোনো নতুন বিশ্বাসও দানা বাঁধছে না। একে ধার্য বৈপ্লবিক অবস্থা বলতে চান বলতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় এ একটা সংশয়মথিত অবস্থা।

সংশয়বাদ নয়—অব্যবস্থিতচিত্ততার স্থূলত অবস্থা। অচলায়তন নয়—আয়তন-হীনতা।

মোটের উপরে, সমাজের চিন্তার পরিস্থিতি হচ্ছে, যাকে মিলিটারি ভাষায় বলা হয় ফ্লুইড, অর্থাৎ তরল। কম্যুনিজম সোশ্যালিজম ধনিকতন্ত্র শিল্পায়ত সমাজসভ্যতা—এসব কী জিনিস না বুকেই এগুলির সমর্থকদের বেশীর ভাগ সরব। এদের বিরুদ্ধবাদীরাও তাই। অথচ এর যে-কোনোটাই আমাদের সনাতন ও বর্তমান সমাজব্যবস্থার চেয়ে আকাশপাতাল তফাতে।

সংবাদসাহিত্যের পরিধি এই সমস্ত সমস্তাকে নিয়ে। বালাসরস্বতীর নাচ থেকে ক্রুশফ, মাওসেতুং কেনেডির নীতি এবং গতিপ্রকৃতি সবই সংবাদ-সাহিত্যের উপজীব্য। বিশ্বাসের কমতির যে অহুযোগ আমি সাধারণ বাঙালীর সম্পর্কে করেছি আপনারা বিদগ্ধজন তা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও করতে পারেন জানি এবং তা করা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, সমালোচকের সমর্থন, বিরুদ্ধতা, বিশ্লেষণ, উপপত্তির নৈতিক ভিত্তি কী তা জানতে চাইবার অধিকার সকলের আছে। যে সন্দেহ দোলায় সাধারণ বাঙালী ভুলছে আমরা সাংবাদিক-সমালোচকরাও সে দোলায় দোল খাচ্ছি কিনা এ-বিচার আমি করতে অক্ষম। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, কিন্তু প্রাচীন একটা জনশ্রুতি আছে, কাকে কাকের মাংস খায় না। সমালোচকদের সমালোচনা করা আমার পেশাধর্মের বিরুদ্ধে। এ-লৌকিক ধর্মে আমার বিশ্বাস অচল।

এতক্ষণ মেকথা বললাম এটি হল সংবাদসাহিত্যের মূল কথা, মর্মের কথা। জগতের যাবতীয় বিষয়ে আমরা সাংবাদিকরা যেসব মতামত ছাড়ি তার পশ্চাতে বিশ্বাস এবং যুক্তির ভিত্তিভূমি না খুঁজে পেলে আপনারা নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন যে আমরাও আর পাঁচজন বাঙালীর মতো সোভার-বোতলধর্মী —মানে, ফস্ করে গেঁজে উঠি, তলানিটা পান্‌সে। তবে যাই হোক, আমাদের মনস্থিত্য আপনারা বিশ্বাস না থাকলেও আমাদের জনমনোরঞ্জনের ক্ষমতায় আপনারা আস্থা অটুট আছে নিশ্চয়ই! আধারে আবৃত ঘনসংশয়ের মধ্যে এটিই একমাত্র আলোকশিখা।

সংবাদসাহিত্য কালজয়ী নয়। অবশ্য সংবাদপত্রে যে-আলোচনা-সাহিত্য প্রকাশিত হয় তার কিছু কিছু—বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাংবাদিককর্মের মতো এক-একটা মণিবিন্দু—চিরন্তন সাহিত্যের খাসদরবারে স্থান পেয়েছে। কিছু-সংখ্যক সাংবাদিকও কালজয়ী হয়ে ইতিহাসে বেঁচে আছেন কিন্তু সে তাঁদের

সাংবাদিক রচনার জন্ম নয়, তাঁদের চরিত্রের মহিমার জন্ম অথবা দেশের ও দশের প্রগতির পুরোধা হিসাবে। সংবাদসাহিত্যের প্রধান কাজ হ'ল জনসাধারণের মনে সমষ্টিচিন্তা, সামাজিক হিতাহিতের চিন্তা, গোষ্ঠীজীবনের বহুমুখী চিন্তাকে জাগ্রত উদ্ভুদ্ধ করা। সাময়িকতার দোষ ও গুণ দুইই এর আছে—কিছু সমালোচনা নিঃসন্দেহে নশ্বর, কিছু বা দূরদৃষ্টিতে দেখলে অধিকতর স্থায়ী। তবে সাংবাদিকরা জনমানসের ক্ষেত্রে ভাবনার বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছেন এ দাবি করলে হয়তো আপনারা আপত্তি করবেন না। আবাদ-করা ক্ষেত্রে হয়তো সোনা ফলে—অন্ততঃ সেকথা কল্পনা করে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। একাজ আমরা কতটা নির্ভীকভাবে, কতখানি নিঃস্বার্থ সত্যস্বরূপে করতে পারছি তার বিচার অবশ্য দশজনের হাতে। গণদেবতার হাতে আমাদের বিচারের ভার তুলে দিয়েই আমরা সন্তুষ্ট।

আর-একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হল সংবাদসাহিত্যের ভাষা। দশজনের সামনে বক্তব্যটি তুলে ধরাই এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সে-দশজনের সকলেই, কিছু বিদগ্ধ নয়, স্তবরাং সাংবাদসাহিত্যের ভাষায়ও বৈদগ্ধ্যের চেয়ে প্রাঞ্জলতার স্থান বড়। পাঠকের কাছে সহজস্বরে, গভীর কথা বলবার জন্ম সাধনা সাংবাদিককে করতেই হয়। কোন কথাটি সুন্দর তা সাংবাদিকের সজ্ঞানের বস্তু নয়—কোন কথাটি বহুজনবোধ্য তা-ই সাংবাদিকের কাম্য। সাহিত্য পত্রিকার এ-বালাই নেই, তার বিচরণক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণতর এবং যেসব পাঠককে উদ্দেশ্য করে তা প্রচারিত হয় তাঁরাও বিদগ্ধ। পাঁচমিশেলি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার খোঁজ সুগম ভাষার উদ্দেশ্যে। সেদিক থেকে বাংলা সংবাদপত্র ভাষাকে অনেক দিয়েছে এবং দেবেও। সংবাদপত্রের আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ-সাধনা চলছে। এ সম্পর্কে পণ্ডিতজনের গবেষণার অনেক প্রয়োজন এবং অবকাশ আছে, সে-ভার তাঁদের উপরে ছেড়ে দিয়ে মোটামুটি ছ'একটি কথা বলেই এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করব।

সংবাদপত্রের ভাষা নিয়ে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গত কলকাতা অধিবেশনে স্বর্গত হুমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-মশায় তাঁর অভিভাষণে আলোচনা করেছিলেন। কথাভাষার ব্যবহারে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। যারা কথাভাষার পক্ষে এবং যারা বিপক্ষে উভয়েই কিন্তু এই বিষয়ে একমত যে ভাষা বহুজনের পক্ষে সুগম হওয়া দরকার। কথা বা সাধু বিভক্তির ব্যবহারেই ভাষা সহজ সাবলীল হয় এ দাবি কেউই করেন না। যে রীতিতে বললে

লেখকের স্ববিধা হয় সে-রীতি অনুসরণ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত, এই আমার নিজের মত। তবে একথাও এসঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে যে বিশেষ বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্রে—যথা শিল্প, কারুকলা, অভিনয়, চলচ্চিত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে—একটা বিশেষ ধরণের বুলি গড়ে উঠছে যা প্রাঞ্জল নয়, আড়ষ্ট, ইংরাজীতে যাকে বলে Specialised jargon তার অভিমুখী। সাহিত্য-সমালোচনার খাসমহলের কথা ছেড়েই দিচ্ছি কারণ সেটি লেখকদের সংরক্ষিত ক্ষেত্র। ভালোমন্দ যা বলার তা তাঁরাই বলবেন। মোটের উপরে চলমান জীবনের গতির সঙ্গে যোগ রেখে সমাজচিন্তার যে প্রকাশ তাই সত্যিকারের সংবাদসাহিত্য। একে প্রচারধর্মী বলুন, আপত্তি নেই; দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্য, কমাদরের সাহিত্য বলুন, তাতেও খেদ নেই। কিন্তু বর্তমান সমাজে এর শক্তিমত্তা কেউই অস্বীকার করবেন না আশা করি।

অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন,
ব্যয়বাহুল্য বর্জন করুন,
জাতীয় প্রস্তুতিকে
শক্তিশালী করুন।

সংবাদসাহিত্যের এই শক্তিমত্তা থেকেই আজকের উচ্ছল পরিস্থিতিতে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন জেগেছে। একটা প্রকাণ্ড কর্তব্যও। সমগ্র দেশ আজ আত্মরক্ষার উত্তমে ভরপুর, চীনা হামলাদারদের ভারতের উত্তর-সীমান্তের বাইরে ঠেলে দেবার জগ্ন বন্ধপারিকর। দেশপ্রেমের আবেগ জেগেছে সকল দেশ জুড়ে। সংবাদপত্র সে-আবেগকে স্থিতিহীন সবল রাখার দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু সে আবেগ : শুধু উচ্ছল-উদ্দাম হলেই চলবে না, তাকে প্রতিরক্ষার কূর্মকাণ্ডে সংহত করার দায়িত্ব সংবাদসাহিত্যিকের বয়েছে। কী রক্ষার জগ্ন আজকার সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি? সে'কি কেবল মাত্র ভারতের ভৌগোলিক সন্ধার অক্ষুণ্ণতা, না তার চেয়ে বড় কিছু? সেকথার উত্তর আমাদেরই জোগাতে হবে।

ভারতের জনসাধারণ এতদিন যে শুধু সমরায়োজন এবং সামরিক শক্তি

সংগঠনের দিকেই অমনোযোগী ছিল তা নয়। আজকের বৃহৎ জগতে জাতীয় সংহতির অমোঘ শক্তিসাধনায়ও শিথিল হয়ে পড়েছিল। শত্রুর আক্রমণে আমাদের রাষ্ট্রের সেই বর্মের ছিদ্র ধরা পড়েছে। আজ এক শত্রুর হিংস্র নগ্নরূপ দেখতে পেয়েছি—কিন্তু শত্রু আর অহিতসাধক কি ওই একটাই? আমাদের জাতীয় সংহতি দুর্বল এ সন্দেহ করলে অল্প শত্রুরাও কি অসাধু স্বেচ্ছাচ্যুত নিতে চাইবে না? সুতরাং আজকের প্রস্তুতি স্বল্পমেয়াদী হতে পারে না। শক্তিমত্তার সাধনাকে বিরামহীন হতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, কী সেই স্বাধীনতা যাকে রক্ত দিয়ে, মাথার ঘাম দিয়ে রক্ষা করব? সে-স্বাধীনতা তো বাঙালীর স্বাধীনতা কিম্বা আসামবাসীর বা অযোধ্যাবাসীর স্বাধীনতা নয়, তা সর্বভারতের স্বাধীনতা, সকলের সাধারণ, সমভোগ্য স্বাধীনতা। তার মূল রয়েছে আমাদের অতীত ঐতিহ্যে, তার উর্ধ্ব বৃদ্ধির গতিপথ রয়েছে ভবিষ্যতে। তার প্রাণরস আমাদের আত্মশক্তিতে। অতীতকে বাদ দিলে চলে না কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়ে বেঁচেই থাকা যায় না। আজকার পরিস্থিতিতে তাই জনসংযোগের পুরোধা সংবাদপত্রের একটা বিশেষ কর্তব্য আছে যা রাজনৈতিক নেতাদের কর্তব্যের চেয়েও বেশী নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের কর্তব্যের চেয়েও বেশী বিচারশীল। সংবাদসাহিত্য যদি সেই কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে যেতে পারে তবেই তা সার্থক হবে।

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী

প্রণীত

- * নন্দনতত্ত্ব ৫'০০
- * দর্শন-চাৰিত্ৰ্য ৩'০০
- * রবীন্দ্রদর্শন-অবলীক্ষণ ৮'০০

- * An Enquiry into the Nature and Function of Art Rs. 10/-
- * Studies in Aesthetics. [In the Press]

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা

রঞ্জিত সিংহ

‘কুলায় ও কালপুরুষ’-এর মুখবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টত আক্ষেপ করেছিলেন যে তিনি নাকি একাধিক বিবেচকের বিচারে দেশদ্রোহী। বস্তুত এই সব মতামত ঋীদের মুখনিঃসৃত, অল্পসন্ধান করলে দেখা যাবে তাঁদের অনেকেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। ব্যক্তিগত জীবনে আমি ত কয়েকজন স্বনামধন্য সাহিত্যের অধ্যাপককে সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অল্পরূপ মন্তব্য পোষণ করতে শুনেছি। অবশ্য তখন এই বলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির আশলে ষড়রিপুর আক্রমণে সর্বদাই বিপর্যস্ত। কেননা, সাহিত্যবিচারের নাম নিয়ে স্ততি, অনুকম্পা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি কতগুলো ঘৃণিত মানবানুভূতিকে প্রাশ্রয় দেওয়া ছাড়া বাংলাদেশে সমালোচনাসাহিত্যে আর কি হয়েছে।

পক্ষান্তরে এও জানি যে সংকবির পক্ষে পাঠকের অভ্যন্তরৈক্যতাকে তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রাতিশ্রিক অল্পভূতির অনিবার্য তাগিদ নিহিত থাকায় তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে এমন কতগুলো লক্ষণ দেখা দেয় পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হতে যা বেশ সময় লাগে। বস্তুত, সমসাময়িক কালের পাঠকের কাছে কবি যদি প্রশংসাভাজন না হন, তবে তাতে যে সব সময়েই আক্ষেপ করার কিছু আছে তা নয়, আশ্বাস করবার মতও অনেক কিছু থাকতে পারে।

অন্তত, সাহিত্যবিচারে সাহিত্যের ইতিহাসকে ঋরা মানদণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথকে দেশদ্রোহী বলে তাঁদের মনে হবে না। মনে হবে, এই কবির কবিতায় প্রাতিশ্রিকতার লক্ষণ সার্বত্রিক হলেও এঁর সমগ্র মানসিক গঠন ও কলাকৌশল বাংলা সাহিত্যেতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ নামক দুর্বোধাতার যে-জনশ্রুতি সাহিত্যসমাজে আজ প্রচলিত আছে তার ঘোর কাটিয়ে কেউ যদি তাঁর কবিতা-পাঠে অগ্রসর হন তবে তাঁর নিশ্চয়ই মনে হবে যে ইনি এমন একজন বাঙ্গালী কবি, সাহিত্যেতিহাস ঋর নখদর্পণে। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ আশী বৎসরের নিরন্তর সাধনায় যে-লিরিকতা আমাদের সাহিত্যে মর্ষাদাবান হয়েছিল, সুধীন্দ্রনাথ কোথাও তাকে অসম্মান দেখান নি। শুধু লিরিকের মধ্যে যে অতি-লালিত্য তথা তারল্যের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাকে তিনি সর্বদা

স্বরূপে রেখেছিলেন। ফলত রবীন্দ্র-সমসাময়িক, এমন কি রবীন্দ্রনাথও অতিলালিত্য ও অতিকথনের যে-বর্জনীয় ক্ষীতি চোখে পড়েছিল তা সর্বদাই সূধীন্দ্রনাথকে শিল্পে সংঘমের আবশ্যিকতা সম্পর্কে সজাগ করিয়ে দিত। উপরন্তু দেশ ও কাল ভেদে মানুষের অনুভূতির ভাষা পাণ্টে যেতে থাকে, জীবনের মূল্যবোধে পরিবর্তন আসে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা যে-পূর্ণের স্পর্শে আলোকিত, সূধীন্দ্রনাথ সে আলোকিত সমন্বয় উপলব্ধি করবার জ্ঞান ব্যাকুলতা দেখান নি। আধুনিক মানুষের বিবেকী দ্বিধায় বিচলিত রূপ যেকালে আমরা হ্যামলেটের বিয়োগান্ত মহিমায় খুঁজে পেয়েছি, সূধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহের আগন্তে সেই একই অনুভূতি বরাবর কার্যকরী হয়েছে। এবং এ ধরনের অনুভূতির অনিবার্য ফলশ্রুতি যেহেতু চিন্তাশুদ্ধিতে, সূধীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠের দায়িত্ব তাই ভিন্নতর। আসলে আন্তিক্যবোধ হচ্ছে মানুষের সনাতনী চিন্তা-বিক্ষেপ-কিন্তু যে বিবেকী দ্বিধায় আজকের দিনের প্রতিটি মানুষ উৎকণ্ঠিত তার প্রতিষ্ঠা মানুষের অতিজাগ্রত বুদ্ধির ওপরে। ফলত সূধীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রযুক্তিতে শৃঙ্খলার অভিব্যক্তি অসাধারণ, পরিমিতিবোধের প্রতি আগ্রহ ঐকান্তিক। তাই রবীন্দ্রনাথের সংশ্লেষণী বুদ্ধি ও আপাতশিথিল রচনারীতির দোদাঁড় প্রতাপের মধ্যেও তিনি বলতে পেরেছিলেন :

“মালোকা, মাযুজ্য, মঙ্গ, সে কেবলই সম্ভব স্বপনে

বিসংবাদ, বিকর্ষণ, আর্ষমত্য জাগ্রত জগতে ॥”

এই ‘জাগ্রত জগতে’-র অধিবাসী ছিলেন সূধীন্দ্রনাথ। তাই ‘অর্কেষ্ট্রা’র বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টাচিন্তে বাধলেও লেখকের অকপট অনুভূতির প্রকাশ যেহেতু তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, সে গ্রন্থ ছাপানোর সম্মতি দিতে তিনি তাই দ্বিধা করেন নি।

এবং এই স্বরূপে বেন্ জনশন যেকালে আমাদের গুনিয়েছিলেন যে কবির বিচার একমাত্র শ্রেষ্ঠ কবিরই সম্প্রদায় তখন সম্ভবত একটা কথার ওপরেই তিনি বিশেষভাবে জোর দিতে চেয়েছিলেন যে, সাহিত্য প্রবন্ধ রচনা আর অগ্রান্ত প্রসঙ্গে প্রবন্ধ রচনা একই মানসিকগঠনের কাজ নয়। এই মন্তব্যের সবচেয়ে বড় নজির রয়ে গিয়েছে অধ্যাপিকা শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনাগ্রন্থে। সে গ্রন্থের আর যাই গুণ থাক বা না থাক এবং গ্রন্থ-রচয়িত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় যে সম্মানেই ভূষিত করুন না কেন শ্রীমতী ত্রিপাঠী একটি জিনিস উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি যে কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তি ‘একেনৈব প্রযত্নেন নির্বৃত্যন্তে’। তাই কবিতার বিচারেও

প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির পৃথক মূল্যায়ন সম্ভবপর হয় না। কারণ কবিতার শব্দ কবির অনুভূতির আবিষ্কার। আধুনিক যুগের একটি অত্যন্ত বুদ্ধিসচেতন মানুষের চিন্তায় যে কর্মে ও বিবেকী দ্বিধার দোলাচলতা লক্ষিত হয়—যার পরিণাম নিঃসঙ্গতাবোধে, স্বধীন্দ্রনাথের কবিসত্তা সেই অনুভূতিরই জন্মস্থল। ফলত যে বয়সে কবি স্বভাবত আবেগনির্ভর ও যুক্তিবিরাগী হয়ে থাকে স্বধীন্দ্রনাথ সে বয়সে যে সব কবিতা লিখেছিলেন তাতে এমন সব শব্দ প্রবেশাধিকার পেয়েছে যা শুধু প্রমাণ করে যে এই কবি “এমনি সংস্কারমুক্ত যে চিরন্তন প্রসঙ্গেও ইনি কবি-প্রসিদ্ধির ধার ধারেন না, সর্বত্র অগ্র সমস্ত ভুলে উক্তি ও উপলব্ধির সহযোগ খোঁজেন।”

“তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্তের তলে
হিতবুদ্ধি হস্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি ;
তোমারই বিমূর্ত প্রহ্ন জীবনের নিশীথ বিরলে
প্রমাণিবে মূল্যহীন আজন্মের সঞ্চিত স্মৃতি।”

অর্থাৎ যে সব অনুভূতির কথা বলতে বিছাপতির কালের মানুষ যে সব শব্দ ব্যাপক অর্থে যে ধরণের উচ্চারণপদ্ধতির আশ্রয় নিত, স্বধীন্দ্রনাথের সময়ে তার অনিবার্য পরিবর্তন এসেছে। যিনি সংকবি তিনি যুগোচিত সঞ্চারীর সহযোগে চিরকালীন রসসত্তাকে দেশগত ও কালগত চিহ্নে চিহ্নিত করেও মহাকালের বস্তু করে তুলতে পারেন। মানবজীবনে প্রেমের বিয়োগান্ত মহিমা নিয়ে অনেকেই ত-ভাল কবিতা লিখেছেন। তবু উপরিউক্ত কবিতাটি যিনি পড়বেন—চিরন্তন প্রসঙ্গে বলে নয়—নতুন আর একটি কবিতা বলেই তাঁর ভাল লাগবে। এই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দসমষ্টির সব কয়টিই যে কবির তাৎকালিক সমাজে প্রচলিত ছিল তা নয়। তবে সে সময়কার উচ্চারণ-পদ্ধতিতে যে যুক্তির আগ্রহ, বিবেকী দ্বিধায় বিচলিত মানুষের মোহ-মুক্তির বিশ্বাস অথচ সে সম্পর্কে সচেতনতা দেখা গিয়েছিল, তারই অনিবার্য প্রকাশ যুক্তিধর্মী শব্দে, এমন কি প্রেম নামক অত্যন্ত ললিত অনুভূতির ক্ষেত্রেও তার অন্তর্থা ঘটে নি। ‘হিতবুদ্ধি হস্তারক’, ‘স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্ত’—এই সব শব্দরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রবেশের মধ্যস্থতায়। অক্ষরবৃত্তের ধীরলয়ে এই যুক্তাক্ষর-প্রধান শব্দ শুধু যে প্রেমের মোহমুক্তির বাহন হয়ে দেখা দিয়েছে তাই নয়, ‘প্রমাণিবে’ ‘নিশীথে বিরলে’ ইত্যাদি লিরিকপ্রধান শব্দের প্রতিবেশী হয়ে অগ্র এক ব্যঞ্জনার নির্দেশ দিয়ে যায়। প্রত্যেকটি আধুনিক মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্বের যে বিক্ষেপে উৎকণ্ঠিত তার পেছনে রয়েছে মিশ্রানুভূতির

বাঙালীর বহুমুখী জাতীয় জীবনের পবিত্র দলিল

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১ম খণ্ড ॥ ১২'৫০ ॥

বিনয় ঘোষ-কৃত

বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের অবশুপাঠ্য ও অপরিহার্য আকরগ্রন্থ

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৮৪০ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিষয়ানুক্রমিক সন্নিবেশ, বিস্তারিত ভূমিকা, সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত।

উনিশ শতকের অষ্টাদশ বাংলা পত্রিকা থেকে অনুরূপ সংকলন ধণ্ডে ধণ্ডে প্রকাশিত হবে। বর্তমান গ্রন্থ প্রথম খণ্ড। বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনুরাগী যারা এ-বই তাঁদের কাছে চিরন্তন সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আশুতোষ অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার রয়্যাল অক্টোভো সাইজের বই, আর্ট প্লেট ও বোর্ড বাঁধাইসহ, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্ম মূল্য মাত্র ১২ টা. ৫০ ন. প.।

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিজ্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
সচিত্র সংস্করণ ৫'৫০ ॥

[প্রতীচির মহাকাব্যগুলি থেকে চয়িত অল্পম কথাসাহিত্য-সংগ্রহ]

AFRICANISM Rs. 16/-

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

নবগোপাল দাশের

ব্যান ও বল্লা ৩'০০ ॥

এক অধ্যায় (২য় মুঃ) ৩'০০ ॥

অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বসুর

ভারতের চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১টি আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মুঃ) ৪'০০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর

প্রমথনাথ বিহারী

ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪'০০ ॥

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

ঘটনাঘটন। যে-চৈতন্য প্রেমের আত্মসমর্পণের কথা বলে, প্রেমের ব্যাপ্তি ও প্রসারতার ইঙ্গিত দেয় তাকে অভিভূত করে দিয়ে আরেকচৈতন্য মনে করিয়ে দেয় প্রেমের ব্যর্থ পরিণাম, আত্মবিশ্বস্তির ধানি। আবেগের পাশাপাশি বুদ্ধি বাস করে। সে জানে, ‘জীবনের নিশীথ বিরলে’ যে-প্রশ্ন অহরহ জেগে ওঠে তা ‘হিতবুদ্ধি হস্তারক’ বটে তবু তা তার ‘আজন্মের সঞ্চিত স্মৃতি’। কবির চৈতন্যে এই পরস্পরবিরোধী অনুভূতি অবিশিষ্ট-ভাবে রয়েছে বলেই ‘হিতবুদ্ধি হস্তারক’ ও ‘প্রমাণিবে’ এই দুই বিধর্মী স্বনিরূপ প্রায় পাশাপাশি থেকেও আমাদের শ্রুতির বিরুদ্ধতা জাগায় নি।

আর এই ব্যাপারেই বর্তমানের বহু কবি ও কাব্যরসিক অনেকাংশে বিপ্রলাপিত। হাস্তকর শোনাতেও অনেকের মুখে স্বধীন্দ্রনাথ ও মাইকেল মধুসূদনকে হাইফেনযুক্ত হতে শুনেছি। এতখানি বিভ্রমনা সম্ভবত স্বধীন্দ্রনাথের মত অতিসচেতন কবিরও ধারণা এড়িয়ে গিয়েছে। অবশ্য এটা সত্য যে এই দুই কবিই দন্তকুলোদ্ভব। তাছাড়া সংস্কৃত শব্দকীর্তি দুজনেই দেখিয়েছেন। কিন্তু তা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথই বা কম যান কিসে। ষষ্ঠে সংস্কৃত শব্দ তাঁর কবিতাতেও ত প্রবেশাধিকার পেয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রধান সুবিধে হচ্ছে যে সাধারণ লোকের কাছে তাঁর কবিত্যাতির বারো আনাই জনশ্রুতি। আলোচনার সুবিধার্থে তিনজন কবিরই তিনটি কাব্যংশ তুলে দিচ্ছি।

১ ॥ কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে স্তম্ভিত হতে
কর পদ্য সঞ্চালনে। [মধুসূদন]

২ ॥ দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের স্বর বাজিছে শিরায় বৃষ্টি ধারে
যুথীবন হতে বাতাসেতে আসে স্বধার স্বাদ
বেগী-বান্ধনের মান্নায় পেতেম যে সংবাদ
এই ত জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ—
মন শুধু বঁলে, অসম্ভব এ অসম্ভব ॥ [রবীন্দ্রনাথ]

৩ ॥ অবশ্য বুঝছি আজ এ-সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী ;
কারণ অদ্বয়-ব্যতিরেকী
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত,

এবং সে নিত্য বিপরীত
 দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
 বিকল্প স্বভাবক্ষেত্রে। নিঃসংশয়
 উপরন্তু এও
 বিশ্বামিত্র দস্যুরাই ব্যক্তি নামধেয়
 যদিচ প্রাজ্ঞের মতে.....

[স্মৃদীন্দ্রনাথ]

মধুসূদনের এই কবিতা পড়ে কেউ বলবেন না, তাৎকালিক বাঙ্গালী সমাজের উচ্চারণ-পদ্ধতির সঙ্গে এর কোন যোগ আছে। সত্যি কথা বলতে কি মধুসূদনের কাছে সংস্কৃত শব্দের আমদানি হচ্ছে অতিশ্রুত ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির চেষ্টামাত্র। বাস্তবিক, ‘খেদান্ মশকবৃন্দে’র মত অশ্লীল শব্দসমষ্টি কি ক’রে তাঁর মত নামকরা কবি নির্বিচারে বসিয়েছিলেন তা ভেবে ওঠা যায় না। কাব্যরসজ্ঞের অবিদিত নয় যে শব্দ হিসেবে কোনো শব্দই ভালো বা মন্দ নয়, প্রয়োগকৌশলের ওপরে শব্দের যাথার্থ্য নির্ভর করে। বেমানান শব্দই অশ্লীল শব্দ। আসলে মধুসূদন আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতির ধরণটা কোনদিনই বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। ফলে তাঁর কবিতায় অনেক নতুন নতুন শব্দ আছে কিন্তু তার মধ্যে স্বল্পই রয়েছে যা তাঁর অল্পভূতির প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ পড়ুন, দেখবেন যে সংস্কৃত, তদ্ভব, দেশী শব্দের বর্ণসংকর ঘটিয়ে গিয়েছেন শুধুমাত্র আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অবিকৃত রাখবার জন্তে। ঐ ভাষায় আমরা হয়ত কথা বলি না কিন্তু জীবনে এমন অনেক লগ্ন এসে উপস্থিত হয় যখন অমনভাবে কথা বলতে পারলে সত্যি আমাদের ভাল লাগত। কান পাতলে আমাদের রক্তের প্রবাহে ঐ ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাই। স্মৃদীন্দ্রনাথে এসে দেখি, এখানে বিশশতকের অতিজাগ্রত মানুষ যেন আত্মদমালোচনায় কোমর বেঁধেছেন। তাঁর ভাষা তাই যুক্তিপ্রধান, বিতর্কমূলক, দর্শনাস্রিত। ‘সিদ্ধান্ত’, ‘অন্নব্যতিরেকী’, ‘বিকল্পস্বভাবক্ষেত্রে’ প্রভৃতি দার্শনিক ও যুক্তিপ্রধান শব্দের সঙ্গে ‘মেকী’, ‘উপরন্তু’, ‘যদিচ’, ‘অবশ্য বুঝেছি আজ’ প্রভৃতি অব্যয়-প্রধান শব্দের যখন সন্নিপাত ঘটে তখন মনে হয় ঐ ধরণের উচ্চারণ-পদ্ধতি যেন কত অন্তরঙ্গ, হয়ত অমনিভাবে আমরা আমাদের চিন্তার স্ত্রুণুলোকে অস্ত্রের কাছে ব্যাখ্যা করে থাকি। মধুসূদনের ‘খেদান্ মশকবৃন্দে’র মত পড়তে গিয়ে কখনো হাসি আসে না। আসলে কবির শব্দবোধ শব্দসংগ্রহে নয়, শব্দপ্রয়োগে। স্মৃদীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সেইখানেই।

শব্দপ্রয়োগের আলোচনায় আরো দু'এক পা অগ্রসর হলে দেখি
সুধীন্দ্রনাথ বলছেন—

“অদম্য উদ্বিগ্ন মোর অব্যক্তরে অমর্যাদা করে ;

অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—

নাম—শুধু নাম—শুধু নাম ।”

এই পংক্তি কয়টির মধ্যে দুইটি শব্দের প্রয়োগ আমাদের বিস্মিত করে।
একটি ‘অমর্যাদা’, অপরটি ‘পরাক্রান্ত’। প্রথম শব্দটির পদোন্নতি ঘটেছে
বকোক্তির নৈপুণ্যে, দ্বিতীয়টির ঘটেছে নতুন বিশেষ্যের বিশেষণ হয়ে। অর্থাৎ
যে-পরিচিত শব্দ-পরিবেশে ঐ দুটো শব্দকে দেখতে অভ্যস্ত তার শিল্পপ্রভাব
ব্যতিক্রমে নতুন ব্যঞ্জনায় তা আজ বলীয়ান। অথবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের
পরবর্তী সামাজিক অবস্থা যেখানে বর্ণনা করতে গিয়েছেন ‘সমাধিনিম্ন কাল,
অসম্ভূত অমা একা জাগে’ সেখানে দেখা যাবে ‘অসম্ভূত’ শুধুমাত্র একটি ভারী
সংস্কৃত শব্দই নয় যে-রাত্রির উৎপত্তি ধরা যাচ্ছে না অর্থাৎ তা এত গভীর
ও নিরঙ্ক তার সঙ্গে পৃথিবীর কোথাও যেন কোন যোগ নেই—অর্থের এই
নানাস্বকে ধরা হয়েছে একটি শব্দে। পল্লবগ্রাহীদের দেশে এই ধরণের
সাফল্য সত্যি বিস্ময়কর; আবার মাত্রাবৃত্তের মত পোষাকী ছন্দেও আমাদের
উচ্চারণ পদ্ধতির তিনি প্রতিধ্বনি শোনালেন—

“তাই অসহ লাগে ও আত্মরতি ।

অন্ধ হ’লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?

• আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজের ক্ষতি

ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে ।”

এই কবিতার আলোচ্য পংক্তি কয়টি গতভূমিক শব্দ দিয়ে তৈরী কিন্তু
তবু এ কবিতা হয়ে উঠেছে। একি ছন্দের জন্তে, না অন্ধ ও বন্ধ শব্দের
অন্ত্যাহুপ্রাসে, না ভ্রান্তিবিলাস শব্দটির চমৎকার প্রয়োগে—আলাদাভাবে
কোনটিই কারণ নয়, সব কিছু মিলেই এর রস—এইসব কিছুকে যে মেলায়,
—অহুভূতির সেই স্পন্দন,—এসব তারই আবিষ্কার—তবেই ত এই রসস্রষ্টি।
প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলে রাখা ভালো যে, সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন ঋতসিজাগ
কবি—এই দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়।

ফলত চিত্রকল্প সৃষ্টিতে সুধীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক। প্রথমত
এজরা পাউণ্ডের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, অসংখ্য স্রষ্টির লোভ দমন
করে সারা জীবনে একটি ভাল চিত্রকল্প তৈরী করা অনেক কৃতিত্বের

পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্যে তাঁর চিত্রকল্পগুলো দানা বেঁধেছে।

“ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি

অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে।”

এই দুই পংক্তির মধ্যে কবি যে চিত্রকল্পকে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন তা একটি শব্দের ওপর নির্ভরশীল। দেশের প্রতিনিধি আমরা শুনেছি কিন্তু আবেগের প্রতিনিধি শুনেছি কি? কে প্রতিনিধিত্ব করছে,—ভরা নদী! তবে কি আবেগই ভরা নদী? হয়ত তাই। বর্ষার দুই কুলপ্লাবী নদীর মত অন্তরের আবেগ। এই সমগ্র চিত্রকল্পে নতুন শব্দ বিশেষ কিছু নেই, এমন কি এ চিত্রও খুব আমাদের অপরিচিত তাও বলব না। কিন্তু ‘প্রতিনিধি’—এই একটি শব্দের নতুন প্রয়োগে এ চিত্রকল্পে অনেক নতুন আকর্ষণ পাওয়া গিয়েছে। আর একটি কবিতার দুইটি স্তবক তুলে দেওয়া গেল যেখানে চিত্রকল্প ধরা দিয়েছে যথোচিত ও সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিশেষণের মধ্যস্থতায়।

নাথু সংকটে হাঁকে তিস্ততী হাওয়া

প্রাকৃত তিমিরে মগ্ন চুমলহরি।

ছদ্ম-সায়রে কার বহিঃ বাওয়া

অপর্ণ বনে দিয়েছে রহস ভরি ॥

স্বহৃদ আগুন নিবে গেছে গৃহকোণে

শ্রাস্ত সাধীরা স্বপনে আপনহারা

আমি শুধু বঁসে তুষারিত বাতায়নে

প্রহরে প্রহরে গুপি খসে কত তারা ॥

পাহাড়ের দেশের শীতের রাত্রি তার সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে মেলানো আছে একটি অলুপ্ত—কিসের অলুপ্ত অথবা কার, তার কোনোয়কম ইঙ্গিত দেওয়া নেই। তবে এতে যে বিষাদ আছে তা বলা বাহুল্য। ‘তিস্ততী হাওয়া’, ‘প্রাকৃত তিমির’, ‘অপর্ণ বনে’, ‘স্বহৃদ আগুন’—এইসব কয়েকটি বিশেষণ-বিশেষ্যের সম্বন্ধে পার্বত্য প্রকৃতির রূপ-বর্ণনার প্রয়াস ধরা পড়েছে। কিন্তু চিত্রের সীমাকে ছাড়িয়ে যা অলুপ্তির রাজ্যে এসে পৌঁছয় তা হচ্ছে ‘তুষারিত বাতায়ন’। এ যেন প্রকৃতির চিত্রকে অতিক্রম করে মানসিক বিষাদজনিত নিঃসঙ্গতাবোধের প্রতীক স্বচনা করে গেল। শব্দের রকমফেরের মধ্যে সূবীজনাথের চিত্রকল্প দানা বাঁধে তার একটি উল্লেখ্য নজির—

“বিশ্ব স্বাধীন ; অমরে মীন ;

মাটির মমতামুক্ত তিমির পৃথল কায়া ।”

শরৎকালের নির্মল স্বচ্ছ আকাশের গায়ে জলকণাহীন মেঘ যেন মাছের পিঠের মত স্তরে স্তরে জমা হয়ে থাকে—সেই সমস্ত চিত্রকে ঐ দুটি শব্দে ধরা হয়েছে। অবশ্য স্বাধীননাথের চিত্রকল্প উপলব্ধি করতে হলে শুধু চোখ দিয়ে দেখলে হবে না, মন দিয়ে একটু ভাবতে হবে। বস্তুত, অপরাপর চিত্রকল্প সাধারণত যেমন আমাদের দৃষ্টির ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দিয়ে তবে বুদ্ধির ইন্দ্রিয়ে স্থান করে নেয়, বাংলা কবিতায় স্বাধীননাথের চিত্রকল্প তার ব্যতিক্রম। বুদ্ধির সমর্থন না পেয়ে তাঁর চিত্রকল্প আমাদের দৃষ্টির পৃষ্ঠপোষণ লাভ করে না। ফলত অগ্রহায়ণের চিত্র আঁকতে গিয়ে যে শব্দসমষ্টির আশ্রয় তিনি নিয়েছেন তা অগ্রহায়ণের লৌকিক চিত্রকে অতিক্রম ক’রে আধুনিক মানুষ্যের মানসিক একাকিত্ব তথা তার আত্মপরিষ্কারের অন্ধত্বকে ব্যক্ত ক’রে গিয়েছে।

“রহস্তের অনচ্ছ অভিধা

মুহুরিত-সরোবরে ; হতবাক্ জ্রমে

প্রবিষ্ট নিবিড় ছায়া, বহিরঙ্গ বিশীর্ণ মলিদা

অবলুপ্ত জনপদ ইন্দ্রনীল ধূমে

ঘরে ঘরে প্রদোষের দ্বিধা।

রিক্ত অগ্রহায়ণ, প্রকৃতির দেহে জরার চিহ্ন, কুয়াশায় প্রায়াক্রম্য গ্রাম। বিকেল হ’তে না হ’তেই রাত্রির অন্ধকার। কিন্তু পড়তে গিয়ে অগ্রহায়ণকে ঠিক অগ্রহায়ণ বলে আর মনে হবে না। ‘হতবাক্ জ্রমে’, ‘বিশীর্ণ মলিদা’, ‘প্রদোষের দ্বিধা’ ইত্যাদি কয়েকটি শব্দচিত্রের মধ্যস্থতায় অন্তর জরায় ক্লিন্ন একটি আধুনিক মানুষ্যের চেহারা যেন চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখি। যে মানুষ্য সমাজের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন, সম্পদের মধ্যে থেকেও যেন ক্লান্ত। শব্দ বেশী নেই, ব্যঙ্গনা আছে। ছবির বাহুল্য নেই কিন্তু রংএর প্রগাঢ়তা আছে।

কিন্তু এই সমস্তের ওপরে যে কৃষ্ণবস্ত্রের জঘ্ন স্বাধীননাথ আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় তা হচ্ছে রবীন্দ্রোত্তর যুগে তিনিই বোধহয় প্রথম যিনি কবিতা লিখতে গিয়ে সর্বদা স্মরণে রেখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, তাঁকে স্বীকার করতে হবে, স্বীকার করতে হবে দেশের সম্পদ হিসেবে, আমাদের নানা অল্পবঙ্গের রূপকারী হিসেবে, আমাদের বহু নির্বাক অল্পভূতির

বক্তা হিসেবে। ‘নীলনবঘন’ শব্দরূপ রবীন্দ্রনাথের। আমাদের শৃঙ্গারচৈতন্তের
অনুষ্ঙ্গ হিসেবে আমাদের ভাবনা ধারায় তা স্থান ক’রে নিয়েছে। স্বধীন্দ্রনাথের
কবিতা বুঝেছিল যে রবীন্দ্রনাথের পর যিনি কাব্যপাঠে অগ্রসর হবেন
‘নীলনবঘন’ শব্দ তাঁর কাছে কালিদাসের ‘মেঘদূতের’ মত অনুষ্ঙ্গময়, ব্যঞ্জনা-
প্রধান। তাই প্রেমের অনুভূতিকে রূপ দিতে গিয়ে স্বধীন্দ্রনাথ সরাসরি ঐ
শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছেন।

“নীলনবঘন চঞ্চল আখি

যে-তড়িৎময়ী কালবৈশাখী”

এতে শুধু অনেক কথা বলার অনর্থক বিভ্রম থেকে যে তিনি রেহাই
পেয়ে গিয়েছেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের দৈনন্দিন ভাবনার অনুষ্ঙ্গ
তা যেন প্রথম আবিষ্কার করলাম। গঙ্গাজলেই যেমন গঙ্গাপূজা হ’য়ে থাকে,
রবীন্দ্রনাথের জন্ত যোগ্য গান প্রস্তুত করতে গিয়ে তিনি তেমনি রবীন্দ্রনাথের
শব্দাবলীকেই প্রধান অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন—

“তোমার যোগ্য গান বিরচিব ব’লে,

বসেছি বিজনে, নব নীপবনে,

পুষ্পিত তৃণদলে।

শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে ;

ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে ;

শ্রাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে

চন্দ্রকলার চন্দনটিকা জলে।

মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান,

গান বিরচিব ব’লে ॥”

তখন ভারি বিস্ময় লাগে যে সব শব্দের অষ্টাঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাতে
রাবীন্দ্রিক ব্যঞ্জনা অবিকৃত রেখেও একটা স্বতন্ত্র অনুভূতির কথা শোনানো
যায় কি করে? ‘সংবর্তে’ বিরূপ ও অনুর্বর বিশ্বের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে
রবীন্দ্রনাথকে যখন তিনি ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে আবার নতুন ক’রে
পড়তে হচ্ছে হবে, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে দেখবার একটি নতুন ইঙ্গিত
যেন খুঁজে পাওয়া যায়। যে-নিরুদ্দেশ যাত্রার বিদেশিনীর নীরব হাসিতে
আত্মসমর্পণের আহ্বান ছিল সংসারের লৌকিক স্তম্ভকে অতিক্রম ক’রে
অন্তরের সেই যে অমোঘ প্রয়াণ—সেই অতি সূক্ষ্মর অনুভূতি এই বিরূপ
বিশ্বের পটভূমিকায় বিপর্যস্ত—

“তথাপি যেকালে নিরুদ্দেশ যাত্রার সংজ্ঞায় হেন

দূরবস্থা শুধু সম্ভাব্যই নয়, অবশ্যসম্ভাবীও

বটে, অশোভন তখন নির্বেদ ।.....

.....তরল অনলে পরিণত

ঝলমল জল ; গলিত অম্বরতল ; অলুগত

দিগ্ধুর আঁখি ছলছল কষ্ট কল্লনায় ; মেঘে

অন্তর্হিত চূড়া পদান্ত উর্মির মুখর উদ্বেগে

প্রতিষ্ঠিত ; অন্তর্গিরি, ইত্যাদি বিবাদী লক্ষণের

অলৌকিক নির্বিরোধ তথা সে-সমন্বয়ের জের

শ্মিত বিদেশিনীর অভয়ে, এবং সোনার তরী

তাদের ডাকে নি অজানার অভিমারে ।”

বস্তুত, এক কথায় বলা যায়, স্বধীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসংগ্রহ প্রতিপদক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যেন সমালোচনা। যে ধরণের অলুভূতিকে শব্দ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তিগত ও যুগোচিত অলুভূতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্বধীন্দ্রনাথ তাঁকে ব্যবহার ক’রে গিয়েছেন। এতে স্বধীন্দ্রনাথের দেশদ্রোহী মনোভাব প্রমাণিত হয় না। শুধু প্রমাণ হয়, রবীন্দ্রনাথ ও স্বধীন্দ্রনাথ এক যুগের কবি ছিলেন না। তাই তাঁদের উচ্চারণ-পদ্ধতিও একরকম হয় নি। তাই স্বধীন্দ্রনাথ প্রেমের কথা বলতে গিয়ে ভুলতে পারেন নি—

“জানি কত তরুণীর গাল

অমনই অর্ধৈর্ষভরে শতবার দিয়েছি রাঙায়ে ;

অলুপূর্ব পথিকার পায়ে

বজ্রাহত অশোকে অলঙ্কার করেছি বিনত

ক্ষণিক পুষ্পের লোভে । ক্রমাগত

তাদের পদাঙ্ক মুছে গেছে রৌদ্রে, ধারাপাতে, বড়ে ;

যুগান্তরে

তোমার স্মৃতিও, জানি, সেই মতো হারাবে ধুলায় ॥”

বুদ্ধি তাঁকে ক্ষণিকের জন্তেও মোহগ্রস্ত হ’তে দেয় নি, সমস্ত উপভোগ যেন পরিণাম চিন্তায় ব্যাহত। মিলনের পরমলগ্নও যেন বিচ্ছেদের দুঃখে পূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অথকের উপাসক..... তাঁর কাছে বিচ্ছেদের চরম মুহূর্ত পরম প্রাপ্তির ইঙ্গিতে ঐশ্বর্যবান—

“সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে, সমুখের পথ দিয়ে—

ফিরে দেখা হবে না ত আর ।

ফেলে দিও ভোরে-গাঁথা ম্লান-মল্লিকার মালাখানি—

সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী ।”

এইসব তুলনা শুধু একটি জিনিস প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম স্বতন্ত্র কবি স্বধীন্দ্রনাথ । স্বধীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে তাই মনে হবে, তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পুনরাবৃত্তির চেয়ে কাব্যে নতুনত্বের দাবী অনেক বেশী । বুঝেছিলেন, যে ঐতিহ্য জন্মসূত্রে প্রাপ্তির ব্যাপার নয়, কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা তাকে অর্জন করতে হয় । প্রতি পংক্তি লিখে স্বধীন্দ্রনাথ তাই বার বার তাঁর উত্তরসূরীদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ঐতিহ্য ও অনুকরণ একই শব্দের প্রকারভেদ নয় । বস্তুত, যিনি বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষকে যুক্ত করতে পেরেছেন তিনিই ঐতিহ্যবান কবি । ফলত স্বধীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীদের সঙ্গে কী ধরণের কাব্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তাঁর কৃতিত্ব ও প্রশংসা তার ওপরেই নির্ভরশীল । অর্থাৎ স্বধীন্দ্রনাথের যুগসচেতনতার আত্যন্তিকতা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে তিনি কতখানি অতীতসচেতন । রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলা কবিতার ঐতিহ্য মনে রেখেছিলেন ব’লেই তিনি অতখানি স্বতন্ত্র ও ঐতিহ্যবান ।

॥ বেঙ্গলের বরগীয় সাহিত্য সম্ভার ॥

প্রবোধকুমার সান্মালের

রাশিয়ার ডায়েরী

কমিউনিস্ট জগৎ ও জীবনের নির্মম হার্দ্য
বিচিত্র রূপায়ণের বিরাট আলেখ্য ।

প্রথম খণ্ড : ১৪'০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড : ১২'০০ ॥ দুটি খণ্ড একত্রে : ২৫'০০ ॥

দেবতাত্ত্বা হিমালয়

১ম খণ্ড (১০ম যুগ) ২'০০ ॥
২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ যুগ) ১০'০০ ॥

স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

প্রদক্ষিণ ২য় যুগ : ৪'০০ ॥ দিকশূল (৩য় যুগ) ৪'৫০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

নবেন্দু ঘোষের

মহাকাণ (২য় যুগ) ৩'৫০ ॥ ডাক দিয়ে যাই (৬ষ্ঠ যুগ) ৩'০০ ॥

নারায়ণ সান্মালের

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

মনামাী চার টাকা ॥ মার্কসবাদ ২'০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের

দিলীপ মালিকারের

যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪'০০ ॥ রোপোলিয়নের দেশে ২'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

পথ চলে গেছে

সমর সোম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

—চি তৌ র গ ড়—

চট্টেরিয়া স্টেশনে গার্ড আসে জাগাতে। শিশিরভেজা ভোরের আলো এসে ভিড় করে। কুয়াশার পর্দার মত যে আরাবলি দূরে কাঁপছে দিবাস্বর্ষের প্রথর আলোকে সে কিছুক্ষণ পরই স্তব্ধ নিষ্পন্দ হয়ে যাবে। উঠে বসি। এর পরই চিতৌর... সেই ছোটবেলার—কৈশোরকালের স্বপ্নগাথা কল্পনার ইন্দ্রপুরী চিতৌরগড়।

স্টেশন রোড পার হয়ে এগিয়ে চলি। পথে লোক-চলাচল ক্রমশঃ বাড়ছে। হলুদ আর লাল পাগড়ি হেঁটে চলেছে। কোটা নদী পাশে ফেলে গম্ভীরীরা সাঁকো পেরিয়ে পথ ছুটেছে চিতৌরগড়ের দিকে। গম্ভীরীরা এ সাঁকো আজকের নয়—চিতৌর অধিকারের পর আকবরের সময় তৈরী হয়েছিল। মৃত ইতিহাসের মধ্যে প্রাণের ছোট্ট একটি স্ফুলিঙ্গ এই গম্ভীরী সাঁকো।

আজকের এ পরিবেশ হয়তো পাঁচ বছর পর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সাফল্য-ব্যর্থতার কোলাহলে এ মাটির শান্তি ব্যাহত হবেই। নতুন জনপদ মীরনগরের পত্তন হয়েছে। সামনে বাজার বস্তী। সব শহরের সমস্ত বাজারই যেমন নোংরা অস্বাস্থ্যকর মনে হয় এও তাই। বাজারের গন্ধই আলাদা! কর্দমাক্ত পথের জীর্ণ বুকখানি তাকিয়ে দেখতেই রুচির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিছুদিন আগে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি। উৎসব শেষ হয়ে গেছে, আবর্জনা পড়ে আছে। দূর থেকেই দেখেছিলাম রঙীন কাগজের শিকল,...বিবর্ণ হয়ে এসেছে...ছিঁড়ে পড়েছে স্ফার। বাজার মিশেছে মাঠে, মাঠের পাকা হলুদ ভূট্টা ছড়িয়ে আছে বাজারে। যেদিকে দৃষ্টি ফেরাই—কেবল লাল পাগড়ি আর হলুদ পাগড়ি।

পথ এসে পৌঁছয় আপাত লক্ষ্যে : সামনে চিতৌর দুর্গ। প্রথম প্রবেশ-দ্বার—পাতিল বা পাটল পোল পার হই-বটে কিন্তু প্রবেশপথের শেষ নেই।

বহু পথে বহু তোরণ। ভৈরবী তোরণ, হনুমান তোরণ, গণেশ তোরণ, জোরলা (জোড়া) তোরণ, লক্ষ্মণ ও রাম তোরণ—সাতটি প্রবেশপথে সাত অলঙ্কার। যত এগোই পথ উচুতে ওঠে, টেনে নিয়ে যায় ইতিহাসের অসংখ্য শ্রোত ও আবর্তে। আমি এখানে দর্শক ছাড়া আর কিছুই নই। মমীর দিকে যে বিষয় যে কোতুল নিয়ে মাল্লব তাকায় সেই দৃষ্টিতে চিত্তোরকেও আমরা দেখতে আসি। আজ সে পাথরের স্তূপ, প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাগার হলেও এ দেহে একদিন প্রাণ ছিল। অষ্টম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মেবারের শিশোদিয়া এবং গোহালিত বংশের রাজাদের চিত্তোর ছিল রাজধানী। চিত্রাঙ্গদ মৌর্য নিজের নামে নামকরণ করতে চেয়েছিলেন—এ রাজ্যের তাই ‘চিত্র’ হয়েছে ‘চিত্তোর’।

জীবনে বহু জিনিস গড়া হয় কিন্তু তারা থাকে না। জীর্ণ ভগ্নস্তুপের আড়ালে চাপা থাকে বহু মনের আগুন, বহু জীবনের উত্তাপ। চিত্রাঙ্গদ মৌর্যের মনের আগুনে জ্বলে উঠল শিশোদিয়া রাজ্য অজয়পালের মনের ঘুমন্ত দীপ। সাজালেন দুর্গপ্রাচীরকে নতুন করে...। দৃঢ়তায়, মন্থণতায়, গঠন-কলায়—সেই নব নির্মাণ অমর করে রেখেছে অজয়পালকে।

রাজ্য ও রাজত্বের ইতিহাস—হত্যা ও হিংসার কলঙ্কে কলঙ্কিত। ভাস্করের বিভীষিকা ব্যর্থ করেছে নব নির্মাণের প্রচেষ্টা। সৃষ্টির সমস্ত স্বপ্ন এই বিভীষিকার রাত্রে আত্মহত্যার জগ্রে উন্মুখ হয়ে উঠে বসে। চিত্তোর দুর্গের মন্থণতায় ঘাপড়লো তরবারির...পাষণ-শীলতায় ছড়িয়ে পড়লো রক্তের সতেজ উষ্ণতা।

মাল্লবের লোভ অনেক। সে শুধু হীরা-জহরত, জনপদ ও বাজার নিয়ে সন্তুষ্ট হতে শেখেনি। অগ্নির হৃদয়ভেঙ্গে নিজের লোভকে ঘৃতাছতি দিতেও সে প্রস্তুত। কাম ও কামনায় সৃষ্টির কমনীয়তা এইভাবেই নষ্ট হয়ে যায়। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ : আলাউদ্দীন খিলজীর অস্ত্রশস্ত্র নেচে উঠলো দুর্গপ্রাকারে। পদ্মিনীকে চাই...অল্পমার স্থান এ দুর্গে নয়—মোঘল হারেমে!

ইতিহাস বলে আলাউদ্দীন চেয়েছিলেন গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের সমতুল্য হতে। কিন্তু এই চিত্তোর আক্রমণ তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দিয়েছে, আলেকজান্ডার ও আলাউদ্দীনের পার্থক্য বড় করে ধরেছে। গ্রীকবীর নাইল-সুন্দরী ক্লিওপেট্রাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—তাকে ভালবাসবার জগ্রে পাঠাবেন সুন্দর বীর তরুণকে। কিন্তু আলাউদ্দীনের জীবনে বড় হয়েছিল, বন্ধন হয়েছিল পদ্মিনীর প্রতি আসক্তি। তাই চিত্তোর আক্রমণে স্বয়ং ছিলেন নেতা।

আলাউদ্দীন খিলজী থেকেই আরম্ভ হয় চিতোরের দুর্ভাগ্যের ইতিকথা। তারপর এলেন—বাহাদুর শাহ, সম্রাট আকবর...! বার বার এইভাবে চিতোর মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছে। ধ্বংসস্থাপ, মৃতের কংকাল ডিঙ্গিয়ে, রক্ত-শ্রোত মুছে চিতোর নতুন করে নিজেকে সাজিয়েছে। রাজপুত জাতির যা কিছু গৌরবময়, যা কিছু বলিষ্ঠ—তারই স্মৃতি জড়ানো চিতোরের বুকে। মালবের সুলতান মামুদ খিলজীকে পরাজিত করেছিলেন রাণা কুস্ত, দিল্লীর লোদী সুলতানদের শৌর্যবীর্যের অহঙ্কার ব্যর্থ করেছিলেন রাণা সঙ্গ। এঁরা তো সবাই বীরপুত্র চিতোরের! সবার ওপরে আছেন মহান রাণাপ্রতাপ। ইতিহাসের ছাত্র নই আমি। কিছু সামান্য জ্ঞান ছিল এদেশের...কিন্তু যত চলি পাথর আপনা থেকে কথা বলে ওঠে।...প্রাকারে, স্তম্ভে, মন্দিরে, প্রাসাদে অতীত যেন বাজায় হয়েছে আজ।

নবম থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মন্দিরচূড়ার কারুকার্যে মন হারিয়ে যায়। কত দেখি! কুস্ত, মীরণ বাই, শ্রামজী, জটাশংকর, শংকর, সমিধেশ্বর, অদ্ভুতনাথ, কালী, অন্নপূর্ণা, পটলেশ্বর, কে নেই এখানে! দশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এ দুর্গ। ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির ও সংস্কারের এক এক অধ্যায় এখানে সেখানে—সর্বত্র খোলা।

আমরা এযুগের মানুষ। পাঁচফুটের ঘরে দুনিয়া দেখি। মাসিক বেতনের হিসাবে আয়-ব্যয় বরাদ্দ করি। সেদিনের ‘নৌ-লক্ষ’ ভাণ্ডারের রহস্য আমরা জানব কিভাবে? সাথী যখন পাথরের সোপান পেরিয়ে পৌঁছে দেয় দুর্গ-অভ্যন্তরে সেই ভাণ্ডারের সামনে, দেখায় গহ্বর আর বলে—‘এখানে সব সময় জরুরী খরচের জগ্নু মজুদ থাকতো ন’লাখ টাকা (১)—তখন পাথরের আড়ালে আটকোনা সেই পরিধির দিকে তাকিয়ে থাকি। সামনে বনবীরের দীবার... বাঁ পাশে খোলা ময়দান। আরো এগোতেই মাথা তোলে—শৃংগার চৌরী। চিতোর দুর্গে এ যেন ব্যতিক্রম। এ যে রাজার গড়া নয়... শাসন ও চক্রান্তের ফুল এ মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য হয়ে আসেনি। সাদৃশ্যেও শৃংগার চৌরী স্বতন্ত্র। এর প্রতিষ্ঠা করেছেন মহারাণা কুস্তের খাজাধী। সতীনাথ ছিলেন ত্যাগ ও তপস্রার প্রতীক। বীরের জীবনে ত্যাগ ও তপস্রাই যে শৌর্যকে মহিমাম্বিত করতে পারে—একথা চক্রান্ত ও চাপা দ্বিতে পারেনি।

মন্দির-পরিক্রমা শেষ হয়...পিছনে পড়ে থাকে কুস্তপ্রাসাদ আর তার ‘সবুজ গোথর’ (স্বর্ঘমুখী), গণেশ ডেউরী। এসব প্রাসাদে একটা জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ে। একটি দরজা ছাড়া দুটি দরজা কোথাও নেই।

॥ শেফালীর বই মানেই সেবা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরোগ্য নিকেতন ॥ মহাশ্বেতা ॥ চৈতালি ঘূর্ণি

৭ম মুঃ ৭'৫০ ॥

৩য় মুঃ ৫'৫০ ॥

১০ম মুঃ ২'৫০ ॥

মনোজ বসুর

মানুষ গড়ার কারিগর ॥

নবীন যাত্রা

৩য় মুঃ ৫'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৪'০০ ॥

বনফুলের

সে ও আমি ॥

দ্বৈরথ ॥

স্বপ্নসম্ভব

৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৩'০০ ॥

৩য় মুঃ ৩'০০ ॥

সতীনাথ ভাট্টার

অপরিচিতা ॥ পত্রলেখার বাবা ॥ গণনায়ক

২য় মুঃ ৩'০০ ॥

চার টাকা ॥

২য় মুঃ ২'৫০ ॥

সমরেশ বসুর

বি. টি. রোডের ধারে ॥ সওদাগর ॥ বাঘিনী

৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥

২য় মুঃ ৬'০০ ॥

২য় মুঃ ৭'০০ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুতুলনাচের ইতিকথা ॥ প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান

৮ম মুঃ ৫'৫০ ॥

২য় মুঃ ২'০০ ॥

সৈয়দ যুজতবা আলীর

চতুরঙ্গ

॥ অবিশ্বাস্য ॥

ময়ূরকণ্ঠী

৩য় মুঃ ৪'৫০ ॥

৯ম মুঃ ৩'০০ ॥

১৪শ মুঃ ৪'০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গম্পা ॥

সূর্যসারথি ॥

একতলা

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

৩য় মুঃ ২'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

ডানপাশে বাঁপাশে কামরার পর কামরা—মাটির নীচে...মাটির উপরে। হয়তো এখানে কোন ঘরে বসে বনবীর রাজদণ্ডের স্বপ্ন দেখেছিল।

সবই তো দেখছি, কিন্তু চিত্তোর দুর্গের হৃদয় কোথায়? সমস্ত খণ্ড হৃদয় যার মধ্যে সমগ্র হয়ে উঠেছে সে কোথায়? এ দুর্গের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান শ্রীকুলবাণী ভরসা দেন... পথ দেখান। নগ্ন পদক্ষেপে মনকে তৈরী করে নিয়ে এগিয়ে চলি—মীরা মিলন কী আশে!

পুণ্যতীর্থ ভারতভূমিতে জন্মে মীরার নাম শোনেনি—এমন কেউ বুঝি নেই! সেই মীরামন্দিরে চলেছে এবার পথ। রাসপূর্ণিমার শুভ্রতায় নিবেদিতা শুধু মেড়তা-রাজ দুর্দাজীরাও জোধাজীর ঘরে উৎসবের আলো হয়ে জন্মাননি—ভক্তিরসের অনন্ত সমারোহ নিয়ে ভারত-ইতিহাসের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন। আজ বার বার সেই কথা মনে আসে। যেদিকে কান পাতি...বাতাসে কে গুনগুনিয়ে ওঠে—‘আখিয়া তরসে দরশন ছাসী’...। স্বপ্নে দীননাথের গলায় মালা দিয়েছিলেন। ভেঙ্গেছে সে স্বপ্ন...এবার কোথায় পাবে মীরা তাঁকে? সর্বভ্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে ক্ষণিকের জন্ত তিনি গেলেন গিরিধারীর দর্শনে। নিমেষের দর্শন চিরবিরহের পৃথিবীতে আনলে অলৌকিক সান্না। হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা হলেন সাকার ব্রজরাজ।

কিন্তু এতো ভাবদৃষ্টি। অস্তিত্বের সমস্ত অল্পপরমাণু ফরিয়ে মীরা তো পায় না তাঁর গিরিধারীকে। ‘চারভুজা’র মন্দিরপথে বাণীর পাশে উপবাসী অন্তরে বিরহের মীড় গাঢ় মুছনায় ভেঙ্গে পড়ে।

ভীলবাড়ার ছেলে রামপ্রসাদ ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে ফিরিয়ে আনে। বলে শুধু একটি কথা—‘রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন সম্প্রতি!’ দুর্দাজীরাও জোধাজী নয়, ভোজরাজ নয়, রাণাকুন্ড নয়—রাষ্ট্রপতি! রাষ্ট্রপিতার পরই রাষ্ট্রপতি। পিতার চেয়ে পতির বোলবলা বেশী এদেশে। পিতা তো দুর্বোলের দুর্ভাগ্যের সাথী-আশ্রয়, পতি তো উৎসব-রজনীর অতিথি, বসন্তের কুসুম তার কপালে। তাই তাঁর আসার জন্তে নতুন প্রবেশপথ।

মীরামন্দিরের পাশেই বিরাট কুন্তুমন্দির। সামনে রৈদাসের ছত্ৰী। ছত্ৰীতে আছে ছটি চরণচিহ্ন শুধু। অনাগত যুগের মানুষের জীবনে রৈদাস-বাণুর মত এক পরম ইঙ্গিত। বিশ্বস্থিতি একই স্রষ্টার। এখানে বিভেদ কেন? দেবতা কি শুধু বর্ণ-কৌলীণ্যের পূজা নেন? এসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন রৈদাস। তাইতো তাঁর পদচিহ্ন মীরামন্দিরের সামনে। ভক্তির আসরে হরিজন ও হরজনে কোন ভেদ নেই। রৈদাসের ছত্ৰীর সমস্ত দেখাশুনার ভার

আজো তাই হরিজনের হাতে। শুককে প্রণাম না করে মীরা তো মন্দিরে যেতে পারতো না।

কর্নেল টডের ‘এনাল্‌স্ অব্ রাজস্থান’-এ পড়েছিলাম,—লোককথায়ও শুনেছি রাণা কুস্ত ছিলেন মীরার স্বামী। আজ জানলাম সে কথা ভুল। পণ্ডিত গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওবা উদয়পুর রাজ্যের ইতিহাসে লিখে গেছেন—“মীরাবাইয়ের বিবাহ নিয়ে জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে টড লিখে গেছেন তিনি রাণাকুস্তের রাণী। এর পর থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এই কথাই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল।”

—“তবে কে মীরার স্বামী?”

রাজস্থান বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আর মীরা সংসদ মণ্ডলের অধ্যক্ষ লালসিং শক্তাবংজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—“মহারাণা সঙ্গার ছেলে কুমার ভোজরাজ!” একটু থেমে শক্তাবংজী আবার বলতে থাকেন—“মিথ্যাই লোকে রাণাকুস্তের নিন্দা রচায় সোমজী! পরমভক্ত ছিলেন তিনি। গিরিধারীকে অসম্মান করবেন, মীরাকে সন্দেহ করবেন তিনি? কুমার ভোজ আর কুস্তে অনেক তফাৎ।”

ঠিকই বলেছেন—শক্তাবংজী! ওই তো কুস্তশ্রাম মন্দির। শুধু কি মন্দির?—‘রসিকপ্রিয়া’-র নাম আমরা না জানলেও মেবার জানে, চিতোর মনে রেখেছে। গীতগোবিন্দের সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই টীকা—আজো রাজস্থানী পণ্ডিতের শ্রদ্ধার বস্তু। এ ছাড়া ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়—রাণাকুস্ত ছিলেন মীরার তিন পুরুষ আগেকার মানুষ। কেমন করে তাঁর ঘর করবে মীরা!

মহারাণা সঙ্গা-পত্নী কৃষ্ণপ্রেমিকা মীরাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। কুমার ভোজও কোনদিন সম্পূর্ণভাবে স্বামীর অধিকার পান নি...। সাংসারিক জীবনের দুঃখ-দ্বন্দ্বের অজস্র বিভ্রম জুটল সেবিকার ভাগ্যে। মীরার মহল হোল আলাদা। চিতোর দুর্গের প্রাচীরের একপাশে রামপ্রসাদ দাঁড় করিয়ে দেয়—“ঐ দেখুন মীরার সেই নিরাস্রিত জীবনের আশ্রয়! আজ জীর্ণ হয়ে পড়েছে।”

মাঝে মাঝে রামপ্রসাদ কবি হয়ে পড়ে। কয়েক ঘণ্টা ওর সঙ্গে রয়েছি—তাই ‘নিরাস্রিত জীবনের আশ্রয়’ শুনে চমকে উঠি না। দুঃসাহসী বানধন-ছেঁড়া মনের উদ্দাম কল্পনা যে এর জীবনে মিলে আছে—তার গল্প একটু আগেই শুনেছি। হাওয়াই জাহাজে পাইলটের কাজ শিখতে পালিয়ে

এসেছিল রামপ্রসাদ। মা-বাপের স্নেহের সন্তান। তাঁরা ছাড়বেন কেন। জরুরী কাজের কৈফিয়ৎ দিয়ে ডেকে আনলেন বাড়ীতে, দরজা বন্ধ করে আটকে রাখলেন অবাধ্য ছেলেকে। মানুষের মাথার ওপর ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন আর এক নতুন অনুভব দখল করলে।—‘পিতৃস্নেহ!’ কিন্তু কোথায়... ঘর তো তবু ফিরতে পারে না। চলায় তার ছন্দ, বলায় তার কবির মাধুর্য।

—“ভোজের মৃত্যুর পর”, রামপ্রসাদ বলে, “গড়া হয়েছে নতুন মীরামন্দির। ওই যে কুস্ত-খামের বাঁ দিকে। পুত্রশোকের বেদনায় মীরার জীবনকে একেবারে শূণ্য নিঃসঙ্গ করে সরিয়ে রাখতে পারেন নি রাণা সঙ্গ। প্রায় আশীটি ক্ষতের দাগ ছিল তাঁর দেহে...কিন্তু এ ক্ষত মনকে ছুইয়ে দেয়। এ মন্দির গড়ে দিয়েছিলেন তাই বিধবা পুত্রবধূকে।”

কীর্তনের আয়োজন ছিল মীরামন্দিরের প্রাঙ্গণে। (বিনা নাট-মন্দির এখানে মন্দিরই নেই।) ‘খড়ি চৈন ন আওরে দরশন বিনা মোয়...’—ভজনের স্বর ছ’কান ভরে দেয়, চোখ জুড়িয়ে দেয়—এক মধুর স্বর্গলোক। মন্দির-অভ্যন্তরে প্রদীপের শিখার সঙ্গে মিশে আছে সে জ্যোতিঃ। ছড়িয়ে পড়েছে ভাবময়ী মীরার রঙতুলির মুখে। হাসছেন স্মিত আবেশে—মীরা কে প্রভু! বহুবার বহুজনের মুখে বহু জায়গায় শুনেছি মীরার ভজন কিন্তু প্রাণ তো এমন দোলা পায় নি। মনের সমস্ত অনুভূতি একত্র হৃদয়কে আজ নিঙ্ড়ে নিতে চায়। নাটমন্দিরের ভাঙ্গা পাথরের মেঝেতে বসে জনতার সামনে চোখের জল মুছি।

চুঁচড়োর গঙ্গাতীরের বৈষ্ণবী শ্রামার কথা মনে পড়ে। স্মরণে আসে শ্রীদাম বৈরাগীর কথা। শ্রামা বৈষ্ণবীর মুখে আমার প্রথম মীরার ভজন শোনা। সদর বাড়ীর দেউড়ির ধারে বাঁধানো চাতালে বসে শ্রামা নিজের মনে গেয়ে যেতো ভজন। বাড়ুজ্যেমশাই যদি কোনদিন কোণের ঘরে থাকতেন—তবে বেরিয়ে এসে ভিক্ষা দিতেন বৈষ্ণবীকে।

ভিক্ষা চাইতে আসতো না শ্রামা। তার গোপালের জগ্ন গন্ধরাজ, মল্লিকা, টাপা তুলে নিয়ে যেতো। যেদিন ফুল ফুটতো না—সে বসে বসে নিজের মনে বহুক্ষণ গান গাইতো। মীরা আর চণ্ডীদাসের পদই ছিল তার প্রিয়।

ভাষা বুঝতাম না সেদিন, তাবের ভিতরে নামবার কোন ক্ষমতাই হয়নি তখন—তবু মনে আছে অবাক হয়ে শুনতাম স্বরের ধ্বনি। শ্রামা বাইরে থেকে ক্রমশঃ অন্তরমহলে আসা আরম্ভ করে। ‘মা’-কে কেমন করে সে যেন খুঁজে বার করে নেয়। বুঝা পিতামহী তুলসীদাসের রামায়ণ কিনা তাঁর

মাতুলের মহাভারত কিম্বা ছতোম পেঁচার নক্সা নিয়ে বসে থাকতেন নিজের ঘরে। অনেক হারিয়ে নিজের বংশগৌরব... নিজের আভিজাত্যের কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারতেন না। কিছু বুঝতাম না আমরা, বয়সও হয়নি। তবু তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন। মা সরে যেতেন একপাশে। দক্ষিণের বারান্দায় রেলিঙয়ে ভর দিয়ে তিনি তাঁর একটুকরো আকাশেই আপন স্বথ-দুঃখের খতিয়ান মেলাতেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর দাদাশুভ্রর কিম্বা হরিনাথ দে ক'বার এ বাড়ীতে এসেছেন, কিম্বা শ্যামলাল সোম কেমন করে নবাবের আত্মরের নৌকো চারগুণ দাম দিয়ে কিনে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সে সব কথায় তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। দক্ষিণের এ বারান্দায় শ্যামা বৈষ্ণবী মাকে খুঁজে বার করেছিল। এই ভাবেই আমার জীবনে সদর-বাড়ী থেকে অন্তরমহলে বহু আগেই মীরা পদক্ষেপ করে।

সে সব যেন বহুকালের কথা।

আজ সে মাটির রঙই আলাদা। কোথায় কেমন ভাবে সব ধূয়ে মুছে গেছে। আজ দশ বছর চুঁচড়ো যাইনি। সব বিরহকেই যেন একত্রিত করে তোলে বিরহিণীর একটি মাত্র পংক্তি—‘ঘড়ি চৈন ন আওরে দরশন বিনা মোয়...’।

মীরামন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। চোখের সামনে থেকে তবু সে ভাবময়ী চিত্র মুছতে চায় না। মীরার শেষ পরিণতি কি?

—সমস্ত বিরহের অবসান! শক্তাবৎজী জবাব দেন।

—গিরিধারীকে পেয়েছিলেন?

—সব পরীক্ষাই তো দিয়েছেন—দিতে হয়েছে তাঁকে। মহারাণা সঙ্গা মারা গেলেন...রতন সিংহ মারা গেলেন...সিংহাসনে বসলো বিক্রমজিত। মীরার জীবনে লাঞ্ছনার শেষ পর্যায় হোল শুরু। এবার প্রতিপক্ষ শুধু গিরিধারীকে সরিয়ে রাখতে চাইল না, মীরাকে সরিয়ে ফেলবার জন্তু আরম্ভ হোল বড়যন্ত্র। দয়ারাম পাণ্ডা চরণামৃত বলে বিষ দিলে সাধিকাকে। কিন্তু বিষ হোল অমৃত।

রামপ্রসাদ বলে,—উস সময় বতাতে হৈঁ কি দ্বারকাধীশ কে মুঁহ সে জহর কে কাগ নিকলে থে!

—লেকিন, শক্তাবৎজী খামতে চান না, এখানেও শেষ না হোল চক্রান্ত। ঝাঁপিতে কালনাগ পুরে পাঠায় রাণা,—বলে দেয় আছে শালগ্রাম শিলা। মীরা নিজের হাতে ঝাঁপি খোলেন, বাহক অপেক্ষা করে কালনাগের উদ্গত

কণার। কিন্তু কোথায় বিষধর? শালগ্রাম মাথায় তুলে নেয় মীরা।
বিস্মিত বাহক ফিরে চলে অভূতপূর্ব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে।

এরপর মীরা চিতোর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মেড়তাতেও শান্তি নেই।
চললেন বৃন্দাবন।

এই সময়েই জীব গোস্বামীর দেখা পান ব্রজভূমিতে। দুজনেই সাধক-
সাধিকা। ব্রজরাজের জন্ত দুই হৃদয় উন্মুখ—তবু নাকি জীব গোস্বামী অসম্মত
হয়েছিলেন মীরা মিলনে। বলেছিলেন,—“নারীর সঙ্গে তো আমি দেখা
করি না।”

—দেখা করেন না? সাধিকা জবাব দেন,—বৃন্দাবনে ক্লৃষ্ণ ছাড়া আর
কোন পুরুষই তো নেই। এখানে কে নারী...কে পুরুষ সখা!

মীরাবাদীর শেখমুহূর্ত কোথায় কেমনভাবে আসে—জানবার জন্তে
অনেক চেষ্টাই করি। শুধু শুনতে পাই—‘ওহ তো গিরধর গোপাল কে মূর্তি
মে’ সমা গয়ে।’ উদয়সিংহ পাঠিয়েছিলেন মীরাকে ফিরিয়া আনতে উদয়পুরে।

মীরা তখন দ্বারকায়। তিনি তখন পলিতকেশ যোগিনী। যাবেন
কোথায়? মন হরি লিহৌঁ রণছোড়া।

যারা এসেছিল—তারাও যে ফিরতে চায় না। চিতোর-গৌরবের সব-
চেয়ে প্রদীপ্ত শিখা তারা ফিরিয়ে নিয়ে যাবেই।

মীরা গিয়ে দাঁড়ালেন গিরিধারীর সামনে। বিদায়...বিরহ...? সব
প্রশ্নের জবাব রইলো শূন্য মন্দিরে। রণছোড়জী হাসছেন...মীরা নেই। পড়ে
আছে চুনরিয়া... শেষ চিহ্ন। প্রশ্ন করেছিল চিরবিরহিণী—‘সজ্ঞানী কব মিলসী
পীউ মেরা!’ শেষ মুহূর্তটি সেই উত্তরকেই এনে দেয়। হরি লিহৌঁ গিরধর!
...গ্রহণ করে গিরিধারী! হরণ করেই নেয়!!

বেলা হয়ে আসছিল। চলতে হয়। দেখবার এখনো বহু বাকী।
দেহেরও সামান্য বিশ্রাম দরকার। গৃহস্থও অপেক্ষা করে আছে মধ্যাহ্নে অন্ন
নিয়ে।

সামনে মাথা তুলে আছে কুস্তের বিজয়স্তম্ভ। রামপ্রসাদভাই ছুটিয়ে নিয়ে
চলে। কলকাতা শহরে মল্লমেট যারা দেখেছে তারা বলতে পারে এমন
স্তম্ভ তো আমরা রোজই দেখি। কিন্তু কুতব-কুতবই, মল্লমেট-মল্লমেটই, আর
কুস্তের বিজয়স্তম্ভ আপন ঐতিহ্যই মহান। শুধু ঐতিহ্যই নয়! কারিগরের
শিল্পীর বহু আন্তরিকতা মিশে আছে এর পাথরে পাথরে। নাটি স্তবকে
উৎসাহিত হয়েছে স্তম্ভ। স্তবকে স্তবকে পাথরে পাথরে ভাস্কর ফুটিয়েছে বহু

রেখা। একাংশে বিশ ফুটের উচ্চতা ও পরিধি দখল করেছেন—লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম-লক্ষ্মণ, উমা-মহেশ্বর, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, নকুল, মহাকাল, মহালক্ষ্মী, বরাহ, বামন, মহাকালী ও নাগ দেবী। এক কথায় ভাগবত, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত সব সাকার হয়ে উঠেছে বিজয়স্তম্ভে। সন্ধিনী লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে ওঠে। পাথরের ছোট ছোট সিঁড়ি, সরু সরু জালি, অর্ধ-গোলাকার অলিন্দে খুঁজে বেড়াই। কি যে খুঁজে বেড়াই তা বলতে পারব না। বললেও বিশ্বাস করবে না মানুষ। সহজ বুদ্ধি সব সময় অন্তরকে বুঝতে চায় না। জন্মজন্মান্তরের যে অমর অল্পভূতি অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে হৃদয়ে ঘুমিয়ে আছে যুক্তিতর্কের বুদ্ধি তাকে খুঁজে পায় না। খুঁজে পেলেও ধরতে পারে না।

**জাতীয় প্রস্তুতির জন্মে চাই
শৃঙ্খলা, আত্মোৎসর্গ
এবং দৃঢ় সংকল্প !**

জানি না কেন, জীবনে বহু পথ হেঁটেছি, বহু ঘরে গেছি, বহু মানুষ পেয়েছি—যাদের দেখে মনে হয়েছে এরা যেন আমার বহু-কালের চেনা। পা ফেলে তাই পা ফেরাতে পারিনি, হাত মিলিয়ে আর হাত ছাড়ানো যায়নি। মনে পড়ে চুপার দুর্গে আতিথ্যের একটি দিন। সেখানে হঠাৎ সাধনাকে দেখে মনে হয়েছিল এ দুর্গে যেন এমন ভাবে আর একদিন ওকে আমি দেখেছি। দুর্গাধিপতির সরকারী বাসভবনের পাথরের ঘরে—যখন আমায় দুয়ার বন্ধ করে শোবার জন্মে বলা হয় তখন হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেসলো—‘ওর খিল তো নেই!’ অথচ সে ঘরে আমি কোনদিন পা দিই নি। দুর্গপ্রাচীরের পাশে পাশে বহু লুকানো পথ কেমন করে হেঁটে চলে গেছি...। সমাধিস্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে মন কেঁদে উঠেছে। কেন? তাই বিজয়স্তম্ভের সংকীর্ণ সিঁড়ির আবর্তন ভেঙ্গে অর্ধগোলাকৃতি অলিন্দে অলিন্দে শুধু খুঁজে বেড়াই—যা একদিন ফেলে গেসলাম। কি ফেলে গেসলাম...কবে ফেলে গেসলাম তার কিছুই তো মনে নেই!

ভাবতে চেষ্টা করি জীবনের রহস্যই জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

শিব থাকলেই শক্তি থাকবে। জটাশংকর সামান্য দূরে। নিঃসঙ্গ দেবতা

প্রাচীরের কোলে কিসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন যেন। পদ্মিনী-প্রাসাদে ঢোকান সময় শক্তিকে কালীমন্দিরে চোখে পড়ে।

একাদশ শতাব্দীতে যে প্রাসাদ মাথা তোলে—বিংশশতাব্দীর শেষার্ধ্বে সেখানে দাঁড়াই। ইতিহাস ছায়া ফেলেছে, নক্সার কিছু কিছু হেরফের হয়েছে—তবু প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। আজো সেখানে বলমাছে পাথরে পাথরে রূপের বিতৃতি, আজো তার কুঞ্জছায়ায় আছে বিশ্রামের অবসর, বিলের জলে আছে স্নিগ্ধ স্রী! হয়তো তত ফুল ফোটে না, পুরানো পাথর দল ডাঙ্গায় না ঘুমক কিন্তু দূর পাহাড়ের মাথায় সূর্য তেমনি লাল হয়েই ওঠে। কত কাকন, যুঁই আর চামেলী। এমন কি কক্ক ফুলটি পর্যন্ত আছে। পর পর দরজা পার হই। আসে তিনটি উঠান। গোল চত্বরের ছায়ায় বসে গড়ের জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকি। স্বপ্ন দেখার জায়গা বটে! বিস্তীর্ণ ক্ষীণ জলধারা সবুজ হয়ে আছে। ওপারে সেই বিশ্ববিখ্যাত অতিথি আলাউদ্দীনের ছোট প্রাসাদখানি। সামনেই পদ্মিনীর অলিন্দওয়ালা প্রাসাদ। সৌন্দর্য-পিপাসাতুর বাদশাহ ও তাঁর প্রাসাদে বসে দর্পণে ছায়া দেখেছিলেন পদ্মিনীর। রাজপুত তিলোত্তমার কাহিনীর এইখানেই সূত্রপাত। সামনে পোড়া মাঠ...খণ্ডহার। আপন রিক্ততায় উগ্র হয়ে আছে। পিছনের আরবলীর ছায়া পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারেনি। অবশ্য বিলের বিরঝিরে হাওয়া সেখানে বহে যায়। ওই খণ্ডহারের জীবনে এই এক মস্ত সান্দ্রনা। কনের (করবী) ফুলের মিষ্টি গন্ধে মাঝে মাঝে তার উদাস মধ্যাহ্ন-স্বপ্ন এমনি ভাবেই ভরে ওঠে।

মাছজ্বর সাজানো পৃথিবীর নক্সা পান্টায় কিন্তু প্রকৃতির রুচি জানে অর্থ-কৌলীন্তের কলঙ্কের স্পর্শ পৌঁছয়নি। সেই মাঠ আজো রয়ে গেছে। উপত্যকা তেমনি-তরো ছড়ানো...। আগের মতোই—ভীল, মীলা ও গোন জাতির লোক সে উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাখাল-বালকের প্রতিধ্বনি আর পাথর ডাকেই শুধু এ স্তব্ধ প্রান্তরের ধ্যানভঙ্গ হয়।

পথের শাখাপ্রশাখা নানা দিকে নানা মুখে ছড়ানো। রমাপ্রসাদ আর ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। জিপকে সোজা ছুটিয়ে দেয়—শাস-বছর কী কুণ্ডের দিকে। দেহে জমেছে অনেকখানি ক্লান্তি। পাহাড়পুরীর বরফ-শীতল জলে সে ধুয়ে দেবে অবসাদ। ক্লান্ত হওয়া চলবে না—‘সোমজী, আপে তো দূর কে মুসাফির হৈ!’

—হাঁ, সচমুচ্! সফর সচমুচ্ লম্বী হৈ!

—তো ফির কপড়া উতার দীজিয়ে! চিতোরকে আখরী আনন্দ রহী হৈ।

পাহাড়ের গুহায় সন্ধে নিয়ে যায়। পাথরের সরু সরু কাণিশ বয়ে পৌঁছয় গুহায়। গোমুখীর অরুণ প্রবাহ কোথা দিয়ে বারবার শব্দে নেমে আসছে। পাষাণপূরীর প্রাচীর বেয়ে নামছে উচ্ছল বর্ণা। ছড়িয়ে যাচ্ছে নীল জল। দিকে দিকে গোমুখীর উৎস-মুখ। ঘাটে এসে ডুবে গেছে। নেমে গেছে জল তলে—অতলে! সন্দিনী তীরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে—ফিরে এসো।

বাঙালীর ছেলে হলেও পথে-প্রান্তরে ঘুরে বহু রকমের আহাৰ্য্যই উদরস্থ করেছি। চিতোরের নাথুলাজী সাহেব চীপটজীর বাড়ীর বাফলা-বাটির কিন্তু কোন ধারণাই ছিল না। মেবার যারা গেছে—তারা যেন বাফলা-বাটি খেয়ে ফেরে। আটা তো আমাদেরও চলে; কিন্তু ছুন দিয়ে নরম করে আটা মেখে বাটিতে ভরে জলে সন্ধ করা আবার ঘুঁটের আগুনে সেকঁকে নেওয়ার সন্ধে কারো পরিচয় নেই। পাপড় ও জিরের জল দিয়ে সেদিনকার মত ভোজন-পূর্ব শেষ করলাম। চীপটজীর পরিবারের লোকজনরা বৈঠকখানায় ভিড় করে আসেন। আশপাশের ঘর থেকে, দালান থেকে কোতুহলী ঘুঁঘট কাঁপতে থাকে। সবই দেখি। রামপ্রসাদ বলে, থোড়া আরাম কর লীজিয়ে। এহী বক্ত হৈ! ওদের আলোচনা করতে দাও বাংলার কথা। আমি মেবারকে খুঁজে পেয়েছি সেই আনন্দে অন্ততঃ পনেরো মিনিটের জন্তে চোখ বুঝতে পারি। অবশ্য আমি চার্চিল নই। যেখানে যখন স্তুবিধা পাই সেখানে চোখ বোজবার শিক্ষা এখনো পাইনি। চীপট পরিবারের বিশাল নরম তাকিয়া, ধরধবে জাজিম তবু যে চোখ বোজবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল—একথা মানতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ গ্রন্থ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাট্টার
আজব জীবিকা	৩'০০ ॥ মায়াবতী ২'৫০ ॥
জীবন-মুহুর্ত ২য় মুঃ	২'৫০ ॥ অভিষার ৩'৫০ ॥
অরুণা হালদারের	রণজিৎ রায়ের
তারার	২'০০ ॥ ফসল ৩'৫০ ॥
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
সেই আশ্চর্য রাত	৩'০০ ॥ শাদা-কালো ৩'০০ ॥
বিমল দত্তের	ঋষি দাসের
কাশ্মীর প্রিমেস	৩য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥ মা ৩য় মুঃ ২'৭৫ ॥
পরিমল গোস্বামীর	

(বারট্রাও বাসেলের
The Conquest of Happiness)

সুখের সন্ধানে

পাঁচ টাকা ॥

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

শিল্পীর স্বাধীনতা, অধুনা সকল দেশেই তর্কের বিষয় রূপে উপস্থিত হয়েছে। এই তর্ক এদেশে আগেও ছিল। কিন্তু এখন চৈনিক আক্রমণের পরবর্তীকালে ভারতে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে। রুশ-ডিস্ট্রিক্টর স্থালিনের মৃত্যুর পর থেকে সোবিয়ৎ দেশে এবং মাও-সে-তুং-এর বহুখ্যাত বহুনির্দিষ্ট “শত গুণ্য বিকাশ”-তত্ত্ব প্রচারের পর চীনে শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তার ফল ভাল হয়নি। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার [২৩. ৩. ৬৩] ভাষ্যকার শ্রীসঙ্ক্যাকর নন্দীর বিবরণে তা দেখা যায় :

“১৯৫৭-য় বরিস পাস্তারনাকের ভাগ্যে যে অপমান লাঞ্ছনা জুটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ইলিয়া এরেনবুর্গের ভাগ্যে। এরেনবুর্গের বয়স এখন বাহান্তর। এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ : কম্যুনিজম-বিরোধিতা।

ক্রেমলিনে গত ৮ই মার্চ যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়, তাতে ৫০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্লুশ্চফ, যিনি শিল্প-সাহিত্য থেকে চাষবাস পর্যন্ত সব কিছুতেই বিশেষজ্ঞ, এই সম্মেলনে পনেরো হাজার শব্দে রচিত এক বক্তৃতা পড়েন। মস্কো রেডিওয় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে সেটিকে পাঠ করতে। রবিবারের প্রতিটি সংবাদপত্রে ফলাও করে তা প্রকাশিত হয়।

পূর্ববেক্ষকদের ধারণায়, এই বক্তৃতাটি লেখক, চিত্রশিল্পী, গায়ক, সুরকার, চলচ্চিত্রকার, ভাস্কর প্রভৃতি ষাঁরা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট পার্টির মোড়লী করার অধিকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, তাঁদের সতর্কীকরণ।

সম্প্রতি পর পর কয়েকটি সভায় এরেনবুর্গ এ সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, রাজনীতির মত শিল্পী-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান” যেনে নেওয়া হোক। সরকার-অনুমোদিত “সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা”ও থাকুক, আবার পশ্চিমা ভাবধারাগুষ্ঠ শিল্প-আঙ্গিকও থাকুক।

ক্লুশ্চফ এটিকে নাকচ করে তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, “আদর্শবাদের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মানলে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, কৃষক-শ্রমিকদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে।” উক্তিটি থেকে

পরিষ্কার বোঝা যায়, সোভিয়েত বুদ্ধিবাদীদের এই চঞ্চলতায় পার্টি কর্তারা রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন।

এরেনবুর্গের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী যখন আক্রমণ শুরু করেন, সভায় তখন এরেনবুর্গ ছিলেন না। পার্টির আদর্শবিষয়ক কর্তা লিওনিদ ইলিচেভ যখন তাঁকে স্তালিন আমলে স্তালিনের প্রশংসা করার জগ্ন ভণ্ড বলে গালিগালাজ শুরু করেন, তখন পঙ্ক-কেশ, কপ্প স্বাস্থ্যের এই বৃদ্ধ লেখক সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে যান।

তখন এক তরুণ লেখককে তিনি বলেন, “সোভিয়েত শিল্পের ফুল ফোটা আর আমার দেখা হল না। তবে তোমরা হয়তো দেখতে পার—কুড়ি বছর পরে।”

ক্রুশ্চফের সব থেকে বেশী রাগ যেন বিমূর্ত শিল্পের বিরুদ্ধে। প্রকাশের এই রীতিটির পক্ষাবলম্বনের জগ্ন তিনি এরেনবুর্গের মতামতকে আক্রমণ করে বলেন, “আদর্শের শাস্তিপূর্ণ মহাবস্থানের বুলি কপচে এই বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষ্য। এঁরা পূরণ করতে চাইছেন, এজগ্ন এই বুলটিকে তাঁরা ‘ট্রোজানের ঘোড়ার’ মত আমাদের দেশে টেনে এনেছেন।”

পশ্চিমী ছুনিয়া তরুণ সোভিয়েত কবি ইয়েভতুশেকোর কবিতার প্রশংসা করে তাকে “অ্যাংগ্রি ইয়ংমেন” আখ্যায় ভূষিত করেছেন। সভায় ক্রুশ্চফ তাঁকে দাবড়ানি দিয়ে বলেন, “আমাদের শত্রুরা তোমার এত প্রশংসা করে কেন? নিশ্চয়ই তাঁদের মনোমত বস্তু তোমার লেখার মধ্যে রয়ে গেছে। এই বেলা ভেবেচিন্তে ঠিক করে নাও, কি তোমার পছন্দ।”

একটি অভিযোগ ছিল, “মার্শাল স্তালিনের আমলে শিল্পী ও লেখকরা শুধু ‘বাস্তবতার বার্নিশ’ই লাগিয়েছেন। অথচ তাঁর অপরাধ সম্পর্কেও তাঁরা ওয়া-কিবহাল ছিলেন। তাঁরা স্তালিনকে বিশ্বাস করে এটুকু চিন্তা করেননি যে, দমন-পীড়ন সং-নির্দোষদের উপরও হতে পারে।”

এই অভিযোগের জবাবে ক্রুশ্চফ বলেন, স্তালিন কম্যুনিজমের লক্ষ্য পূরণার্থে সমর্পিত-গ্রাণ ছিলেন। স্তালিনের মৃত্যুতে তিনি কঁদেছিলেন। সে কান্নায় কোন কপটতা ছিল না। যদিও তাঁর ব্যক্তিগত রহ দোষের কথা আমরা জানতাম। ব্যক্তি-মানুষের জগ্ন ঝাঁরা আরও বেশি স্বাধীনতা দাবি করেন, তাঁদের নিন্দা করে ক্রুশ্চফ বলেন, “আমার মতে, ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা কখনোই দেওয়া সম্ভব নয়, পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজেও না।”

এরেনবুর্গের বিরুদ্ধে যে ঝড় ঘনিয়ে উঠছে, গত জানুয়ারীতেই

‘ইজ্জতেস্তিয়া’র প্রকাশিত ইয়েরমিলভের আক্রমণ থেকেই তা বোঝা গেছিল। সেজানের ছবি ভাল লাগে—এহেন একটি পাপ কথা এরেনবুর্গ উচ্চারণ করেছেন এবং কথাটি পার্টির অনুশানের বিরোধী। ইয়েরমিলভের প্রবন্ধে প্রচ্ছন্ন এমন ইঙ্গিতও ছিল যে, স্তালিনের স্তনজরে থেকেই তিনি গর্দান রক্ষা করেছেন।

ইয়েরমিলভের প্রবন্ধে যে প্রশ্নটি মাথা চাড়া দেয়, তা হল স্তালিন আমলে বর্তমান পার্টি কর্তারাই বা কি করে গর্দান বাঁচালেন? ৮ই মার্চের সভায় তাই ক্রুশ্চফ সবিস্তারে কাহিনী ফাঁদেন কিভাবে তাঁরা রক্ষা পেলেন এবং এও বোঝাতে চান যে, স্তালিন লোকটি যতটা ভাবা হয়, ততটা খারাপ ছিলেন না। এঁরা তখন বুঝতেই পারেননি যে, নির্দোষরা শিকার হচ্ছেন।

ক্রুশ্চফের এত সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই : স্তালিন-আমলকে কলঙ্কিত করে লেখকরা এখন যা লিখছেন, তার দ্বারা পার্টিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। শিল্পে বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কে তাঁর মত : এতে গাঢ় এবং বিষণ্ণ রঙ ব্যবহার করা হয়, মানুষের চেহারা ভেঙে চুরে দেখান হয়। শিল্পীদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সাম্যবাদী চিন্তা-ধারণাকে রূপ দেওয়া। যে সব শিল্পী এতে বিশ্বাসী নয়, পার্টি তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়োজন জঙ্গী, বিপ্লবী শিল্পী।

শিল্প এবং শিল্পীর স্বাধীনতা বহুকালের পুরনো প্রশ্ন, পুরনো দাবি। সাম্যবাদী সমাজে বহু কিছু অস্বাভাবিক সঙ্গ এই স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিও অনুসৃত বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। সোভিয়েতের যে সব লেখক-শিল্পী আজ শিল্পীকে পার্টি নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত করে, নিজ নির্দেশের বাহন করতে চান, তাদের পরীক্ষা দেবার মুহূর্ত আজ উপস্থিত। তাঁরা মাথা নোয়াবেন, না আত্মহত্যা করবেন, না শিল্পীর অহঙ্কারে মেদিনী কাঁপাবেন?

এই দীর্ঘ বিবরণী কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। চীন দেশেও একই ঘটনা ঘটেছে। আজ তাই ভারতীয় চিন্তাজীবীদের সামনে প্রশ্ন—কোন পথে যাব?—সাম্যবাদ; না, গণতন্ত্রবাদ? যদি গণতন্ত্রকে রক্ষা না করা যায় তবে স্বাধীন চিন্তার অবসান, মানবতার অপমৃত্যু। তাহ’লে স্বাধীনতার আর রইল কী?

* * * *

রাজমহেন্দ্রীতে তেলুগু লেখক সম্মেলন

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হায়দ্রাবাদে প্রথম নিখিল ভারত তেলুগু লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর দ্বিতীয় সম্মেলন বসে এই বছরে (১৯৬৩)

রাজমহেন্দ্রীতে গত ৪, ৫, ৬ জালুঅরিতে। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের উপমন্ত্রী শ্রী ডি. এস. রাজু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

সারা ভারত থেকে দুই শ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। তেলুগু কবি শ্রীমধুনাপান্তলা সত্যনারায়ণ শাস্ত্রী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, তেলুগু সাহিত্যের অগ্রগতির পরিমাপ হবে এই সম্মেলনে।

উদ্বোধন ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, আজ জাতীয় সংকটের দিনে পথনির্দেশ দেবেন লেখক সমাজ। সাধারণ মানুষকে দেশমন্ড্রে উদ্বোধিত করবেন তাঁরাই, জাতীয় সংহতি সাধনে তাঁরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

৪ঠা অক্সরাজোর মন্ত্রী শ্রী. পি. ভি. নরসিংহ রাও “দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য” আলোচনা আসরে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অল্প লেখকদের রচনা দেশকে প্রেরণা দান করেছিল, আজ সংকটলগ্নে তার পুনরাবৃত্তি চাই। সর্বশ্রী জামদগ্নি শর্মা, পুরিপণ্ডা অগ্নলাস্বামী, ভি. এল. নরসিংহ রাও, শ্রীমতী উটুকরী লক্ষ্মী কান্তাস্মা এই আলোচনায় যোগ দান করেন ও স্বরচিত দেশপ্রেমমূলক কবিতা পাঠ করেন।

ঐদিন “সংস্কৃত বিভাচর্চায় তেলুগুভাষীর দান” আলোচনায় পণ্ডিত মনীষীরা যোগ দেন। সর্বশ্রী কে. লক্ষণ শাস্ত্রী কে. ভি. এন. আপ্পা রাও, ভাগ্নম আপ্পালাছিরুলু অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ঐ দিনই ‘কাব্য বঙ্গমায়া সভা’ (কবি সম্মেলন) অস্থগ্ঠিত হয়। কবি সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন কবি সম্রাট শ্রীবিখনাথ সত্যনারায়ণ। রাজ্য মন্ত্রী শ্রী পি. ভি. নরসিংহ রাও উদ্বোধন করেন। কবি সম্রাট তাঁর ভাষণে বলেন, কাব্য সাধনার মূল লক্ষ্য—আনন্দ। কাব্যের রূপ ও সংজ্ঞা বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্থলভ খ্যাতির মোহ ও লবু আমোদের আকর্ষণ কবি ও কাব্য পাঠক, উভয়কেই বর্জন করতে হবে। কবিতা যে মহৎ সৃষ্টি, এই বিষয়টিই তিনি জোরের সঙ্গে তুলে ধরেন।

স্বর্ভশ্রী মধুনাপান্তলা শাস্ত্রী, এম. শেযাশায়ী, কে. ভি. স্বত্রঙ্গণ্য দীক্ষিতুলু, ডঃ ভি. ভি. আবধানী কাব্যালোচনায় যোগ দেন ও তেলুগু কাব্যের নানা রূপ ও পর্ব আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিন ৫ই “ছোট গল্প ও উপন্যাস” আলোচনা আসরে সভাপতিত্ব করেন ডঃ জি. ভি. নীতাপতি। সর্বশ্রী মোক্ষপতি নরসিংহ শাস্ত্রী, নোরী নরসিংহ শাস্ত্রী, মুনিমাণিক্যম্ নরসিংহ রাও, এম্ রামা মোহন রাও, বেণুগোপাল রাও প্রমুখ কথাশিল্পী আলোচনায় অংশ গ্রহণ

করেন। তেলুগু গল্প-উপন্যাসের কৃতিত্ব-অকৃতিত্বের কথা তাঁরা আলোচনা করেন।

ঐ দিন সন্ধ্যায় নাট্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যমন্ত্রী শ্রী. আশ্লা রাও সভাপতিত্ব করেন। শ্রীরাও তেলুগু নাট্যান্দোলনের আদি থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত দূরবিস্তৃত ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। সর্বশ্রী বন্দ কনক লিঙ্গেশ্বর রাও, ভামিদিপতি রাধাকৃষ্ণ, পঠুবুচ্চি সঘশিব রাও, মোক্ষপতি নরসিংহ শাস্ত্রী, ভি. ভি. এস. নরসিংহ রাও, জে. মাধবরাম শর্মা প্রভৃতি লেখক তেলুগু নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও অগ্রগতির বিচার করে ভাষণ দেন।

দ্বিতীয় দিন মহিলা লেখকদের একটি অধিবেশন হয়। শ্রীমতী এ. বিবেকানন্দ দেবী সভানেত্রীত্ব করেন। শ্রীযুক্তা জি. ইন্দুমতী দেবী উদ্বোধন করেন। সর্বশ্রীমতী আই. সরস্বতী, ইউ. দেবী, রামা দেবী, লক্ষ্মীকান্তাম্মা, জানকী রাণী, হেমলতা মীনাক্ষী, পুলামম্মা, কে. ভি. অচ্যুত বল্লী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শেষ দিন ৬ই জানুয়ারির প্রধান অনুষ্ঠান “সাহিত্য সমালোচনা” আলোচনা আসর। প্রখ্যাত অলংকার শাস্ত্রী শ্রীজম্মলামাদক মাধব রাম শর্মা পৌরোহিত্য করেন। তিনি প্রাচীন আলংকারিক সূত্রাদি বর্জন না করার পরামর্শ দেন। নবীনদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, তাঁরা যেন মন খোলা রাখেন, বিচার বুদ্ধি জাগ্রত রাখেন। বর্তমানকালের সাহিত্য সমালোচনায় প্রাচীন অলংকার-শাস্ত্রের যে ওদামিগ্ন ও অবজ্ঞা দেখা যায়, তা বর্জনীয় বলে তিনি মনে করেন। শিল্পবিচারে ও কালবিচারে সেই রচনাই সার্থক হবে যা মানবজীবনের কল্যাণ ও মনের শান্তির পোষকতা করবে বলে তিনি মনে করেন।

সর্বশ্রী জি. সীতাপতি, কবি সম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ, কোরলাপতি রাম মূর্তি, চিলুকুরি পদ্মায়া শাস্ত্রী, শ্রীবাস্তব প্রমুখ লেখকরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমানকালে নিরপেক্ষ সাহিত্য সমালোচনায় শোচনীয় অল্পপস্থিতিতে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মননগত সততা ও শিল্পগত আন্তরিকতার বহুল চর্চা কামনা করেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী ডক্টর বি. গোপাল রেড্ডী তৃতীয় দিনের অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। জাতীয় সংকটলগ্নে লেখকদের মহা দায়িত্বের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। ‘আধুনিক তেলুগু লেখকদের সমবেত সাধনায় তেলুগু সাহিত্যের যে উন্নতি ঘটেছে, সেজন্য তিনি তাঁদের প্রশংসা করেন। কথ্য তেলুগু ভাষাকে সাহিত্যের প্রধান বাহন ব্যবহারের

জ্ঞাত তাঁরা যে সাহসিক প্রয়াস করে চলেছেন, তাতে ডক্টর রেড্ডী আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন, অচিরে ‘ব্যবহারিক ভাষা’ সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠবে। সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থ ও ‘সহিতি মঞ্জরী’ পত্রিকা ডক্টর রেড্ডী সম্মেলনে বিতরণ করেন।

তৃতীয় দিনের শেষ আলোচনা-সভা—“ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান”—আসরে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর ওরুগাণ্ডি রামচন্দ্রায়। যথার্থ ঐতিহাসিক-গবেষকের চারিত্র-লক্ষণ নির্ণয় করে তিনি বলেন, অন্ধ্রে এরকম গবেষক আছেন—সরস্বতী কে. লক্ষ্মণ রাও, চিলুকুরী বীরভদ্র রাও, মল্লমপল্লী সোমশেখর। তাঁরাই প্রথম প্রাচীন ইতিহাস-গবেষণামূলক রচনা লিখেছেন।

এই আসরে বিভিন্ন বিষয়ে বলেন : শ্রীরঙ্গবন্দী স্ববরাও [‘অন্ধ্রে ঐতিহাসিক গবেষণা’], শ্রী বি. ভি. নরসিংহ রাও এবং শ্রীলবণম [‘তেলুগু শিশুসাহিত্য’], শ্রীমহীধর জগনমোহন রাও [‘তেলুগু বিজ্ঞান-সাহিত্য’], শ্রী কে. এস. স্বব্রহ্মণ্য [‘তেলুগু সাংবাদিকতার বিবর্তন’], অধ্যাপক কে. স্ববরামায়া [‘পম্পা ও নরায়’], শ্রীমামবেদম্ জানকীরাম [‘তেলুগু সাহিত্য-ধর্মী সাংবাদিক রচনা’], শ্রী এন. গঙ্গাধরম [‘অন্ধ্র লোকগীতি’]।

সম্মেলনে তিনজন অল্পলেখকের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাঁরা হলেন—কবি কস্তুরী ভেঙ্কটেশ্বর রাও, ঔপন্যাসিক গোপীচাঁদ, গল্পকার কাশীম থান্।

মার্কাস স্কয়ারে পক্ষকালব্যাপী বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের সপ্তমে ২২শে মার্চ এক গ্রন্থ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সংঘের সভাপতি শ্রীস্বধীরচন্দ্র সরকার। সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রকাশিত ও মুদ্রিত তিন হাজার বাংলা বই উপস্থিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার-আয়োজিত গ্রন্থমুদ্রণ প্রতিযোগিতায় বাংলা বই গত কয়েক বছর ধরেই পুরস্কার লাভ করেছে। মুদ্রণ ও প্রকাশন শিল্পের উন্নতি এই প্রদর্শনীতে লক্ষ্য করা গেল। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলীর জ্ঞাত তিনটি বিশেষ ‘স্টল’ খোলা হয়। সেকাল ও একালের নানা লেখকের নানা বইয়ের এই প্রদর্শনী খুবই আকর্ষক হয়েছিল।

“কবি নজরুল জন্মোৎসব কমিটি”র পক্ষ থেকে কাজি আব্দুল ওহুদ এক বিবৃতিতে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন—

এই বৎসর বিপ্লববাদী আন্দোলনের ইতিহাস ও তাতে নজরুল-সাহিত্যের প্রেরণা ও অঙ্গসন্ধানার্থ একটি আকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হবে। নজরুলের সমগ্র রচনাবলীও প্রকাশিত হবে। দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে নজরুল-রচনার 'কপিরাইট' রয়েছে। তাঁদের সহযোগিতা ভিন্ন একাজ সম্ভব নয়। কমিটির আপিসে—৬, অ্যান্টনী বাগান লেন, কলকাতায়—যদি নজরুল-অনুরাগীরা এ বিষয়ে যোগাযোগ করেন, তবে উদ্দেশ্য সফল করা যায়। এই বৎসর কবির ৬৩তম জন্মোৎসব তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হবে।

* * * *

কৃষ্ণনগরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ মার্চ কৃষ্ণনগরের সুরম্য রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিবেশন-উপলক্ষে আয়োজিত একটি সাময়িক পত্র ও চিত্রাদির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় সঙ্গীত-প্রতিনিধি শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মূল অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীহিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মূল সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত এবং ইউ. এস. আই. এস-এর প্রতিনিধি মিঃ ষ্টালিন বি ষ্টীল সভায় বক্তৃতা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সমবেত অভাগতদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ সিংহরায় তাঁদের রিপোর্ট পাঠ করেন। লোকসঙ্গীতশিল্পী শ্রীভারাপদ নাহিড়ীর সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর মূল অধিবেশন পরিসমাপ্ত হয়। এই অধিবেশনের শেষে শ্রীতরুণ রায়ের পরিচালনায় কলিকাতার 'থিয়েটার স্ট্রেন্টারের' শিল্পীবৃন্দ দেশাত্মবোধক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সৈনিক' অভিনয় করেন।

দ্বিতীয় দিন ১৬ই মার্চ সকাল ৮টায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। ডাঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত এই সভায় ভাষণ দেন। তারপর সকাল দশটায় শুষ্ক

হয় কাব্যশাখার অধিবেশন। এই অহুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। আঠাশজন প্রবীণ ও নবীন কবি সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

ঐদিন বৈকালে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে শিশুসাহিত্য শাখার অধিবেশন বসে। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী। সভায় শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষকুমার দে শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন শ্রীমতী সুনীতি গুপ্ত, শ্রীবেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীষগীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর সাহিত্যশাখার অধিবেশন বসে সন্ধ্যা ছয়টায়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। সভার উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীঅনন্ত রায়। সভায় শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মানসভ্যতায় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী বলেন যে, নিছক কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর রঙীন মায়ায় পাঠকের মন ভুলোবার দিন চলে গেছে। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিকদের নূতন কাল-চেতনা, ভাবালুতায়ুক্ত কঠিন বাস্তববোধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের পথে পদচারণাকে তিনি অভিনন্দিত করেন। তবে যে সব আধুনিক সাহিত্যিকের রুচিহীন দেহবাদী চিত্রাঙ্কনের দিকেই প্রবণতা, তিনি তাঁদের কঠিন সমালোচনা করেন।

সাহিত্যশাখার পর রাত্রি সাড়ে সাতটায় নাট্যশাখার অধিবেশনে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রবীণ নাট্যকার শ্রীমমথ রায়। নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতির অভিভাষণে ডঃ ভট্টাচার্য এয়ুগে চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে নাটকে অভিনয়ের তুলনায় প্রয়োগরীতির ওপর অতিনির্ভরতা এবং ফলে পেশাদার মঞ্চে প্রথম শ্রেণীর নাটকের অভাব সম্পর্কে আলোচনা করে আশাপ্রকাশ করেন যে, বর্তমানের শৌখীন রঙ্গমঞ্চ থেকেই সত্যকার ভাল নাটকের উদ্ভব হবে।

অধিবেশনের তৃতীয় দিন ১৭ই মার্চ সকালে অহুষ্ঠিত হয় কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব। শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সর্বশ্রী মমথ রায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কুমারেশ ঘোষ, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্তপ্রসাদ রায়, স্মরণ

আচার্য, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, সন্তোষ দে, তারিণীপ্রসাদ রায় দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে প্রদ্বা নিবেদন করেন।

কাজী আবদুল ওহুদের সভাপতিত্বে ঐদিন বৈকাল চারটায় প্রবন্ধ শাখার অধিবেশন বসে। এই সভার উদ্বোধন করেন ডঃ স্ববোধরঞ্জন রায়। ডাঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীমতী মঞ্জু গুহরায় প্রভৃতি মননশীল প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অতঃপর স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সভাপতিত্বে সঙ্গীতশাখার অধিবেশন বসে। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীস্বথময় গোস্বামী। সভাপতিমহাশয় তাঁর ভাষণে বাংলায় নিজস্ব সঙ্গীতধারার সার্থক চর্চার ওপর বিশেষ জোর দেন। শ্রীতারাপদ লাহিড়ী বিভিন্ন সুরে দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সমন্বিত বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সবশেষে ডাঃ কালিকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অল্পাধিক সমাপ্তি অধিবেশনে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন সরকার, ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী প্রভৃতি স্বরগীয় সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবিত চৈতন্য সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় যাতে নদীয়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্তে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অপর দুটি প্রস্তাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কৃষ্ণনগরের বাস্তুভিটায় তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সৌধ নির্মাণের এবং পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবী জানানো হয়। সভাপতি ডাঃ সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতিতে, সমবেত সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের এবং বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধক ও বক্তাদের ধন্যবাদ জানানোর পর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তিনদিন-ব্যাপী কৃষ্ণনগর অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

★ যদি পড়তেই হয় ত

তবে বেঙ্গলের বই পড়ুন ॥

পাঠকের চিঠি

মাননীয়

সম্পাদক মহাশয়,

“সাহিত্যের খবর” কলিকাতা : ১২

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা সাহিত্যের খবর শরৎচন্দ্রের শৈল্পিক প্রতিভার শ্রেণী নির্ণয় লইয়া প্রাজ্ঞ প্রবীণ ও তরুণ সমালোচকদের মধ্যে যে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে—তাহা গভীর মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিলাম।

শরৎচন্দ্র মূলতঃ প্রথম, না দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিক—সে সম্পর্কে রায় দিয়া দল ভারী করার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। তবে শেষোক্ত সম্প্রদায় শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভার অসারতা প্রমাণ করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রবন্ধে মাঝে মাঝে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন—যাহা বাঙলা সাহিত্যের পাঠক রূপে আমার নিকট যথেষ্ট আপত্তিকর বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই চিঠিতে দুইচারটি কথা বলিতে চাই।

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন : “আধুনিক মাহুষের প্রত্যয়, প্রয়াস, ব্যর্থতা, জীবনতৃষ্ণা, জীবন-জিজ্ঞাসা এ সব কিছুই শরৎ উপন্যাসে নাই।” অত্র ভাষায় তাহারই অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয় : “গোঁরার স্বগভীর জীবন-জিজ্ঞাসা ও চতুরঙ্গের অফুরন্ত জীবনতৃষ্ণার পূর্বাভাস আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাই বন্ধিমে। কিন্তু তার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও শুনি না শরৎচন্দ্রে।”

আধুনিক মাহুষে প্রত্যয় ইত্যাদি বলিতে তাঁহারা কী বুঝাইতেছেন, আমি জানি না। কিন্তু সহজ সরল ভাষায় জীবনতৃষ্ণা বা জীবনজিজ্ঞাসা বলিতে যাহা বুঝি—তাঁহার অভাব শরৎ-সাহিত্যে নাই বলিলেই চলে। এ সম্পর্কে বহু আলোচিত ‘দেনা-পাওনা’ হইতেই ঘোড়শীর একটি উক্তি উদ্ধৃতি হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে : “তাদের (নির্মল-হৈম) দেখেইত আমি ঘোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী পদ যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়া-ছিঁড়ির অবধি নেই, যে জন্তে কলঙ্কে আপনারা দেশ ছেয়ে দিলেন সে-যে আজ জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্ছি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েছি জানেন ? সে ওই খালে। মেয়েমাহুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি কত মিথ্যা সে কথা ওদের দেখেই বুঝতে পেরেছি।”

আমার জিজ্ঞাস্য ইহা কি স্ত্রীত্ব জীবনতৃষ্ণা নহে? দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের জীবনজিজ্ঞাসা এবং বঙ্কিম-সাহিত্যের জীবনজিজ্ঞাসা কি এক? অতীতের রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরেবাইরের যে জীবনজিজ্ঞাসা তাহা হইতে শেষের কবিতার জীবনজিজ্ঞাসা (অবশ্য যদি থাকে) স্বতন্ত্র নহে? আসল কথা যে যুগে যে উপন্যাসের সৃষ্টি, সেই যুগ-জিজ্ঞাসাই উপন্যাসের জীবন-জিজ্ঞাসা বা জীবনতৃষ্ণা হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। যাহার জন্মই উনবিংশ শতাব্দীর গোরা, ঘরেবাইরে বিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি শেষের কবিতা হইতে এত স্বতন্ত্র। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, শিল্পের শাস্ত্র-কালীনতাকে আমি অস্বীকার করিতেছি।

শ্রীমদগোপাল সেনগুপ্ত তাঁহার প্রবন্ধে অত্র বলিয়াছেন: “পতিতাকে তিনি মহাসতী বানিয়েছেন……”। এই স্থলে তিনি ‘পতিতা’ শব্দটিকে কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন জানি না। আমার বক্তব্য—প্রচলিত অর্থে শরৎচন্দ্রের কোন নায়িকা সম্পর্কেই ‘পতিতা’ শব্দের প্রয়োগ চলিতে পারে না। তিনি ‘পতিতা’ শব্দের স্থলে ‘সমাজজ্বলিতা’ শব্দের প্রয়োগ করিলেই পারিতেন। শরৎচন্দ্রের পুনর্বিচার করিতে গিয়া গতানুগতিকার আশ্রয় গ্রহণ শুধু অত্যাচার নহে, অশোভনও বটে। ‘পতিতা’ শব্দ যদি তাঁহার সচেতন প্রয়োগ হয় তাহা হইলে এ কথা বলিতে আমরা বাধ্য—শরৎচন্দ্রের প্রতি প্রাবন্ধিকের শ্রদ্ধাহীনতাই ইহার কারণ।

পরিশেষে আমার সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, পল্লববাবু তাঁহার প্রবন্ধের শেষাংশে উপদেশাত্মক যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহা না করিলেই ভাল করিতেন। মূলতঃ প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিনি নিজেই যে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন—তাহাই ইহাতে প্রমাণিত হয়। শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল প্রতিপক্ষ ডঃ মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার প্রতিবাদে এই জাতীয় অশ্রদ্ধেয় মনোভাব পোষণ করেন নাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে: “বুদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া,” পল্লববাবুর এই প্রণিপাতের অভাবই আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লববাবুকে আরেকটুকু সংযত হইয়া লেখনী চালাইতে অনুরোধ করি।

নমস্কারান্তে—

ইতি

জয়ন্তকুমার রায়

কলিকাতা: ১৯

যোগাযোগ : সামগ্রিক উপন্যাস-প্রত্যয়

শক্তিপ্রসাদ পাণ্ডা

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বে লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘যোগাযোগ’ একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই উপন্যাসখানি ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে গ্রন্থ-কলেবর লাভ করে। এর আগে (১৩৩৪ আশ্বিন ও ১৩৩৫ চৈত্র) ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে প্রথম দুটি সংখ্যায় এর নাম ছিল ‘তিনপুরুষ’। তৃতীয় সংখ্যায় এই নামটি পরিবর্তিত হয়ে ‘যোগাযোগ’ নামে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে এবং এই নামেই বর্তমানে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে পরিচিত। বিদগ্ধ সমালোচকদের দ্বারা উপন্যাসটির ভাবগত, রূপগত, শিল্পগত ও রসগত দিকগুলি নানাভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে, স্মরণ্য যে সেই দিক দিয়ে উপন্যাসটির নব-মূল্যায়ন করতে বসায় কোন কৃতিত্ব নেই। তবে যোগাযোগের সামগ্রিক উপন্যাস-প্রত্যয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। যে একটি বিষয়ে সমালোচকদের সকলেই একমত হয়ে এই উপন্যাসের সামগ্রিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, সেটি হচ্ছে—যোগাযোগ সম্পূর্ণ উপন্যাস-অভিধা গ্রহণে অক্ষম ও রবীন্দ্রনাথের লেখনী মধ্যপথে থেকে গিয়ে উপন্যাসের শৈল্পিক ক্রটির কারণ হয়ে উঠেছে। কেউ বা রবীন্দ্রনাথের লেখনীর এই অপ্রত্যাশিত হঠকারিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন—উপন্যাসটির অত্যন্ত পরিমাপাধি আটের দিক থেকে গুরুতর ত্রুটি। আর কেউ বা একে বাংলা সাহিত্যের গুরুতর দুর্ঘটনার কারণ বলেতে চেয়েছেন। উপন্যাসটির সম্পর্কে তাঁদের অভিযোগের পরিপূরক মন্তব্যগুলিকে মেনে নিলেও উপন্যাসের সামগ্রিক প্রত্যয়ের মানদণ্ডে যেন তাঁদের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি অনেক পরিমাণে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে বলে মনে হয়। সেইদিক দিয়ে অসম্পূর্ণতার অভিযোগ থেকে ‘যোগাযোগ’কে মুক্ত করবার চেষ্টাই এই প্রবন্ধের মূল্যবৃত্ত উদ্দেশ্য। প্রাচীন ও বিদগ্ধ সমালোচকের মতকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে কেউ যেন না মনে করেন। কেননা, নির্বিচার মতানুবর্তিতাই যে শ্রদ্ধা-নিবেদনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—একথা আশা করি এ যুগে কেউ মানবেন না।

‘যোগাযোগ’এর অসম্পূর্ণতার অভিযোগের স্বপক্ষে সমালোচকদের উত্থাপিত সবচেয়ে জোরালো যুক্তিটি হ’ল—রবীন্দ্রনাথ প্রথমে উপন্যাসটির নাম

দিয়েছিলেন ‘তিনপুরুষ’, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে তিনপুরুষের কাহিনী বর্ণিত হয়নি বা তিনপুরুষের সামগ্রিক চেহারাটি ফুটে উঠবার সুযোগ পায়নি, তাই উপন্যাসখানি অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে।

‘তিনপুরুষ’ নামের উপন্যাসের বিচারে এই যুক্তিটি যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ‘ষোণাষোণ’ উপন্যাসের বিচারে যে সেই একই যুক্তি সমান গুরুত্বপূর্ণ থাকবে তারও কোনও তথ্য নেই। উপন্যাসখানিকে আমরা ‘ষোণাষোণ’ নামেই পেয়েছি, ‘তিনপুরুষ’ নামে নয়। এই নামান্তর উপলক্ষ্যে ১৯২৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ‘কিন্তা’ জাহাজ থেকে লেখা ও ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ‘বিচিত্রা’র প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি কৈফিয়ৎ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

—“তিনপুরুষ’ নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল ‘ষোণাষোণ’।”

এই নাম পরিবর্তন-প্রসঙ্গে তিনি যে কারণ নির্দেশ করতে চেয়েছেন তাও এখানে উল্লেখযোগ্য—“‘তিনপুরুষ’ নাম ধরে আমার যে গল্পটা বিচিত্রায় বের হচ্ছে তার নাম রক্ষা করতেই হবে এমন কোন দায় নেই। কাঁচা থাকতে থাকতেই ও নামটা বদল করব বলে স্থির করেছি। পাঠক-দরবারে তার কারণ নির্দেশ করি।

...

...

...

...

“ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জগ্রে, বিষয়গত নাম স্বভাব-নির্দেশের জগ্রে মানুষকে যখন ব্যক্তি বলে দেখিনে, বিষয় বলে দেখি, তখন তার গুণ বা অবস্থা মিলিয়ে আর উপাধি দিই—কাউকে ‘যলি বড়োবউ’, কাউকে বলি মাস্টারমশায়।

“সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার অভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক, বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্বখচিত বইয়ের শিরোনামায় যখন দেখব ‘স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর জঁধা’, বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দ্বারা ই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু ‘ওথেলো’ নাটকের যদি ওই নাম হ’ত পছন্দ করতুম না। কেননা এখানে বিষয়টি প্রধান নয়, নাটকটিই প্রধান। অর্থাৎ আখ্যানবস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঙ্গনা, নাট্যরস, সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।

“এমন একটা কিছু অবলম্বন করে গল্প লিখতে বসলুম যাকে বলা যেতে পারে বিষয়। যদি মূর্তি গড়তেম একতাল মাটি নিয়ে বসতে হত। অতএব ওটাকে ‘মাটি’ শিরোনামায় নির্দেশ করলে বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে বাধত না। বিজ্ঞান যখন কুণ্ডলকে উপেক্ষা করে তার সোনার তত্ত্ব আলোচনা করে তখন তাকে নমস্কার করি। কিন্তু কনের কুন্তল নিয়ে বর যখন সেই আলোচনাটাকেই প্রাধান্য দেয়, তখন তাকে বলি বর্বর। রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এইজন্য বিষয়টাকেই শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না। বস্তুতঃ রস-সৃষ্টিতে বৈষয়িকতাকে বড়ো জায়গা দেওয়া উচিত হয় না। যারা বৈষয়িক প্রকৃতির পাঠক তাঁদের দাবির জোরে সাহিত্য-রাজ্যে হাটের পস্তন হ’লে দুঃখের বিষয় ঘটে। হাটের মালিক বিষয়বুদ্ধিপ্রধান বিজ্ঞান।”

“এদিকে সম্পাদক এসে বলেন, সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। আমি ভেবে দেখলুম, রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা। সন্দেহ যেখানে রূপ সেখানে তাকে বলি ‘অবাক চাকি’, যেখানে বস্তু সেখানে তাকে বলি মিষ্টান্ন। সম্পাদক মশায়ের সংজ্ঞা হচ্ছে ‘সম্পাদক’, এখানে অর্থ মিলিয়ে আদালতে হলফ করে বলতে পারি শব্দের সঙ্গে বিষয়ের যোলো আনা মিল আছে। কিন্তু যেখানে তিনি বিষয় নন, রূপ—অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও একমাত্র—সেখানে কোনো একটামাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে বাঁধা অসম্ভব। সেখানে তাঁর আছে নাম। সেই নামের সঙ্গে মিলিয়ে শব্দ-মিত্র কেউ তাঁর যাচাই করে না। পিতামাতা যদি তাঁকে সম্পাদক নামই দিতেন তবে নাম সার্থক করবার জন্তে সম্পাদক হবার কোনো দরকারই তাঁর থাকত না।

গল্প জিনিসটাও রূপ; ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট।

*

*

*

*

সম্পাদকমশায় যখন গল্পের নামের জন্তে পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন ‘তিনপুরুষ’ নামটা দিয়ে তাকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন করে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল, যদেতৎ অর্থঃ মম তদন্তু রূপং তব। আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে। ছায়েবাল্লগতাস্বচ্ছা ইত্যাদি। কাহিনী বলে, তার মানে কী হল? নাম বলে, বাক্যে ‘ভাবে আজ থেকে, আমাকে

সপ্রমাণ করে চলাই তোমার ধর্ম। কাহিনী বলে; রেজিস্টার বইয়ে কর্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়েই সেটা বেকবুল যেতে চাই।

“কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন-তোরণ ওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্লটা চলে আসবে এই আমার একটা খেয়ালমাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জ্ঞে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জ্ঞেই। স্ততরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।”

—বিচিত্রা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

উপন্যাসের নামান্তর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই কৈফিয়টকে যথেষ্ট বলে ধরে নিলে স্বীকার করতে হয়—‘যোগাযোগ’ নাম নিয়েও উপন্যাসটিকে যে ‘তিনপুরুষের’ নির্দেশিত পথে চলতে হবে তার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ততা নেই। স্ততরাং ‘তিনপুরুষের’ জের টেনে ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের উপরে অসম্পূর্ণতার অভিযোগ চাপানোও যুক্তিযুক্ত নয় মনে করা যেতে পারে।

এখন ‘তিনপুরুষের’ কথা বাদ দিয়ে ‘যোগাযোগ’ হিসেবে উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ হ’তে পেরেছে কিনা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। উপন্যাসের প্রারম্ভে যোগাযোগের সেতুটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। “আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তার হ’ল বত্রিশ। ভোর থেকে আসছে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া।”—মধুসূদন-কুমুদিনীর সম্ভান অবিনাশ ঘোষালই যোগাযোগের সেতু। প্রথমে সেতুটিকে চিহ্নিত করেই উপন্যাসের কাহিনীকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ঘোষাল ও চাটুজ্যে বংশের পৌরাণিক যুগের ইতিহাসে দেখানো হয়েছে, কেমন করে এই দুই বংশের মধ্যে বিরোধের বীজ উৎপন্ন হ’ল আর ক্রমশ সেই বীজ মহীকুহের আকার ধারণ করে কিভাবে উভয় বংশের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘনিয়ে আনল। বহুদিন ধরে চাটুজ্যেদের প্রতি ঘোষাল বংশের অক্ষম ক্ষোভ তাদের মানসিক প্রবাহ ধরে বয়ে চলেছিল। অবিনাশের বাপ মধুসূদনের কপালজোরে ঘোষাল-বংশের নিভন্ত প্রদীপ আবার জলে উঠলো পূর্ণোত্তমে। চাটুজ্যে-বংশের গৌরবের ক্ষয়মান রশ্মিটুকু দেনার দায়ে পিষ্ট বিপ্রদাসকে কেন্দ্র করে কোনরকমে টিকে রইল। মধুসূদনের সৌভাগ্য-রবি যখন মধ্যগগনে, তখন সে তার অতীত গৌরবের ধ্বংসস্তুপের উপরে চাটুজ্যে-বাড়ির মেয়ে কুমুদিনীকে বিয়ে করে বিজয়-নিশান প্রোথিত করবার চেষ্টা করল। উপন্যাসের সংঘাত আর এক নতুন দিকে মোড় নিল।

মধুসূদন কুমুদিনী ছ'জগতের মাছুষ। মধুসূদন ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনেও সে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির দাস। কুমুদিনীও তার কাছে এক ধরণের পণ্য। ব্যবসায়ীর খেয়ালখুশীর বাইরে তার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থের গোঁরবে এই পণ্যকে মধুসূদন কুক্ষিগত করতে চায়। প্রেমের পথ যে সূক্ষ্ম পথ ধরে চলে, প্রেমের উদ্বোধনে যে আরতির প্রয়োজন হয়—সেই সূক্ষ্মবোধ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মধুসূদনের কোথায়? তাছাড়াও চাটুজ্যো-বংশের উপরে বংশানুক্রমিক লালিত আক্রোশে মধুসূদন সেই বংশের উপরে এক প্রবল রকমের বিরূপতা পোষণ করে। কিন্তু কুমুদিনীর জীবনের যে উনিশটি বছর তার আওতার বাইরে কেটেছে, সেখানে তার কোনও জোর নেই। অর্থের গোঁরব দেখিয়ে, উপহারের আড়ম্বরে, তোষণ বা শাসন কোন পথেই সে কুমুদিনীর মনকে জয় করতে পারেনি। অথচ যে সহজ উপায়টুকু গ্রহণ করলে অনায়াসে তাকে জয় করা যেতো, সেটুকু বুঝবার মতো ক্ষমতাও মধুসূদনের নেই। ফলে পাশাপাশি থাকলেও দুজনে ছ'জনের কাছে হয়ে উঠলো—দুই দ্বীপের অধিবাসী। দৃশ্য অথচ দুর্বোধ্য।

কুমুদিনীর জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই জগতের মধ্যে সে তার আত্মগত মানস-বিলাস নিয়েই মগ্ন। মনের মধ্যে যে আদর্শ প্রেমিকটিকে সে লালন করে এসেছিল এতদিন, তার সঙ্গে মধুসূদনের কোনো মিল খুঁজে না পেয়ে এক নির্বিকার সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে চাইলো সে। মনের সব আকুলতাকে তার মানস-দেবতার চরণে অর্পণ করে দিয়ে মধুসূদনের সমস্ত আঘাতকে সহ্য করবার জন্তে সে প্রস্তুত হ'ল। কিন্তু মধুসূদনের কাছে এই নির্বিকারত্ব অসহনীয় হয়ে দেখা দিল। কারণ কুমুদিনীর মন মধুসূদনের কাছে থেকেও ভিন্নমুখী। স্বামীর শয্যা শয়ন করেও তার অন্তর বিরুদ্ধ। যে মধুসূদন কোনোদিন কারো কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি, তাকেও এই নির্বিকার কাঠিন্যের কাছে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। আর এই পরাজয়ের আক্রোশ কখনো চাটুজ্যো-বংশের উপরে স্লেষ হয়ে, কখনো বিপ্রদাসের প্রতি ব্যঙ্গ হয়ে আর কখনো বা কুমুদিনীর উপরে আঘাত হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। যে কুমুদিনী পিতার প্রতি মায়ের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার মনোভাব নিয়ে স্বামীর সমস্ত অত্মায়কে হাসিমুখে সহ্য করবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ঘোষাল-বাড়িতে বধু হয়ে এসেছিল, সেই কুমুদিনীও শেষপর্যন্ত ফিরে আসতে বাধ্য হ'ল দাদা বিপ্রদাসের আশ্রয়ে।

অবনতির দ্বারা জয়লাভের শাস্ত প্রেম-নীতি মধুসূদনের জানা ছিল

না। প্রভুত্ব ও দাসত্বই ছিল তার কাছে একমাত্র বাস্তব ও সত্য। তাই প্রভুত্বের দ্বারা কুমুদিনীকে জয় করতে না পারায় সহজলভ্য শ্রামার স্থল দেহোপভোগের দিকে মধুসূদনের মন আকর্ষণ অল্পভব করলো। কুমুদিনীর প্রত্যাখানের যন্ত্রণাকে চাপা দেওয়ার জন্য শ্রামার সাগ্রহ আত্মদানকে মধুসূদন ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

কিন্তু শেষপর্যন্ত সন্তান-সন্তবা কুমুদিনীকে মধুসূদন তার ভাবী বংশধরের জননী হিসাবেই ডাক দিয়েছে। নিজের সমস্ত অনিচ্ছা ও বিরূপতা সত্ত্বেও কুমুদিনীকে সে ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে। সন্তানপালনের দায়িত্ব নিয়ে চাটুজ্যো-বংশের মেয়ে কুমুদিনী, বিপ্রদাসের হাতে গড়া কুমু, তার সমস্ত স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে ঘোষাল-বাড়ির অস্থিতিকর পরিবেশের মধ্যে ফিরে গিয়েছে। এক ভাবী সন্তানের আগমনী ঘোষাল ও চাটুজ্যো-বংশের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা সূচিত করেছে, মধুসূদন-কুমুদিনী এই দুই স্বতন্ত্র দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগের সেতু রচনা করতে এগিয়ে এসেছে। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে এই সেতুটির ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসটিকে শেষ করা হয়েছে আর সেই সেতুটিকে মূলতঃ উপলক্ষ্য করেই উপন্যাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের সম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবার পথে কোন বাধাই নেই।

কোন সমালোচক কয়েকটি প্রশ্নের উত্থাপন করে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তিকে অতর্কিত বলে অভিযোগ করেছেন, এই অভিযোগের কারণ হিসাবে প্রথমতঃ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে—“মধুসূদন কি শ্রামার কলুষিত আসনের এক পার্শ্বেই তম্বহার অবহেলার স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়েছে, না, স্ত্রী অপেক্ষা সন্তানের জননীকে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে?”^১

প্রশ্ন হিসাবে এটি অত্যন্ত সঙ্গত ও সূচিস্থিত প্রশ্ন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর যে দিতেই হবে এমন কোন দায়বান্ধা উপন্যাসিকের থাকতে পারে না। সার্থক উপন্যাসিক যতটুকু ভাবেন বা বলেন, পাঠককে দিয়ে তার অনেক বেশী বলিয়ে নিতে বা ভাবিয়ে নিতে পারেন। উপন্যাসিকের প্রদত্ত ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করেই পাঠকের অল্পভূতি নিবিড়তা লাভ করে। শ্রামা ও মধুসূদনের পঙ্খিল সম্বন্ধের চিত্রাঙ্গন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কুশলী শিল্পীমন যে ছ’একটি ইঙ্গিত রেখে গিয়েছে—তাতেই ভবিষ্যতে মধুসূদনের সংসারে শ্রামার স্থান যে মধুসূদনের সন্তানের জননীকেও অতিক্রম করে যাবে এমন মনে হয় না।

“শোনা গেছে শ্রামাসুন্দরীকে মধুসূদন কখনও কখনও মেরেওছে, শ্রামা

১, ২—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

যখন তারঘরে কলহ করেছে, তখন মধুসূদন তাকে সকলের সামনেই বলেছে, 'দূর হয়ে যা বেরিয়ে যা বজ্জাত, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে,' কিন্তু এতেও কিছু আসে যায় নি। শ্রামার সম্বন্ধে মধুসূদন আপন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে। ইচ্ছে করে মধুসূদন তাকে যা দিয়েছে শ্রামা যখনই তার বেশি কিছুতে হাত দিতে গেছে অমনি খেয়েছে ধমক। শ্রামার ইচ্ছে ছিল সংসারের কাজে মোতির মার জায়গাটা সেই দখল করে, কিন্তু তাতেও বাধা পেলে; মধুসূদন মোতির মাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, শ্রামাসুন্দরীকে বিশ্বাস করে না। শ্রামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রং লাগেনি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে। যেন শীতকালের বহু ব্যবহৃত ময়লা মেরজাইটার মতো, তাতে কার্কাবেরের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন করবার জিনিস নয়, খাট থেকে ধুলোয় পড়ে গেলেও আসে যায় না কিন্তু ওতে আরাম আছে। শ্রামাকে সামলিয়ে চলবার একটুও দরকার নেই, তা' ছাড়া শ্রামা সমস্ত মনপ্রাণের সঙ্গে ওকে যে বড়ো বলে মানে, ওর জন্তে সব সহিতে সব করতে রাজি, এটা নিঃসংশয়ে জানার দরুণ মধুসূদনের আত্মমর্যাদা স্বেচ্ছা আছে। কুমু থাকতে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল।" (—যোগাযোগ, —রবীন্দ্রনাথ)

কুমুর দ্বারা আহত আত্মমর্যাদার ক্ষতের উপরে শ্রামাকে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে মধুসূদন, আর কিছু নয়। কিন্তু যখন তার এই আহত পৌরুষ নতুন কিছুকে নিয়ে জালা জুড়াবার অবকাশ পাবে তখন যে শ্রামা এক একেজো ওষুধের কৌটর মত পড়ে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি! মধুসূদনের আহত পৌরুষের নতুন অবলম্বন তার সন্তান। অবমানিত আত্মমর্যাদার উপর গৌরবের জয়নিশান। এক সময়ে মধুসূদনের মনে হয়েছিল— "কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটিমাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।" মধুসূদনের এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কুমুদিনীকে তার সন্তানের জননীত্ব প্রতিষ্ঠিত করে সে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে তাতে আর সন্দেহ কি! এই আত্মপ্রসাদের আনন্দ, সন্তানের জননীর মাধ্যমে কুমুকে অধিকার করবার জয়োল্লাস ও ঘোষাল-বংশের বংশধরের ওপর স্নেহ ও প্রীতির উচ্ছ্বাসের স্রোতের মুখে শ্রামাসুন্দরীর ক্ষীণ অধিকারটুকু টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। সুতরাং সন্তানের জননী হিসাবে যখনই মধুসূদন কুমুদিনীকে ডাক দিয়েছে, শ্রামাসুন্দরীর আসন যে তখনই নড়তে আরম্ভ করেছে এতে কোন সন্দেহ থাকে না। তাই বলা যেতে পারে, সমালোচক যে প্রশ্ন তুলেছেন তার স্পষ্ট ধারাবাহিক বর্ণনার চেয়ে ইঙ্গিতের

মধ্যে উত্তরটুকুকে পরিষ্কৃত করে লেখক যথেষ্ট শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হ'ল—“যে অবিনাশ ঘোষালের জন্মতিথি রাশি রাশি অভিনন্দনপত্র ও পুষ্পমালা-সন্তারের দ্বারা ভারাক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সে তাহার পিতামাতার মর্যাস্তিক বিচ্ছেদকে কিরূপ যোগসূত্রে বাঁধিয়াছে, তাহাদের বিরোধ-বিড়ম্বিত সম্পর্কের মধ্যে কিরূপ স্থায়ী আপোষ-সন্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে, এই সমস্ত অতুল্যচিত্রিত কৌতূহলপ্রশ্ন উত্তর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।”^২

সমালোচক যাকে ‘অতুল্যচিত্রিত কৌতূহলপ্রশ্ন’ বলেছেন—তার ‘নীরবে উত্তর প্রতীক্ষা’ করে থাকবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। লেখক স্পষ্টভাবে না বললেও বুঝে ওঠার পক্ষে পাঠকের বোধশক্তিটুকুই যথেষ্ট। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের যোগাযোগটুকুই বড়ো কথা। যোগাযোগের স্বরূপ বিশ্লেষণের একটা প্রশ্ন থাকলেও সেই স্বরূপটির ইঙ্গিতে বড়ো হয়ে ওঠার পথে কোন বাধা থাকতে পারে না, মধুসূদন সন্তানের মধ্যে আত্মপ্রসাদ খুঁজে পেয়েছে। মুখ্যো-বংশের অনমনীয় কণ্ঠটিকে সন্তানের মায়ের রাস্তায় বাঁধবার কল্পনা সত্য হয়েছে, মুখ্যো-ঘোষাল দুই রক্তের মিলন-সংকেত নিয়ে অবিনাশের জন্ম হয়েছে। বংশগর্ভী মুখ্যোক্তে ভঙ্গজ অপবাদ-দুষ্ট ঘোষালরক্ত সংমিশ্রিত হয়েছে। এর চেয়ে বড়ো আনন্দ বুঝি মধুসূদনের আর নেই। সর্বোপরি বংশধরের উপরে তার অপার মমতা ও স্নেহ থাকবেই। এই দিক দিয়ে মধুসূদন তার সন্তানের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে কুমুকে কতক পরিমাণে স্বীকার করে নিতে বাধ্য। *

কুমুদিনীর কথা আলোচনা করলেও দেখা যাবে—তার মানসপ্রস্তুতি মধুসূদনের কাছে বার বার ধাক্কা খেয়েছে। তার অন্তরের অন্ধার আসন মধুসূদনের মনোভাবের বৈপরীত্যের স্পর্শে মলিন হয়ে উঠেছে। তাই তার বিক্ষত অন্তরের অনমনীয় নিবিকারিত্বের কাছে মধুসূদন কোনদিন প্রশ্রয় পায়নি। তবুও তার মনের অনেক অমীমাংসিত দুঃখ প্রশ্ন সত্ত্বেও মধুসূদনের ভাবী সন্তানের জননীর কর্তব্যপালন করবার জ্ঞাত ঘোষাল-পরিবারে তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। একি কেবল নিষ্ক দায়িত্বপালনের জ্ঞান? সন্তান-লালনের ব্যাপারে তার নিজস্ব অন্তরের অনুপ্রেরণা কি কাজ করেনি? মাতৃত্বই নারীত্বের পূর্ণ মুক্তি। নারীজীবনের বহু অসংগতি, অমীমাংসিত অনেক প্রশ্ন, হৃদয়ের অব্যক্ত অনেক অপরিপূর্ণতা ও জীবনের বহু অনাস্বাদিত

১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ শিশু ও কিশোরদের জন্য 'বেঙ্গল'এর স্মরণীয় সাহিত্য-সম্ভার ॥

অমরেন্দ্রকুমার সেনের	বানভট্টের	
ডাকটিকিট	১'২৫ ॥ লালুভুলু (৩য় মূদ্রণ)	৩'০০ ॥
চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর (জরাসন্ধ)	গোপাল ভৌমিকের	
রং চং এক টাকা ॥	ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী (২য় মূঃ)	১'২৫ ॥
জ্যোতিপ্রসাদ বসুর	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের	
বিপ্লবী কামাইলাল	১'৫০ ॥ প্রাণী ও প্রকৃতি	১'৫০ ॥
তেজেশচন্দ্র সেনের	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের	
হারানো ছেলে	২'২৫ ॥ পৃথিবীর ইতিহাস (১ম খণ্ড)	৮'০০ ॥

গোপাল হালদার সম্পাদিত

'সোনার বাংলা' গ্রন্থমালা :

জলমাটিপাহাড়, জনসঙ্গম, অতীত ইতিহাস প্রত্যেকটি দু'টাকা ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের	তারাপদ রাহার	
চরণিক	তিন টাকা ॥ রক্তধূলির পথ-বিপথে	এক টাকা ॥
রেবতীভূষণ ঘোষের	নমিতা বসুর	
সবুজ টিয়া	০'৭৫ ॥ পিকনিক	দু'টাকা ॥
কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের	চিরঞ্জীব বিশ্বাসের	
মানুষ এলো	১'২৫ ॥ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	১'৫০ ॥

দেবদাশ দাশগুপ্তের

পরাসুত প্রকৃতি (২য় মূঃ)	১'০০ ॥ আকাশের কথা	প্রাণের কথা
(রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)	০'৭৫ ॥	এক টাকা ॥

অভিজিতের	আনন্দ ঘোষের	
মাটির বন্দী	০'৫২ ॥ কাপড়ের কথা	০'৬২ ॥
ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের	আশা দেবীর	
এবংপুরের টিকটিকি	১'০০ ॥ ঘুমতি নদীর ঢেউ (৪র্থ মূঃ)	১'০০ ॥
বিক্রমাদিত্যের	শৈল চক্রবর্তীর	
খুন্সী দরওয়াজা (২য় মূঃ)	১'৭৫ ॥ ম্যাণ্ড ম্যাণ্ড (৩য় মূঃ)	০'৭৫ ॥

ননীগোপাল গোস্বামীর

সবে মিলি করি কাজ	* ঠাকুরের কথা ও বাণী	* আমাদের উৎসব
১'২৫ ॥	১'৫০ ॥	১'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

আকাজ্জা সঙ্গেও সন্তানের মুখ দেখে নারী শান্তি পায়। নিজের জীবনের ব্যর্থতার ধানিকে সে সন্তানের স্পর্শ-মাদকতায় ভুলতে চেষ্টা করে। নারী-জীবনের এই স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে কুমুদিনীই বা বঞ্চিত থাকবে কেন? কুমুদিনীর জীবনেও যে এই প্রবণতা দেখা দিতে পারে, ঔপন্যাসিক অনেক আগে থেকেই তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। স্বামীর বাড়িতে এসে মধুসূদনের ব্যবহারে কুমুর অন্তরটি যখন দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় আলোড়িত হতে আরম্ভ করেছে, সেই সময়ে মধুসূদনের ভাইপো হাবুলের মধ্যে সাস্থনা খুঁজেছে কুমুদিনী। হাবুলকে দেখে কুমুর মনের উদগ্র ইচ্ছাটির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসের মধ্যে। “তখন কুমুর বুকের ভিতরটা টনটন করছিল—এই ছেলেকে বুকে চেপে ধরে যেন বাঁচল। হঠাৎ কেমন মনে হ’ল কতদিন ঠাকুরঘরে যে গোপালকে ফুল দিয়ে এসেছে, এই ছেলেটির মধ্যে সেই ওর কোলে এসে বসল। ঠিক যে-সময়ে ডাকছিল সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে বললে, ‘এই যে আমি আছি তোমার সাস্থনা।’”

সুতরাং পরের ছেলের একটু পেলব স্পর্শ যদি কুমুর বিক্ষত মনে সাস্থনা ঢেলে দিতে পারে, তাহ’লে মধুসূদনের ওপর লক্ষ অনুযোগ থাকলেও, তার নারীত্ব যথোচিত মর্যাদা না পেলেও এবং অন্তরের মধ্যে বহু আঘাতের ক্ষত থাকলেও নিজের সন্তানের মধ্যে সে যে সাস্থনার অমৃত খুঁজে পেতে পারে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই সন্তানকে আশ্রয় করেই কুমুদিনী যে স্বামীর সংসারে হাসিমুখে থাকতে পারবে এমন ধারণা করলে নিশ্চয়ই অগ্নায় হবে না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসের উপরে আরোপিত অতর্কিত পরিসমাপ্তির অভিযোগটি ধোপে টেকে না।

উপন্যাসটির ‘তিনপুরুষ’এর নামটির মধ্যে অনেকে হয়তো অসম্পূর্ণতা খুঁজে পেতে পারেন; কিন্তু সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। ‘যোগাযোগ’ হিসাবে উপন্যাসটি সত্য এবং যোগাযোগের ইতিহাস ও স্বরূপ-বিশ্লেষণে উপন্যাসটি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণতা দাবি করতে পারে। বিলীয়মান ও উথায়মান ছুটি ধারার মিলন-সংকেত, বিশ্বের ও শিক্ষার সংযুক্তিসাধনের পরিকল্পনায়, দুইটি নরনারীর দ্বন্দ্ববহুল বিপরীতধর্মী হৃদয়ের বোঝাপড়ার শিল্পায়িত ইঙ্গিতে ‘যোগাযোগ’ সার্থক এবং যোগাযোগের মূল সেতু যে সন্তান—এই সত্যের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠায় ‘যোগাযোগ’ সম্পূর্ণ উপন্যাস। উপন্যাসের “অতর্কিত পরিসমাপ্তি আটের দিক দিয়া গুরুতর ত্রুটি” এই মন্তব্যের উদ্ভব—থগের মধ্যে অথগের, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহত্তের ও বিন্দুর মধ্যে সিন্দুর আশ্বাদ দেওয়া যদি আটের গৌরব হয় তবে ‘যোগাযোগ’ নিঃসন্দেহে সেই গৌরবের অধিকারী।

শরৎসাহিত্যে নারীর মাতৃরূপ

সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

শরৎসাহিত্যে মাতৃস্নেহ ক্ষরিত হইয়াছে স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের উপর যতটা নয় ততটা ঈষৎ দূর-সম্পর্কিত সন্তানস্থানীয়া আত্মীয়ের জন্ত। নারায়ণী তাঁহার পুত্র গোবিন্দকে ভালবাসিত না এমন নহে কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে তাঁহার কাছে গোবিন্দ ও রামের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়াছিল। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর মাতৃস্নেহ বর্ধিত হইয়াছে তাঁহার নিষ্ঠুর বড় জায়ের হতভাগ্য ভ্রাতা কেঠর উপর। মেজদিদি সন্তানের জননী, তাঁহার মাতৃস্নেহ ক্ষুধা তাঁহার আপন সন্তানের দ্বারা মিটিয়াছিল তবুও কেঠর প্রতি স্নেহ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। অনাথা বিমাতা-পুত্রের প্রতি ভগ্নীর অত্যাচার দেখিয়া মেজদিদির স্বাভাবিক নারীহৃদয় ব্যথিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। সন্তান মাতৃহারা নরেন ও মেজদিদির অফুরন্ত স্নেহের মধ্যে আপনার হারান মাতৃস্নেহযুক্ত হৃদয়টিকে যেন খুঁজিয়া পাইয়াছিল। সেই হৃদয়টির সন্ধান পাইয়া সর্বদা যখন-তখন ছুটিয়া আসিত। তাই সে বলিতে পারিল, ‘আমার মেজদি থাকতে আমি কাউকে ভয় করি না।’ আর কেঁচো শাপের মত চক্র ধরিয়া কামড়াইয়াছে শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অমূল্যধনকে বিন্দু যেমন স্নেহ করিত, অন্নপূর্ণাও তেমন ভালবাসিতেন। কিন্তু “সংসারের সমস্ত ভার অন্নপূর্ণার মাথায় ছিল বলিয়া তিনি ছেলেমানুষ করিতে পারিতেন না। তাই এই ভারটা ছোটবো লইয়াছিল।”

শরৎসাহিত্যে শিশু মায়ের অপেক্ষা মাতৃস্থানীয়াদের অধিক ভালবাসে। কিন্তু সব সময় জ্যাঠাইমা, খুড়িমা, দিদি, বোদির ব্যবহার মধুর নয়। বরঞ্চ তাহাদের আচরণে কর্কশতা স্থানে স্থানে উগ্র হইয়া দেখা দেয়। বিন্দুর ছেলের কথাই ধরা যাক। ছেলের রুখ গরম করিতে দেবী হইলে অমূল্যগত-প্রাণা খুড়িমা শাসাইল যে, ইহার পর হইতে সে-ই সেই ভার গ্রহণ করিবে। নিজেই সেদিন কোল হইতে ছেলেটাকে ছুঁ করিয়া মাটিতে বসাইয়া দিয়া জুধের কড়া তুলিয়া আনিয়া উনানের উপর চড়াইয়া দিল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে অমূল্য চীৎকার করিয়া উঠিতেই বিন্দু তাহার গাল টিপিয়া দিয়া

বলিল, ‘চুপ কর, চোঁচালে’ একেবারে মেয়ে ফেলব।’ রামের স্তম্ভিততেও দেখি, অপরের বাগান হইতে একটা শশা চুরির অপরাধেও নারায়ণী রামের উপর কম কঠোর হন নাই। নারায়ণী জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, “হাঁ বাঁদর…… বুড়ো ধাড়ী, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটাও জানে, দাঁড়িয়ে থাক, এক পায়, পাজি, দাঁড়া বলছি।”

মাতৃস্থানীয়ারা যেমন নিবিড় স্নেহে বৃকে টানিয়া লন, তেমনি অপরাধের শাস্তিও চরম দেন। ভালবাসা-প্রবাহের মধ্যে উগ্রতার সামঞ্জস্য শিশুমন খুঁজিয়া না পাইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে। বিন্দুর ছেলেতে বিন্দুর বারণ না মানিয়া অমূল্যের ডাংগুলি খেলা, আর তাহার নেড়া মাথায় জরির টুপি পরিতে আপত্তি—এই ছয়ের অপরাধে মারধোর করিবার পরও অমূল্যকে উপবাসী কয়েদী থাকিতে হইল এবং এই ব্যবস্থা যখন তাহার স্নেহময়ী ছোটমাই করিলেন তখন অমূল্য এই আচরণের হেতু কিছুতেই খুঁজিয়া পাইল না। রামের আলাদা হইবার পর তাহার বৌদি তিনদিন খবর লন নাই। তাহাকে ডাকিয়া থাইতে বলেন নাই, তাহার জগ্ন রান্না করেন নাই। যে বৌদি আহারের সময় অতি স্নেহে অতি যত্নে তাহাকে কোলে বসাইয়া খাওয়াইত তাহার এই বিপরীত আচরণ তাহাকে ব্যথিত ও ভীত করিল।

জ্যেষ্ঠাইমা কিশোরী রমা ও রমেশকে স্নেহ করিতেন। তাঁহার স্নেহের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র বেণী, রমেশ পাছে বেণীকে অসম্মান করে, সমাজপতি হিসাবে যোগ্য আসন না দেয় এই ভয়ে রমেশকে অত্যাচার করিলেন, বেণী প্রভৃতিকে বলিয়া পিতৃশ্রদ্ধার ব্যবস্থা করিতে। রমেশ ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, “কিন্তু এটাতো তোমার জানা উচিত ছিল, রমেশ, যে আমার সম্ভানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না।” কিন্তু তাঁহার অফুরন্ত স্নেহ ছিল রমা ও রমেশের জন্ত। তাহাতে কোন সাংসারিক সঙ্কীর্ণতার লেপমাত্রও ছিল না। তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে হয়। মাল্লুষের দুর্বলতার যেন অতীত, তিনি সদগুণের যেন প্রতিমূর্তি।

জ্ঞানদার খুঁড়মা মাঝুটি বড় কর্মকুঠ, অলস রমণী কিন্তু একেবারে হৃদয়হীন ছিলেন না। অতুল নিঃসহায় জ্ঞানদা ও তাহার মায়ের উপর যে নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিল এবং জ্ঞানদার করুণার প্রেমভিক্ষাকে ব্যঙ্গ করিল তাহার প্রতিবাদ করিল সে-ই, কর্হিল “ঘোর কলি বলেই বাঁচোয়া দিদি, নইলে আর

কোন কাল হলে মা বসুন্ধরা এতক্ষণে লজ্জায় দু'ফাঁক হয়ে যেতেন, অতুল।” জ্ঞানদার মামী পোড়াকারের চেহারা বিকট আর ততোধিক বিকট তাহার মুখের হাসি। সে হাসিয়া উপরের এবং নীচের সমস্ত মাড়িটা অনাবৃত করিত। তাহার কথাবার্তা একটু দূর হইতে শুনিলে বগড়া বলিয়া মনে হইত। তাহার উপর সে যেমন মুখরা তেমনি যুদ্ধবিশারদ। তথাপি তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে স্নেহ-কল্লুধারা চিরন্তন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শুষ্ক দগ্ধ পোড়াকারের মধ্যে হরিপালের ম্যালেরিয়া ডিপোতেও স্নেহ-সহানুভূতির অভাব হয় নাই। তাহার কপট নীচাশ্রয় স্বামীর আচরণের সে প্রতিবাদ করিয়াছে। অসহায় বিধবা ও তাহার ততোধিক অসহায় কন্যাকে লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে। নারীর প্রতি অত্যাচার দেখিয়া তাহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছে। সে স্বামীকে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল, “বলি, সে স্থপাত্তর? বটে? আমার নিজের দাদা, আমি জানিনে? তাড়ি গোঁজা খেয়ে, পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাসের পেটের উপর লাথি মেরে, মেরে ফেললে কিনা?—তাই এমন স্থপাত্তর আর নেই। গলায় দেবার দড়ি জোটে না তোমার? ধিক ধিক!” ভাই হইলে যে-ভাই এমন নৃশংস কাজ করে সে নারী হইয়া সে কি করিয়া আরেকটি বলি দিবে? সে তাহার একমাত্র অলঙ্কার বাঁধা দিয়াছে এই উপায়হীন মেয়ের চিকিৎসার জগু। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দুর্গা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিয়াছিলেন, “না বুঝে অনেক অপরাধ তোমার চরণে কোরে গেলাম বৌ—সে সব মাপ করো।” পোড়াকার আজ আর সমস্ত মাড়ি বিকশিত করিয়া হাসিল না বরং চট করিয়া এক ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া লইয়া কহিল, “পোড়া কপাল! অপরাধ ত সব আমাদেরই হল ঠাকুরঝি! ওলো, ও গেনি! মামা-মামীর উপর রাগ-টাগ করিসনে যেন। আসচে বছর আম কাঁটালের দিনে নিমন্তন্ন রইল—জামাইকে যেন সঙ্গে কোরে একবার আসিস মা” বলিয়া হাতে পিঠ দিয়া আর দু'ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।” এই অশ্রু কত শুভ্র, মধুর ও পবিত্র।

সিন্ধেশ্বরীর স্বভাবে ছিল দৃঢ়তার অভাব। আজকার দৃঢ়তা কাল সামান্য কারণেই শিথিল হইয়া পড়িত। স্বার্থবুদ্ধির অন্তরালে তাহার হৃদের মাতৃস্নেহের নিষ্কার। কানাই, পটল ও তাহাদের মায়ের প্রতি তাহার ছিল অফুরন্ত স্নেহমমতা! কুসুম ও রাজলক্ষ্মীর বাৎসল্যপ্রীতি প্রণয়কাজ্জ্বল্য সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জটিল হইয়াছে। কুসুম তাহার স্বামী বৃন্দাবনের সংস্রব হইতে নিজেকে

দূরে রাখিয়াছে। বৃন্দাবন সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে হাত করিতে পারে নাই। এমন সময় একদিন বৃন্দাবন চরণকে লইয়া কুসুমের নিকট উপস্থিত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের প্রতি আকাঙ্ক্ষায় তাহার জননীহৃদয় উবেল হইয়া উঠিল। সব ভুলিয়া শিশুর স্বন্দর মুখের পানে কপাটের ছিদ্র-পথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।...চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু যেন সহস্র বাহু হইয়া উহাকে চিনাইয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষপঙ্ক্তির ভেদ করিয়া বাহিরে আনিতে চাহিল। আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বৃষ্টির আর কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই। বুক যেন তাহার ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। এই মনোহর স্বস্থ মবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এত বড় অনধিকার সংসারে কার আছে? চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অলুভব করিতে লাগিল ততই তাহার বঞ্চিত, তৃষিত মাতৃ-হৃদয় কিছুতেই যেন শাস্ত্যনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তার নিজের ধন জোর করিয়া, অজ্ঞায় করিয়া অপরে কাড়িয়া নিয়াছে। কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, মা বল, তা হলে ছেড়ে দেব, চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'না।' "তা হলে ছেড়ে দেব না," বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল, টিপিয়া চুমু খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিল। সংসারে এমন মাতৃমূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে তখন অবাধ হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। সন্তানের প্রতি তৃষিত হৃদয় তাহাকে যে অসহ্য পীড়া দিতেছিল তাহাই তাহাকে স্বামীর কাছে ঠেলিয়া নিয়া গেল, প্রেমের পরিণতি সন্তানকামনায় আর সন্তানকামনার মূলে রহিয়াছে যৌন মিলন আকাঙ্ক্ষা। কুসুমের মনে এই দুই বৃত্তি একত্রে জাগিয়া উঠিল, অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় চরণ আসিয়া জাগাইয়া তুলিল। এই চরণকে অলুসরণ করিয়া কুসুম যেদিন বৃন্দাবনের গৃহে আসিয়া পৌছাইল সেদিন আর তাহাকে পাইল না। তাই দেখি, কুসুমের সমগ্র জীবনে অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল মিনতি, সার্থকতায় পৌছিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়ুক্ত শ্বিপুল প্রয়াস।

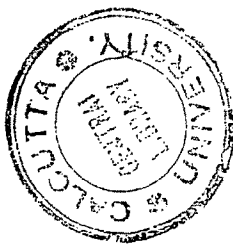
এই অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল রাজলক্ষ্মীর জীবনে। তাহার জননী হইবার জন্য অতৃপ্ত বাসনার কাছে তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য অর্থহীন। সে নিজেই বলিয়াছিল যে, বন্ধুর বাবার সঙ্গে বিবাহের ফলে যদি সে সন্তানের জননী হইত তাহা হইলে সে তাহাদের ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইত। প্রথমে রাজলক্ষ্মী মনে

করিয়ছিল যে শ্রীকান্তের সেবা করিয়া তাহার সদ্গলাভ করিয়া তাহার জীবন সার্থক হইবে। ক্রমে সে বুঝিতে পাইল যে শ্রীকান্তের জন্ম তাহার যে প্রেম, তাহাকে তাহার সন্তানলিপ্সা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে কারণ শ্রীকান্ত তাহার জন্ম সব তাগ করিলেও সম্মম ছাড়িতে পারিবে না। শ্রীকান্তের মন একথা চিন্তা করিয়া কণ্টকিত হইয়াছে, “আজ তাহার পরিণত যৌবনের স্নগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃসহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার সন্তানদ্রোখিত কুস্তকর্ণের মত বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্তা এমন জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সেদিন পাটনায় তাহার যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম আজ তাহার সেই মাতৃরূপ স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলই মনে হইতে লাগিল, তত বড় আগুন ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বন্ধুই তাহার কাছে পর্যাপ্ত নয়, আজ ছুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের স্তখুঃখই তাহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছে।”

মাতৃস্বের এই আকাজক্ষা দেখি, ষোড়শীর জীবনে। হৈমর মাতৃরূপই ষোড়শীকে নারীজীবনের সার্থক পথ দেখাইল। স্বামী-পুত্রসহ হৈম আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই তাহার অন্তরের বহুদিনের স্তম্ভ অলকা জাগিয়া উঠিল। এবং ভৈরবী-জীবনের নিষ্ফল ঈদ্রিত করিয়া অলকা জীবনকে সকল করিতে নির্দেশ দিল।

শরৎ-সাহিত্যের মাতৃস্বের আরেক অভিব্যক্তি দেখি, দয়াময়ীর জীবনে। মুখুয্যে-পরিবারে যেদিন তিনি নববধূ বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন প্রথম দিনেই সেই যে বিপ্রদাসকে কোলে তুলিয়া লইলেন, মাতৃস্বের স্নেহরসে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। একদিনের জন্মও বিপ্রদাস তাহার বিন্দুমাত্র অভাব বোধ করেন নাই। ইহার পর দয়াময়ী দ্বিজুকে পাইয়াছিলেন, কল্যাণীকে পাইয়াছিলেন কিন্তু বিপ্রদাসের স্থান কেহ অধিকার করিতে পারিল না। একবার বিপ্রদাস মাতৃস্নেহ হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্ম। আমরা দেখি, আপনার ব্যথার ভিতর দিয়াই বিপ্রদাস মাতাকে আবার ফিরিয়া পাইয়াছিল।

শরৎ-সাহিত্যে নারীর স্নেহ যত্ন আদর শ্রদ্ধা অক্ষুরন্ত। এখানে নারী তাহার মাতৃস্নেহ শিশুদের পরিবেশনের ভিতর দিয়া আপনার স্নেহনির্বাহ, করুণাময়ী রূপ-মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে।



সাহিত্যের খবর
দৃশ্যকাব্য সংখ্যা
বর্ষ ১০৮ সংখ্যা ৮
বৈশাখ, ১৩৭০

বাংলা নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বর্তমান বাংলা নাটক সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত একথা একরূপ সর্ববাদিসম্মত। অথচ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, বর্তমান বাংলা নাটকের উপর ইউরোপীয় নাটকের যে অবিসংবাদিত প্রভাব বর্তমান তাহার অন্তরালে সংস্কৃত-রীতির ছায়া প্রচুর পরিমাণে^{*} রহিয়াছে। বাংলা নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনের অনুবর্তন করেন নাই সত্য, তবে তাঁহারা অনেকস্থলে ইউরোপীয় আদর্শে রচিত নাটককে নানাভাবে সংস্কৃত আকার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেকস্থলে বাংলা নাটকের প্রাণ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত এবং ইহার বাহ্য আকার ভারতীয় রীতিতে গঠিত। আর অনেকস্থলে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত বস্তুর উপর প্রাচ্যবর্ণের অনুলেপন।.....

সংস্কৃত কোনো কোনো সংজ্ঞা বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রকার নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য বা রূপক নাট্যসাহিত্যের সাধারণ নাম। ঠিক এই অর্থে না হইলেও এই দুইটি নাম বাংলা নাট্যসাহিত্যে অজ্ঞাত নহে।

—‘ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি,’ পৃ: ৭২-৮০

বাংলা নাটকের মুক্তিসঙ্কান

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

এ কথা সত্য যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যখন কাব্য-সাহিত্য কিংবা কথা-সাহিত্য কোন কিছুই জন্ম হয়নি, নাটকেরই জন্ম হয়েছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদারের ‘ভদ্রার্জুন’ নাটক যখন প্রকাশিত হলো তখন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যই হোক, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই হোক তাদের কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। এমন কি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে পরিচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ও তার চার বৎসর পর রচিত হয়েছিল। তারপর নাটককে আশ্রয় করেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে সর্বপ্রথম বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাও আমরা লক্ষ্য না করে পারিনি। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে প্রধানত বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনবিমুখী রোমান্টিক রচনা মাত্র; কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক বাস্তবধর্মী রচনা রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীন কুল-সর্বস্ব’ প্রকাশিত হয়েছিল এবং তারপর থেকে বাংলা কাব্য এবং কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে রোমান্সের প্রেরণা বলাহীন অশ্বের মত বাঙ্গালীর মনোভূমির উপর নদিয়ে উদ্দাম বেগে ধাবমান হয়েছিল, কেবল নাটকই তার সামনে দাঁড়িয়ে তার একটি বলিষ্ঠ বাস্তব জীবনের আদর্শ প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। মাইকেল মধুসূদনের গ্রহদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের সামাজিক নাটক ও গ্রহদনগুলোই তার প্রমাণ। সুতরাং প্রত্যক্ষ জীবনাশ্রয়িতা সাহিত্যের যে একটি বিশিষ্ট গুণ, তা বাংলা নাটকের প্রথম যুগ থেকেই যে ভাবে প্রকাশ পেয়ে এসেছে, বাংলা কথা এবং কাব্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তা সে ভাবে কোনদিন প্রকাশ পেতে পারেনি।

তথাপি বাংলা নাটক সম্পর্কে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণার কী করে সৃষ্টি হলো তাও বিচার করে দেখা আবশ্যিক। কারণ, এ কথাও সত্য যে তার মধ্যে এমন কোন বিষয় নিশ্চয়ই ছিল যার জন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত সমাজটির মধ্যে সেক্সপীয়রের নাটকই নাটকের আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল।

কারণ, সেক্সপীয়রের নাটকের মধ্য দিয়েই নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয় যেমন স্থাপিত হয়েছিল, তেমনই সেক্সপীয়রের নাটকের অসাধারণ গুণ এবং শক্তিও ছিল—তাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নাটক সম্পর্কে বিচার করা কারও পক্ষে তখন সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছিল। অথচ বাংলার সমাজে যে সেক্সপীয়রের নাটক সৃষ্টি হতে পারে না, এ কথা কেউ সেদিন গভীরভাবে বিপ্লবণ করে দেখেননি। বাংলা নাটক রচনার একেবারে আদি যুগ থেকে এই ধারণা যে আমাদের দেশের নাট্যাঙ্করাগীদের কী ভাবে প্রভাবিত ক'রেছিল মধুসূদনের জীবন থেকেও তার প্রমাণ যাওয়া যায়। মধুসূদন যখন তাঁর বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজিডি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করেন, তখন তাঁর পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁকে তা' সেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে আরও ঘটনা-কটকিত এবং ষড়যন্ত্রসম্বল ক'রে তুলবার জ্ঞান পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই পরামর্শ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি এবং এই বিষয়ে তিনি যে মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন, তা' থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে, বাঙ্গালীর সাহিত্যে যে সেক্সপীয়রের আদর্শে নাটক রচিত হ'তে পারে না, এই বিষয়ে তিনি বহুদিন পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে এই বিষয়ে লিখেছিলেন, 'Some of my friends and I fancy you are among them, as soon as they see a drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape'.

মধুসূদন তাঁর হিন্দু কলেজের ইংরেজি-শিক্ষিত বন্ধুবর্গের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে সেক্সপীয়রের মত নাটক রচনা করতে গেলেন না, তার জন্তে তাঁকেও সেদিন প্রচুর দাম দিতে হয়েছিল। যে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হ'বার আশায় তিনি নাটকখানি রচনা করেছিলেন, সেই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তা অভিনীত হ'লো না। কিন্তু তাই বলে, বাংলা সাহিত্যে যে তা পরিত্যক্ত হয়েছিল তাও নয়। অল্পদিনের মধ্যেই তা শোভাবাজার নাট্যশালায় অভিনীত হ'লো এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডিক্রপেও অভিনন্দন লাভ করল।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই ধারা প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এসেছেন, তাঁরা কেবলমাত্র নাটক কেন, সাহিত্যের অগ্রাঙ্ক বিষয়ও প্রধানতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় রস-সংস্কারের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করেই বিচার করেছেন। তাঁদের কাছে সেদিন কাব্য ও কথা সাহিত্য মর্যাদা লাভ ক'রেছে কারণ, আধুনিক কাব্য কিংবা কথা সাহিত্যের কোন প্রাচীনতর ধারা এদেশে বর্তমান ছিল না, সুতরাং পাশ্চাত্য সমালোচনার পদ্ধতি তাদের উপর আরোপ করবার কোন বাধা হয়নি। কিন্তু বাংলা নাটক কেবলমাত্র যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবের ফলেই জন্মলাভ করেছে, তা' নয়, তার একটি নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্য ছিল—তা' অস্বীকার করে এ দেশের নাট্যকারগণ যে সেদিন অন্ধভাবে কোন বিজাতীয় আদর্শে অলু করণ করবার মত মোহগ্রস্ত হন নি, সেজন্য তাঁরা আমাদের অভিনন্দন-যোগ্য, অবহেলার যোগ্য নন। সেদিন সেক্সপীয়রের মত একটি বলিষ্ঠ আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েও যে তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাটিকে রক্ষা করেছিলেন, তার ভিতর দিয়েও এই জাতির এই বিষয়ক ঐতিহ্য যে কত শক্তিশালী ছিল, তা' অনুভব করা যায়। সুতরাং বাংলা নাটকে ধারা সেক্সপীয়রকেই সম্পূর্ণরূপে পেলেন না বলে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে অপাংক্ত্য করে রাখলেন, তাঁরা একদিকে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপটিরও যেমন সন্ধান পাননি, তেমনই এই বিষয়ক জাতীয় ঐতিহ্যের শক্তিটিও অনুভব করতে পারেন নি। আজ পঁচিশ বছর পরও যদি বাংলার স্বধীসমাজ এই বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকেন, তবু তা'দিয়ে দীর্ঘ দিনের এই অজ্ঞতা এবং অবহেলার লজ্জা কিছুতেই দূর হ'তে পারে না।

বাংলার বিদগ্ধসমাজের এই অবহেলা সত্ত্বেও বাংলা নাটক তার ক্রম-বিকাশের ধারা অব্যাহত রেখে অগ্রসর হ'য়েছে, কিন্তু তা'সত্ত্বেও তার যে একটি গুরুতর ক্ষতিও এরই মধ্যে সাধিত হ'য়েছে তাও অস্বীকার করা যায় না এবং তারই ফলে আজও তা যথার্থ মর্যাদার অধিকারী হ'তে পারে নি। বাংলা নাটকের বিরুদ্ধে স্বধীসমাজে এমন একটি সংস্কার ইতিমধ্যেই এমন দৃঢ়মূল হয়েছে যে, তা আজ সহসা এক মুহূর্তেই শিথিল করাও অসম্ভব। দেশ স্বাধীন হ'বার পর হ'তেই সাহিত্যের জন্ম যে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ব্যবস্থা হয়েছে, বাংলার নাট্য-সাহিত্য আজ পর্যন্ত তার আনুকূল্য লাভ করতে পারে নি। বাংলার আধুনিক কাব্য, উপন্যাস কিংবা সাহিত্য-গবেষণা আজ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ যাবৎ বাংলার কোন নাট্যকার কিংবা নাট্য-গবেষক সে সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। তবে এ কথা সত্য, নাট্য-বিষয়ক

কোনও কোন গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি কিংবা অন্য ভাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ তা' সঙ্গেও আজ তা' যদি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে তবে তার মূলেও বাংলা নাটক বিষয়ে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত সংস্কারই যে আজ পর্যন্ত দায়ী, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অথচ ঐ কথা আজ বলিষ্ঠ কণ্ঠেই প্রচার করা যায় যে, বাংলার নাটক কেবলমাত্র বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা উদ্ভুদ্ধ করতে যে ভাবে সহায়ক হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের আর কোন বিভাগ দ্বারা তা সম্ভব হতে পারেনি। স্বিজেল্লালের দেশোদ্ভোধক বাংলা নাটকগুলো ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তাদের অভিনয়ের মধ্যদিয়ে দেশব্যাপী জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত করতে সহায় হয়েছিল। সুতরাং বাংলার এই নাট্য-সাহিত্যের প্রতি আজ পর্যন্তও রাষ্ট্রের এই উপেক্ষা দেশের নাট্যাঙ্গরাগী ব্যক্তিমানের নিকটই নিতান্ত বেদনাদায়ক বলে মনে হতে পারে। এ কথা সত্য, আজ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করে থাকেন, কিন্তু যাদের সৃষ্টি আশ্রয় করে অভিনয়ের গুণ প্রকাশ পেয়ে থাকে, যাদের ব্যতীত অভিনয়-কর্মের অস্তিত্বই থাকত না, তাঁরাই আজও রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হয়ে আছেন। নাটক এবং তার অভিনয় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য, একজনের সৃষ্টি আর একজন রূপ দিয়ে থাকেন, প্রথমে নাটকের সৃষ্টি তারপর অভিনয়। কিন্তু আজ যে অবস্থা দেখা যায়, তাতে স্রষ্টার চাইতে সৃষ্টির মূল্য বেশী, সাজাহানের চাইতে তাজমহল বড় হয়ে উঠেছে। এই ভ্রান্তি আমাদের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত দূর না হয়, ততদিন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে আমাদের সাহিত্যের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হতে পারে না।

বাংলা সাহিত্যে নাটক যত সমাজ-ও রাষ্ট্র-সচেতন, আর কোন বিভাগই তত নয়। একদিন যখন সমাজ কোলীজ প্রথা দ্বারা কলঙ্কিত হল, তখন রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর নাট্যরচনা দ্বারা তাকে নির্গম ভাবে আঘাত করেছিলেন। সেই নাটক-অভিনয়ের ভেতর দিয়ে কোলীজপ্রথার দোষগুলো সেদিন যত জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, এই বিষয়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুরূহ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলোর ভিতর দিয়ে তা তার একাংশও প্রকাশ পায়নি। নব্য বাংলা বা ইয়ং বেঙ্গলের দোষত্রুটিগুলো মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকের ভিতর দিয়ে যত জীবন্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, সাহিত্যের আর কোন বিষয়ের মধ্যদিয়ে তা এত বলিষ্ঠ ও নির্ভীক পরিচয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েছিল? তারপর ইংরেজ নীলকরের অত্যাচারে বাংলার

অসহায় কৃষককুল যখন দুর্দশার চরম অবস্থার মধ্যে নিষ্কিণ্ণ হয়েছিল তখনও কোন প্রবন্ধকার কিংবা কথা-সাহিত্যিক অত্যাচারিত কৃষকের এই মর্মান্তিক লাঞ্ছনাকে ভাষা দেবার জগ্ন অগ্রসর হয়ে আসেননি। দীনবন্ধু তাঁর অমর লেখনী প্রসূত 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যদিয়েই সেই বেদনার মুখে ভাষা দিবার দুঃসাহস করেছিলেন। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বাংলার নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনের গ্লানি যখন এদেশের সমাজকে স্পর্শ করল, তখনও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' প্রভৃতির ভিতর দিয়ে সমাজের সেই ক্ষত-স্থানটিকে অনাবৃত করে ধরলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে আধ্যাত্মিক বাণী বাঙ্গালীর চিত্তাকাশে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, তাও গিরিশচন্দ্র পৌরণিক নাটকগুলির মধ্যদিয়ে রূপ লাভ করেছে। একটি মাত্র অবিচল আদর্শ সামনে রেখে বাংলার নাটক কোনদিনই কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি। বরং তা' চারিদিকে দৃষ্টি উন্মুক্ত রেখে ক্রমাগত সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। সেইজগ্ন যখন বিংশশতাব্দীর প্রথম থেকেই এ দেশে স্বদেশী-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তখনও জাতীয় জীবনের সেদিনকার যুত্পণ সংগ্রামের মধ্যেও বাঙ্গালী নাট্যকারগণ প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। এমন কি, যে গিরিশচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরে পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক-রচনার মধ্যেই তাঁর সৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তিনিও তাঁর সকল রোমান্টিক চিন্তা পরিভ্যাগ করে নূতন নাটক-রচনার মধ্যদিয়ে জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র প্রচার করবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তারপর ক্রমে অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে গিয়ে যখন বাংলার রাজনৈতিক জীবন দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হ'লো, ক্রমে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও দেশবিভাগের চরম অভিশাপের মধ্যদিয়ে তার কণ্টক পথে স্ফুটন যাত্রা পদে পদে ব্যাহত হ'তে লাগল, তখন জাতির সেই সঙ্কটে বাংলার নাটক সেই অভাবনীয় বেদনাকেই ভাষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। বরং দেখতে পাওয়া গেল, এই যুগের বাংলা নাটক যুগের সমগ্র বিপর্যস্ত রূপটিকে প্রকাশ করবার জগ্ন তার আত্মা এবং দেহে নূতন ভাব এবং আঙ্গিক গ্রহণ করে তাকে এক সম্পূর্ণ নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করে তুলল। তারপর সাম্প্রতিক চীনা-আক্রমণের মুহূর্তে বাংলার নাট্যকারগণই প্রথম অগ্রসর হয়ে এসে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানালেন। এই ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৌলীন্তপ্রথা থেকে আরম্ভ করে আজকের চীনা-আক্রমণ পর্যন্ত

বাংলা দেশের উপর দিয়ে যত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকোভ দেখা দিয়েছিল, তাদের সকল কিছুই ধারক এবং বাহক রূপে বাংলার নাট্য-সাহিত্য যে ভাবে জাতীয় ভাব-প্রকাশের কার্ঘে আত্মনিয়োগ করেছে বাংলা সাহিত্যের আর কোন বিভাগ সে তুলনায় যা করেছে তা' নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

তবে এখানে একটি কথা উঠতে পারে যে, নাটকের উদ্দেশ্য কি কেবল মাত্র যুগোচিত জাতীয় ভাব পরিবেশন করা? তার কি চিরন্তন কোন সাহিত্যিক দায়িত্ব পালন করবার নেই? যদি তা' থেকেই থাকে, তবে সে দায়িত্ব বাংলার নাটক কতদূর পালন করতে সক্ষম হয়েছে? তার উত্তরে এ' কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নাটক যাই প্রচার করুক না কেন, তা সাহিত্য, স্ততরাং তার একটি সাহিত্যিক দায়িত্বও আছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করবার উপরও তার চিরন্তন শাস্ত্রত জীবনের বাণী প্রচার করবার একটি গুরুতর দায়িত্ব আছে। কিন্তু নানা যুগের নানা মতবাদ প্রচার করবার ভিতর দিয়েও মানব জীবনের চিরন্তন সেই বাণী কিংবা শাস্ত্রত তার সেই রূপ বাংলা নাটকের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় নি, এ' কথাই কি বলবার উপায় আছে? এমন কি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বাস্তব-ধর্মী রচনা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের মতবাদ প্রচারের মধ্য দিয়েও বঞ্চিতা কুলীন কন্যা-দিগের যে শাস্ত্রত বেদনার অল্পভূতি ভাষা পেয়েছে, তা' কি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি? তা' না হ'লে শতাব্দিক বৎসরের পরও আজ এই নাটকের অভিনয় এমন সাকল্য লাভ করতে পারত না। যেখানে জীবনের বাস্তব রূপায়ণ আছে, তার স্বগভীর বেদনা আছে, সেই বেদনার অভিব্যক্তি আছে, কেবলমাত্র যুগোচিত ভাষায় তার প্রকাশ হয়েছে সত্য কিন্তু তার জীবনগুলো শাস্ত্রত। তেমনই মধুসূদনের রোমান্টিক নাটকের মধ্যদিয়েও চিরকাল মাহুঘের আশা ও বেদনা, স্বপ্ন ও কামনা রূপ পেয়েছে। তাঁর প্রহসনগুলোর মধ্যেও মত-প্রচারের যে প্রেরণাই থাক না কেন, সেখানেও মানবের চিরন্তন দুর্বলতার বিষয়ই তাঁর অবলম্বন হয়েছে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভক্তপ্রসাদ আজও জীবিত আছে। তারপর গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যদিয়েও মানব জীবনের চিরন্তন দুর্বলতার কথাই তাঁর মতবাদ-প্রচারের মধ্যদিয়েও আত্মপ্রকাশ করেছে। এইভাবে অল্পসন্ধান করলে বাইরে থেকে আপাতদৃষ্টিতে যেখানে কোন নাটকের মধ্যে যুগোচিত মতবাদ প্রচার করা হয়েছে বলে মনে হবে, কিন্তু একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে সেখানেই দেখা যাবে যে সেখানেও

বাঙালীর বহুমুখী জাতীয় জীবনের পবিত্র দলিল

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১ম খণ্ড ॥ ১২'৫০ ॥

বিনয় ঘোষ-কৃত

বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য আকরগ্রন্থ

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৮৪০ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিষয়ানুক্রমিক সন্নিবেশ, বিস্তারিত ভূমিকা, সম্পাদকীর ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত।

উনিশ শতকের অষ্টান্ন বাংলা পত্রিকা থেকে অনুরূপ সংকলন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বর্তমান গ্রন্থ প্রথম খণ্ড। বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অমুরাগী যারা এ-বই তাঁদের কাছে চিরন্তন সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আন্তর্ভাষ অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার রয়্যাল অক্টোভো সাইজের বই, আর্ট প্লেট ও বোর্ড বাঁধাইসহ, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্য মূল্য মাত্র ১২ টা. ৫০ ন. প.।

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

যোগেশচন্দ্র বাগলের

নিখিলরঞ্জন রায়ের

বিদ্রোহ ও বৈরিতা ২'০০ ॥

সীমান্তের সপ্তলোক ৩'০০ ॥

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

মার্কসবাদ ২'০০ ॥

প্রাণী ও প্রকৃতি ১'৫০ ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

নবগোপাল দাশের

ব্যান ও বন্যা ৩'০০ ॥

এক অধ্যায় (২য় মুঃ) ৩'০০ ॥

অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বসুর

ভারতের চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১টি আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মুঃ) ৪'০০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর

প্রমথনাথ বিন্দীর

ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪'০০ ॥

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

যে নর-নারীর চরিত্র আছে; তারা শাস্ত্রত গুণায়িত। কারণ, সত্যকারের মানুষ যদি সৃষ্টি করা সম্ভব না হয়, তা' হলে তাদের দিয়ে মতবাদ প্রচার করাও ফলপ্রসূ হতে পারে না। স্বতরাং বাংলার নাটকেও আগে মানুষ এসেছে, তারপর তাদের দিয়ে যুগের সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছে। স্বতরাং এই মানুষ-সৃষ্টির মধ্যদিয়েই নাটকের শাস্ত্রত গুণ প্রকাশ পেয়েছে। তবে সে মানুষ কোথাও পূর্ণাঙ্গ, কোথাও বা অসম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকতে পারে।

এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোর কথাও আমরা কিছুতেই উল্লেখ না করে পারিনে। রবীন্দ্রনাথের কবি-মনোভাব তাঁর সকল নাট্যসৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করেছে, এ'কথা সত্য; তার ফলে তাঁর নাটকীয় চরিত্রগুলো অনেক ক্ষেত্রেই রক্তমাংসের উপাদানে গঠিত না হয়ে ভাব বা idea বাহন হয়েছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাদের শাস্ত্রত সাহিত্যগুণ প্রকাশ পায়নি, তা বলবার উপায় নেই। সে গুণ নাটকের না হ'তে পারে; সে গুণ হয়ত কাব্যের। কিন্তু তাঁর নাটক-গুলোর মধ্যদিয়ে বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের ঐতিহ্যের সঙ্গে যে যোগ রক্ষা পেয়েছে, তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা ছিল তা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অনুগামী। তিনি উপকরণবহুল পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের পরিবর্তে আমাদের দেশের উপকরণবিহীন যাত্রার মঞ্চকে রক্ষা করবারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর প্রায় অধিকাংশ নাটকের মধ্যেই যাত্রার আঙ্গিকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলোর নাটকীয় মূল্য যাই থাক না কেন, তাদের মধ্য দিয়ে যে কাব্যগুণ প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যেই সাহিত্যের শাস্ত্রত শক্তি বিদ্যুত আছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলোর ভিতর দিয়ে বাংলার জীবন, তার সংস্কার, তার ধর্মকর্ম ধ্যানধারণাকেই অনেক ক্ষেত্রে রূপায়িত করেছেন। 'ডাকঘর' প্রমুখ নাটকের মধ্যদিয়ে শাস্ত্রত জীবনের বাণী প্রকাশ করলেও বাংলার পরিচিত নিত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপরিসর জীবনের মধ্যেই তিনি তাঁর সেই বাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন। অমল চরিত্রের মধ্যদিয়ে তিনি যে শাস্ত্রত জীবন-বাণীই প্রচার করুন না কেন, অমলকে বাংলার ঘরের শিশুরূপেই তিনি চিত্রিত করেছেন—এই গুণেই রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলো বাংলা ও বাঙ্গালীরই নাটক। এদের আপাত-রোমাঞ্চিক পরিচয়ের মধ্যদিয়েও শাস্ত্রত বাঙ্গালীরই প্রাণ স্পন্দিত হ'য়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত জীবনবোধই রবীন্দ্রনাটকের ভিত্তি।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তুলনায় বাংলার নাটকই বাঙ্গালীর

জীবনের নিবিড়তম শামিধ্য রক্ষা করে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। যে যুগে বক্ষিমচন্দ্র তাঁর কাব্যধর্মী রোমান্টিক উপস্থাপনগুলোর ভিতর দিয়ে স্বপ্নরাজ্য নির্মাণ করে চলেছেন, সেই যুগে তা দ্বারা লেশমাত্র প্রভাবিত না হয়েও তাঁরই অন্তরঙ্গ সৃষ্টি দীনবন্ধু বাঙ্গালীর সেদিনকার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনের মধ্যে তাঁর নাটকের উপকরণ সন্ধান ক'রে বেড়িয়েছেন। তবে এ কথা সত্য, যুগে যুগেই যে তা সম্ভব হয়েছে, তা' নয়। যে যুগে প্রত্যক্ষ জীবনের মূল্য হ্রাস পেয়েছে, সে যুগে বাংলার নাটকগুলোও যে বাস্তবজীবনবিমুখী না হয়েছে তা'ও নয়। কিন্তু সমাজ কিংবা জীবনের প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব সমস্তার সম্মুখীন হয়ে কোনও দিনই বাংলার নাটক জীবন-বিমুখী হ'য়ে উঠেনি। সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলনই তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। আজ বাঙ্গালীর স্রষ্টা জীবন-সংগ্রামের দিনে তার নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্র হ'তে আধ্যাত্মিক কিংবা রোমান্টিক চিন্তা-বিলাসিতার অবসান হ'য়েছে, সেইজন্য পৌরাণিক কিংবা রোমান্টিক নাটক আজ আর কোন নাট্যকার লিখবার প্রয়াস পান না, বরং তাদের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ জীবন-সমস্তামূলক নাটকই আজ রচিত হ'চ্ছে। এই সমস্তাও আজ বৃহত্তম সামাজিক সমস্তার পরিবর্তে ক্রমে পারিবারিক এবং তারপর ব্যক্তি-জীবনের সমস্তার মধ্যে এসে নীমায়িত হতে আরম্ভ ক'রেছে। কারণ, ব্যক্তি-জীবনের উপর বৃহত্তর সমাজ এবং এমনকি ক্ষুদ্রতর পরিবারেরও যে-প্রভাব একদিন ছিল, আজ তার উপর তাদের সে-প্রভাব নেই। আজকের বাংলা নাটক এই সত্যটি স্বীকার ক'রে নিয়েই ব্যক্তিজীবনবিমুখী হ'য়ে উঠবার প্রয়াসী হ'য়েছে। স্ততরাং সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ধারাটিকে স্বীকার ক'রেই বাংলা নাটকের বিকাশ হচ্ছে বলেই তার বেঁচে থাকবার শক্তি কোন দিনেই লোপ পাবার আশঙ্কা নেই।

জাতির জীবন-সমস্তায় যত জটিলতার উদ্ভব হয়, তার নাটকের উপকরণেও তত প্রাচুর্য দেখা দেয়। বাঙ্গালী ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে চলেছে, স্ততরাং একদিন তার মধ্যে নাটকের উপকরণে অপ্রাচুর্য ছিল বলেই হোক কিংবা যে কোন কারণেই হোক, তা'কে যে রোমান্টিক বিষয়-বস্তুর সন্ধান করবার প্রয়োজন হয়েছিল, আজ তার আর সে প্রয়োজন নেই। আজ জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত বাঙ্গালীর মধ্যে যে বহুমুখী সমস্তার উদ্ভব হ'য়েছে, তা'কে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে পারলেই বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ নাটক রচিত হতে পারে—ইতিমধ্যেই সেই অল্পযায়ী প্রয়াসও দেখা দিয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আরও একটি প্রয়াস দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। অনুবাদ এবং স্বাঙ্গীকরণ দ্বারা চিরকালই বাংলা সাহিত্য পুষ্টি লাভ করেছে, একদিন সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক অনুবাদ করে বাংলা নাটকেরও ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল। তথাপি এ'কথা স্বীকার করতেই হবে যে, অনুকরণ এবং অনুবাদই যদি নাট্যকারদিগের প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়ে, তবে সাহিত্য জাতীয় রস-চেতনা থেকে বঞ্চিত হয়ে সহজেই জাতির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়। আজ বাঙ্গালীর জীবনে নাটকীয় উপাদানের অভাব আছে বলে কেউ স্বীকার করবেন না, অথচ দেখা যায় যে, অধিকাংশ নাট্যকার বহু জাতীয় জীবনের উপকরণগুলোকে তাঁদের রচনায় গ্রহণ করার পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাটকের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে নাটক রচনা করে থাকেন। পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবনের পার্থক্য আছে। এ' পার্থক্য অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে যারা আশা করেন, তাঁরা অসঙ্গতরূপে আশাবাদী হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা ভারতীয় সমাজ-জীবনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সন্ধান রাখেন না। স্বতরাং সে রকম আশার উপর নির্ভর করে এখন থেকেই ভবিষ্যৎ কালের জগৎ কোন নাটক রচনা সঙ্গত হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুবাদ-নাটকগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেগুলোকে অনুবাদ বলেই পাঠক ও দর্শক সমাজ গ্রহণ করেছে; কিন্তু আজকের নাটকগুলো পুরোপুরি অনুবাদও যেমন নয় তেমনি স্বাঙ্গীকরণও নয়। তার ফলে তাদের মধ্যদিয়ে যে সমাজ জীবনের পরিচয় আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে তা' আমাদের সামাজিক জীবনের আদর্শকে বিভ্রান্ত করে। সাহিত্য জাতির জীবনের সঙ্গে যদি যোগ রক্ষা করে তবেই সে যথার্থ পুষ্টিলাভ করতে পারে—জাতির আচার, আচরণ, জীবন-সংস্কার ইত্যাদিকে অস্বীকার করলে সাহিত্য পঙ্গু হয়ে গিয়ে অচল হয়ে পড়ে। একদিন জাতির জীবনের কর্ম ও চিন্তা ধারার সঙ্গে স্নবিড় যোগ রক্ষা করে বাংলা নাট্য-সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল বলে কোনদিনই তার প্রাণশক্তির অভাব হয় নি। কিন্তু আজ যদি তার মধ্যে জাতির সম্পর্ক-বিচ্ছেদের আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকে, তবে তার ভবিষ্যৎ খুব আশাশ্রুদ বলে মনে করা যায় না।

এ কথা সত্য একদিন পরীর সমাজ-জীবন আমাদের নাট্যসাহিত্যের যে প্রেরণা দিয়েছে, তা' আজ আমাদের সামনে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রামনারায়ণ ও দীনবন্ধুর প্রেরিত রচনা পল্লীজীবনভিত্তিক। এমন কি, সাম্প্রতিক কালে তুলসী লাহিড়ী 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়া তার' নামে বাংলা সাহিত্যের

যে দু'খানি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছেন, তা'দেরও ভিত্তি পল্লীজীবন। নানা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পল্লীজীবনের সঙ্গে সেই যোগ আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সুতরাং বাংলা নাটকের যে কতকগুলো সনাতন ক্ষেত্র ছিল, সেখান থেকে তার আর কোনও নূতন প্রেরণা পাবার উপায় নেই। তার পরিবর্তে আর একটি নূতন যে সমাজ-জীবন গড়ে উঠছে, তা'তে নাটকীয় উপাদানের অভাব আছে তা'ত কেউ স্বীকার করবেন না। পল্লীর কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের বিনিময়ে আমরা শহরের শিল্পকেন্দ্রিক এক নূতন সমাজ-জীবন আজ লাভ করেছি। পল্লীর সঙ্গে বিচ্ছেদের জ্ঞাত পরিতাপ করবার পরিবর্তে যদি আমরা শিল্পকেন্দ্রিক শ্রমিক-জীবনের মধ্যে গভীর ভাবে অনুশন্ধান করি তা'হলে সেখানে বাংলা নাটকের নূতন নূতন উপকরণ লাভ করে আমরা লাভবান হব। কারণ, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক পল্লীর কৃষিজীবন অপেক্ষা শহরের ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্প-জীবন আরও জটিল, আরও অনিশ্চয়তা এবং আশঙ্কা দ্বারা বিক্ষুব্ধ, সুতরাং নাটকীয় উপাদানও সেখানে বিচিত্রধর্মী। শ্রমিকের সমস্তা কেবল তার বহুমুখী অর্থনৈতিক সমস্তাই নয়, তার অগ্রমুখী আরও জটিলতর সমস্তা আছে, তা' উদ্ধার ক'রে নাটকের মধ্যদিয়ে এক অভিনব জীবন-বাণীর সন্ধান লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং অনুবাদ, অনুকরণ ইত্যাদির পরিবর্তে আজ জাতীয় জীবনের মধ্যে উপকরণ-সন্ধানের প্রেরণা যত বেশি দেখা দেয়, ততই বাংলা নাটকের পক্ষে সকল দিক থেকেই কল্যাণকর হতে পারে।

সাম্প্রতিক কালে বাঙ্গালীর নাটকের অনুশীলনের ক্ষেত্রে আর একটি প্রয়াস দেখা দিয়াছে, তা' নানা কারণেই অভিনন্দনযোগ্য। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকখানি বিলুপ্তপ্রায় নাটকের কেবলমাত্র পুনঃ-প্রচারই নয়, সার্থক পুনরাভিনয় হয়েছে। তাদের মধ্যে রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ', মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা' 'সধবার একাদশী', 'কৃষ্ণকুমারী', অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকা-বিদায়', 'ভিল-তর্পণ', গিরিশচন্দ্রের 'যায়সা-কি-তায়সা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই বিলুপ্ত-প্রায় নাটকগুলোর অভিনয়ের ভিতর দিয়ে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিযুগের নাটকগুলোরও যে একটি শাস্ত্রত আবেদন ছিল, তাই বাংলা নাটকের দর্শকবৃন্দ প্রত্যক্ষ অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছেন। কারণ তাদের অভিনয়ের মধ্যদিয়ে যে কেবল একটি শিক্ষাগত বা Academic কৌতুহলই নিরুত্তীর্ণ করেছিল, তা' নয়—তাদের ভিতর দিয়ে সে যুগের নাট্যকারের শক্তি এবং

দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা' এ যুগের নাট্যকারদের মধ্যেও নূতন প্রেরণা সঞ্চার করবার সুযোগ দিয়েছে।

একদিন বাংলার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ বাংলা নাটক রচনার যে প্রেরণা দিয়েছিল, আজ সে'দিক থেকে তার প্রেরণা লাভ করবার সুযোগ যে অনেকটা হ্রাস পেয়েছে এ'কথা অনেকেই অনুভব করে থাকবেন। কারণ, এখন ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে একই নাটকের শত শত রজনী অভিনয়ের ফলে নূতন নূতন নাটক পরিবেশন করবার সুযোগ অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে, আজ যে অসংখ্য শৌখিন নাট্য সম্প্রদায় বাংলা দেশের সর্বত্রই গড়ে উঠেছে, একদিন তা'দের কারও অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সেদিন ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের যে দায়িত্ব পালন করবার প্রয়োজন ছিল, আজকে তার পক্ষে তা' করতে না পারলেও জাতির নাট্য-সাহিত্যের পক্ষে কোন বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা করা যায় না। কারণ, নূতন নূতন নাটক রচনা এবং তাদের

চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে ভারতের সেবা করুন।

পরিবেশন করবার দায়িত্ব আজ কয়েকটি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায় অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে পালন করবার জন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছে। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ-গুলোর বেঁচে থাকবার যে প্রয়োজন আছে, তা' কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, সুতরাং তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে তার যে পথে চলা অপরিহার্য, কোনও আদর্শের দোহাই দিয়ে তাকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করবার প্রয়াসকেও যুক্তি-সম্পন্ন বলে মনে করা যায় না। আজ সবাক চলচ্চিত্রের যুগে তার তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে বাংলার রঙ্গমঞ্চগুলো বেঁচে আছে—শুধু বেঁচেই আছে নয়, এমন কি, আজ নূতন প্রাণশক্তিতে পর্যন্ত সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে, তা' কেবলমাত্র তার নূতন আঙ্গিক উদ্ভাবন ক'রে নূতন পথ ধ'রে চলবার জন্তই সম্ভব হয়েছে; তা' না হ'লে সবাক চলচ্চিত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে তার আত্মবিলোপ ঘটত। অনেকে এ'কথাও মনে করেন, ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চগুলো বহুমুখী প্রয়োগরীতির উপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দেবার জন্ত অভিনয়গুণ যেমন হ্রাস পেয়েছে, তাদের নাটকগুলোর সাহিত্যগুণও তেমনই গোঁণ হয়ে পড়েছে। বাংলার সাম্প্রতিক রঙ্গমঞ্চকে নিতান্ত আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এই উপায়ও উদ্ভাবন করবার আবশ্যক হয়েছে। আজ রঙ্গমঞ্চের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী সবাক

চলচ্চিত্র, অথচ মঞ্চজগতে গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমারের মত প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারও অভাব দেখা দিয়েছে। অতএব বাধ্য হয়ে রঙ্গমঞ্চকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে কতকটা আপস করে নিতে হয়েছে। সুতরাং অতীতে যে যুগে চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব ছিল না, অথচ বহু রঙ্গমঞ্চে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার অস্তিত্ব ছিল, তার সঙ্গে আজকের চলচ্চিত্রের যুগের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার সম্পর্কশূন্য রঙ্গমঞ্চের কোনও ভাবেই তুলনা করা চলে না। অতএব অতীতের বাংলার রঙ্গমঞ্চে যা হয়েছে, আজকে তা হয় না বলে পরিতাপ করাও অর্থহীন। তবে এ কথা সত্য, প্রয়োগরীতির উপর অতিরিক্ত জোর দেবার ফলে বাংলার রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়ে প্রথম শ্রেণীর নাটকের সম্মান লাভ করা কঠিন হতে পারে; কিন্তু আগেই বলেছি যে, এ যুগে সে দায়িত্ব নেবার ভার শৌখিন রঙ্গমঞ্চগুলোই নিতে পারে, ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চগুলোকে সে দায়িত্ব থেকে কিছুকালের জন্য অব্যাহতি দিলেও বাংলা নাট্য-সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতির কিছু কারণ হবে না। যে উপায় উদ্ভাবন করেই হোক রঙ্গমঞ্চগুলো আজ যদি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে পারে তবে একদিন তাদের মধ্যে থেকেও সার্থক বাংলা নাটকের সম্মান ব্যর্থ হবে না।

অনুবাদ গ্রন্থ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর	শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাট্টাচারীর
আজব জীবিকা	৩'০০ ॥ মায়াবতী ২'৫০ ॥
জীবন-মৃত্যু ২য় মুঃ	২'৫০ ॥ অভিসার ৩'৫০ ॥
অরুণা হালদারের	রণজিৎ রায়ের
তারার	২'০০ ॥ ফসল ৩'৫০ ॥
	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সেই আশ্চর্য রাত	৩'০০ ॥ শাদা-কালো ৩'০০ ॥
বিমল দত্তের	ঋষি দাসের
কাশ্মীর প্রিমেস	৩য় মুদ্রণ ৪'০০ ॥ .মা ৩য় মুঃ ২'৭৫ ॥
	পরিমল গোস্বামীর

(বারট্রাও রাসেলের
The Conquest of Happiness)

সুখের সন্ধানে

পাঁচ টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো

নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দ

স্বধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার

যৌবনের মুখে ক্ষুদ্র আন্দোলনের মধ্যে এক বিশিষ্ট তপস্তার আসনে সমাসীন শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার জানিয়ে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দেবতার দীপ হাতে যে কল্পদ্রুত আসেন তাঁর প্রতি সেদিন কবিগুরু স্বল্প আবেগ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার রূপ নিয়ে ফুটে বেরিয়েছিল সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়, অমৃতনিয়ন্দনী স্রোতে। সে ছিল পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন তপস্তা, সেখানে আরাম লজ্জিতশির হয়, মৃত্যু ভোলে ভয়। প্রায় দুয়ুগ পরে তাঁকে তিনি দেখেছিলেন তার দ্বিতীয় তপস্তার আসনে, অপ্রগল্ভ স্তব্ধতায়, সেদিনও তাঁকে প্রণতি জানিয়ে এসেছিলেন তিনি। শুধু ভাবসাধনাতেই মিলন নয়, পুরানীর লেখাতে ত পড়ি ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় আসবার পর জোড়াসাঁকোয় চলেছেন নিমন্ত্রণে। জাপানী শিল্পী ওকাকুরা, জগদীশচন্দ্র, বোধহয় নিবেদিতা ও আরো কয়েকজন সেই ডিনারে আমন্ত্রিত ছিলেন। কবিকেও দেখি চলেছেন সঞ্জীবনীর আফিসে। বন্দেমাতরম মকর্দমায় ছাড়া পাওয়ার পর ১২ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেন—আপনি আমাদের বড্ড ফাঁকি দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজীতে জবাব দেন—Not for long. এই সাক্ষাতের একটি সুন্দর ছবি পাই আমরা শ্রদ্ধেয় চারুদত্তের কাছে “অরবিন্দ ছাড়া পাওয়ার দিনহুই বাদে একদিন ছপুর বেলা আমরা—অরবিন্দ, গুঁর মেজদা, স্ববোধ, নীরদ ও আমি খুব হৈ হৈ করছি এমন সময় দরোয়ান এসে বললে—রবিবাবু এসেছেন। আমরা তাড়াতাড়ি সামনের হলে বেরিয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ দুই বাছ প্রসারিত করে অরবিন্দকে বুকে টেনে নিলেন, কবির চোখহুটি ছলছল করছিল।” শ্রীঅরবিন্দেই একটি ইংরাজী কবিতা মনে পড়ছে তার বাংলা ভাবার্থও দিচ্ছি—

I shall not die

Although this body, when the spirit tires

Of its cramped residence, shall feed the fires

My house consumes, not I.

Together and upbear the teeming earth

I was the eternal thinker at my birth

And I shall be though I die.

আমি মরিব না, আমি মৃত্যুহীন

যদিও জানি—একদিন

ক্লান্ত দেহলীর সীমিত দিগন্ত ছাড়ি

অমোর শ্রান্ত সন্তা দিবে পাড়ি

অগ্নিভোজ্য হবে এ নিকেতন

বহিমালিকার উৎসব আভরণ

সে আমি, কিন্তু আমি ত নহি

যে আমি জড়িয়ে রহি, বাতাসে বহি

তুলিয়া ধরি অশ্বরে

পৃথ্বীর সাথে মিতালীর স্বয়ম্বরে

যে আমি জন্মদিনেও ধ্যাননিমগ্ন

যে আমি মৃত্যুক্ষেণেও রসবিলগ্ন।

দু' দুটো শতবার্ষিকীর জগবাস্প, লাক্ দোড় বড়তার বহর দেখে, মাইকী শূলবিদ্ধ
অমায়িক ভাষণ শুনে, আশানিরাশার দোলনচাঁপার 'দে দোল' 'দে দোল'
দেখতে দেখতে ভাবছিলাম পিতৃরিকথকে আমরা শ্রদ্ধা করি না অশ্রদ্ধা করি।
ইচ্ছে হয়েছিল প্রশ্ন করি কবিকে—তুমি কি এসেছিলে তোমার সম্মানে অহুষ্ঠিত
আসরে বাশরে, জলসায় গানে নৃত্যভিনয়ে, উৎসবে-অহুষ্ঠানে, রসের মেলায়,
উজোগের খেলায়। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর নানা অহুষ্ঠানে গিয়ে মনে
হয়েছে—শ্রদ্ধা মানে কি ভাবগদগদ আরতি, ফুলফলে পল্লবে মাল্যচন্দন
অর্ঘদান, তাঁর বাণী বা কথাকে যন্ত্র করে নিয়ে মন্ত্রের মত আবৃত্তি—জীবনে তার
প্রতিফলন কই, অহরণন কই, রূপায়ণ কই। আমরা কি বলতে পারছি
জীবনের একটি সামান্যতম পর্বেও যে চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। ইঁ্যা,
পূজো করি আমরা হয়তো এটা সত্যি, ব্যক্তিগত জীবনে অনেকের অনেক কিছু
প্রাপ্তি বা লাভও ঘটেছে, বৈদগ্ধ এসেছে, এও সত্য কিন্তু সমষ্টিগত সাধনে
এই সব মহাপুরুষদের আবির্ভাব-লগ্ন ব্যর্থ না হলেও চিরকালের জন্ত যাতে সার্থক
হয় তার জন্ত আমরা কি করছি। বার বার এই কথা বলতে ইচ্ছে হয়—
Awareness আর acceptance এক নয়।

বাংলা হিসাবে এই শতাব্দীর প্রথম দর্শকের কথা স্মরণ করলে দেখা যাবে

তিনটি জ্যোতিষ ভারত ভাগ্যগগনে বিধাতার জয়টাকা পরে উদয়-নেপথ্য থেকে ধীরে ধীরে উঠছেন—১৩০০-১৩১০ বাংলার চিত্তমস্থনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে—ভারতের একপ্রান্ত থেকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, আর একদিক থেকে শ্রীঅরবিন্দ—মাঝখানে বিশ্ব জয় করে এসে বসলেন বিবেকানন্দ।

এই তিনজনকেই দেখেছি ‘গন্ধভারে আমন্ত্রণ বসন্তের উন্মাদন রসে’ নয় শুধু, ধ্যানমগ্ন চৈতন্যের জ্যোতিলোকেও। এই ত্রয়ীর দান আজও সক্রিয়।

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা জানি বিপ্লবী মহানায়ক রূপে, মহাযোগী রূপে, বিশিষ্ট চিন্তানায়ক দার্শনিক বলে। কিন্তু তারও পিছনে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যে একজন সম্পূর্ণ সাহিত্যরসরসিক শ্রষ্টা বসে আছেন সে কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। “সাবিত্রী”র কবিকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু সেই কাব্যকে বলি দাঁতভাঙা, কারণ যে গিরিশঙ্গমালার মহৎ মৌনে কবি আমাদের মনকে নিয়ে যেতে চান, সেই তুঙ্গীনাথের নিশ্চলা সমাহিতির তীর্থে যাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই অপরাধ হয় আমাদের নয়, যিনি লিখেন তাঁর, কারণ সেখানে সমাজ-চেতনার ব্যক্তি-মানসের value বা norm নিয়ে বিরোধ আছে এই কথা বলে আমরা বিতণ্ডা তুলি। ভুলে যাই কাব্যের বা নাটকের মূল মন্ত্র, তার রূপরস-শৌন্দর্যের প্রকৃত বিভাস। স্বথচ্ছঃখ জৈবিক তাড়না, সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সবই একটা বৃহত্তর পরিণতিতে যাবার বিকাশপথের সোপান। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক মন, তার পারিপার্শ্বিক, তার স্থূল বেদনা-কামনা-কল্পনা নিয়েই কেবল সাহিত্য সৃষ্টি করে না—সব মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ নিটোল সত্তাই শিল্পীর মনে সদাক্রিয়াশীল। সে প্রকাশ চায়, বিকশিত হয়ে ওঠে, নানা ছন্দে গানে রূপে, অধিকার-ভেদে দৃষ্টি-ভেদে শিক্ষা-দীক্ষা-সহিষ্ণুতা-ভেদে। কোন ইজ্জতের মধ্যদিয়েই তার যাত্রার সম্পূর্ণ ইতিহাস ফুটে ওঠে না। এখানে ধ্বনির আলোক রসাত্মক কাব্যের সমষ্টি, রোমাঞ্চিক প্রলেপ, আদর্শ ও ভাবগত বিকাশ, কারুশিল্প, সমাজ-চেতনা ছাড়িয়ে অনির্বচনীয়ও। প্রসাধনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে উপলব্ধির নিবিড়তাও যেমন আসে, প্রাপ্তির আনন্দের সঙ্গে বৃহত্তর স্পর্শ, মহতের অল্পভূতিও। কবি যে শ্রষ্টা আর দ্রষ্টা দুইই। কবি শ্রীঅরবিন্দের প্রথম যুগের কবিতাতে পড়ি—

তাকে আমরা দেখেছি

ঐ স্তব্ধ তুষারশৃঙ্গের নীরব মহিমায়

স্বগভীর গরিমায়

মহাশূণ্ডে আকাশের নীলিমায়

যেখানে তিনি কর্মব্যস্ত
 তিনি হারিয়ে গেছেন আমার মনে
 মহাত্মাসীর গহ্বরে
 তাঁকে পেয়েছি আমার চিন্তায়
 ফুলের স্তবকে স্তবকে
 নিশীথিনী তারার ভাস্বরজালে

আবার কবি তাঁকে দেখছেন

কোন ছায়াঘন প্রত্যুষের আলোতে
 বিশ্বত সায়াহ্নের নির্জন প্রাস্তবে
 শুনি তব পদধ্বনি
 দয়িততম আসো তুমি
 দীপশিখা সম, আনন্দ স্বপন মম
 তুমি আসো
 আরো আরো নিকটে আরো

মহৎ শিল্পীরা তাঁদের শিল্পচেতনা প্রকাশ করেন নানা মাধ্যমে। শ্রীঅরবিন্দ শুধু কবি নন নাট্যকারও। তাঁর জীবনের বরোদাবাস যুগকেই নাটকের যুগ বলা যেতে পারে। বাংলা ইংরাজী সংস্কৃত গ্রীকলাতিনফ্রেঙ্কের অপূর্ব রসায়নে বিদগ্ধ কবিমানস অজস্র সৃষ্টি করে চলেছে—কালিদাসের বিক্রমোর্বশী থেকে চণ্ডীদাসের প্রেমকাব্য, ভর্তুহরির নীতিশতক থেকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, ইউরিপাইডিস্ সফোক্লিস ম্যালার্মেবোদলেয়ার সেক্সপীয়র কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

এই পরিবেশেই তাঁর নাটকের জন্ম। কোন কোন সমালোচকের মতে শ্রীঅরবিন্দ ঠিক নাট্যকার নন, নাটকের আকারে তিনি কাব্য পরিবেশন করেছেন (dramatic poetry)। ড্রামা বা নাটকের মধ্যে আমরা কি চাই এ নিয়ে বহু মূল্যবান মন্তব্য এযুগে ওযুগে, এদেশে ওদেশে এরিষ্টটল্ থেকে ভরতমুনি, অনেকেই করেছেন। ড্রামার স্বরূপ কী এ কথা বলতে আমরা ধরে নিয়েছি যে তাতে থাকবে মানব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের একটা যোগ-বিয়োগের ফল—এক কথায় action এবং একটা সমগ্রতা integrity। অনেক সময়েই নাটকে scenic এবং musical illusion-কে নাটকের স্বরূপ বলে মনে করি অবশ্য তার শ্রীরূপ ফোটাতে কতকগুলি উপায় ও অপায় আছে। ধরুন সেক্সপীয়রের হ্যামলেট চরিত্র—এতো রকমে কতো ধরণে কতো মনীষী তাকে রূপায়িত করেছেন। বার্নাড শ সেই

কথাই বললেন তাঁর “The Interpreter প্রবন্ধে—The cry is still they come. রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর বাউলের যে ছবিটির সঙ্গে আমরা পরিচিত তার ব্যাকগ্রাউণ্ডে আছেন কবি স্বয়ং। যারা তার এই অভিনয়টি দেখেছেন আর গান শুনেছেন—“ধীরে বন্ধু ধীরে” তাঁরা টমসন্ সাহেবের উক্তিকে মনে করবেন।

It was almost as if Milton had acted his Samson.

রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকের অল্পভূতিময় যে সংকেতটি (symbol) আছে সে তো কবির নিজেরই কথা। নাটকটির জন্মইতিহাস অপূর্ব। কবি বলছেন—“শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাতুর পেতে পড়ে থাকতুম, প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে।……কিন্তু হঠাৎ কি হল রাত ছুটো তিনটেয় অন্ধকার ঘেন পাখা বিস্তার করল……যাই যাই মনে একটা বেদনা জেগে উঠল……আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়তো মৃত্যু”……ফলে একটি অপরূপ নাটকের সৃষ্টি হলো নাম তার ডাকঘর। এর অভিনয় দেখে মহাত্মাজী চোখের জল রাখতে পারেন নি। নাট্যকারকে শুধু play wright হলেই চলে না—এলারডিস্ নিকল বলেন যে গ্রীসে নাটকের জন্ম হয়েছিল গান থেকে—অবশ্য তাই বলে নৃত্যনাট্য বা musical extravaganzaই নাটকের সমগ্র রূপ নয়। জীবনের দোলায় যা জমলো—কাম কামনা হিংসা রিগ্‌সা, স্নেহ প্রেম ভালবাসা, মোহ, বেদনা তারই ঘাতপ্রতিঘাতে যে নূতন শিল্পচেতনা প্রতিফলিত হলো তাকে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে প্রতিফলন করাই নাটকের উদ্দেশ্য। এরই মাঝখানে যখন ফুটে ওঠে একটা inner quality of dramatic integrity তখনই গুণীর বিচারে তা হয় রসোত্তীর্ণ।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম নাটক “Perseus the deliverer—‘পরিব্রাতা পারসিউস’। এটি লেখা তাঁর বরোদাবাসের যুগে—আজ থেকে ৬০।৬৫ বছর পূর্বে। গল্পের আখ্যানভাগ এই যে রাজা এক্রিসাস্ দৈববাণীতে জেনেছিলেন যে তাঁর কন্যার পুত্রই তাঁকে ধ্বংস করবে, অনেকটা কংসকাহিনীর মত। সেইজন্তই মেয়েকে আবদ্ধ করে রাখলেন নির্জন ছুর্গে, কিন্তু স্বর্গের অধিপতি জিউস্ অবতরণ করলেন সেই কারাগারে এবং সেই মিলনের ফলে জন্ম নিলেন পারসিউস্। কন্যা পুত্র প্রসব করেছে জেনে ক্রুদ্ধ নরপতি কন্যা ও দৌহিত্রকে অকূল সমুদ্রে কাণ্ডারীহীন পালহীন তরণীতে ভাসিয়ে দিলেন। সে যাত্রাও তারা বেঁচে গেলো এবং আশ্রয় পেলে সেরিপস্ দ্বীপের অধিপতির কাছে। পারসিউস বড়ো হলো, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার বীরত্বের প্রকাশ

হলো শেষ পর্যন্ত সিরিয়ারাজের কণা এণ্ড্রোমেডাকে বিবাহ করলেন তিনি সমুদ্রদেবতা পসিডনের বিরোধিতা করে। গল্পের ছায়া পুরাতন গ্রীসের কাহিনী, যাকে heroic myth বলা যেতে পারে। নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দ একে এলিজাবেথান যুগের রোমান্টিক নাটকেই পরিণত করলেন না, এর মধ্যেই একটা উর্ধ্বতর গভীরতর আধ্যাত্মিক চেতন জীবনের সূচনাও দিলেন। নাটকের আরম্ভে প্যালাম এথেনি (বা সৌন্দর্যের দেবী) ও পসিডনের বাক্যালাপেই কবিত্বময় ভাষায় এর ইঙ্গিত। তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত মহাসাগর—উর্মিমুখর ব্যগ্রভীষণ—মহাঝটিকার আবর্ত—দেবী এসে দাঁড়ালেন আকাশে বিদ্যুৎমেখলা, তড়িতচঞ্চলা, আলুলায়িতকুন্তলা—অশান্ত সমুদ্রকে স্তব্ব করে দিয়ে তিনি বললেন :

হে পসিডন্ তুমি জাগো, জাগৃহি, ওঠো

সমুদ্রের বহু নিম্নে নিদ্রিত পসিডন্ জেগে বললে—

কে আমাকে ডাকে

জলধির কলনাদে উত্তর এলো

উর্ধ্ব আবির্ভাব হয়েছে এক শুভ্রা শক্তির

তুমি কে জিজ্ঞাসা করে পসিডন্

আমি মাহুঘের অমর অভীষ্টাকে ঠিক পথে চালিত করি

Me the Omnipotent

Made from His being to lead and discipline

The immortal spirit of man, till it attain

To order and magnificent mastery

Of all his outward world.

শ্রীঅরবিন্দের এই নাটকটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জনের কিছুটা তুলনা করা যায়। রঘুপতি আর পলিয়াডন্ এক নির্মম দেবতার উপাসক—জয়সিংহ আর পার্সিউস্, অর্পণা ও এণ্ড্রোমেডা তারই বলি। দেবতা চাইছে তার বলি—‘মায় ভূখা হ’

My victims, Polyadon, give me my victims—

মহাকালী কালরূপিনী, রয়েছেন

দাঁড়াইয়া তুষাভীক্ষ লোলজিহবা মেলি—

বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্ত ধারা

ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে—

রসের মতন অনন্ত থপরে তার

কিন্তু শুভাশক্তির কাছে রুদ্রাশক্তির শেষ পর্যন্ত হার হয়ই। মৃত্যুরূপা
যাতাই যে মা অমৃতময়ী এ উপলব্ধি আসে। নাটকটি বৃহৎ, এর মধ্যে
থাকে myth, romance ও realism। মূল কথা হচ্ছে—Be glad of
love, be glad of life. প্রেম ও জীবনকে এক সূত্রে গেঁথে দেন স্বর্গের
দেবতা। আজকের দিনে অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবে এই নাটকটি
ব্যবহৃত হবে না কিন্তু অরবিন্দ সাহিত্য ও দর্শনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে
এই নাটকটির মূল্য অসীম। এই যুগে শ্রীঅরবিন্দ কালিদাসের বিক্রমোর্বশী
নাটকটিকে ইংরাজীতে রূপদান করেন “The Hero and the Nymph”
নাম দিয়ে। উর্বশী কুবেরপুরী থেকে ফিরছিলেন এমন সময় অসুররা তাঁকে
হরণ করলে। রাজা পুরুষোত্তম তখন এখান দিয়ে আসছিলেন, তাঁর টনক
নড়লো। তিনি ‘ঐশাং দিশং প্রতি’ আশ্রয় গমন করলেন, উর্বশীকে উদ্ধার
করে হেমকূট পর্বতশিখরে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের
বন্দী হয়ে গেলেন। এই ঘটনাপ্রতিঘাতের মধ্যেই কালিদাসের উর্বশী ফুটেছে।
সে স্বর্গের কামনাকেন্দ্রের কেন্দ্রী নয়, সে অপ্সরা নয়—অনপ্সরের সে প্রতিভাসি,
সে মাহুধী, সে প্রেমিকা, দুর্বৃত্ত হরণ করলে সে মূর্ছা যায় তার সখীরা
চীৎকার করে :

অজ্ঞা, পরিত্রাণ, পরিত্রাণ

যাকে শ্রীঅরবিন্দ রূপান্তরিত করলেন—Rescue from Titan violence
এই উর্বশীই মাতৃস্নেহে গরবিনী—পুত্র মে আউ, সে বলে :

সখি, মা খলু মা খলু বিশ্বর—

প্রথম অঙ্কে উর্বশী যখন চলে গেলেন গন্ধর্ব কন্যাদের সঙ্গে তখন কালিদাস

অহো চূর্ণভাভিলাষী মদনঃ

এষা মনো মে প্রসভং শরীরাত্ পিতুঃ

পদং মধ্যমং পতন্তী—স্বরঙ্গনা

কর্ষিত খণ্ডিতাগ্রাং সূত্রং মুণালাদিবং রাজহংসী—

শ্রীঅরবিন্দ একে নূতন করে সৃষ্টি করলেন

O! Love, O! Love

Thou makest man not for things impossible

And mad for dream. She soars up to the Heavens,

.....Draws my heart by force

Out of my bosom. It goes with her

bleding as when a wild swan

Through the sky,

Wings for her flight, there dangles

In her beak, a dripping fibre from the lotus torn.

রাজহংসী চলেছে—বলাকার দলের সঙ্গে—দূরে আরো দূরে হেথা নয়, হেথা নয়—কিন্তু সেই হংসহুহিতা নিয়ে যাচ্ছে আমার ক্ষতবিক্ষত মনটি—তার রক্তাক্ত চকুটি থেকে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, উপড়ে নিয়ে যাওয়া মৃণালতন্তর একটি টুকরো। কালিদাসের কাত্যায়নী মন কল্পনা করেছিল যে এই লোকললামভূতা নারী কখনই বেদভ্যাস জড় ভোগবিমুখ ঋষির সৃষ্টি নয়, ইনি কান্তিমান চন্দ্রের বা

শৃঙ্গারৈক বসঃ স্বয়ং হু মদনো, মাসো হু পুষ্পাকরঃ

শৃঙ্গাররসপ্রধান মদনদেবের বা মধুমাসের সৃষ্টি হবেন।

শ্রীঅরবিন্দ মূলতঃ কালিদাসের উর্বশীকে গ্রহণ করলেও নিজেও চার সর্গে বিভক্ত একটি উর্বশী কাব্য রচনা করেছিলেন এবং সেই উর্বশীকে মহাকাব্যীয় স্তরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। সে উর্বশী রতিভ্রারে প্রীড়িতা বটে, তবুও আলসে মদনের মনবিহ্বল মাধুর্য রভসে সে পড়ে থাকে, আতপ্তঘন দেহাগ্র-চূড়ায় তার হিয়া ছুরুছুরু কাঁপে, তবু দেহের অগুতে অগুতে অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গিতে কামনার প্রতিটি স্তরে যে মিলনের স্তত্রপাত তার সার্থকতা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কারণ প্রেম যদি উর্বশীর না হয়, আত্মকেন্দ্রিক থেকে যায় তাহলে বিশ্ববিধান যে উল্টে যায়।

How long shall one man

Divide from heaven its most perfect bliss

Go down, bring her back

উর্বশী ফিরে এলেন, পুরুষবা বিরহব্যথায় অধীর হয়ে উঠলেন, তিনি কৈলাসে তপশ্রামণ্ড হয়ে মহাশক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন

He understood infinily and saw

Time like a snake coiling among the stars.

কিন্তু এ হলো তাঁর ব্যক্তিগত প্রাপ্তি, নীচে পড়ে রইলো মাটির পৃথিবী

The green and strenuous earth abandoned rolled.

এই abandoned কথাটির তাৎপর্য অসীম। সাধনার প্রেমে তপস্রায় উর্ধ্বে ওঠা যায় কিন্তু সেইটেই তার কথা শেষ নয়, কাব্যের নয়, নাটকের নয়, সাধনার নয়—মাটি ছেড়ে বিশ্বকেন্দ্রিক হওয়া যায় না

যে দুর্লভ রাত্রি মম,

বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম

তার জন্ম মাটিতে, তাকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়, শোধন করে নিতে হয়— তাই 'উর্বশীতে' যার আরম্ভ 'সাবিত্রীতে' তার শেষ—জীবননাটকের এই সব চেয়ে বড়ো সত্যই নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দের অবদান।

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী আর এক অপরূপ কল্পনা। সে কণ্ঠা নয়, বধু নয়, মাতা নয়, সে সুরসভাতলে নৃত্য করে, নৃপুর গুঞ্জরি চলে যায়, স্তব্ধ অর্ধরাত্রে সে দ্বিধায় জড়িতপদে সলজ্জিত বাসরশয্যাতে যায় না। সে সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃত-পান সভার সখী। সে অনন্ত রঙ্গিনী, তাকে ধরা যায় না, সেই অধরাকে ধরার খেলায় সবাই মত্ত, জীবনের জৈব নিয়মই এই।

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী অস্তাচলবাসিনী

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী
কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের উর্বশী ফেরে

She is but gone, for a little gone

But she will soon come back—

কালিদাস তাকে জননী করে উর্ধ্বে তুলে দিলেন মাহুতী মহিমায়, শ্রীঅরবিন্দ তাকে বহুর মধ্য থেকে উদ্ধার করে একের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন তপস্রায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে বাহুর অহুভূতিতে বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন সৌন্দর্যের স্রবায়—পৃথিবীর যা কিছু স্নন্দর সবই উর্বশীর প্রেরণা। আবার উর্বশীর সম্পর্কেই আধুনিক এক ছায়াবাদী কবি (দিনকর) লিখলেন—

তু পুরুষ তভী তক্ গরজ্জ বহা যব ভীতর বহ বৈশ্বানর

তুমি পুরুষ ততক্ষণ যতক্ষণ আগুন আছে শিতরে, কিন্তু নারী

জব দেখতি পুরুষ কো ইচ্ছা ভরে নয়ন সে

নারী জাগতী হৈ কেবল উদ্বেলন, অনল রুধির মে

মন মে কিম্বী কান্ত কবি কো ভী জন্ম দিয়া করতী হৈ

সে এক কান্ত কবিরও জন্মদান করে।

শ্রীঅরবিন্দের একটি নাটকের নাম 'বাসবদত্তা' আর একটির নাম

‘রদোগুনে’ (Rodogune)। বাসবদত্তায় মহাকবি ভাস্কর আভাস হয়তো কিছু আছে। অবন্তীর রাজপ্রাসাদ, অযোধ্যা ও কোশাঘীর চিত্র, গঙ্গা গোদাবরী নর্মদার শিকরসিক্ত প্রমোদ-উজ্জান, আসব সংগীত পুষ্প, আবার মহাসেপ্ত, গোপালক, বৎস যোগেন্দ্ররায়ণ, বাসবদত্তা, মঞ্জুলিকা অলক বিকর্ণ প্রভৃতি নাটকোচিত চরিত্রগুলির বিকাশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড় শান্ত হল, বিপদ শেষ হল, বীণায় বাজল প্রেমের বন্দনা

রাণী আমার, এবার আমরা খেলে যাব
সোনালী সবুজ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে
এক স্বর্ণ স্বপ্নের ভিতরে অনন্ত কাল ভেসে ভেসে
গুণো মর্তের কনকোজ্জল লক্ষ্মী, যতদিন না
আমাদের কাছে খুলে দিচ্ছ
তোমার স্বর্ণপুরীর
জ্যোতির্ময় দুয়ার।

শ্রীঅরবিন্দের আর একটি নাটক হচ্ছে “বমোররে উজীররা”। শ্রীঅরবিন্দের যৌবনে বরোদাবাসকালীন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের ঘটনাগুলির মধ্যে এই রম্য নাটকটি অন্ততম বৃহৎ। তাছাড়া এই নাটকটির উপর তাঁর একটু বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্টি ছিল। তাঁর প্রথম যুগের চঞ্চল রাজনৈতিক জীবনের ঘূর্ণিপাকে তাঁর লেখা কাগজপত্র খাতা বই পুলিশের হাতে লণ্ডভণ্ড হয় এবং অনেককিছু হারিয়ে যায়। এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি পঞ্চাশ বছর পরে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার কাগজপত্র ও নথীর মধ্যে পাওয়া যায়। এই নাটকটির সম্পূর্ণ অনুবাদ আমি করছি শ্রীঅরবিন্দ মন্দিরের “বর্তিকা” পত্রিকার মাধ্যমে। নাটকটি হারুণ্ অল্ রসীদের যুগের কাহিনী লিপিবদ্ধ করছে। এর মধ্যে শুধু ভাব, ভাষা, চরিত্র সংঘাত নেই, আছে অনবচ্ছাদিত হাসির খোঁজ, Satire ও Wit, গানের ফোয়ারা অথচ নাট্যমহিমাকে স্তম্ভ বা নিম্নাঙ্গের করেনি। সেখানে

বাদীর দলের বন্দিনী ঐ তপ্ত শিখা তরীকে
ধরবো গুণো কিসের জাঁকে মনে মনে গুনছি যে,
যেমন আছে, তেমনি আছে
ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো
হে অধীর স্তম্ভ হও
মনরে আমার ঘুমিয়ে পড়ো
হৃদয় আমার শান্ত রও

ধুকধুকনি বন্ধ করে কাঁদতে শেখো, কাঁদতে শেখো
 প্রতীক্ষার পত্রখানি চোখের জলে ভিজিয়ে লেখো
 বেঁচে থাকার জারকেতে করলে ত অনেক লাফালাফি
 মন্দির দিনের নেশায় যেতে মাতাল মত দাপাদাপি
 জানানো কি জীবন কেবল বেদনাতে ছলছল
 রোদনভরা ব্যথার সুরে করে শুধুই টলমল

তাই কবি ও নাট্যকার প্রস্ন তোলেন—

তুমি কি পারবে ধরে রাখতে সেই রঙীন রাঙা প্রেমকে

উজল চিকণ গোলাপ বরণ চাকচিকে

না, না, না, ওগো হরিণনয়না

ফাঁদ পেতে প্রেম যায় না ধরা

প্রণয়ের ভাগ যায় না করা

সাঁঝের বাতির ক্ষীণ আলোতে চকচকে ঐ চোখদুটি

তোমার দিলমাতানো চেরীগলানো রঙীন রাঙা ঠোঁটদুটির পরেও যে
 গল্পের শেষ নেই—সেই শেষের নাটকের কথাই শ্রীঅরবিন্দের কথা, তবে
 প্রথমকে বাদ দিয়ে নয়—তাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নাটকে শুধু playwright বা
 নাট্যকার নন, কবিমনীষীও।

॥ বেঙ্গলের বরণীয় সাহিত্য সম্ভার ॥

প্রবোধকুমার সাহিত্যলেক্স

হাস্যবানু ৪র্থ মুঃ ৮০০ ॥

নওরঙ্গী ৩০০ ॥

শ্যামলীর স্বপ্ন ৬ষ্ঠ মুঃ ৪০০ ॥

স্বাগতম ৮ম মুঃ ২০০ ॥

প্রথম খণ্ড : ১৪০০ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড : ১২০০ ॥

দুটি খণ্ড একত্রে : ২৫০০ ॥

দেবতাত্মা হিমালয়

১ম খণ্ড (১০ম মুঃ)

২০০ ॥

২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ)

১০০ ॥

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

প্রদক্ষিণ ২য় মুঃ

৪০০ ॥

দিকশূল (৩য় মুঃ)

৪৫০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

নবেন্দু ঘোষের

মহাকাণ্ড (২য় মুঃ)

৩৫০ ॥

ডাক দিয়ে যাই (৬ষ্ঠ মুঃ)

৩০০ ॥

নারায়ণ সাহিত্যলেক্স

সরলাবালা সরকারের

মনাম্রী

চার টাকা ॥

হারানো অতীত

৩০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের

দিলীপ মালিকারের

যুদ্ধের ইয়োরোপ

৪০০ ॥

মেনপোলিয়নের দেশে

২০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

নাটকবিচার প্রসঙ্গে

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়

সমকালীন নাটক-প্রযোজনায় একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যারা একে আন্দোলনের ফলশ্রুতি বলতে পঞ্চমুখ তাঁদের মতের সহগামী না হলেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এটি অতি-মাস্প্রতিক কালের ঘটনা। বিশেষত্বটি এই, যে, নাট্যপ্রযোজক, শিল্পী ও দর্শকসমাজ এক আবেগের সূত্রে বাঁধা পড়েছেন নাট্যকারের সঙ্গে। সব থেকে বড় কথা নাটককে আজকের বাংলাদেশ ভালোবাসতে চেয়েছে—এ আবেগ সেই চাওয়া থেকেই। তারই ফলে পেশাদার মধ্যে কয়েকশত রজনী একাদিক্রমে নাট্যাভিনয় চলে, অপেশাদার নাট্যসংস্থা পেশাদারী ভঙ্গী নিয়ে নিয়মিত নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করে নতুন ইতিহাসের সূত্রপাত করেন।

ইতিমধ্যেই একটি প্রশ্নের অবকাশ আছে। বাংলাদেশ নাটককে ভালোবাসতে চেয়েছে বলার অর্থ কি ?

খুবই সত্যি কথা যারা নিজেদের নাট্যপ্রেমিক বলে মনে করেন তাঁদের এ মন্তব্য আঘাত করবে তবু বলতেই হয় তুলনায় নাটককে ভালোবাসেন এমন লোক নগণ্য। যারা মনে করেন ‘নাটক ভালোবাসি’ তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসতে চান—তাই নাটক মানেই তাঁরা উৎসাহ বোধ করেন। নাটক তা সে যেমনই হোক না কেন—নাটকের বহিরঙ্গের কয়েকটি গুণ থাকলেই তাঁর প্রযোজনা হচ্ছে, দর্শন দর্শনী দিয়ে দেখতে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাণঢালা অভিনয় হচ্ছে এবং—‘নাটক ভালোবাসি’—এই বিশ্বাসের আবেগে দর্শক যথাস্থানে—যার সম্বন্ধে বলা চলে অধিকাংশই অস্থান—হাততালি দিয়ে প্রযোজক ও শিল্পীদের উৎসাহিত করছে। পেশাদার অর্ধপেশাদার ও অপেশাদার নাট্যসংস্থারা একটি একটুকরে একই নাটকের অনেক রজনী স্পর্শ করেছেন।

একে যদি নাট্যপ্রেম আর আন্দোলন তাঁর জন্মদাতা বলে ঘোষণা বা আন্তরিক বিশ্বাস করা হয় তাহলে নিরুপায়। তবে তাকে স্বীকার করে নিয়ে সত্যের অপলাপ করা এখনও অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। আমাদের বিশ্বাস সত্যিকারের শিল্পের ক্ষেত্রে তেমন ছুঁদিন কোনদিন আসে না।

॥ বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের শ্রেষ্ঠ বই ॥

বীরেন্দ্রমোহন আচার্যের

ছন্মায়ন কবিরের

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

২য় মুঃ ৭'৫০ ॥

৩য় মুঃ ৩'৫০ ॥

আনন্দকিশোর মুন্সীর

রাঘব বোয়াল

ভেলকি থেকে ভেবজ

৩'০০ ॥

৩য় মুঃ ৬'৫০ ॥

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

রমাপদ চৌধুরীর

আয়ুর্বেদ সঙ্গ ২'০০ ॥

মুক্তবন্ধ ৩'০০ ॥

সুবোধ ঘোষের

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য় মুঃ ৫'০০ ॥

মৃগতৃষ্ণা ৩'০০ ॥

প্রফুল্ল রায়ের

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সিন্ধুপারের পাখি

কয়লাকুঠির দেশে

২য় মুঃ ৯'০০ ॥

২য় মুঃ ৩'৫০ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কালকূটের

চক্রী

অমৃতকুণ্ডের সন্ধানে

৩য় মুঃ ৩'৫০ ॥

৯ম মুঃ ৫'০০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

বিক্রমাদিত্যের

শ্রেষ্ঠ গল্প

ফতে নগরের লড়াই

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

২'৫০ ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

দেবজ্যোতি বর্মণের

ব্যান ও বন্যা

আধুনিক ইয়োরোপ

৩'০০ ॥

৩'২৫ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের

চায়না টাউন

* রাজা ও মালিনা

* কর্ণফুলী

২য় মুঃ ৪'৫০ ॥

২য় মুঃ ৩'০০ ॥

৩য় মুঃ ৩'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

আন্দোলন আজ নাকি গতিশীল মঞ্চে মঞ্চে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তা শুরু হ'ল কবে? তার প্রস্তুতি ও প্রারম্ভে কাদের নাম লেখা আছে? যাদের আজ আন্দোলনের নায়ক বলে প্রচার করা হয়েছে তাঁরা কি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিপ্রচেষ্টার ধারকমাত্র নয়? সেইজন্তেই তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সূত্রবন্ধন নেই?

না, সূত্রবন্ধন নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের কেউ যে ভিন্নপথে চলে এসেছেন প্রথমদিনের যাত্রাশুরুর পথ ছেড়ে—তা স্বচ্ছ সরল। এ অধঃপতন তাহলে নাট্য আন্দোলনকে স্পর্শ করবে, বলা চলে তাকে আত্মঘাতী হতে বাধ্য করবে।

‘আন্দোলন’ শব্দটিকে প্রশ্রয় দিলে উপরোক্ত সংশয় জাগতে বাধ্য। তাছাড়া যার উদ্দেশ্য আজও সূক্ষ্মভাবে একটি পথকে আশ্রয় করেনি বরং বলা যেতে পারে অজ্ঞাত, পরিচয়হীন, তাকে এত আড়ম্বর করে প্রতিষ্ঠা দেবার পেছনে যে উদ্দেশ্য আছে হয় তা সং নয়, না হয় নিছক চিত্তবিলাস মাত্র। যেহেতু প্রথম অভিযোগের সমর্থনে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও জন্ম নেয়নি, তাই দ্বিতীয়টিই অবলম্বনীয়। সেদিক থেকে বলা অসঙ্গত হবে না, চিত্তবিলাসের রঙে ভালোবাসতে চাওয়াকে ভালোবাসা মনে করে নাট্যপ্রেমিকের গর্ববোধে বাঙ্গালীরা ধত্ত।

অভিযুক্ত বাঙালীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এর জন্তে দায়ী। আবেগপ্রবণতা চরিত্রের গুণ তবে মাত্রা ছাড়ালে গুণও অপগুণ হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিনের ইতিহাসে এমন নজীর বড় কম নয়। সেই আবেগের প্রচণ্ডতা নিয়ে বাঙালী দর্শক নাটক দেখেন—ভালোলাগলে উচ্ছ্বসিত হন,—প্রতি শতরজনী অন্তর বারবার প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হন; আর কোনো বিশেষ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয় দেখে খুশী হন। নায়ক-নায়িকার পরিবর্তন হলে অতিরিক্ত উপস্থিতি দিতে তাঁরা বাধ্য—বলা চলে অলিখিত সত্রে আবদ্ধ।

সত্যিকারের ভালো নাটকও তাঁরা দেখেন। ভালো লাগে তাঁদের। সেকথা ঘোষণাও করেন। কিন্তু তাদের শৈশবকালে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বিশ্বত হন। সবকিছুর মতই ভালো নাটকও জন্মায় খুব কম। ইতিমধ্যে তাই প্রচলিত নাটক নিয়ে দর্শক খুশী—অনেকটা ছুধের সাধ পিটুলিগোলায় মিটিয়ে বেশ তৃপ্ত।

এই নাট্যপ্রেমের ধারাকে ও তার ধারক ‘আন্দোলন’কে স্বীকার করতে সহজ সংকোচের অনিবার্য জন্ম।

বাঙলা দেশের নাটক-সমালোচনাতেও এই দুর্বলতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একে বলা উচিত নাটক আলোচনা—সমালোচনা নয়। এ মন্তব্যকে যদি কেউ কটাক্ষ মনে করেন তবে সবিনয় নিবেদন, তেমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধের সূত্রপাত হয় নি। যাকে আমরা সমালোচনা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তা আসলে সমালোচক মালুঘটির নিতান্ত ভালোলাগা-না লাগার বিবৃতি বিশেষ। তিনি আলোচক মালুঘ। ভালোলেগেছে তার কারণ আর ভালোলাগেনি কেন,—এই নিয়ে তাঁরা গণ্ডীবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তা ভালো হয়েছে কিনা—না হলে কেন হয় নি তারই সম-আলোচনা আজকের দিনে পাওয়া দুর্লভ। তবু তাঁরা সমালোচক কারণ তাঁরা মন্তব্য করার স্বযোগ পান আর তাকে বৃহত্তর মালুঘের সামনে তুলে ধরতে পারেন। কি সাহিত্যগত, কি প্রয়োগগত, নাটকের বিচার এই দুর্বলতালঙ্ঘিত।

নাটকের উৎস-সন্ধান একটি তথ্য সাফরিত যে, নাটক কৃষিসভ্যতার দান। অলুকের তার প্রাথমিক স্তর। কৃষিসভ্যতার পূর্বে এই অলুকের থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, তবু নাটক প্রত্যক্ষভাবে জন্ম নেয় কৃষিসভ্যতার অলুকের-প্রধান অলুঠান থেকে। মিশর গ্রীস ভারতবর্ষ রোম ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন লৌকিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে তার পুষ্টি হয়ে নাটকের আজকের রূপ এসে দাঁড়িয়েছে। নাটক আজ সাহিত্যের অঙ্গ কিন্তু তার প্রাণ, সাহিত্যের নয়, প্রয়োগধর্মের। সংস্কৃতির ‘দৃশ্যকাব্য’ ও প্রতীচীর ‘drama is an action’ মন্তব্যটি স্মরণ করছি এই প্রসঙ্গে।

বাঙলা নাটকের শতবর্ষপূর্তি হয়ে গেছে অনেকদিন আগে, তবু আজও বাঙলা সাহিত্যে দুর্বলতম শাখা বলতে নাটকের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশনা অবশ্যস্বাবী। নাটকের সাহিত্যগুণ বিচারে তার অকিঞ্চিৎকর অনস্বীকার্য। যেহেতু ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে অতএব যথেষ্ট মন্তব্য ও চিৎকার করা যেতে পারে কিন্তু তাতে প্রমাণিত হবে না ভালো বাঙলা নাটকের আজ ছড়াছড়ি। প্রকৃতপক্ষে কষ্টপাথরের বিচারে খুব কম নাটকই সার্থকতার মানদণ্ড লাভ করবে। তাই কেউ যদি বলেন বাঙলা নাটক তেমন জন্মাচ্ছে না বা নেই তাহলে তাঁকে দোষ দিতে পারি না। যারা এ অভিযোগ আনেন তাঁরা নির্ভরশীল নাট্যতত্ত্বের ওপর। যারা বিরোধিতা করেন তাঁরা নাট্যতত্ত্বের ধার ধারেন না—গিরিশ যুগের মালুঘের মতই দর্শনীর স্ফীতোদর অঙ্ক দেখে নাটকের ভালোমন্দ বিচার করেন। বলা চলে তারই ফলে আজও বাঙলা ভাষায় নাট্যতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের জন্ম অনাগত।

সাহিত্যগুণের দিক থেকে যাঁরা নাটক বিচার করেন তাঁদেরও তত্ত্ব-নির্ভরতায় তীব্র অনীহা লক্ষণীয়। নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় না হলেও আজ নাটকের অধ্যয়ন অব্যাহত এবং সেক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক বিচারের নামে অবিচার ঘটে চলেছে নিয়ত। প্রতীচ্যের ছুঁচারটি স্তরের অপূর্ণ প্রয়োগ করে বলা হয় কোন্ নাটক গুণবান কোন্ নাটক গুণহীন। সে আলোচনার চরিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—নিতান্ত আত্মগত ভালো-লাগা-না-লাগাকে যেন সমর্থন করিয়ে নেবার জন্তে ঐ স্তর আশ্রয়। বিচারের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্তরসন্ধান নেই। তখন তাঁরা, বিচিত্র ব্যক্তিমানসিকতাকে প্রশ্রয় দেন—নাটক-বিচার করতে গিয়ে তত্ত্বনিষ্ঠার নিন্দা করেন। অথচ সকলের একথা স্মরণীয়, অন্ততঃ সমস্ত বিচারকদের ক্ষেত্রে অবশ্যই—যে, বিচার করতে গেলে একটি মানদণ্ডের প্রয়োগ অপরিহার্য, সে মানদণ্ড ব্যক্তি মাহুষের হৃদয়বৃত্তি-জাত নয়—বহুদিনের সৃষ্টির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তার বুদ্ধিদীপ্ত রূপ। তত্ত্ব, তথ্য-নিরপেক্ষ নয়। আগে ভাষা পরে ব্যাকরণ। যেহেতু আগে জীবন পরে সংস্কার, তাই বলে নাটক-বিচারে বলা চলে না আগে নাটক পরে তত্ত্ব। সে কথা ইতিহাসের সত্য মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের বিচার, তার ফলশ্রুতি অর্থাৎ ভাবনার ওপর প্রতিফলিত হয়। নাটক ভাবসমারোহে—তত্ত্বের ভাবনায় তাকে যাচাই করাই বিধেয়। নিছক তত্ত্বশিষ্যে বিচারকে অসার্থকতাই করে গৌরবান্বিত করে না। প্রেমিকের উদ্বেলতা বিচারকের সাজে না।

আজ পর্যন্ত বাঙলা নাটক-বিচারের ধারা লক্ষ্য করলে সাহিত্যগত ক্ষেত্রে দেখা যায় এতদূরেকই বিচিত্র সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। এমন দাবী কখনোই করা যায় না, যে, সিদ্ধান্তগুচ্ছ অবিচিত্র হবে। কিন্তু বহু বিচিত্রতার মধ্যে একটি স্থানে অন্ততঃ তাদের ঐক্যকামনা অন্বেষ্য হবে না। সে হল নাটকের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের ধারাতে ঐক্যবোধ। একই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে বিচিত্র বিচার হোক আর সেইটাই স্বাভাবিক—নাহলে সমালোচকের বিচার-বিশেষত্ব থাকে না। আর এটুকু না থাকলে সমালোচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিস্প্রয়োজন। কিন্তু বাঙলা নাটক-বিচারের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে এমন কি আজও ঘটে চলেছে, তা হ'ল ব্যক্তিবিশেষের নিছক ঐক্য—অবন্ধনা মানসিকতার ওপর নির্ভরশীল বহু বিচিত্র মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা প্রচণ্ড রকম পরস্পরবিরোধী। ফলে যে নাট্যকার কোনো সমালোচকের কাছে সাদর বন্দিত—অনুজনের কাছে অতিনিন্দিত।

বলা বাহুল্য যথোচিত কারণ নির্দেশিত না হয়েই। ফলে বাঙলা নাটক ও নাটক-বিচারের গ্রন্থসংখ্যার অঙ্ক স্থূল হচ্ছে কালের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মূল্যায়ন বলতে যা বোঝায় তা হ'চ্ছে না।

হু'একজন ধ্রুবপথের পথিক-সমালোচক যে একেবারেই নেই এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। তাঁরাই বর্তমানে কিছুটা আশাভরসার স্থল।

সাহিত্যগত বিচারের কথা আপাততঃ স্থগিত থাক। প্রয়োগগত বিচারই বা এখন কোন স্তরে? বলা বাহুল্য সে ক্ষেত্রে জন্ম নিতান্ত অল্প বা অবহেলা করার মত নয়। যেহেতু আজকের দর্শক নাটক দেখে সেই হেতু সমালোচকরা হু'কলম নাট্য-সমালোচনা লিখতে কার্পণ্য করেন না। এই বাহ! ধাঁরা নাটকের প্রযোজনায় সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁরা জানেন ওই সমালোচনার আত্মিক মূল্য কতটুকু। বিক্রীত সমালোচকের কাছ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সমালোচনা ক্রয় করা হয় বাহ্যিকমূল্য ফাঁপিয়ে তোলার জন্তে। শিল্পী, প্রযোজক, কলাকুশলী, সমালোচকদের সঙ্গে দর্শকসমাজের এক অংশের কাছে এ হল উন্মোচিত গোপনীয় তথ্য। আর সব থেকে বড় লজ্জার কথা, তাতে কোনো সংকোচ নেই কোনো পক্ষের। অদ্ভুত এই যে, সেই সমালোচনায় দর্শকসমাজের সচেতন অংশও প্রায় সবক্ষেত্রে প্রভাবিত। এই সম্মোহন বাঙলা নাটকের একালীন অভিশাপ!

প্রয়োগশিল্পের সমালোচনায়, ব্যক্তিমানুষই বড়। ব্যষ্টির প্রবণতার ওপর মূল্যায়ন হয় নাট্যাভিনয়ের। অমুক অভিনেতা বা অমুক অভিনেত্রীকে ভালো লাগে, অতএব তার সম্বন্ধে দুচার কথা বেশি থাকবেই। ধাঁকে ভালো লাগে না, স্বাভাবিক পরিণতিতে তিনি বহুদূরে সরে যান—এক কোণে সংকুচিত হয়ে পড়েন। আর ধাঁরা অপরিচিত তাঁরা বেমালুম হারিয়ে যেতে বাধ্য। তাঁরা হারিয়ে না যাবার উপায় একটি—গডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো। নিজের জন্তে ব্যবস্থা তাঁকে করতেই হবে। নচেৎ যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

কলাকুশলীদের কপালেও এই একই ফলযোগ। খ্যাতনাম মানুষ অসাধারণ কিছু না করলেও খ্যাতি আরও বাড়ে—মান অলুযায়ী কাজ না করলেও অখ্যাতি হয় না। তাঁদের সমধর্মী মানুষরা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পরিচিত অতএব তাঁদের পথ যথাযথভাবে রুদ্ধ করার জন্তে আয়োজনের অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রে সমালোচনার দ্বারস্থ না হয়ে উপায় কি? হু'একটি ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই আছে—বরাবর থাকে। তবু বলা চলে ব্যবসাগত কলঙ্ক স্পর্শ করে আজকের

দিনের নাট্যাভিনয়-সমালোচনা নিকৃষ্টতার চূড়ান্ত নিদর্শন। বাঙালীর রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে পূর্ণাঙ্গ করে সেদিন এই পর্ব তাকে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই আর সেই অকল্যাণী মুহূর্তে এই জাতীয় সমালোচনা যে কালিমা লেপন করবে তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যগত সমালোচনায় সমালোচক-গোষ্ঠী আত্মনিষ্ঠ। এটি তাঁদের দুর্বলতা, কিন্তু প্রয়োগশিল্পের সমালোচক (ব্যতিক্রমদের বাদ দিয়ে) চরিত্রহীন, সমালোচকের চরিত্রের যে বলিষ্ঠ নিরপেক্ষতা, সর্বোপরি আপন ভালো-লাগা-না-লাগার ওপর নির্ভর করে ভালো কি ভালো নয় বিচারের জন্তে তত্ত্ব শরণ করার মত যে উদারতা—তা তাঁদের বিন্দুমাত্র নেই।

দর্শক নাটক-বিচার করে, না, নাটক দেখে। যারা বিচার করে তারা সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা দর্শক হিসেবে সচেতন—সেই হিসেবে অসাধারণও বটে। নাটক-বিচার করতে গিয়ে তাঁরা কল্পনা ও শাস্ত্রের আশ্রয় নেন স্বার্থ সমালোচকের মত। দর্শক শাস্ত্র পড়ে নাটক দেখতে আসবে, এসব আশা করা অত্যাশ—কিন্তু সমালোচক দর্শক হয়ে নাটক দেখতে আসবেন—এ ধৃষ্টতা কি কারণে ক্ষমা করতে হবে।

নাটক দেখতে হলে উন্মুক্ত চিত্তপট নিয়ে আসতে হবে। নাটকের দর্শক সেই মন নিয়ে আসেন—নাট্যকারের কবিকল্পনাকে আপনার চিত্তপটে প্রতিফলিত করে খুশী হতে পারেন। কিন্তু সমালোচক—দর্শক নন। শুধু প্রতিফলন নয় নাট্যকারের কবিকল্পনাকে বিচার করে গ্রহণ করার দায়িত্ব তাঁর। চিত্তপটের পাশে থাকে একটি কষ্টিপাথর। মুগ্ধমনের পাশেই তীক্ষ্ণ সচেতনতার সহাবস্থান। শিল্পী ও শাস্ত্রীর সমন্বয়ে সমালোচকের জন্ম।

কি সাহিত্য কি প্রয়োগ—নাটকের সমালোচনা করতে গেলে নাট্যশাস্ত্রে জ্ঞান রাখাটাই বড় কথা নয়—তার আশ্রয়ই আসল বিষয়। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নাট্যকারের স্রষ্টিকে স্পর্শ করা শুধু নয় তার শিল্পগুণের বিচার করা সহজ। বিচার করতে গিয়ে মুগ্ধচেতনার কোনো প্রশ্রয় নেই। সেখানে প্রয়োজনের মুখ চেয়ে খণ্ডবিখণ্ড করে দেখতে হবে, চিনতে হবে, চেনাতে হবে। নাটকের চরিত্রস্বরূপ দেখতে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো সামনে থাকা দরকার তা হল নাটকের প্রতিপাত্ত বিষয় কি? চরিত্রায়ণ বৃত্তের অনুরোধ রক্ষা করেছে কিনা? বৃত্তের গঠনে সন্ধি বিভাগ, প্রারম্ভ, অতীত, অতীতবৃত্ত অগ্রগতি ঘটনানির্বাচনে কুশলতা, সমস্ত দৃশ্যই অপরিহার্য কিনা, নাট্যকৌতুহল কি যথাযথভাবে রক্ষিত, নাটকটির আবেগধর্মিতার স্বরূপ কি, সংলাপ কেমন,

ক্লাইম্যাক্স কোথায় ও তা যথার্থ কিনা—সর্বোপরি রসনিবিড়তা বা রসনিষ্পত্তিগত প্রশ্ন খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার করা উচিত। বৃত্তবিচার নিছক জীবনের মানদণ্ডে বিচার করা হবে না। সেখানে প্রতিপাত্তবিষয়ের পটভূমিতে বিচার বাঞ্ছনীয়।

সমালোচক এক হিসেবে নাট্যকারের থেকে অনেক বড়—সে গুরুদায়িত্ব-পালনে। সমালোচক একাধারে নাট্যকার, দর্শক, আর তা-ও নিরপেক্ষ। একদিকে নাট্যকারের ধ্যানকে, কল্পনাকে অনুভব করতে হয় আবার দর্শক হিসেবে তাকে আশ্বাদ করতে হয়। আর এরই মাঝে বিচারকের মহিমায় নাটকের বিচার করতে হয়। নিঃসন্দেহে এ অতি-কষ্টিন কাজ। একই সঙ্গে স্পৃহ ও নিস্পৃহ হয়ে নাটকের অতলগহনে ডুব দিতে হয়।

প্রয়োগশিল্পের সমালোচকের দায়িত্ব আরও বেশি। তাঁকে হ'তে হয় অভিনেতা, কোনো একটি বিশেষ চরিত্রের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করলে চলে না। উপস্থাসের পাঠক-পাঠিকারা সাধারণতঃ নায়ক বা নায়িকার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও নাট্যসমালোচককে প্রতিটি চরিত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে চিনতে হয়, আশ্বাদান করতে হয়। শুধু তাই নয় নাট্যক্ষেত্রের বহু আঙ্গিক বিষয়ে তাঁর সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। আঙ্গিকের প্রয়োগ, তা সে যত আকস্মিক বা অপ্রযুক্ত হ'ক না কেন বিলম্ব বা অভিভূত হয়ে পড়লে চলে না—প্রতি ক্ষেত্রে প্রার্থিত প্রতিক্রিয়া (effect) কে সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হয়। সমান্তরালভাবে সহৃদয়তা নিয়ে—সমবেদনাবদ্ধ' নিয়ে শিল্পের সঙ্গে একাত্ম আবার বুদ্ধির দীপ্তি নিয়ে শিল্পবিচারক। রূপ-রসের ভ্রম্যতা আর শিল্পোৎকর্ষ বিচারে তুলাদণ্ডের সচেতনতা নিয়ে নাট্য-সমালোচকের চরিত্র। শুধু নাট্যতত্ত্ব নয়—শুধু রসলিপ্সা নয়, দুয়ের মিলনে সার্থক বিচারকের জন্মসম্ভব।

এখানে এবার যদি প্রশ্ন জাগে আজকের নাট্যবিচারকদের চরিত্র কি এই গুণে বিভূষিত? সচেতন দর্শক ও পাঠকের প্রার্থনা, বাঙলার সমালোচকরা চরিত্রবান হয়ে উঠুন। তাঁরা নাটকে ভালোবাসবার স্বযোগ এনে দিন। যেদিন বাঙালী নাটকে আজকের থেকে অনেক বেশি ভালোবাসবে—সত্যিকার ভালোবাসবে সেদিন 'আন্দোলন'-নিরপেক্ষ হয়েও বাঙালী নাটকের গৌরবময় জয়যাত্রা ছুঁনিরীক্ষ্য হবে না। বাঙালী নাটকের সেই স্বর্ণপ্রত্যয় এনে দেবে অব্যবহিত মধ্যাহ্নের দীপ্তি। সমালোচক সেদিন বরণীয় হবেন—ধন্য হবেন সৃষ্টিধর হয়ে।

অবিলম্বে ঘোষিত হোক—সে শুভদিন সমাগতদ্বার।

নাট্যসমালোচকের দায়িত্ব

মাধব রায়

অনেকের অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায় নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সর্বশেষ সাহিত্যিক—যিনি বাংলা নাটককে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের এ দীনতা কেন? রবীন্দ্রোত্তর যুগের নাট্যকারদের অনেকে সেদিনের নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় রূপে মঞ্চসরবরাহ, প্রকাশক, পত্র-পত্রিকার অসহযোগ মনোভাব, সাধারণের নাটক পাঠে অনীহা বা অগ্রপ্রকারে নাট্যপ্রিয় করে তুলতে পারেনি বলে কঠিন কঠে সমালোচনা করেছেন।

যদি একথাকেও গুরুত্ব না দিই তবু একটা কথা জানতে আপত্তি কি! পশ্চিমের শিক্ষায় শিক্ষিত জনসাধারণ সেক্সপিয়রের পর বানার্ড শ'য়ের নাম তখন শুনেছে। বানার্ড শ' উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ পর্যন্ত সমস্ত নাট্যসাহিত্যের প্রতিভা বিচ্ছুরিত করে গেছেন। বলতে আপত্তি নেই এদেশের কলেজী শিক্ষায় যখন নাটক পড়াশোনা হয় তখনই মাত্র কলেজের ছাত্ররা নাটকের খোঁজ করে থাকেন। অন্ত্যায় নাটকের উপর তাদের প্রবণতা স্বভাবই কম। পরীক্ষা-সমুদ্র পার হতে কোর্সের অন্তর্ভুক্ত নাট্যকারের অগ্রান্ত নাটক বা নাট্যসাহিত্যের যে “রেফারেন্স” সংগ্রহ করতে হয় তাতে কিছু নাটক ও নাট্যকারের পরিচয় সেই ছাত্রের আয়ত্তে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইংরেজী ভাষায় লিখিত নাটকের খোঁজ-খবর প্রায় একপ্রকার দায়ে পড়ে জানতে হয়।* এ বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের যে উদাসিন্য আছে উত্তরকালে দায়ে-পড়া নাট্য-প্রীতিসম্পন্ন ছাত্রমণ্ডলী তার উপর নির্ভর করে বাংলা নাটক আলোচনায় রত হন। বাংলা নাটক পশ্চিমী নাটকের মানদণ্ডে যদি সমকক্ষ না হয় অপাণ্ডিত্যের কুৎসা তেঁকান তবে বড় শক্ত। পশ্চিমের সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ভাবধারায় বাংলা নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ এবং এদেশীয় নাট্যকারদের দেশজ ভাবধারায় উদ্ধৃক হয়ে নাটক-রচনার ফলে “বাংলায় নাটক নাই” এই অমথা অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। নাট্যকার ও নাট্য-সমালোচকের এই যে দুইভাবের

শিবিরে অবস্থান তার পরিণামে একটি স্বদীর্ঘ কলপ্রশ্ন সাহিত্য-শিল্পের উৎস-মুখটি স্বতঃ-উৎসারিত হতে পারছে না। যে কোন দেশের পরিচয় সে দেশের পারিপার্শ্বিক; ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ভাবধারায় সীমিত। ফলে, নাট্যকার—শুধু নাট্যকারই বা কেন, প্রত্যেক শিল্প-সাহিত্য সেই ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁরা যে সকল শিল্পের সৃষ্টি করে থাকেন তার আলোচনাও সেই পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া উচিত। নচেৎ সাহিত্যিকের শিল্পসৃষ্টির মূল স্রুটিই অজানা থেকে যাবে। লেখক ও সমালোচক—পরস্পরে বক্তব্যের ধারাটি অহুসরণ করে গেলে তবে আমরা শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলার স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে বানার্ড শ'য়ের জোয়ান-অব-আর্কের স্বদেশ-প্রেমের পার্থক্য বুঝতে পারবো। কিন্তু সমালোচনায় এর ব্যতিক্রম ও অভাবই নাট্যকারদের ভাবনাচিন্তাকে ব্যাহত করে ও বিঘ্ন ঘটায়।

দেশকালপাত্র ছাড়াও সমালোচকদের ব্যক্তিগত প্রবণতাও বিচার্য। এই প্রবণতা প্রতিটি লেখক ও সমালোচকের অল্পবিস্তর থাকবে। তাই নিরপেক্ষ সমালোচক পাওয়া যেমন শক্ত, তেমনি অভাব প্রকৃত দরদী নাট্য-সাহিত্যের পাঠক। সাহিত্য-সমালোচক সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা। তার চোখ দিয়ে এক শ্রেণীর বিদগ্ধজন ও নাট্যছুরাগী রসিকগণ নাটক দেখেন। তার বিশ্লেষণে সাহিত্যপাঠের যে স্পৃহা জন্মে তা কোনো কম বড় পুরস্কার নয়। তাই নাট্য-সাহিত্যের সমালোচক বাংলা নাট্য-সাহিত্যে আজ যথার্থই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নাট্য-সাহিত্যের তেমন সমালোচনা ও আলোচনার ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যে নাটক-অভিনয় হয় তারই শুধু আলোচনা-সমালোচনা হয়। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের সব খবরাখবর হয় না—এটা আশ্চর্যের! আজও পর্যন্ত নাটকের আলোচনায় সাধারণত যে সমালোচনা হয় তাতে প্রধানত মঞ্চস্থ নাটকের আঙ্গিক, ব্যবস্থাপনা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়, কাহ্ন-কথা, আলোকসম্পাত প্রভৃতি খুঁটিনাটি বক্তব্যে সমালোচক মুখর হয়ে উঠেন। নাটক যৌথশিল্প; অতএব নাটকের একক সত্তাকে অস্বীকার করাটা একটা অতিদুষ্ট যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ যে নাটক এই সমস্তের কেন্দ্রবিন্দু তার আত্মপরিচয় সমালোচকের দৃষ্টি থেকে দূরেই থাকে। অবশ্য যখন সমালোচকের সমালোচনায় রত হয়েছি তখন সমালোচক হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন : এ যেন প্রাবন্ধিকের অনেকটা সোনার “পাথরবাটি” ধরণের আলোচনা। তবু নাটক প্রয়োজনা ছাড়া নাটকের যে এক

সাহিত্যমূল্য থাকতে পারে, নাটক শুধুমাত্র সংলাপের মাধ্যমে গড়ে উঠে, যে সাহিত্যমূল্য বিদেশে একটা সাহিত্য-স্বীকৃতিও অর্জন করেছে, তার উপর কেন সমালোচকগণ পরিপূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করেন না? এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর নাট্যসাহিত্যের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃত হয়। সাধারণ ভাবে দেখি, নাটকের বইয়ের সমালোচনা যথেষ্ট ও অপ্রাসঙ্গিক। দরদী সমালোচক ও বোদ্ধা-বিচারকের সংখ্যা এখানে কম। সাধারণত কথা-সাহিত্যের সমালোচনা যারা করে থাকেন তাঁদের উপর এর দায় ছেড়ে দেওয়া হয়। উপযুক্ত অভিজ্ঞতা, স্বচ্ছ ধ্যানধারণার অভাবে ব্যক্তিগত প্রবণতা ও অভিরুচিতে লিপ্ত হওয়া সমালোচকের পক্ষে কিছু আশ্চর্য নয়। তাছাড়া অন্য এক প্রশ্নও মনে আসছে। অভিনয়ে নাটকের বহু অংশ অভিনেতাবর্গের নামে এবং আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জায় ঢাকা পড়তে পারে, কিন্তু সাহিত্যবিচারে সে নাটকের মূল্য প্রযোজকদের চাহিদা মিটিয়েও শূন্য ফলশ্রুতি বহন করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমন ক্ষেত্রে নাটকের পাঠক গড়ে উঠছে না তবু মঞ্চপ্রেমিকদের সহযোগিতায় নাটক পার পেয়ে গেল। এখানে আগের কথায় ফিরে এসে তাই বলতে হয়, রবীন্দ্রোক্ত যুগে নাট্যকারদের মঞ্চসরবরাহের স্বযোগ নাট্যসাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করেনি, বরং রবীন্দ্রনাথের কালের বহু নাটক শুধুমাত্র সাহিত্যমূল্য পেয়ে ধ্বংস হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নাটকের আলোচনায় মঞ্চস্থ নাটক ও নাট্য-সাহিত্য—দুই বিভিন্ন খাতে নাটকের গুণাগুণ বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। বাংলা সাহিত্যের দরবারে নাটকের বর্তমান রুদ্ধদ্বার অভ্যর্থনা লক্ষ্য করে কি স্বীকার করতে হবে সাহিত্যের হাটে নাটক আসেনি; না, এসেছে, শুধু সত্যিকারের নিরপেক্ষ সমালোচক আসেননি—কোনটা সত্য?

ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা প্রিয়জনকে উপহারে

‘বেঙ্গল’এর বই-ই সবসেবা

নাটকে কল্পনার স্থান

ফণিভূষণ বিশ্বাস

নাটকে কল্পনার স্থান কতটুকু, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, নাটক হচ্ছে অভিজ্ঞতার ছকে ঢালাই-করা কল্পনার মূর্তি। আবার কেউ বলেছেন যে, কল্পনা-বাস্তবে গড়া অভিজ্ঞতার সজীব চরিত্র-চিত্রণই হ'লো নাটক। শ'কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,—কি থেকে নাটক সৃষ্টি হয়? কল্পনা থেকে,—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। নাটকে যে কল্পনার স্থান আছে, একথা মানতেই হবে। তা যদি না থাকতো, তবে কোন নাট্যকারই তাঁর মানস-পুত্র-কন্যাদের মনের মত করে গড়েপিটে নিতে পারতেন না। শেকস্পিয়ার কোন এক ইটালীয়ান গল্পকারের কাহিনী নিয়ে আর যাই করুন না কেন, ওথেলোর জন্ম দিতে পারতেন না। ইটালীয়ান কাহিনীর আঁতুড়ঘরে ওথেলো জন্মার নি, ওথেলো ভূমিষ্ট হয়েছে শেকস্পিয়ারের কল্পনার স্রুতিকাগৃহে।

এই ভাবে যে কোন কাহিনীরই পুনর্জন্ম ঘটেছে নাট্যকারের হাতে। এক কথায় পর্যবেক্ষণ দিয়েছে তাদের চোখ; আর লেখকের হৃদয়ের উত্তাপে যে স্পন্দন উঠেছে, কল্পনা তাদের মাহুষ করেছে। এই কল্পনাই সব কাহিনীর মা। সেই মা যখন কাহিনীগুলোকে ঘটনার দোলনায় শুইয়ে দেয়, তখন ভাবনার শিশুগুলো হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণভরে খেলা করে। কখনও তারা মুখভঙ্গী করে হাসে কাঁদে, আন্দার করে, চোখ রাঙায়, ভয়ে কাঁপে, কথা বলে,—তখনই আমরা তাদের চিনতে পারি। আর তখনই সেই চেনা-চেনা মাহুষগুলো দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রোতারা তখন আপন ভাবনার আলোয় তাদের দেখে অভিভূত হয়। চমকে উঠে হাততালি দিয়ে বলে : বাহবা! তখনই বুঝতে হবে যে, নাটকের ঘুমন্ত মাহুষগুলো প্রাণ পেয়ে নড়েচড়ে উঠেছে; অভিনেতাদের আন্তরিকতায়, হৃদয়ের নিবিড় উত্তাপে, তাদের ভাবনায় কল্লিত চরিত্রগুলো জেগে উঠেছে। পাদ-প্রদীপের আলোয় বোবা সৃষ্টি সবাক হয়ে সকলকে অবাक করে দিয়েছে। আর তখনই নাট্যকারের কল্পনা অভিনেতাদের ভাবনায় দ্বিজ্জ্বলাভ করেছে। এখানেই কল্পনার পুনর্জন্ম।

তা' হলে নাট্য-কল্পনার ব্যবহারিক দিক দু'টি। প্রথমতঃ সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি হওয়া। সৃষ্টি করার প্রথম কারবার নাট্যকারের। আর সৃষ্টি-চরিত্রের কল্পিত রূপে সৃষ্টি হওয়াই অভিনেতাদের কাজ। এ কাজ সংঘটিত হ'বে অনেকটা বিজলীবাতি জ্বালার মত আশ্চর্য উপায়ে। নাটকের চরিত্র-পর্যবেক্ষণ চেতনার সুইচ টিপে দেবে, আর বাকীটুকু সমাধা করবে কল্পনা। কল্পনাই অভিনেতাদের চেতনায় এক চৈতন্যময় প্রাণসম্ভাবনার আলো জেলে দেবে। একজন পাশ্চাত্য নাট্য-সমালোচকও তাই বলেছেন : "observation will press the button and imagination will do the rest." অর্থাৎ বর্ণিত চরিত্রের কল্পনায় শিল্পধরা নিজেই সৃষ্টি হ'ন। তাঁরা একটি শিল্প-সৃষ্টিকে মগজে করে বয়ে নিয়ে যান মঞ্চে, আবার পাদ-প্রদীপের আলোয় নিজেরা আর একবার সৃষ্টি হ'ন। এই দিক থেকে অভিনেতারা একাধারে এক চরিত্র-স্বত্বের মূর্ত প্রতীক এবং পরিণামে প্রাণবন্ত সৃষ্টি।

এই কল্পনার আলোয় শিল্পীতে শিল্পীতে পার্থক্য ঘটে। জাত অভিনেতা যখন একটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কোন একটা চরিত্রকে স্থূল পশুত্বের পর্যায় থেকে মানবতায় উন্নীত করেন,—তিনি যখন একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্যনিকির জগৎ অন্বেষণে, আবিষ্কারে ব্যস্ত,—তখন অপেক্ষাকৃত হীন-প্রতিভার শিল্পীরা কেবল আবিষ্কারের জগৎ আবিষ্কার করেন, তাঁদের অন্বেষণ নিছক জল্পনাসরণেই পর্যবসিত হয়। প্রসিদ্ধ নাট্য-সমালোচক লেসিংও এই কথা'র প্রতিধ্বনি করে বলেছেন : "To act with a purpose is what raises man above the brutes, to invent with a purpose, to imitate with a purpose, is that which distinguishes genius from the pretty artists who only invent to invent, imitate to imitate."

তা' হলে উচুদরের শিল্পী নাটককে নিশ্চয় উপভোগ করেন? যে কল্পনার ভোজে প্রস্তুত তাঁকে আহ্বান করেন, যে আনন্দের জগৎ প্রতিটি দর্শক উদ্ভ্রষ্ট হয়ে আছে,—মহৎ শিল্পীর সেই উচ্ছিন্ন উপভোগ্যের প্রসাদকে দর্শকরা পায় অমৃত রূপে। তিনি তখন শুধু শ্রুণী করার চেষ্টা করেন না, তিনি তখন প্রোতাদের মন কেড়ে নেন। সেখানে আমরা নাট্যকারের ভাবনাকে পাই অভিনেতাদের জাগ্রত ভাবে, কর্তৃত্বের, ব্যক্তিত্বের, বিচিত্র ভঙ্গিমার অভিব্যক্তিতে। আর সেখানেই নির্জীব কল্পনার সজীব উদ্ভাবন।

তা' হলে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চ-মুখী কল্পনাপ্রকাশের অবকাশ আছে নাটকে। নাটক লেখা থেকে মঞ্চস্থ হওয়া পর্যন্ত—কল্পনারই একটানা কাজ।

এই আরম্ভ থেকে শেষ অবধি আছে বিচিত্র কল্পনার আবেশ। সেগুলি যথাক্রমে হচ্ছে কল্পনার রূপায়ণ, কল্পনার অল্পসরণ, কল্পনার অল্পভাবন, কল্পনার উপস্থাপন এবং কল্পনার সংকেত।

প্রথমতঃ নাট্যকার তাঁর কাহিনী-কল্পনার ভাবনাকে রূপায়িত করেন। তখন অবশ্য কল্পনা স্থানু, চরিত্র-ভাবনা নির্জীব থাকে। কিন্তু প্রস্তুতির সময় অভিনেতার যখন মহলা দেয়, তখন সে কল্পিত মডেলকে মনেপ্রাণে অল্পসরণ করে; এই ভাবে দীর্ঘদিনের অল্পধাবনের ফলে অভিনেতাদের মনে যে চরিত্র-ভাবনা জন্মায়, সেটাই হ'লো কল্পনার অল্পভাবন। সেই অল্পভাবনকে অভিনেতার যখন মধ্যে এসে বিচিত্র ভাব-ভঙ্গীমায়-কথনে প্রকাশ করে, সেটা তখন কল্পনার উপস্থাপন। আর শেষ পর্যায়ে আসে কল্পনার সংকেত। এর মধ্যে থাকে আসন্ন বিপর্যয়ের ভাবী ইঙ্গিত। ভাষা দেখানে মূক, অভিব্যক্তি সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাল। কাজেই একান্ত নিঃশব্দে সেই সংকেতের স্মৃতীকৃত ফলা দর্শকদের চেতনায় গিয়ে বিদ্ধ হয়। দর্শকদের বুকের ভিতরটা তখন দুর্ক দুর্ক করে উঠে। ভয়াবহ আসন্ন পরিণামের কথা চিন্তা করে তারা হঠাৎ বে-সামাল হয়ে পড়ে। এহেন সাংকেতিক ভাষা কিছু না বলেও এত কথা বলে, এত গোপন নিগূঢ় ইঙ্গিত দেয়,—যা এক নিমেষে সমগ্র নাটকের আবহাওয়াও পাল্টে দিতে পারে।

এই কারণে কল্পনা-সংকেতকে বলে নাটকের তোরণদ্বার। এহেন সংকেতের এক-একটা দরজা নাটক আমাদের বৃহত্তর সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যায়। যে নাটক যত এই সংকেতের ভাবনায় গম্বুজগত, সেই নাটক শ্বাস-রুদ্ধ-উৎকর্ষায় তত জম-জমাট।

তার একাধিক কারণও আছে। প্রথমতঃ নাটকের পট-পরিবর্তন ঘটে সংঘাতে, কর্ণে, প্রবৃত্তির ছুঁসহ তাগিদে। কোন নীতির নির্দেশে নাটকের চেহারা তেমন বদলায় না। দ্বিতীয়তঃ নাটকীয় অভিব্যক্তিগুলো যতই অব্যক্ত থাকবে, ততই তার ভাবগুলো সাংকেতিক কল্পনায় শ্রোতাদের কৌতুহলকে টেনে নিয়ে যাবে নূতন সম্ভাবনার দিগন্তে। ততই রূপ রূপান্তরে দর্শকদের নির্বাক দৃষ্টি অভিভূত, মুগ্ধ হবে। আর দৃশ্যান্তরে চরিত্রের এই উদ্ঘাটনই হ'লো জাত-নাটকের প্রাণধর্ম। মর্মকথা। এইজন্তু পাশ্চাত্য নাট্য-সমালোচকরা বলেছেন যে, যতই চূড়ান্ত কল্পনায় নাটকের দেহ-কাঠামোটি নিখুঁত হোক না কেন,—নাট্যকার যে মুহূর্তে সেই দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, সেই মুহূর্তে নাটক সমবেত দর্শকদের প্রশংসার ভোটাধিকার হারাবে। অর্থাৎ—

“A play loses its franchise over an audience, the moment it discusses the framework of the almost perfect utopia.” পক্ষান্তরে an implicit statement shows more than what it tells.” এই-
থানেই সাংকেতিক ভাবনার প্রাধান্য, সংঘাত-রুদ্ধ-ভাবী কল্পনার জয়-জয়কার।

এবার নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণে কল্পনা কতখানি সক্রিয়, তা দেখা যাক। অবশ্য চরিত্রচিত্রণের সময় নাট্যকারের ভাবনার সামনে একটা না একটা মডেল থাকে। সেটা কাঠামো মাত্র। পরিকল্পনার ভাবনা দিয়ে তাকে গড়েপিটে নিতে হয়। এখানেই কল্পনার কারু-কার্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আছে। চরিত্র কাহিনীর বশীভূত হ’বে না, চরিত্রই সৃষ্টি করে নেবে কাহিনীকে। অর্থাৎ কাহিনী হ’বে চরিত্রের মুখাপেক্ষী। চরিত্র কেবল ঘটনাকে তৈরী করে নেবে না, তাকে নিয়ন্ত্রণও করবে। চরিত্র যদি দাঁড়ায়, তবেই তো কাহিনী দানা বেঁধে উঠবে। চরিত্রের সঙ্গে ঘটনাসম্বলিত কাহিনী সংযোজনার দায়িত্ব যে কি নিগূঢ়, নাট্যকারের কর্তব্য যে কি কঠোর, সে সম্পর্কে গলস্‌ওয়ার্ডির মন্তব্য প্রশিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে-নাট্যকার চরিত্রের হাতে কাহিনীকে সঁপে না দিয়ে কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রগুলোকে জুড়ে দেন, তিনি মহা অপরাধে অপরাধী। অর্থাৎ—“The dramatist who hangs his characters to his plot instead of handing his plot to his characters is guilty of cardinal sin.”

এইখানেই প্রাধান্যের প্রশ্ন উঠে, জিজ্ঞাসাবাদটা অবশ্য নাটকীয় বিচার সম্পর্কে। অর্থাৎ নাট্য-দেহ-নির্মাণে কার পর কোনটা আসবে? এর উত্তরে একদল বলেছেন যে, চরিত্র যখন নাট্য-প্রাসাদের স্তম্ভ, তখন তার উপরেই কাহিনীর ছাদ ঢালাই হ’বে। আর এই চরিত্রের ভিত কাটা না হ’লে, কেমন করে কাহিনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হ’বে? বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্য এর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, চরিত্রের নির্দিষ্ট ছকটা খুঁজে না পেলে কি নাট্যকার কাহিনী-রচনায় আত্ম-নিয়োগ করবেন না? বরং তার উটো। কাহিনী আর সংঘাতের ভিড় ঠেলে চরিত্রগুলো এক একটা বৈশিষ্ট্যের বিজয়-মঞ্চে এসে দাঁড়াবে। ব্যক্তিত্বের তলোয়ার ঘুরিয়ে যে চরিত্র নির্ভীক সৈনিকের মত সমস্ত পরিস্থিতিকে জয় করে গলায় বিজয়মালা পরতে পারবে, সেই চরিত্রই হ’বে নাটকের প্রধান নায়ক। তাকে অর্জুনের মত লক্ষ্যভেদ করেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করতে হ’বে। তবেই কালের দরবারে তার জয়ধ্বনি উঠবে। তার জগৎ আর কোন পরিকল্পনার স্বয়ম্বর-সভা ডাকতে হবে না।

এহেন অভিমতকেও আর-ক্লেয়ার্স্ নস্তাৎ করে দিয়েছেন। ওর কোনটাকেই তিনি পুরোপুরি সত্য বলে জানতে চান নি। বলেছেন যে, অমনতর একতরফা আভা কথার কোন মূল্য নেই। নাটক-রচনার একটা যে নির্দিষ্ট ছক আছে, সেই ছাঁচেই পরিকল্পনা, চরিত্র এবং কাহিনীকে এমন ভাবে দাঁড় করাতে হ'বে, যাতে কেউ কোন দিক থেকে এতটুকু ভাবসাম্য না হারায়। তবেই সেই সামগ্রিক সামঞ্জস্যের স্বদৃঢ় বন্ধনে নাটক সৃষ্টি হ'বে। এই নাটক-রচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রেই আসবে একটা ভাবনাপুষ্টি পরিকল্পনা, তারপর আসবে চরিত্রগুলি, এবং তাদেরই চারপাশে এসে দাঁড়াবে কাহিনী। তবেই কল্পনায়, সংলাপে, চরিত্র-ঘটনায় নাটক হ'বে বলিষ্ঠভাবে বজ্রমুষ্টি। তাঁর এই উদ্ধৃতি থেকেই মতবাদটি আরও স্পষ্ট হ'বে—"the idea comes first, the character second and the story last of all."

আর নাট্য-চরিত্রের বাধ্যবাধকতাও অনেক। তার একদিকে জীবন-তথ্য, অণুদিকে মনস্তত্ত্বের ভিড়। তা' ছাড়া সময়সীমা এবং ঘটনার পটভূমিকায় নাটকীয় চরিত্রের গতিবিধিও সীমিতভাবেই স্থনির্দিষ্ট। এইজন্ত নাট্যকারকে হতে হয় জীবন-শিল্পী। এই কারণে মানব-চরিত্র সম্পর্কে যার সম্যক ধারণা নেই, জীবন্ত-সত্য-প্রাণের মডেলকে যিনি দেখেননি, তিনি কিন্তু প্রকৃত নাট্য-শিল্পী হ'তে পারবেন না। আদত কথা সত্যিকার নাট্য-কর্ম কেবল চরিত্রায়ণ নয়, সেটা স্বভাবতঃ-ই জীবন-শিল্প। কেননা কেবল পাত্র-পাত্রীর মুখে কতকগুলো ছেঁদো নাটুকে কথা বসিয়ে দিলেই চরিত্র সৃষ্টি হয় না, তাদের ভাবনায়, তাদের আচরণে প্রাণের উষ্ণ-শ্রোত বইয়ে দিতে হয়। যে চরিত্রের হৃদয়ে বাসনা-কামনার ক্ষুধা নেই, যে মনে হাসি-কান্নার দোলা নেই, সেগুলি প্রাণবন্ত মাহুয নয়। তা জড়মূর্তি। পাথরে খোদাই-করা নির্জীব মডেল মাত্র।

এই পাত্র-পাত্রীদের চলা-ফেরাও কেমন হ'বে, মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় তার স্থনির্দিষ্ট নির্দেশনামা আছে। মঞ্চে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের সহজ স্বাভাবিক গতিবিধির উপরই নাট্য-চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। এক একজন অভিনেতার চলা-ফেরা এমন স্বাভাবিক স্বস্থ মাহুযের মত যে, তাদের দেখলেই মনে হয় না যে, তাঁরা অভিনয় করতে মঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আবার এমনও দেখা গেছে যে, কোন একজন অভিনেতা মঞ্চে পদার্পণ করেই সমবেত দর্শকদের হাততালি পেয়েছেন। যিনি প্রথম দর্শন দিয়েই অভিনন্দিত হ'লেন, তিনি যে ভাষণে, অভিনয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করবেন, সে

বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার কোন কোন অভিনেতার নিষ্ক্রমণের এমন একটা নাটকীয় ভঙ্গী দেখা গেছে যে, তাঁর পদাঙ্ক অহুসরণ করে দর্শকদের দৃষ্টি এবং কৌতুহলোদ্দীপ্ত কল্পনাও ছুটেছে নেপথ্যের দিকে। যে অভিনেতার নিষ্ক্রমণের পদধ্বনি দর্শকদের কানে বাজতে থাকে, দর্শকরা রুদ্ধনিশ্বাসে তাঁর পুনরাগমনের পথ চেয়ে থাকেন অধীর আগ্রহে। সেই অভিনেতাদের ভাগ্যে প্রশংসার হাততালি বাধা। এই কারণে নাট্য-সমালোচকরা বলেছেন যে, যে-অভিনেতা তাঁর আগম-নিগমের দোলকে দর্শকদের মনকে কাল্পনিক উৎকণ্ঠায় ছুলিয়ে দিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

এবার ‘প্লট’ বা কাহিনী-বিশ্বাসের কথায় আসা যাক। নাট্য-কাহিনী কেমন হ’বে, সেই প্রশ্নে একজন নাট্য-সমালোচক ভারি স্বন্দর মন্তব্য করেছেন। বলেছেন যে, কাহিনী তার চরিত্র-বাহিনীকে নিয়ে অনেক ঘটনাবিক্ষুব্ধমুদ্র পেরিয়ে যে নতুন ভাবনার দ্বীপে দর্শকদের পৌঁছে দেবে, সেই অপ্ৰত্যাশিত দেশ আবিষ্কারের আনন্দে দর্শকরা অভিভূত হ’বে। সাময়িকভাবে তারা ভুলে যাবে যে, প্রেক্ষাগৃহে বসে আছে। এই হ’ল উচ্চাঙ্গের নাট্য-কাহিনীর সামগ্রিক বিচার।

এহেন সামগ্রিক দৃষ্টি কোণ থেকে নাট্যাখ্যানের বিচার না করে, তাকে গোড়া থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। প্রসিদ্ধ সমালোচক সমারসেট মমের এই হ’লো অভিমত। তিনি অত উচ্ছ্বসিত হয়ে কাহিনীর দর্শন-তত্ত্ব উদ্ঘাটনে ব্যস্ত হননি। বরং তিনি একটা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। বলেছেন : “A plot is merely the pattern on which the story is arranged.” অর্থাৎ প্লট হ’চ্ছে এমন একটা কাঠামো যার মধ্যে আখ্যান-বস্তু বিস্তৃত হ’বে। আর এই কাঠামো নির্মাণটা সহজ ব্যাপার নয়। ওটাও একটা বিশেষ শিল্পকর্ম। কাজেই ভালো প্লট তৈরী করার জন্ত বিশেষ ধরনের ভাবুকতা আর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন।

এই কারণে প্লট-সংগঠনের প্রয়োজন সর্বাগ্রেই। এই প্লট বা নাট্য-কাঠামোটি যেমন হ’বে, ঠিক তেমনিই হ’বে নাটকের ঐঙ্গিত্য চোহারা। তাই সমালোচকরা বলেছেন যে, প্লটই হ’চ্ছে নাটকের ‘লট’ বা ভাগ্যালিপি। এই কাঠামোর প্রথম পর্যায়ে থাকবে বিষয়বস্তু বা ‘থিম’; দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে একটা ঘটনার সূত্র, যে সূত্র ধরে (issue) কাহিনী হ’বে তৃতীয় স্তরে সংঘাতমুখী; আর সেটাই হবে নাটকীয় উত্তোঙ্গের কর্ম-পর্ব।

এবং বিধ প্লটবিশ্বাসের ব্যাপারটা কিন্তু সহজ নয়। এর পিছনে

অনেকখানি সক্রিয় সজাগ ভাবনা না থাকলে, আঙ্গিকের দিক থেকে কোন প্লটই নিখুঁত হতে পারে না। তা হ'লে প্লট না হ'লেও কি তার উপর বলিষ্ঠ নাটক গড়ে তোলা যাবে? না। এই কারণে আলাংকারিকতা বলেছেন যে, নাটকের দেহগঠনের মেরুদণ্ড হলো প্লট। সেই প্লটবিজ্ঞাসকে আলাংকারিক সাতটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা (১) ভূমিকা বা প্রস্তুতিপর্ব, (২-ক) সংঘাতমূহ্র আবিষ্কার, (২-খ) আক্রমণাত্মক ধারা, (৩) কর্মোত্তেজনার সৃষ্টিকরণ (raising action), (৪) মূল বিপর্যয় অতিক্রমণের ঘূর্ণিমুখ ঠিক করা (main crisis turning point), (৫) কাহিনীর চূড় (climax), (৬) কর্মভাঁটার মুখ এবং (৭) পরিণতির ফলশ্রুতি (outcome of conclusion)।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, প্লট-বিজ্ঞাসের এতগুলো ধাপ পার হয়ে কাহিনী পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায়। কাহিনীর চূড় থেকে নাটককে সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার জগুই চরম হুঁসিয়ায়ীর দরকার। একজন নাট্য-সমালোচক তাই বলেছেন, প্লটবিজ্ঞাসের এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে যিনি তাঁর সৃষ্ট নাটকীয় কুশীলবদের হাতে চরম মুহূর্তেরগুলিভরা চূড়ান্ত পরিণামের বন্দুক তুলে দিতে পারেন, তাঁর নাটক নিঃসন্দেহে টারগেট হিট করবেই। অবশ্য তার জগু পূর্বাপর সেই চুলপাঁকানো অভিজ্ঞতার মোক্ষম ভাবনা থাকা দরকার।

পরিশেষে নাটকীয় সংলাপের কথা তুলি। প্রথম কথা সংলাপ না হ'লে, সবাক নাটক হয় না। সংলাপই নাটকের প্রাণ। কেননা ঘটনা-সংশ্লিষ্ট নায়ক-নায়িকাদের পারস্পরিক আলাপে-সংলাপে নাটক সংঘাতের সম্মুখীন হয়, পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। এই কারণে শ্রোতাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হচ্ছে রঙ্গালয়ের দৃশ্যাবলী নয়, অভিনেতাদের সংলাপ। তাই গলস্‌ওয়ার্দি বলেছেন যে, শুরু থেকে সারা পর্যন্ত থাকবে সংলাপের একটা হাতে-বোনা লেস। একটার পর একটা মজবুত কথার হুশ্রুজ্বলিত বুনন, যার দ্বারা সমস্ত ঘটনা বাঁধা পড়বে এক সূত্রে এবং সমস্ত পরিস্থিতি তার কাছে হ'বে নতজাহা। তা' হ'লে চরিত্র এবং সংঘাতকে এক সূত্রে বিধৃত করাই সংলাপের অগ্ন্যতম প্রধান কাজ। • সংলাপের মাধ্যমেই ঘটনার উদ্ঘাটন, ভাব-আবেগের সম্প্রসারণ এবং সংকোচন ঘটে। এক কথায় সংলাপের হাতে যে সংহতির বন্না থাকে, তার দ্বারাই ঘটনার গতি-সংহতি এবং প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত হয়।

এবার সংলাপের শ্রেণীবিজ্ঞাস সম্পর্কে আলোচনা করি। কোন নাটকে কি ধরনের সংলাপ থাকবে, আলাংকারিকতা তারও নির্দেশ দিয়েছেন। সংলাপের

ধরণ নির্ভর করবে নাটকের গড়নের উপর। চলতি কথায় যাকে বলে, যেমন বিয়ে, তার তেমনি মন্ত্র। যেমনি নাটক, তেমনি হ'বে তার সংলাপের ভাষা। যে নাটক হৃদয়-গলা-বেদনায় সিক্ত, তার সংলাপের ভাষাও পর্দায় পর্দায় করুণ রস নিঙড়ে ঢেলে দেবে। আবার যে নাটক হাস্যরসে চটুল, তার সংলাপে থাকবে হাসির উৎস। যেখান থেকে মাঝে মাঝে নিঃসৃত হ'বে হাস্যরসের ফোয়ারা। অথবা যে নাটক মিলন-রসে টইটধুর, তার সংলাপের ভাষা আনন্দ-কৌতুকের আতরে ভুবুভূর করবে। কিংবা যে নাটক আসবে সংস্কারের পরোয়ানা নিয়ে, তার ভাষায় থাকবে নিষ্ঠুর পিয়াদার চাবুক।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে নাটকের স্বরূপের ব্যাখ্যাতা হ'বে তার সংলাপ। সাধারণতঃ আট ধরনের নাটকীয় সংলাপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে নাটকে। যথা (১) ব্যাখ্যাকারী বা উদ্ঘাটনীয় সংলাপ (expository dialogue), (২) বাস্তবধর্মী অকৃত্রিম সংলাপ (realistic dialogue), (৩) কাব্যিক সংলাপ (poetic dialogue), (৪) আবেগময় বা বক্তৃত্যধর্মী সংলাপ (auditory dialogue), (৫) সমিল কাব্যিক সংলাপ, (৬) ক্ষেত্র বিশেষে স্বগতোক্তি (monologue), (৭) ব্যঙ্গনাময় বক্তোক্তি। এর আবার দুটি ভাগ যথা—কটাক্ষ, শ্লেষোক্তি; কখনও বা হাস্যোদ্দীপক ক্ষুদ্র কবিতার লেজুড় থাকে নাটকীয় সংলাপে। (৮) হাস্যোদ্দীপক পরিহাসের ভাষা (comic language)।

এহেন বিচিত্র সংলাপ কেমন ভাবে কোন নাটকে বসালে কার মুখে লাগসই হ'বে সেটাও বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। তা নিয়েও অনেক সমস্তার উদ্ভব হয়েছে। সংলাপ-রচনার সময় সে কথা বার বার ভেবে নিতে হ'বে। দরকার হ'লে নাট্যকারকে মনে মনে সেই কথাগুলো কেবলি আবৃত্তি করতে হবে। এ অভিমত একজন বিখ্যাত নাট্য-সমালোচকের। তিনি বলেছেন যে, তাঁর দ্বারাই উচ্চাঙ্গের সংলাপ রচনা করা সম্ভব, যিনি সংলাপ সৃষ্টি করার সময় কাল্পনিক নায়ক-নায়িকা হয়ে বার বার উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলো আবৃত্তি করে স্বকর্ণে শ্রবণ করেন। অথবা যিনি নাটকীয় ভাষণ রচনার সময় কাল্পনিক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সেগুলি আবৃত্তি করার পর, তা' নিজ নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মুখে লাগসই ভাবে বসিয়ে দেন। কথাগুলি আবৃত্তি করার পর যেটি কানে অশোভন ঠেকবে, যে কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হ'বে, যে কথায় বক্তব্য সঠিক পরিষ্কৃত হবে না, যে কথা পরবর্তী ভাবনাকে আটকে দেবে, যে কথায় নাটকীয় গতি জ্বল হ'বে, যে কথা কৃত্রিম অবাস্তব বলে মনে হ'বে; যা অভি-কথন দোষে ছুঁই হ'বে, নাট্যকার সেগুলি নির্মমভাবে ছেঁটে

বাদ দেবেন। অথবা প্রয়োজনমত তাকে ঘসা-মাজা করে পরিবেশন-যোগ্য করে তুলবেন। এক কথায় যে কথার প্রতিধ্বনি কানকে পীড়া দেবে না, উচ্চারিত যে শব্দ ভাবনাকে বিদ্রূপ করবে না, তাকেই নাট্যকার জাত-সংলাপ বলে ধরে নেবেন। অথবা যে কথার পুনরাবৃত্তি শুনে নাট্যকার আনন্দে চমকে উঠবেন, যে কথা বার বার আবৃত্তি করেও পুরানো হবে না, সেই কথাই যে অদ্বিতীয় সংলাপ হ'বে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এমনও শোনা গেছে যে, কোন একজন বিখ্যাত নাট্যকার তাঁর অননুক্রমণীয় আশ্চর্য সাবলীল সংলাপ-রচনার সময় স্বপ্নে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অনর্গল যে কথা বলেছিলেন, তাঁর পাত্র-পাত্রীদের মুখে সেই কথা শুনে প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত শ্রোতারা আনন্দে ভয়ে সংশয়ে মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিল। এমনতর সংলাপ সৃষ্টি করা মুখের কথা নয়; এ ধরনের সংলাপ চিরকালের কথা, চূড়ান্ত সাধনার ফলশ্রুতি।

শেষ কথা এই যে, নাটকের যবনিকা-পতনের পরও দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করার কথা অনেকক্ষণ ভুলে থাকে; নাটক শেষ হওয়ার পরেও যে নাটকের সব শেষটা শ্রোতাদের ভেবে নিতে হয়, আর যে নাটকের ভাবনা নিয়ে দর্শকদের ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে যেতে হয়, যার ঘটনা-সংঘাতের স্মৃতি অনেকক্ষণ শ্রোতাদের মনে তোলপাড় করে, নিঃসন্দেহে সেই নাটকই উচ্চাঙ্গের শিল্প-কর্ম। নাট্যকারের প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি।

ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

উদবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য	৮'০০
রবীন্দ্র-সমীক্ষা	৩'০০
রবীন্দ্র-বিতান	৫'০০
রবীন্দ্র-অমীষা	৫'০০
বীরবল ও বাংলা সাহিত্য	৪'০০
রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ	৬'০০
বাংলা গদ্যের শিল্পসমাজ	৩'২৫

কাব্যনাট্য ও মালিনী

রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ

কাব্যনাট্য এমন একটি শিল্পকর্ম, যা কবিতা এবং নাটকের স্বভাবধর্ম আত্মসাৎ করে স্বকীয় মহিমা অর্জন করে। বস্তুনিষ্ঠ শিল্প হিসাবে নাটকের বৈশেষিক লক্ষণকে বলা যায় তন্ময়তা; কিন্তু কবির মন্ময়-স্বভাব কবিতাকে করে তোলে রসগ্রাহ্য। এই তন্ময়তা এবং মন্ময়তার হরগৌরী মিলনেই কাব্যনাট্যের শৈল্পিক সার্থকতা। অর্থাৎ subjectivity (Kant-এর ভাষায় Aesthetic quality) এবং objectivity (Keats-এর ভাষায় Negative capability): এই দু'য়ের অপূর্ণগুণত্বনিবর্তের উজ্জ্বল স্তম্ভর শিল্পরূপ হল কাব্যনাট্য। এই মানদণ্ডেই গ্রীক-নাট্যসাহিত্য কাব্যনাট্যের আদর্শ দৃষ্টান্তের মর্যাদা পেয়ে আসছে। স্রষ্টা ছিলেন যেন একই-দেহে কবি এবং নাট্যকার যুগপৎ। আত্মনির্লিপ্ত নাট্যকার তাঁর বহিদৃষ্টিতে দেখেছেন মানুষের সচল সজীব মূর্তি; মন্ময়ী কবি তাঁর অন্তদৃষ্টিতে দেখেছেন মানুষের একান্ত গোপন অন্তরঙ্গ সত্তাকে। এই যুগ্মদৃষ্টির অর্ধেতের ফলেই গ্রীক-নাট্যসাহিত্য মানুষের চিরন্তন জীবনমূল্যবোধ অনুসৃত হয়ে আছে।

নাটকে এই জীবনমূল্যবোধ বা মানুষের এই অন্তর-সত্তার রূপায়ণের ক্ষেত্রে কবিতা নাটককে নাটকীয় করে তুলতে গল্প অপেক্ষা অধিকতর শক্তি রাখে। ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে মর্যাদাসঞ্চারী গভীরতায় চরিত্রের প্রয়োগ যে অনুভূতির অনিবার্য ফলশ্রুতি, তার স্বাভাবিক প্রকাশ কবিতাতেই বিশ্বাসযোগ্যভাবে সম্ভব। গল্পে লিখিত নাটকে চরিত্রে বা গল্পে কথা বলে, কাব্যনাট্যে বলে কবিতায়—এক গভীরতর স্বরূপগত বৈষম্যের এ হল নিতান্তই এক বাহ্যিক প্রভেদ। কাব্যনাট্য এমন শিল্পকর্ম নয়, যা গল্পে লিখিত হতে পারত; কিন্তু হয়েছে কাব্যে। কাব্যনাট্যের সমগ্র পরিমণ্ডলটিই হবে নাটকীয়ভাবে কাব্যময়; কিন্তু সম্ভাব্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে নয়, এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবেই, আর অনিবার্যতাকে স্বীকার করেই। গল্পনাটক এবং কাব্যনাট্যের মধ্যে মৌলি প্রভেদ হল এই যে, প্রথমটিতে থাকে বাস্তবসত্যের উপস্থাপনা, আর দ্বিতীয়টিতে আন্তরসত্যের উদ্ঘাটন। The first concentrates its imitation on the outermost reality, the

second on the innermost.^১ ফলত, গল্পনাটকে নাট্যকায় বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটায় বহুবিচিত্র জীবনের গ্রন্থিসকল উন্মোচিত করেন এবং সেই উন্মোচনের মধ্য দিয়ে জগৎ-সংসারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটিও নির্ণীত করেন। কিন্তু কাব্যনাট্যে মানুষ সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব শক্তিকেই জীবনের পটভূমিকায় দণ্ডায়মান। প্রতিবেশ আর তাকে পরিচালিত করে না; আন্তরসত্যই তাকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে যায়।

এই আন্তরসত্যকে শিল্পিত করতে গেলে শুধুমাত্র পুরাণ, ইতিহাস বা রূপকথা কিংবা কোন কিয়দন্তী অথবা অতিপ্রাকৃত বিষয় অবলম্বন করলেই— যা সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে—তা কাব্যনাট্যোপযোগী হবে না। চরিত্র এবং ঘটনার অন্তোন্ত-নির্ভর পারস্পর্য এবং অন্তর্গত সংগতিক অক্ষুন্ন রেখে বিষয়বস্তুকে এমনভাবে বিবৃত করতে হবে যাতে স্বেচ্ছায় সামাজিকের মনে রস-কৌতুহল সদাজাগ্রত থাকে। সর্বোপরি, অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞার আলোকসম্পাতে অবলম্বিত বিষয়বস্তু নবতন ব্যঙ্গনায় হবে সমৃদ্ধ। A plot is poetic when behind the concentration of facts which the artist has brought together there lies the intimation of something which transcends the subjectmatter and from which the subjectmatter receives its full significance, though not its factual coherence.^২ অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তুতে বহুখাণ্ডিত বৈচিত্র্য বা ঘটনাবাহুল্যের পরিবর্তে বস্তুসীমাতিক্রমী অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই অভিপ্রেত।

এই তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়বস্তুকে রূপায়িত করবে সেই সব চরিত্র, স্বভাবতই যাদের কাব্যসম্পদের উপার্জন আছে। সাধারণত দেখা যায় যে, কাল্পনিক উপকথাভিত্তিক বা পৌরাণিক চরিত্রগুলি আপনা-আপনি কাব্যিক। যেমন দেবচরিত্রগুলি। তেমনি আধুনিক বা প্রাচীন রূপকথাগুলিতে ভালমন্দ, ত্রায়-অতায়, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি বৈপরীত্যগুলিকেও কাব্যিক চরিত্র লাভ করতে দেখা গেছে। সার্থক ট্রাজিক চরিত্রগুলির ভাব-ভাবনা, কল্পনা-মনীষা, উপলব্ধি-প্রজ্ঞা, প্রত্যয়-প্রবৃত্তি সে কাব্যনাট্যের উপাদান হয়েই আছে। আবার শুধুমাত্র ব্যক্তিকে প্রাতিষ্মিকতার জগত্বে, নাটকীয় চরিত্রের প্রচলিত প্রথাকে অতিক্রম করে চরিত্র কাব্যিক হয়ে উঠতে পারে। আবার জীবনে

১। L. Abererombie : Functions of Poetry In Drama.

২। H. Fluchere : The Function of Poetry In Drama.

এমন অনেক লগ্ন আসে, যখন মানুষ এমন অনেক কথা বলে বা কাজ করে, যা নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়। এই ব্যক্তিসীমাতিক্রমী অন্তর্ভূতির যে তীব্রতা গভীরতা, ব্যাপ্তি, তাই তখন তাকে আকস্মিক এক কাব্যিক চরিত্রে পরিণত করে। মনে হয়, এই চরিত্রগুলি সংসারের আর দশজন মানুষের মতো নয়। কোন-না-কোন একদিক থেকে চরিত্রে অতিরিক্ত নিহিত থাকায়, এদের মুখের ভাষাও হয়ে ওঠে দৈনন্দিন কার্যে ব্যবহৃত ভাষা থেকে পৃথক এবং অতিরিক্ত কিছু আর। অন্তর্গূঢ় প্ররোচনার স্বভাবতই যা কাব্যধর্মী। চারিত্র্য এবং কবিতার মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকে না যেন আর, তারা একাত্ম হয়ে যায়।

তাই, কেবলমাত্র অলংকরণ-সৌকর্য বা শ্রুতিমাধুর্যের জন্তই কাব্যনাট্যে কবিতা-প্রয়োগ অচুচিত। It must justify itself dramatiacally and not merely be fine poetry shaped into a dramatic form.^৩ নাটকের সামগ্রিক আবেদনশষ্টিতে কবিতার সক্রিয় অবদান থাকা চাই। নাটকীয় জীবনের যে বিশেষ মুহূর্তে চরিত্র কবিতায় আত্মপ্রকাশ করছে, সেই মুহূর্ত থেকে তাকে বিযুক্ত করা যাবে না আর। মনে হওয়া চাই, সেই অবস্থায় কবিতাই ছিল স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, অনিবার্য। আবার কবিতার ভেতরে এমন কোন উপাদান থাকবে না, যা নাটকীয় ঘটনার গতিকে ব্যাহত করতে পারে। চরিত্র এবং ঘটনার সঙ্গে পরস্পর ও সংগতি রক্ষা করে কবিতা যেমন চরিত্রকে অভিব্যক্তিপ্রবণ করে তুলবে, তেমনি ঘটনার গতিবেগকে পরিণামের দিকে প্রবাহমান রাখবে।

অতএব, কাব্যনাট্য এমন একটি শিল্পকর্ম, যা কবিতা এবং নাটক যুগপৎ। মানবজীবনের মূল্যবোধ বা মানুষের অন্তরসত্যকে উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে, বা অবলম্বিত বিষয়বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই তাৎপর্যকে রূপদান করে সেই সব চরিত্র, কবিতা যাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। এবং নাটকীয় গতিকে যে কবিতা অব্যাহতভাবে পরিণতির দিকে সঞ্চালিত করে। সহৃদয়ের মনে কৌতূহলকে জাগ্রত রেখে, সম্ভাব্য উপায়ে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে, অনিবার্যতাকে স্বীকার করে।

আলোচ্য কাব্যনাট্যে যে জীবনমূল্যবোধ অভিব্যক্ত, তা ধর্মের আদর্শ সম্পর্কে বিচার-বিতর্ককে আশ্রয় করেই। কিন্তু এই ধর্ম নির্বিকার কোন তত্ত্ব নয়, জীবনবিবিক্ত কোন সত্য এর স্বভাবে নেই। এই ধর্ম স্বরূপে

৩। T. S. Eliot : Poetry And Drama.

মানব-জীবনাশ্রয়ী, এবং যাবতীয় আত্মস্থানিক জটিলতা থেকে মুক্ত। এদিক থেকেই ‘মালিনীর’ সঙ্গে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধের’ বক্তব্যগত সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করে মহত্তর জীবন রচনা যে অসম্ভব—এই সত্যই উভয় নাটকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধের’ সন্ন্যাসীর মানবচিত্ত বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত ছিল বলেই সে শাস্তি পেলো না ; শেষত কোন এক মানবকন্ঠার স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাকে সংসারকে স্বীকার করতে হয়েছিল। প্রথম অংশে মালিনীও স্বধর্মের দ্বারা উদ্বোধিত-চিত্ত দেবী ; কিন্তু শেষাংশে সে মানবধর্মের নিকট আত্মসমর্পিতা কুমারীকন্ঠা। প্রথমে যে ছিল ‘ধর্মরাগোজ্জ্বল দেবী’, শেষে সে-ই হোল ‘পূর্বরাগোজ্জ্বল প্রণয়িনী’। মালিনীর এই আশ্চর্য রূপান্তর এই কথাই প্রমাণ করে যে, ধর্ম জীবনকে অস্বীকার করে নয়, প্রেমকে পরিহার করে নয়। বা হওয়া চাই জীবনসম্পর্কিত প্রেমাত্মক জড়িত। এই সত্যটিই ‘মালিনীর’ বিষয়বস্তুকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে বলে তা হয়েছে কাব্যনাট্যোপযোগী। এবং তাই ফলত, বিষয় তার সীমাকেও অতিক্রম করেছে। বিষয়াতিশয়ী ব্যঙ্গনাই তো সাহিত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করে।

রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থের ‘মহাবস্তুবাদান’ উপাখ্যানটিকেই যথাযথভাবে এই কাব্য মধ্যে উপস্থাপিত করেন নি। তা যদি করতেন, কবিনাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে বলা যেত ঐতিহ্য-অনুসারী। কেননা, বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, প্রতি ক্ষেত্রেই বিষয় আহৃত হয়েছে ইতিহাস, পুরাণ বা রূপকথা থেকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ঐতিহ্যকে একেবারে অস্বীকারও করেন নি। কেননা, ‘মালিনীর’ কাহিনী অংশতঃ পূর্বোক্ত উপাখ্যানাশ্রয়ী ; যদিও একান্তই ঐ উপাখ্যান-নির্ভর নয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যতিক্রমী প্রতিভাশক্তি। তাঁর এই অনন্ততা স্বকীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বিষয়বস্তুর নবতম ভাষ্যে।

মূল কাহিনীর সঙ্গে নাট্যকাহিনীর যে আংশিক সংযোগটুকু লক্ষ্য করা গেছে, তা হল এই : কাশীরাজের কন্যা মালিনী নবধর্ম গ্রহণ করায় আচারনিষ্ঠ সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণেরা তার নির্বাসনদণ্ডদেশ প্রার্থনা করলে, রাজা তাদের সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ; কিন্তু রাজ্যের কিছু লোক রাজকুমারীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। নাটকের অন্তিম দৃশ্যটি যে স্বপ্নদর্শনের ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছেন। আর সৃচনা থেকে পরিণামের অন্তর্বর্তী প্রসার তো স্রষ্টার ভাবসংবেদনে ঐক্যপ্রাপ্ত। এই ভাবসংবেদনের

সাহায্যেই তিনি বিষয় বস্তুর এক নতুন ভাষা রচনা করেছেন, জীবনের মানবিক অস্তিত্বই সেখানে প্রধান।

প্রথম থেকে তৃতীয় দৃশ্য পর্যন্ত মালিনীর যে রূপ, তা নবধর্মের আকস্মিক এবং বিস্ময়কর আবির্ভাবে আত্মবিস্মৃতির। অনভিজ্ঞাতপূর্ব এই রহস্যময় অলুভূতির তীব্রতা তার চরিত্রে এমন এক অতিরেক নিয়ে আসে যে, কালিদাসের একটি উপমার গীতিকাব্যিক অনুবাদে মালিনী বলেছে :

ভগবন, রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে,
সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী—স্বর্ণরেণুরাশিমাঝে
মৃত জড়প্রায়।

আবির্ভূত ধর্মবোধ তাকে এমনই অভিভূত করেছে যে, আত্মাভিব্যক্তির জগৎ সে আশ্রয় গ্রহণ করেছে কবিতার; যে কবিতা ঐ বিশেষ অলুভূতি-গীড়িত মালিনীচিন্তকে প্রকাশের একমাত্র স্বাভাবিক বাহন।

মহাক্ষণ আসিয়াছে! অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিन्दুসম করে টলমল
পদ্মদলে।

প্রথমে মালিনীর মনে হয়েছিল সে মুদ্রিতদলপদ্মে আবদ্ধ ভ্রমরী। অর্থাৎ সে তখন আকস্মিক আবির্ভূত ধর্মবোধের বিস্ময়কর প্রভাবে একবারেই আত্মবিস্মৃতা। সে মৃত জড়প্রায়; কেননা, তখন তার ব্যক্তিক রমণীসত্তার অবলুপ্তি। কিন্তু তারপর সে তার চঞ্চল অন্তরকে মনে করেছে পদ্মদলে টলমল শিশিরবিन्दুর মত। এই রূপকল্পে যে আশ্রয়চ্যুতির ইঙ্গিত আছে, তা নাটকীয়ভাবেই সার্থক হয়েছে। কেননা মালিনী স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্র প্রজাবৃন্দের আকাজক্ষিত নির্বাসন বরণ করেছে। এই রূপকল্পটির সঙ্গে নাটকীয় গতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলেই একে বলা যায় functional এবং সেকারণেই নাটকীয় সংহতিও এখানে দৃঢ়বদ্ধ। যেহেতু All imagery that has a functional relation with a play increases dramatic concentration.^৪

মালিনী যে নির্বাসন বরণ করল, তার কারণ এই যে, নবধর্মোপলব্ধি তাকে এমন এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের অধিকারিণী করেছে যে, তার মনে হয়েছে : গৃহহীন নিরাশ্রয় সংসারবাসীদের সে অন্ধকার রাত্রির উত্তাল জীবননদী পারাপার

৪। U. E. Fermor : Imagery In Drama.

করে দিতে পারবে। সেই বহুলপ্রচলিত জীবননদীর রূপকল্পটি স্বতঃস্ফূর্ত-
প্রয়োগে এক নতুন ব্যঙ্গনায় মালিনীর মৌহর্তিক চারিত্র্যকে প্রকাশ করেছে।

আমি স্বপ্ন দেখি জেগে,
শুনি নিজাঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে
নদীতে উঠিছে ঢেউ, রাত্রি অন্ধকার
নৌকাখানি তীরে বাঁধা—কে করিবে পার,
কর্ণধার নাই—গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস—মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান—মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ, যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে।

Aeschylus, Shakespeare, Synge প্রভৃতির মনেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাট্যে
এই সব রূপকল্প প্রয়োগ করে নাটকীয় সংহতি এবং ঘনবদ্ধতাকে সৃষ্টি
করেছেন। এই রূপকল্প আবার যে কবিতাকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়েছে,
তা Shelley-র ভাষায়, যথার্থই দৈবীপ্রতিভার তাৎক্ষণিক অল্পভব।

আর, মালিনীর হৃদয়ে ধর্মবোধের যে চেতনা, তাতো স্বরূপে এই
দৈবীঅল্পভবই। এই অল্পভূতির প্রবল পরাক্রমেই সে দুর্নিবার আবেগে সশরীরে
উপস্থিত হয়েছে তারই নির্বাসনকামী ব্রাহ্মণ-সমাজের সম্মুখে। মালিনীর
এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণেরা তার কাছে নতিস্বীকার
করেছে; একমাত্র ‘পিতৃধর্ম, প্রাণপ্রিয়-প্রথা, চির-আচরিতকর্ম, চির-পরিচিত
নীতি’-রক্ষার্থী সনাতনপন্থী আচারনিষ্ঠ দৃঢ়তা ক্ষেপকর ব্যতীত।

কিন্তু হৃদয়প্রধান, অল্পভূতিপ্রবণ, কোমলচিত্ত স্প্রিয়ের মনে হয়েছে—

মিথ্যা তব স্বর্গধাম
মিথ্যা দেবদেবী, ক্ষেপকর। ভ্রমিলাম
বৃথা এ সংসারে এতকাল। পাই নাই
কোন তৃপ্তি, কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়।

অভিজ্ঞতার এবং প্রবণতার প্রবল-গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বই যদি কবিতার জন্ম হয়,
তবে স্প্রিয়ের এই অকপট স্বীকারোক্তি কবিতা নিঃসন্দেহে এবং তা চরিত্র-
প্রকাশকও বটে। ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও, স্প্রিয় স্বভাবে তাদের

একজন ছায়ামাত্র নয়, শাস্ত্রজ্ঞ হলেও, শাস্ত্রবচনের প্রতিধ্বনি নয় ; ধর্মনিষ্ঠ হলেও, যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাসকেই ধর্ম বলে বিশ্বাস করে না নিঃসংশয়ে । তাই মালিনীকে দেখে তার চিন্তে জেগেছে সংশয়, লেগেছে দোলা । এই সংশয় আচারসর্বস্ব ধর্মের সত্যতার প্রতি ; এই দোলা প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ থেকে জাগ্রত । মালিনীর ভেতরেই সে তার ধর্মকে দেখতে পেলো এবং আকস্মিক । এবং এই ধর্ম তার প্রবণতাহুমারী, কেননা, তা হৃদয়ের বড় কাছাকাছি । এই গভীর আন্তরিক উপলব্ধিই তাকে কবি করেছে । স্বভাবতই সে কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে, যে কবিতা তার চরিত্রকেও প্রকাশ করেছে এবং নাটকীয় প্রতিক্রিয়া প্রতিকলিত করেছে বলেই যা আত্যন্তরীণ সংযোগে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে অধিত । সুপ্রিয় বলেছে—

আজি তুমি কে আমার
জীবনতরঙ্গী পরে রাখিলে চরণ—
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ—
একি গতি দিলে তারে । এতদিন পরে
এ মর্ত্য ধরণী মাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর ।

নিরাশ্বাস সংসারবাসীদের জীবননদী পার করে দেওয়ার জগ্রে মালিনী যে তরঙ্গীর কথা বলেছিল, তা ছিল ধর্মের । কিন্তু মহাকালের নদী অতিক্রম করার জগ্রে সুপ্রিয়ের যে তরঙ্গী, তা জীবনের । এখানেই এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অমূর্ত ধর্মতত্ত্ব দিয়ে কোন শাস্ত্রত মত প্রতিষ্ঠা করা যায় না ; তা হওয়া চাই জীবন-সম্পর্কিত । মালিনীর ধর্মের এক দৈবী উপলব্ধিই ছিল, যা তার মানসলোকে সাময়িক প্রভাব বিস্তার করেছিল । মালিনীর ছিল না জীবনবোধ, অবশ্য যা ধীরে ধীরে তার অন্তরে জাগ্রত হওয়ার অল্পকূল অবসর পেলো, ক্ষেপকর যখন মালিনীকে দমন করার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে সৈন্য-সংগ্রহ করতে গেল, আর সুপ্রিয় এলো মালিনীর খুব কাছাকাছি ।

মালিনীকে এখন আর দেবী বলে মনে হয় না ; সে যে মানবী একজন এবং তারও যে একটি প্রেমার্থী হৃদয় আছে—সে কথাই বড় হয়ে উঠেছে । দরিত্রের মতো সে সুপ্রিয়কে নিজের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে—

তুমি মোর বন্ধু হবে ? মন্ত্রণুক হয়ে
দেবে প্রাণ ?

সুপ্রিয়ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হল মালিনীর কাছে—

প্রস্তুত রাখিব নিত্য

এ ক্ষুদ্র জীবন। আমার সকল চিত্ত

সবল নির্ঘল করি ; বুদ্ধি করি শাস্ত

সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত

তব কাজে।

যার কাছে সুপ্রিয় আত্মসমর্পণ করল, তারই বিনাশের অন্তত বার্তা বহন করে পত্র এলো ক্ষেপংকরের। এই সংবাদ সুপ্রিয় রাজাকে দিলে, ষথাসময়ে ক্ষেপংকর বন্দী হল। উপহারস্বরূপ রাজা মালিনীকে সুপ্রিয়ের হাতে দান করার ইঙ্গিত করলেও, তীর মর্মদাহে সুপ্রিয় তা প্রত্যাখান করল। সুপ্রিয়ের এই প্রত্যাখানে মালিনীর আশাভঙ্গজনিত দীর্ঘশ্বাস, প্রেমার্থী হৃদয়ের শূন্যতা-বোধ, তার রমণীসত্তার একাকীত্ব করুণ-মধুর অভিব্যক্তি পেয়েছে এই আশ্চর্য রূপকল্পে—

ওরে রমণীর মন.

কোথা বক্ষোমারো বসে করিস ক্রন্দন

মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা

কপোতীর প্রায়।

এই কবিতা মালিনীর চরিত্রগত রূপান্তরের নাটকীয় অভিব্যক্তি। ভাবতে ভালো লাগে যে এই মালিনী ‘দেবী নারে, দয়া নারে, ঘরের সে মেয়ে’।

আর এই মেয়েই যে সুপ্রিয়ের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ, এই কথা জানতে পেরে বিদ্রোহী ক্ষেপংকর তার হৃদয়ের অন্তর্গুঢ় প্ররোচনায় অব্যাবহিতভাবে বলেছে—

আমি কি দেখিনি ওরে

আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে

এসেছে অনাদিধর্ম নারীমূর্তি ধরে

কঠিন পুরুষমন কেড়ে নিয়ে যেতে

স্বর্গপানে ? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে

জন্মে নি কি প্রপ্লাবেশ ? অপূর্ব সংগীতে

বক্ষের পঙ্কর মোর লাগিল কাঁদিতে

সহস্র বংশীর মতো—সর্ব সফলতা

জীবনের যৌবনের আশা কল্ললতা

জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে

মঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে

এক নিমেষের মাঝে ।

হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে এই কবিতা ক্ষেমংকরের গোপনাবৃত আন্তরসত্যটিকে প্রকাশ করেছে। এখানেই এর নাটকীয় তাৎপর্য। চরিত্র হয়ে উঠেছে প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত। আর এই চরিত্র প্রমাণ করল যে, সবলে পরিহার করলেও আবেগাশ্রয়ী অল্পভাবাক্ত মানবধর্মকে নিমূল করা যায় না। সৌন্দর্য, প্রেম, সংগীত, স্বপ্ন—চিরকাল মানুষকে বিস্মিত, উদ্দীপ্ত, মুগ্ধ, মগ্ন করে। আর তা করেছিল বলেই তো সুপ্রিয় বিশ্বাসঘাতকতা করল; যার জন্য তাকে ক্ষমা করতে না পেরে ক্ষেমংকর হত্যা করল। কিন্তু প্রিয়ঘাতী ক্ষেমংকরকে ক্ষমার আবেদন জানানো মালিনী—‘মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে’।

ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করল যে মালিনী, সে এক প্রণয়িনী মানবী—একটামাত্র অলঙ্কারে অভিজ্ঞতার সাহায্যে জীবনের অস্তিত্বকেই বড় করে দেখতে শিখলো। যে ছিল দেবী, লোকমাতা; সুপ্রিয়ের সান্নিধ্যে সে হল মানবকুমারী এবং প্রণয়িনী। যার ছিল শুধুমাত্র এক অস্পষ্ট ধর্মবোধ, সে উপার্জন করল প্রেম, জীবনবোধ। যে ছিল প্রতীক, সে হল ব্যক্তিক। সুপ্রিয়ের প্রেমকে আশ্রয় করে জীবনকে ভালবেসে। কিন্তু মৃত্যু যে জীবনের এক অনিবার্য নির্মম সত্য, তার সঙ্গে মালিনীর পরিচয় ঘটল তারই ভালবাসার একতম প্রিয়জনের অপমৃত্যুতে। সুপ্রিয়ের মৃত্যু মালিনীর হৃদয়ে বেদনাবোধের সঞ্চার করেছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু অন্তমূলে জীবনাসক্তি থাকায় একটা উদার প্রশ্রয়ই বিকীর্ণ হল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েই তো আমরা জীবনের বিস্তীর্ণ প্রশ্রয় দেখতে পাই; জীবনকে আরও মায়াময় মনে হয়, আরও ভালবেসে ব্যগ্রবাহ প্রসারিত করি জীবনকেই আলিঙ্গন করার জন্য। প্রিয়জনের মৃত্যুতেই এই জীবনাসক্তি আরও গভীর আরও প্রোত্নরঞ্জিত হয়েছিল বলেই, মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে অহরোধ করল। জীবনকে যে ভালবাসতে শিখলো প্রিয়জনের মৃত্যুতে, সে কি আরও মৃত্যুর নিষ্ঠুর কামনা করতে পারে? তাই মালিনী ক্ষেমংকরকে বাঁচতে দেখতে চায়। এ যেন মৃত্যুর জীবনস্বীকৃতি : Coleridge-এর ভাষায় ‘a willing suspension of disbelief’।

এই জীবনমূল্যবোধকেই শিল্পিত করতে গিয়ে, এই কাব্যনাট্যের কাহিনী মূল উপাখ্যানের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কোন-না-কোন এক প্রকার অতিরেক নিহিত থাকায় [মালিনীর আকস্মিক ধর্মান্তরিত্বের তীব্রতা এবং পরিণেবে

প্রেমঘনিষ্ঠ মানবধর্মের প্রতি অকুণ্ঠ আলগত্য : 'সুপ্রিয়ের প্রবল গভীর দোলাচল হৃদয়ধর্মিতা : ক্ষেপকরের অচপল আদর্শনিষ্ঠতা] চরিত্রগুলির স্বভাব থেকে উৎসারিত হয়েছে নাটকীয় ঘটনার দ্রুতগতি এবং চমৎকারিত্ব। আর, তারা যে কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তা তাদের আন্তরসত্যকে উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে হয়েছে একেবারেই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। একদিকে লিরিকের আবেগাল্পভূতির মর্মস্পর্শী গভীরতা এবং মাদুর্ঘ্য, অপরদিকে নাটকীয় ঘটনার তীব্রগতি এবং অধিসর্পিল পরিণামমুখিতা—এই দুয়ের স্ফূর্তি সমন্বয়ে 'মালিনী' সার্থক কাব্যনাট্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

আর্থকুমার সেনের	তারাগ্রন্থ চট্টোপাধ্যায়ের
নীলাসঙ্গিনী	৪'০০ ॥ বাউ ও বিহঙ্গ ৩'৫০ ॥
শ্রীতিকণা আদিত্যের	ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
কেদারভূজ বজ্রীমারায়ণে	২'৫০ ॥ লালবাবুর লাল (২য় মুঃ) ১'২৫ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রূপ হোল অভিশাপ ২য় মুঃ ৭'০০ ॥ রূপান্তর মানস মিছিল

[হিন্দি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে] ২য় মুঃ ২'০০ ॥ (সচিত্র) ৩'০০ ॥

মন্মথনাথ রায়ের	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আত্মার দেখা ডেনমার্ক	২'০০ ॥ বিপিনের সংসার ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥
যোগেশচন্দ্র বাগলের	রূপদর্শীর
বিদ্রোহ ও বৈরিতা	২'০০ ॥ কথায় কথায় ২য় মুঃ ৩'০০ ॥
স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের	সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রদক্ষিণ ২য় মুঃ	৪'০০ ॥ রাগে আর অনুরাগে ৩'০০ ॥
শান্তিলাল রায়ের	সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আরাকান ফ্রণ্টে	২'০০ ॥ জন্মপানী বন্দীশিবিরে ২'৫০ ॥

জয়াসঙ্কর

লৌহকণাট

১ম পর্ব (১৪শ মুঃ) ৪'০০ ॥ এই পৃথিবীর মধ্যে আর এক
২য় পর্ব (১১শ মুঃ) ৩'৫০ ॥ জগতের এক আশ্চর্য মর্মসুন্দ
৩য় পর্ব (৭ম মুঃ) ৫'০০ ॥ কাহিনী। বাংলাসাহিত্যে নব-
দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন জীবন-
সন্ধানী কথাশিল্পী জয়াসঙ্কর।

বেঙ্গল পাবলিশাস' প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

নববর্ষের চিন্তা

বঙ্গাব্দ ১৩৭০ সাল এলো। এমন নববর্ষ গত দশ বছরে আসে নি। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে বহিঃশত্রুর আক্রমণ আরসমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক সংকট দিন দিন প্রবল হয়ে উঠেছে। ‘নব বৎসরে করিলাম পূণ লব স্বদেশের দীক্ষা’ : এই সংকল্প বাণী আজ উচ্চারণ করি। সেই সঙ্গেই উচ্চারণ করি জীবন-সন্তোষের উদার বাণী—

চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন ॥

সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন

নবগঠিত স্বাধীন সাহিত্যসমাজের উদ্বোধনে গত ২৮, ২৯, ৩০ মার্চ মার্কাস স্কয়ারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন-মঞ্চে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের সূচনা করেন বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি, দেশ-আনন্দ-বাজার-সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। তাঁর স্বাগত-ভাষণে ফরমায়েসি সাহিত্যরচনার বিপদের কথা উল্লিখিত হয়। তিনি বলেন, “সত্যকারের সাহিত্য স্বাধীন ও শাস্ত্রত। অতীতে ইহার স্বাধীনতা খর্ব করার অপচেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে উহা সাহিত্য হয় নাই, দেশের কল্যাণসাধনে উহা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু অতীতের বিপদ অপেক্ষা আজ বিপদ আরও বেশী। চীন আক্রমণের পটভূমিকায় এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ করিয়া সাবধান হওয়া প্রয়োজন।”

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অমৃত ও অমৃতবাজার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। তিনি বলেন, “আজ চিন্তার পবিত্র স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্তে ভারতের সাহিত্যিকদের সতর্ক ও সংযত হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিমানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সাহিত্যিকের কাছে তাঁর মনের

স্বাধীনতা অমূল্য। সেই অমূল্য স্বাধীনতা যদি একবার অপহৃত হয়, তাহলে সাহিত্যিকের মূল সত্তাই বিনষ্ট হতে বাধ্য। সেইজন্তেই সতর্কতার প্রয়োজন।”

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীতারশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বস্থতা নিবন্ধন তাঁর ভাষণ পঠিত হয়। তিনি বলেন, “আজ এক নূতন সমস্তার সন্মুখীন হয়েছি আমরা, এই মহান ভারতের শিল্পী ও সাহিত্যিকরা যাদের কাছে হাজার হাজার বছর ধরে স্ব্থের চাইতে শান্তি বড়, ভোগের চেয়ে ত্যাগ মহত্তর এবং ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন অপেক্ষা আত্মার আনন্দ মূল্যবান। স্বাধীনতার অর্থ আরণ্য পাশবিকতা নয়। স্বাধীনতা মানে সামগ্রিক মানব কল্যাণের আদর্শ মেনে চলা, ঐকিক সত্তাকে সার্বিক সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করা।……বিশ্ব-মানবসত্তার মধ্যে আমাদের মাহুত্বের মত বেঁচে থাকার মহৎ আকাঙ্ক্ষাকে বিনষ্ট করার সর্বপ্রকার বিজাতীয় অপপ্রচেষ্টাকে বাধা দিতে তাই আমরা আজ এখানে সমবেত ও কৃতসংকল্প।”

স্বাধীন সাহিত্যসমাজের পক্ষ থেকে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ সমাজের বক্তব্য নিবেদন করেন। সমাজের লক্ষ্য, আদর্শ, চিন্তার স্পষ্ট পরিচয় তাঁর ভাষণে পাওয়া গেল। এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য ও সার্থকতার কথাও তিনি বলেন। আজকের জাতীয় সংকটে সাহিত্যিকরা গা বাঁচিয়ে চলতে পারেন না, সর্বাত্মক সাম্যবাদী চিন্তা-অভিযানকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ না নিয়ে পারেন না—এই কথাই তিনি বলেন।

এর পর শুরু হয় আলোচনা-আসর। বিষয় ছিল—ভারতীয় সাহিত্য : বৈচিত্র্যের মল্লো ঐক্য। এই আলোচনায় যোশী দিয়েছিলেন শ্রীক। না স্বব্রহ্মনীয়ম্ (তামিল), ডঃ হীরালাল চোপরা (উর্দু), শ্রীপ্রমোদ মিত্র (বাংলা)। আলোচনাশেষে এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির কার্যকরী সভাপতি শ্রীস্ববোধ ঘোষ সমাপ্তিভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের সারাংশ এই—সাহিত্যের স্বাধীনতা এবং বিবিধের মধ্যে ঐক্যের ধারণা আমাদের প্রজ্ঞা ও চিন্তায় বহু পূর্বেই স্বীকৃত। বহু মध्ये এককে আবিষ্কার করার উপলব্ধি আমাদের নূতন নয়। স্বাধীন সাহিত্যসমাজ যে-কথা বলেছে তা কেবল তাদের নয়, আরও বহু লোকের, যারা পর-মতবাদের প্রতি আসক্ত নয়, সকলেরই।

দ্বিতীয় দিন আলোচনার বিষয় ছিল—চিন্তার স্বাধীনতা। শ্রীউমাশংকর যোশী (গুজরাতি), শ্রীঅ্যান দত্ত (বাংলা), শ্রীস্বনীল গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা) আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

তৃতীয় দিন আলোচনার বিষয় ছিল—সংস্কৃতির সংকট ও লেখকদের কর্তব্য। আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন—শ্রীবালকৃষ্ণ রাও (হিন্দী), শ্রীবুদ্ধদেব বসু (বাংলা), শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র (উড়িষ্যা), শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও শ্রীঅলোক সরকার (বাংলা) ॥

১৯৬৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পুরস্কার

গত কয় বছরের মতো এই বছরেও বাংলা দেশের দৈনিক-মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা-প্রদত্ত পুরস্কার-তালিকা ঘোষিত হয়েছে।

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ও ‘দেশ’-প্রদত্ত প্রফুল্লকুমার পুরস্কার ও স্বরেশচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীরমাপদ চৌধুরী ও শ্রীকালিদাস রায়।

‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ ও ‘যুগান্তর’-প্রদত্ত মতিলাল পুরস্কার ও শিশিরকুমার পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীতারশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু।

এই পুরস্কারগুলির প্রতিটির সম্মান-দক্ষিণা এক হাজার টাকা। ‘মৌচাক’-প্রদত্ত শিশুসাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ‘উন্টোরথ’-প্রদত্ত কবিতা-পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী উমা দেবী। এ ছটির সম্মান-দক্ষিণা পাঁচশ টাকা করে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যসেবীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রভারতী সমিতি-প্রদত্ত পুরস্কার

সাহিত্যের খবর-এর পাঠকদের অজানা নয় যে, রবীন্দ্রভারতী সমিতি প্রতি দু বছরে রবীন্দ্র-চর্চা ও গবেষণার জন্ত বিশেষ পুরস্কার দেন। এই পুরস্কারের সম্মান-দক্ষিণা তিন হাজার টাকা। ১৯৫৯-এ প্রথমবার পুরস্কার পান ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, ১৯৬১-তে দ্বিতীয়বার পুরস্কার পেলেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। গত ৭ এপ্রিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্বর্গতা ইন্দিরা দেবীর তরফে পুরস্কার গ্রহণ করেন তদীয় আত্মীয়া শ্রীমতী ঈশিতা ঠাকুর। শ্রীসেন সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ইন্দিরা দেবী (১৮৭৬-১৯৬০) ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্র-গবেষণায় যে নিরলস সাধনার পরিচয় দিয়েছেন, তার ফলে আমরা উপকৃত হয়েছি। ইন্দিরা দেবীর ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’, ‘রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম’ ও রবীন্দ্রগীতি নোটেশন রবীন্দ্রাভ্যুদয়গীতাবলীর পথনির্দেশক। আর রবীন্দ্র-গ্রন্থ-সম্পাদনায় পুলিনবিহারীর অতুলনীয় কৃতিত্বের ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন। এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

পঞ্চম বার্ষিক বঙ্গনাট্যসাহিত্য সম্মেলন

বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিষদের উত্তোগে ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এপ্রিল বিশ্বরূপামঞ্চ পঞ্চম বার্ষিক বঙ্গনাট্যসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের প্রথম দিন মূল সভাপতি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী একটি উপভোগ্য ভাষণ দেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ।

মূল সভাপতি অধ্যাপক বিশী বলেন, “নবনাট্য-আন্দোলনের বিপদ এই যে, রাজনীতি নাট্যধর্মকে ব্যাহত করছে। দলীয় রাজনীতির প্রচার যখন নাটকের মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন তা মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়।

“যাত্রা নষ্ট হয়েছে থিয়েটারের নকল করতে গিয়ে আর থিয়েটার নষ্ট হয়েছে সিনেমার নকল করতে গিয়ে। পাড়ায় পাড়ায় নাটক-অভিনয়েরও বিপদ আছে। এর ফলে নাটক স্থানীয় আবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ফলে বৃহৎ সমাজের স্খলিতের সামগ্রিক আবেদনের অভাব ঘটে। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে নাটক সৃষ্টি ও অভিনয়ের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করা তাই উচিত হবে না।

“নাটকসৃষ্টিতে লেখকদের আগ্রহ সঞ্চারের জন্য শ্রেষ্ঠ নাটক রচনায় পৃথক পুরস্কার দেওয়া উচিত। এবিষয়ে পরিষদ ও রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।”

শ্রীহুশীল মুখোপাধ্যায় ও অজিত ঘোষও বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাটকের বিশেষ আলোচনা আসর বসে। সভাপতি ছিলেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন দ্বিজেন্দ্র-কন্যা মায়া দেবী। দ্বিজেন্দ্রনাটক সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসানন্দকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীঅজিত ঘোষ।

হিন্দী সাক্ষাজ্যাবাদ ও সরকারী ভাষা-বিল

নববর্ষের সূচনায় ভারতীয় পার্লামেন্টের লোকসভায় নয়া সরকারী ভাষা-বিল আনা হয়েছে। এই বিলে বলা হয়েছে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারির পরে হিন্দীই হবে সরকারী ভাষা। সরকারী কাজকর্মে ইংরেজির মর্যাদা কমে যাবে। হিন্দীর সমমর্যাদাসম্পন্ন সহযোগী সরকারী ভাষারূপে নয়, প্রয়োজনমত ছুয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজির সামান্য ব্যবহার চলতে পারে (English may continue to be used in addition to Hindi) এই প্রস্তাবে অ-হিন্দীভাষী ভারতীয় মাত্রেই আশঙ্কিত হবেন। আসল কথা

ইংরেজিকে সহযোগী সরকারী ভাষার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং দশবছর বাদে তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের মতলবে পার্লামেন্টারী কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা। “আংরেজী হঠাৎ” “হিন্দীমে বোলিয়ে”-ওয়ালাদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য বজায় রেখে ভারতের ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্ত ইংরেজিকে অত্যাধিকারী সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতিদানে বিজ্ঞ পন্থা যতদিন না অল্পহত হবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী ঐক্যবোধ আসবে না। ভাষাগত লড়াই দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃখকর হবে বলে আশংকা আছে।

সরকারী কাজে বাংলার ব্যবহার

১৩৭০ বঙ্গাব্দের পচিশে বৈশাখ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সকল সরকারী কাজে বাংলাভাষা যতদূর সম্ভব ব্যবহার হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানিয়েছেন। আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দিত করি।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য-অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৬২

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য-অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল আনয়নের জন্ত অভিনন্দিত করতে পারছি না বলে আমরা দুঃখিত।

এই বিল আইনে পরিণত হলে বাংলাদেশের স্বকুমার কলাচর্চার মরণ ঘনিয়ে আসবে।

অবাঞ্ছিত আপত্তিজনক নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণের জন্ত ১৮৭৬ সালের পুরনো আইনের সংশোধনের জন্যই এই বিল আনা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত খসড়াঅুযায়ী, যতরকমের প্রমোদ-অহুঠান আছে প্রায় সবটাই ‘ড্রামা’ বলে গণ্য হবে। গীতিনাট্য, শাব্দা, কবিগান, তর্জা, কীর্তন, জলসা, হাশুকৌতুক সবই ‘ড্রামা’, কেননা সবই ‘গীতিবিষয়ক প্রমোদ’।

প্রস্তাবিত খসড়া অহুযায়ী, লাইসেন্স-ব্যতীত রাজ্যের কোথায় অহুঠান করা যাবে না। লাইসেন্সদানের কর্তা হলেন কলকাতার জন্য পুলিশ কমিশনার ও মফঃস্বলের জন্ত জেলা শালক। যে স্থানে অহুঠান হবে, সেই স্থানের মালিক বা দখলীকার ঐ লাইসেন্সের দরখাস্তের সঙ্গে দক্ষিণা (দুশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে) জমা দেবেন। লাইসেন্সদাতার বিবেচনাই এসব ক্ষেত্র চূড়ান্ত। দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলেও টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে না। ফলে

যে কোনো স্থানে যে কোনো প্রকার প্রমোদ-অহুষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

তারপর বিষয়বস্তু মঞ্জুরীর জন্য দরখাস্ত করতে হবে। এর জন্য পৃথক ক্রফিশা (যার পরিমাণ পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে) দিতে হবে। যদি কর্তৃপক্ষ বিষয়বস্তু আপত্তিজনক মনে করেন তবে মঞ্জুরী না দিতে পাবেন। লাইসেন্স ও মঞ্জুরী (স্বাক্ষর) ছাড়া অভিনয় করলে সর্বোচ্চ শাস্তি ছ মাস কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে। সর্বক্ষেত্রেই বিচার নির্ভর করবে পুলিশ কমিশনার বা জেলা শাসকের ওপর। এই বিল আইনসিদ্ধ হলে পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো স্থানে যে কোনো প্রমোদাহুষ্ঠানে প্রতিবার দুশ টাকা ও পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। স্কুল-কলেজ-ক্লাব পাবলিক স্টেজ—সর্বত্রই এই বিধি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রতিবার অভিনয়ের জগ্ন একই নাটকের জন্য প্রতিবার লাইসেন্স ও মঞ্জুরী নিতে হবে। এর ফল কী হতে পারে, তা ভেবে আমরা হতবাক হচ্ছি।

তিনটি মৃত্যু

গত ১৭ এপ্রিল ভাগলপুর 'রেল-স্টেশনে' আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রখ্যাত হিন্দী কবি ও গীতিকার গোপাল সিং 'নেপালীর' জীবনাবসন হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২।

গত ১৮ এপ্রিল কলকাতার প্রবীণ সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫।

ভারতী-গোষ্ঠীর লেখক হেমেন্দ্রকুমার সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে নাট্যাভিনয়, চিত্র ও সংগীতকলার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। বাংলাভাষায় প্রথম নৃত্যাভিনয়-সম্পর্কিত মাসিকপত্র 'নাচঘর' তিনি সম্পাদনা করেন। 'বাদের দেখেছি' ও 'বাদের দেখছি' গ্রন্থদ্বিতে হেমেন্দ্রকুমার গত অর্ধ-শতাব্দের বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করেন।

বাংলাশিশুসাহিত্যে তাঁর দান অসামান্য। অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর প্রবর্তক ও প্রধানশিল্পী হেমেন্দ্রকুমারের 'যথের ধন', 'আবার যথের ধন', 'কিং কং', 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' বহুপরিচিত কিশোরপাঠ্য উপন্যাস। 'ভগবানের চাবুক' তৈমুরলঙ-এর জীবনী অবলম্বনে রচিত কিশোরপাঠ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। হেমেন্দ্রকুমার বহু গীত রচনা করেছেন। এই মজলিশী প্রবীণ শিল্পীর মৃত্যুতে বাংলা কলাক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল।

গত ১৪ এপ্রিল দার্জিলিঙে মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন ৭০ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর শেখনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছুকাল আগে চিকিৎসার জন্ত তিনি রাশিয়ায় যান। তিন সপ্তাহ আগে তাঁকে দার্জিলিঙে নিজ বাসভবনে আনা হয়। ইডেন-হাসপাতালে তিনি মারা যান।

উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলায় পান্ধা গ্রামে ১৮৯৩ সালের ৯ এপ্রিল কেদারনাথ পাণ্ডের জন্ম হয়। তিনি ১৬ বছর বয়সে কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষার্থে যান। সারা ভারত ভ্রমণ ও শাস্ত্রচর্চায় পরবর্তী দশ বছর তিনি অতিবাহিত করেন। তারপর ১৯১৯এ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন ও কারাবরণ করেন। কারাকক্ষে বসে তিনি শাস্ত্রচর্চায় নিরত ছিলেন। ১৯২৭ সালে শিক্ষকরূপে তিনি সিংহল যান ও বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্যালংকার বিহারে ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রপাঠের ফলে তিনি বৌদ্ধ জীবনাদর্শের প্রতি অতুরন্ত হন এবং পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করে রাহুল সংকৃত্যায়ন নাম গ্রহণ করেন। এই নামেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হন।

১৯২৯ সালে তিনি প্রথমবার তিব্বত ভ্রমণে যান। সেবার মঠে বাসকালীন তিনি বৌদ্ধ গাথাকাব্য অধ্যয়ন করেন। লাসার অগ্ন্যাত্ন মঠেও তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন। এসময়ে তিনি নৈষ্ঠিকবৌদ্ধরূপে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৩৪-এ দ্বিতীয়বার ও ১৯৩৫-এ তৃতীয়বার তিনি তিব্বত ভ্রমণে যান। তিব্বত থেকে তিনি বহু দুস্ত্রাপ্য পুঁথি ভারতে নিয়ে আসেন। পাটনা যাদুঘরে সেগুলি রক্ষিত আছে। তারপর তিনি জাপান, মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া, মঙ্গোল ও অগ্ন্যাত্ন সোবিয়েৎ নগরী পরিদর্শন করেন। সোবিয়েৎ দেশে থাকাকালীন তিনি সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছুকাল লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এবার ভারতে ফিরে আসেন গোঁড়া কমিউনিস্টরূপে।

দেশে ফিরে তিনি বিহারের কিনান আন্দোলনে যোগ দেন। এদিকে গ্রন্থরচনায় ছেদ পড়েনি। ইতঃমধ্যে তিনি ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, তিব্বতী, সংস্কৃত, আরবী, পারসী, পালি, কষ ভাষায় রূপান্তরিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। নানা ধর্মেরও দর্শনের আলোচকরূপে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

স্বাধীন ভারতে তিনি 'পদ্মাবিভূষণ' উপাধি লাভ করেছিলেন। বারানসীর পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'মহাপণ্ডিত' উপাধি দান করেন। সেই উপাধিতে তিনি

স্থপরিচিত। রাহুল সাংকৃত্যায়ণের যে-সকল গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে তার তালিকা দিলাম :

১. ভোলুগা থেকে গঙ্গা, ১ম খণ্ড, (মিত্রালয়)
২. ঐ ২য় খণ্ড—অনুবাদক ভগীরথ পাল (ঐ)
৩. মানব সমাজ (ভারতী বুক)
৪. জয় যোধেয় (বিশ্ববাণী)
৫. সিংহ সেনাপতি (করুণা)
৬. নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর (আই. এ. পি.)
৭. কিম্বদন্তি দেশে। গ্রন্থন মিত্র-অনূদিত। (মিত্রালয়)

॥ বেঙ্গল-এর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ॥

সম্ভা-প্রকাশিত

আচার্য হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

Languages & Literatures of Modern India

• Rupees Eighteen Only

AFRICANISM

A peep in Art, Literature & Culture of 'Black' Africa

Rupees Sixteen Only

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের	প্রীতিময়ী করের	সাত্যাকির
জাহাজ	পথ চলিতে	অনিকেত
৫'০০ ॥	৩'২৫ ॥	২'৫০ ॥
শান্তা দেবীর	সীতা দেবীর	নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
অলখ ঝোরা	মহামায়ী	উপনগর
৫'০০ ॥	৬'০০ ॥	৭'০০ ॥
বিজন ভট্টাচার্যের	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের	দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
রানী পালঙ্ক	নিকষিত হেম	গোম্বুলির রঙ
২'৫০ ॥	৩'০০ ॥	৩'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

যবনিকা কস্পামান : নোতুন ভাবনা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

যেদিন থেকে ভারতের শাসনক্ষমতা ভারতবাসীর করায়ত্ত হয়েছে, সেদিন থেকে আমাদের রাজনীতির চরিত্র বদল হয়েছে। পরাধীন ভারতে রাজনীতি ছিল নেতিমূলক, ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদেয ও ঘৃণাকে বাড়িয়ে দেওয়া, শাসনযন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগ করা, শাসনযন্ত্রের প্রতীক যা-কিছু তাকে ধ্বংস করা প্রমুখ নেতিধর্মী কর্মে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা হয়েছিল। অতীত-স্মৃতিমহন, পূর্বগৌরবস্মরণ, জাতিবৈর ও স্বদেশপ্রেম প্রচার, নবসমাজের স্বপ্নরূপায়ণ, ইতিহাস-রোমান্সের আশ্রয়ে নবভারত সন্ধান : সেদিনের নাট্যকারের কথাবস্তু ছিল।

কিন্তু আজ নবদায়িত্ব, নবকর্মভার, স্বাধীনতার নব আনন্দ আমাদের দৃষ্টিকে পরিবর্তিত করেছে। আজকের নাট্যকারের সামনে নোতুন ভাবনা। ব্যঙ্গ, কারুণ্য ভাবানুতা—এই পুরনো সম্বল নিয়ে নাটকরচনার দিন অবসিত। নবসমাজরচনার ভাবনা নাট্যকারের মনকে আজ গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। সামাজিক সংস্কার ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, তা সাম্প্রতিক নাটকের কথাবস্তুরূপে ব্যক্ত হচ্চে। স্বাধীনতা-পরিবর্তী দ্রুতপরিবর্তমান সমাজে ব্যক্তিমানসের যে মুক্তিস্পৃহা, যে জীবনোপভোগের উল্লাস, যে আত্মবীক্ষা তার সার্থক নাট্যরূপায়ণও নাট্যকারের অস্থিষ্ট। পূর্বে নাটকে নায়ক-চরিত্রের সংকট ও হৃদয় বলতে যা বোঝাত, আজ তার তাকে বোঝায় না। নব চিন্তা, নব সংজ্ঞা, নব আয়তন আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে ও করছে।

কিন্তু তবু কি পুরনো মূল্যবোধ আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছি? এই প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর—না। নায়ক-সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি পুরোপুরি বদলেছে? মানি, অধুনা নাটকে কেবলানী, মজুর, ফেরিঅলা নায়কের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু রাজা বা জমিদারকে নায়করূপে দেখার সংস্কার আজো যায়নি। আমাদের বর্তমান সমাজে রাজা বা জমিদারের আইনতঃ কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে এই মুহূর্তে যে-সব নাটকের অভিনয়

হয়, প্রায়শঃই সেখানে জমিদারের দেখা পাওয়া যায়। যাত্রা-পালায় তো অনিবার্হভাবেই রাজা, শাহজাদা, সামন্ত, সেনাপতির প্রাধান্ত লক্ষ্য করা যায়।

নাটকে মানসিক অতুত্বতিসমূহের মধ্যে যেটি প্রবলতম, সেই প্রেমাতুত্বতির কোন্ রূপ আমরা দেখি? নিঃসন্দেহে রোমাটিক প্রেম—আদর্শবাদী বা ভাবালুতাপূর্ণ প্রেম। ধনীপুত্রের প্রতি মধ্যবিত্ত-কন্তার প্রেম বা ধনীকন্তার প্রতি মধ্যবিত্ত-পুত্রের আকর্ষণ বাংলা নাটকের প্রিয় উপাদান। এই উপাদান আজ অপ্রিয় বা বর্জিত হয়েছে, একথা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই।

আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ বাংলা নাটকের বর্তমান ধারক। মধ্যবিত্ত সমাজে পরিবারের কর্তা ও অধীন চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কে অবনতি, একানবর্তী পরিবারের ভাঙন, নারীপ্রগতির নবরূপ, পরিবারে অর্থ নৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন, মধ্যবিত্ত সমাজের দ্রুত ভাঙন ও যুবশক্তির শোচনীয় অপচয়—এই সমস্ত লক্ষণ সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে ক্রমশঃই ফুটে উঠছে। কিন্তু এবিষয়ে আমরা পুরনো প্রতিষ্ঠান ও ধারণা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারি নি, অথচ নবীন সমাজভাবনাকেও অস্বীকার করতে পারি নি। তার ফলে আমাদের মনের মধ্যে দ্বিধা ও সংশয় প্রবল হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক নাটকে বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণা এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। আত্মসমীক্ষা ও বিশ্লেষণে বাংলা নাটক সম্পূর্ণ সং হতে পারেনি।

আধুনিক ভারতে সবচেয়ে বড় কথা নবীন সমাজগঠনের বিপুল যজ্ঞ—দেশব্যাপী তার বিপুল আয়োজন। এই নবীন সমাজ-সম্পর্কিত নোতুন চিন্তায় আজো আমরা সম্পূর্ণ দীক্ষিত হতে পারি নি। নাটকে এই বিষয়ে নোতুন ভাবনা দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে বিষয়ে উপযুক্ত নাট্যসংস্কার এখনো গড়ে ওঠে নি।

পেশাদার রঙ্গালয়ের ব্যবসায়ী দৃষ্টি কোনোদিনই নাট্যাভিনয়ে নোতুন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না। এই মুহূর্তে কলকাতায় যে ক’টি পেশাদার রঙ্গালয় আছে, তাদের নাটক-নির্বাচন লক্ষ্য করলেই এটি ধরা পড়বে। প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়, আধা-রোমাটিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক কথাবস্তু, সুলভ ভাবালুতাপূর্ণ সমাধান, সস্তা-প্যাচ ও মঞ্চকৌশলের প্রতি অতি-নির্ভরতা, সিনেমা-অভিনেতৃবর্গের দ্বারা অক্ষম চরিত্রচিত্রণ ও সিনেমা-আঙ্গিকের মূঢ় অতুলসরণ থেকেই এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাই আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে, বাংলা নাটকের মুক্তি কোন্ পথে? শখের দলের দুদিনের শৌখিন অভিনয়ে, না, ব্যবসায়ী রঙ্গালয়ের

চোখ-ধাঁধানো প্রদর্শনীতে? অথবা, তৃতীয় পথে, আদর্শবাদী প্রগতিশীল চিন্তাবাহী শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠীর সাহসিক আন্দোলনে?

এই তৃতীয় পথের নবভাবনায় আজ শতাব্দী-প্রবীণ বাংলা রঙ্গমঞ্চের যবনিকা কম্পমান। ‘নবনাট্যআন্দোলন’ সংজ্ঞাটি আজ অতি-ব্যবহারে বিবর্ণ ও মলিন হয়ে গেছে, এই আন্দোলন আজ সাবালকত্ব লাভ করেছে, তার বয়স হল বিশ। আজ প্রগতিশীল নাট্যভাবনার ফলে বাংলা রঙ্গমঞ্চ কতটা মুক্তিপথে এগিয়েছে, তা শাস্ত্রমনে ভেবে দেখতে হবে।

বাংলা নাটক সম্পর্কে পূর্বসূরী ও বর্তমানে প্রবীণেরা যে-সব কথা আমাদের স্তনিয়েছিলেন, আমরা বিনা বিচারে তা মেনে নিই।

ছুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

“ভক্তিরসাম্প্রিত পৌরাণিক নাটকই বাঙালীর গভীরতম ধ্যানকল্পনা ও জীবনসাধনার সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্কবিশিষ্ট। ইহাই বাঙালীর সহজ ও ঐতিহ্যবাহী প্রেরণা হইতে উদ্ভূত। পুরাণের দেবমহিমাখ্যাপক বা বীর ও ভক্তের আরাধ্য দেবতার নিকট আত্মনিবেদনমূলক কাহিনীগুলি এখনও আমাদের বিশ্বাসের প্রাণরসে সজীব ও অন্তরের আলোড়নে স্পন্দিত।”

এই মন্তব্য বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া যায় কি? গিরিশচন্দ্রের বিষমঙ্গল (১৮৮৮) ছাড়া আর কোনো ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক বাংলায় নেই যা সর্বজনপ্রশংসাধন্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘নরনারায়ণ’ (১৯২৬) বা যোগেশচন্দ্রের ‘সীতা’ (১৯২৪) মহৎ নাটক, আশা করি এ কথা কেউ বলবেন না। আপত্তি হবে, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রধান নাটক নিয়ে—‘রাজা’, ‘অরুণপরতন’ বা ‘ডাকঘর’ নিয়ে। সবিনয়ে জানাই, রবীন্দ্র-নাটক মূল ধারার অনুবর্তী নয়, বাংলা নাটকের প্রাথমিক ধারার সঙ্গে এইসব রবীন্দ্র-নাটকের কোনো যোগ নেই। রবীন্দ্র-নাটকের কোনো পূর্বপুরুষ নেই, কোনো উত্তরপুরুষও নেই। ভক্তিরসাম্প্রিত পৌরাণিক নাটক “এখনও আমাদের বিশ্বাসের প্রাণরসে সজীব”, এই মন্তব্য কতদূর বাস্তব-সমর্থিত, সে-বিষয়ে সংশয় জাগে।

নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কেও অল্পরূপ উচ্ছ্বাস ও অতি-প্রশংসার অভাব নেই। কিন্তু নাট্যআন্দোলনের জোয়ার, এক কথা, যথার্থ পাঠযোগ্য সাহিত্য-গুণান্বিত নাটক (Reading drama) রচনা, অল্প কথা। গত বিশ বৎসরে নবনাট্যআন্দোলন শেখোক্ত শ্রেণীভুক্ত কয়টি নাটক আমাদের উপহার দিতে পেরেছে? সাম্প্রতিক বহু-বিভক্ত নিয়ত-অস্থির দম্ব-সংকুল সমাজের আয়না

যে-সব মঞ্চসফল নাটক, তাদের স্থায়ী মূল্য কতটা? এই অস্থির সমাজ ও বিশ্বাসরিক্ত যুগ কি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার অল্পকূল প্রতিবেশ? এই দ্বন্দ্ব-সংকুল অস্থির জীবনাবর্ত নাট্যপ্রেরণা যোগাতে পারে। কিন্তু ঢেউ নেমে যাবার পর ক্রমেনে তটভূমিতে কি কোনো স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারবে? খণ্ড খণ্ড জীবনাংশ বা তর্কমূলক মতবাদ-কেন্দ্রিক জীবনাদর্শ আমাদের জীবনের তাৎক্ষণিক অগভীর আলেখ্য রচনা করে এবং সাফল্যের সঙ্গে নাট্যরূপ দেয়। একথা সত্য। কিন্তু খণ্ড খণ্ড জীবনাংশের মহত্তর সংশ্লেষ, জীবনের গভীরতর ব্যঞ্জনা, মানবানুভূতির ব্যাপক প্রকাশ কি এইসব নাটকে দেখা যায়? রবীন্দ্র-নাটকের মহৎ সম্পদ আমরা দূর থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনা করি, বিশেষ পর্বে ঢাকঢোল বাজিয়ে ভক্তির নৈবেদ্য অর্পণ করি, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে কি তাকে ব্যবহার করি? রবীন্দ্র-নাটক কি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গভীর বাইরে রইল না?

জানি, এইসব প্রশ্ন জটিল, অস্ববিধাজনক ও অস্বস্তিকর। তবু মনে হয়, এই সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই সাম্প্রতিক নাটকের যথার্থ মুক্তি লুকিয়ে আছে। কেননা আমাদের জীবনও জটিল, সহস্র জালে তা বিজড়িত, লক্ষ বন্ধনে তা আবদ্ধ, অসংখ্য চেনা-অচেনা বাসনায় তা রক্তাক্ত। আশা করব আমাদের নবীন নাট্যকারবৃন্দ জীবনের গভীরশায়ী অর্থসন্ধানে ব্যাপৃত হবেন, পরিবর্তমান বিশেষ রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির পটভূমে মানবিক মূল্যবোধের বিচার করবেন এবং ক্রমসঞ্চিত নোতুন-পুরনো উপাদানের সমীকরণে মহত্তর জীবনবোধে বাঙালি দর্শক ও পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে তুলবেন।

আসন্ন পরিবর্তনের সম্ভাবনায় আজ বাংলা নাটকের যবনিকা কম্পমান। পটোত্তোলনের জন্তু অপেক্ষা করব।

—রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাকাহিনী—

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অদৃশ্য শত্রু

ড্রাগন

মৃত্যুবান

৪র্থ মুঃ ২'০০ ॥

৩য় মুঃ ২'০০ ॥

২য় মুঃ ২'০০ ॥

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

পাতালের পাকচক্র

ওঙ্কারের টঙ্কার

৩য় মুঃ ১'২৫ ॥

২য় মুঃ ১'২৫ ॥

নাটক নিয়ে নতুন চিন্তা

রমেন লাহিড়ী

আধুনিক বাংলা নাটক যেন এক নৈরাজ্য।

স্বাধীনতালাভ ও দেশবিভাগ বাঙালীর রাজনৈতিক, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা ঘটালো তা যেমন আকস্মিক তেমন ব্যাপক। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা করে প্রতিপন্ন হোল 'পাপের পরাজয় পুণ্যের জয়' কথাটা নিছক একটা মন-ভোলানো যুক্তি ছাড়া কিছু নয়। দুর্ভিক্ষই সে কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে প্রথমে। তারপর স্বাধীনতালাভের পর যখন স্বাধীন-ভারতের যে উজ্জ্বল স্বপ্ন মানুষ দেখেছিলো তা মরীচিকার মত অন্তর্হিত হোল, তখন মানুষের মনে আর যাই হোক এমন বিশ্বাস আর রইলো না যা অবলম্বন করে বহুদিনের সাধিত জীবনচর্চা ও সংস্কারকে মেনে নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। বিজ্ঞানের জয়জয়কার দৈবশক্তিতে আস্থা ঘুচিয়ে দিলে। অপরদিকে পাশ্চাত্যের নানান দেশের নানান দার্শনিক চিন্তা এসে বাঙালীর চিন্তার কেন্দ্রে বিপর্যয় ঘটালো। শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলির দৃষ্টান্তে নিজের দেশকে গড়ে তোলবার প্রয়োজন হোল অবশ্যস্বাবী। কৃষি-কেন্দ্র জীবনের শ্লথতা শিল্পপ্রাধান্যের যুগের প্রচণ্ড গতির চাপে স্তব্ধ হয়ে গেল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হোল মূল লক্ষ্য, আপনি বাঁচলে বাপের নাম হোল মূল মন্ত্র আর সুবিধাবাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে গোটা সমাজটাই ছুটে চললো কোন অনির্দেশ লক্ষ্যের দিকে। সে লোভেরও যেমন শেষ নেই, সেই ছোট্টারও তেমনি বিরতি নেই। কোথায় পড়ে রইলো দেশকে নৈতিক দিক থেকে নতুন করে গড়ে তোলবার আদর্শ। চোরাকারবার, ভেজালদারী সুবিধাবাদ আর শতক ছুর্নীতির আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে যারা উঠতে পারলো পাঁচজনের শীর্ষে তারাই হোল নেতা। কোটা কোটা সাধারণ মানুষ পড়ে রইলো সেই তিমিরে যে তিমিরে ছিলো তারা স্বাধীনতালাভের আগেও।

আজকের বাংলা নাটকের মূল অবলম্বন এই বাস্তবতা। জীবনের কোনখানে কোনও সত্যবোধ নেই, বিশ্বাস নেই শির ও হৃদয়ের অস্তিত্বে। আজকের নাটকেও তাই। বাস্তবতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, শ্রীহীনতা, অপচয়,

অনাচারের পাক খুলিয়ে তোলাই নব্যরীতির প্রত্যক্ষ নীতি। মানুষে মানুষে
 ঘেঁষা হিংসা দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগানই প্রগতিবাদের লক্ষণ। অথচ মানুষের সৃষ্ট
 দুর্বিপাকের চাপে বিশ্বস্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তিল তিল করে যে প্রচণ্ড
 আত্মিক অপচয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষয় হয়ে যেতে বসেছে তার বিরুদ্ধে নেই এতটুকু
 বিজ্ঞোহ। বিজ্ঞান মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে আধুনিকতম মারণাস্ত্র। প্রতি
 মুহূর্তে নিঃশেষ হ'য়ে যাবার প্রচণ্ড ভয় নিয়ে মানুষের দিবারাত্রের ঘণ্টা মিনিট
 কাটছে। ভয় যতই বাড়ছে, কোনমতে শুধু নিজে বেঁচে থাকার হাশ্বকর আশ্বালন
 ততই বাড়ছে। অথচ এই পাশবিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে মানুষ
 যে প্রচণ্ড নৈতিক শক্তির জোরে সেই নৈতিকতা সৃষ্টির প্রয়াসে আজ সঙ্কল্প
 ভাবে ব্যর্থ শিল্পী-সাহিত্যিকের কলম। বাঙালীর সমাজজীবনেও এই অবক্ষয়ের
 চেষ্টা এসেছে। যুগবিবর্তনের সঙ্ক্ষিপ্ত দাঁড়িয়ে সমস্ত স্তরের মানুষ যখন প্রচণ্ড
 জীবন-যন্ত্রণায় কাতর— তখন সাহিত্য বেছে নিয়েছে একদিকে আত্মস্বাতন্ত্র্য—
 বিলাসের মোহ, অপরদিকে শ্রেণীসংগ্রামের নামে আত্ম-ধ্বংসের ভ্রান্ত পথ।
 ভ্রান্ত বললাম, কারণ নাটকে যেভাবে রাজনীতি-চিন্তা আজ আসছে তা স্বস্থ
 নয়, স্বাভাবিক নয়। রাজনীতি বা পলিটিক্‌স্ যে অর্থে সমাজবিজ্ঞান, সে
 অর্থে রাজনীতিচর্চা নাটকে হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। রাজনীতির
 একটা সহজ রূপ আমরা বুঝে নিয়েছি। বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী।
 প্রগতিবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু প্রগতি মানেই শুধু অর্থনৈতিক শোষণ
 বা সামাজিক অনাচারের একদেশদর্শী ব্যাখ্যা বা সমালোচনা নয়। শোষিত
 যারা হয় আর শোষণ যারা করে তারা একই সমাজের মানুষ। একই সমাজ-
 ব্যবস্থার অধীন মানুষ। সুতরাং শুধুমাত্র শ্রেণীগত বিভেদের মাপকাঠিতে
 তাদের মধ্যে ভাল-মন্দের সীমানা নির্দেশ করলে চলবে কেন? নীতিহীনতা
 মানুষকে অগ্রাহ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে আর যে নৈতিকতার অভাব দারিদ্র্যগ্রস্ত
 মানুষগুলিকে বিপথে চালিত করে—তার উৎপত্তির কারণ মূলতঃ একই।
 অবলম্বন করবার মত একটা স্থিতির জীবনদর্শনের অভাব। তাই নাটকে যখন
 শুধু শোষণের, অনাচারের জঘন্য রূপটিকে তুলে ধরা হয়, তখন সেই ছবি যতই
 বাস্তবসম্মত হোক না কেন যথার্থ মোটেই হয় না। কারণহীন কার্য সম্ভব
 নয়। অথচ কারণের যথাযথ বিশ্লেষণ না করে শুধুমাত্র কার্যটিকে প্রকট করে
 তোলার নাম আর যাই হোক বাস্তবতা নয়। অথচ এই রীতিটিই বাস্তবতার
 নামে নাটকে চলে আসছে। নিপীড়িত মানুষের অবচেতন মানসের প্রতিশোধ-
 প্রবৃত্তি অত্যাচারীর আশ্চর্য পতন বা শাস্তি প্রত্যক্ষ করে আনন্দ পায়।

অত্যাঁয় অসত্য অনাচারের বিরুদ্ধে ষথার্থ বিক্ষোভকে যে পথে স্মংহত ও স্পরিচালিত করা যায় তার উপায় এই সস্তা বাস্তববাদিতা নয়। এর অনিবার্ধ ফল এই যে সাময়িক উত্তেজনার শেষে অত্যাঁয়ের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ থাকে মানুষের মনে তা নির্জীব হ'য়ে পড়ে। এক ধরণের হীনমন্ততা, অসহায়তাভাব চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। কারণ, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এঁ সে বুঝতে পারে নাটকের সত্যে আর জীবনের সত্যে কত তফাৎ। নেতিবাদী দর্শনের দ্বারা আচ্ছন্ন নাটকের প্রভাবে মানুষের আত্মবিশ্বাসের সবটুকু শক্তিই ক্ষয় হ'য়ে যায়। তখন অত্যাঁয়কারী মানুষের মত সেও এক ধরণের আত্মসম্মোং ও স্বেবিধাবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয় যা স্পষ্টতই প্রগতিবিরোধী।

জীবন ও চিন্তার মধ্যে এই স্ববিরোধ আজ সমাজের সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত। নাটকে এই স্ববিরোধকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে নতুন এক জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা করাই কাম্য ছিল আজ। কারণ নাটক অনেক মানুষের সমবেত প্রয়াসে সৃষ্ট শিল্প—যার মধ্য দিয়ে অনেক মানুষের চিন্তাচেতনা মূর্ত হ'য়ে ওঠে, একই সঙ্গে অনেক মানুষের হৃদয়-মনকে উদ্বেলিত করে। নাটকের গুরুত্ব তাই অপরিমীম। গুরুর ভূমিকা নাটকের। গুরু সৎ হলে শিষ্য সৎপথে চালিত হতে পারে। গুরুর মধ্যে বিচারবোধের বিভ্রান্তি ঘটলে তা শিষ্যের পক্ষেও মারাত্মক হতে বাধ্য।

এই বিভ্রান্তি আজকের নাটকের সর্বাঙ্গে। কারণ নাটক ধারা লেখেন তাঁদের অনেকের চিন্তায়ই রয়েছে এই বিভ্রান্তি। রাজনীতিক্ষেে ষথার্থভাবে অনুধাবন না করেই নাটকে রাজনীতি করার ফ্যাশনটিকে চালু করা হয়েছে। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে আমরাও বড় বেশী পলিটিকস-প্রিয় হ'য়ে পড়েছি। কেউ বামপন্থী, কেউ দক্ষিণপন্থী যেহেতু দল ছাড়া রাজনীতি করা যায় না। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই, দলের দৃষ্টিতে দেখতে হচ্ছে জীবনকে। দল যদি নীতি-নির্ধারণে ভুল করে তবে সেই ভুল ব্যক্তিকেও মেনে নিতে হয়। কারণ দলগত রাজনীতির যুগে ব্যক্তির কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মাত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল; তা সেই ব্যক্তি যত সত্যদ্রষ্টাই হোন না কেন। দল যদি বামে হেলে, ব্যক্তির ভাবনাও বামে হেলবে। দক্ষিণে হেললে দক্ষিণে। কাল যে নীতি সত্য বলে প্রচুর উত্তমসহকারে প্রচার করা হয়েছে, আজ যদি তা ভ্রান্ত বলে নির্দেশ আসে, তবে কালকের সত্য জীবনের সব ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'য়ে যাবে। এর বিরোধিতা যে করবে সে

প্রতিক্রিয়াশীল। যে নির্বিচারে যেনে নেবে তার প্রগতিবাদী সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর ব্যক্তিগত জীবনে অনেকে যারা রাজনীতি করে না অথচ নাট্যরচনা করে, তারা শুধু স্থিরলক্ষ্যে চেয়ে থাকে ‘ওয়েদারকক্’টির দিকে।

কখনো বামে কখনো দক্ষিণে হেলনের এই নীতিহীন নীতি আজকের অনেক নাটকে লক্ষ্য করা যাবে। দৈহিক মানসিক দুর্গতি থেকে মানুষকে মুক্তির প্রেরণা জোগানোর মহৎ উদ্দেশ্য অনেক নাটকেই অনুপস্থিত। কারণ নাট্যকারের নিজস্ব চেতনাতেই এই লক্ষ্যের রূপ স্থাপ্ত নয়। নাটকের মধ্য দিয়ে মুক্তির বার্তা ঘোষণার ইচ্ছা হয়তো রয়েছে, কিন্তু সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার পথে বাধা অনেক, যদি প্রগতিবাদী সম্মান নষ্ট হয়! যদি লোকে বলে স্বপ্নবিলাসী! আর, মানুষের আত্মিক মুক্তির যে পথ নির্দেশ করতে যাচ্ছি, সেই পথটিই ভ্রান্ত হয়! অতএব?

অতএব, নিছক বাস্তবতার পূজারী হওয়াই শ্রেয়ঃ। সত্য চাপা থাক, শিব চাপা থাক, সুন্দর উছ থাক। জীবনের গ্লানি, কুশ্রীতা, নির্লজ্জতা, লোভ, ঈর্ষা, বিদ্বেষের ফটোগ্রাফ তুলে ধরাই হোক নাট্য-রচনার লক্ষ্য। কেউ যদি নির্দেশ করে, হাজারো রকমের ইজমের দোঁহাই দিয়ে সহজেই প্রমাণ করে দেওয়া যাবে, নির্দেশ করা তার স্বভাববধর্ম। কেউ যদি সমালোচনা করে জীবনদর্শনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে, পাশ্চাত্যের বড় বড় দেশের বড় বড় দার্শনিকের নাম তুলে প্রমাণ করে দেওয়া যাবে সমালোচক ব্যাক্-ডেটেড। একথা কাউকেই বোঝানো সম্ভব হবে না যে, জীবনবোধ যার স্পষ্ট নয়, মানুষে মানুষে সত্যকার সম্পর্কে—মহুসুত্বে যার বিশ্বাস নেই, নিজের সত্য উপলব্ধির কথা স্পষ্ট করে বলার মত আত্মবিশ্বাস যার নেই—সে কখনও বেঁচে থাকার, মানুষের অগ্রগতির চেতনাকে যথার্থ সুন্দর ও মঙ্গলময় চেতনায় উদ্ভুদ্ধ করে তুলতে পারে না।

তাই বলছিলাম আজকের বাংলা নাটক যেন এক নৈরাজ্য। রাজনীতি নিয়ে এই আশ্চর্য মাতামাতির যুগেও নাটকে এই বিশ্বংখলার রাজত্ব সত্যিই বিস্তারিত। অথবা এমনটাই ঘটে! রাজনীতি মানুষে মানুষে বিভেদ, বিদ্বেষ, হানাহানির সম্পর্কে বড় করে দেখানো হয়—এই বোধ যদি না জাগে, তবে নাটকের ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটবে না।

অথচ বাস্তব সত্য এই যে, সুখদুঃখেরা এই জীবনে স্নেহভালবাসা একাত্মতা দিয়ে পাঁচজনকে নিয়ে বেঁচে থাকতে আগ্রহী লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ আজ এই আশাই করে যে, নাট্য-সাহিত্যের মাধ্যমে জীবনের যাকিছু সুন্দর, যাকিছু মহৎ, যাকিছু প্রেমময়—সে সর্বেরই অনাবিল প্রকাশ ঘটুক।

নাটক বিচার : নতুন দৃষ্টি

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

নন্দন-তাত্ত্বিক মূল্যবিচারে কোন ভাবনা শিল্পভাবনা হবে, কোনটি নয়, সৃষ্টির সীমানায় কোন বিষয় সাহিত্যভাবে একান্ত অস্বিষ্ট কিংবা অন্ত্যজ আর্টচেতনার ধারাবিকাশে সমাজবিজ্ঞাসের স্বান্দিক আচরণবিধি সাহিত্য-বিচারের বিপুল নিরিখ কিনা—সমস্ত কিছুই নির্ভর করে, জগৎ ও জীবনকে দেখবার একটি বিশেষ মনোজাত ভঙ্গী ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর।

সমাজচিন্তা বলে : সমাজ মূলতঃ বিবর্তনপরায়ণ। সমাজকক্ষে আছে : পরস্পর-বিপরীত স্বভাবের সংঘর্ষের অবস্থান। সেই সংঘাত কদাচ স্পষ্ট, কদাচ অস্বচ্ছ। তার গতিময়তা কখনো শিথিল, কখনো বেগবান ফলশ্রুতিতে যে চিরায়ত বর্ধিষ্ণু ধারা, যা ঐতিহ্যবাহী হয়ে বর্তমান, বর্তমান পার হয়ে স্বদূর, স্বদূরের কোন এক আলোকময় কক্ষে গুস্ত, তার স্বাক্ষর-মুদ্রিত হচ্ছে সাহিত্যের ইচ্ছায়, কাব্যের অভিপ্রায়ে, নাট্যের দ্বন্দে। মনুজ্ঞভাবের এই মুহূর্মুহঃ মনুনে শিল্পচৈতন্ত্যের যে রূপময় প্রকাশ আমরা দেখি তারই এক ফলবান শাখা, নাট্যশাখা। আজকের দশকে নাট্যবিচার তাই, ঐতিহাসিক গ্রায়দণ্ডের মূল্যবিচারের মুখ্যপেক্ষী, সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহের কাছে দায়বদ্ধ। থিয়েটার-ভাবে অন্তরের কথা হচ্ছে দ্বন্দ। ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাধারার দ্বন্দ। নতুন-পুরোনো স্বভাবের দ্বন্দ, গ্রায়-অগ্রায় বোধবৃত্তির দ্বন্দ। দ্বন্দই নাটকের নিগূঢ় সত্তা।

আর এই পরিব্যাপ্ত সত্তার লীলাক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের বাঁচার যন্ত্রণায়। এর বিস্তৃতি তাই যন্ত্রণার প্রথম প্রতিরোধ থেকে বর্তমানের সংগ্রাম-স্কন্ধ জীবনের চৌহদ্দিতে। তাই মানব-ইতিহাসের মূল কথা হচ্ছে শ্রেণীমানুষের বিরোধ, স্বতীর্থ শ্রেণী-সত্তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামতের কারুকার্য।

ফিউডাল বাংলার পরবশতার যুগ থেকে আজকের স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলার থিয়েটার-এর নব্য মূল্যায়ন যেমন প্রয়োজন তেমনি অপরিহার্য এতাবৎ সৃষ্ট নাটকের সামুহিক মর্মসূত্র অন্বেষণ।

নির্দিষ্টায় বলা সঙ্গত,—এই অন্বেষণ রাজনীতিপ্রেরণা সজ্ঞাত। নাট্যমর্ম মতবাদসাপেক্ষ। নইলে নাট্যকারের ভাগ্যবিধায়ক রাষ্ট্রীয় পুলিশ হয় কি করে ?

“গজানন্দ” ও “হুম্মান-চরিত” শুধু কি সঙ্গীক প্রিন্স অফ ওয়েলসকে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুরস্কৃত দিয়ে হিন্দু প্রথামত বরণ করার প্রতিবাদ ছিল? তাই যদি হবে, ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহলে এর মধ্যে রাজজোহের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেন কেন? করেন এই কারণে, ১৮৭৩ সালের আগে ধারা নাট্যসাধক ছিলেন সেই মাইকেল, দীনবন্ধু, রামনারায়ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জ্যোতিঠাকুর তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক। খাঁটি স্বদেশকল্যাণকামী।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলায় উদ্ভাসিত বাংলার রেনেসাঁ-মানস তখন স্বাধীনতাহীনতার বাঁচতে চায় না। কেননা রেনেসাঁর প্রধান সর্ত ছিল ফিউডাল অর্থবিত্তাস ভেঙ্গে ধনবাদী অর্থনীতিনির্মাণ এবং অন্ততম সর্ত ছিল মুক্ত মনের আবাদন, ব্যক্তিবিশেষের মূল্য-সচেনতনতা ও জাতীয় মুক্তির তৃষ্ণা। অর্থাৎ দেশপ্রেমের উদ্বোধন। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মেজাজে ছিল মূলতঃ বুদ্ধিবাদী বিদ্রোহ, হৃদয়বাদী আন্দোলন। “স্বরেঞ্জবিনোদিনী” ছিল এমনি ধরণের একখানি নাটক। যে নাটক অভিনীত হবার সময় নাট্যকার উপেন দাস সহ অমৃতলাল, মতিলাল ও বেলবাবু গ্রেপ্তার হন, কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি শ্রীউমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে এঁদের পক্ষ সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন। থিয়েটার যুগের প্রেরণা যদি রাজনীতি-প্রেরণা-সজ্জাত না হত, তাহলে কেনই বা লর্ড লিটন (তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল) নাটককে শাসন করবার জন্ত আইনের দণ্ড হাতে এগিয়ে আসবেন। কেনই বা সৃষ্ট হবে ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট, যা আজও শিল্পে কুখ্যাত কাল কানুন বলে বিকৃত। কই দেখি না তো কখনো কবিতা-শাসন করবার জন্তে, বা উপন্যাস-শাসন করবার জন্তে কোন আইন রচিত হয়েছে। হয়েছে নাটকের বেলায়। কেননা সাহিত্যের পরিবারে এই শিশুটি জন্ম-পলিটিক্যাল। তাই পুলিশকে হতে হয় নাট্যবোদ্ধা। আজও তাই দেখি আবার আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী কংগ্রেসী সভায় আলোচনা হচ্ছে কেমন করে আবার নাটকের স্বাধীনতা অপহরণ করা যায়। লজ্জার কথা। স্বাধীনতার লজ্জা।

এমনি করে ব্রিটিশের আমলারা; স্বামিন্ত-দাসেরা, মাইকেলের “একেই কি বলে সভ্যতা” ও “বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রেঁা” বন্ধ করে দিয়েছিল। আরও অবাক হবার কথা যখন দেখি যাত্রীর বহু পালা-নাটকও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা সেগুলি ছিল জাতীয়ভাবে উদ্ভুদ্ধ, স্বাধীনতা-কামনার অগ্নি-বিচ্ছুরণ, জাতীয় অর্থনীতিকে বিদেশী শোষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা। ভূষণ দাসের “মাতৃপূজা,” মথুর সাহার “পদ্মিনী,” মুকুন্দদাসের সব কটি নাটকের

ওপর আইনের উত্তত খড়গ নেমে এসেছিল। কেননা সেগুলি ছিল পলিটিক্যাল নাটক। কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ষোল বছর পরেও যখন শুনি নাটকে রাজনীতি থাকাটা নাকি পাপ, সাহিত্যের জাতি যায় নাকি তাতে।

অথচ গিরিশচন্দ্রের ‘সিরাজদৌলা’, ‘মীরকাশিম’, ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘প্রতাপাদিত্য’, ‘পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত’, দ্বিজেন্দ্রলালের ‘রাণা প্রতাপ’, ‘মেবার পতন’, পরবর্তী কালের মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’, রবীন্দ্রনাথের ‘রথের রশি’, ‘রক্তকরবী’, শচীন সেনগুপ্তের “সিরাজদৌলা,” ‘গৈরিকপতাকা’ অবিসম্বাদিত পলিটিক্যাল নাটক। এই সমস্ত নাটকে দেখানো হয়েছে যে মাহুঘের স্বাধীনতাবোধ নিহত হলে, ব্যক্তির প্রেম, প্রীতি কখনোই পরিপূর্ণতা পেতে পারে না।

আগেই বলেছি : রেনেসাঁর বিপ্লব অর্থ নৈতিক বিপ্লব। ভারতের বুকেও তার ঢেউ এসে লাগে। ভারতের ফিউডাল অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করে বুর্জোয়া অর্থনীতি। তাই ভারতের চিন্তাকাশেও ভাবের দিক থেকে বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা দেয়। সে রূপান্তর অন্তর্মুখিনতা। ভাবের হাওয়ায় মনের দিকে চাওয়া। পঞ্চদশ শতকের বাঙলার প্রথাবদ্ধ জীবন থেকে সাহিত্যের দৃষ্টি একক মনের দরজায় নেমে আসে। বঙ্কিম-গিরিশের রোহিণী, কুন্দ, ষোণেশ, ককণাময়, পরবর্তী কালের কিরণময়ী, কমল, অচলার মধ্যে উত্তরিত হল। এবং এশিয়া ইউরোপখণ্ডে যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার হাওয়া জীবনে ও সাহিত্যের দিগন্তে নতুন আলো এনে দিল এবং সেই আলো এখনি ছড়িয়ে পড়ল বাংলার মানসিকতায়, তখন দেখলাম বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাংলা,—মানব সমাজকে সাহিত্য-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আধা-ধনবাদী ও সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে সাম্যবাদী সভ্যতার সম্ভাবনায় উত্তীর্ণ করে দিতে ব্যস্ত। অর্থাৎ সাহিত্য, সাহিত্য অর্থেই আরও পলিটিক্যাল হল। এই সত্য আজকের সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য। জীবনের সত্য। এই সত্যকে আড়াল দিয়ে যে সমস্ত মেকী সাহিত্য-প্রেমিক সাহিত্যের বিপ্লবতা রক্ষা করবার জন্তে দল বেঁধে কণ্ঠ বিদীর্ণ করছেন—তাঁরা আর যাই হোক জীবনের অবশ্যসত্তাবী সত্যকে মেনে নিতে ভীত সন্ত্রস্ত। জীবনের খেলায় সত্যকে ফাঁকি দিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। নিজেদের ভোলাচ্ছেন। এই সত্যভাষণ বাংলার নাট্যশালায় প্রথম ধরা পড়ল বিজন ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী’ ও ‘নবান্ন’ নাটকে। তুলসী লাহিড়ীর ‘দুঃখীর ইমান’, ‘ছেঁড়া তার’

ও দিগিন বাবুর 'দীপশিখা' নাটকে। যদিও এই নাটকগুলির মধ্যে সোশ্যাল রিয়ালিজম বোধের আধিক্য বেশী, তবুও বলব আগামী কালের শ্রেণী-সংগ্রামে নিযুক্ত হবে যে সর্বহারা, শোষণ লাঞ্ছিত মানুষ তাদের তীক্ষ্ণ, ঝজু, বর্ষার ফলার মতন ধারালো চেহারা বাংলা নাটকের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। ভাবের দিক থেকে, অঙ্গের দিক থেকেও। পরবর্তীকালে পেলাম বিজনবাবুর 'গোত্রান্তর', তারও আগে পেলাম দিগিনবাবুর 'অন্তরাল' যার মধ্যে সোশ্যাল রিয়ালিজম-ভাব অতিক্রম করে নাট্যচিন্তা আরও বেশী অগ্রসর, আরও বেশী বৈজ্ঞানিক এবং নাটকে সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা রূপ নেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সচেষ্ট। এই হচ্ছে গণনাট্য আন্দোলনের ধারা, গণনাটক হবার অভিপ্রায়। যে ধারা বাংলার পেশাদার মঞ্চেও লিটল থিয়েটার গুপের 'অঙ্গার' নাটক পর্যন্ত প্রসারিত এবং অধুনা-উন্নত দেশপ্রেমিকদের প্রেমে স্তব্ধ। কেননা 'অঙ্গার' পলিটিক্যাল। বেশী বলবার অবকাশ নেই, তাই বলে রাখি কোন কিছুই পৃথিবীর,—সাহিত্যের সামগ্রী হতে বাধা নেই, যদি তা যে দিন তব্বের বিচারে উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ আর্টের সরসভায় প্রাণ পায় এবং সমগ্র মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। সাহিত্যে যারা স্পৃহা-অস্পৃহা বাছবিচার করেন, সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার জন্ত যাদের ভাবনার আর অন্ত নেই তাঁরা যেন রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি স্মরণ করতে ভুলে না যান—“মার্কসিজমের ছোঁয়া কারো কবিতায়” যদি লাগে অর্থাৎ কাব্যের জাত বাঁচিয়ে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই—” [অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, ১৯৩৯ সাল] ✓

শেষ কথা বলি, সমাজের ভবিষ্যৎ আছে। সাহিত্যের দিগন্ত এ আকাশ পার হয়ে যাবে, জীবনের সত্য সূত্রে প্রসারিত, সেই দিকেই দৃষ্টি রেখে বলব—শ্রেণী-সংগ্রামের ধারা বেয়ে মানুষের আকাজক্ষাকে সেই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থায় এবং তারপরেও যদি আরও কোন প্রগতিশীল ব্যবস্থা থাকে সেখানেও আমাদের নাটক আমাদের উত্তর-জীবনকে পৌঁছে দেবে, মানুষকে, জীবনকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে, এবং নিশ্চিত জানি তা এই শ্রেণীসংগ্রামের পথ ধরে এবং রাজনৈতিক মতবাদের অল্পবর্তন করেই।

প্রবোধকুমার স্বাস্থ্যালের

রাশিয়ার ডায়েরী •

১ম খণ্ড : ১৪'০০ ॥

২য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

দ্বিটি খণ্ড একত্রে : ২৫'০০ ॥

দেবভাস্মা হিমালয়

১ম খণ্ড : (১০ম মুঃ) ৯'০০ ॥ ২য় খণ্ড : (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১২

রাজনীতি নয়, নতুন অঙ্গ

গিরিশংকর

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষ সাতপাকে বাঁধা। অর্থাৎ এ বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। মানবশিশু একটা সামাজিক পরিবেশে জন্ম নেয়, সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠে, আশ্রয় সেই পরিবেশেই আবদ্ধ থাকে। কাজে কাজেই ব্যক্তি-মানুষের ওপর নিশ্চিতভাবে সমাজ তার প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির তাগিদ, অধীত জ্ঞান, ও সামাজিক পরিবেশের সীমাবদ্ধতা তাকে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেয় না। স্বভাবতই সমাজের খণ্ডাংশ হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি-মানুষ প্রতিনিয়ত সমাজ-বিবর্তনের সক্রিয় শক্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ ও সমাজ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাদ্বীভাবে যুক্ত।

আবার এই সমাজ-বিবর্তনের বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব। আজ কালক্রমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রায় অসীম। একদা যে সমাজ মূলতঃ ধর্ম ও ধর্মীয় নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত আজ সেই সমাজ মূলত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত। স্বভাবতই প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত। সমাজের মতই রাষ্ট্রের প্রভাব ব্যক্তি-মানুষের ওপর, আবার ব্যক্তি-মানুষের প্রভাব রাষ্ট্রের ওপর।

এই রাষ্ট্র-সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও ফলিত জ্ঞান ও তার প্রয়োগই রাজনীতি। তাই যদি হয় তবে ব্যক্তি-মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যে ব্যক্তি-জীবন তার সঙ্গে রাজনীতির যোগ অত্যন্ত নিবিড়। তাহলে মোটামুটি বা দাঁড়াল—ব্যক্তি-মানুষ, সমাজ ও রাজনীতি অবিভাজ্য, যদিও ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সর্বদাই যে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকবে এমন নয়।

এখন যেহেতু কোন সার্থক শিল্পকর্মের মূল কোন না কোন মৌলিক মানবিক অনুভূতিতে প্রোথিত তাই প্রতিটি শিল্পকর্মই শেষবিচারে জীবন-সম্পর্কিত। এমনকি সূক্ষ্মতম বিমূর্ত শিল্পরচনার মূলে ও অন্বেষণে জীবনের স্পন্দন ও উষ্ণতা দ্রষ্টব্য। এই জীবন আবার দেশ, কাল ও সমাজ-শাসিত—অর্থাৎ রাষ্ট্র-শাসিত অর্থাৎ রাজনীতি-সম্পর্কিত। তাহলে বলা যায় মানুষের কোন শিল্পকর্মই (মূর্ত বা বিমূর্ত) যখন জীবন সম্পর্ক-রহিত নয় তখন

জীবনের প্রতিটি প্রকোষ্ঠই (যেহেতু প্রকোষ্ঠগুলি পরস্পর-সম্পর্কিত) মনুষ্যকৃত প্রতিটি শিল্পকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। কখনো হয়ত এ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষ, অবশ্য এ প্রত্যক্ষতা বা পরোক্ষতা আবার সমাজদেহের বিশেষ বিশেষ শক্তির উত্থান-পতনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

নবনাট্য আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে একটা প্রশ্ন সোচ্চার—নাটকে রাজনীতি থাকবে কিনা? ওপরের আলোচনায় স্পষ্ট যেহেতু যে কোন শিল্পকর্মেই রাজনীতি-বিযুক্ত নয় সুতরাং নাটকেও রাজনীতি অপরিহার্য। কিন্তু খুব সঙ্গতভাবেই অতঃপর প্রশ্ন ওঠে—এই অপরিহার্যতার স্বরূপ কি? অর্থাৎ রাজনীতি পরোক্ষভাবে থাকলে কতটা থাকবে? প্রত্যক্ষভাবে থাকলে কতটা থাকবে? রাজনীতির পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ রূপ কি হবে?

এ সম্পর্কে কোন অল্পপাত-নির্ণয় আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না। তাহলে প্রশ্ন—কোন নাটকে রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতির সার্থকতার নিরিখ কি? নিরিখ একটাই—যে নাটক দর্শক-সমাজের মৌল অমুভূতিকে আবর্তিত করতে পারছে কিনা।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাজনীতির প্রশ্ন আমাদের সাহিত্যে সচেতন ভাবে এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে। এ প্রশ্নের পেছনে যে চিন্তা ক্রিয়াশীল তা হচ্ছে (১) মাহুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ভাবনা-চিন্তা তা ব্যক্তিগতই হোক অথবা সমাজগতই হোক অর্থনৈতিক বিজ্ঞাসের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ সামাজিক পরিবেশে মাহুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-দুর্দশাও নির্ভরশীল সেই সমাজের অর্থনৈতিক বিজ্ঞাসে। কারণ সমাজের সমস্ত লক্ষণাদি তার অর্থনৈতিক বুনয়াদ-সম্ভূত। (২) যেহেতু শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজেরই অঙ্গীভূত তাই তার রূপান্তরে সমাজের অগ্রাগ্র অংশের মত তারও দায়িত্ব বর্তমান। এবং (৩) সে দায়িত্ব পালনের শক্তিশালী হাতিয়ার তার শিল্প।

এই চিন্তার ভিত্তি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হল তা হচ্ছে লেখক-শিল্পীর সামাজিক জীবন হিসাবে প্রধান কাজ তার শিল্প-হাতিয়ারের সাহায্যে সামাজিক কাঠামোর অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিজ্ঞাসের পরিবর্তন সাধন। এই সিদ্ধান্ত অমুযায়ী শিল্পী-সাহিত্যিককে রাজনীতিবিদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতি একবস্তু না হওয়ায় আলোচ্য সিদ্ধান্ত অমুযায়ী শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ফসল ফলল তা কোন কোন ক্ষেত্রে শাণিত হাতিয়ারের কাজ করল বটে কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের যা মূল

উদ্দেশ্য—মানুষের মৌল অহুতৃতিকে আবর্তিত করার কাজে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল। শিল্প-সাহিত্য যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মৌল অহুতৃতিকে স্পর্শ করতে পারছে ততক্ষণ তার বৈশিষ্ট্য সার্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা ভ্রষ্ট হতে বাধ্য।

শিল্প-সাহিত্য শুধু তার নিজস্ব দেশ ও কালের গণ্ডিকে প্রভাবিত করে না—তার ক্ষেত্র দেশ ও কাল উভয় অক্ষেই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশ-কালের সীমা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা এইখানেই—যে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গেই মানুষের জীবনের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা মূলতঃ উপরিগত। এই উপরিগত পরিবর্তন তার মৌল অহুতৃতিসমূহের প্রকাশভেদ মাত্র। তাই রাজনীতি ও সামাজিক কাঠামোর আমূল ভিন্নতা সত্ত্বেও সেক্সপীয়রের বা কার্লিডাসের রচনা আধুনিক মানুষের কাছে আদরণীয়। যদিও সাময়িক সমাজ ও রাজনীতিকে অগ্রাহ্য করেই শিল্প-সাহিত্যের আবেদন অহুতৃতির দরজায় তবু শিল্পসৃষ্ট মানুষ আবার সাময়িক সমাজ ও রাজনীতি নির্ধারিত। যে মানবজীবনের কথা শিল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তু (বিমূর্ত চিত্রণ ছাড়া) তার শেকড় সাময়িক সমাজ ও রাজনীতিতে প্রোথিত না হলে তা আবার নিরালম্ব। স্বতরাং নাটকে রাজনীতি থাকবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দাঁড়ল—নাটকে (সাহিত্যে) রাজনীতি থাকতেই হবে এমন কথা বলা যায় না আবার একথা ভাবাও মূঢ়তা যে, রাজনীতি থাকলেই নাটক অপবিত্র হয়ে গেল।

একদিন শিল্পকে অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার রূপান্তর ঘটানোর প্রত্যক্ষ হাতিয়ার হিسابে দেখার ফলে যে ভ্রান্তি বোঁকের সৃষ্টি হয় (এ ভ্রান্তি শুধু আমাদের নয় অন্তর্দেশেও এর ক্রিয়াশীল রূপ আমরা দেখেছি) তারই প্রতিক্রিয়ায় শিল্পকে রাজনীতি-বিষুক্ত করার বোঁকের সৃষ্টি। আদতে বর্তমান নাটকের সঙ্কট এখানে নয়। শুধু নাটকই বা বলি কেন—আত্মসমৃদ্ধ বহু গদ্যগদ্যভাষণের পেছনে বর্তমান উপন্যাস ছোটগল্প কবিতায় সঙ্কটের ঐ ছায়াটি আজ স্পষ্ট। ঐ সঙ্কটেরই তাড়নায় উপন্যাস আজ কোথাও মৃত অতীত ব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত, কোথাও ভৌগোলিক সীমানা-বিস্তারের মুক্তিসন্ধানী। ছোটগল্প আজ কাহিনী স্টাণ্ডের পর্বে পর্বে পা ফেলে অবশেষে ঐষ্টম্ অব্ কনসাসনেসে মগ্ন। আর কবিতা নির্বাসিত কবির একক চেতনার অস্পষ্ট প্রকোষ্ঠে।

আজকের উপন্যাস গল্প কবিতা এবং নাটকে মানুষের মৌল অহুতৃতিকে যে আবর্তিত হচ্ছে না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তবু মানুষের মন ভরছে

নাটক ও রাজনীতি

বীরু মুখোপাধ্যায়

রাজনীতি শব্দটি বিভ্রান্তিকর। যে সময় দেশে রাজা বা রাজতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সময় সেই শাসকরাজের যে স্বকীয় নীতি, তাকেই রাজনীতি বলা চলতো। বলা বাহুল্য তার সঙ্গে সমাজের বা দেশের আপামর-জনসাধারণের কোন সম্পর্কই ছিল না। কারণ রাজা কিভাবে রাজ্যশাসন করবেন, সেটা একমাত্র রাজারই সমস্যা, অপর কারও নয়। কালাবর্তে ক্রমে রাজতন্ত্র লোপ পেল বা পরিবর্তিত হলো। সাধারণ দেশবাসী দেশের শুভশুভের অংশীদার রূপে স্বীকৃতি পেল। রাজার রাজ্য পরিণত হ'ল জনসাধারণেরও রাষ্ট্রে। সুতরাং পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতি চিহ্নিত হ'ল রাষ্ট্রনীতি রূপে। আজকের রাজনীতির অর্থ রাষ্ট্রনীতি, যে রাষ্ট্র জনসাধারণের সমর্থনে গঠিত, জনসাধারণের শুভার্থে পরিচালিত (অন্ততঃ হওয়া উচিত)।

এবার নাটকের কথা। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার অন্তর্গত নাটক বা নাট্য-সাহিত্য স্বভাবতই সমাজজীবনকে আশ্রয় করেই সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়। সত্য-সুন্দর-শিবের মূল্যায়ন সমাজসত্য-ভিত্তিক। ব্যক্তি-সত্যও সত্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু ব্যক্তি-মানস সমাজ-মানসের পর্যায়ে উন্নীত না হ'লে, তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা পায় না। ওখেলোর সমস্যা যদি একজন মূর সেনানায়কের ব্যক্তিগত সমস্যা হ'ত, তা হ'লে শেক্সপীয়র কালজয়ী সাহিত্যিক হতেন না। সুতরাং সত্য-ভিত্তিক নাট্য-সাহিত্যের মূল উপজীব্য সমাজ-সত্য। সে সত্য দেশের ও সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে আহরণ করতে হবে। স্বভাবতই সমকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও সমস্যাতে বাদ দিয়ে কোন নাটক রচিত হ'তে পারে না। আজকের রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণ-কামনার উদ্দেশ্যে পরিচালিত, তখন রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি এক ও অখণ্ড। অতএব চলমান সমাজনীতি অথবা রাষ্ট্রনীতিকে উপেক্ষা ক'রে কোন সাহিত্য রচিত হতে পারে না, নাটক ত' নয়ই।

কিন্তু সাধারণভাবে রাজনীতি-আশ্রয়ী নাটক প্রচারধর্মী বলে চিহ্নিত এবং রসপিপাসুদের দৃষ্টিতে অপাঙক্তেয় ব'লে স্বীকৃত। এর কারণ কি? কারণ নাটক বা রাজনীতি কোনটিরই সঙ্গাগত অর্থে এর বিচার হয় না।

প্রথম কথা নাটক কি? নিঃসন্দেহে শিল্পসৃষ্টি, রসোত্তীর্ণতা যার প্রধানতম উপাদান। সাধারণভাবে আমরা নাটককে পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে ভাগে ক'রে থাকি। ইংরেজীতে একে বলে “five ‘C’s” : “contast,” “contradiction,” “conflict,” “climax” “culmination”। ছোটবড় সূক্ষ্ম অথবা স্থূল যে আকারেই হ'ক, এই কয়টি স্তর অতিক্রম ক'রে নাটককে রসসৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছতে হয়। অর্থাৎ সংঘাত দিয়ে নাটকের শুরু, সত্য পরিণতিতে তার সমাপ্তি। একটা সত্যকে ধ্রুবতারার মতো স্থিরলক্ষ্য করে নাটককে এগোতে হবে বিভিন্ন ব্যঙ্গনার স্তর পেরিয়ে। সে সত্য নিশ্চয়ই সমাজ-সত্য। যে সংঘাত দিয়ে নাটকের শুরু, সে সংঘাত নিশ্চয়ই মানুষের দেহের অথবা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল জাতীয় ঐতিহ্য-বিরোধী

“সর্বকালের জন্য প্রস্তাবিত এই বিলে পুলিশ ও জেলাশাসক প্রমুখ সরকারী কর্মচারীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে শেক্সপীয়ার থেকে শুরু করে মাইকেল-দীনবন্ধু-গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর নাট্যকারগণের সকল নাটকের অভিনয়ভাগ্য এবং হরণ করা হয়েছে যাত্রাদল থেকে শুরু করে প্রতিটি পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যসংস্থার অভিনয়-স্বাধিকার।”

—গল্পথ রায়

(সভাপতি সারা বাংলা পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা-সম্মেলন)

মনের সংঘাত এবং মানুষ সমাজছাড়া নয়। সংঘাত-সৃষ্টির প্রয়োজনেই নাটকে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী চরিত্রের সৃষ্টি করতে হয়। পাঁচ ভাইই যুধিষ্ঠির হ'লে নাটক হয় না। ভীম, অর্জুনও থাকা চাই, আবার বৃহত্তর সংঘর্ষের প্রয়োজনে দুর্ঘোধন, দুঃশাসনকেও জন্ম নিতে হবে। বিপরীতধর্মী চরিত্রকটি সকলেই নিশ্চয়ই সামাজিক জীব, তাদের সংঘাতের ফলে সংঘর্ষ অবশ্যস্তাবী এবং সংঘর্ষের চরমসংকটের মধ্যদিয়ে চরিত্রগুলির (এক বা একাধিক) যে শাস্ত সত্যোপলব্ধি সেইখানেই নাটকের পরিণতি। এখন সত্য অর্থে সমাজ-সত্য—একথা আগেই বলেছি, কিন্তু সত্য শব্দটারও ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

সত্য স্থির, সত্য এক, সত্য ধ্রুব—এসব কথা আমরা বহু শুনেছি এবং আলোচনা করেছি। কিন্তু কথাগুলো বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ সত্য বদলায় সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। সত্য বদলায় যুগে যুগে, বদলায় সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এককালে মানুষের বিশ্বাস ছিল সূর্যটা পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে—সেদিন সেইটাই ছিল সত্য, আজ তা সত্য নয়। ঠিক তেমনই “স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক” জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক—এইটাই ছিল গত দু’দশক আগেরও সত্য। আজ সে সত্যে ফাটল ধরেছে, আরও দু’দশক পরে সে সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, তথা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সমাজ-সত্যের মূল্যায়ন হচ্ছে যুগে যুগে এবং এ তিনটি পরস্পরের পরিপূরক। সমাজ, তার অর্থনীতি এবং তাকে পরিচালনা করার জ্ঞান যে রাষ্ট্রনীতি সব মিলিয়েই আমরা বলি রাজনীতি। এ রাজনীতি বাদ দিয়ে কোন নাটক রচিত হতে পারে না।

কিন্তু তা হ’লে নাটকে রাজনীতি নিয়ে এত বাগবিতণ্ডা কেন? কারণ রাজনীতির অর্থ আমরা করি কোন দলীয় নীতি বা কোন বিশেষ মতাদর্শ এবং নাটককে করি তার প্রচারের মাধ্যম। Every art is propaganda but every propaganda is not art. প্রচার যখন শিল্প হয়ে ওঠে তখন সেটা প্রচার থাকে না, হয় প্রকাশ। চণ্ডীদাস পদাবলী কীর্তনে কৃষ্ণলীলারই প্রচার করেছেন, কিন্তু ব্যঙ্গনার গুণে, ভাবের গভীরতায় তার প্রচারের কালিমা মুছে দিয়ে তাকে করেছে কাব্য। কোথায় প্রচার নেই? ইলিয়াড, ওডেসী থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ সবাই ত বিভিন্ন সত্যের প্রচার করে গেছেন। তবু প্রচারের খড়ের কাঠামো মাটির মায়ায় মেজেছেন, রংয়ের তুলিতে অপক্লপ করেছেন, রসের প্লাবনে স্নান করিয়েছেন। তাই ত’ তারা আজ যুগজয়ী জগৎজয়ী প্রতিমা। সত্যাত্মীয় রসোত্তীর্ণ নাটক রাজনীতিকে বাদ দিয়ে রচিত হয় না, হ’তে পারে না।

‘বেঙ্গল’এর বই কিনুন, পড়ুন, উপহার দিন কারণ.....

‘বেঙ্গল’এর বই মানেই

শ্রেষ্ঠ অষ্টার সার্বক সৃষ্টি !!

রাজনীতি ও নাট্যাঙ্গি

দেবব্রত স্মরণোধুরী

সাহিত্য ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে বিসম্বাদ রুশবিপ্লবের মধ্য থেকেই সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তার আগে এ বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা কখনও দেখা দেয়নি—সাহিত্যিকরাও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কমিউনিজমের প্রবক্তারা উপলব্ধি করেন যে মাহুষের সম্পূর্ণ সত্তার ওপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে সম্পূর্ণ মাহুষকে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজনমত নিয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা রাজনীতি ও অর্থনীতি সামগ্রিক মাহুষের অংশবিশেষ এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। মানব-সত্তার বৃহত্তর অংশ এই দুই নীতিভিত্তিক নয়। শব্দের সঙ্গে শব্দের যোজনা এবং বাক্যের বিস্তারের দ্বারা মনের কোন বিশেষ ভাব-ভঙ্গি প্রক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিকে প্রকাশ করার সঙ্গে রাজনীতি অথবা অর্থনীতির সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। আমি খাই তাই আমি লিখি—এ যুক্তি—হাস্যকর কারণ সব লোকই খায় কিন্তু খুব অল্প লোকই লেখে—ছাগল খায় কিন্তু সে লেখে না। লেখার জন্তে নিখুঁত রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকলেই লেখায় পরিবেশ সৃষ্টি হবে—এ যুক্তিও অপ্রাপ্তমনের যুক্তি কারণ তা হলে মৌমাছি বা পিপড়েদেরই সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি হতো।

মাহুষ ভগবৎ-প্রেরিত জীব—ভগবৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই তার জন্ম এবং ভগবৎ-নির্দেশেই সে ইহলোকে এবম্প্রকার ব্যবহার করে চলেছে, মাহুষ সম্বন্ধে এই ধারণা হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই যায়।

কিন্তু মাহুষ যদি স্বয়ম্ভূ হয় এবং প্রত্যেকটি মাহুষ যদি প্রত্যেকটি মাহুষ থেকে ভিন্নতর হয় তাহলে একথাও স্বতঃসিদ্ধ হয় যে প্রত্যেকটি মাহুষের আচার-আচরণ অদ্বিতীয় হবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি মাহুষের মন যে অনির্বচনীয় অপরিমেয় রহস্যের আধার—এতো সর্বজনবিদিত এবং এই রহস্যের বিস্মিত সৃষ্টিধর্মী মনই তো সাহিত্য-কর্মে অঙ্গিকারী।

স্রষ্টার কাজ এই রহস্যের রূপরসগন্ধকে স্বীয় medium-এর মাধ্যমে মাহুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এর জন্তে চাই মানবসত্তার অথবা আত্মার গহন কাননে স্বচ্ছন্দ্য বিচরণ, স্বচ্ছন্দ্য চয়ন এবং নির্বাচিত পুষ্পগুলির দ্বারা

পুষ্পস্তবক রচনা—যে রচনায় আকৃতি ও প্রকৃতির নির্দেশ থাকবে তার একান্তই নিজস্ব জীবনোপলব্ধি ও রুচি থেকে।

সৃষ্টকর্মের উক্ত তাৎপর্য যারা স্বীকার করবেন তাঁদের কাছে এটা স্বচ্ছ হবে যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে সাহিত্য-সৃষ্টি একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট স্তরায় পাপবিদ্ধ। রাজনীতির লৌহকবচে স্বচ্ছন্দ-বিচরণকারীকে আবদ্ধ করলে হয় তার অপমৃত্যু নয়তো সে হয় কিস্তৃতিকিমাকার।

নাটক সাহিত্য নয় এমন কথা কেউ বলেন নি—যদিচ পঠনযোগ্য বাংলা নাটকের সংখ্যা—কতিপয়। সমাজের কোন বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ধরণের সাহিত্য-রচনা সাহিত্যকর্মে অবগম্য। যথা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপে এবং কিছুপরিমাণে সর্বত্র ফ্যাসী-বিরোধী সাহিত্যকর্ম। যে কর্মের সীমাবদ্ধ মূল্য সম্বন্ধে এবং সেই হেতু তার ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধেও কর্মকর্তারা কোন দুরাশা পোষণ করেন নি। খুব কম ফ্যাসী-বিরোধী সাহিত্যই ফ্যাসী-বিরোধিতা অতিক্রম করেও বিশুদ্ধ সাহিত্যরস পরিবেশনে সক্ষম হয়েছে।

উদারনৈতিক মতবাদ সাহিত্য সম্পর্কেও সম্পূর্ণ উদার। তাঁদের এমন কেউ কোন দাবী করেছেন বলে জানা নেই যে সাহিত্য উদারনৈতিক রাজনীতি বা অর্থনীতির স্বপক্ষে সৃষ্ট হওয়া উচিত।

শুধুমাত্র কমিউনিষ্ট মতবাদ ক্রশবিপ্লবের কাল থেকে এই দাবী জানাচ্ছে যে সাহিত্যকে হতে হবে Realist আর “Realism” হচ্ছে—class struggle এবং সমাজের Socialist বা Communist গঠনকর্ম। কমিউনিষ্ট দর্শনই মাল্লুসের একমাত্র জীবনদর্শন স্তরায় সাহিত্যিক এতদ্ব্যতিত যা সৃষ্টি করবেন তাই হবে অবাস্তব।

আমাদের নাট্যজগতে কিছুকাল যাবৎ এ জাতীয় মনোভাবের অল্পপ্রবেশ ঘটেছে—শুধু অল্পপ্রবেশ বললে অল্প বলা হবে—বস্তুত এ ধরণের মনোভাবের রীতিমত অত্যাচার বলেছে বলেই ঠিক হয়।

নাটকে রাজনীতি নিশ্চিতই থাকতে পারে। অর্থনীতিও সমধিক ভাবে স্থান পেতে পারে। এমনকি ঐ দুই নীতির যে কোন একটিকে ভিত্তি করে নিশ্চিতই নাটক রচনা করা যেতে পারে। তবে উক্ত নীতি ব্যতিরেকে নাটক রচনা করা অসার্থক হবে এমনতর দাবী করা বাতুলতা বলেই মনে হয়। নীলদর্পণে নীলকুঠিয়ালদের ওপর ঘৃণা ও নীলচাষীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার অল্পপ্রেরণা সৃষ্টি করা সার্থক হয়েছে—তেমনি সধবার একাদশীতে মৃত্যুপান ও বেণ্ডাসক্তির পাপ সম্বন্ধে স্বচেতনতার সঞ্চার করা

সার্থক হয়েছে—যেমন হয়েছে ইবসেনের Ghostএ যৌনরোগজনিত সর্বনাশ সম্বন্ধে বা Pillars of the Society-তে সমাজে ক্ষমতার গুণ্যতা সম্বন্ধে—Shaw-এর Arms and the Manএ যুদ্ধের অসারতা সম্বন্ধে তেমন Camus Calligla নাটকে নিয়তম মানবসম্পর্কও আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধে।

কিন্তু এঁদের এমন কেউ দাবী করেননি যে কোন একটি বিশেষ মতবাদ আশ্রয় না করলে সমাজ বা ব্যক্তিমনের গ্লানিগুলি দূরীকরণ সম্ভব নয়। একথাও তাঁরা কেউ বলেননি যে মনুষ্য-সমাজ বর্তমানে যে পথে চলে তাই সমর্থনযোগ্য—সুতরাং তার পরিবর্তন নিস্প্রয়োজন। তাঁরা শুধু মাহুষের এবং মাহুষকে কেন্দ্র করে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে এবং চিরাচরিত দৃষ্টিতে ভুজের রহস্যগুলির বিচিত্র গতি-প্রকৃতিকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। গোটা মাহুষ এবং তার সমাজকে নিয়ে যখন তাঁরা লিপ্ত তখন নিশ্চিতই মাহুষের সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ড তাতে স্থান পাবে এবং রাজনীতি সে ক্রিয়াকাণ্ড-বহির্ভূত নয়। তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কখনও সেখানে রাজনীতি অধিকতর মাথাচাড়া দিয়েছে কখনও বা অগ্রসর। কিন্তু কখনই তা সাহিত্যশিল্পকর্মের ‘নিরপেক্ষতার’ দর্শন বিচ্যুত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নিশ্চিতই একদিক থেকে রাজনৈতিক নাটক—। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নাগপাশে আবদ্ধ রাজার মুক্ত আকাশের জগ্রে আকৃতির অন্তর্দ্বন্দ্বের যে রূপ নাট্যকারের অপূর্ব শিল্পকর্মের স্বয়মায় মগ্নিত, তা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের ইঙ্গিত দেয় না। তাই এ নাটক দেশ ও কালকে অতিক্রম করে চলেছে।

বিপদ হচ্ছে সেইখানে যেখানে নাট্যকার বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শনধারী। সাহিত্যিক যখন নিজের দর্শনশক্তিকে মূলতুবি রেখে অথবা কোন এক বা একাধিক দার্শনিকের চোখ দিয়ে জগৎকে দেখেন তখনই হয় বিভ্রাট। তা না হয় “ঘরকা, না পরকা”। নিজের দর্শনশক্তিকে তীক্ষ্ণ করার জগ্রে সাহিত্যিক নিশ্চিতই সর্বপ্রকার দর্শনে সাধ্যমত পরিক্রমণ করবেন—কিন্তু তা একমাত্র নিজের দর্শনশক্তিকেই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করার জগ্রে—নিজের চোখকে অন্ধকারে রেখে অন্ধের চোখ দিয়ে দেখবার জগ্রে নয়। এ পোড়া বাংলা দেশে সে অল্পশীলন-স্পৃহা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে এখন, অন্তত নাট্যজগতে তা আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন-ষ্টালিন প্রমুখদের লেখা থেকে স্বচ্ছন্দে অপহৃত “লাইনের” বাংলা অল্পবাদ (বেশির ভাগই বিকৃত) বহু রচনায় স্থানে-অস্থানে ছড়িয়ে আছে।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক নাট্যকার Harley Granville Barker সম্বন্ধে Margery M. Morgan লিখছেন—“...Barker was sensitive to the deepest currents of feeling in his age and had a *more than intellectual* grasp of traditional Political philosophy.”

তঁার নাটকগুলিতে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন বর্তমান জগতের জন্তে সত্যিকারের রাজনৈতিক নায়ক—ফলে তৎকালীন (১৮৯০—১৯২০) সমাজ-চেতনার বিভিন্ন স্তর তঁার নাটকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তঁার সৃষ্ট চরিত্র অস্থির হয়ে বলে উঠেছে—

“Let it (nature) slack ! The way men allow Nature to befool them into swinging the Pendulum...they’ve no other notion...between getting babies born and starting wars to destroy the surplus !”

তিনি নিজেও বলেছেন—“it was as nice as could be. But it grew that sometimes I’d sit there wishing the end of the world would come just for a change.”

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কোনো রাজনৈতিক ফতোয়া জারী না করে তঁার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে বলেছেন :

“If we can’t love the bad as well as the beautiful...if we won’t share it all out now...fresh air and art...and dirt and sin...then we good and clever people are costing the world too much.” এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে এ বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনা সম্ভব নয়। আমার আশঙ্কা আছে হয়তো এ নিবন্ধ বহু আলোচনার সূত্রপাত করবে। তার বেশিরভাগই হবে নিবন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে তার স্বপক্ষে। নিবন্ধের সীমাবদ্ধতার জন্তে যথাবিহিত যুক্তি ও প্রমাণ উল্লেখের অভাব।

যাই হোক—আমার বক্তব্য হচ্ছে রাজনীতি যখন উপগ্রাস, ছোটগল্প এমনকি কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে তখনই নাটকেরও বিষয়বস্তু হতে পারে—হয়েছে এবং হবে। কিন্তু প্রকারান্তরেও তা বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শনের বাহক হবে না। সৃষ্টিকর্মে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন সৌন্দর্য-সৃষ্টিই হবে তার একমাত্র লক্ষ্য।

নাটক ও জীবনবোধের বিবর্তন

বিভূতি মুখোপাধ্যায়

আজকের নাটকের বিষয়বস্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কালে আমাদের সাহিত্য যে কৃত্রিম ক্লাসিক পর্বের অল্পবৃদ্ধি ঘটেছিল তার মধ্যে, অথবা সামাজিক নাটকের নামে রচিত স্থূল গ্রহসন-পঞ্চরঙের রূপাবরণে, কিম্বা নগর কলকাতার কতিপয় মধ্যবিত্ত জীবনের কথাকাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাবৎ মাল্লবের চলমান জীবনছন্দের স্ব্থ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার তরঙ্গ-বিক্ষেপে ছলতে ছলতে আজকের নাট্যসাহিত্য প্রাণসঞ্চিত হয়ে চলেছে ক্রমপরিপূর্ণতার দিকে। এই যে সমাজ-জীবনের সার্বিক কল্যাণবোধ একে রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি যাই বলি না কেন, এটাই নাটক তথা অন্ত্যন্ত শিল্প-কর্মের নিয়ন্তা-শক্তি।

আজকের নাটকের জীবনবোধ কেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেই আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই এই বোধের ক্রমিক বিবর্তনের কথাটাও তাই এসে পড়ে। বিধাতা মাল্লবকে বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ে বিভাগ করে সৃষ্টি করেননি। সমাজ-শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে মাল্লব নিজেকে ভাগ করে নিয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে, আর স্বভাবতই শক্তি আর মর্যাদার ভাগবন্টনে কেউ হয়েছে লাভবান, আবার কেউ বা পড়েছে অবহেলার অতলান্ত অন্ধকারে। ঊনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যে এই অবজ্ঞাত মাল্লব প্রায় অবহেলিতই ছিল দেখতে পাই। তখন হয় গতানুগতিক পৌরাণিক জীবনচিত্র, নয়ত বা কতিপয় নগরবাসী শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত মাল্লবের জীবন-কথাই ছিল নাটকের প্রধান উপজীব্য। সাধারণ শ্রেণীর কথা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তাদের মঞ্চাবতরণ ছিল প্রধানতঃ এবং প্রায়ক্ষেত্রেই হাশ্বরস-বিতরণের উদ্দেশ্যে। অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটকের কথা ছিল স্বতন্ত্র; কিন্তু এর ধারা-প্রবাহ যে বেশ কিছুদিন বাংলা নাটককে প্রভাবিত করতে পারেনি, সে কথা কারুরই অজানা নয়।

যুগ পেরুল। দৃষ্টি বদলাল। সামাজিক আর অর্থনৈতিক জীবনে হয়ে গেল একটা বড়রকমের ওলোট-পালোট। ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্ঘম অত্যাচারে হিন্নভিন্ন জীবন খুঁজে পেল সামগ্রিক মাল্লবের সংহতির মধ্যদিয়ে

তার সার্থকতার পথ। সংগ্রাম শুরু হলো সমগ্র জাতির বণিক-স্বার্থের বিরুদ্ধে। আর এই আন্দোলন চরম রূপ পেল বিয়াল্লিশের তটনীয়। সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল, কৃত্রিম ক্লাসিক পর্বের অল্পবৃদ্ধি অথবা রোমান্টিক কল্পনা-বিলাসিতার পথ পরিত্যাগ করে আমাদের নাট্যদৃষ্টি বস্তবমুখী হলো, তাবৎ মানুষের ব্যথা-বেদনার নব মূল্যায়নের মধ্যদিয়ে সে সার্থক করতে চাইল নিজেকে। এটাই হলো নবনাট্যের কাল। অর্থাৎ নাট্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকের নবলব্ধ জ্ঞান-চৈতন্তের নবতর প্রকাশ-মুহূর্ত।

একটু গভীরে অন্বেষণ করলেই বোঝা যাবে, যে, এই চেতনা এসেছে জীবনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চক্রাবর্তের উত্থান-পতনের ছোট বড় নানা তরঙ্গের দোলায় ঢুলতে ঢুলতে। আর শুধু বিগত দুই শতাব্দীর সাহিত্যের বেলাতেই কেবল কথাটা প্রযোজ্য নয়, আবহমান কাল ধরেই এই সব নীতি-নিয়ম সাহিত্যিকের জীবনবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। কেননা জীবনবোধটা রাজনীতি-সমাজনীতি-বিগর্হিত কোন নিরালম্ব বস্তু নয়। 'ভূমা' নয় 'ভূমি' হলো প্রধান আকর্ষণ। সমাজশাসনে যখন যে ভাবে, যে নীতির প্রতি মানুষ আহুগত্য দেখিয়েছে তার শিল্পসৃষ্টিতেও তখন সেই ভাবে সেই নীতির প্রতিভাসন হয়েছে। তাবৎ মানবজীবনের দুঃখ-সুখের এই লীলা সাহিত্যকে করেছে প্রাণবন্ত। একক আনন্দলাভের জ্ঞান সাহিত্য নয়। ব্রহ্মস্বাদ আর সাহিত্যস্বাদে তফাৎ আছে। ব্রহ্মস্বাদ অথও জীবনের রসঘন অমৃতস্বরূপ, আর সাহিত্য জীবন-মহনজাত বিষামৃত।

সাহিত্যচেতনা আর 'ব্রহ্মচেতনা' তাই এক কথা নয়। সবকিছুর বাইরে আবার সবকিছুর ভিতরে ওতপ্রোত বিজড়িত সেই ব্রহ্মের কথা যিনি জেনেছেন, তাঁর সাহিত্যরচনার বাসনা থাকে না। কেননা ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবনে আছে সংঘাতহীন অপার অমৃতলোকের আনন্দ-নিবিড় তময়তার আশ্বাদ। এক কথায় নির্বিকল্প সমাধি। ব্রহ্মজ্ঞানী স্বর্ষির পক্ষে কি আবার বানপ্রস্থ থেকে প্রত্যাবর্তন করে পুত্রকলত্র নিয়ে সংসার সাজিয়ে বসা সম্ভব, না স্বাভাবিক। অতীতকে সাহিত্যের মূল কথাটা হলো জীবনের সংঘাত। ত্যাগ নয়, জীবনকে তার বিভিন্ন colour আর shadesকে, আপন অল্পভূতি আর প্রগাঢ় আবেগ মিশিয়ে ভোগ করতে চেয়েছেন শিল্পী। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অথও জীবনশ্রোত, তত্ত্বগতভাবে সেই life force বা elan vital-এর স্বরূপ-অন্বেষণ দার্শনিক আনন্দিত, কিন্তু শিল্পীর কাছে

অথও মণ্ডলাকারের স্বরূপ নয়, তার দৈনন্দিন চলতার মধ্যে যে নিত্যনূতন লীলার বৃহদ, শত বর্ণবিচ্ছুরিত যে রামধনু বর্ণালী, তার আকর্ষণই সর্বাধিক। সাহিত্যের উপজীব্য হলো তাই। ভোগবাসনাকে আরো নিবিড়, আরো প্রগাঢ় করবার জন্তই শিল্পী সৃষ্টি করেছেন আর এক দ্বিতীয় জগৎ। যেখানে তিনি স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতিস্পর্ধী। সাহিত্যের মধ্যে তাই যে জীবনের রূপরসরঙের জয়গান দেখি, তা হলো অথও জীবনশ্রোতের একটি খণ্ডাংশ, মানুষের মধ্যেই কেবল বিদ্যুত। আর আমরা আগেই বলেছি যে, এই জীবনচৈতন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে মানবসমাজের নিয়ত পরিবর্তনশীল নীতি-নিয়মের মাধ্যমে।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের শিল্পকলায় স্তম্ভের চেয়ে বিস্ময় আর ভীতির পরিচয়ই বেশী। অথচ প্রকৃতিতে যে তখন স্তম্ভের মোহনীয় রূপটি ছিল না তা নয়। আসলে প্রকৃতির সেই মোহনীয় সৌন্দর্যস্বপ্নমা উপভোগ করার অবসর মানুষের ছিল না, কেননা নানা বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেই তাদের আপন অস্তিত্ব তখন টিকিয়ে রাখতে হয়েছে।

আবার যখন যাযাবর মানুষ একটু স্থিতিশীল করতে পেরেছে নিজেকে—সমাজ গড়েছে, সম্পত্তি করেছে, তখন জীবনের মানেও তাঁর কাছে গেছে পরিবর্তিত হয়ে। জীবনবোধের এই রূপান্তরের ইতিহাসটাই হলো তার সাহিত্যের ইতিহাস, কেননা যুগে যুগে এই পরিবর্তনের ছবিটিই মানুষের সাহিত্যে প্রতিভাসিত।

একদিন যখন মানুষ রাজশক্তিকে সমাজ-সংহতির সর্বপ্রধান রক্ষাকর্তা বলে মেনে নিয়েছিল, তখন সেই রাজাকেই ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিভূ বলে মেনে নিয়ে তাঁর জয়গান গেয়েছে সাহিত্যে। কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুন্তলম্” কি ট্রাজিডী হতে পারতো না? ঐশ্বর্যগর্ভী এবং কামনা-লুপ্ত রাজা দুষ্মন্তর ভোগবাসনার চরম রূপটি কি আশ্রমবালা শকুন্তলার সঙ্কল্প নিয়তির মধ্য দিয়ে দেখান যেত না? কিন্তু হলো না কেন? কেন দুষ্মন্তকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ভাসার অভিশাপের প্রয়োজন হলো মহাকবির? তার কারণ দুষ্মন্ত ঈশ্বরের প্রতিভূ। তাঁর সভার নবরত্নের এক রত্নের, তাঁরই ব্যভিচারের সমালোচনা করার অধিকার এবং স্পৃহা কোনটাই ছিল না।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাবো, যে সেই আদিযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমাজবোধের বিভিন্ন ধ্যানধারণার সংঘাতটাই তার মধ্যে স্পষ্ট। চর্যাপদের সন্ধ্যা ভাষা নিগূঢ়

তত্ত্বসাধনার প্রচ্ছন্ন পারিভাষিক অর্থে যতই কুহেলিকাচ্ছন্ন হোক না কেন, নিরন্ন দরিদ্র মানবসমাজের দুঃখ-বেদনার কাহিনীটিই তার বহিরঙ্গ রূপাবরণের প্রধানতম অলঙ্কার। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলি দেবদেবীর জয়গান নয় শুধু, রাজা বা জমিদারের অত্যাচারে অবক্ষয়িত সমাজ-জীবনের ট্রাজিডীই তার প্রতি ছত্রে রূপায়িত। ‘ফুল্লরার’ বারমাস্ত্রা ব্যাধ-জীবনের অবহেলার প্রতিই স্মৃতির প্রতিবাদ। স্বয়ং কবি কল্পণের জীবনগাথাও তারই সন্নিবেশিত প্রতিচ্ছবি। আমাদের লোকসাহিত্যে যে অপরিপূর্ণ প্রেমাকাজক্ষার ট্রাজিডী, তার কারণ অল্পসন্ধান করেছেন কবি কাজীর অত্যাচার আর সমাজের বর্ণ-বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে। মহয়া-মলুয়ার প্রণয়-বেপথু হৃদয়বেগের যে কল্পণ পরিণতি তা নবাব অলুচরের স্বার্থপরতা এবং কামলোলূপতারই বিষাক্ত ফল। “লীলা-কঙ্কের” প্রতি ছত্রে সমাজের বর্ণ-বৈষম্যের ট্রাজিডীই প্রতিভাসন। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে, রায়প্রসাদের গানে দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষেরই জয়গান। গোড়ীয় শুদ্ধাভক্তির পুণ্যময় রসোদগাতা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনগাথায় কি কাজীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোর করে সংকীর্ণনের মিছিল বার করে সমাজ-জীবনকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার কাহিনী নেই?

তারপর এলো ইংরেজরা। আমাদের জীবনবোধে দেখা দিল আর এক পরিবর্তন। বণিক-শক্তির কূটস্বার্থপরতায় আমাদের সামাজিক সংহতি যখন একান্তভাবে বিপর্যস্ত, তখন একক শক্তির প্রতি আস্থা হারিয়ে আমরা সংহত হবার সাধনায় মগ্ন হলাম। শুরু হল রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সজ্জবদ্ধ অভিযান। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সামাজিক সংহতি পুনর্গঠিত করে, আমরা প্রাগ্রসরিত হলাম স্বাধীনতার পথে। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ মদমস্ত্র ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে জানাল প্রতিবাদ। সামাজিক বাধা-বিপত্তি আর কুসংস্কার চূর্ণ করে সংহত সংগ্রামের আহ্বান জানাল অচলায়তন মুক্তধারা। দাদাঠাকুর আর ধনঞ্জয় বৈরাগীতে পেলাম গান্ধীজীর প্রতিচ্ছবি।

সামগ্রিকভাবে সংহত সমাজবোধের কল্যাণ-কামনাতেই মানুষের জীবন-নীতি প্রতিনিয়ত এক সত্য থেকে আর এক সত্যের পথে এগিয়ে চলেছে। এই জীবনবোধকে যদি রাজনীতি বা আধুনিক পরিভাষায় রাষ্ট্রনীতি বলি, তবে তার প্রতিফলন সাহিত্যে অবশ্যজ্ঞাবী। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল দেশের সাহিত্যেই তাই হয়ে আসছে। Art for art's sake-এর নীতিতে আজ কেউ বিশ্বাসী নয়। এবং যখন ছিল তখনও সঠিকভাবে মানবজীবনের নীতি ও পরিণতির কথাটা সাহিত্যে যে আসে নি, তাও নয়।

তবে একটা কথা মনে রাখার দরকার তা হলো এই যে, ismএ ismএ লড়াই সাহিত্যের আসরের যোগ্য বস্তু নয়; সেটা প্রচারের ক্ষেত্র। আর সাহিত্য কখনই কবিগানের আসর নয়। জীবনকে স্বস্থ, স্বন্দর, ভোগ্য করে তোলার স্পৃহাই তার মধ্যে বলবতী। সত্য শিব এবং স্বন্দরের প্রকাশ, সামাজিক সংহতি এবং নিরাপত্তার মধ্যেই বর্তমান। সাহিত্যকে প্রচারের মাধ্যম করে তুললে সে প্রকাশ কল্পনাতেই থেকে যাবে।

॥ শিশু ও কিশোরদের জন্য 'বেঙ্গল'এর স্মরণীয় সাহিত্য-সম্ভার ॥

অমরেন্দ্রকুমার সেনের বাণভট্টের
ডাকটিকিট ১'২৫ ॥ **লালুভুলু** (৩য় মুদ্রণ) ৩'০০ ॥
 চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর (জরাসন্ধ) গোপাল ভৌমিকের
রং চং এক টাকা ॥ **জুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী** (২য় মুঃ) ১'২৫ ॥
 তেজেশচন্দ্র সেনের দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের
হারানো ছেলে ১'২৫ ॥ **পৃথিবীর ইতিহাস** (১ম খণ্ড) ৮'০০ ॥

গোপাল হালদার-সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' গ্রন্থমালা :

জনমাটিপাহাড়, জনসঙ্গম, অতীত ইতিহাস প্রত্যেকটি দু'টাকা ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের তারাপদ রাহার
চরগিক তিন টাকা ॥ **রক্তধুলির পথ-বিপথে** ১'২৫
 রেবতীভূষণ ঘোষের নমিতা বসুর
সবুজ টিয়া ০'৭৫ ॥ **পিকনিক** দু'টাকা ॥
 কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের চিরঞ্জীব বিশ্বাসের
মানুষ এলো ১'২৫ ॥ **ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ** ১'৫০ ॥
 দেবদাশ দাশগুপ্তের
পরভূত প্রকৃতি (২য় মুঃ) ১'০০ ॥ **আকাশের কথা** **প্রাণের কথা**
 (রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত) ০'৭৫ ॥ **এক টাকা ॥**

অভিজিতির আনন্দ ঘোষের
মাটির বন্দী ০'৫০ ॥ **কাপড়ের কথা** ০'৬২ ॥
 ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের আশা দেবীর
এবংপুরের টিকটিকি ১'০০ ॥ **সুগতি নদীর ঢেউ** (৪র্থ মুঃ) ১'০০ ॥
 বিক্রমাদিত্যের শৈল চক্রবর্তীর
খুলী দরওয়াজা (২য় মুঃ) ১'৭৫ ॥ **ম্যাও ম্যাও** (৩য় মুঃ) ০'৭৫ ॥

ননীগোপাল গোস্বামীর

নবে মিলি করি কাজ * **ঠাকুরের কথা ও বাণী** * **আমাদের উৎসব**
 ১'২৫ ॥ ১'৫০ ॥ ১'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা : বাবোরা

নাটক আর মানুষ

কিরণ মৈত্র

কি লিখব ?

যেমন করে লিখতে পারলে মনে হতে পারে লেখাটা বেশ জ্ঞানগর্ভ হয়েছে তেমন ক্ষমতা আমার নেই।

নাটক লিখেছি। পড়েছি। নাটক নিয়ে ভেবেছি। কিন্তু সে সম্পর্কে রায় দেবার প্রয়োজনও খুব কম বোধ করেছি।

তাই ভাবছি কি লিখব ?

কি লিখব এই কথাটাই মনে যখন তোলপাড় করছে, তখনই আর একটা কথা মনে এল। কেন লিখব ?

বিধাতা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। নতুন নতুন সৃষ্টির লীলা এখনও চলেছে। তাঁর সৃষ্টির সবটাই যে আমাদের মনে ধরেছে তা মনে করার কারণ দেখি নে। বেশী জলে বিরক্ত হয়েছি। বেশী রোদে তেতে উঠেছি। গাল পেড়েছি বিধাতার নামে।

তাতে বিধাতার কিছু যায় আসে ?

তিনি কি স্বর্গ থেকে নেমে তাঁর কাজের কৈফিয়ৎ দিতে আসছেন, না কোনদিন অমসবেন ? যখন যেমন ইচ্ছে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সাজিয়ে চলেছেন নিরন্তর। তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত প্রতিবাদলিপি নিরন্তরই থেকেছে। থাকবেও।

কারণ তিনি জানেন, তিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেই তিনি খালাস। এমনটি কেন করলেন ? এমনটি কেন হচ্ছে ? ইত্যাদি জবাবদিহি নিজে করতে বসেন না।

নাট্যকার বিধাতা নয়। কিন্তু বিধাতার মতই সৃষ্টিধর। আমার তো মনে হয় বিধাতার মতই নাট্যকারের কাজ সৃষ্টি করা, আর কিছু নয়।

অনেকে বলে নাটক নাকি যৌথ শিল্প। হতে পারে হয়তো। প্রযোজনার সময় হয়তো তা যৌথ শিল্প। কিন্তু যখন লেখা হয় তখন সেটা কার ? নাট্যকারের। সম্পূর্ণভাবে নাট্যকারের।

নাট্যকারের চিন্তা আর ভাবনার রাজ্যে কে থাকে তখন ? কার আসন সবার আগে পাতা !

মাহুষ ! মাহুষ !! মাহুষ !!!

কোন মাহুষ !

যে মাহুষ হাজারো সমাজচিত্তায় মাথা ভার করে আছে ? যে মাহুষ রাষ্ট্রচেতনায় জর্জরিত ?

না, সেই মাহুষ যে ছোটোখাটো স্বথ-দুঃখ নিয়ে বাস করছে, প্রেম, প্রীতি-ভালোবাসায় নিজেকে বেঁধেছে। প্রতিহিংসা আর ক্রোধে, শাস্তি আর অশাস্তিতে, জলছে, নিভছে। দারিদ্র্যের ভারে কাঁদছে কখনও, কখনও হাসছে সুখের সন্ধানে। নিজের ছোট্ট বৃত্তের মধ্যে নিরন্তর যে ঘুরপাক খাচ্ছে। পড়ছে।

উঠছে। মরছে। বাঁচছে।

রায়টা বোধ হয় শেষের দলেই যাওয়া ভালো।

রচনার সার্থকতা নির্ভর করে কতটা গভীরভাবে তার ভাবনাগুলো ধরতে পারি। কতটা অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তার স্বথ-দুঃখকে নিজের করে পরের কাছে বিলোতে পারি। তার চোখের জল আর মুখের হাসির সঙ্গে নিজের চোখের জল আর মুখের হাসির কতটা মিল স্বরাতে পারি। কতটা পারি তার অকারণ আচরণকে স কারণ করতে।

তা যদি পারি তাহলে দেখব সে মাহুষের সঙ্গে হাজার মাহুষের মিল রয়েছে। ছোট্ট পরিবারের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে সমাজে তার পা শড়েছে। রাষ্ট্রের চিন্তাও বুঝি ঠাই পেয়েছে সেইখানে।

নাটকের ক্ষেত্রে গোল বেঁধেছে সেইখানেই। আমরা যারা নাটক লিখছি সহজ কথাটি সোজাভাবে বলতে আমরা যেন ভুলতে বসেছি। নিজের চিন্তা, ভাবনা, বিশ্বাস, প্রত্যয়ে যে জটিলতা এসেছে, সেই জটিলতাই প্রতিফলন ঘটচ্ছি নাটকে।

কলম ধরেই মন চায় আমার জ্ঞানবৃক্ষে নাটকরূপী ফলটা ঝুলিয়ে দি। গল্পের শেকড়টা রাষ্ট্রচেতনার মাটিতে প্রোথিত করে দি। চরিত্রের পাতাগুলো সমাজ-সমস্তার বৃন্তে আটকে দি। আমরা বড় বেশি জেনেছি, বুঝছি। এই বোধটা অনর্গল আমার মনে কাজ করে বলে, চরিত্রগুলো নিজের কথা না বলে আমার কথা বলে। কাহিনীটা ভার মত হয়ে আমার মত হয়। শেষ কথাটুকু তার না হয়ে আমার কথা হয়। সবার মাঝেই আমি থাকি। চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা যা কিছু তার স্ততোগুলো আমার হাতে। পুতুলের মত ওরা নাচে। আর নাচে।

এটা ঘটছে তার কারণ যতটা মন দিয়ে আমরা রাষ্ট্রনীতি আর সমাজ-নীতিকে জানতে চেয়েছি, ততটা মন দিয়ে মানুষকে জানতে চাইনি। চিনতে চাইনি। বুঝতে চাইনি। ভালোবাসতে চাইনি।

এক অর্থে আমরা যতটা এ্যাকাডেমিক, ততটা প্র্যাকটিক্যাল নই। যতটা হুজুমবাদী, ততটা হৃদয়বাদী নই। যতটা আদর্শবাদী, ততটা মানবতাবাদী নই।

আমরা মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে, রাষ্ট্রকে দেখছি। দেখছি সমাজ বা রাষ্ট্রের পটভূমিকায় মানুষকে।

ফল দাঁড়িয়েছে মানুষকে আমরা গোটাভাবে পাচ্ছি নে। নাটক পড়ে বা দেখে আবেগে, আনন্দে, বেদনায় বিহ্বল হতে পারছি নে। কোন চরিত্রের চোখের জলে নিজের চোখ ভেজাতে পারি নে। মনে হয় না এদের আমি চিনি। এদের আমি জানি। আমি এদেরই একজন।

আজকের নাটকগুলো রসোত্তীর্ণ হতে পারছে না, যুগোত্তীর্ণতার কোন লক্ষণ তাতে প্রকাশ পেতে পারছে না তার মূল কারণটা বোধহয় এইখানেই রয়ে গিয়েছে।

কথাগুলো নেহাৎই আমার যে মনগড়া নয়, তার প্রমাণ পেলুম সেদিন যখন এক নামী নাট্যকারের নাটক হাতে এসে পড়ল। সুদীর্ঘ ভূমিকায় পৃথিবীর ভাবঞ্জনের বার্তা বহন করেছেন। পড়লে মনে হবে আহা নাট্যকার কী গভীর চিন্তাশীল! জ্ঞানমার্গে তাঁর পদচারণা কত সাবলীল! আহা, কী গভীর সমাজ-সমস্তার কথাই না তিনি নাটকের মধ্যে বলতে চেয়েছেন।

কিন্তু হায়রে! নাটক পেতে সে ভুল আমার ভাঙলো। রেডিমেড ফর্মুলায় দাভব্য হাসপাতালের থরথরে সাজানো বোতল আর লাল নীলের জলের মত নাটকের চরিত্র, সংলাপ, ঘটনা-সংস্থাপনা সেজে বসে আছে।

আপনা থেকেই বিকশিত হতে পারলো না।

নাটকে রাজনীতি করা হচ্ছে, কথাটা বোধহয় এই কারণেই উঠেছে। নইলে মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বলব, তার ব্যথা, বেদনা, বঞ্চনাকে মুখর করব, চাইব মানুষ শোষণমুক্ত হোক, অহেতুক শাসন মুক্ত হোক, মানুষ স্বাধীন হোক, সুন্দর হোক, অন্ধকার থেকে আলোকে তার উত্তরণ ঘটুক এতে আর আপত্তি কিসের? কেনই বা তাতে রাজনীতির গন্ধ পাওয়া যাবে? আর লোকে বললেই তা শুনবো কেন?

আর শুনলেই বা মানবো কেন?

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আজ তা আমাদের মানতে হচ্ছে কারণ আমরা কেউ কেউ ঘোড়ার আগে গাড়ী জুতেছি। জুতছিও। জ্ঞান আর বুদ্ধি দিয়ে নাটককে আমরা বাঁধতে চাইছি।

আর চাইছি বলেই এত কথা উঠছে। উঠুক।

এর দ্বারা আর কিছু প্রমাণ না হোক, একটা কথা অন্ততঃ প্রমাণ হয় নাটক প্রবলভাবে বেঁচে আছে। যে পথে হাঁটতে কবিতা ভয় পেয়েছে, গল্প-উপস্থাপন সম্বন্ধে এড়িয়েছে, নাটক অন্ততঃ সেই সাহসটুকু দেখাতে পেরেছে।

যা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাই দিয়েই শেষ করি। বলি, এই হট্টগোলার সংসারে সমালোচকরা তার আপন উপজীব্য খুঁজে ফিরুক। আমরা যারা নাটক লিখব পণ করেছি, একটু দূরে থেকে নাট্যদেবীর সেবা করে যাই। যাতে তা সুন্দর হয়, সার্থক হয়, মহৎ হয়। কালের ইতিহাসে আমরা বাঁচি আর না বাঁচি।

॥ নানান ধরনের বই ॥

নির্মলকুমার বসুর	মণীন্দ্র রায়ের
নবীন ও প্রাচীন ৪'০০ ॥	খোলা চোখে ২'০০ ॥
মন্মথনাথ রায়ের	রণজিৎ সেনের
আমার দেখা ডেনমার্ক ২'০০ ॥	দৈত্যগঙ্গীত ৪'০০ ॥
রূপদর্শীর	রঞ্জনীর
কথায় কথায় ২য় মুঃ ৩'০০ ॥	বইয়ের বদলে ২য় মুঃ ২'৫০ ॥
শান্তিলাল রায়ের	সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আরাকান ফ্রণ্টে ২'০০ ॥	জাপানী বন্দীশিবিরে ২'৫০ ॥
সোমেন্দ্রনাথ রায়ের	দীপেন রাহার
পৌষ-ফাগুনের পান্না ৩'০০ ॥	কাঁচা মাটি পাকা পথ ৪'০০ ॥
অদিতিমোহন রায়ের	অজিত মুখোপাধ্যায়ের
শিকারের কথা ৫'০০ ॥	অমৃত মন্ডন ৪'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বায়ো

হাতের কুঠার

রবীন্দ্রনাথ

এক এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পঙ্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি; অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অগ্নি প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, গোপুলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি ‘আমার সাধনা কত না নিষ্ফল হবে’। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব—নিদেন আমার দু-চারটি কথা তাঁর অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার ‘সাধনার’ প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় ‘সাধনা’ আমার হাতের কুঠারের মত আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না—এ’কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

—১৮৯৩/৯৫ ফেব্রুয়ারির পত্র,
ছিন্নপত্রাবলী

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

রঞ্জিত সিংহ

চর্চিতচর্ষণ ও স্তাবকের মিলিত নামসংকীর্ণনে ধ্রুপদের ধ্বনিও লুপ্ত হ'তে বসে। ধ্বনি ও কলরব প্রভেদ হারায়, প্রাতিস্মিকতা ও পুচ্ছানুগ্রাহিতা সমার্থক ঠেকে। ফলত ব্রীজসের একচ্ছত্র প্রতাপে যখন হপকিন্সের মত কবিকেও ব্যতিব্যস্ত হ'তে দেখি তখন ভয় হয় অমিয় চক্রবর্তীও না শেষপর্যন্ত তাঁর অলুকারদের ভিড়ে নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য নিরবধি কাল ও বিপুল পৃথ্বীর অমোঘ নিয়মে ব্রীজসের যথেষ্টাচারও শেষপর্যন্ত ধোপে ঢেকে নি। পক্ষান্তরে ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্যের বিভেদ প্রসঙ্গে ফ্রেয়েডীয় মতবাদের পৃষ্ঠপোষক ক'রে হর্বট রীড আমাদের মত স্বল্পশিক্ষিতদের যে অনেক উপকার সেধেছেন তাতে সন্দেহ নেই। না মেনে উপায় থাকে না যে আপ্রাণ চেষ্টায় অলুকারকেরা যেটুকু পারেন সে শুধু সৃষ্টির কয়েকটি চারিত্র্যলক্ষণের চর্চিতচর্ষণ করতে। এবং অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যলক্ষণাদির কিছু কিছু নমুনা সম্বল ক'রে সাম্প্রতিকেরা যখন স্ব স্ব কালবার ফাঁদতে ব্যস্ত তখন অমিয় চক্রবর্তীর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে যতটা না হতাশাবোধ আসে সাম্প্রতিকদের আশুপ্রয়াণের চিন্তায় বুঝি বা ততোধিক বিচলিত বোধ করি। আসলে যে কোনো কবিশঃপ্রার্থীর পক্ষে ক্রোচের বহুআলোচিত প্রস্তাবে অনবধান অতিশয় বিপদজনক। উপরন্তু, ব্যক্তিত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তির ব্যাপার নয়। ফলত যে-কাব্যলক্ষণাদির অংশীদার এই কবিসম্প্রদায়, বাংলায় তারি পারিভাষিক উত্তর 'মুদ্রাদোষ'।

সৌভাগ্যের বিষয়, হপকিন্সের মত অমিয় চক্রবর্তী বন্ধুত্বের বিড়ম্বনায় পড়েন নি ব'লেই যথাসময়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'য়ে রসজ্ঞদের সর্বক ক'রে দিয়েছে যে কোথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কারা তাঁর পুচ্ছানুগ্রাহী। আলোচ্য এই প্রভেদ বোবার মানদণ্ড চেনাতে গিয়ে হর্বট রীড, অর্গানিক ও অ্যাবস্ট্রাক্ট—এই যে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর এবং অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সাম্প্রতিকদের আপেক্ষিকবিচারেই তা ধারণা করা সহজ হয়।

অধিকন্তু, রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় প্রায় এক শতাব্দী ধরে বাঙালী পাঠক ভ্রমার সার্বত্রিকতা সম্পর্কে যে-অবহিতি লাভ করে এসেছেন অমিয় চক্রবর্তী সেই এক প্রসঙ্গ পরিবেশন করেও অদ্ভুতরকমের নতুন। কাব্যচর্চায় যার বিষয় ও বিষয়ীর প্রাতিম্বিক যোগফলকে প্রধান বলে মেনে থাকেন তাঁরা জানেন অমিয় চক্রবর্তীর এই স্বাতন্ত্র্য কত দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি বাস করে রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা হওয়া যেকালে কঠিন ছিল সেখানে রবীন্দ্র-পরিপ্রেক্ষীর আত্মীয় হয়ে এতখানি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা প্রমাণ করে যে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হওয়া টিকে থাকারই সামান্য লক্ষণ অন্ত্যায় প্রমথনাথ বিনোদিত মত আধো আধো পন্থা লিখে রবীন্দ্রভক্তির পরাকাষ্ঠা সাজা সহজ হলেও পাঠকের বিশ্বস্তির অতলে স্থান পেতে বেশী সময় লাগে না। উপরন্তু, পণ্ডিতমূর্খ ও চর্চিতচর্চণের দল চিরকাল স্বতন্ত্র প্রতিভাকে মনে মনে ডরায়। যে-রিপুর বশবর্তী হয়ে ব্রীজেস একদা হপকিন্সের কবিতা চেপে রাখবার অক্ষম প্রচেষ্টায় নেমেছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনুর্ধরেরা কবিতার সংগ্রহ প্রকাশ করে, প্রবন্ধ, সাহিত্যের ইতিহাস লিখে এই তিরিশের যুগের কবিদের লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার পবিত্র কাজে হাত দিয়েছেন। কিন্তু সংসারে দেখা যায় যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ঠকে। ফলত কবিদের ভাগ্যান্বিত্যবাদের ভার সমালোচকের ওপর কদাচ পড়ে না, পড়ে কবিদের স্ব স্ব রচনার গুণাগুণের ওপর। এবং অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাবলী যে তাঁর উত্তরসূরীদের যথেষ্ট ভাবায় তা ইদানীন্তন কবিতাপাঠেই ধরা পড়ে। যাইহোক, স্বতন্ত্র অল্পভূতির তাগিদ নিয়ে অমিয় চক্রবর্তী যে আবির্ভূত তার প্রমাণ পূর্ণতাবোধকে নতুন ভাবানুশঙ্গের মধ্যে তাঁর অল্পভূতি আবিষ্কার করেছে। নতুন প্রযুক্তির স্বাদ ত বটেই, রবীন্দ্রনাথের পরেও এই প্রসঙ্গে আরও নতুন অল্পভূতির উদ্ভাপ অবশিষ্ট থাকতে পারে তা ভাবতেই বড় অবাক লাগে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে বাঙালী কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপঠিত ও অ-আলোচিত কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। এর হেতুসন্ধান দেখা যায় জীবনের অন্ত্যায় ক্ষেত্রের মত এখানেও বাঙালীর ভক্তিবাদী চিন্তাই স্বপ্রধান। এই ভক্তিবাদের অন্ত্যায় দেশদ্রোহী বলে নাম কিনলেও এ কথা সত্যি রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্রে মাল্যদানে বাঙালী এ যাবৎ যতখানি নিষ্ঠা দেখিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ায় ততখানি শ্রম সে স্বীকার করে নি। এর কারণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গানই রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাত মেরেছে। এবং রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ যে তাঁর গান, কবিতা নয় এ ব্যাপারে তিনি নিজেও

নির্দ্বন্দ্ব ছিলেন ব'লে জাপানের শিল্প-বক্তৃতায় তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিও পাওয়া গিয়েছে। বস্তুত, কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি যে সব জড়তা দেখিয়েছিলেন সঙ্গীতের স্বরবিস্তারের সে সমস্তই অতি সহজে কাটিয়ে উঠেছিলেন তিনি। অবশ্য অমিয় চক্রবর্তীর আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এতটা স্থান জোড়ার কারণ হচ্ছে মহাকবি ব'লে জেনেও লোকে কেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ার চেয়ে গান শোনায় মন দিয়েছে তার উত্তর পাওয়া যাবে অমিয় চক্রবর্তীর সাফল্যে। বস্তুত, গতো যে-প্রসঙ্গের স্মৃতির পরিবেশন সম্ভবপর, রবীন্দ্রনাথকে তা নিয়ে যখন দীর্ঘ পথ ফাঁদতে দেখি তখন যে কোন কবিষশঃপ্রার্থীর কাছে এজ্জা পাউণ্ডের সতর্ক বাণী পরম পাথের।

“বৃষ্টি বারে, চৈতন্তের বোধে

আবার আকাশ ভরে রোদে।

তারি জন্ত শিশু আঙিনায়

দৌড়ে খেলে, হাট বসে, গৌরীপুরে জমে ব্যবসায়।”

পক্ষান্তরে গভীর মনোযোগ ও ঐকান্তিক অহুভূতির বলে অমিয় চক্রবর্তী বস্তুবিশ্বের স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই পরমতার অচিন্ত্য মুহূর্তকে আবিষ্কার করেছিলেন। যিনি অনির্বচনীয় তিনি যে সহজ ও সুন্দর— এই কথাটা চকিতে ধরা পড়ে। ‘সর্বভূতান্তরাঙ্গা’—উপনিষদের এই যে বাণী একে অমিয় চক্রবর্তী তাঁর চৈতন্তের বিষয় ক’রে নিতে পেয়েছিলেন। ফলত তাঁর অতদ্র অহুভূতি অণোরনীয়ান থেকে মহতো মহীয়ান পবার মধ্যে আত্মার যে-অস্তিত্বকে আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর প্রমাণ যিনি অবর্ণনীয় অর্থাৎ যিনি ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ, তিনি কত সহজভাবে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই আবিষ্কারই ত কবিতা হ’য়ে উঠেছে। বৃষ্টির চিত্র, রোদের আকাশ, শিশুর খেলা, হাটের ছবি—এ সমস্তই ত সাধারণ ব্যাপার কিন্তু তবু কি এরা অসাধারণ হ’য়ে ওঠে নি! জীবনের একটা মুহূর্তের বর্ণনার ইচ্ছে ছাড়া পাঠকের কাছে আপাতত আর কোনো ধরা-ছোয়ার মধ্যে তিনি যাননি। শব্দের উত্থানপতনময় বন্ধুরতায়, পর্বের স্নগতম বিস্তারে রোদ-বৃষ্টি-শিশু-হাট ইত্যাদি কয়েকটি অসংলগ্ন চিত্র কবির চৈতন্তের মধ্যে এক সমাহার খুঁজে পেয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছেন যিনি অনির্বচনীয়। মুহূর্তের সৌধ গড়ে উঠেছে। যিনি সাহিত্যের খবরাখবর রাখেন তাঁর নিশ্চয়ই জানা আছে যে স্বরীন্দ্রনাথের পাঠক যখন বিবেকীদ্বিধার বিয়োগান্ত পরিণাম দেখে চিত্তশুদ্ধি ঘটান—সেই সময় বিষ্ণু দে-দেখালেন জগৎ ও জীবনের অন্তরালবর্তী

বাঙালীর বহুমুখী জাতীয় জীবনের পবিত্র দলিল

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১ম খণ্ড ॥ ১২'৫০ ॥

বিনয় ঘোষ-কৃত

বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য আকরগ্রন্থ

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৮৪০ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিষয়ানুক্রমিক সন্নিবেশ, বিস্তারিত ভূমিকা, সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত।

উনিশ শতকের অষ্টাশ্র বাংলা পত্রিকা থেকে অমূল্য সংকলন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বর্তমান গ্রন্থ প্রথম খণ্ড। বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনুরাগী বারা এ-বই তাঁদের কাছে চিরন্তন সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আশুতোষ অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার রয়্যাল অক্টোভো সাইজের বই, আর্ট প্লেট ও বোর্ড বাধাইসহ, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্ম মূল্য মাত্র ১২ টা. ৫০ ন. প.।

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

• বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৬'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
সচিত্র সংস্করণ ৫'৫০ ॥

[প্রতীচির মহাকাব্যগুলি থেকে চয়িত অল্পপম কথাসাহিত্য-সংগ্রহ]

AFRICANISM : Rs. 16/-

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

নবগোপাল দাশের

ব্যান ও বন্যা ৩'০০ ॥

এক অধ্যায় (২য় মুঃ) ৩'০০ ॥

অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বসুর

ভারতের চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১টি আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মুঃ) ৪'০০ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর

প্রথমনাথ বিহারী

ইংলণ্ডের ডায়েরী ৪'০০ ॥

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

শৃঙ্গগভতা, জীবনানন্দ মাহুষের গভীরতম অস্থখের কথা বললেন। অমিয় চক্রবর্তী এঁদেরই প্রতিবেশী। ফলে এই দশকের কবিতার সামগ্রীকলক্ষণের সামান্যীকরণে যে-সমালোচক এগোবেন, তিনি শুধু চারপাশ হাতড়েই বেড়াবেন, সহজে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবেন না। কষ্টকল্পনার সাহায্যে অল্প তিনজনের একটা সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করা গেলেও অমিয় চক্রবর্তী এঁদের থেকে সম্পূর্ণ খাপছাড়া। বস্তুত, যখন মাহুষের সর্বাপেক্ষা স্বকুমার অল্পভূতিও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব'লে জানতে শিখছি তখন এ সময়ের 'বিনিময়'-এ অমিয় চক্রবর্তী আমাদের শোনালেন—

“তার বদলে পেলে—

সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর

নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর

আলোয় ভরা জল

ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা

বেগুনী মেঘের ওড়া পাল্টা

ভরল হৃদয়তল—

একলা বুকে সবই মেলে।”

সমস্ত বঞ্চনা ও অবিশ্বাসের পরিবর্তে ফিরে পাই এক পরম বিশ্বাসের মুহূর্ত। প্রতীতি জন্মায়, বিশ্বাসের লগ্নের অবসান ঘটলেও বিশ্বাসের অল্পক্ষ মুত্যাঞ্জয়। স্তব্ধ নীল, স্বচ্ছ পুকুর, লুপ্ত-পড়া ফুলের ডাল, বেগুনী-রংএর মেঘ—এই সব ছবির মধ্যে একদা সংঘটিত এক মধুর লগ্নের অল্পক্ষ জড়িয়ে আছে। তার অবস্থান সমস্ত হৃদয় জুড়ে, স্মৃতির মধ্যে তারা মর্যাদা পেয়েছে।

অধিকন্তু, কবির বিচারে কবির জীবনী টেনে আনার অনৌচিত্য সম্পর্কে যদিও রবীন্দ্রনাথের বাক্যব্যয় বুঝা যায় নি তবু যেটাসের কবিতার কেকিক গোষ্ঠিলির প্রসঙ্গ তলিয়ে দেখতে গেলে যেমন তাঁর জীবনের কয়েকটা ঘটনা জেনে নেওয়া উপকারে আসে, অমিয় চক্রবর্তী প্রায় আজীবন আমেরিকা প্রবাসী সে কথা ঋীর অজ্ঞাত তাঁর কাছে অমিয়বাবুর উচ্চারণ-পদ্ধতি অনেক সময় বিসদৃশ ব'লে ঠেকবে। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা প্রবাসীর স্মৃতিরোমহুক চিন্তের পর্যবেক্ষণ। বৈদেশিক আবহে দেশের পরিচিত মুহূর্তগুলোকে আবিষ্কার ক'রে তিনি যেন বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছেন। তাঁর সমস্ত কবিতাবলী তাঁর চৈতন্তের এক বিশ্ময়।

“নীল চেউ-এ সারি নৌকো, গানে-ভরা ড্যাংবুকের তট
বাজনা বাজে জলে জলে যমুনায় মীরার ভজন ;
দেখি টেনে এক-দৃষ্টে বেবি চায় মার দিকে,
হয়ত লগুনে ভিড়ে, কিংবা লক্ষ আলোর মার্কিনে—
প্রাণ কেঁপে ওঠে ;”

আসলে অমিয় চক্রবর্তী যে-প্রাণবর্তিকার স্পর্শ অন্তরে অনুভব করেছিলেন তা রবিপ্রদক্ষিণের ফলশ্রুতি নয়, এর প্রাপ্তি আপন বিশ্বাসের ভূমিকা থেকে । ফলত প্রযুক্তির ব্যাপারে অমিয় চক্রবর্তী কোথাও তথাকথিত হ’তে পারেন নি । তিনি ধ্বনি দিয়ে চিত্রকল্প রচনা করেছেন এবং চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে দূরদেশের পটভূমিকায় আপনদেশের নানা মুহূর্ত, ভাবানুঘর্ষের নানাস্ব । তাই কলোরাডোর সূক্ষ্ম পাহাড়ঘেরা এক অলীক দুপুরে যে-দুর্লভ মুহূর্ত কবি আবিষ্কার করেছিলেন তা কী ধরণের ধ্বনিগুণের আশ্রয় পেয়েছে, তা শুনুন ।—

“জানতামই না যখন ছুজন, সেত অনেক দূর

• তারো চেয়ে দূর যে আজ দুপুর ।

এক মুহূর্তে ছিন্নস্বতো সমস্ত এই বেলা

• অলীক আলোয় খেলে খেলা ;

কলোরাডোর সূক্ষ্ম পাহাড় সোনায় মেলা

• ঘরহারা রোদ্দুর ।”

এখানে এক উজ্জ্বল ঔদাস্যের প্রকৃতিস্থ রূপ প্রেমের বিষাদে ও স্বরাঘাতের স্পন্দনে মহীয়ান । অমিয়বাবুর কবিতার বিভিন্ন বৈদেশিক স্থানোন্মেষের ব্যাপারে বিচলিত হ’য়ে আমার এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এই জাতীয় কবিতার পাদটীকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদিও একদিন আমাদের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সেদিন যদিও শিক্ষক-ছাত্রের ব্যবধান স্রবণে রেখে তাঁর সঙ্গে তর্কে নামতে পারিনি কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিল যে, যে সহৃদয় রসজ্ঞের কাছে ‘কলোরাডো’ পাহাড় ভৌগোলিক অন্তরাল সৃষ্টি করবে না, প্রেমের পরম বিস্তারকেই জাগিয়ে দিয়ে যাবে । সহৃদয় পাঠক এটাও লক্ষ্য রাখবেন, স্তবকের অন্তিম পংক্তির অন্ত্যাহুপ্রাসবর্জন । আশ্রয়হীন তথা সীমাহীন রোদ্দুরের চিত্রকে প্রকাশের জন্য কবি অন্ত্যাহুপ্রাসের আশ্রয় বর্জন করেছেন । প্রকৃতির কঠিন উজ্জ্বল্যে ধরা পড়েছে প্রেমের কোমলগাঙ্কার রূপ ।

বলাবাহুল্য কবিতায় ব্যঙ্গার্থের নানাস্ব যে আবশ্যিক—অপরাপর সংকবির মত অমিয় চক্রবর্তীও তা অনুভব করেছিলেন । ফলত পরস্পর-বিরোধী

প্রসঙ্গে ও অনুভূতির সংঘর্ষে এক অথও মুহূর্ত গড়ে উঠেছে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়।

“কফির স্বরভি; টোটে মাথনের স্বাদ মধু-মেশা,
ভোর সাড়ে সাতটার গোলাপি আলোর ঠাণ্ডা নেশা—
মুহূর্তের এই মূর্তিবহ
শরীরী চৈতন্যে বাঁধা আমার সংগ্রহ
ওডি-কলোনের গন্ধমাখা,
বন্ধু, তোমায় আজ নীলাস্তে পাঠাই দূরপাখা।
ঝগ্ ঝগ্ ট্রেন শব্দ, ষ্টেশনের স্তব্ধ রোদ
কালরাত্রে স্বপ্ন দেখা ডোবা বোধ
পৌছনো তবুও ফিরে চাওয়া”

কোনো গভীর তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির তোড়জোড় আলোচ্য পংক্তিগুলোর কোথাও ফুটে ওঠেনি। সকালের কয়েকটি প্রাত্যহিক ঘটনাপরম্পরার বিবরণ আছে ঐ স্তবকটিতে। কিন্তু যে প্রসঙ্গগুলোর ভগ্নাংশে যে ধরনের অনুভূতির উদ্ভাপ আমরা অনুভব করি তারা পরম্পরবিরোধী। কিন্তু কবির চৈতন্যে এসে তা যেন এক অথওতা খুঁজে পেয়েছে। সমস্ত কবিতাটি অনুবক্ষময়। আমেরিকার সকালে এসে মিলেছে বাংলাদেশের সকাল। ট্রেনের শব্দ, ষ্টেশনের স্তব্ধ রোদ মনে করিয়ে দেয় গভীরত্বের স্বপ্নে-দেখা দেশের জন্ম মূক বেদনা। এক অনুবক্ষ থেকে কবি আরেক অনুবক্ষে এসে পৌঁছে যান। তাই সমস্ত কবিতাটি স্বল্পতম পর্বাস্থের ব্যবধানে বিভক্ত। ফলত ‘ঝগ্ ঝগ্’ পর্বাস্থে ‘ঝ’ এই অক্ষরের ওপর ঝাঁক দিয়ে যে-কাটিগের বোধকে ধরা হয়েছে ‘ষ্টেশনের’ এই পর্বাস্থে এসে তা সর্বাঙ্গাঙ্গী ভাবিতা পেয়েছে। ‘স্তব্ধ রোদ’-এ এসে যেন হঠাৎ নিস্তব্ধতার চেতনা ফুটে উঠেছে। পরের পংক্তি এসেছে আগের পংক্তির অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে। শেষ পংক্তিতে ধরা পড়েছে একটি অনুবক্ষময় ব্যাকুলতা। প্রতিটি পর্বাস্থ প্রতিটি পর্বাস্থকে পরিক্রমা ক’রে যেন অগ্রসর হয়েছে এবং এরই সমালোচনাত্মক এগিয়ে চলেছে প্রতিটি অনুভূতি প্রতিটি অনুভূতিকে অতিক্রম ক’রে। ফলত, অক্ষরবৃত্তে কবিতা লিখলেও অক্ষরবৃত্তের আইন সর্বত্র রক্ষিত হয় নি। অনুভূতির স্পন্দন যেকালে শ্রুতির একমাত্র আইন তাই পর্বগুলো টুকরো টুকরো ক’রে দিয়ে অমিয় চক্রবর্তী আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ধ্বনিগুণের যথোচিত সম্মান দিয়েছেন। আসলে আধুনিকতা মজির ব্যাপার বলেই তা ভঙ্গীসর্বস্ব। এবং যেহেতু স্বভাব ও

অভিব্যক্তির যোগফল দুর্লভ ঘটনা। তাই আধুনিকতা কোনো দেশকালে সীমাবদ্ধ নয়। তাই শেক্সপীয়ার আজকের দিনেও আধুনিক অথচ আজকাল বাংলাদেশে যারা কবিতা লিখছেন তাঁদের অধিকাংশই সাম্প্রতিক। অমিয় চক্রবর্তী যে আধুনিক ছিলেন তা যদিও রসজ্ঞের কাছে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না তবু যারা সর্বপ্রকার আধুনিকতায় বীতশ্রদ্ধ তাঁদের বলে রাখি যে পূর্ণের অল্পভূতি তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ ভাষাতেই শুনিয়েছিলেন। শব্দগঠনে নানা রকমফের, ছন্দের নানা নিপাতনিক স্বাধীনতা এনেছিলেন শুধু আমাদের মৌখিক কখনরীতি অবিকৃত রাখার জন্তে। এবং যারা তিরিশের দশকের কবিতার সামান্য লক্ষণ খুঁজে পেতে চান এই একটি কারণের জন্তেই অমিয় চক্রবর্তীকে তাঁদের খাপছাড়া বলে মনে করা উচিত নয়।

উপরন্তু অমিয় চক্রবর্তীর মানসিকতা তথা তাঁর প্রযুক্তির শাবল্যে যিনি দেশের প্রতি মমত্ববোধের সন্ধান পাবেন তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে যেকালে আমাদের কোনোই অল্পভূতিই অবিমিশ্র নয় অমিয়বাবুর দেশপ্রেম তাই তাঁর মিশ্রাল্পভূতির ঘটনাঘটন। শৃংগার অল্পভূতি, স্পিনোজার দর্শন পড়ার আনন্দ, টাইপরাইটারের হৈচৈ এমন কি রান্নার সুস্বাদু—প্রভৃতি বিভিন্নধর্মী অল্পভূতি কবির চৈতন্যে এসে অখণ্ড রসবস্ত্র সৃষ্টি করে। এলিয়ট সাহেবের আলোচ্য দৃষ্টান্ত শুধু প্রমাণ করে যে রঙ্গলাল অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক কবিতা আমাদের আর যে উপকারেই আসুক না কেন, রসজ্ঞের রূপকারী বিবেককে কোনোদিন তা তৃপ্তি দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে অমিয় চক্রবর্তীর “পালাবদলে”র ‘বে-ষ্টেট রোড’ কবিতাটি পড়লে বুঝতে পারবেন কত বিচিত্র অল্পভূতির উত্থানপতনের মধ্যে কবির দেশের প্রতি মমত্ববোধ সূক্ষ্মভাবে মিলে রয়েছে। কবিতাটির প্রথম স্তবক আরম্ভ হয়েছে একটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে। বিখ্যাত কেশ্বজু ব্রীজ থেকে কবি নভেম্বরের বৈকালীন বিলেতের ব্যস্ততাময় জনবহুল রাস্তা দেখছেন। দেখতে দেখতে সহসা তাঁর চোখে পড়েছে—“উষের জলে বৌদ্ধতারা, বহুরাত্রিপারে দৃষ্টিনামা”। এই আবিষ্কার দেশের স্মৃতিকে নিয়ে এলো। • তাই দ্বিতীয় স্তবক শুরু হয়েছে দেশের অল্পবৃদ্ধ তথা তার প্রতি মমত্ববোধ দিয়ে—”

ঘরে ফিরে শুভলক্ষ্মী রেফার্ডের শুভ্রতা ভজন
মুহূর্তের কণ্ঠে আনে দ্বাদশ দেউল জাগা তীর
প্রবাস-সমুদ্রহীন, অকল্প চাওয়ার বুকে স্থির ;
কতদিন হ’য়ে গেল খুঁজেছি সে পথের লগন।”

কিন্তু এই অল্পভূতি যে-পরিবেশে আবিস্কৃত তা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রাজ্য— এই স্তবকের পরের চারপংক্তিতে কবি তার-ই বিবরণ দিয়েছেন। আবার অস্তিম স্তবকে এসে তিনি যেন আবিস্কার করেছেন উপস্থিতির দাবী দেশের মমতা বোধকেও ধরে রাখতে দেয় না। তাই কোথায় যেন শুভনাস্তিকতার সূক্ষ্মরেখা একটু কৈপে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। উপরন্তু, অমিয় চক্রবর্তী যে-চৈতন্যের মধ্যস্থতায় সমস্ত বিশ্বকে দেখতে চেয়েছেন তাতে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত প্রাণিত হ'য়ে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভবের কারণ ঘটিয়েছে। 'বে-ষ্টেট রোড'-এর প্রথম স্তবকে দৃষ্টি ও শ্রুতির উত্থানপতনের সঙ্গে পাঠক পরিচয় লাভ করে। দ্বিতীয় স্তবকে গিয়ে শুধু শ্রুতি ও দৃষ্টির সহযোগিতা এবং অস্তিম স্তবকে এসে দেখি এই তিনটি ইন্দ্রিয় মিলেমিশে একটি অভিনব মুহূর্ত গড়ে তুলেছে। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা স্বরাঘাত যে কোনো ছন্দে অমিয় চক্রবর্তী যেনতুন স্পন্দনকে জাগিয়ে তুলেছেন তা আসলে তার ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী ইন্দ্রিয়ের সংঘর্ষের ফলশ্রুতি। তাই শব্দ-প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি যে-স্বাধীনতা নিয়েছেন তাতে ইন্দ্রিয়ের এই উত্থানপতন তথা অল্পভূতির এই ঘটনাঘটনকে ধরবার চেষ্টাই অনিবার্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ফলত আলৌচ্য কবিতার "রঙা অশ্রুতার অগ্নতার প্রান্ত-নিঃশ্বসিত" পংক্তিটির গোড়ায় যে দৃষ্টির কব্জ আছে তা যেন ধীরে ধীরে শ্রুতিতে আশ্রয় পায়। 'অগ্নতার' শব্দের 'তা' বিভক্তি অর্থের যে সামান্যীকরণ ঘটিয়েছে তার দ্বারা কবির বিস্তারবোধই আবিস্কৃত। অথবা আলৌচ্য কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে যেখানে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বলেছেন যে বহুদিন "খুঁজেছি সে পথের লগন" তখন আশ্চর্য ধ্বনিগুণ আবিস্কৃত হয়। বিরহের ব্যবধানবোধ যেন 'লগন' শব্দের মধ্যে ষত তীব্রভাবে খুঁজে পেতাম তার চেয়ে অনেক বেশীভাবে অল্পভব করা গেছে 'লগন' শব্দে।

বস্তুত, কোনো এক বিশেষ লগ্ন, হঠাৎ ভাললাগা অথবা কোনো এক অল্পস্বপ্ন—তাই নিয়ে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা গড়ে উঠেছে। এবং রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী একই ভাবনার অংশীদার হ'য়েও যে ভিন্নধর্মী ছিলেন তার প্রমাণ অমিয় চক্রবর্তীর ঐ বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতার কথাই ধরা যাক। অবশ্য মোহিতলাল এই কবিতায় যে বাগাড়ম্বরতার সন্ধান পেয়েছিলেন সেই কারণে নয় আমাদের আসলে যা বিচলিত করে তা হচ্ছে এখানে বড় বড় চিন্তার সমারোহ আছে কিন্তু কবির অল্পভূতির সহজ আবিস্কার নেই। ফলে শব্দে-ছন্দে নিভুলতা সত্ত্বেও পড়তে পড়তে চোখে ঢুল আসে, পুরীক্ষার খাতায় সারাংশ লেখা সহজ হয় এবং এ কবিতা নিয়ে শিক্ষকীয়

চিন্তাবৃত্তির যুগ্মস্থ জমে ওঠে। স্তূতরাং অমিয় চক্রবর্তী যখন বলেন—

“.....শিরায় মনের দুঃখ বাড়ে

জমা-মেঘ-সম্ভূতি ব্যবধান চূর্ণ-করা দিনে”

তখন সত্যিই এর ঠিক মানে খুঁজে পাওয়া আয়াসসাধ্য হ’য়ে পড়ে। বস্তুত বিরহের বোধকে ব্যক্ত করা ছাড়া এতগুলো শব্দের আর বিশেষ কোনো কাজ নেই। কিন্তু তবু কাজ আছে। ‘ব্যবধান’—এই শব্দের বিশেষণ ‘জমা-মেঘ-সম্ভূতি’। কবিতার অনভ্যন্ত পাঠক নিশ্চয়ই বিচলিতবোধ করবেন বিশেষত ‘সম্ভূতি’ শব্দের ব্যবহারে। কিন্তু ‘সম্ভূতি’ শব্দটি যে তার প্রচলিত ব্যবহারিক রূপ ছেড়ে প্রাথমিক অর্থে স্থান পেয়েছে রসজ্ঞ ঠিকই তা আবিষ্কার করবেন। ব্যবধানের দুঃখও আনন্দ-প্রভব—হাইফেন-বদ্ধ তিনটি শব্দের যোগপড়ে সেই অনুভূতিই বিস্তারলাভ করেছে। অথচ ‘পৃথিবী’ কবিতায় বৈশাখের আকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে ‘বিহুং-চকুবিদ্ধ দিগন্ত’—এই শব্দবদ্ধ আমাদের চোখকে খানিকটা তৃপ্তি দেয় বৈকি ; কিন্তু তারপর ? অন্তত্ব অমিয় চক্রবর্তীকে বলতে শুনি।—

“আসন্নিক মুহূর্তে দোহল

নীলইচ্ছা ক্লেমাটিশ ষ্টেশনে ধরেছে গুচ্ছ ফুল

তাতে ছোঁয় একটি দূর ঘূর্ণআলো সৌরতার থেকে।”

এ হচ্ছে অন্তিমবাদীর গভীরতম আবিষ্কার। ফুল থেকে আকাশ, সৌরতার পর্যন্ত সর্বত্র ‘আমি’র অভিব্যক্তি। সমস্ত বিশ্বলোক সেই স্বরসংগতির অন্তর্ভুক্ত। আবার এই একই ভাবনার বশবর্তী হ’য়েই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের রূপক-প্রধান কবিতা ‘নীলমণিলতা’। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্যায়নকে যারা ঈশ্বরনিষ্ঠার মত পাপকাজ বলে মনে করেন অথবা যাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণদেব সমাগোত্রীয় তাঁরা ছাড়া আর সবাই স্বীকার করবেন যে অমিয় চক্রবর্তী শুধুমাত্র ইঙ্গিতে যে অনুভূতিকে সঞ্চারিত করেছেন, দশমুখকে দীর্ঘ কবিতা লিখেও ‘নীলমণিলতা’র কবি অরূপ অনুভূতির স্পন্দন জাগাতে পারেন নি। আসলে সংকবিতা চিরকালই ইঙ্গিতপ্রধান, অর্থপ্রধান নয়। ইঙ্গিতে অনুভূতির যে-শাবল্য ফুটে ওঠে, কবিতার পাঠকের তাই হচ্ছে অভিপ্রেত। অধিকন্তু, এই বিশ্লেষণ পড়ে কেউ যেন ভুল না করেন যে অমিয় চক্রবর্তী সর্বাঙ্গসুন্দর। বস্তুত, তাঁর ‘ঘরে ফেরার দিন’-এর অনেক কবিতা হয়ত অপাঠ্য ঠেকবে কিন্তু সে শুধুমাত্র তাঁর পূর্বানুসৃত বৈশিষ্ট্যের অভাবই।

বলাবাহুল্য, কৃতির সম্মুখীনও আমার অভিপ্রায় নয়। বরং আমি যা বলবার চেষ্টা করছি তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশালতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গিয়েছে। যিনি ‘পূরবী’র ‘শেষবসন্ত’ কবিতাটি পড়েছেন তিনি জানেন যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে শ্রেষ্ঠ সেখানে তিনি অল্পস্বল্প, ইঙ্গিতপ্রধান। কিন্তু ঔপনিষদিক উদ্দেশ্যপ্রণোদনা কবিতা লেখার ব্যাপারে প্রায়ই তাঁকে পথে বসিয়েছে। অবশ্য ‘মানসী’, ‘ক্ষণিকা’ লিখে তিনিই যদিও প্রথম বাঙালী পাঠককে কবিতার আসল রূপের সন্ধান দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তী জীবনে ঘটনাচক্রে সেইসব প্রযুক্তির আর পরিণত রূপ না দিয়ে শুধুমাত্র সম্ভাবনার স্তরে তিনি ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। বস্তুত, সঙ্গীতের আত্মীকরণের ক্ষমতা কবিতার চেয়ে যে বেশী, বৈষ্ণব পদাবলীর মনোযোগী পাঠক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের তা জানা ছিল। ফলত রবীন্দ্রসঙ্গীতে বড় বড় ভাবনার টুকরোও বেমানান শোনায়নি। যাই হোক, পূর্বসূরীর বৈফল্য ঘেহেতু উত্তরসূরীর কাব্যসংস্কারে কাজে লাগে, অমিয় চক্রবর্তী তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই সব সংস্কারসাধ্য অমনোযোগ লক্ষ্য রেখেছিলেন। ফলে যে সব কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে সেখানে বড় বড় কথার তোড়জোড় কখনো ফুটে ওঠেনি। বরং ক্যাফেটেরিয়ার গল্প, জনতার ব্যস্ততা ইত্যাদি ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতেই যেন সহসা বৃহত্তর বেদনা অনুভব করি। আমি তা বলব অনাবিষ্কৃত রবীন্দ্রনাথ এইখানেই আবিষ্কৃত হয়েছেন। সম্ভাবনাময় রবীন্দ্রনাথ এখানে পূর্ণতা পেয়েছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের মত পূর্বসূরী ছিলেন বলেই অমিয় চক্রবর্তীর এই সাফল্য।

‘বেঙ্গল’এর বই কিনুন, পড়ুন, উপহার দিন কারণ.....

‘বেঙ্গল’এর বই মানেই

শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার সার্থক সৃষ্টি !!

গল্প-পত্নের ঐতিহ্য ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দেবভোষ বসু

কবিরা, এলিঅট একদা জানিয়েছিলেন, স্বভাবত গল্পের স্নেহক। গল্পরচনায় এই সিদ্ধি, তাঁর মতে, কবির বিচিত্রগামী প্রতিভাকে প্রমাণ করে না, বস্তুত প্রতিষ্ঠা করে এই সত্যকেই যে শিল্পচর্চা প্রকারভেদের মুখাপেক্ষী নয়। অর্থাৎ একজন কবি যখন গল্পরচনায় মনোযোগ দেন, তখন স্বকীয় চিন্তাধারার সরলবাহন হিসেবেই তিনি গল্পকে গ্রহণ করেন না, তার মধ্যে কাব্যশোভন লাভ্যের আবিষ্করণে যত্নশীল হন। অথচ গল্পচর্চাও যে শিল্পচর্চা, এই আদিসত্য স্বীকার করলে গল্প-পত্নের ভেদরেখা যে গণিতশাস্ত্রের সংজ্ঞাবন্ধনেই নিজে থেকে ধরা দেয় একথা না মেনে উপায় থাকে না। এবং উপেক্ষা করা যায় না এই সত্য যে এই দ্বিবেগীপ্রবাহ আসলে একই উৎসে নিবদ্ধগতি। তাহলে গল্প-পত্নের পার্থক্য কোথায়, অথবা আত্মাহুতগত? নাকি তাদের অচলায়তন আসলে স্বপ্নভঙ্গের মতোই অলীক? আমি জানি এটা নতুন কোন প্রশ্ন নয়, বিশ্বসাহিত্যে এ প্রশ্ন বারবারে ফিরেফিরে এসেছে—কখনো সজ্ঞানে, কখনো অনতিগোচরে। উদাহরণত শেকস্পীয়রের সনেট। জর্নৈক অসিতাপ্তীকে নিবেদিত সেই সমস্ত সনেট কেউ কি আজ আর পড়তো, নাকি জীবিত থাকতো সেই মৃন্ময়ীর অঙ্গস্মরণ, যদি শেকস্পীয়র জীবন্ত কথারীতির আশ্রয় ছেড়ে কবিপ্রসিদ্ধির শরণার্থী হতেন? যদি কীটস-কথিত নৈরাশ্রসিদ্ধির দ্বারা তাঁর রচনাবলী চিহ্নিত না হতো? যদি অকবির মতো প্রেমসীর রূপবর্ণনা করতে গিয়ে সুন্দরশব্দের মোহে কাব্যশিল্পকেই মসীলিপ্ত করতেন তিনি? যদি এমন কবিতা না লিখতেন—

Who will believe my verse in time to come

If it were filled with your most high deserts?

Though, yet, Heaven knows, it is but as a tomb

Which hides your life and shows not half your parts.

If I could write the beauty of your eyes

And in fresh numbers number all your graces

The age to come would say this poet lies

Such heavenly touches never touched earthly faces.

[সনেটসংখ্যা ১৭]

তাহলে কি বহুযুগের ওপার থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতো আধুনিক পাঠকের কানে? অলৌকিক প্রতিভাবলে শেকসপীয়র সেই যুগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে কাব্যরীতির মৃত্যু হয় বটে কিন্তু কথ্যরীতি চিরজীবী। তাই এই ছুই রীতির সমন্বয় ঘটিয়ে উত্তরণের ফলশ্রুতি আনলেন তিনি স্বরচিত সনেটগুচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে গল্প ও পদ্য যে একে অন্নের পরিপুষ্টি সাধে, কখনো কখনো স্বতোবিরোধকে প্রশ্রয় দেয় না, শেকসপীয়রের শিল্পস্বভাব সেই কথাই প্রমাণ করলো। অথচ আজও পাঠক সাধারণ্যে তো বটেই, এমনকি নারস্বতসমাজেও গল্প-পদ্যের বর্ণাশ্রম এতই দৃঢ়ভিত্তি যে এই দুয়ের শিল্পসমর্থ মিশ্রণও কৃত্তি হিসাবে গণ্য নয়, ভৎসিত অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে। কেননা সাধারণ দৃষ্টিতে কবিতায় গল্পশোভন শব্দব্যবহার বা বিভ্রাসপদ্ধতির অহুসরণ কবিত্বের পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ লোক ষাকে গল্প বলে মনে করে তা আসলে আটপোরে কল্যাভাষা। যে ভাষায় মাল্লুখ সচরাচর কথা বলে তার সঙ্গে গল্পের পার্থক্য বিস্তর। এমনকি রোমান্টিক অভ্যুত্থানের যুগে স্বয়ং ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে জীবন্ত ও সংরক্ত ভাষাদর্শের দিকে ঝুঁকেছিলেন, কোলরিজের বিশ্লেষণী মেধা সে ভাষাকে কল্যাভাষার আদর্শ বলে মেনে নিতে পারেনি। একদিকে তিনি যেমন ভেবেছিলেন যে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর কথ্যভাষাই কবির পক্ষে একমাত্র গ্রাহ্য, অন্যদিকে গল্প ও পদ্যের পার্থক্য যে শুধু মাত্রাবিশ্বাসের পার্থক্য নয় এ ধারণাও তাঁর অনধিগম্য ছিল।* আসলকথা কথ্যরীতি যে কোন শ্রেণীবিশেষের ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বস্তুত শিল্পীজেনোচিত আবিষ্কারের মুখাপেক্ষী, তা ওয়ার্ডসওয়ার্থ কখনো বোঝবার চেষ্টা করেননি। সর্গোরব তাঁর ঘোষণা যদিও গল্পপদ্যের মৌল ভেদরেখাকেও মানতে চায়নি এবং সরল উচ্চারণকেই সজীবতার হৃৎস্পন্দন বলে নিশ্চিত হয়েছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে লুসি-বিষয়ক কবিতাবলী

* প্রসঙ্গত স্মরণ্য যে মাত্রাবিশ্বাস উপেক্ষা না করে কবিতায় গল্পের চরিত্রলক্ষণ ফুটিয়ে তোলাই ছিল ‘পলাতক’ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। কিন্তু ‘ছড়ার ছল’ এ গ্রন্থের আখ্যানমূলক কবিতাগুলিতে যে নিত্যন্তই আরোপিত, তা সং পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়তে বাধ্য। অথচ এই গুরুদায়িত্ব অনেক পূর্বেই তিনি হৃৎস্পন্দন করেছেন ‘ক্ষণিকায়’। এমনকি আখ্যান-কবিতার ক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্তের ষোগ্যতা যে কম নয় তাও তো রবীন্দ্রনাথই দেখালেন ‘কথা ও কাহিনী’তে। প্রকৃতপক্ষে আত্মপরাগতির এই দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের একটি লক্ষণীয় পরাভব।

ব্যতিরেকে তাঁর কোনো কবিতাই বহুঘোষিত রীতিগত বিপ্লবের দৃষ্টান্তস্থল নয়। আর লুসি-বিষয়ক কবিতাগুলিও যে আমাদের বয়ঃসন্ধির সমসাময়িক সে কথা কে না জানে? এমনকি ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডে যখন পৌঁছাই তখনো দেখি কথারীতির অন্বেষণে ব্রাউনিং নাট্যাশোভন স্বগতোক্তিকেই তার স্বরূপ বলে স্থিরপ্রত্যয় হয়েছেন। ব্রাউনিং ভেবেছিলেন যে মর্তলোকচারী নায়ক-নায়িকাদের কথোপকথনের মধ্যদিয়েই কাব্যে গভীর চরিত্রলক্ষণ ফুটিয়ে তোলা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে কথারীতির সাধনায় আটলান্টিকের অপরপ্রান্তবাসিনী কবি এমিলি ডিকিনসনের কবিতাবলী তাঁর কোন কাজে লাগলো না। অথচ শ্রীমতী ডিকিনসন ব্রাউনিং-এর সমসাময়িক কবি; এবং আত্মানুসন্ধানের নিষ্ঠায় অথবা আঙ্গিকের সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর কবিতা যে ব্রাউনিং-এর কাব্যপ্রচেষ্টাকে অনেক পিছনে ফেলে গেছে, আশা করি রসজ্ঞ পাঠক তা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। কিন্তু শ্রীমতী ডিকিনসন ব্রাউনিং-এর মতো কবিতাকে কথোপকথন দিয়ে ক্লাস্তিকর করেননি; বিদ্যাসপদ্ধতিতে, শব্দের ব্যবহারে এবং নির্লিপ্ত আত্মনিরীক্ষায় কথারীতি তাঁর হৃদয়তন কবিতা-সমূহে বিষয়করভাবে উপস্থিত—যা, মানতেই হবে, ছইটম্যানের প্রসিদ্ধ গল্প-কবিতাতেও অনর্জিত থেকে গেছে।

Floss won't save you from an abyss,

But a rope will,

Notwithstanding a rope for a souvenir

Does not look as well.

But I tell you every step is a sluice,

And every stop a well.

Now will you have the rope or the floss

Prices reasonable. [Floss won't save you.]

ব্রাউনিং-এর অপরিণামদর্শী বিকর্ষণ সন্দেহও, নিরবধি কাল এবং বিপ্লা পৃথ্বী যথাসময়ে এমিলি ডিকিনসনের প্রতিভাকে স্বীকার করলো। এবং যদিও ম্যাথীসেন-এর বই পড়ে আমরা জানতে পারি যে ঐ মার্কিন কবির লেখার সঙ্গে এলিয়টের কোনো কালেই পল্লিচয় ঘটেনি, তথাপি এলিয়টের কাব্যরীতি যে ডিকিনসন-ব্যবহৃত রীতিরই পরিণত সংস্করণ এমন ভাবা কষ্টসাধ্য নয়। কেননা কি সমালোচনায়, কি কাব্যে সর্বত্রই এলিয়ট কথারীতিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু ব্রাউনিং-এর মতো কোনো ভ্রান্তধারণার দ্বারা তিনি

কখনো আক্রান্ত হননি। বিপরীতক্রমে তিনি বুঝছিলেন যে কথোপকথন এক জিনিস, কথোপকথনের রীতি আর এক। কথোপকথন ভালো কবিতার সামান্য লক্ষণ—সেখানে কবি নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলেন—

After such knowledge, what forgiveness? Think now
History has many cunning passages, contrived corridors
And issues, deceives with whispering ambitions,
Guides us by vanities. [Gerontion]

এই কবিতাংশে গল্পের ধর্ম ও কথ্যরীতির স্পন্দন যে সুরক্ষিত আছে, অন্তত এলিয়ট-ব্যবহৃত cunning passages ও contrived corridors শব্দাবলীর অভিঘাতেই তা স্পষ্ট। কিন্তু এখানে নাটকীয়তা নেই, আছে সেই নিবিড়বন্ধ আবেগ যাকে হর্বাট রীড বলেছেন : 'point of intensity' এবং যার প্রভাবে নাটকের পাত্রপাত্রী কখনো কখনো কবিতায় কথা বলে ওঠে।* অধিকন্তু এই কাব্যংশও স্বগতোক্তি বটে, কিন্তু তা কবিরই স্বগতোক্তি, চরিত্রের নয়। আসলে এই কবিতা আত্মসংগ্রামেরই বাণীমূর্তি। বলাই বাহুল্য, আত্মসংগ্রাম যতো তীব্র হবে, কবিতা ততই কথ্যরীতির দিকে ঝুঁকবে, কবিপ্রসিদ্ধির কুসুম-শয়ন ছেড়ে গল্পের কঠিনোজ্জল ধর্মের মধ্যেই পাবে অস্থিষ্ট উৎসকে।

এতক্ষণ যাদের কথা বলা হোল তাঁরা যেহেতু স্বনামধন্য বিদেশী কবি, তাই প্রাগ্লভ্যের স্বাক্ষর এ আলোচনায় স্থম্পষ্ট। কিন্তু যখন মনে পড়ে যে একদা বাংলাদেশেই স্টট এবং বায়রন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন উত্তরাধিকার-স্বত্বের অমোঘ টানে আমি শু পশ্চিমাচলের দিকে তাকাই। তদসম্বন্ধেও কৃপাশ্রয়ী কোবিদরা আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে হিতবুদ্ধিহস্তারক বিদেশী প্রভাব খুঁজে পেয়ে বড়ই দুঃশিস্তাগ্রস্ত। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে 'কুলায় ও কাল-পুরুষের' মুখবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ এদের সম্পর্কেই লিখে গেছেন—“অবশ্য আমি যতদূর জানি, বর্তমান বাঙালী সাহিত্যিকদের অধিকাংশ শৈশবে স্থল পলাতেন না; এবং পরবর্তী জীবনের অধ্যয়নে তাঁদের অনেকে যদিচ কবিগুরুর সমকক্ষ নন, তবু পাশ্চাত্য নামের খামথেনালী উল্লেখ প্রায় সকলের জিহ্বা একেবারে অনাড়ম্বর। তাহলেও আমাদের মধ্যে লেখাপড়ার অসামঞ্জস্য বিস্ময়কর; এবং

* এই তত্ত্বের বথার্থ প্রয়োগক্ষেত্র অবশ্য এলিয়টের কাব্যনাট্য। কিন্তু নাট্যগুণ তাঁর কাব্যেরও অন্ততম বৈশিষ্ট্য। মনে হয় কাব্যনাট্যের সেই প্রাক্ষিপ্ত তীব্র মুহূর্তগুলোই যেন সংহত হয়েছে এলিয়টের কবিতায়। ফলত মানতেই হবে, যে কথ্যরীতি তাঁর কবিতার অবশ্যস্বার্থী লক্ষণ, তা উন্নীত চৈতন্যেরই ভাষা।

তার ফলে বাংলা প্রবন্ধই বিপদগ্রস্ত নয়, বাংলা কাব্যও অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট।” স্বদেশীসাহিত্যের এবং বিধ অসারতা সম্পর্কে স্বধীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন বলেই আত্মচলনাকে তিনি বরাবর ঘূর্ণা করে এসেছেন। এবং যদিও প্রাচীন আলাংকারিকদের মতো তিনি বুঝেছিলেন যে রসসৃষ্টিই সাহিত্যতত্ত্বের শেষ কথা তথাপি শাস্ত্রজ্ঞদের সিদ্ধান্তপ্রিয় মনোধর্মের প্রভাব তাঁর উপর কোনদিনই পড়েনি। বস্তুত সৃষ্টিশীলতার মধ্যদিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্য-জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট অর্থ দিয়ে গেছেন। পাণ্ডিত্য, মনীষা এবং জীবনব্যাপী অল্পশীলনের ফলে স্বধীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে গল্প ও পত্নের পার্থক্য নিতান্তই লোকমাত্র, প্রথানুমোদিত। কবির সমন্বয়ধর্মী মনের কাছে এবং বিধ বর্ণাশ্রম নিরর্থক। তাই গল্পের শব্দ, অময়, বিস্তারপদ্ধতি বা চরিত্রলক্ষণ বলতে যা বোঝায় তা যেমন তিনি অনবরত গ্রহণ করেছেন তাঁর কবিতায়, অল্পপক্ষে পত্নের সমন্বয়লালিত অল্পবন্ধ ও আবেদনও সংরক্ষিত তাঁর গল্পে। আসলে এই দ্বিবিধ-চর্চার মধ্যে তিনি কোন ভেদরেখাকে খুঁজে পাননি, যেহেতু তাঁর মতে ‘সাহিত্যতীর্থ গল্প-পত্নের সঙ্গমস্থল’। তাই তাঁর কবিতায় বা গল্পে একটি রূপকারী বিবেকের চেহারাই ফুটে ওঠে, যা এলিয়ট-কথিত ঐক্যবোধের দ্বারা উপার্জনীয়।

বস্তুত যদিও গল্প-পত্নের পার্থক্য সম্বন্ধে বিস্তার কথা বলা হয়েছে, এদের অন্তর্গত ঐক্য অর্থাবধি অস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে স্বধীন্দ্রনাথের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—“গল্প ও পত্ন সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্বন্ধে যখন রসসৃষ্টির দৃষ্টি চাপে, তখন আর এই স্নিহিত স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা স্ব স্ব মূলধন একত্র করে যে যৌথ কারবার পাতে, তাই জন-সমাজে পায় কাব্য-আখ্যা।” মানতেই হবে স্বধীন্দ্রনাথ-উপলব্ধ এই সহজ সত্যটি, সম্ভবত সাহিত্যে বিশেষত বঙ্গসাহিত্যে, সর্বাপেক্ষা অনাদৃত। কেননা প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বাংলা কবিতায় গল্প-পত্নের নির্বিবাদ সম্পর্কে চিন্তা বা চর্চা প্রায় কেউই করেননি এবং এ প্রসঙ্গে যে নামটি স্বতই মনে আসে তার উল্লেখ পর্যন্ত দৃষ্টনীয়। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর গুপ্ত আজ আর বাঙালী পাঠকের কাছে কোনো স্থায়ী আবেদন নিয়ে আসেন না। তাঁর পরিচয় লঘু মুহূর্তের সাংবাদিক হিসাবে। অধিকন্তু ব্যঙ্গ-প্রবণতা এবং সাময়িক ঘটনাঘটনের দ্বারা তাঁর রচনাবলী এমনই চিহ্নিত যে, কোনো সজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর অসাধ্য—এমন একটি বিশ্বাস বাঙালীর মজ্জাগত। ‘সজ্ঞান’ শব্দটি খুব আধুনিক, কিন্তু উত্তরসূরীদের জন্ত শ্বেষ-যমক-অল্পপ্রাস ছাড়াও যে তিনি ভাববার মতো কিছু রেখে গেছেন, তা আজ

॥ বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের সার্বক সৃষ্টি ॥

তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরোগ্য নিকেতন ॥ রচনা-সংগ্রহ ॥ চৈতালি ঘূর্ণি

৭ম মুঃ ৭'৫০ ॥

১ম খণ্ড : ১০'০০ ॥

১০ম মুঃ ২'৫০ ॥

মনোজ বসুর

মানুষ গড়ার কারিগর ॥

নবীন যাত্রা

৩য় মুঃ ৫'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৪'০০ ॥

বনফুলের

সে ও আমি ॥

দ্বৈরথ ॥

স্বপ্নসম্ভব

৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৩'০০ ॥

৩য় মুঃ ৩'০০ ॥

সতীনাথ ভাট্টার

অপরিচিতা ॥ পত্রলেখার রাবা ॥ গগনায়ক

২য় মুঃ ৩'০০ ॥

চার টাকা ॥

২য় মুঃ ২'৫০ ॥

সমরেশ বসুর

শ্রীমতী কাফে ॥

সওদাগর ॥

বাঘিনী

৩য় মুঃ ৬'০০ ॥

২য় মুঃ ৬'০০ ॥

২য় মুঃ ৭'০০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গম্পা ॥

দুয়ার হতে অদূরে

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

চতুরঙ্গ

অবিশ্বাস

ময়ূরকণ্ঠী

৩য় মুঃ ৪'৫০ ॥

৯ম মুঃ ৩'০০ ॥

১৪শ মুঃ ৪'০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গম্পা ॥

সূর্যসারথি ॥

একতলা

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

৩য় মুঃ ২'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

বিশেষভাবে স্বীকার্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তই একমাত্র লেখক যিনি আমাদের মৌখিক ভাষাকে কবিতায় ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু আসক্তি ছিল তাঁর, এমন কি কবি উপাধিও তাঁকে মানায় না। কিন্তু সমসাময়িক রঙ্গলাল অনতিপরবর্তী হেমচন্দ্র, নবীম সেন বা মাইকেলের পাশে তিনি যে প্রথর উজ্জল ও প্রাণবন্ত, অভিজ্ঞতারই অগুট শিল্পী, সে কথা কি মান্য নয়? এমনকি ‘স্বাদেশিকতা’ নামক বিরাট ব্যাপার নিয়ে কবিতা লিখতে বসেও তিনি কখনো ভক্তিমদে নিমজ্জিত হন নি। ‘স্বদেশ’ নামক কবিতায় যেখানে তিনি লিখেছেন—“বিশেষত নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে”, সেখানে ‘বিশেষত’ শব্দের ব্যবহার শুধু আধুনিক নয়, কারণাত্মক এবং কথ্যভঙ্গীর দ্বারা সমর্থিত। অন্তর্দিকে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্য যে চরিত্রলক্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার সঙ্গে কথ্যভঙ্গীর বিশেষ যোগ ছিল না। বিদ্যাসাগরের মন প্রধানত অম্লবাদেই সজাগ ছিল বলে, সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কৃতের রীতি-নীতি তাঁর কাছে বাংলা রচনাতেও বর্জনীয় ঠেকে নি। তথাপি সেই গত্তের মাধুর্য অল্পপেক্ষণীয়; এবং ক্লাস্তিকরতা তার অনপনয় লক্ষণ হলেও, পুরাবৃত্তের পরিচর্য অথবা ধ্রুপদী আবহব্যপ্তিতে সে ভাষার উপযোগিতা অনস্বীকার্য, কিন্তু আমার বিবেচনায়, তাঁর শিশুপাঠ্য রচনাবলীতেই বিদ্যাসাগর স্বপ্রতিষ্ঠিত। নীতিস্থধাকে উপলক্ষ্য করে সেখানে তাঁর গদ্য অনায়াস, আমাদের ব্যবহারিক ভাষারই প্রতিফলন তাতে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কাব্যধর্মী গদ্যরচনার তাগিদে যেমন বিদ্যাসাগর তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রও এক ধরনের দীর্ঘ সমাসযুক্ত শিথিলগঠন কবিপ্রসিদ্ধিময় গদ্য, যাকে সিরিল কনোলী বলেছেন Mandarin Prose, তাতেই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন অম্লবাদক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মৌলিক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধির কথা তুলনামূলকভাবে চিন্তা করি, তখন বঙ্কিমের ত্রুটিগুলি বস্তুত আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যতই দিন যাচ্ছে আমরা বুঝছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য অকাব্যেরই লক্ষণাক্রান্ত, সুন্দর গত্তের পরিচয়বহু নয়। কবিত্বশোভন শব্দাবলী, প্রতুল আবেগ-উচ্ছ্বাস থাকা সত্ত্বেও তাঁর গদ্যে কবিতার আবেদন করণভাবে অল্পপস্থিত, এবং সেই কারণেই তাঁর রচনায় গত্তের স্বাধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গদ্য যেখানে শিল্পের দাবী নিয়ে উপস্থিত, সেখানে গত্তের সঙ্গে তার তফাৎ বস্তুত বহিরাঙ্গিক। কবিতার শব্দ যথেষ্টভাবে প্রয়োগ করলেই গদ্য কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে না; গত্তের আপাতনীরস শব্দাবলীর মধ্যে যিনি কাব্যমাধুরী আবিষ্কার করেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে গদ্যশিল্পী। একথা হঠাৎকির মতো

শোনালেও, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের রচনা পাশাপাশি পড়লেই এর সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হবে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে উত্তরস্বরীর ঋণ অবশ্যস্বীকার্য। উচ্চাঙ্গের শিল্পীস্বভাব না থাকার জন্য যদিও তিনি গল্পে কাব্যধর্মিতার আসল অর্থটি বুঝতে পারেন নি, তবুও তিনিই প্রথম নিজের গলায় সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। এবং সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়াসই আধুনিক কালের তথাকথিত লিখিত গল্পের আদর্শ। ‘লিখিত’ বলছি তার কারণ এই যে এই গল্পের সঙ্গে কথ্যভঙ্গীর আত্মীয়তা যৎসামান্য। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘর গুপ্ত কবিতায় যে কথ্যরীতিকে আমদানি করবার চেষ্টা করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র গল্প-রচনাতেও তার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছেন; তার অগ্রতম কারণ অবশ্য বঙ্কিমী গল্পের অর্থহীন অলংকারপ্রবণতা। তথাপি, বঙ্কিমের নিষ্ফল প্রচেষ্টার মধ্যও অন্তত এই সত্য স্বীকৃত যে গল্পের সম্পর্ক শুধু প্রাঞ্জলভাষণের সঙ্গেই নয় এবং অর্থ-নিষ্পত্তি ব্যতীত তার আরো গুরুদায়িত্ব আছে। একথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অধিকাংশ লোকের মতে গল্প যখন নৈরাশ্র্যমনেরই বাহন। তখন মনের যাবতীয় কাজকর্ম, এমনকি রসসৃষ্টির দায়িত্ব থেকেও উপযুক্ত দূরত্বে স্বহসিমা বজায় রাখা তার অবশ্যকর্তব্য। অতর্কিতে কবিতা ভাবময়, কল্পনার ইঙ্গিতে অন্তরীক্ষে সততসঞ্চারণমান, সেখানে গল্পের পদসঞ্চার কবিত্বশক্তির দৈন্যকেই প্রমাণ করে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটু আনাগোনা করলেই ধরা পড়বে যে এবং বিধ ধারণার অসারতা রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রতিপন্ন করলেন উপলব্ধি অদ্বৈতের সার্থক উচ্চারণে। ‘লিপিকা’র অন্তর্গত রচনাগুলি কবিত্বের পরাকর্ষী। যদিও গল্প-পত্রে অতথানি সমীকরণে আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী জেনে রবীন্দ্রনাথ তাদের গুণশিল্পের নমুনা হিসাবেই সংরক্ষিত করেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এই দ্বৈধের সমাধানে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা কখনো থেমে যায় নি। ‘পলাতক’ ও ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে বিষয়বস্তু নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের যে পক্ষপাতহীনতা লক্ষ্য করি, মনে হয়, ছন্দোবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তা ‘পুনশ্চ’ কাব্যেরই সঙ্গত পূর্বস্বরী। ‘বাংলা গল্পে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা’ এই প্রশ্ন যখন তাঁকে পীড়িত করছে, তখন আমরা পেলুম ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থ যা ‘অসংকুচিত গুণরীতিকে কাব্যের অধিকার’কে অনেকদূর বাড়িয়ে দিলো।

প্রকৃতপক্ষে গল্প ও পত্রে মধ্য কোন মৌল বিরোধ নেই। শুধু তাদের আত্মীয়সম্পর্ক শিল্পীমত দায়িত্বের মুখাপেক্ষী। এবং গল্পপত্রে নির্বিরোধের মধ্য দিয়েই যে শিল্পসৃষ্টি সম্পূর্ণ সেকথা রবীন্দ্রনাথ প্রথম উপলব্ধি করলেন

বটে কিন্তু সজ্ঞান পরিণামপ্রত্যাশায় স্বধীন্দ্রনাথই সেই অর্ধেক সাধনাকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মর্যাদা দিয়েছেন। অথচ একই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও, কাব্যের ক্ষেত্রে, স্বধীন্দ্রনাথ কখনো গতকবিতার ত্রিসীমানা মাড়ান নি।

তথাপি অল্প কি উপায়ে গতপদের নির্বিরোধ সম্ভব, তার ইশারাও আমরা স্বধীন্দ্রনাথে পাই। কাব্য-পাঠক মাত্রই জানেন যে শব্দের জন্ত তাঁর কোন সংস্কারান্বিত ছিল না। সংস্কৃতভাষা শব্দের সঙ্গে মৌখিক আলাপের শব্দ বা আপাতনীরস আভিধানিক শব্দের আত্মীয়বন্ধন যে সম্ভাব্য ও নিবিড়, তাঁর কবিতা পড়লে এ সত্য উপলব্ধ হয়। শব্দের সীমাবদ্ধতা কখনো মানেন নি তিনি এবং শব্দাবলী অভিধানের আশ্রিত হলেও তাদের পুষ্টি যে মনই যোগায়, ভার্জিনিয়া উল্ফের মতো এই বিশ্বাস তাঁরও বরাবর ছিল। যেমন—

কখনো ওঠে পাতাল ভেদ করে

অসম্ভূত অমা।

বায়ুর বেগ সহসা যায় মরে

• দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।

উদ্ধৃত অংশের শেষ দুই পংক্তিতে কথ্য বাগ্‌ধারা ‘মরে যাওয়া’ বা ‘ক্ষমা দেওয়া’ অত্যন্ত সহজেই ‘অসম্ভূত অমা’ শব্দবন্ধের সার্থক প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে। অথচ কবিতাংশের ঋপদী সংহতি অথবা ভাবগাষ্ঠীরূপে কখনোই বিচলিত করেনি। আটপন্থিক শব্দের এই প্রয়োগনৈপুণ্য আমাদের আরও বিস্মিত করে যখন ভাবি যে বাগ্‌ধারা বা কথ্যরীতি সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কখনো তিনি কাব্যের সাধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নি। অন্ত্যমিল, ছন্দের কঠিন-বন্ধন অথবা চিত্রকল্পরচনার শিল্পীমত্তা তাগিদ যেমন তিনি মেনেছেন, অল্পদিকে গতকবিতার স্বৈরাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন—কখনো মনে করেননি যে গল্পের চরিত্রলক্ষণ সংহতিচর্চার বিপক্ষে। আসলে ভাবগত ছেদ এবং বাগ্‌যন্ত্র-নির্দেশিত ছেদ যে যথাক্রমে গল্প ও গল্পের মৌল বিচ্ছেদলক্ষণ, ব্যাকরণের এই অনুশাসনে তাঁর আদৌ আস্থা ছিল না। কবিতার যাবতীয় প্রসিদ্ধি, নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে মেনেও তিনি যে স্বরচিত কাব্যে গল্পের স্বভাববর্ধক সংরক্ষণ করেছেন, রসজ্ঞ পাঠকের কাছে তা আজ আর অবিস্মৃত নেই।

অল্পক্ষে কোনো প্রাথমিক অর্থে নয়, আধুনিক অর্থে স্বধীন্দ্রনাথের গল্পও কাব্যধর্মী। অর্থাৎ কাব্যের ক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট অনুশীলনে তিনি পূর্বাপর আত্মস্থ ছিলেন, গল্পরচনায় সেই শুভপরিণামী আত্মপ্রয়োগ তিনি কখনো

অনাবশ্যক ভাবেন নি। অথচ কোনো সংস্কারভূগ অর্থে তাঁর গল্প যে কাব্যধর্মী নয়, একটি যথেষ্ট উদ্ধারের সাহায্যেই তা স্পষ্ট হবে।

“স্বপ্নাত প্রতীকের মতোই উৎকৃষ্ট কবিতার চিত্রকল্প দ্বন্দ্বসমাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য; এবং সাধ থাকলেও, সাধের অভাবশত আমি সে-রকমের রচনায় অপারগ বটে, কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যেহেতু জন্মগত, তাই উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার শিখতে আমাকে শেক্সপীয়রের কাছে ছুটতে হয় না। এ দেশের ঝাঁঝী রোদেই আমি চোখকানের ঝগড়া মেটাই। তবে মহাকবিরা জানেন যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময়ে স্বকীয় বিশ্ববীক্ষার সর্বনাশ সাধে; এবং সাহিত্য শুধু বিষয়-বিষয়ীর সঙ্কেত নয়, রসসামগ্রীর মায়ামুকুরে দর্শক আবার বহুরূপী।”

মানে নিয়ে ধাঁধা মাথা ঘামান, তাঁদের কাছে এই গদ্যাংশ যে দুর্বোধ্যতারই বাণীমূর্তি তা আমি জানি। অধিকন্তু সমালোচনা আত্মচিন্তার স্বক্ষেত্র বলে জটিল ভাষণ সেখানে ভৎসিত। মননরাজ্যকে সরাসরি জনসাধারণের বিচরণভূমি করে তোলাই সমালোচকের বহুশত আতঙ্কত্ব। কিন্তু প্রবন্ধকে যিনি শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছে ‘আঙ্গিকের গুরুত্ব যে বক্তব্যের সমাল্পাতিক, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পরে সে কথা পুরোনো হয়ে গেছে। তাই এই গদ্যাংশ আমার কাছে মোটেই দুর্বোধ্য বলে মনে হয় না, বরং অচেনা লাগে এবং সেই অচেনাই যে শেষপর্যন্ত হৃদয়কে স্বধাসংকেতে ডাক দেয়—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। যেমন উদ্ধৃত অংশে ‘দ্বন্দ্বসমাস’ শব্দটি। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটি যে পরিচিত বৈয়াকরণিক আবেষ্টনী থেকে সরে এসে রসস্থিতির উপাদান হতে পারে, তা বিশ্বয়কর। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে একই শব্দ কবিতায় ব্যবহার করে, স্বধীন্দ্রনাথ গদ্যপদের নিবিড় আত্মীয়তাই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন—

অবশ্য বুঝেছি আজ এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী;
 কারণ অময়ব্যতিরেকী
 সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত
 এবং সে নিত্যবিপরীত
 দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যায়
 বিকল্প স্বভাবক্ষেত্রে।

সরলতার নিতান্ত অনটনে পূর্বোদ্ধৃত গদ্যাংশ যেমন আদর্শ রচনা হিসাবে গৃহীত হবে না। প্রতুল গদ্যশব্দের ব্যবহারে, বিদ্যাসপদ্ধতির অকাব্যিক আবেদনে

এই কবিতাংশও তেমনি নীরস অতিশয়োক্তি বলেই নিন্দিত হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কবিতার আত্মদানে পূর্বাঙ্গিত সংস্কার অধিকাংশ সময়েই পাঠককে বিপথগামী করে। তাই এই কবিতাংশের কথ্যভঙ্গী, গুরুভার শব্দাবলী এবং আবেগশূন্যতা জনসাধারণের কাছে ‘আকস্মিক’ বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। তথাপি ‘দ্বন্দ্বসমাস’ শব্দ অল্পপেক্ষণীয়, তার কারণ এই অদ্বিতীয় শব্দের জোরেই এই অংশ কাব্য-পদবির যোগ্য। প্রসঙ্গত স্মরণ্য, যে অল্পপেক্ষ শিল্পবিবেক স্বধীন্দ্রনাথকে কবিতায় এই শব্দব্যবহারে উৎসাহী করেছে, সেই অনিবারণীয় প্রভাব তাঁর গদ্যরচনাতেও অল্পপস্থিত থাকে নি। প্রকৃতপক্ষে গদ্যরচনায় এই শিল্পবিবেকের সাক্ষাৎ বঙ্গবাণীর সেবকদের মধ্যেও দুর্লভ। কারণ রবীন্দ্রনাথ যদিও গদ্যের অল্পপম শিল্পী, তথাপি শব্দব্যবহারে তিনিও সম্ভবত এতখানি মনোযোগী কোনদিনই ছিলেন না। তথাপি একথা আমরা মানতে বাধ্য যে রৈবিক গদ্য যখন সরলতম উচ্চারণ, যেমন ‘ছেলেবেলা’য়, তখনও তা রসস্থিতি এবং কবিত্বমাধুর্যে তুলনাহীন। অবশ্য ‘গঙ্গার ধারে সেই স্মর দিয়ে স্মিনে করা বাদলদিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে’—এই বাক্যাংশ গঠন না কবিতা তা বলা কঠিন। কিন্তু অত্যাশ্রয় প্রবন্ধসমূহে এমন কি-গল্প-উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ কবির যোগ্য গদ্য লিখেছেন। তাঁর গদ্যশৈলীতে সহজের প্রতি যে অল্পরাগ ব্যক্ত, তাতে শিল্পীর সংজ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে অল্পপস্থিত বটে কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য যে সে রীতির অধিকারস্বত্ব রবীন্দ্রনাথের মতো লোকান্তর কবি-প্রতিভারই একচেটিয়া। * রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে আর-একজন লেখকের কথা স্বতঃই এ প্রসঙ্গে মনে আসে—তিনি প্রমথ চৌধুরী। কবিত্বশক্তির অভাববশত যদিও তিনি গদ্যকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন নি, তথাপি তাকে তিনি জীবনী-শক্তি দিয়েছেন, সেই জীবনীশক্তি যা কথ্যরীতির অবশ্যজ্ঞাবী লক্ষণ। ভাষা যখন কথ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায়, তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। প্রমথ চৌধুরী একথা বুঝেছিলেন এবং সেইজন্তই তাঁর রচনা পড়লে মনে হয় তিনি যেন আমাদের সঙ্গেই কথা বলছেন, লেখকের সঙ্গে পাঠকের

* রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অত্যন্তম লক্ষণ উপমাপ্রিয়তা। বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্ত যে সমস্ত সাদৃশ্যচিন্তা তাঁর গদ্যে স্থান পায়, তা তুলনাবিহীন। কিন্তু গদ্যরচনায় এই উপমাপ্রয়োগ তখনই ব্যর্থ, যখন অল্পবুদ্ধি কবিদের ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় প্রযুক্তি অর্থকে পরিস্ফুট না করে আরও জটিল করে তোলে। তখন তাকে গদ্য বা কবিতা কোনটাই বলা যাবে না—বলা যাবে সংকর-রচনা।

দ্রুত নিশ্চিত করাই যেন তাঁর অভিপ্রেত দায়িত্ব। কিন্তু সংলেখকের
নিবন্ধনীয় প্রভাব সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নয়। ফলত প্রমথ চৌধুরীর
গতরীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে আধুনিক কালে যা ভূরিপরিমাণ তৈরী হচ্ছে
তারই নাম ‘রম্যরচনা’। যে আলাপী ঢঙ এই জাতীয় রচনার মৌললক্ষণ,
তার সঙ্গে অবশ্য বীরবলী শিল্পীমনস্কতার লেশমাত্র আত্মীয়তা নেই। জনপ্রিয়তা
দিকেই তার দুর্বল ঝোঁক এবং জনসংযোগের মধ্যেই তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার
পরিভূতি।

স্বাধীনীয় গত্তের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর আলোচনা এই
কারণে অনিবার্হ সে এই দুই পূর্বসূরীর প্রভাব তাঁর উপর নিশ্চিত। অবশ্য
‘প্রভাব’ শব্দটি নিরতই আমাদের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। একদিক দিয়ে
দেখতে গেলে সব লেখকই পূর্বসূরীর দ্বারা প্রভাবিত। এবং প্রভাব যেখানে
নিশ্চিত অনুকরণ নয়, সেখানে তার ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ—অবিচ্ছিন্ন শ্রোতোধারার
ভেসে যাওয়া এবং দায়িত্বশীল সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণ। একদা রাবীন্দ্রিক
গীতিরমধারায় বাংলাদেশের নিশ্চেষ্ট কবিত্বশক্তি আত্মসমর্পণ করেছিল; স্বথের
কথা ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম সেই গুরুবাদী যশ-প্রার্থীদের ক্ষমা করেনি।
প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ করে শ্রোতে গা ভাসানো নয়, তাঁর
কাছে সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণই যে উত্তরসূরীর আত্মকৃত্য একথা রবীন্দ্রভক্তরা
কখনোই বোঝেন নি। যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রথম শিক্ষা দিলেন নিজের
কথা নিজের মতো করে বলবার, যিনি কবিতাকে মুক্তি দিলেন যুদ্ধবর্ণনা,
স্বদেশপ্রেম আর কৃত্রিম ক্লাসিকতার বন্ধন থেকে, যার জীবনই শিল্প এবং
শিল্পসৃষ্টির গোড়ার কথা, তাঁকে আমরা অনেকদিন কাজে লাগতে পারিনি।
তিরিশের যুগে সেই শুভপ্রচেষ্টা যখন শুরু হোল, বিশেষকরে বাংলা কবিতায়,
মজার বিষয় তখন তা ভৎসিত হয়েছিল গুরুবিরোধী কার্যকলাপ বলে। কিন্তু
বুদ্ধদেব বসুর অল্পম রচনার পর কি করে আর রসজ্ঞ পাঠককে বোঝানো যাবে
যে চরিত্রপূজার সঙ্গে সাহিত্যিকের সম্পর্ক তুচ্ছ এবং সাহিত্যে সজ্ঞান বিরোধিতা
আত্মীকরণেই নামাস্তর? এবং সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের অনশ্বর ঋণস্বীকার
করে ‘তব্বী’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় স্বধীন্দ্রনাথ লিখতে পেরেছিলেন—‘শুধু
স্বন্দরের মোহ যে চোরকে পাপের পথে ভাঁকে, যে নিশ্চয়ই নীতিপরাণ নয়,
কিন্তু রূপজ্ঞ বটে।’ প্রকৃতপক্ষে যে রূপদক্ষ চৈতন্য স্বধীন্দ্রীয় রচনাবলীর
সার্বত্রিক লক্ষণ, তার সমান্তরলতা মেলে শুধু রবীন্দ্রনাথে। আত্মসৃষ্টির ব্যাপারে
রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্যকে মর্যাদা দিয়েছেন তিনি, আর শুনেছেন অহরহ

সেই সৌন্দর্যের আহ্বান যার অভাবে সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতা তুল্যমূল্য। অবশ্য একথা আমি বলতে চাইছি না যে কথ্যরীতির জগৎ প্রথম চৌধুরীর সামীপ্য তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্প যেহেতু কখনো বা কথ্যভঙ্গীপ্রধান, তাই কথ্যরীতিতে তাঁর ঔৎসুক্য সদাঙ্গাগ্রত ছিল না বলেই মনে হয়। তবে কথ্যরীতি তাঁর হাতে যে কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছিল ‘জীবনস্মৃতি’ ও ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থদ্বয়েই তার পরিচয় সহজ। যারা মনে করেন যে কথ্যভঙ্গী ক্রিয়াপদাশ্রিত, ‘জীবনস্মৃতি’ পাঠান্তে তাঁরা বুঝবেন যে সাধুক্রিয়াপদ ব্যবহার করেও কেন সেই গল্পভাষার পাশে বঙ্কিমের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ নিস্ত্রাণ বাক্পদ্ধতির দৃষ্টান্তস্থল। বারংবার পাঠককে সন্ধানন করেও বঙ্কিম যে কথোপকথনের স্পন্দন জাগাতে পারেননি, প্রাক্তন অভিজ্ঞতার একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়েই সেই ফলশ্রুতিতে উত্তীর্ণ করলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’কে। অবশ্য পরবর্তীকালে ক্রিয়াপদের পরিমার্জনায তাঁর উত্তম সর্বদা সক্রিয় ছিল। এবং তারই ফলে ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থের রচনাবলীতে একাধারে শিল্প ও মনন, অনুচারিত প্রয়াস ও মহত্তম সিদ্ধির সংমিশ্রণ দেখতে পাই।

পক্ষান্তরে প্রথম চৌধুরী অগ্রজের সাফল্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন বলে গল্পের চরিত্রলক্ষণ চিনতে তাঁর দেৱী হয়নি। ক্রিয়াপদের ব্যবহার তো বটেই, এমনকি স্বকাম্য গল্পের সম্ভাবনা যে কতখানি তাও আর অজ্ঞাত ছিল না। তাই নির্ভাবনায় প্রথম চৌধুরী কথ্যরীতির সার্বজনিক অনুশীলনের দিকে মন দিলেন। অবশ্য এখন আর স্বীকার করতে বাধ্য নেই, যে উচ্চাঙ্গের শিল্পীস্বভাব কথ্যরীতির নিত্যসঙ্গী, অলংকার-প্রযুক্তি তার সার্থক বিকল্প নয়। বীরবলী বাক্পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় হলে একথা আরো সত্য মনে হবে। তাঁর রচনায় শ্লেষ-যমক অনুপ্রাসের প্রাচুর্য গল্পকে স্মৃতিপাঠ্য করেছে বটে, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে সেই গাষ্ঠীর্ষ ও কমনীয়তা, লাবণ্য ও দাঢ্য, যা ভালো গল্পের তর্কাতীত স্বভাবলক্ষণ। সৌভাগ্যক্রমে প্রাথমিক ইতিহাসে স্বধীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য যেমন অবিচ্ছিন্ন ছিল, তেমনি এও কখনো তিনি মনে করেননি যে যা কিছু প্রাক্তন তাই হিরন্ময়। সেইজন্মেই কথ্যরীতির সন্ধানে যাত্রা করে প্রথমেই তিনি, অন্তত গল্পের ক্ষেত্রে, বীরবলী অনাড়ম্বরভাবে শ্রদ্ধা হারালেন। এবং যখন তিনি বললেন, ‘আগে পরমার্থের বার্তাবহ বলে স্মৃতি-স্মৃতি কবিদের ডাক পড়তো’, তখন তিনি শ্লেষ আনলেন বটে, কিছু তা পাঠককে বিদ্ধ করলো না, বরং উত্তীর্ণ করলো শিল্পের নন্দনলোকে। আবার, ‘দূরবীক্ষণ, রঞ্জনরশ্মি,

ছায়াচিত্র ইত্যাদির অল্পগ্রহে চৈতন্য সম্প্রতি অলক্ষ্যে দিশাহারা’—এই বাক্যে কাব্য-শোভন ‘দিশাহারা’ শব্দ ব্যবহার করে যে ক্লাস্তিকরতার সূত্রপাত ঘটালেন তিনি, প্রাথমিক ‘অল্পগ্রহ’ শব্দের দ্বারা তার সমাধান করতেও ভুললেন না। এমন উদাহরণ স্বধীন্দ্রীয় রচনাবলীতে সর্বত্র উপস্থিত। এবং প্রত্যেক বাক্যের বিশ্লেষণী আলোচনায় না নেমেও বলা যায় যে শব্দ ও অর্থের অপূর্ব সংমিশ্রণেই স্বধীন্দ্রনাথের স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে যেমন কবিতায়, তেমনি গদ্যেও, শব্দের প্রতি স্বধীন্দ্রনাথের আত্যন্তিক মনোযোগ লক্ষণীয়। এবং আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দের প্রতি তাঁর মোহপ্রবণতা বর্তমানে রীতিমতো ভৎসনার প্রসঙ্গ। কিন্তু স্বধীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় একাধিক সংস্কৃতানুগ শব্দের প্রয়োগ সুলভ হলেও, শব্দের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল ভিন্নতর। এলিঅটের মতো তিনিও বুঝেছিলেন যে অর্থের আশ্রয় এবং অর্থব্দের ব্যঞ্জনা ব্যতীত শব্দে সঙ্গীতের আবেদন কখনোই পৌঁছায় না। পূর্বোক্ত গদ্যাংশের অন্তর্গত এই বাক্যে—‘কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে আমরা পরিচয় যেহেতু জন্মগত, তাই উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার শিখতে আমাকে শেক্সপীয়রের কাছে ছুঁতে হয় না, এ দেশের বাঁ বাঁ রোদেই আমি চোখকানের ঝগড়া মেটাই’—শেক্সপীয়রের নামোল্লেখ অনেকেই বিদ্বাভিমানের পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করবেন। আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বধীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্বাকে কাজে লাগান শিল্পসৃষ্টির তাগিদে—বক্তব্যকে সমর্থন বা খণ্ডন করার জগ্গে নয়—কবিতার মতো গদ্যকেও একটি স্পষ্টরূপ দেবার জগ্গে। তাই ‘শেক্সপীয়র’ তাঁর দৃষ্টিতে একটি অর্থব্দের ধ্বনি, স্বায়ত্ত শিল্পরীতির অনিবার্য উপাদান। অতীত—‘এবং সেই জগ্গে আমার ভয় হয় যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ও দ্বিগুণ ব্যতীত প্রলয়সঙ্কুল কালক্রোচে সভ্যতার নিরুদ্দেশযাত্রা বুঝি বা কূল খুঁজে পাবে না’—এই বাক্যে ‘নিরুদ্দেশযাত্রা’ শব্দবন্ধ করে স্বধীন্দ্রনাথ যে আবহ সৃষ্টি করলেন তাঁর সঙ্গে বিশুদ্ধ কবিতার ফলশ্রুতি তুলনীয়। অথচ এখানে কঠিন শব্দের বিমুখ প্রতিক্রিয়া নেই, অতিসাধারণ শব্দ, সম্ভবত কাব্যেই যার ব্যবহার প্রথানুমোদিত, তা অত্যাগত শব্দের সঙ্গে অস্থিত হয়ে আমাদের কাছে রমণীয় হয়ে উঠেছে। আবার এমন শব্দও তিনি ব্যবহার করেন যা এলিঅট-কথিত ‘wealth of association’-এর ফলে সম্পূর্ণ বাক্যটিকেই একটি শিল্পসৃষ্টিতে রূপান্তরিত করে। উদাহরণতঃ ‘স্বাধিকারপ্রমত্ত’ ও ‘স্বায়ত্তশাসন’ শব্দদ্বয় উল্লেখযোগ্য। যে স্বর্ণীকৃত কবিতাংশে ‘স্বাধিকারপ্রমত্ত’ শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই সীমা থেকেই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তিনি শিল্পীর দায়িত্ববোধে। এবং তাকে

যদিও তিনি সমালোচকের প্রাস্তিক ও রক্ষণশীল মতামতের বিশেষণরূপেই ব্যবহার করেন, তথাপি অনুবন্ধের ঐশ্বর্যে তা বক্তব্যকে গোঁণ করে দিয়ে হয়ে ওঠে একটি শিল্পসৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে শব্দের এবং বিধ প্রয়োগের পশ্চাতে রচয়িতার মনোদর্শ সহজেই অনুমেয়। তা স্বধীন্দ্রনাথের আত্মকথায়— “সাহিত্যের শব্দ অভিপ্রায়ের জগৎ গৃহীত হয় না, গৃহীত হয় রূপের ভাগিদে; এবং সেখানে যেমন প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধ্যান। তেমনই ধ্যান বলে, প্রত্যেক শব্দস্বাধিকার গুণে আনন্দদায়ক।” (অর্দ্ধেতের অত্যাচার)। ফলে প্রবন্ধ-রচনাও তাঁর কাছে বক্তব্যের উপস্থাপনামাত্র নয়, একটি শিল্পসমর্থ প্রতিবেশসৃষ্টি।

কিন্তু একথা বলে আমি তাঁর মননসিদ্ধিকেই খর্ব করতে চাইছি না। অন্তত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধপঞ্চক যে বঙ্গসাহিত্যের অগ্রতম সম্পদ এবং প্রথম যথার্থ মূল্যায়ন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কারণ রবীন্দ্র-সমালোচনা বলে যে পরাসক্ত চর্চায় বাংলাদেশের একাধিক চিন্তানায়ক জীবন অতিবাহিত করেছেন, তা আসলে ভক্তিরসাস্রিত। যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটেছে, সেখানেও রুচির প্রভাব খুব অনিশ্চিত, প্রধামত বিষয়গত উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচারেই তা বদ্ধমূল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্লাস্তিহীন শিল্পীসত্তার পরিচয় ও বিশ্লেষণ স্বধীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে যেভাবে উপস্থিত, অগ্রত তার ছায়াও খুঁজে পাই না। এবং গুরুদেবের কাব্যের সঙ্গে প্রবাহের তুলনা যদিও রবীন্দ্র-অধ্যাপকরাও মেনে থাকেন, তথাপি তৎসম্পর্কিত গ্রন্থাবলী বিষয়সংকেতেই দিকভ্রান্ত, কেননা রবীন্দ্রপ্রতিভা প্রবাহের সমতুল্য তার উচ্চারণ কোথাও স্পষ্ট নয়। অথচ নির্দেশটা রবীন্দ্রনাথই দিয়ে গেছেন ‘কড়ি ও কোমলের’ ভূমিকায় এবং তাকেই অনুসরণ করে স্বধীন্দ্রনাথ প্রাতিশ্বিক উপলব্ধির সঙ্গে শিল্পাঙ্গিকের সম্বন্ধনির্ণয়ে যত্নবান হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত প্রবন্ধের সরলীকরণ বর্তমান রচনার উপজীব্য নয় বলে এ সম্পর্কে বাগবিস্তার নিম্প্রয়োজন। শুধু এইটুকুই স্মরণীয় যে, রবি-প্রদক্ষিণের দুঃসাহস পরিত্যাগ করে স্বধীন্দ্রনাথ যেহেতু আলো আর তাপেই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আত্মাহুতির গৌরব তিনি অর্জন করতে পারলেন না—স্বাভাবিক আত্মবিকাশই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা হয়ে রইলো। এবং তাঁর এই আত্মানুগ নির্ধারণ ফলেই আজ বাংলাসাহিত্যের অনতিদীর্ঘ ইতিহাস হাওয়া-বদলের সম্মুখীন। কেননা ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত গচ্ছ-পতের যে অর্ধেতচর্চা কখনোই সজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ীভূত হয়নি—স্বধীন্দ্রনাথ তার মধ্যেই সাধনার রাস্তা খুঁজে পেলেন। তথাপি শিল্পীস্বলভ অতৃপ্তিবোধে

‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—“বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গন্ত-পন্থের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তি-বিপর্যয়, ইত্যাদি বাংলাকাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতার রয়ে গেল।”*

আপাতদৃষ্টিতে স্বধীন্দ্রীয় গণ্ডের এবং কবিতার বিশিষ্টরূপ বাঙালী পাঠকের কাছে কাঠিন্য ও জাড়ের যে অনমনীয় দুর্লক্ষণ নিয়ে উপনীত, অধিকাংশের মতে দেশজ গণ্ডের ইতিহাসের তার নমুনা তো অলঙ্কার বটেই, পূর্বাভাস পর্যন্ত অদৃষ্ট। ফলে তাঁর রচনারীতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞার সংমিশ্রণে ইতোমধ্যেই কিংবদন্তীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু একটু ভাবলেই ধরা পড়ে যে তিনিও শ্রোতাবাহারী থেকে বিচ্ছিন্ন নন এবং যতটুকু দূরত্ব রেখে তিনি তাঁর মনোলোকের সংবাদ পরিবেশন করেন, তা আসলে আত্মমগ্ন ব্যক্তিস্বভাবের পরাকাষ্ঠা নয়, শিল্পীর নির্লিপ্ত স্বগতোক্তিরই পরিবাহক। কারণ একথা তিনি আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মহাকবিদের ভাগ্যে তৈরী শ্রোতা কদাচিত্ জোটে। এবং জীবনব্যাপী শিল্পীমগ্ন সততা সত্ত্বেও বাংলাদেশের হৃদয়ে যেহেতু এখনো তিনি প্রবেশাধিকার পাননি, তাই মনে হয় যে শ্রোতৃমণ্ডলী তৈরী করবার দায়িত্বই তাঁর উপর অর্পিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আকস্মিকমৃত্যু অনেক গরিষ্ঠ সম্ভাবনার উপরেই চিরদিনের মতো ছেদ টেনে দিয়েছে। তিনি যেহেতু মননশীলদের অগ্রগণ্য ছিলেন তাই প্রভূত লেখার দৈবাহুগ্রহ তিনি কোনোদিনই অর্জন করতে পারেন নি। তিনি সেই স্বল্পসংখ্যক লেখকদেরই একজন, যাদের আত্মসন্তোষ সম্ভাবনাকে স্থাপু করে না, যাদের নিরন্তর প্রয়াসে ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ প্রতিশ্রুতি স্পষ্টতা পায় আর উত্তরসূরীদের জন্ম তৈরী হয়ে ওঠে শিল্পের নবীন আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে এই শেখোক্তিই স্বধীন্দ্রনাথের ভাব ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে স্পষ্ট। তাঁর প্রতিভা তাই প্রণীত গ্রন্থের মধ্যেই বদ্ধমূল নয়, আরো ব্যাপক এবং অন্তঃশীল, দায়িত্বশীল উত্তরসূরীর অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ ব্যতীত আর গুরুত্ব প্রমাণের আর কোন সহজ রাস্তা খোলা নেই।

* এবং জীবনের উপান্তে পৌঁছে নিজস্ব পদ্ধতীতি সম্পর্কে তিনি যে কথা স্মরণে লিখেছিলেন তাও যদি বশঃপ্রার্থীদের সৃষ্টিভঙ্গ ঘটাতে না পারে, তবে বুঝতে হবে বঙ্গসাহিত্যে পরাগতির দুর্দিন আসন্ন—“গত কয়েক বছর ধরে আমার প্রাক্কালীন গন্ত আমাকে কেবলই লজ্জা দিয়েছে। উক্তি ও উপলব্ধির অনৈক্য, চিত্রকল্পের পরিবর্তে কবিত্র্যসিদ্ধির ব্যবহার, ভাষার স্থবিধাদাবাদী বিকার, ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাব্যের বড় উপসর্গ, সব কটাই আমার পুরাতন লেখায় বর্তমান।” (স্বগত—‘পুনশ্চ’)

অন্তরীক্ষের সঙ্গীত

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ পাঁচ ॥

কর্ম এড়িয়ে নয়, কর্মের মধ্য দিয়েই কর্মত্যাগের আনন্দে, অর্থাৎ মুক্তির বিজ্ঞানানন্দে, যেতে হয়।

যখন ‘কর্ম’ করি তখন যদি ভাবি, যে কর্মদ্বারা আমি পূর্বজন্মের ঋণই পরিশোধ করছি তবে কর্মদ্বারা বর্তমানে মনোমত ফল যদি কিছু না-ও পাই—তবুও দুঃখ-জাগবে না, হাহাকারে মন পূর্ণ হবে না—এবং সেই হেতু কর্ম তখন বন্ধন হবে না আমার জীবনে। অন্তরে শুভবুদ্ধির আনন্দটি আমার যাবতীয় কর্মে যদি সঞ্চার করে রাখতে পারি, তবে এই ভেবে নিশ্চয়ই সাহস হবে যে আগামী জন্মের জন্ম স্মৃতি সঞ্চয়ে হচ্ছি প্রস্তুত।

সাধারণতঃ আমরা কর্ম করি—সত্ত-সত্ত কিছু প্রাপ্তির আশায়। সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলা খুবই কঠিন—একপ্রকার অসাধ্য বললেই হয়, যে, আমরা ইহজীবনে যে ফলভোগ, দুঃখভোগ অথবা সুখভোগ, করি—তার জন্ম দায়ী শুধু বর্তমান জীবনের কর্মই নয়। বর্তমান কর্মে প্রারম্ভের প্রভাবটাও বিচার্য। জীবনে সাফল্য অথবা অসাফল্য, মান-অথবা অপমান—বর্তমানে যা পাচ্ছি, তার মধ্য থেকেই অতীতজন্মের ইতিহাসটি পাঠ করা, ব্যাখ্যা করা, জ্যোতির্জ্ঞানী বিদ্বন্ধের পক্ষে খুব যে কঠিন, তা নয়।

স্পষ্ট কথা এই—পূর্বজন্মের স্মৃতি যদি থাকে, তবে ইহজন্মে আপনি অধিকারমত সুখ ও সাফল্য পাবেনই ; এবং ‘অদৃষ্ট’ আপনাকে তদনুযায়ী কর্ম আপনানি ইচ্ছাবেগের মধ্য দিয়ে যথাসময়ে ঠিক করিয়ে নেবে। এ-জন্মে কর্ম করে এ-জন্মেই তার ফল পেয়ে গেলেন—এ-ধারণা সহজবোধ্য বাস্তব ধারণা হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নয়, তাই সত্য নয়।

এইজ্ঞা শাস্ত্রমতে—কর্ম করার সময় কোনো কামনার বশবর্তী হতে নেই। কেন? না কামনার বশবর্তী হলে যে-বিষয় বা বস্তু কামনায় আপনি মগ্ন সেই বস্তু বা-বিষয়ের বন্ধনে আপনাকে বন্দী হতে হবে : আপনার অনাগত জীবনটি এই বন্ধনভারে হবে আনমিত, স্তবরাং গতিপথ তার রুদ্ধ হতে বাধ্য।

কর্ম করতেই হবে জীবনে—কিন্তু করতে হবে নিষ্কামভাবে। নিষ্কামভাবে কর্ম করার মহত্ত্ব এই : পূর্বজন্মের স্মৃতিগুণে আপনি ইহজীবনে ফল তো পাবেনই, কিন্তু বিশেষ কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা বর্তমানে রাখেন না বলে আগামী জীবনে আপনার দেবযান গতিও হবে সম্ভব।

বলতে পারেন, পূর্বজন্মের স্মৃতি যদি না থাকে? যদি না থাকে, তবে যতই কামনা করুন, ‘রূপং দেহি, ধনং দেহি যশো দেহি’ বলে দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়ুন, বড়মানুষের দ্বারে গিয়ে কাঙালপনা করুন কিংবা ছলবলকৌশলের সহায়তা নিন, মনোমত ফলোদয় কিছুতেই হবে না। আবার একথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, যে, কাঙালপনা করার দরুণ আপনার অজ্ঞাতেই আগামী জীবনটিকেও আপনি করবেন দুর্গতিদীর্ণ।

সকামকর্ম তাই দুর্বলের কর্ম; অবাস্তব কর্ম বলে জানি। নিষ্কামকর্মই জীবনের গতিপথকে প্রশন্ন করে, প্রশস্ত করে।

‘ব্রাহ্ম-নামা’টিকে লক্ষ্য রেখে কর্ম করার মত আনন্দ-কর্ম আর কিছু নেই। লক্ষ্য খুবই বড় একেবারে বড়, যার বড় আর কিছু নেই—এই জ্ঞান অল্পে ভরে না মন। অল্পে যার মন ভরে না অল্পের জ্ঞান সে কর্মও করে না—করে বৃহত্তর জ্ঞান, তুমার জ্ঞানে প্রভুত্বের জ্ঞানে। এই কারণে ইহজীবনের সাফল্য অথবা অসাফল্য তাঁর চিত্তকে স্পর্শই করে না, তিনি শুধু করে যান, করে যান আর করে যান। তাঁর কর্মের মধ্যে মহতো মহীয়ান সেই ব্রহ্মভাবে বীজটি থাকে বলে মুক্তিপথে তাঁর একারই যে শুধু গতি হয়, তাই নয়,—দেশকল্যাণের এমন কি বিশ্বকল্যাণেরো, তা’ সহায়ক হয়।

ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যদি থাকেই, তবে একেবারে বড় ফলটিই চাই। জেনে রাখা ভালো বড় ফলটি পেতে হলে ছোট ফলটি কামনা করতে নেই। ছোট নিয়ে যদি ভুট্ট, তবে ছোটের মধ্যে বহুজন্ম ছোটালুটি করতে হবে, বড়ের জ্ঞান যদি ব্যগ্রতা, তবে অর্জুনের একমুখী লক্ষ্য নিয়ে জন্মথেকে জন্মান্তরে অব্যাহত একাগ্রনিষ্ঠায় জাগতে হবে। মুক্তি আসবে। গতির জনই কি গতি? মুক্তির জ্ঞানই তো গতি?

যেতে যেতে এক এক সরাইখানায় আসব ; কিছুদিন থাকব, ঠকাব না কাউকে, কাঙালপনা করব না কারোর কাছে, সহযাত্রীদের শুভকামনা করে, সবার ভালো প্রার্থনা করে অন্তরে, সাধ্যমত উপকার করে সকলেরি— ধীরে ধীরে চলব গন্তব্যের পুণ্যমন্দিরে ।...সকাম কর্ম মানেই পিছু-ফিরে দেখা, পিছু-হঠা । পিছু-হঠাতে আসি নি যদি বুঝে থাকি, তবে পথের কোনো প্রলোভনেই নয়, পথ ভেঙে-ভেঙে কেদার-বন্দীর পর্বত-কঠিন বন্ধুর পথ ভেঙে-বহু চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে করে একদিন ঠিক পৌঁছে যাব নিত্যপূর্ণের শিব-মন্দিরে । তখন কী দেখব ? দেখব সেই পূর্ণ আর কেউ না, এই আমিই । তখন মন্ত্র কী ? না, সোহহম্ সোহহম্ । সচ্চিদানন্দ শিবোহম্ । সেই আমি, সেই আমি সৎ চিং আনন্দ সেই শিব আমি । সেই আমারি অন্বেষণেই এই আমারি অভিযান ।

॥ ছয় ॥

জীব-শরীরে অবস্থান করেও জীবমুক্তির সাধনার দ্বারা একেবারে শিব আত্মাকে দর্শন করার, আয়ত্ত করার কথা অর্থাৎ সর্বজগদগত সেই আমি-সত্তায় প্রমুদিত হয়ে সর্বানন্দভূ হওয়ার কথা—শাস্ত্রে আছে । অনন্ত সেই সর্বব্যাপী শিবচৈতন্যকে আমাদের দেহস্থ, মর্মস্থ অল্পচৈতন্য দ্বারা ধারণ করা, বহন করা, বা দর্শন করা অবশ্য সম্ভব না ! আমরা, সাধারণ মানুষেরা, জীব-শরীর থেকে ভাব-শরীরে বড় জোর জাগতে পারি ; মৃত্যুর পরে যে-শরীরটুকু ও চৈতন্যটুকু নিয়ে আমরা থাকি—তার দর্শন পেতে পারি । আমাদের মধ্যে যারা অসাধারণ যারা সাধনমার্গের সর্বোচ্চস্তরে বহুজন্মের দিব্যসাধনায় সম্মুখিত, তাঁরা বাসনার শতকোটি সূক্ষ্ম শরীরের বন্ধন ত্যাগ করে একেবারে আত্মায় গিয়ে অধিষ্ঠিত হতে পারেন । সেইসব জীবমুক্ত মহাত্মা ইহলোকেই চৈতন্যলোকের নির্দেশ আনেন । সহস্র জন্মের মহাজ্ঞান মাইষকে দান করেন ।

এমন মহাত্মা সংসারে যুগে যুগে জন্মেছেন । তবু যে আমরা তাঁদের কথা নিতে পারি নি, চরিত্রে প্রতিভাভ করত্রে পারিনি, তার কারণ তাঁদের কথা বোঝার অধিকার এখনও আমরা অর্জন করিনি । শাস্ত্রে যে অধিকার-ভেদের কথা আছে তার তাৎপর্য ক্ষুব্ধই গভীর ।

আমি শাস্ত্রগ্রন্থ সামান্যকিছু পড়েছি । আত্মতত্ত্ব কী—বক্তৃতা করে বোঝাতে পারি, হয়তো জ্ঞাতব্য কিছু গ্রন্থও লিখে দেওয়া অসম্ভব নয় । কিন্তু মনে মনে জানি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা এই যুগ-প্রভাবিত বর্তমান জীবনের

কর্ম নয়। অনেক জন্ম আমাদের ঘুরতে হবে। স্থখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার চক্রে ঘুরে ঘুরে আসতে হবে আমাদের। জ্ঞানসত্তার প্রভাবে মুখে যাই বলি, কলমে যাই লিখি,—স্বভাব-সত্তার গভীরে আমার অনেক আশা, অনেক কাম-কামনা, যশোলিপ্সার অনেক মোহ, এই জীবনের এই নামটাকে, প্রতিষ্ঠা দেবার অনেক প্রয়াস। স্বখে-স্বচ্ছন্দ্য থাকবার জন্তে আমি টাকা চাই, ভালো বাড়ী চাই, মনোমত আসবাবপত্র চাই—লজ্জার কথা আর কত বলব, আমি গাড়ী চাই, পাড়ার লোকে আমাদের বেশ একজন কেউ-কেটা বলুক, এমনটা কে বললে আমি চাই না? আমি চাই আমার ছেলেমেয়েরা বেশ ভাল লেখাপড়া শিখুক দেশের গণ্যমান্য হক, ছেলেদের সব ফুটফুটে সোনাপানা বৌ আঁসুক, মেয়েদের মনের মত বর আঁসুক, আমি চাই।

আমার চাওয়ার কি ছাই শেষ আছে? বয়স অর্ধশতাব্দী কবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—বনে যাবার বয়স হয়ে গেছে বহুকাল, তবু মাঝে মাঝে পঁচিশ বছরের ছোকরাটি হতে চাই, মাঝে মাঝে মনে মনে হয়েও যাই, গান লিখি কাঁচা মনের প্রণয়গান, গল্প লিখি আধুনিক মনোজীবনের জটিলতার, লজ্জার মাথা খেয়ে তা ছাপতেও দিই পত্র-পত্রিকায়, গ্রন্থকারে বারও করি। জ্বী তা পড়ে লজ্জা পান, আমার কিন্তু লজ্জার বালাই নেই।

কী এতে বোঝাতে চাইছি? আমার মত আমার পাঠক-পাঠিকাও। আমরা সবাই বড় ভালবাসি এই পৃথিবীকে, পার্থিব এই জীবনকে, জীবনের এই বিশ্ববিধ ভোগভূষণকে। সহজে এ-সব ছাড়তে চাই নে।

শাস্ত্রকারেরা তৃষ্ণার অতীত্বেই কিন্তু যেতে বলেছেন। কথা তাঁদের বুঝি না যে, তা নয়, কিন্তু চরিত্রে তা ফলাতে পারি না। কেন পারি না তা' জানি। ছাড়ার কথায় রস পাইনে তাই ছাড়ি নে। গতজন্মে এমন কোন সাধনা করিনি—তার প্রভাবে ছাড়ার আনন্দ এ-জন্মেই পূর্ণ ভাবে আশ্বাদ করব। এ-জন্মে শুধুমাত্র এ-টুকুই হল, আমি মহর্ষিদের জ্ঞানকে বিশ্বাস করলুম, সত্য বলে স্বীকার করলুম, সাধিতব্য বলে শ্রদ্ধা করলুম এতেও অনন্ত আনন্দ।

এই আনন্দই আমার বাসনালোককে পরিশুদ্ধ করেছে। আগামী জন্মে এর প্রভাবে আরো তীব্রতর বিশ্বাস ও তীক্ষ্ণতর মেধা নিয়ে জন্মাব। তখন ভোগে যে-রস, ত্যাগে তারো চেয়ে মধুরতর রস আশ্বাদ করব।

গতজন্মে যা করেছি তার ওপর আর আমার হাত নেই। যে তীর ছুঁড়ে দিয়েছি তা আর ফেরাতে পারব না। কিন্তু যে-তীর এখনো ছুঁড়ি নি—কোন

লক্ষ্য তা ছুঁড়ব এখন থেকেই স্থির করতে পারি। এখানে আমার সাধনার স্বাধীনতা আছে।

কেমনতর স্বাধীনতা? না, কর্মবাসনাকে মলিনা না করে বিশুদ্ধ করার স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতাতুই পাওয়ার স্কৃতি করেছি পূর্বজন্মে। মন আমার মলিনপথে যাচ্ছে, আমি তাকে প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দেব। প্রাথমিক চেষ্টাতেই যে জয়ী হব তা নয়। অনেকবার হারব। পড়ব। কিন্তু আবার উঠব ধূলি বেড়ে। পূর্বজন্মেই এটা আমি যে করে এসেছি, অনেককিছু চাওয়ার মধ্যে এটা-ও যে চেয়ে এসেছি—এ-জন্মের এই মনোভাব থেকেই তা বুঝতে পারছি।

এজন্মে আমি অনেক চাই। কিছু পাই, কিছু পাই না। পাই না বলে মনে অভৃষ্টি হাহাকার যে জাগে না, তা নয়, কিন্তু যদি বুঝতে পারি এ-হাহাকার আমি পূর্ব থেকেই শুধু যে রচনা করে রেখেছি তা নয়, আগামী জীবনের জন্তেও নবতর হাহাকার সঞ্চয় করছি অজ্ঞাতসারে, তবে তপস্যায় বসব এ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার অভিপ্রায়ে।...জীবনে কোনো ক্ষেত্রে সফল হলাম না বলে' কাপুরুষের মত যারা কাঁদে, তারা কেবল কাঁদেই। জন্ম থেকে জন্মান্তরে তুচ্ছ-প্রাপ্তির

আপনায় যা কিছু প্রিয়

সেগুলি বাঁচাবার জন্তই

আরও বেশী সঞ্চয় করুন।

জন্ত কেবল হাহাকারই করে। বীরের মতো তাই বলা ভালো 'বয়েই গেল'। যা পাইনি—কাঙালের মত তার দিকে হাত বাড়িয়ে লোকহাসানো তো শুধু নয়, অনাগত জীবনটাকেও কাঙাল করে তোলার পথ পরিষ্কার করা। তার চেয়ে যা পেয়েছি তাতে তুষ্ট থেকে জীবন-জয় আমাকে জাগতে দাও। অনেক তুমি পেয়েছ বলে, নাম পেয়েছ, যশ পেয়েছ, বাড়ী পেয়েছ, জনবল পেয়েছ বলে তোমাকে দীর্ঘা করব না; বয়ঃ বলব, তুমি আরো যেন পাও কিন্তু বস্তু-পাওয়ার বিড়ম্বনায় যেন আত্মার পথ তোমার অন্ধকার না হয়। সংসারে যে কটা দিন আছি, সাধারণ কর্তব্য-কর্মগুলি সাধন—করে স্বদেশের সেবা করে নীরবে, বিশ্বের মঙ্গলকামনা করে আনন্দে, ভাবের গভীরে যেন থাকতে

পারি। সংসার-পথে চলতে চলতে পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দোষে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অবমানিত হব, অসফল হব, প্রতারিতও হব। অনেক মানুষ বন্ধু-ভাবে এ-সে শত্রুতাচরণ করে' সরবে, ভালো কিছু করেও নিন্দা পাব ঘরে-বাইরে তবু আত্মদক্ষিণ আমি হারাব না। ইহ-জীবনে পূর্ণ আত্মতত্ত্বে হয়তো আমার অধিকার নেই, কিন্তু সাধারণ এই জীবনতত্ত্বে-ও কি নেই? 'সদভাবে অর্থ উপার্জন করে', সাধ্যমত দান দিয়ে, সাধ্যমত লোকের উপকার করে, সাধ্যমত জনকজননী, ভাইভগ্নী, পুত্রকন্যা, ছাত্রছাত্রী, পাড়াপ্রতিবাসী, বন্ধু-স্বজনের সেবা করে, সাধ্যমত ইষ্ট-দেবতার নাম নিয়ে সাধারণ সামাজিকের জীবন যাপন করে যাওয়ায় এ-জন্মে তো কোনো বাধা দেখি না। সামান্য এই কর্ম-কর্তব্যটুকুতেও যদি অনিচ্ছা, তবে বুঝতে হবে পূর্বজন্মে আমি অতি নীচ ছিলাম, আগামী জন্মেও আরো নীচ হয়ে আমি জন্মাব।

তথাপি আমার কথা এই—জীবনের গতিপথে এমনতর নীচ আমি-রো বন্ধনমুক্তি সম্ভব, আত্মদর্শন সম্ভব। তবে বিচার্য এই : কত কোটি জন্ম-জীবন ও মৃত্যু-জীবন পর সম্ভব?

॥ বেঙ্গলের বরণীয় সাহিত্য সম্ভার ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

দেবতাত্ত্বা হিমালয় ১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ২১.০০ ॥
২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০.০০ ॥

স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের	
প্রদক্ষিণ ২য় মুঃ	৪'০০ ॥ দিকুশূল (৩য় মুঃ)	৪'৫০ ॥
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর	নবেন্দু ঘোষের	
মহাকাল (২য় মুঃ)	৩'৫০ ॥ ড়াক দিয়ে যাই (৬ষ্ঠ মুঃ)	৩'০০ ॥
নারায়ণ সান্যালের	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের	
মনামী	চার টাকা ॥ মার্কবাদ	২'০০ ॥
বিক্রমাদিত্যের	দিলীপ মালাকারের	
যুদ্ধের ইয়োরোপ	৪'০০ ॥ নেপোলিয়নের দেশে	২'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

বাংলায় কালিদাস-চর্চা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমলেন্দু ঘোষ

[রঘুবংশ]

রঘুবংশ—মহাকাব্য ; ১৯শ সর্গে সমাপ্ত । রাজা দিলীপ থেকে শুরু করে অগ্নিবংশ পর্যন্ত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে এই মহাকাব্যে ।

কিংবদন্তী আছে : প্রথম জীবনে মূর্খ কালিদাস স্ত্রীর কাছে তিরস্কৃত হয়ে প্রাণত্যাগের সংকল্প নিয়ে সরস্বতী কুণ্ডে ঝাঁপ দেন । কিন্তু সরস্বতীর আশীর্বাদে মূর্খ কালিদাস পরিণত হলেন পণ্ডিত কালিদাসে । কালিদাস তখন ফিরে এলেন স্ত্রীর কাছে এবং দ্বার খুলতে অল্লসোধ জানালেন—“অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ” এই বলে । কালিদাসের স্ত্রী তখন স্বামীর পরীক্ষা চাইলেন, কালিদাস-কথিত তিনটি বাক্যের সাহায্যে তিনখানি গ্রন্থ রচনার নির্দেশ দিলেন । পণ্ডিত কালিদাস তখন সেইখানে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে তিনখানি কাব্য শুনিয়ে দিলেন স্ত্রীকে । ‘অস্তি’ শব্দ অবলম্বনে ‘কুমারসম্ভব’ ; ‘কশ্চিৎ’ শব্দ অল্লসারে ‘যেষদূত’, এবং ‘বাক্’ শব্দ অল্লসারে “বাগার্থাবিব সম্প্ৰজ্ঞো” এই প্রথম শ্লোক নিয়ে রচিত হল ‘রঘুবংশ’ নামক মহাকাব্য । বিদ্বষী স্ত্রী তখন কালিদাসকে পণ্ডিতরূপে শ্রদ্ধা জানালেন ।

দুই ॥ অনুবাদপঞ্জী

১৮৯২—চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ১৮৯৯—অজ্ঞাত, ১৯০২—নবীনচন্দ্র দাস,
১৯০৪—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৫২—কালিদাস রায়, ১৯৫৪—অমলেন্দু গুপ্ত ।

১৮৯২ [১২৯৯]

রঘুবংশ—মহাকবি কালিদাস-বিরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ—চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ প্রণীত—১ম সংস্করণ—২৫ জ্যৈষ্ঠ সংবৎ ১৯১২ ; ১৪শ সংস্করণ, সংবৎ ১৯৪৯ [১৮৯২ ইং] ; পৃ. ১৩৬ (খণ্ডিত) কলিকাতা মেট্রিকাল যন্ত্রে মুদ্রিত ।

অনুবাদের নমুনা :

“কিয়দিন পরে রাজীদিগের গর্ভসঞ্চার হইল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ ও গভিত ধাতুস্তম্ভের ত্রায় শোভমান হইতে লাগিলেন। এক নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া তিন রাজপুত্রীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। রাজীরা স্বপ্নাবস্থায় দেখিতেন যেন শংখচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ খর্বাকৃতি দিব্য পুরুষেরা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; গরুড় স্বর্ণবর্ণ পক্ষজাল বিস্তার করিয়া অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগকে বহন করিতেছেন; কৌস্তভধারিণী কমলা হস্তে কমল ধারণ করিয়া কতই উপাসনা করিতেছেন; এবং সপ্তর্ষিগণ মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া বেদগানপূর্বক তাঁহাদিগের স্তবস্তুতি করিতেছেন। রাজা মহিষীগণের নিকট এইরূপ স্বপ্নবর্তী শ্রবণ করিয়া জগৎপিতার পিতা হইলেন ভাবিয়া মনে মনে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন।

“অনন্তর সম্পূর্ণ দশম মাসে প্রধান রাজমহিষী কৌশল্যা শুভলগ্নে শুভক্ষণে পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। কুমারের রূপে স্মৃতিকাগার উজ্জ্বল হইল। নরপতি পুত্রের রমণীয় রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাম নামে বিখ্যাত করিতেন। তদনন্তর মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর ভরত নামে এক পুত্র হইল। পরিশেষে কনিষ্ঠা স্মিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করলেন। রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দশাননের কিরীট হইতে রাক্ষসত্রীর অশ্রুবিদ্যুৎরূপ একটি উজ্জ্বলতর রত্ন স্থলিত হইল। স্নতানন সন্দর্শন করিয়া রাজার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। স্থানে স্থানে নর্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে বাজকর সকল বাজোন্মম আরম্ভ করিল। তদীয় পুত্রজন্মে অমরগণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং প্রজাগণ গৃহে গৃহে নানাবিধ মহোৎসব করিতে লাগিল। অনন্তর কৃতসংস্কার রাজপুত্রেরা শাপশোধিত মণির ত্রায় সমধিক শোভমান হইয়া দিন দিন শশিকলার ত্রায় পরিবর্ধিত হইতে লাগিলেন।

“কুমারেরা স্বভাবতঃই অতিশয় বিনীতস্বভাব ছিলেন। আবার পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপদেশ লাভ করিয়া ততোধিক বিনীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পরস্পর বিরোধ করিতেন না। চারি জনেরই সমান সৌভ্রাতৃ ছিল। তথাপি লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের দ্বিবিশেষ প্রণয়ভাজন হইলেন। যেমন বায়ুবহির বা চন্দ্রসমুদ্রের প্রণয় কদাচ স্থলিত হইবার নহে, তদ্রূপ রামলক্ষ্মণ ও ভরতশত্রুঘ্নের পরস্পর সদ্ভাবও অস্থলিত হইল। গ্রীষ্মকালাবসানে মজল-জলধরাবলী যাদৃশ লোচন-প্রীতিকর হয়, তাঁহারাও প্রজাপুঞ্জের সেইরূপ

জানন্দজনক হইলেন । . রাজা দশরথ এইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় অলৌকিক পুত্রচতুষ্টয়ের পিতা হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।”

—[দশম সর্গ] ।

আলোচ্য চতুর্দশ সংস্করণ রঘুবংশের অনুবাদ চন্দ্রকান্ত মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আশুতোষ শর্মা কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ।

প্রথম সংস্করণের ‘বিজ্ঞাপন’ অংশে চন্দ্রকান্ত লিখেছেন : “.....ইহাতে [রঘুবংশ কাব্যে] সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের জীবনচরিত, রাজনীতি, স্থললিত হিতোপদেশ, এবং কাব্যশাস্ত্রে বর্ণনীয় যে কিছু উৎকৃষ্ট বিষয়, তৎসমুদায়ই বর্ণিত আছে । ..

“...অধিক কি বলিব, সমগ্র রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে যাদৃশ ফললাভ হয়, রঘুবংশ পাঠে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সমুদায় জানিতে পারা যায় ।

“আমি রঘুবংশের এই সকল গুণ নিরীক্ষণ করিয়া এবং আমার কোন হিতৈষী বান্ধবের পরামর্শ লইয়া অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই । পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত অনুবাদ করা হইলে সংস্কৃত কলেজের পূর্বতম অধ্যক্ষ অশেষগুণমাগর শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম । বিজ্ঞানাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক সেই অংশটি অবলোকন করিয়া আমাকে লিখিতে আদেশ করেন । অধুনা উক্ত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই. বি. কাউয়েল এম. এ. মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া বহু ব্যয় স্বীকারপূর্বক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম । ইহা সংস্কৃত রঘুবংশের অবিকল অনুবাদ নহে । অঙ্গীল অংশ সকল ঐক বাবেরই পরিত্যক্ত হইয়াছে । যে সকল সংস্কৃত ভাব বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে বিরস হইয়া উঠে তাহাও পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে সূত্রাব্য বোধে দুই একটি নূতন বিশেষণ পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । ফলতঃ সংস্কৃত রঘুবংশ পাঠে সহৃদয় লোকদিগের যাদৃশ প্রীতিলাভ হয় ; ইহা পাঠ করিলে তদনুরূপ প্রীতিলাভের কোন রূপেই সম্ভাবনা নাই । যাহা হউক, যদি পাঠকবর্গের যৎকিঞ্চিৎ সন্তোষকর হয় তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব ।”—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৭ ।

১৮৯৯ [১৩০৬]

রঘুবংশ | বঙ্গভূমির উপহার | মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলি [বঙ্গানুবাদ] ।
কলিকাতা ১৩০৬ সাল পূ. | ৯৮ [অনুবাদকের নাম অপ্রকাশিত] ।

অনুবাদের নাম :

বাক্য ও অর্থের স্মারক পরস্পর সংশ্লিষ্ট । জগতের জনকমনীষরূপ পার্বতী

ও মহাদেবকে বাক্য ও অর্থের সম্যক্জ্ঞানলাভের নিমিত্ত বন্দনা করি । ১ ।
 সূর্যপ্রভাবংশই বা কোথায় ? অন্নবিষয়গ্রাহিণী মতিই বা কোথায় ? আমি
 মোহবশতঃ ভেলাদ্বারা ছুস্তর সাগর উত্তীর্ণ অভিলাষী হইতেছি । ২ । আমি
 মূর্থ, তথাপি কবিদিগের যশকে প্রার্থনা করিতেছি ; অতএব, উন্নতপুরুষের
 লভ্য ফলে লোভবশতঃ উর্ধ্ববাহু খর্বাকৃতি পুরুষের ত্রায় উপহাসাম্পদ হইব
 । ৩ । অথবা মণিকে বজ্রদ্বারা অর্থাৎ রত্ন বিদ্ধ করিবার সূচীবিশেষদ্বারা বিদ্ধ
 করিলে তন্মধ্যে যেমন সূত্র অনায়াসেই গমন করিতে পারে ; তদ্রূপ পূর্বকবিগণ
 (রামায়ণাদিরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়া) বাক্যরূপ প্রবেশদ্বার নির্মাণ করিয়া
 গিয়াছেন, অতএব আমি প্রবেশ করিতে পারিব অবশ্য পূর্বকবিগণের রচিত
 রামায়ণাদি অবলম্বন করিয়া রঘুবংশ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব । ৪ । সেই
 (অর্থাৎ পূর্বকবিগণের রচিত রামায়ণাদি অবলম্বন করিয়া রঘুবংশ রচনা
 করিতে প্রবৃত্ত,) আমি, ঐহারা জন্ম হইতে বিমুগ্ধ, ঐহারা ফল না করিয়া
 আরম্ভকার্য হইতে নিবৃত্ত হইতেন না, ঐহারা সমাগরা পৃথিবীর অধিপতি
 ছিলেন, স্বর্গপর্যন্তও ঐহাদিগের রথের পথ ছিল, ঐহারা শাস্ত্রানুসারে অগ্নিতে
 আহুতিপ্রদান করিতেন, ঐহারা যাচকগণের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন, ঐহারা
 যথাসময়ে নিজ কর্তব্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, ঐহারা দানের নিমিত্তই অর্থসংগ্রহ
 করিতেন, ঐহারা সত্যবাক্য বলিবার নিমিত্তই অপর রাজগণকে জয় করিতে
 অভিলাষী ছিলেন, ঐহারা বংশরক্ষানিমিত্তই বিবাহ করিতেন, ঐহারা
 শৈশবকালে বিষয়ভোগ করিতেন, ঐহারা বৃদ্ধকালে মূনিবৃত্তি অবলম্বন
 করিতেন অর্থাৎ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিতেন, ঐহারা অন্তকালে যোগদ্বারা
 দেহত্যাগ করিতেন, তাঁহাদিগের গুণসমূহ আমার কর্ণে আসিয়া আমাকে
 চাঞ্চল্যপ্রকাশ করিতে নিয়োজিত করিতেছে, (অতএব) অন্নবাক্যশক্তিসম্পন্ন
 হইয়াও সেই রঘুবংশীগণের বংশ বর্ণনা করিব । ৫

—[প্রথম সর্গ]

১৯০২ [১৩০৯]

রঘুবংশ | সরল সংকলন | শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম. এ. প্রণীত | Easy
 Selections from the RAGHU-VAMSA in Bengali | Calcutta |
 Sanskrit Press Depository | ১৯০২ | পৃ. ৭৬

অনুবাদের নমুনা :

আশিলা জানকী পরি রক্তবাস,
 নিজপদপানে দৃষ্টি নিরন্তর

সে শান্ত মূৰ্তি করিল প্রকাশ
 পবিত্র চরিত, সরল অন্তর ।
 না পারি সহিতে দর্শন সীতার
 ফিরাইল আঁখি যত পৌরজন—
 লাজে অধোমুখে এবে সবাকার
 ফলভরে নত শস্ত্রের মতন ।
 সমাচীন হয়ে বান্ধীকি তখন
 জানকীরে হন কহিলা বিহিত—
 “রতির সমক্ষে চরিত্রে আপন
 লোকের সংশয় কর অপনীত ।”
 বান্ধীকির এক শিষ্য মতিমান
 পুণ্য জল আনি করিল প্রদান,
 সে জলে জানকী করি আচমন
 কহিলেন সত্য-অব্যর্থ-বচন—
 “পতি হ’তে আমি বাক্য-কায় মনে
 না হইয়া থাকি যদি বিচলিত,
 তবে, বসুন্ধরে, তব ও চরণে
 দিয়া স্থান মোরে কর অন্তর্হিত ।”
 এরূপ কহিলা পুণ্ড্রিতা সতী,
 অমনি বিদর্পা হ’ল বসুমতী,
 সে ছিদ্ৰে বিহ্বৎসম জ্যোতিরিশি
 উঠিল সহসা আলোক প্রকাশি ।
 যে প্রভারাশির মাঝে সমুজ্জ্বলা
 ফণীদ্বের ফণা-উৎক্ষিপ্ত আসনে
 বিরাজিলা ধরা ক্ষুদ্রিত কিরণে,
 কটিতটে যার সমুদ্র মেখলা !
 পতি পানে স্থির নয়ন সীতার,
 লয়ে তাঁরে কোলে বসুধা তখন
 পশিলা পাতালে, না শুনি রাজার
 “যেও না, যেও না” কাতর বচন ।

নবীনচন্দ্র দাস অনূদিত :

Raghu-Vamsa in Bengli, complete in I Vol. ২৥০

” Cantos VIII to XV (separately) ১৮

আরও দুটি সংস্করণ রঘুবংশ-অনুবাদ পাওয়া যায়। নবীনচন্দ্র-অনূদিত বইগুলি তৎকালীন গুণীজন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসাপালাভে সমর্থ হয়। শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত, বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, এবং ইন্ডিয়ান নেশন (৬ এপ্রিল ১৮৯৬) ও গ্রাশনাল ম্যাগাজিন প্রভৃতি নবীনচন্দ্রের অনুবাদের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। এখানে তার কয়েকটি সংকলন করা গেল।—

অধ্যাপক কৃষ্ণকমল বলেন :

I fully agree with the very favourable and enlogistic criticism that has been justly and deservedly elicited by your translation in every quarter. Your attempt to exhibit Kalidas in the garp of Bengali verse does credit to you, and must be pronounced successful. Translations in Bengali verse are generally unreadable ; they are either unfaithful or crabbed in language. You have steered clear of both the dangers and have presented to the Bengali literature on excellent book of verse—of good, choice, readable and pleasing verse. This is a feat worthy of praise.

রমেশচন্দ্র দত্ত :

You have performed a worthy task worthily. and the work, I hope, will find a permanent place amongst the lasting works of our age.

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি তাঁর বার্ষিক ভাষণে (পৃ. ২৭) বলেন : (5th February, 1896)

The translation of Kalidas's immotal epic the Raghu-Vamsa by Babu Nobin chandra Das in Bengali metre has elicited the highest praise, not only from educated people, but also from the Tol-Pandits of Bengal.

১৯০৫ [১৩১২ পৌষ]

রঘুবংশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত—[গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত]

[প্রথম প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' ১৩১২ পৌষ ; পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংকলিত
'নবরত্নমালা' ১৩১৪, ও বৈজয়ন্তী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত ।]

অনুবাদের মনুনা :

প্রথম সর্গ

বাক্য আর অর্থ সম সম্মিলিত শিবপার্বতীরে
বাগর্থ সিদ্ধির তরে বন্দনা করিলু নতশিরে ॥১
কোথা সূর্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন,
ভেলায় দুস্তর সিদ্ধ তরিবারে বুখা আকিঞ্চন ॥২
বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ভালে,
মন্দ কবি যশ চায়—সেই দশা তাহারো কপালে ॥৩
কিন্মা পূর্ব পূর্ব কবি রচি গেলা যেথা বাক্যদ্বার
বুজ্জবিদ্ধ মণি-মধ্যে সূত্রসম প্রবেশ আমার ॥৪
আজন্ম যাহারা শুদ্ধ, কর্ম যারা নিয়ে যান ফলে,
সঙ্গারু রাভ্যোশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে ॥৫
যথাবিধি হোম-যাগ, যথাকাম অতিথি-অর্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত ॥৬
দান-হেতু ধনার্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ-আশে দিগ্বিজয়, পুত্র-লাগি কলত্রবরণ ॥৭
শৈশবে বিজ্ঞার চর্চা, যৌবনে বিষয়-অভিলাষ,
বার্ধক্যে মূনির ব্রত, যোগবলে অস্ত্রে দেহ-নাশ ॥৮
এহেন বংশের কীর্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চঞ্চল ॥৯
পণ্ডিতে শুনিবে কথা ভালমন্দ-বিচারে নিপুণ,
সোনা খাটি কিন্মা বুটা পৌ-পরীক্ষা করিবে আগুন ॥১০

অষ্টম সর্গ ॥ অজবিলাপ

[আকাশবিহারী নারদের বীণায়ন্ত্র হইতে বিচ্যুত দিব্যমালিকার আঘাতে
পত্নী ইন্দুমতির মৃত্যুতে রঘু-তনয় অজের বিলাপ ।]

বহু অপরাধে তবুও আমার 'পর
ভুলেও কখনো কর নাই অনাদর,

তবুও কেন আজ কোনো অপরাধ বিনা
 মোর প্রতি তুমি রয়েছ বাকহীনা ॥৪৮
 মনেও জানিনি তব অপ্রিয় কভু,
 মোরে ফেলে কেন চলে গেলে তুমি তবু!
 পৃথিবীর আমি নামেই পতি,
 তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি ॥৫২
 কুস্মমে খচিত কৃষ্ণিত কালো কেশে
 মন্দ পবন কাঁপায় যখন এসে,
 হে স্নতলু, তব প্রাণ ফিরে এল ব'লে
 থেকে থেকে মোর দুর্শাশায় হিয়া দোলে ॥৫৩
 হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ভরা
 জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা !
 রজনী আসিলে হিমাচল-গুহাতলে
 আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জলে ॥৫৪
 ও মুখে অলক দোলে যে মারুতভরে,
 তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে,
 যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে
 অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে ॥৫৫
 শর্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে,
 চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদ পরে,
 বিরহ তাহার মিলনের আশে সহে,
 চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে ॥৫৬
 শয়ন রচিত হত পল্লবে নব
 তবু দুখ পেত কোমল অঙ্গ তব
 আজ সেই তলু চিতা-আরোহণ, আহা,
 কেমনে সহিবে, কেমন সহিব তাহা ॥৫৭
 এ মেথলা তব প্রথমা রহুঃসখী
 গতিহারী দেহে নিকণ হারালো কি ।
 মনে হয় যেন সেও বুঝি তব শোকে
 তোমারি সঙ্গে গিয়েছে মৃত্যুলোকে ॥৫৮
 সমস্ত স্থখ তব সঙ্গিনীজন,

প্রতিপদ-চাঁদ তব আভ্রজধন,
 তব রস মোর জীবনে করেছি সার,
 নির্ভর, তবুও একি তব ব্যবহার ॥৬৫
 ধৃতি হল দূর, রতি-শুধু স্মৃতিলীন,
 গান হল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
 আভরণে মোর প্রয়োজন হল গত,
 শয়ন শূন্য চিরাদিবসের মত ॥৬৬
 গৃহিণী সচিব রহস্যসখী মম,
 ললিতকলায় ছিলে যে শিখাসম,
 করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিয়ে
 বল গো আমার কি না সে হরিল, প্রিয়ে ॥৭৬

রবীন্দ্রনাথ-কৃত ‘রঘুবংশ’ অনুবাদের অংশ বিশেষ সম্প্রতি সুশীল রায়-
 সম্পাদিত ‘ঋগদীপ্যাসিক কবিতাপত্রের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৩৬৭ বৈশাখে
 পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব কতখানি কবির ‘জীবনস্মৃতি’ ও
 বিমলকান্তি সমাদ্দার-রচিত “রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব” [১৯৬১]
 গ্রন্থে তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে
 কালিদাসের প্রভাব অনেকখানি, একথা রবীন্দ্র-রচনাবলীর রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই
 স্বীকার করবেন।

১৯৫২ [১৩৫২]

ইন্দুমতী (রঘুবংশ)—কালিদাস রায়—১৩৫২। পৃ. ৮৭

অনুবাদের নমুনা :

রঘুর তনয় কুমার অজ,
 চরিত্রে তাঁর মিলে একত্র
 ওজ ও বীৰ্য্য, মন্ব রজঃ।
 অনবদ্য সে দেহের গঠন,
 হইল তাঁহার পিতারই মতন,
 মঙ্গলদীপ হইতে দীপিত
 দ্বিতীয় দীপ্ত প্রদীপসম
 উজ্জ্বল তমোনাশক্ষম।

না ত্যজিয়া যেন জীর্ণ শরীর
 লভিলেন পুন রঘুরাজ বীর
 অভিনব দেহে নবজীবন,
 দেহে মনে দৌহে মিল এমন,
 বিত্তা তাঁহারে করিল বরণ
 যথাবিধি গুরু-অনুশাসনে,
 অতুল কাস্তি বরিল অঙ্গে
 নবযৌবনে—উদ্ভেদনে ।

ভূমিকা : রঘুবংশের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সর্গের অজ-ইন্দুমতীর উপাখ্যান লইয়া যে বাংলাভাষায় স্বতন্ত্র একখানি কাব্য রচিত হইতে পারে— এই পরিকল্পনাটি আমি আমার অল্পজ্ঞান শ্রীমান অনিল রায়ের নিকট হইতে পাই ।...রচনা সমাপ্ত হইলে অনিল তাহার বাসভবনে কেবল এই রচনাটি পাঠের জন্তই একটি সাহিত্যিক বৈঠক আহ্বান করেন ।... সেই বৈঠক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তকণ্ঠে রচনাটির প্রশংসা করেন ।—সে বারো বৎসর আগেকার কথা ।...অনুবাদে মহাকবির মন্দাকান্তা ছন্দে রচিত মেঘদূতের মর্যাদা রক্ষা যতটা কঠিন, রঘুবংশের মর্যাদা রক্ষা ততটা কঠিন নয় ।...আমি ছন্দের স্বচ্ছন্দ্যের সাহায্যে একটি প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র কাব্যের রূপ দিবারই চেষ্টা করিয়াছি । কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহা স্বধীসমাজের বিচার্য্য ।”

১লা আশ্বিন, ১৩৫২ ।

১৯৫৪ [১৩৬১]

রঘুবংশ—ডাক্তার অমূলেন্দু গুপ্ত, এম-বি, বি-এস, অনূদিত । প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ২৩ রবীন্দ্রাব্দ, ১৯৫৪ [ইং] ; পৃ. ১৪১ ।

অনুবাদের নমুনা :

জগতের মাতাপিতা পাবর্তী-মহেশ
 শব্দ অর্থ সম ধরে সম্বন্ধ বিশেষ
 সেই শব্দ অর্থ জ্ঞান লভিবার ভরে
 প্রণতি জানাই দৌহে সম্বন্ধ অন্তরে । ১
 কোথায় সেই সূর্য্যবংশ বিরাট মহান
 ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি তাহে অবোধ অজ্ঞান
 ভেলায় দ্রুতর সিদ্ধ হইবারে পার

বাসনা জাগিল যেন হৃদয়ে আমার ।২
 উন্নত তরুর ফল করি আকিঞ্চন
 বামন যেমতি করে বাহ উত্তোলন
 তেমতি নির্বোধ আমি কবিশকামী
 উপহাস লভিবারে হই অগ্রগামী ।৩
 অথবা হীরক বিদ্ধ মণি সমুদায়
 মালাকৃতি লভে যথা স্বত্বের সহায়
 সেই মত পূর্বকবি উদ্ঘাটিত দ্বার
 অনুসরি রঘুবংশ করিব প্রচার ।৪

—[১ম সর্গ]।

(ক্রমশঃ)

বেঙ্গল'-এর রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনী

নীহাররঞ্জন গুপ্তের	ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
অদৃশ্য শত্রু ৪র্থ মুঃ	২'০০ ॥ পাতালের পাকচক্র ৩য় মুঃ ১'২৫ ॥
ড্রাগন ৩য় মুঃ	২'০০ ॥ ওঙ্কারের টঙ্কার ২য় মুঃ ১'২৫ ॥
রাত্রি যখন গভীর হয় ৫ম মুঃ ১'২৫ ॥	ব্লাড ব্যাঙ্কার ৩য় মুঃ ১'২৫ ॥
মৃত্যুবাণ ২য় খণ্ড ২য় মুঃ	২'০০ ॥ লালবাবুর লাশ ২য় মুঃ ১'২৫ ॥

॥ একটি অনন্যসাধারণ বই ॥

পরিমল গোস্বামী

স্বথের সন্ধানে

সারা পৃথিবীর সর্বজাতির
 মানুষের একমাত্র লক্ষ্য 'স্বথ'।
 তাই প্রাণপণ শক্তিতে তারই

পশ্চাৎদাবনে সতত নিরত মানুষ। তবু কিস্তি স্বথ অ-ধরা। স্বথ কি আর
 কি করেই বা সত্যিকার স্বথ পাওয়া যায় তারই সার্থক সন্ধান দিয়েছেন
 স্বনামধন্য দার্শনিক ও চিন্তানায়ক বারটাণ্ড রাসেল তাঁর 'The Conquest
 of Happiness' গ্রন্থে। প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী পরিমল গোস্বামী-অনুদিত এই
 অবগুণ্ণাণ্য গ্রন্থটি রূপা অ্যাণ্ড কোংর সহযোগিতায় প্রকাশিত। ৫'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

শতবর্ষপূর্তি-প্রবাহ

ইংরেজি ১৯৬৩ সাল বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে আর-একটি স্মরণোৎসব-সাল বলে পরিগণিত হবে। স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মানকুমারী বসু এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মশতবর্ষপূর্তি বৎসররূপে এই সালটি চিহ্নিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও উপেন্দ্রকিশোরের বিচিত্র কর্মপ্রতিভা সাহিত্যক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না, সংসারের অগ্রাঙ্ক ক্ষেত্রে ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চায়, স্বকুমার কলার নব নব ক্ষেত্রে তা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে তুলনার অবকাশ কম, কিন্তু দুজনেই গীতবাজে সমর্পিতপ্রাণ ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও মানকুমারী কাব্যসাধনায় চিত্ত সমর্পণ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন—নাটক-গ্রহণ রচনায় শক্তিনিয়োগ করেছিলেন। এঁরাও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন।

আশ্চর্য মনে হয়, গত শতকের মনীষীরা ঈশ্বরপ্রেমী ছিলেন এবং সে প্রেম-প্রকাশে তাঁদের কুণ্ঠা ছিল না। সাম্প্রতিক লেখকেরা ঈশ্বরপ্রেমী কিনা জানি না, কিন্তু তাঁদের রচনায় সে অহুরাগের অকুণ্ঠ প্রকাশ নেই। ধর্মভীরু আন্তিক লেখক—এই অভিধায় ভূষিত হতে অধুনা ক'জন বাঙালি লেখক রাজি হবেন?

শতবর্ষপূর্তি-উৎসবের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত—এঁদের রচনা পুনঃপ্রকাশ ও চর্চা। স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র বাংলা ও ইংরেজি রচনা পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র দ্বিজেন্দ্র-রচনা পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। মানকুমারী বসু ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গ্রন্থাবলী স্বল্পভ মূল্যে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়াও প্রয়োজন। আশা করি উৎসাহী প্রকাশকের আলোকুল্যে এগুলি প্রকাশিত হবে।

*

*

*

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশিত পুস্তকের এক তালিকা বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সভা প্রকাশ

করেছেন। এক শ উনত্রিশ জন লেখক এবং এক শ ছেচল্লিশটি গ্রন্থনাম এই
এই তালিকায় বিধৃত হয়েছে। বর্তমান বৎসরে আরো বই প্রকাশিত হচ্ছে।

*

*

*

আসামের বিশিষ্ট কবি শ্রীযুক্তকান্ত বরকাকতি সত্তর বৎসর বয়সে
লোকান্তরিত হয়েছেন।

*

*

*

গত বৈশাখে কলকাতায় পাঁচজন সোভিয়েৎ লেখক এসেছিলেন। ভারত
সরকারের আমন্ত্রণে এঁরা বর্তমানে ভারত সফর করছেন। এই দলে আছেন
—তুর্কেমেনিয়ার প্রবীণ ঔপন্যাসিক বেদি কেবাবায়েক, দাশেষ্তানের লেনিন-
পুরস্কারপ্রাপ্ত লোক-কবি রমূল গামজাতোফ, ‘ওক্জিয়াবর’ পত্রিকার প্রধান
সম্পাদক সেভলভ কোচেতফ, কবি ও গল্পকার সের্গেই বারুজদিন এবং
ভারতীয় সাহিত্যের অহুবাদিকা মিরিয়াম সলগানিক। এই দলের নেতৃত্ব
করেছেন সেভলভ কোচেতফ।

কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিনিধি-দলের নেতা বলেন :

“ভারতের অধিবাসীদের জীবনের সঙ্গে, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও
বর্তমান অগ্রগতির সঙ্গে, ভারতের আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়লাভ
করতে আমরা এম্বেছি এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক
স্থাপন করতে চাই।.....রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভবন দেখে আমরা
আনন্দলাভ করেছি। ভারতের অধিবাসীদের মতো আমাদেরও কাছে
রবীন্দ্রসাহিত্য অত্যন্ত প্রিয়।...ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার
মানবিকতাবোধের ঐতিহ্য। ভারতের আধুনিক সাহিত্যেও সেই ধারা
অব্যাহত রয়েছে, সেই ঐতিহ্য আরও পরিপুষ্ট হয়েছে। আপনাদের দেশের
সেরা লেখকরা সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে, তাদের হাসিকান্না ও আশা-
আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এক বাস্তববাদী সাহিত্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।
আমরা একে অভিনন্দন জানাই।”

*

*

*

সোভিয়েৎ দেশে ১৯৬২ সালে রুশ ভাষায় ৩২৫৪টি পুস্তক প্রকাশিত
হয়েছে। এগুলির প্রচার-সংখ্যা—২১৬,৩৭২,০০০ কপি। এছাড়া অন্যান্য
আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক-সংখ্যা ২৮১৫। প্রচার-সংখ্যা ৪২,
২৩৭,০০০ কপি।

সোভিয়েৎ দেশে প্রকাশিত পুস্তকের প্রচার-সংখ্যার এক তালিকাদৃষ্টে জানা যায়—

তলস্তয় ও গোর্কির রচনার সংখ্যা সর্বাধিক। তলস্তয়ের রচনাবলী ২৫৩-টি সংস্করণে তেথটিটি ভাষায় ৫৫,৫২৫,০০০ কাপি প্রচারিত হয়েছে। গোর্কির রচনাবলী আটাত্তরটি ভাষায় ২৫৭-টি সংস্করণে ৯৯,৩২৭,০০০ কাপি প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর অধিকসংখ্যায় প্রচারিত হয়েছে বাঁদের রচনা, তাঁরা হলেন— ভোরদভস্কি, শলোকভ, মারশাক, মায়াকভস্কি।

*

*

*

১৯৬১-৬২ সালে, ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের এক বিবরণ সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশ করেছেন। তা থেকে জানা যায়—এই এক বছরে প্রকাশিত হয়েছে ২৩৬১টি ইংরেজি বই, ২৮০৫টি হিন্দী বই এবং ২০৪৩টি বাংলা বই। অগ্ণাত ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক কম। মোট গ্রন্থসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ সাহিত্য-বিষয়ক, শতকরা এক ভাগ কারিগরি-বিজ্ঞা ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান-বিষয়ক। ভারতবর্ষে বছরে প্রায় চব্বিশ হাজার বই ছাপা হয়।

*

*

*

গত ২৩ এপ্রিল পুণায় “বরেরকর সংকার সমিতি” প্রবীণতম মরাঠী সাহিত্যিক শ্রীভাগবরাম ভিটল বরেরকর-এর অশীতিতম জন্মদিবস উৎসব পালন করলেন। তিনি সাধারণ্যে মামা বরেরকর নামেই সমধিক পরিচিত।

মামা বরেরকর বাংলা থেকে মরাঠী ভাষায় শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের কিছু নাটক অনুবাদ করেছেন।

জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করেন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। এই উপলক্ষে তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত দ্রব্যাদি এবং তাঁর রচনাবলীর একটি প্রদর্শনীও ব্যবস্থা করা হয়।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই তিনি মরাঠী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি সম্প্রতি এক বৃহৎ আত্মজীবনী লিখেছেন। নাম “মাজা নাটকী সংস্কার”— অর্থাৎ “আমার নাটকীয় জীবন”। এই গ্রন্থে বর্তমান শতকে মরাঠী রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত ইতিহাস ও মরাঠী সাহিত্যের প্রমাণ্য পরিচয় পাওয়া যাবে। চারটি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। “কন্যা বিহারী সাওছে গোলাম”,

“সোনায়া চা কলস”, “হাচা মুলচো বাপ”, “অপূর্ব বেঙ্গল”, “সীতা” প্রভৃতি সামাজিক ও দেশাত্মবোধক নাটকে ভারতের রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের আলেখ্য পাওয়া যায়। তাঁর লেখা “গোছ গোখেল” নামক উপন্যাসটি মহারাষ্ট্রে “পথের দাবী”র মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

এই অশীতিপর সাহিত্যিক রাজ্যসভার ও সাহিত্য আকাদেমির সদস্য। আজ তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

*

*

*

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান “রবিবাসর”-এর সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ সর্বমাত্র লেখকরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ সর্বাধ্যক্ষ। রবিবাসর-এর ৩৪তম বৎসরের প্রথম অধিবেশনে তিনি সর্বাধ্যক্ষ-পদে বৃত্ত হন। আমরা এই নির্বাচনের জন্ত রবিবাসরের সদস্যদের ধন্যবাদ ও আচার্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*

*

*

পাটনায় সর্বভারতীয় লেখক-চিন্তাজীবী-শিল্পী সমাবেশ :

গত ৯, ১০ মে. পাটনায় সর্বভারতীয় লেখক-চিন্তাজীবী-শিল্পী সমাবেশে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখকরা যোগ দেন। বিহার রাজ্য নাগরিক কাউন্সিলের উদ্যোগে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিহারের রাজ্যপাল শ্রীঅনন্তশ্যাম আয়েঙ্গার উদ্বোধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরী কমিশনের উপ-সভাপতি শ্রী ভি এস রামন সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

জাতীয় সংকটের পটভূমিতে লেখকদের ভূমিকা এবং আদর্শ ও মানসিকতার ক্ষেত্রে আগ্রাসী চীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পন্থা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে সমাবেশ আহূত হয়েছিল।

উদ্বোধক বলেন, হত ভারত-ভূমি উদ্ধারের জন্ত আমাদের সামরিক শক্তি নিয়োগ করতে হবে এবং ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্ত সচেষ্ট হতে হবে। এই বৃহৎ প্রয়াসে লেখকরা অবশ্যই যুক্ত হতে পারবেন। প্রস্তুতির আহ্বান ঘরে ঘরে লেখকরাই পৌঁছে দেবেন—তার জন্ত গান, গাথা, কবিতা, নাটক—সবকিছুই ব্যবহার করতে হবে।

শ্রীআয়েঙ্গার আরো বলেন, বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ হলো—লোকের মনে যে শিথিলতা ও আত্মসন্তোষের ভাব এসেছে, তা দূর করা। উত্তর সীমান্তে

আর কোনো আশংকা নেই—এই ধরণের শিথিল আত্মচিন্তা ও আত্মতৃপ্তি বর্জন করতেই হবে।

শ্রীআয়েঙ্গার বলেন যদি একথা সত্য হয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা অহিংসার পথে স্বাধীনতা পেয়েছি, তবে এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে ব্রিটিশ-শক্তি শান্তি-অহিংসা-যুক্তির কথা শুনেছিল। কিন্তু নেকড়ে বা হায়েনার কাছে এই কথার কোন দাম নেই। সে তা বুঝতেই পারে না। তার কাছে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শোনাবে। চীন সাম্রাজ্যবাদ শান্তি ও শান্তিপূর্ণ পন্থার কথা বুঝতেই পারে না। সুতরাং তার সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের অন্য পথ, অন্য অস্ত্র নিতে হবে। এ বিষয়ে সাধারণকে সতর্ক করার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীকেই নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের দু-মুখো নীতি খুবই বিপজ্জনক। তাদের সকল কথার শেষে এই সত্য থেকে যায়—চীনা-শক্তি যা লুঠে নিয়েছে, তা তাদের ভোগ করতে দাও। এদের বিরুদ্ধেও জনতাকে সতর্ক করার দায়িত্ব লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পীদেরই নিতে হবে।

শ্রীআয়েঙ্গার মনে করেন, লেখকদের একটি স্থায়ী কমিটি—যা মাঝে মাঝে একত্র হবে এবং চিন্তাক্ষেত্রে সাধারণকে সতর্ক করার নব নব পন্থা নির্দেশ করবে।

চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে

ভারতের সেবা করুন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান প্রধান ডক্টর নর্মদেব্বর প্রসাদ বলেন, সীমাস্তরের সংঘর্ষ মূলতঃ আদর্শগত সংঘর্ষ, ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে চীনা স্বৈচ্ছা-তন্ত্রের সংঘর্ষ। চীনাকে আরো গভীরভাবে জানতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন—এই উদ্দেশ্য প্রতি গ্রহণাগারে চীনা বিভাগ, প্রতি গবেষণাকেন্দ্রে চীনা দপ্তর, প্রতি বুদ্ধিজীবীর টেবিলে চীনা ফাইল থাকা উচিত। যে প্রচণ্ড শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, তাকে সবদিকে জানা দরকার। এই কাজে লেখক ও বুদ্ধিজীবীদেরই এগোতে হবে।

জৈনেন্দ্র কুমার, পি শাস্ত্রী, কান্ত ভারারী, স্মৃতি গুপ্ত, এ. আচার্য, শম্ভুনাথ সিংহ (হিন্দী), তসলিম ছতারী জিলানী বাণী, এতেশাল হুসেন, আনোয়ার মুয়াজ্জাম (উর্দু), এন. ভি. রাজগোপালন (তামিল), কৃষ্ণ মোবতী (পঞ্জাবী), সি কে মেহতা (গুজরাতি), এস এন জালান (মাড়বারী), বিমল মিত্র, মণিশংকর মুখোপাধ্যায় (বাংলা) আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র : শ্রেণী-নির্ণয়

সুকুমার মিত্র

শরৎচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, না দ্বিতীয় শ্রেণীর—এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নানা বাদ-প্রতিবাদমূলক আলোচনা পড়লাম অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত ‘সাহিত্যের খবর’ পত্রিকায়। আলোচনাগুলি সবই মনন-প্রধান ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ; তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সবাই স্ব স্ব মতসমর্থনে যে সব যুক্তি দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে যে বেশ দৃঢ়তা আছে তা-ও অমূল্য করলাম। একই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য সবিনয়ে পেশ করছি। আমার বক্তব্য-প্রকাশের মধ্যে আমি কোন পক্ষই নেই। আচার্যের পক্ষেও নেই, অনাচার্যদের পক্ষেও নেই।

শরৎচন্দ্র উপন্যাস লিখেছেন। তাই তিনি ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিককে বুঝতে হলে তাই আগে উপন্যাসকে বুঝতে হবে। উপন্যাস কি? তার সংজ্ঞাই বা কি? এছাড়া প্রশ্নের উত্তরে নানা মূনির নানা মত আছে। সংখ্যাধিক্যের মত হলো বাস্তব জীবন ও জগৎকে অবলম্বন করে লেখকের বিশিষ্ট জীবন-দর্শনসম্বন্ধিত হয়ে একটি কাহিনীর মাধ্যমে যে শিল্পসৃষ্টি হয় তাই উপন্যাস। বলাবাহুল্য এই সংখ্যাধিক্যের মধ্যে আমিও আছি। এ ছাড়াও উপন্যাস সম্পর্কে আমি আর একটা মতও পোষণ করি। তা হলো উপন্যাস একাধারে উপন্যাস, ইতিহাস, কাব্য ও ভবিষ্যৎ-সংগঠক।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস উপন্যাস হয়েও একাধারে ইতিহাস, কাব্য ও শুভ ভবিষ্যৎ-গঠনের স্বপ্নটি প্রয়াস।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস যে সার্থক উপন্যাস সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপন্যাসের সমস্ত সাধারণ লক্ষণ—বাস্তব কাহিনী সৃষ্টি, জীবন্ত চরিত্র রূপায়ণ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রয়াস ও লেখকের বিশিষ্ট জীবন-দর্শন—সবই তাঁর উপন্যাসগুলিতে বর্তমান। অতএব উপন্যাসের লক্ষণানুসারে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে ‘উপন্যাস’ হিসাবে বিচার করতে বসি অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ইতিহাস। ঊনবিংশ শতক ও কলৌল ও কালিকলমের পূর্বপর্বন্ত বিংশ শতকের যুগজীবন, সমাজব্যবস্থার একটা নিখুঁত আলোখ্য

ফুটে উঠেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে। এই বিশেষ যুগটিও মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কারে আচ্ছন্ন। সেই ধর্মসংস্কারে ভক্তির যতটা শিথিলতা, বাহ্য নিয়মাচরণে তার চেয়েও বেশী গোঁড়ামি। সমাজ উচ্চশ্রেণীর মানুষ,—ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের দ্বারা সংরক্ষিত। নিম্নশ্রেণী—ভুলে, বাগ্‌দী, কাঁওরা, ডোম, চাষা—এদের কোন স্থান নেই সমাজে। এরা সমাজে অপাংক্তেয়। উচ্চবর্ণের অমানুষিক নিপীড়ন এদের দৈনন্দিন জীবনের ভোগ্যবস্তু। চোখের জল এদের নীরব ব্যথা-বেদনার বহিঃপ্রকাশ। সাগর, সাগরের খুঁড়ো নিচুশ্রেণীর, তাই তাদের ঠাই নেই জনার্দন-শিরোমণি-শাসিত সমাজব্যবস্থায়; নিষ্করণ সমাজব্যবস্থা মর্খাদা দেয় উচ্চবর্ণের শ্রীকান্তকে, কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসাবে স্বীকৃত দেয় না অন্নদাদিদি ও শাহজী সাপুড়েকে। এই রকম ভাবে সমস্ত উপন্যাস থেকেই দেখানো যেতে পারে এই বিশেষ যুগের সমাজব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার দ্বারা মানবজীবনও কিরকম নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-রচনার যুগের তীব্র শ্রেণীবৈষম্য, ধর্মের গোঁড়ামি, অন্ধ কুসংস্কার-প্রীতি ও হৃদয়ের ওপর সংস্কারের স্থান—প্রভৃতির বর্ণনাত্মক শিল্পিক মূর্তি ইতিহাস হলো শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলো।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কাব্যাত্মশৈলীও অপ্রাচুর্য্য নেই। তিনি যে পরিমাণে আইডিয়ালিস্ট সেই পরিমাণে তাঁর উপন্যাস কাব্য। তিনি তাঁর উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন বাস্তব থেকে, কিন্তু উপকরণগুলিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেননি উপন্যাসের মধ্যে। বাস্তব উপকরণগুলিকে কবিকল্পনার আলোকে অল্পভূতির ব্যাপ্তি ও গভীরতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন, তাই তাঁর উপন্যাসে যা প্রকাশিত হয়েছে তা বাস্তব হয়েও বাস্তবোত্তীর্ণ অল্পভূত সত্যের প্রকাশ। আর এই অল্পভূতির প্রকাশ ঘটেছে বলেই তাঁর উপন্যাসে কাহিনী-পরিকল্পনা, চরিত্র-চিত্রণ বাস্তব সত্য হয়েও সাহিত্যিক সত্য হয়ে উঠেছে; আর সাহিত্যিক সত্য হয়ে উঠেছে বলেই কাব্য হয়ে উঠেছে। এক অর্থে প্রেমই তো কাব্য। যা শাস্ত্র করণ ও সুকোমল তাই কাব্য। প্রেম নিশ্চয় সুকোমল বৃত্তি। প্রেমের একটা বিশেষ ও প্রধান প্রকাশ ‘কান্ত-কান্তা’ভাবের মধ্যে। এই ভাবের রস পরিণাম ‘মধুর’। শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসই এই মধুর রসাত্মক প্রণয়সমস্তামূলক। ষোড়শী-জীবানন্দের মিলনের প্রয়াস, পার্বতী-দেবদাসের ট্রাজিক প্রেম, রমেশের প্রতি রমার অব্যক্ত প্রেম, মাধবীর ওপর সুরেন্দ্রের ঐকান্তিক নির্ভরতা, রাজলক্ষ্মীর প্রতি শ্রীকান্তের আন্তর আকর্ষণ—এই সবই তো শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এ ছাড়াও তিনি

যেখানে জীবানন্দের চিন্তায় ষোড়শীকে মগ্ন দেখাচ্ছেন, শ্রীকান্তের জ্ঞান রাজলক্ষ্মীকে ভাবিয়ে তুলছেন, মৃত্যুপথযাত্রী দেবদাসকে কৈশোরের প্রণয়িনী পার্বতীকে শেষবারের মত দেখাবার ব্যর্থপ্রয়াস করাচ্ছেন সে সব জায়গায় তো শরৎচন্দ্র কবি। শুধু কবি নন, বড় কবি। হৃদয়ের সমস্ত দরদ, সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে প্রণয়প্রবৃত্তির যে মধুর অনুভূতি, যে প্রেমসৌন্দর্য তারই শৈল্পিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন উপন্যাসগুলিতে।

শরৎচন্দ্র যে সমাজব্যবস্থার চিত্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে দিয়েছেন তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, শরৎচন্দ্র যে সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র এঁকেছেন সেই সমাজব্যবস্থার কি তিনি পক্ষপাতী? এই প্রশ্নের উত্তরে বলবো, না, কখনোই না। তাঁর মধ্যে সর্বসংস্কার মুক্তির একটা হৃদয় মনোভাব ছিল, আর ছিল আত্মার সহজ স্বচ্ছন্দ স্বাধীন উল্লাস। তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁরই চিত্রিত তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা তীব্র অভিযোগ—যে অভিযোগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে সর্বসংস্কারমুক্ত শুভ মঙ্গলকর ভবিষ্যতের বীজ। তাঁর প্রচ্ছন্নতা চাইছে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মের কাঠিন্যহীনতা, আর মানবতার মুক্তি। মানুষের মূল্যায়ণ—মানবতার মাপকাঠিতে হোক—এই প্রার্থনা করেছেন তিনি ভবিষ্যতের মানুষদের কাছে, ভবিষ্যৎ সাহিত্য-স্রষ্টাদের কাছে। মানবতার আদর্শে সাহিত্য-নির্মাণের পথকে তিনি উন্মুক্ত করে গেছেন ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকদের জন্তে। অতএব তাঁর উপন্যাস ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকদের কোন পথে চলতে হবে তার একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ। শরৎ-পরবর্তী যুগের মানুষ আমরা সেই নির্দেশ যে আমাদের জীবন দিয়ে, চেতনা দিয়ে, আমাদের মন ও মনন দিয়ে পালন করে চলেছি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই এখন আমাদেরই এক কবি বলেন, ‘সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা, আছে বা নাই’, আর এক কবি বলেন, ‘যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে’ আর এক কবি বলেন, ‘মানুষ সব কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হলো, এবার চাই মৃত্যুশেষের মানে’।

অতএব দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র উপন্যাস লিখেই শরৎচন্দ্র একাধারে ঔপন্যাসিক কবি, ঐতিহাসিক ও ভবিষ্যৎ-পথ-প্রস্তুতকারক।

অতএব শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই মন্তব্য করা চলে যে তাঁর উপন্যাস এতগুলি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তিনি যে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বধী সমালোচক ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন শরৎচন্দ্র জীবনের কবি নন, সমাজের কবি। এখানে তাঁর কাছে আমার প্রশ্ন জীবন

কি সমাজছাড়া? সমাজের বাইরে জীবনের কি প্রকাশ? তিনি বলেছেন জীবন হলো একটা অনির্দেশ্য নামহীন আকারহীন চেতনাপ্রবাহ। বেশ, মানলুম কথাটা। কিন্তু এটা তো জীবন সম্বন্ধে একটা তত্ত্বকথা হলো। জীবনের রসশিল্পের দিকটা কোথায়? তত্ত্ব নিয়ে তো আর শিল্প হয় না। শিল্প হয় রসরূপ নিয়ে। জীবনের রসরূপ হলো মানব। (মানব ছাড়া অল্প সবপ্রাণী জীবনের রসরূপ নয়, শুধু রূপ)। অতএব জীবনের কাব্যরচনা করা মানেই মানবের কাব্যসৃষ্টি করা। কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। একক মানুষের জীবনানুভূতি কি সম্পূর্ণ? না, মোটেই নয়। একের জীবনানুভূতির সম্পূর্ণতা অপর একথা একাধিকের অস্তিত্বের মধ্যে। আর এই একাধিক জীবনের অর্থাৎ মানবের একত্রবাসের ফলেই তো সমাজজীবনের সৃষ্টি। অতএব উপন্যাসে এককের জীবনের সম্পূর্ণতাকে আঁকতে গেলে আনুশঙ্গিকভাবে আর পাঁচজনের কথা অর্থাৎ সমাজের কথা বলতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে জীবন, মানব আর সমাজ—এই তিনটি নাম মাত্র; কিন্তু জ্ঞাপকভাবে তিনটি নামই একটাই অর্থপ্রকাশ করছে। অতএব যিনি শরৎচন্দ্রকে সমাজের কবি বলেছেন, জীবনের কবি বলে স্বীকৃতি দেননি, তিনি কি এখন সেই স্বীকৃতিটা দেবেন?

স্বধী সমালোচক বলেছেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যদিয়ে কোন একটা বিরাট তত্ত্ব বা বিরাট আদর্শ ফুটে ওঠেনি। অথচ উপন্যাসের কথাবস্তুর সঙ্গে একটা তত্ত্বের যোগ থাকা চাই। আমিও মনে করি, উপন্যাসের কথাবস্তুর সঙ্গে একটা তাত্ত্বিকতার যোগ থাকা চাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে কোন তত্ত্ব-দর্শন নেই, একথাটি সবিনয়ে মানতে পারলাম না। আর এ বিষয়ে সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টির তীব্রতা, ভারতীয় দর্শনের, বিশেষ করে সাংখ্যদর্শনের জ্ঞানভারের পরিপূর্ণতা প্রার্থনীয়।

সাংখ্যদর্শন বলে, সৃষ্টির মূলীভূত কারণ সত্ত্ব রজঃ স্তম্ভসাম্যাবস্থা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সৃষ্টির লীলানন্দে চিরচঞ্চল। আর পুরুষ অচঞ্চল, নির্বিকার, নির্লিপ্ত চৈতন্য। প্রকৃতি যখন পুরুষের সান্নিধ্যে আসে তখন পুরুষের সংযোগে প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, সেই বিক্ষোভই নব নব সৃষ্টির কারণ। সাংখ্যদর্শনের এই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রচিত্রণে আরোপিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রতিটি নায়ক জীবানন্দ, দেবদাস, স্বরেশ, শ্রীকান্ত, শেখর, স্বরেন্দ্রনাথ সবাই অকর্মণ্য, নির্বিকার, নির্লিপ্ত। যেন জগতের প্রতি তারা উদাসীন। আর বোড়শী,

রাজলক্ষ্মী, পার্বতী, মাধবী—কত চঞ্চল, কত কর্মঠ। তাদেরই সমস্ত দায়-দায়িত্ব। তাদেরই শুধু কর্তব্যপালনের তাগিদ। জীবনমন্ডলজাত যে বিষামৃত—সেই বিষামৃতেই ভোক্তা যেন কেবল তারাই। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের নায়ক যেন সাংখ্যের পুরুষের জীবন্ত সাকার বিগ্রহ, পুরাণ-কথিত ভোলানাথ মহাদেব; আর নায়িকা যেন সাংখ্যের প্রকৃতির জীবন্ত সাকার-বিগ্রহ স্বরূপিনী, পুরাণকথিত সংসারভিজ্জা পার্বতী। অতএব ভারতীয় দর্শন-তত্ত্ব ও পুরাণ-তত্ত্বের যে রসশিল্প স্রষ্টা শরৎচন্দ্র, সেই শরৎচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীতে বসাতে অনাচার্যদের কেন আপত্তি?

আর একটা কথা বলেই আমার আলোচনা শেষ করবো। প্রেম-প্রবৃত্তি মানুষের শাস্ত্রত প্রবৃত্তি। তা সে প্রেম-প্রবৃত্তির মূলে হৃদয়ই থাকুক, আর আত্যন্তিক যোনিতাই থাকুক, বা সমাজজীবনের প্রভাবই থাকুক। এই প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। একথা ফ্রেডও স্বীকার করেছেন, পাভলভও স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, আমরাও স্বীকার করি। এই প্রেম-প্রবৃত্তি উদ্ভূত যে প্রণয়সমস্তা, সেই সমস্তার যা জটিলতা, সেই জটিলতা-উদ্ভূত যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, আর সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসার প্রতি হৃদয়-মনন-প্রস্তুত যে ইঙ্গিত—এই সমস্ত যে উপস্থাসে থাকে সেই সমস্ত উপস্থাস যে সার্বজনীন আবেদন নিয়ে সর্গোরেব পাঠকের মানসকালে প্রদীপ্ত সূর্যের মত বিরাজ করবে তাতে সংশয় প্রকাশের কিছুই নেই।

যাঁরা বলেন শরৎচন্দ্রের উপস্থাসের মধ্যে মহামানবতা বা বিশ্বমানবতা ফুটে ওঠেনি বলে তাঁকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায় না, আমি তাঁদের কথার কোন মূল্যই দেখি না। ‘মহামানবতা’ বা ‘বিশ্বমানবতা’ এ দুটি গালভরা কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশ্ন করি, মহামানবতা বা বিশ্বমানবতা বলতে তাঁরা কি বোঝেন? নিশ্চয় তাঁরা বলবেন এই দুটি কথার মধ্যে একটা অসীমের, অরূপের ব্যঞ্জনা আছে। এখানে আমার কথা হলো যা আমরা সহজে উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারি না, তার কাব্যায়নও আমরা চাই না। আমরা সীমাকে বুঝি। রূপকে বুঝি। বুঝি মানুষকে। আমাদের শরৎচন্দ্র সেই সীমাকে, সেই রূপকে, সেই মানুষকে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্নাকে সার্থকভাবে চিত্রায়িত করেছেন তাঁর উপস্থাস-শিল্পে।

মানব-দরদী ও ভারতীয়-দর্শন-পুরাণ-বিশ্বাসী এই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর জন্তে আমরা মানবের দরবারে দরবারেই অকুণ্ঠচিত্তে প্রথম শ্রেণীর আসন দাবী করবো।

শরৎ-প্রসঙ্গে

শ্রীযুক্ত সাহিত্যের খবর-সম্পাদক

সমীপেষু

মহাশয়,

গত সংখ্যা সাহিত্যের খবরে প্রকাশিত একখানি চিঠিতে আমার নামের উল্লেখ লক্ষ্য করে প্রীত হলাম। পত্রলেখক আমাকে এই বলে সজাগ করে দিয়েছেন যে পতিতা শব্দটির ব্যবহার আমি বিবেচনাসহকারে করিনি, কেননা শরৎ-সাহিত্যে পতিতা একজনও নেই, সবাই সমাজ-স্থলিতা। আমার বন্ধু স্বর্গতঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী শরৎ-সাহিত্যে পতিতা নামে একখানি বই লিখেছিলেন তাতে তিনি শরৎ-সাহিত্যের সবগুলি সমাজ-স্থলিতাকেই পতিতা অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন এবং কেন করেছিলেন, তার পক্ষে যুক্তিও দেখিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি আগেও যেমন, এখনো তেমনি একমত। তাছাড়া দেবদাস এবং আঁধারে আলোতে শরৎচন্দ্র বিমুক্ত দেহোপ-জীবনী নারীরও অবতারণা করেছেন বলে মনে পড়ছে। যাই হক, পত্রলেখক যখন ঠিক করেছেন যে শব্দ-প্রয়োগের জ্ঞান আমার তাঁর কাছে শিক্ষণীয় তখন তা-ই শিরোধার্য করে নিলাম। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধার অভাবটা তাঁর আবিষ্কার হিসাবে অবশ্যই মৌলিক। শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সবাই (যার মধ্যে সাহিত্যের খবরের সম্পাদক শ্রী মনোজ বসুও অন্ততম) জানেন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত কতখানি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-প্রীতি সাহিত্যের আসরে সত্যভাষণের পথরোধ করে দাঁড়ায়, এ ত জানা ছিল না আমার। নমস্কার ইতি

আপনাদের

বন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনার কাগজের চৈত্র সংখ্যাটি পড়তে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার রায় পত্ররূপ একটি টিল নিক্ষেপ করে একসঙ্গে তিনটি পাখি মারবার প্রয়াস পেয়েছেন, যাদের অন্ততম—এই অভাজন!

শ্রীমায়ের উদ্দিষ্ট অগ্র দুই 'পাখি' ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রয়োজনবোধে তাঁরা তথাকথিত 'অভিযোগ'গুলির জবাব দেবেন কিনা জানি না। তবে এই অকিঞ্চন সম্পর্কে তিনি সে সব বক্তব্য এবং উপদেশ নিক্ষেপ করেছেন, সেগুলি খণ্ডিতব্য। অবশ্য প্রথমেই বলে রাখি যে, শিক্ষামূলক কাজে আমি কথাঞ্চিং অল্পসাহী!

আমার নিবন্ধে আমি যে সব 'পয়েন্ট' তুলেছি, সেগুলোর জবাব কিন্তু শ্রীমায় আদর্শেই দেন নি। বস্তুতপক্ষে দেখা গেল, শরৎচন্দ্রের মূল্যায়নের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য নেই; তাঁর যাবতীয় ক্রোধ আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর আমি যা সমালোচনা করেছি, তার বিরুদ্ধে। সমালোচনার অধিকার সার্বজনীন। 'King can do no wrong'—এ জাতীয় আপ্তবাক্যে আমার আস্থা নেই। আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের প্রজন্মের সকলেরই পূর্বসূর্যপূর্ব অধ্যাপক, কিন্তু সেই কারণেই যে তাঁর অভিমতের সমালোচনা করা যাবে না, এই যুক্তি মানা চলে না।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মূল প্রবন্ধের বিরোধিতা স্বয়ং আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন বলেই সেটা এত গুরুত্বপূর্ণ; এবং ঠিক সে কারণেই তাঁর আলোচনার সমালোচনা করেছি। সম্ভবত, এই বিতর্কে অগ্র যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরাও এই একই কারণে প্রবৃত্ত হয়েছেন : বড় যে বড় গাছেই লাগে!

দ্বিতীয়ত, 'উপদেশাত্মক বাক্যপ্রয়োগ' এবং 'বিচলিত হওয়া'—এ দুয়ের আপেক্ষিক সম্পর্ক কি সেটাও আবার জয়ন্তবাবু ব্যাখ্যা করে বলেননি। গণিতাত্মক সতুপায় অবলম্বন করে যদি ধরে নিতে হয় যে তারা পরস্পরের পরিপূরক, তা হলে ত বড়ই মুশকিল! অবশ্য সেটা জয়ন্তবাবুর পক্ষেই; কারণ (সম্ভবত) বালক হলেও তিনি শাস্ত্রনিষ্ঠ এবং শাস্ত্রের বচনই উপদেশ! তা হলে, অঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে।

উপদেশাত্মক বাক্যপ্রয়োগের = বিচলিত হওয়া

উপদেশাত্মক বাক্য • = শাস্ত্রবচন

∴ শাস্ত্রবচন প্রয়োগ = বিচলিত হওয়া

এদিকে জয়ন্তবাবু আবার এই অকিঞ্চনের প্রতি একটি শাস্ত্রবচন নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর গণিত [না কি লজিক?] অল্পসাহেই এবারে কি দাঁড়ায় সেটা, বরং স্বধীজন যে জান সন্ধান!

জয়ন্তবাবু, আমার লেখায় আচার্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি 'অশ্রদ্ধা' আবিষ্কার করেছেন, তাঁর এই গবেষণার স্বপক্ষে যুক্তি কি, সেটা অবশ্য তিনি বুঝিয়ে বলার

প্রয়োজন মনে করেন নি। সবিনয়ে একটা বলি; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি, আমার শ্রদ্ধা জয়ন্তবাবুর চেয়ে এক তিল কম নয়; সেটা কিন্তু ছাপার বারংবার বিঘোষণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, কারুর ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেই যে তাঁর কোনো অভিমতের বিরোধী মত পোষণ করা যাবে না এ আবার কেমন শ্রদ্ধা? কোন্ অভিধান মতে যে আবার আপত্তি = অশ্রদ্ধা, তা-ও ত বোঝা যাচ্ছে না! ‘প্রাণপাতের অভাব’ আপত্তিকর হতে পারে; কিন্তু বিচারশক্তির অপূর্ণতা বৃহত্তর আপত্তির কারণ নয় কি সম্পাদকমশাই?

আরও একটা কথা অভয় পেলে পরিহাসে বলে : ‘শ্রদ্ধা’ অন্তরের জিনিস। কিন্তু ছাপার অক্ষরে তাকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করা বিপদের। তার কারণ, ছাপাখানার বিশ্ববিদিত ভৌতিক প্রভাবে, ‘শ্রদ্ধা’ পর্যন্ত পড়াবে না, তার গ্যারাণ্টি কি? কাজেই তাকে উপনিষদোক্ত “হিরণ্যগর্ভে” বিশ্রাম করতে দিন—পাইকা, স্মলপাইকা, বর্জাইন্স ইত্যাদির গহন অরণ্যে অসহায় হরিণশিশুর মত ওকে ছেড়ে দেবেন না।

জয়ন্তবাবু আমাকে অহুরোধে একটা উপদেশ দিয়েছেন। সেই অপ্রত্যাশিত উপহারটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ! শিষ্ট সমাজের প্রথানুসারে, আমি তাঁকে বিনিময়ে একটা নির্ভেজাল প্রস্তাব দিলাম: বিশ্বের সেরা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলি বছর দুই ধরে সমন্বয়যোগে পড়ুন তিনি। ‘আধুনিক মাহুঘের প্রত্যয়’ [যা তিনি জানেন না বলে প্রকাশ করেছেন]—সম্পর্কে তা হলে তিনি অবশ্যই অবহিত হবেন। তখন যদি এ বিতর্ক প্রয়োজন মনে করেন, তিনি তুলবেন এবং সাড়া দিতে সর্বাগ্রে এই অভাজনই এগিয়ে আসবে, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তার আগে এই কুট তর্ক না চালানোই সম্ভবত শ্রেয়। আপনি কি বলেন সম্পাদক-মশাই?

নমস্কারান্তে,

পল্লব সেনগুপ্ত

পথ চলে গেছে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমর সোম

উদয়পুর

এত স্মৃতি...এত...কথা...এত দেশ...আর এত মানুষ! মন ভরে উঠছে।
কে আপন কে পর...কে বাঙালী এবং কে অবাঙালী তা আর ভাবতে ইচ্ছা
করে না। যাকে ছেড়ে এগিয়ে চলি—তার জন্তেই মন কাঁদে...তার স্মৃতিই মন
টানে। গাড়ীতে বসে থাকি তাই চুপ করে। স্ববিধা-অস্ববিধা, সঙ্গী-সার্থী
পরিবেশ সব আড়ালে পড়ে যায়। আমার মনের একান্ত নিভৃতে, শান্তির
অবিচ্ছিন্ন তন্ময়তায় যদি কেউ মাথা গলাতে চায় তাকে ঠেলে দিই...বাধে
বিরোধ।

এমনি ভাবেই চিত্তোরগড় থেকে গাড়ী এসে পৌছয় উদয়পুর স্টেশনে।
ঘড়ি দেখি রাজি আটটা পনেরো। গাড়ী দেবী করেছে। স্টেশনে জনতা...
আলো...ফেরিওয়াল। মনে গুণ গুণ করে:

প্রতিদিন

এ পৃথিবী হয় না তো ক্ষীণ,
স্বপ্ন হেথা হয় না তো স্নান—
থেমে তো যায় না মোর

ক্লান্তিহীন সমুদ্রের গান :

হিসাবে হিসাবে চারিধার
করেনি আড়াল আজো জীবনের
অনন্ত বিস্তার

তাই তো রাতের কূলে এ ছ'চোখে নেই অন্ধকার
তাই তো বুকের তীরে এতটুকু নেই

লোনা ঢেউ

সে খবর নেবে না কি কেউ ?

—নামবে না? সঙ্গিনীর ডাকে চমক ভাঙে। অসম্পূর্ণ কবিতা মনের
খাঁচায় বন্দী করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ি।

সামনে সেই জনতা, সেই মালা...সেই মুখভরা হাসি আর বুকভরা স্নেহ-
ভালবাসা। মল্লমুগ্ধ সর্পের মত চোখে চোখে রেখে দাঁড়াই। বুঝতে
পারি এ জীবন দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমার একান্ত নিজের পৃথিবীই
প্রশ্নে-বিশ্লেষণে কঠোর হয়ে উঠতে পারে; বাইরের জগতে আবার অনেককিছু
আমি বাধ্য হয়ে মেনে নিই। এ যেন ঠিক সি-আই-ডি ইনস্পেক্টরের সঙ্গে
মুখোমুখি বসে ইন্টারভিউ দেওয়া। মনের সত্য মুখে আনা চলবে না।

বাইরে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে।

ভিড় হাঙ্কা হয়ে যেতেই দক্ষিণের দরজা খুলে ওপরের বারান্দায়
গিয়ে দাঁড়াই। আজ নবমী। ঢাকের শব্দ নেই; তবে মন্দিরের ঘণ্টার
আওয়াজ আছে। আর মাথার ওপর আছে হাজারো হাজারো নক্ষত্রের শ্মিত
দীপ্তি। শহরে আলো জ্বলছে সারি সারি। এ অঞ্চল তবু নির্জন। সামান্য
শীতের আমেজ হাঙ্কা ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে আছে মাটির বুক, প্রাসাদে,
উজানে। একটু আসে বিশ্রামের অবসর। মনের মধ্যে যত রঙ পথে পথে
জমা হয়ে উঠছিল সময় হয় তাদের ছড়িয়ে দেবার। ছাদের এক কোণে
দাঁড়িয়ে রঙ নিয়ে নাড়াচাড়া করি।

সঙ্গিনী এসে দূরে দাঁড়িয়েছে।

হলুদ চাঁদের আলো জড়িয়ে যাচ্ছে ওর খাদির শুভ্রতায়। মুখে সেই
চিরন্তন প্রশ্ন, সেই অফুরন্ত অভিমান।—যর কেন দিতে পারলাম না! ও
জানে—আমার দুর্গম পথে সঙ্গ নিয়েছে বহু সর্বনাশ, কথা বলেছে বহু ভাঙনের
সেনাপতি। আমার দিনের স্বর্ষ পুড়ে গেলেও এ ধরিত্রী উদাস। সঙ্গিনী
এও জানে আমার হৃদয় বলে—

তবু চাই প্রাণজুড়ে উষ্ণতা,

তবু চাই পথপ্রান্তে বিশ্রামের

কিছু অবসর,

তোমার প্রাণের স্রোতে ধুয়ে দোব

সমস্ত জড়তা...

আমার রাতের বুক তুমি হবে তারার

অফর।

সে রাতে সমস্ত তারা প্রচণ্ড অতৃপ্তি দিয়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

ভোর হতে না হতেই আবার তোড়জোড়। দুই পাশ থেকে দুজন তাড়া
দিচ্ছেন। হীরানন্দজী বলেন—‘তৈয়ারী’, তো উগ্রসিংজী বলেন—‘চলিয়ে।’

—অব্ কই! চলনা হোগা ?

—উদয়নিবাস...উদয়সাগর...বাঘদহা ওর ফির আগে...! উগ্রসিংজী কথা অসম্পূর্ণ রেখে জবাব দেন।

শহর ছেড়ে পার্বত্য গ্রামপথে এগিয়ে যাই যাত্রীর দল। মাইলের পর মাইল ছড়ানো পাথর...এখানে সবুজের স্নান-মন্দ হাসি। পথ চলতে সামনে পড়ে বিরাট উটের কাফেলা। সারি বেঁধে কোন দূর প্রান্তে যাবে ওরা। সকাল থেকে দুপুর গড়াবে, কত সন্ধ্যা-তারা শুকতারার কল্প-কথায় শেষ অন্ধকার পার হবে তবু হয়তো ওরা থামবে না। রক্তমুক্তিকার এই অক্লান্ত প্রাণগুলি সবসময় আমার কাছে বিস্ময়। সঙ্গিনী জিপ থেকে লাফিয়ে পড়ে—ক্যামেরায় ধরবে। হলুদ আঁল ফুলেচাকা পথ দিয়ে উটের পিছু পিছু ও ছুটতে থাকে।

উদয়সাগরের তীরেই উদয়নিবাস। পাহাড়ের কোলে পরম নির্ভরতায় শুয়ে আছে জলরাশি। মধুর আলো উদয়নিবাসের ছায়া-দোল খাচ্ছে উদয়-সাগরের ছোট ছোট তরঙ্গে।

এই উদয়সাগরের তীরেই একদিন লেখা হয় রাজপুত রাষ্ট্রজীবনে মনো-মালিন্যের আত্মঘাতী ইতিহাস। উগ্রসিংজী ইশারা করেন,—“এই মাটিতেই পড়েছিল মানসিংহের তাঁবু!”

অনুর্বর মৃত্তিকা আবর্জনার আড়ালে পড়ে আছে আজ। সেই মানসিংহও নেই...সেই প্রতাপও নেই। প্রায় চারশ বছর পার হয়ে গেছে। তবু স্বাধীনচেতা বীরের প্রচণ্ড অভিমান উষ্ণ নিঃশ্বাসের মত এ বাতাসে এখনো মিশে আছে। মানসিংহের সঙ্গে অন্নগ্রহণ করেননি প্রতাপ। তাঁর ব্যবহৃত সমস্ত জিনিস স্থগাভরে ফেলে দিয়েছিলেন এই উদয়সাগরেরই জলে।

• চারশ বছর আগেকার বনিয়াদ বহুপূর্বে চলে গেছে। মহারাণা ফতে সিং ষাট বছর আগে এক স্বল্পপরিসর নতুন প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। তারই নাম বর্তমান উদয়নিবাস।

বিংশ শতাব্দীর রীতিনীতিই স্বতন্ত্র। এ যুগে হৃদয়বৃত্তি নেই; এ যুগ শুধু হিসাবের লাভ-লোকমানের। উদয়নিবাসের উত্তরাধিকারীরা তাই সমস্ত সাজপোষাক তুলে নিয়েছেন, খুলে নিয়ে গেছেন—উদয়নিবাসের। কে জানে, রাষ্ট্রীয়করণের হাওয়া এসে কখন পৌঁছবে। এই ভয়েই উদয়নিবাস হয়েছে নিরালঙ্কার।

উদয়সাগরের তীর ধরে বাঘদহার দিকে এগোতে থাকি। পিছনে পড়ে

থাকে উদয়নিবাস... অরণ্যের মাঝখানে। প্রায় চার মাইলের ওপর বিস্তীর্ণ হ্রদের জলশোভা। ঝুলেপড়া পাহাড়ের দুই তটজুড়ে মাথা তুলেছে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারের গড়া বিরাট বাঁধ।

বাঘদরুহা ছিল রাণাদের বাঘশিকারের জন্তে ছড়ানো এক অরণ্যরাজ্য। পাহাড়ের বৃকে ঝুলছে সংকীর্ণ পথ। ডান পাশে উঠে গেছে পাথরের স্তূপ, বাম পাশে নেমেছে গভীর খাদ। আর সবকিছু ঘিরে রেখেছে ঘন অরণ্য। ডালের ফাঁক দিয়ে, লতার আড়াল ভেঙে ছড়িয়ে পড়িয়ে স্বর্ষালোক, আবার কখনো বা হঠাৎ উকি দিচ্ছে এক টুকরো আকাশ। এ পৃথিবী অতি সাবধানে লুকিয়ে আছে পিচ আর কোলটারের স্ফেনদৃষ্টি থেকে। ভেতরে যত যাই বিশ্বয় এবং ভয় একই সঙ্গে জমাট বাঁধে। রাণাদের পদচিহ্নের ওপরই তো পা ফেলে এগিয়ে চলেছি। এ অরণ্যে এখনো বাঘের গন্ধ পাওয়া যায়, গর্জন কানে আসে। কৌতুহলবশে ঢুকে তো পড়েছি আমরা। ভবিষ্যত ভাবনা কারারই নেই।

আজকের সরকারী উত্থানের কথা মনে পড়ছে। জানি না কেন—উত্থান বলা হয় তাকে। সে এক অরণ্য। রেঞ্জার বীরেন্দ্রজীর সঙ্গে ইন্দুকোটের আম নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঢুকেছিলাম সে অরণ্যরাজ্যে। চার আনায় একটি আম...আমের রস মানে দেহের রক্ত...ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম গোলাপ আনেন ঔরংজেব আর এই পুষ্পের মাটিতে—এমনি ভাবে নানা কথায় পথ আসছিল সেখানে ফুরিয়ে। মাঝে মাঝে অবস্থা দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। চারশ' বছর আগেকার তেঁতুলগাছ...পনেরো ফিট চার ইঞ্চি তার গোলাই...মোগল যুগের গঠনশৈলীতে গড়া বেদী...! না দেখে যাব কোথায়।

—চলুন এবার একটু চা খাবেন!

—এখন? এই অসময়ে? সঙ্গিনী সংকোচ করে।

—সব ব্যবস্থা যে আগে থেকেই করে রেখেছি আমি! থাকি এ অরণ্যে। জীবনের স্বাদ এখানে অন্তরকম। কেউ আসবেন শুনলেই আশা করি—সভ্য জগতের সঙ্গে অন্ততঃ এক কাপ চা খেতে পারব। বীরেন্দ্রজী হাসেন।

বাংলোর বাইরে উঠানের পিছনে পাহাড়ের দিকে সংকেত করে বলেন,—“ওরই নাম নাগাপাহাড়। আজো এখানে অবাধ আনন্দে ঘুরে বেড়ায় বিষধর ও বিষধরীরা। পাণ্ডবরা এসে ছিলেন এখানে। রয়ে গেছে এখনো তাঁদের পঞ্চকুণ্ড।

পঞ্চকুণ্ডের পাহাড়ী পথ ভাঙা ভাঙা অসংখ্য চড়াইয়ে একেবেঁকে উঠে গেছে। পুরানো বটের ঝুরি নেমেছে কুণ্ডের আশেপাশে। বিচিত্র এ

বটের গঠন ; কোথাও বা ঋজুতায় দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে—কোথাও আবার লতার মত আশ্রয় খুঁজছে। নাগকুণ্ড, স্বর্ষকুণ্ড, গঙ্গা, পদ্মা ও গোমুখ কুণ্ড প্রদক্ষিণ করে শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষের ছায়ায় দাঁড়াই। তুঁশো বছর অতীতের এ মন্দির অয়ত্রে অবহেলায় ইতিহাসের আবর্জনা আজ। তবুও মনকে টেনে নেয় মহাকাব্যের যুগে।

কথায় কথায়, বহু দূর চলে আসছি। বাঘদরহার ভয়াবহ আবহাওয়াকে মানুষ স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারে। তারই প্রসঙ্গে পৌঁছে গেছি মহাকাব্যের যুগে। কিন্তু কাব্য পরিণতি পায় অরণবেষ্টিত বাংলার আঙিনায়। বীরেন্দ্রজী হাসতে হাসতে বলেন—“নিমন্ত্রণ দিলাম, আসবেন...থাকবেন এই বাংলায়। জীবনে যদি এ্যাডভেঞ্চার খোঁজেন তাহলে এই উঠানেই মাঝরাতে তার সাক্ষাৎ পাবেন। দরজা আঁচড়াবে, জানালার কাঁচে মুখ ঘষবে ক্ষুধার্ত বাঘ আর বাঘিনী।”

—“সত্যি?” সঙ্গিনী চমকে ওঠে। চা'য়ে ওর রুচি কিন্তু যায় না।

পাহাড়ী জায়গায়, বিশেষ করে কুমায়ন পার্বত্য প্রদেশে ঘোরার সময় বাঘের কথা ও বার বার শুনেছে। এমন মনুষ্যবর্জিত প্রদেশে ডাকবাংলোয় ওকে সঙ্গে রেখেছি যেখানে—ঝরণা ডিঙিয়ে পাইনের ঝরাপাতা মাড়িয়ে অভিসারে বার হয় নেকড়ের দল। কাছাকাছি ডাকবাংলার রক্ষককে পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। নিশুতি রাতে তাদের হিংস্র নিঃশ্বাসে প্রায়ই লোকের ঘুম ভেঙে যায়। চূপ করে শুয়ে প্রভাতের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই উপায় নেই।

এখানে তো সে তুলনায় স্বর্গ। বিছাতের আলো আছে। উঠানের আলো জ্বাললেই তারা পাশের পাহাড়ে ফিরে যায়।

সব অরণ্যেরই এক নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। সে ভীষণ, সে মোহনীয়। সে দোলায় আবার ভোলায়ও। ঝিল, অরণ্য এবং পর্বত সব মিলেমিশে বাঘ-দর্হাকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সুদৃঢ়পথের আশপাশে বনস্পতির চেয়ে লতাগুল্ম ও কড়াইয়া গাছই বেশী। নানা ফুলে হলুদ পাতায় প্রতিটি ক্লান্ত মুহূর্তকে স্নিগ্ধ করে তুলছে তারা। অকালের দিনে, অনাবৃষ্টির মাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পাগল হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীতে মানুষ। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। পাথর জলে উঠলে ফসলও ঝলসে যায়। শেষ কণাটি নিয়ে মানুষ কাড়াকাড়ি করে—আর গো-মহিষকে দেয় কড়াইয়া গাছের ডাল সিদ্ধ করে।

শান্ত বিরঝিরে ঝিলের জল সূর্যের সামান্য আলোয় ঝলমল করছে আশ্বিনের সকালে। ছোট্ট সাঁকোটর পাশে বসে বসে মাছরাঙা এবং পানডুঝির খেলা দেখতে থাকি। সামনে পাহাড়ের একটি শিখর...সে যেন স্বতন্ত্র! সব কিছু পার হয়ে মাথা উঁচু করে মুগ্ধস্তরু ভূধর বাঘদরহাংর দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গিনী দৃষ্টি ফেরায়,—“দেখেছ!”

অরণ্যরাজ্যে জেগেছে উৎসবের উন্মাদনা। হলুদ পাতা ঝঝঝিরিয়ে বাবে, ডালে ডালে লতায়পাতায় জাগে কাঁপন, ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা রঙের বহু রূপের পাখী। অরণ্যে উৎসব এনেছে রামচন্দ্রের চরগুলি। কিক্কিঝাঝুরীর দিলদার প্রাণগুলিকে দূর থেকে অভিনন্দন জানিয়ে ফিরে আসতে চাই। সঙ্গিনীর কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছিল। ফিরতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্য করি হীরানন্দজী একবার নিজের ধোপদোরস্ত, চুড়িদার পায়জামা, পাঞ্জাবি আর জহরকোটের দিকে তাকাচ্ছেন, ফের ক্যামেরার দিকে। মনে পড়ে বাসা থেকে বেরোবার সময় একগাল হেসে নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—“ঠিক হৈ?” বিরলকেশ তালুর উদ্ভূত তেলচুকু পরম ভূপ্তির সঙ্গে সারা মুখে মুখে জানিয়েছিলেন, “অব্ মৈ প্রেসিডেন্টস্ পার্টি তক্ পহ্ চ সক্তা হ্!” বাঘদরহাংর অরণ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই প্রেসিডেন্ট পার্টিতে না পৌঁছলে বিশেষ ক্ষতি নেই তাঁর; কিন্তু ক্যামেরা পর্যন্ত তার চুড়িদার-কুর্তা না পৌঁছলে আশাভঙ্গের বেদনা গোলপাল মুখখানিকে সূর্যহীন করে রাখবে।

সঙ্গিনী ক্যামেরা খোলামাত্রই তিনি চিবুক উঁচু করে প্রস্তুত ভঙ্গীতে দাঁড়ান। আমাদেরও ফেরার পথ স্ফুগম হয়। স্বড়ঙ্গ পার হতেই শিখিল হয় অরণ্যের আলিঙ্গন। দিগন্তরেখা ছড়িয়ে যায় উন্মুক্ত পার্বত্যভূমির বন্ধুর বুক জুড়ে। স্তরে স্তরে হলুদ পাথর লাল পাথর আর মাদা পাথর সাজানো। ভীল ছেলেমেয়ে পাথর ভেঙে বয়ে নিয়ে চলেছে। বাসা বাঁধবে। পাথরের আড়ান্বে গড়বে নির্জন পৃথিবী। সঙ্গিনীকে পাশে পেয়ে সঙ্গী-সাথীর কান বাঁচিয়ে প্রশ্ন করি,—“ঘর বাঁধবে? পাহাড় ভেঙে আনব পাথর...আঙল ফুল দিয়ে গড়ে দোব স্বর্ণহার আর বাজুবন্ধ!”

অবাক হয়ে ও মুহূর্তের জন্ত তাকায়। স্মাশ্চর্য হবারই কথা! ষাষাবরের মুখে ঘরগড়ার কথা!!

ইতিহাস নির্দেশ দেয়। মানা না-মানা মাহুঘের হাতে। আত্মস্তরিতায়, স্পর্ধার সঙ্গে মাথা তুলে অনেক সময় সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করি। হুংথ পাই।

আত্মনির্ধাতন, পরপীড়ন এবং আত্মতিরস্কারে বাঁচা দুঃসহ করে তুলি। জায়-নীতি সমাজে থাকা প্রয়োজন মানুষ জানে, কিন্তু সে জায় ও নীতিশাস্ত্র সর্বহিতের আদর্শচ্যুতও হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আদালতে মিথ্যা মাক্যের জোর বেশী। চাঁদির চাকার রথ মিথ্যাকে সত্যের সাম্রাজ্যে গড়গড়িয়ে পৌঁছে দেয়। জেলখানায় চার বছর ছিলাম। বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় জেলে হাজারো হাজারো কয়েদী দেখেছি। কেউ তাদের খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। কেউ বা চুরি-ডাকাতি কিম্বা রাহাজানির জন্তে সাজা খাটছে। নকল অপরাধীর সংখ্যাই দেখেছি বেশী। অবশ্য বাংলা দেশের সেই অদৃষ্টপূর্ব নায়ক বিবাহবিশারদ হীরালাল, উর্ধ্বতন কর্মচারীর অপরাধী সন্তান, প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাই বলে প্রতারণাপটু বড়ুয়া—এমনি অনেককেও কাছে পেয়েছি। কেউ কাঁকর-মেশানো ভাঙাচালের ভাত চোখের জলে গলাধঃকরণ করছে, কেউ আবার গলার থলি থেকে গিনি বার করে আফিম গাঁজার ব্যবসা করছে জেলখানায়। জেলখানা তাই আমার কাছে অভ্যুত্থানের নতুন জগৎ। বাংলা-সাহিত্যে দেখছি জেলখানা নিয়ে লেখার এক নতুন চেষ্টা দেখা দিয়েছে। কিন্তু ‘লৌহকপাট’ খুলতে পেরেছে কে? বছরের পর বছর কয়েদীদের তত্ত্বাবধান করেছেন, তাদের হিস্ট্রি-টিকিট নাড়াচাড়া করেছেন, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন, শাস্তির বিধান দিয়েছেন মানি। কিন্তু লৌহকপাটের অন্তরালে সেলে কিম্বা ব্যারাকে আলোকে অন্ধকারে ওদের বুকের শব্দ, নিঃশ্বাসের উষ্ণতা বিশ্লেষণ করবার সুযোগ এঁরা কি পেয়েছেন? এঁরা কি জানেন—অল্পবয়সী ছিপছিপে কয়েদী-মুবককে কুশল জড়িয়ে, মাথায় ভোরাকাটা গামছার অবগুষ্ঠন টেনে দিয়ে তার সঙ্গী-সাথীরা তাকে নাচায়? লৌহকপাট মানে চুরি-ডাকাতির গল্প নয়, ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাসও নয়।

উদয়পুর জেলের নিমন্ত্রণ তাই স্বীকার করেছিলাম। বাবাকে ওরা দেখাতে চায়, বোঝাতে চায়—“জেল সাজা কী জগৎ নহী হৈ, বন্ধি এক বিগড়ে হয়ে ইনসান কো সুধারনে কে জগৎ হৈ!” নয়া ভারতের নবীন দৃষ্টিকোণ।

স্বাধীন ভারতের লৌহকপাট খুলে যারা ১৯৪৭ সালের পর এ জগতে আসবার আর সুযোগ হয়নি। ফটকে দাঁড়িয়ে লম্বা রেজিস্টারে সই করতে গিয়ে কেমন কৌতুক অনুভব করি। আজ আমরা দর্শক। আজ আর আমার আপন হবার অধিকার নেই। কাছে আসবে সবাই, ধরা দেবে না কেউ।

সিপাই-শাস্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে পৌঁছই উদ্যোগশিক্ষা বিভাগে। সারি সারি অশ্বর-চরখা চলছে কয়েদীর হাতে হাতে। ঘরে ঢুকেই মনটা হঠাৎ খারাপ

হয়ে গেল। ব্রিটিশ রাজত্বে নির্বিকার ভাবে হাত-পা এবং রসনার ব্যবহার দেখেছি। আক্ষেপ জাগতো—ভদ্র কয়েদীরা কি ভদ্র ব্যবহার আশা করতে পারে না? যে ইনসান্—যে মানবাত্মায় মনুষ্যত্ববিরোধী ভাবনা জেগেছে তার সংশোধনের জন্ত সজ্জদয়তার কি কোন প্রয়োজন নেই? তবে কর্তৃপক্ষের কি দরকার ছিল নির্বিরোধ অপরাধীর হাতের চরখা পা দিয়ে থামাবার? এ উদ্ভ্রত কেন? অশ্বর চরখা বিভাগে চল্লিশটি যন্ত্র চলেছে। সতরঞ্চি, আসন, তোয়ালে ও কাপড় বুনছে কয়েদীরা; কাটছে সূতো। এখানে যারা আছে তাদের অধিকাংশেরই সাজা প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত। কেউ এসেছে ডাকাতির অপরাধে, কেউ এসেছে ভেগ্রেন্সি আইনের কবলে।

সব জেলেই কয়েদীর সম্বল বলতে থালা-বাটি-কম্বলই বোঝায়। নারকেল ছোবড়ার গদিতে মোটা চাদর বিছিয়ে হাতে মাথা দিয়ে শচীনদাকে সেলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে যখনই অভিযোগ করেছি জবাব দিয়েছেন,—“ভাইরে, জেলখানার সম্বল থালা-বাটি-কম্বল! সে কথাটা ভুলতে চাই না।” সমস্ত আরামের থেকে, সকল ভোগবাসনা থেকে শচীনদা মুখ ফেরাচ্ছিলেন। টলস্টয় গল্প বলেছেন—মানুষের মাত্র পাঁচ হাত জমিরই তো দরকার! কবীর গেয়ে গেছেন—শেষপর্যন্ত দেড়গজ কাপড়েই আমাদের সমস্ত হয়ে চলে যেতে হয়। কাজেই বন্দীশালার থালা-বাটি-কম্বল তো অনেক হোল।

বাংলা দেশের কারাগারের চেয়ে এখানে তবু যেন স্নমৃদ্ধির গন্ধ একটু বাঁঝালো। কারো হাতে টিনের থালা-বাটি নেই। সব কিছুই পিতল-কাঁসা। চমকাচ্ছে। বাটির নামগন্ধ নেই এ রাজত্বে, হাতে হাতে বকবকে ঘটি। জেলখানায় ঢুকলেই পুরো সাম্যবাদ। ছ'খানি কম্বল, ছ'টি শার্ট, ছ'টি জাডিয়া, লাংওট, তোয়ালে, বড় বিছানার চাদর সবাইকে দেওয়া হয়। পকেটমার, মুরগিচোর থেকে নিয়ে কয়েদী-সম্রাট খুনী-ডাকাত সকলেরই সমান অধিকার। বসন এবং ভূষণ ছাড়া অশনের ব্যাপারেও কোন তারতম্য নেই। সরকারী প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক কয়েদী সকালে দেড় ছটাক গমের রুটি এবং পরিমাণ-মত দাল পাবে। বেলা বারোটার সময় আছে যবের রুটি ও দাল; আর সন্ধ্যায় মিলবে সন্জি ও যবের রুটি। মধ্যাহ্নভোজনের পরিমাণ হিসাব অনুযায়ী আশাপ্রদ। এগারো ছটাক আটা; এক পোয়া তরকারি, ও দেড় ছটাক দালে দেহধারণের অনুবিধা হতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে সরকারী প্রথামত খাবার কোন কয়েদীই পায়নি। কন্ট্রাক্টর এবং অধিকার-প্রাপ্ত লোকেরা শাস্টুকু নিয়ে ছোবড়া ফেলে রাখতো। জেলের বাগান

থেকে পুঁই ও কাটোয়া ডেকোর কাঠবৎ অংশটুকু হুন-হলুদে ডুবিয়ে তুলে দেওয়াই ছিল জেলখানার প্রথা।

উনিশ শো বিয়াল্লিশ সাল। ব্রহ্ম-সীমান্ত থেকে আর-হেড ফিরলেন ভাঙা জাপানী হাওয়াই জাহাজের প্রপলার আর আমাকে নিয়ে চট্টগ্রামে। সেটা ছিল মে মাস। সবোমাত্র চট্টগ্রামে জাপানী বোমারু বোমা ফেলে গেছে। লোক পালিয়েছে শহর থেকে কিছু কিছু। তবু দোকান-বাজার সব খোলা। চাইলে সব জিনিসই পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম জেলের কর্তৃপক্ষ তবু দিলেন না মাথার তেল, খাবারের ভদ্র অংশটুকু। অজুহাত দেখালেন বোমা-পড়ার। জেলের একপ্রান্তে ফাঁসির সেল। ফাঁসির আসামী নই তবু তার বেদীর পাশে ঘর দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে দিনের আলোয় ছায়া-ছবির মধ্যে আমার-বিশ্ময়প্রায় পৃথিবীতে ডুবে থাকি। খুনী-ডাকাত থেকে নিয়ে মাস্টারদা (সূর্য্য সেন)-র মত আত্মাও ভিড় করে। বাইরে আগস্ট আন্দোলনের প্রস্তুতি চলেছে। আমাদের দেয় দিয়ে আমরা চলে এসেছি—তবু স্বপ্ন দেখছি জেগে উঠছে দেশ। জনসমুদ্রে জাগছে ধর্মঘটের, বিদ্রোহের তুফান। সে মুহূর্তে সময় কেঁথায় ভাববার তেল আর কটি-মাখনের, সেদিনে সারা মন অধীর হয়ে আছে বিদেশী শাসনমুক্তির প্রতীক্ষায়। ইংরেজ কবে ভারত ছাড়বে! পিতামহীস শেষ কাজ করবার জন্তে অপেক্ষা করতে পারিনি। গলার কাঁচা খুলে ফেলে; হকিম্বানের কথা ভুলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছি। আমরা কি সব কক্ষচ্যুত নক্ষত্র? জলে নিঃশেষ হয়ে গেছি?

মনের তন্দ্রা ভেঙে নড়ে উঠেছিল গলা। চুমকে গেছলো নির্জনতা ভারী বুটের শব্দে।

—‘হালো, আর ইউ হ্যাপি?’ কথা বলছিলেন চট্টগ্রামের জেলাধীশ জ্যামিসন্ সাহেব। চিনতাম না তাঁকে। মধ্যাহ্নের হাফপ্যান্ট ও শার্ট পরা—বিরল কেশ শ্বেতাঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখি। ইংরাজ জন আইরিশ।

—“এ কি স্থখে থাকার জায়গা?”

—“কিসের অসুবিধা? মাথার কক্ষু চুলের দিকে তাকিয়ে বলেন, “মাথায় তেল দাও না কেন?”

—“দেবার মালিকরা যদি বঞ্চিত করে তবে করব কি?” হেসে জবাব দিই। জানাই—বোমাপড়ার জন্তে বাজারে মাথার তেল পাওয়া যায় না। অবশ্য মালিকের মাথায় যথেষ্ট তেল থাকে। লক্ষ্মীবিলাসের মুহু স্বগন্ধ তাঁদের চুল হতে সব সময় ভেসে বেড়ায়।

ফিরে যান জ্যামিসন্ ।

দিন পাঁচেক পর হঠাৎ বেজে ওঠে পাগলা ঘটি । কোন কয়েদী পালালো ? সিপাই-শাস্ত্রী তটস্থ । আমার আট ফুটের পৃথিবীও ভেবে কুল-কিনারা পায় না ।

কিছুক্ষণ পর মাহেব আসেন হাঁপাতে হাঁপাতে হাতে গন্ধতেলের শিশি । পলাতক আসামীকে খুঁজে বার করেছেন তিনি । কাজেই উদয়পুর জেলে কয়েদী-ভোজনের পূর্বব্যবস্থা জারী আছে কিনা তা বলতে পারব না । এ সব কথা কিছু নতুন নয় । স্বাধীন ভারতবর্ষে বহু দেশকর্মী আছেন যারা বছরের পর বছর কারাগারের মধ্যে থেকে ভেতরের বছরকম সমস্তা ও ছুর্নীতির রঙটঙ চেনেন । আজ সংশোধনের ভার তাঁদের দিলেই কাজ এগোবে যারা অর্থনীতিতে এম-এ পাস কিম্বা দর্শন ও ইতিহাস নিয়ে বি-এ পাস, তাদের দিয়ে মাকাই চলতে পারে না । আইনপরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে পাস করে আদালতে ঢুকে সত্যি নির্দোষ মানুষের পক্ষ নিয়ে লড়তে গিয়ে চতুর মোক্তারের হাতে মার খেতে দেখা যায় । নির্দোষ সাজা খাটে । পৃথিবীর এই চেহারাটা কেন মানুষের চোখে পড়ে না—কে জানে !

দরজা পর্যন্ত বিল্লাদার কয়েদী এগিয়ে আসে । বলরাম শর্মা এসেছিল মাদ্রাজ থেকে । ফর্জি আর্ম লাইসেন্সের জন্তে ছ'বছরের সাজা খাটছে । ঘুরে-ফিরে সে বোঝাতে চায়,—“আমি সাধারণ কয়েদী নই !” বলরাম বি-এ., বি-কম., ও এল-এল-বি পাস । অস্ত্রের কোন বামপন্থী দলের হয়ে কাজের জন্তে এখানে আইনের পেশার অজুহাত নিয়ে আসে । তারপর ? আমি নিজের চোখেই দেখতে পাই !

বলরাম যা বলে হয়তো তা সত্যি । মন কিন্তু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । কোন সে এমন বামপন্থী দল যার গোলা-বারুদের প্রয়োজন পড়ে গেল ? মুষ্টিমেয় মানুষ যেমন দেশ নয়, হাতে-গোনা কয়েকটি মানুষের গোলা-বারুদ নিয়ে কাঁপিয়ে পড়াও তেমনি মূর্থতা । আজকের পৃথিবীতে আগ্নেয়াস্ত্রেরই বা মূল্য কি ? বাবাকে তাঁর জার্মান বন্ধু ভিক্টর বলেছিলেন—“আমরা জানি, আমরা বুঝতে পেরেছি ভারতবর্ষ কোন অস্ত্রে রুলী ! ট্যাঙ্ক, কামান, ক্রুজার, বোম ও বারুদের শক্তির চেয়ে তার হৃদয়বল ও আত্মবিশ্বাসই বড় কথা । এত কোটি মানুষের হৃদয়কে অসামান্য করার শক্তি অস্ত্রের কোথায় !” অথচ আমরা ? সে কথা বুঝতে চাই না । বলরামের চকচকে ছুটো চোখে তাই শুধু অপমৃত্যুর ছায়া দেখি ।

(ক্রমশঃ)

দুই যুগ

ত্ৰীপ্ৰমথনাথ বিনী

বঙ্কিমযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় বাঙালী যদি হয় গোরা, মনে রাখতে হবে গোরা উপন্যাসের ঘটনাকাল আনুমানিক ১৮৮২ সাল, তবে নূতন যুগের প্রতিনিধি অমিত রায়। দু'জনের চরিত্রের প্রভেদ যুগচরিত্রের প্রভেদ। গোরার জীবনবাণী যদি হয় 'চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না'; অমিত রায়ের জীবনবাণী যেন তারই প্রতিবাদ। গোরার কাজ করবার মতো উৎসাহ ছিল, অমিত রায়ের তার অভাব বলে সে কেবলই কথার চুল চিরে চিরে বুদ্ধির বাহাহুরি দেখায়। এই মনোভাবের সাহিত্যিক রূপ দেখা দিল প্রমথ চৌধুরীর কলমে।...প্রমথ চৌধুরীর জগৎ অমিত রায়ের জগৎ—সে জগতের নাম দেওয়া যেতে পারে চায়ের টেবিলের জগৎ। সেখানে কথাবার্তা চাপা গলায়, সেখানে হাসি পরিমিত, বাণী পরিমিত, ভাষার পদক্ষেপ পরিমিত আর সেখানে ভাষার সঙ্গীত পেয়ালায় চামচে টুংটাং ধ্বনি। বাংলাসাহিত্যে এ সব লক্ষণ নূতন ও যুগ-চিন্তের বাহন। প্রমথ চৌধুরীর নিন্দা করবার উদ্দেশ্যে এ-সব কথা বলছি না, বরঞ্চ প্রশংসাই করছি। একটা নূতন যুগের ভাবসাব। চরিত্র ও বক্তব্যকে প্রতিভার আতস কাঁচে সংহত করে শিক্ষা জালিয়া তোলা কম শক্তির পরিচয় নয়। ওর মধ্যে নিন্দনীয় যদি কিছু থাকে তবে তা যুগধর্মনিহিত, কিন্তু বোধ করি তাও নয়, কেন না, যুগধর্ম নিন্দনীয়ও নয়, প্রশংসনীয়ও নয়—বা তাই; নিন্দা প্রশংসা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে।

—বাংলা গল্পের পদাঙ্ক। ভূমিকা, পৃ ২১৭

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। বিবর্ণ হলুদ রঙের পাঁতা, নিঃশেষআয় বস্তুমতী-সংস্করণ প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী পড়েছিলুম। “সনেট-পঞ্চাশৎ” ও “পদচারণ” পড়ে চমকে উঠেছিলুম। প্রথম বিশ্বসমরোত্তর বাংলা কাব্যক্ষেত্রে তরল রোমাটিকতার প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর পরিপাটি গঠননৈপুণ্যে সেদিন এক পাঠকের মনোহরণ করেছিল প্রমথ চৌধুরীর কবিতা।

আজো সেই চমকের কথা মনে পড়ে—

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালোবাসা,

যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।

তার লাগি চাই কিন্তু ছুটি আয়োজন—

জোর-করা ভাব, যার ধার-করা ভাষা!

[উপদেশ, সনেট-পঞ্চাশৎ]

এর মধ্যে “তার লাগি” ছাড়া বাকি সবটাই গুণভাষা বললে ভুল হয় না।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-শায়ক নিক্ষেপ করেছিলেন ‘বীরবল’ নামধারী কবি—

হৃদয়ে জগিলে মোর ভাবের অঙ্গুর,

ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে তুলিয়ে।.....

কল্পনা রাখিলে আমি আকাশে তুলিয়ে—

নহি কবি ধূমপায়ী, নলে ত্রিবঙ্গুর। [আত্মকথা, সনেট-পঞ্চাশৎ]

এর পরবর্তী ব্যঙ্গ-শায়ক তীক্ষ্ণতরঃ

কবিতা লিখেছি শখে, হয়েছে কল্পুর।

প্রথম মুশকিল মেলা চরণে চরণ,

দ্বিতীয় মুশকিল শেখা একেলে ধরণ,

তৃতীয় মুশকিল দেখি পাঠক খণ্ডর।

[কবিতা, পদচারণ]

স্তম্ভু তাই নয়,—

জানি মোর ভারতীর তহুর তনিমা,

না বধি রাবণপণ্ডে, কিংবা রাজা কংস।

সাধনার ধন মোর ভাবের অগ্নিমা—

অর্থাৎ ভাবায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ।

[আমার সমালোচক, পদচারণ]

শেষ কথা,

তোমাদের চড়া কথা শুনে

যদি হয় কাটিতে কলম,

লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে

তোমাদের কড়া কথা শুনে।

তার চেয়ে ভালো শতগুণে

দেয়া চির লেখায় অলম,

তোমাদের পড়া কথা শুনে

যদি হয় কাটিতে কলম। [সমালোচকের প্রতি পদচারণ]

প্রমথ চৌধুরীর এই-সব কবিতা আবার নতুন করে পড়ার স্বযোগ হল। যিনি সবিনয় নিবেদনে জন্মিয়েছেন “এ কবি ছিল না কভু বাণীর ঢলান” [কৈফিয়ৎ পদচারণ], সেই কবি প্রমথ চৌধুরী “দ্বিতীয় ঘোবনে” পদার্পণ করে’ যে কবিতা রচনা করলেন, তার অভিনব রূপের নাম সনেট ; কবির কথায় তার পরিচয়—

এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,

কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদ—

প্রকৃতি যাঁহার ‘জ্যেষ্ঠ’, আকৃতি ‘কনেষ্ঠ’। [কৈফিয়ৎ, পদচারণ]

প্রমথ চৌধুরীর কবিতাসংকলন * নোতুন করে পড়ে এ-সব কথাই মনে এলো। প্রমথ চৌধুরীর কবিতার কাব্যমূল্য নিয়ে নানা সংশয় এককালে দেখা দিয়েছিল, পুরনো শনিবারের চিঠিতে তার পরিচয় আছে। কিন্তু কবি আমাদের জানিয়েছেন—

পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।

[ব্যর্থজীবন, সনেট-পঞ্চাশৎ]

মনোঘুড়ি বৃন্দ হলে ছাড়িলে লাটাই !

[আত্মকথা, সনেট-পঞ্চাশৎ]

মিলিয়ে থিলিয়ে কথা আমি লিখি পদ,

লোকে বলে, ‘ও তো শুধু মিলনাস্ত গদ্য। [কবিতা, পদচারণ]

* সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্ত্যান্ত কবিতা ॥ প্রমথ চৌধুরী ॥ সম্পাদনা—শ্রীপুলিনবিহারী সেন ॥
আই. এ. পি. ১৮৮৩ শক। পাঁচ টাকা।

কবির এই দৃষ্টিই সব নয়। তাঁর নিজস্ব অবেষণ আছে—আকাজ্জাও আছে—

সত্য কথা বলি, আমি ভালো নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি।
আর আমি ভালোবাসি বিজ্রপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জল চঞ্চল যার নির্মম অনল—
দগ্ধ করে পৃথিবীর গুহ্য ভূগরাশি ॥

[হাসি ও কান্না, সনেট-পঞ্চাশৎ]

সনেট-পঞ্চাশৎ, পদচারণ ও অন্যান্য কবিতা এই অবেষণ ও আকাজ্জা, অভূষ্টি ও বেদনা, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মদর্শনের ইতিহাস।

বর্তমান সংস্করণে সম্পাদক ‘অন্যান্য কবিতা’-অংশে এতাবৎকাল ছড়িয়ে-থাকা কবিতা সংকলিত করেছেন। এই অংশের প্রথম কবিতায় কবি প্রমথ চৌধুরীর জীবনানুরাগ স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত হয়েছে—

জীবনের অঙ্ক বাড়ে যতদিন বাঁচি,
নিত্য নব দিন আসে চলে নাহি যায়। •

পুরাতন মিশে থাকে নূতনের গায়। •

এ জীবনে ভাই আমি প্রতিদিন বাঁচি ॥ [পঞ্চাশোদশে]

প্রমথ চৌধুরী এই মানসিক যৌবনের কবি—যে যৌবন বৈরাগ্য, জরা, শ্রান্তিকে অস্বীকার করে। ‘সনেট পঞ্চাশৎ’ (১৯১৩) ও ‘পদচারণ’ (১৯১৯) কবিতাগ্রন্থদ্বিতে মানসিক যৌবনের জয়গাথা ঘোষিত হয়েছে। ‘সবুজপত্রের মুখপত্র’ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী এই মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠাই সবুজপত্রের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। বস্তুত প্রবন্ধকার ও কবি প্রমথ চৌধুরী অভিন্ন সত্তা। প্রমথ চৌধুরীর কবিতাপাঠে সবুজপত্রের সংগ্রামী সম্পাদককে চিনে নিতে দেরী হয় না।

বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক ‘গ্রন্থপরিচয়’ অংশে রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিকে যে সংবন্ধনা জানিয়েছিলেন, সেই-সব চিঠি ও প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পাই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর তিনটি চিঠি।

এগুলির মধ্য দিয়ে সনেট-পঞ্চাশতের কবি প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কবিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :

“প্রমথ, তোমার সনেট-পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি তো দেখি নি। এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই—এ যেন ইম্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি—ভীক্ষধার হাস্যে ঝকঝক করচে—কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপসা হয়নি—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেচে। বাংলার সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইম্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ। ইতি ২২শে এপ্রেল ১৯১৩।”

‘বঙ্গসরস্বতীর খড়াপানি মূর্তি’ প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মনোভঙ্গির সঙ্গে কবি প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতার কিছুটা মিল ছিল। কিন্তু তারপর? স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীস্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কখনো সখনো এই মানসিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। সাম্প্রতিক কবিরা বীরবলী-কবিতাপাঠে উপকৃত হবেন, এই আশা প্রকাশ করা অজায় হবে না বলেই মনে করি। নূতন কবির উদ্দেশ্য প্রমথ চৌধুরী যে কথা বলেছিলেন তা একালের কবিরা স্মরণ রাখলে উপকৃত হবেন বলে বিশ্বাস করি—

প্রকৃত কাহারো	রক্ষিতা নয়।
সবারি গলাতে	জড়িয়ে রয় ॥
যে রস তাহার	পরশে পাও
নিজের জ্বানি	কবুল থাও ॥

[নূতন কবি, অজ্ঞাত কবিতা-অংশ]

এ-কথা প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে (১৯১২), আজো তার প্রয়োজন ফুরায় নি।

যদি পড়তেই হয়

বেঙ্গল'এর বই.....

কাদম্বরী

ডক্টর স্মৃতির করণ

বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতির যুগ তখনো শেষ হয়নি। অল্পবাদের ভেতর দিয়ে তার গতি ক্রমশঃ আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছে। রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-ঈশ্বরচন্দ্র (বিদ্যাসাগর)-তারশংকর-প্যারীচাঁদ—এঁদের প্রচেষ্টার মধ্যেই আধুনিক গল্পের বিকাশ-কণিকা পূর্ণায়িত হলো—বঙ্কিমচন্দ্রে। সপ্তম শতকের মহাকবি বাণভট্টের ‘কাদম্বরী’ অবলম্বন করে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তারশংকর তর্করত্ন বাংলা ভাষায় সেই গল্পকাব্যের অল্পবাদ প্রকাশ করলেন। এই অল্পবাদ নিয়েই আমাদের আলোচনা। তারশংকরের সমসাময়িক এবং সাহিত্যের দিক দিয়ে তাঁর পূর্বসূরী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন বাংলা গল্পের ‘উজ্জ্বল জনতাকে’ স্মরণ করছেন,—অল্পবাদ-সাহিত্যের মধ্যে নোতুন জীবনশ্রোত প্রবাহিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা যখন বাংলা সাহিত্যের আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দীপ্তি নিয়ে প্রকাশমান, ঠিক সেই সময় সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারের কর্মী তারশংকরের প্রতিভাও বিকশিত হলো—বিদ্যাসাগরের প্রতিভাসূর্যের আড়ালে খানিকটা ম্লানরূপেই। রচনারীতিতে, তারশংকর বিদ্যাসাগরের কাছে কিঞ্চিৎ খণী বৈকি। কিন্তু তাঁর মৌলিকতা এবং বিশিষ্টতাকেও আমরা বাদ দিতে পারি না। মহাকবি বাণভট্টের, গল্পকাব্যের উচ্ছ্বাস তিনি আত্মস্থ করবার চেষ্টা করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে বাণভট্টের দীর্ঘসমাসবদ্ধতাকেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন,—কিন্তু এদিকটা গৌণ। তারশংকরের রচনায় সংস্কৃত-গদ্য বেশ ভালোরূপেই ছিল এবং তা’ ছিল বাণভট্টের রচনাকে অল্পকরণ করবার জন্মই। এ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের দিকটাও লক্ষ্য করবার মতো। শব্দসৌন্দর্য্যে এবং প্রকাশভঙ্গিতে বাণভট্টের যে দক্ষতা, তারশংকরের অল্পবাদের মধ্যে তেমন দৃক্ষশিল্পীর হস্তচিহ্ন হয়তো বা আমরা পাইনি, কিন্তু তিনি সহজ এবং সরলভাবে অনেক ক্ষেত্রেই মূলের বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। ফলে মূল কাব্যের বিস্তৃতির অবলোপ ঘটেছে তারশংকরের কাদম্বরীতে, কিন্তু সংস্কৃতের নাগপাশ থেকে তিনি তাকে রক্ষা করেছেন। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাভীর্য বজায় রেখে তিনি যদি কাদম্বরীর অল্পবাদ করতেন,

তা' হলে একমাত্র ক্রিয়াপদ ছাড়া বাংলাভাষাকে খুঁজে পাওয়া। তারাশংকরের আত্মবাদিক দুর্বলতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৃতিত্বও উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলাগণে, যতিস্থাপনের পূর্ণতা দেখা দিল বিজ্ঞানাগরের রচনায়। তারাশংকরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে,—তিনি পূর্ণচ্ছেদ, কমা এবং সেমিকোলনের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা' সূচক নয়। পূর্ণচ্ছেদের ভারেই পংক্তিবিজ্ঞানের অবস্থাকে দুর্বল করে তুলেছেন। তার ফলে অত্মবাদের স্বচ্ছলপ্রবাহে উপলব্ধির বাধা মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে। ভাষার স্রোতকে সেক্ষেত্রে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। এটা ঘটেছে, অত্মবাদের মূলস্রোতকে যথাযথরূপে ধরতে না-পারার জেতে। একথা বলছি না, যে তারাশংকরের অত্মবাদ শোভন হয়নি; শোভন হয়েছে অনেক দিক দিয়েই, কিন্তু তার অশোভনতাকেও দৃষ্টির বাইরে ফেলতে পারিনি। সংস্কৃতির দীর্ঘসমাসবদ্ধতা, বাংলাভাষায় রক্ষা করা বিপজ্জনক সে ক্ষেত্রে অত্মবাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। তারাশংকর একথা জানতেন এবং কাদম্বরীর ভূমিকাতে-ও তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে তাঁর অত্মবাদপংক্তি—অত্মসারী নয়, ভাবাত্মসারী। সেজন্য তিনি অনেক বর্ণনার বিস্তৃতিকে ছোট্ট ফেলে, তার সৌন্দর্যকেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিহত করেছেন। কিন্তু এও আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় নি, যে, তিনি মূলের অত্মসরণ করতে গিয়ে অনেক সময় দুর্বল অত্মকরণ করেছেন। ফল হয়েছে এই যে, যতিসংস্থাপনের ক্ষেত্রে রীতিমতো গাঙগোল উপস্থিত হয়েছে। পূর্ণচ্ছেদের আক্রমণে—পংক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ঘটেছে,—বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটবার পূর্বেই পূর্ণচ্ছেদের উত্তত দণ্ড তার গতিকে অর্ধসমাপ্তির পথে অসহায়ের মতো দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। এই অসহায়তা লক্ষ্যণীয় : “অবস্তীদেশে উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। যে স্থানে ভুবনত্রয়ের সর্গস্থিতিসংহারকারী—মহাকালাভিধান ভগবান্ দেবাদিদের মহাদেব অরস্বিত্তি করেন। যে স্থানে শিপ্রানদী তরঙ্গরূপে জুটুটি বিস্তার পূর্বক ভাগিরথীর প্রতি উপহাস করিয়া বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।” ক্রিয়াপদের অসংবদ্ধতাও কাদম্বরীতে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানাগরের যতিস্থাপন দুর্বল নয়; তাঁর রচনায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বাহুল্যও দেখা দেয়নি। তারাশংকরের রচনার মধ্যে এ দুর্বলতা মাঝে মাঝে দেখা গেছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার বহু-আবর্তনে বাক্যের মাধুর্য নষ্ট হয়েছে— : “একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অন্তগত হইলে, পক্ষীগণের কলরবে অরণ্যানী—কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আভাষে

গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনানন্দন বিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসমরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্ললীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অশেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।” মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে যে গান্ধীর্থ, যে-রসসৃষ্টি তারাশংকরের অনুবাদে সে-গান্ধীর্থ নেই, সে-রসসৃষ্টির প্রকাশও নেই। বাণভট্টের যে চিত্রধর্মিতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তারাশংকরের অনুবাদে তার প্রকাশ অতি ক্ষীণ। যে-রঙ ফলাতে বাণভট্টের প্রাস্তি ছিল না, তৃপ্তি ছিল না, যে-রঙের মধ্যে কবিত্ব আর ভাবের রঙও ছিল প্রচুর, তারাশংকরের অনুবাদে তার প্রকাশ নেই। বর্ণ-বিচ্ছাসের কৃতিত্বে বাণভট্ট অতুলনীয়। তারাশংকর, সেই বর্ণের স্বাক্ষর যথার্থরূপে রাখতে পারেননি; অনেক ক্ষেত্রে অতি সংক্ষেপে কাহিনী স্বরক্ষা করেছেন মাত্র। কিন্তু কাহিনী প্রকাশ করাই অনুবাদকের একমাত্র কাজ নয়; মূলের ভাব আর রঙ রাখাই

প্রতিরক্ষা বণ্ডে

লগ্নী করার অর্থ

নিব্বাপত্তায় জন্ম লগ্নী

তাঁর সবচেয়ে বড়ো কাজ। রবীন্দ্রনাথ, বাণভট্টের কাদম্বরীকে বলেছেন চিত্রশালা; কথাটি অতি শোভন। তারাশংকরের কাদম্বরীকে চিত্রশালা কিছুতেই বলা চলে না,—কারণ তাঁর অনুবাদ, কাহিনীকে বড়ো করে দেখেছে, বাদ দিয়েছে মূলকাদম্বরীর স্পন্দমৌল্যকে। মূলকাদম্বরীতে ব্যাধকর্ষক পক্ষীশাবক অপহরণ-ক্ষেত্রে এবং মৃগয়া-কোলাহলের সময় বাণভট্ট যে অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সমাবেশ করেছেন, তারাশংকর তার কণিকামাত্রও আমাদের জন্ম রাখেন নি। তিনি আমাদের মৌল্য-সৌকর্য্য দেন নি, দিয়েছেন কেবলমাত্র কাহিনীর স্থূলতা। বাণভট্ট যেক্ষেত্রে বর্ণনার সাহায্যে স্বর্গের স্বপ্না সৃষ্টি করেছেন, সে ক্ষেত্রে তারাশংকর মর্ত্যের মাধুর্য্যটুকু লুপ্ত করে ফেলেছেন। একটু উদাহরণ দিয়েই বলি; বিষ্ণাটবীতে মৃগয়ার কোলাহল, এক বনস্পতির শাখায় শাখায়, কোটরে-কোটরে পক্ষীশাবকদের শিশুরাজ্য; এক ছুরন্ত ব্যাধ সেই গাছে উঠে পাখীর বাচ্চাগুলিকে নির্মম হাতে হত্যা করে, গাছের নীচে ফেলে দিচ্ছে;.....এ ক্ষেত্রে বাণভট্ট অপূর্ব চিত্রাঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পংক্তিগুলির অনুবাদ করেছেন: “কেহ-বা অল্পদিবসজাত,

তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটল কান্তি যেন শাল্লী-কুসুমের মতো ; কাহারো পদের নূতন পাণ্ডির মতো অল্পঅল্প ডানা উঠিতেছে ; কাহারো-বা পদ্মরাগের মতো বর্ণ ; কাহারো-বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে, যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে ; এই সমস্ত প্রতিকারে-অসমর্থ শুকশিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক-একটি ফলের মতো গ্রহণ পূর্বক গতপ্রাণ করিয়া ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।” উপমা-উৎপ্রেক্ষার সৌন্দর্যে, এ-অভুবাদও মধুর হয়ে উঠেছে, দীপ্ত হয়েছে তার ব্যঞ্জনা। তারাশংকরের অভুবাদ :—“সোপানশ্রেণীতে পাদক্ষেপপূর্বক অট্টালিকায় যেরূপ অনায়াসে উঠা যায়, নৃশংস কণ্টকাকীর্ণ ছুরারোহ সেই প্রকাণ্ড মহীকূহে সেইরূপ অবলীলাক্রমে আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিষাবকদিগকে ধরিয়া একে-একে বহির্গত করিয়া প্রাণসংহার পূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।” ‘কাদম্বরী’ “অবিকল অভুবাদ” না-ই হোক, “অবিকল পরিগৃহীত”-ই হোক, কিন্তু এ পরিগ্রহণের মধ্যে রস-গ্রহণের প্রচেষ্টা খুবই কম। অভুবাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা এবং বর্ণনার সৌন্দর্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক বাংলাগদ্যের—বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বর্ষাকালবর্ণনায় এবং শরৎকালবর্ণনায় তাঁর মৌলিকত্ব স্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে তিনি মূল গ্রন্থের ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। বেতাল পঞ্চবিংশতিতে বিদ্যাসাগর যেমন, শশানদৃশ্যের বীভৎসতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, কাদম্বরীতে বর্ষাকালের দৃশ্যবর্ণনাতেও তারাশংকর এরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার প্রাকৃতিকবীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। ভাষার গান্ধীর্ষ আছে এক্ষেত্রে, তার গুরুভার নেই। প্রকাশভঙ্গীর নবত্ব আছে, নেই কোন পাশ কাটিয়ে যাবার প্রবৃত্তি। “পথে বর্ষাকাল উপস্থিত। নীলবর্ণ মেঘমালায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্দিকে মেঘ, দশদিক অন্ধকার। দিবারাত্রির কিছুই বিশেষ রহিল না। ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জন ও ক্ষণপ্রভার হুঃসহ প্রভা ভয়ানক হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টি।……।” ছোট্ট পংক্তির মধ্যে তারাশংকর তাঁর প্রকাশভঙ্গীর নবত্ব দেখিয়েছেন। দীর্ঘমাসবদ্ধ পদ এবং দুর্বহ অলংকারের চাপে—বর্ষাকালের মহিমাকে তিনি লুপ্ত করে ফেলেন নি। এমন দৃষ্টান্ত তাঁর কাদম্বরীতে আরো আছে। বেতাল পঞ্চবিংশতিতে—বিদ্যাসাগরের রচনারীতিতে বরং তারাশংকরের মতো এই বর্ষাকালের দৃশ্যবর্ণনায় জটিলতা আছে। “একে

কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত; তাহাতে আবার, ঘনঘটাধারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, মুঘলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল; “...এ’র সঙ্গে উপরোক্ত উদ্ধৃতির প্রথমভাগের সাদৃশ্য আছে, রচনারীতির স্বল্প পার্থক্যটি একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারা যাবে আশা করি। কিন্তু সর্বাঙ্গীণরূপে তুলনায়, বিজ্ঞাসাগর তাঁর রচনারীতিতে, ভাষার প্রসাদগুণে, যতিসংস্থাপনে, শব্দবিজ্ঞাসে এবং রসস্থিতিতে, তারাশংকরের চেয়ে অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কাদম্বরীর স্থান যে একেবারেই নগণ্য, একথা কিন্তু আমরা বলতে পারি না। যে যুগে তারাশংকরের জন্ম, সে-যুগে তাঁর প্রতিভা একেবারে হীনপ্রভ নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বাংলাগতের যদি-কোন ঝংকার আমরা শুনে থাকি, তা’ শুনেছি তারাশংকরের মধ্যেও। প্যারীচাঁদের ঝংকার এ ঝংকারের সুরে সুর মেশাতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ-গতের আদর্শ, তারাশংকর-প্যারীচাঁদের বৈতসত্য নিহিত ছিল, বলা চলে। তারাশংকর, বিজ্ঞাসাগরের দীপ্ত-প্রতিভাকে অতিক্রম করতে পারেন নি, একথাও যেমন সত্য, তিনি বিজ্ঞাসাগর-যুগেও তাঁর মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন—এ-ও তেমনি সত্য। এ মৌলিকত্ব কাদম্বরীতে সহজ-দৃষ্ট নয়, সহজ-দৃষ্ট “রাসেলোসে” গঙ্গাচরণ সরকারের কথা : ‘কাদম্বরী তো কাদম্বরী : ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্ত মাতাইয়া তুলিল ! যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গলার জনসোনিয়ান ভাষা।’ বাঙ্গলায় গজচ্ছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস।”—কথাগুলি সর্বাঙ্গীণ সত্য না হ’লেও আংশিকরূপে নিশ্চয়ই সত্য। বাংলাসাহিত্যে—গত-রীতির ইতিহাসে তারাশংকরের “কাদম্বরী”র সংকুচিত হওয়ার কারণ নেই।

বেঙ্গল’এর রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনী

নীহাররঞ্জন গুপ্তের	ফাঁদুনী মুখোপাধ্যায়ের
অদৃশ্য শত্রু ৪র্থ মুঃ	২’০০ ॥ পাতালের পাকচক্র ৩য় মুঃ ১’২৫ ॥
ড্রাগন ৩য় মুঃ	২’০০ ॥ ওঙ্কারের টঙ্কার ২য় মুঃ ১’২৫ ॥
রাত্রি যখন গভীর হয় ৫ম মুঃ ১’২৫ ॥	ব্লাড ব্যাঙ্কার ৩য় মুঃ ১’২৫ ॥
মৃত্যুবাণ ২য় খণ্ড ২য় মুঃ	২’০০ ॥ লালবাবুর লাশ ২য় মুঃ ১’২৫ ॥
বিমল দত্তের	

কাশ্মীর প্রিন্সেস (৩য় মুঃ) ৪’০০ ॥

জীবন-মৃত্যুর এক
অভিবিচিত্র কাহিনী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো

বিষ্ণু দে'র কবিতা

রঞ্জিত সিংহ

এলিয়ট তথা ক্ল্যাসিসিজমের প্রত্যাবর্তনের বহুপূর্বেই চিত্রকল্প-আন্দোলনের পুরোধা টি. ই. হিউম ঘোষণা করেছিলেন যে রোম্যান্টিক কবিতার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাধাবন্ধহীন আবেগের কাল অবসানপ্রায়। ফলত কবিতার জগৎ থেকে যে-ফ্যান্সিকে আকল্পনাজ্ঞানে কোলরিজ নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হিউমের আত্মকৃত্যের অন্ততম হল। কারণ তাঁর বিবেচনায় সংহত রূপকল্পের সাথার্থ্যে কল্পনার আকাশবিহার যত না কার্যকরী প্রাকরণিক বিবেক বৃষ্টি বা ততোধিক প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে হিউম এও বলেছেন, ক্ল্যাসিসিজমে কল্পনার আকাশবিহার-ও সংযমের অধীন। এই মন্তব্যের বৈশিষ্ট্যকল্পে 'Cymbeline' নাটকের অন্তর্ভুক্ত একটি গানের দুটি পংক্তি উদ্ধার করে 'Golden lad' এই শব্দবন্ধের তিনি খুব তারিফ করেন। 'Golden' শব্দের পর 'lad' শব্দের প্রয়োগ কতখানি সংযমের সাক্ষ্য তা রোম্যান্টিকসদের অতিকথন-প্রীতির তুলনামূলক বিচারেই প্রমাণিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে পাউণ্ড যখন বললেন যে লিরিকতার যুগ শেষ হয়ে গেলেও লিরিকব্যবহারের আগ্রহ নৈরাঅ্যাপস্বী কবিদের অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত তখন পাকেপ্রকারে তিনি হিউমকেই সমর্থন করেছিলেন। অধিকন্তু এফ. ও. ম্যাথীসনের মধ্যস্থতায় আমরা জানতে পারি যে যদিও 'স্পেকুলেশন্' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এলিয়ট পাউণ্ডের মুখে হিউমের নাম শুনেছিলেন মাত্র এবং যখন হিউম এলিয়টের কাছে প্রায় জনশ্রুতি এলিয়টের কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ যদিও সেসময়েই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, তবু তাতেও হিউমের 'রোম্যান্টিসিজম ও ক্ল্যাসিসিজম' প্রবন্ধের আশ্চর্য প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আসলে প্রথাগতরূপের উচ্ছেদ হিউম এমন মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন যে বের্গসের শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যায় কবিতার ভাষা সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য তিনি করেছেন, তার পুনরুচ্চারণে নিশ্চয়ই আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কাছে আমি অটুহাসির কারণ হব। উপরন্তু সাধারণজ্ঞান মাল্লুষের সামান্তলক্ষণ নয়। কলে প্রতি যুগে এবং প্রত্যেক দেশে মৌল কবির আবির্ভাবে পাঠকবর্গ

অসিধারাত্রতই গ্রহণ করেন। এর কারণ অবশ্য একট-ই আছে যে সংকবিও প্রাথমিকভাষার সম্পর্ক চিরদিনই বিষমাত্মপাতিক। আর যদি পাঠককে বিভ্রান্ত করাই কবির প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রতিবাদ নিশ্চয়ই ত্রায়সম্মত। কিন্তু তাতেও ত দেখি রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে ক্ষমা করেন নি। শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলাল ন্যূনতম অংশ জুড়ে রয়েছেন। অবশ্য ইতিহাস সাক্ষী নেই তবু একদা কীটস যখন ‘পট্ অব্ বাসিল্’ কবিতায় ‘আকাশ’ শব্দের পরিবর্তে শুধু ‘নীল’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন আজকের দিনে বিষ্ণু দে’র কবিতার মতই হয়ত তাৎকালিক পণ্ডিত-আমরেরও এই একই অট্টহাসির রব শোনা গিয়েছিল।

বিষ্ণু দে’র কবি জীবনের সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য তিনি জনসাধারণের শ্রুতকবি, পঠিত কবি নন। বসবাসের উন্নতমানে যে-দ্রব্যাদির সংস্থান আধুনিক জীবনে আবশ্যিক, আমি জানি, তাতে একদিকে যেমন রেডিওগ্রাম, ক্রীজ ইত্যাদি অবস্থান করে, তেমনি অন্যদিকে বিষ্ণু দে’র কবিতা, অজাস্ হক্সলীক প্রবন্ধগ্রন্থও অত্যাবশ্যক। আসলে সিরিল্ কোনোলি যে-উন্নত অর্থে ‘Dandy’ শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন তার আমরা কদর্ঘ ঘটিয়েছি বিষ্ণু দে’কে কেন্দ্র করে। অবশ্য বহু আগেই স্বধীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন যে বর্তমান লেখকদের অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিত্যাৎকৃতিতে সমকক্ষ না হ’লেও ‘পাশ্চাত্য নামের খামখেয়ালী উল্লেখ অনেকের জিহ্বাই একেবারে অনাড়ম্বর’। কিন্তু একথা লেখার সময়ে সাম্প্রতিক পাঠকদের নাম স্বধীন্দ্রনাথ যে সাবধানে এড়িয়ে গিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এই ধরনের পাণ্ডিত্যের জোরেই শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস-গ্রন্থে বিষ্ণু দে’র কাব্যগ্রন্থে এলিয়টের নাম উল্লিখিত হয়েছে। কারণ জনশ্রুতি যখন বিষ্ণু দে’র সঙ্গে এলিয়টের নাম যুক্ত করেছে তখন তার পুনরুল্লেখ স্বকুমারবাবুরই বা আপত্তি কোথায়! পক্ষান্তরে এও জানি যে পাঠকবর্গের এই বিভ্রান্তির জন্ম স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত-ই প্রাধান্য দায়ী। কারণ বাংলা তিনি অগ্রায় রকমের শুদ্ধ লিখতেন। ‘মালার্মের কাব্যাদর্শ আমার অদ্বিষ্ট’—এই কথা ব’লে স্বধীন্দ্রনাথ নিজেকে যেমন পথে বসিয়েছেন ‘বিষ্ণু দে’র মত এলিয়ট-ভক্ত কখনও নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না’—এই ব’লে বিষ্ণু দে’কে-ও তিনি সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। কারণ আমাদের বৈশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষা-দীক্ষার গুণ এমন-ই মহৎ যে প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ স্বকুমার সেন-ও মালার্মে ও এলিয়টের

সঙ্গে যথাক্রমে স্বধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে'র কবিতার তুলনামূলক আলোচনা ক'রে বসে আছেন।

কিন্তু যেকালে স্বধীন্দ্রনাথের মত বিষ্ণু দে-ও অন্তর দিয়ে অনুভব করে ছিলেন যে লিরিকতার যুগ অবসান প্রায় তখন এ ব্যাপারে হিউম-পাউণ্ড-এলিয়টের কাব্যজিজ্ঞাসা তাঁদের যে কোনোরকম সাহায্য করেনি—এ ধরনের ধারণা না হওয়ার-ও ত কোনো গ্রায়সঙ্গত কারণ নেই। উপরন্তু, 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের ওপর স্বধীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রবন্ধ যখন বুদ্ধদেব বসুর মত বিচক্ষণের অবোধ্য ঠেকেছে তখন সাধারণ পাঠকের কাছেও প্রবন্ধের উপযুক্ততা সন্দেহে জিজ্ঞেসবাদ নিরর্থক। অবশ্য বিনয় বৈদগ্ধ্যের স্বাভাবিক ভূষণ। বুদ্ধদেব-বাবুর আলোচ্য মন্তব্য বুঝি বা সেই স্বভাববিনয়েরই সাক্ষ্য। কারণ তাঁর থেকে বিজ্ঞায় বুদ্ধিতে অনেক খাটো থেকেও আমি স্বীকার করতে পারব না যে প্রবন্ধটির আশ্রিত আমার অবোধ্য মনে হয়েছে। অধিকন্তু, বিষ্ণু দে'র কবিতার যে লিরিক উপাদান ও মাত্রাচ্ছন্দের নৈপুণ্য স্বধীন্দ্রনাথ দত্তের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বুদ্ধদেব বসুর মতামত তারই প্রতিধ্বনি। আসলে এই পত্রলক্ষণাজ্ঞাস্ত আলোচনাটিতে বুদ্ধদেববাবু এমন উল্লেখযোগ্য কিছু বলেন নি যা স্বধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে পাওয়া যাবে না। অবশ্য স্বধীন্দ্রনাথ এমন অনেককিছু বলেছিলেন যা স্বভাবতই বুদ্ধদেববাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। এই স্বধীন্দ্রনাথ-ই প্রথম বিষ্ণু দে'র নৈরাশ্র্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেছিলেন এবং 'বিষ্ণু দে'র আদর্শ আর আচার সর্বত্র সমতালে চলে না'—বিষ্ণু দে'র কবিতা সম্পর্কে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ-ও 'উক্ত প্রবন্ধের-ই অংশভাগ'। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর প্রশ্নের চাল ভিন্নজাতের। 'কৃতকৃতম', 'অপাপবিদ্ধমস্মারি', 'সোৎপ্রাসপাশ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের উপযুক্ততা অথবা "..... জানলুম যে আপনার মতো 'এলিয়ট-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণা তাড়নে কাব্য লেখেন না'। তবে কিসের তাঁড়নায় লেখেন?"—এই সব প্রশ্নে আর যে জিজ্ঞাসাই ফুটে উঠুক এতে কাব্যজিজ্ঞাসার পরিমাণ কতখানি আছে তা বিতর্কসাপেক্ষ। কারণ যে-কবিতা পাঠকের মনকে নাড়া দিতে পারে তার আবেদন কোনদিনই অভিধার্থের পথে আসে না। অন্তত, ক্রেসিডার লিরিকতা যে-ঋপদী যথার্থ্যে সংহত ও বেগমান বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তা নিশ্চয়ই দৃষ্টান্তস্থল। পাউণ্ড যেকালে তাঁর উত্তরসূরীদের লিরিক লেখায় নিরুৎসাহ দিয়ে লিরিক ব্যবহারে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন তখন বিষ্ণু দে'র এই সিদ্ধি আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎমুক্তি কোথায়

বাঙালীর বহুমুখী জাতীয় জীবনের পবিত্র দলিল

বিনয় ঘোষ-কৃত

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১ম খণ্ড ॥ ১২'৫০ ॥

বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য আকরগ্রন্থ

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৮৪০ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিবয়ানুক্রমিক সন্নিবেশ, বিস্তারিত ভূমিকা, সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত।

উনিশ শতকের অষ্টাশ্র বাংলার পত্রিকা থেকে অনুরূপ সংকলন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বর্তমান গ্রন্থ প্রথম খণ্ড। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অনুরাগী যারা এ-বই তাঁদের কাছে চিরন্তন সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আন্তর্জাতিক অধ্যাপক শ্রীমদেবপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার রয়াল অক্টাভো সাইজের বই, আর্ট পেট ও বোর্ড বাঁধাইসহ, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যের জঙ্ঘ মূল্য মাত্র ১২ টা. ৫০ ন. প.।

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিজ্ঞানাগর ও বাংলার সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

[নতুন করে ছাপা হচ্ছে ১ম খণ্ড]

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

Languages & Literatures of Modern India

Rupees Eighteen Only

AFRICANISM : Rs. 16/-

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

ষোগেশচন্দ্র বাগলের

ব্যান ও বন্যা ৩'০০ ॥

ষিজোহ ও বৈরিভা ২'০০ ॥

— অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বহুর

ভারতের চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১টি আর্ট পেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মুঃ) ৪'০০ ॥

তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ও

প্রথমনাথ বিশী সম্পাদিত

প্রমথনাথ বিশীর

কাব্যবিভান ১০'০০ ॥

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ৪র্থ মুঃ ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

নিহিত আছে। অধিকন্তু, বিষ্ণু দে'র কাব্যের যে-গুণ রসবিবেকীকে আকর্ষণ করে তার সঙ্গে এলিয়ট কথিত-'Objective Co-relative'-এর যোগ কতখানি তাও বিবেচনাধীন। এবং যদিও স্বধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে'র মধ্যে আলোচ্য গুণের লক্ষণ দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তবু বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সেগুণের একমাত্র অধিকারী স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত। বস্তুত, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে 'সংবর্ত' ও 'যযাতি' কবিতাদ্বয়ের সাফল্য অসাধারণ। অসংখ্য ঘটনা বা প্রসঙ্গের উত্থানপতন—বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ তথা পর্বপর্বাদ্বয়ের হাস্যবৃদ্ধি-প্রভব ধ্বনিবৈচিত্র্যের মধ্যে স্বধীন্দ্রনাথ এখানে কদাচ আত্মপ্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি গীতলতার যে আকস্মিক উপস্থিতি ধ্রুপদী যথার্থ্যের অন্তরালবর্তী হয়েছে এ কবিতাদ্বয়ের নাটকীয় গুণকে তা বহু পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে বিষ্ণু দে'র মর্জি যেহেতু লিরিক-প্রধান তাই তাঁর কাছে ক্ল্যাসিসিজমের যথার্থ্য প্রয়োজনীয় ঠেকেছিল লিরিকের শিথিলতা, আবেগ ও অতিকথনকে পরিমিতিদানের জন্তে। বিভিন্ন পুরাণোল্লেখ ও চরিত্রাবতারণায় নৈরাশ্র্য আরোহণ আনার অভিপ্রায় তাতে নিহিত ছিল। অতথায় তাঁর ক্রেসিডা বা ওফেলিয়া রবীন্দ্রনাথ ত দু'রের কথা, 'বনলতা সেনে'র কবিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারত না।

- "জানি জানি এই অলাতচক্রে চক্রমণ
- সোৎপ্রাসপাশে বলিনাকো তাই কথা
- ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা—
- জীজিবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।

সোনালী হাসির ঝরণা তোমার ওষ্ঠাধরে।

প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপলমায়া।

মুখর সে গান ভেঙ্গে গেলো। আজ স্তব্ধ তমাল।

হাঁকা হাসির জীবনে কি এলো ফসলের কাল?"

প্রথম স্তবকের পুরাণালুপ্ত বা ঔপনিষদিক উল্লেখ রূপকল্পে যে-সংহতি ও কাণ্ডাত্মক এনেছে তারি ফলে দ্বিতীয় স্তবকের লিরিকতা আমাদের আকর্ষণ করে। সংহত রূপকল্পের পরেই লিরিকতার এই ঈষৎ মুক্তির অপরিমিত আনন্দ নিশ্চয়ই বিস্তৃত হত যদি কবিতাটির আত্মন্তে দ্বিতীয় স্তবকের স্বর বরাবর রক্ষা করা যেত। অবশ্য এসব ব্যাপারে লাফার্গ ও এলিয়টের কাব্যাদর্শ তাঁর কাছে যেমন ঐকান্তিক ছিল না, 'ক্ষণিকা'-র কবির অবদানও তেমন

কম নয়। অধিকন্তু, এই পুরাণায়ুষ্কের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করার তাগিদও তাতে নিহিত ছিল। কিন্তু জীবনের বহু কার্যকারণেই হেতুর অপেক্ষা হেতুভাসের সন্ধান-ই বেনী মেলে। তাই মাইকেলকে বাংলার মিল্টন, নবীনচন্দ্রকে বায়রণ ও রবীন্দ্রনাথকে শেলী আখ্যা দিয়ে আমরা এক সময়ে গর্ব অনুভব করতাম এবং স্বধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে'র ওপর বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য ক'রে আজ আমরা বিকারবোধ করছি।* অথচ পাউণ্ড ও এলিয়টের স্বকীয়তা সম্পর্কে যারা আশ্বালন করেন তাঁরা কি জানেন কাব্যের ঐতিহ্যের অধেষণে পাউণ্ড যেমন চীনা কবিতার অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন তেমনি ডাণ্টে ও লার্ফর্গ কাব্যরচনার ব্যাপারে এলিয়টের কাছে অত্যাবশ্যক ঠেকেছিল? বস্তুত, প্রকৃত স্বকীয়তা যে এক প্রকারের ক্রমবিকাশ—এলিয়ট যদি একথা আমাদের ব'লে না দিতেন তবে হয়ত আমাদের অনুরত বুদ্ধি আরো কিছুদিন বৃথা অধীক্ষায় মাথা কুটে মরত। বিষ্ণু দে'র কবিতা সম্পর্কে আমাদের বিবেকী পাঠকদের একমাত্র অভিযোগ তাঁর এই বিদেশী কাব্যপ্রীতি। অবশ্য এলিয়ট ও বিষ্ণু দে পাশাপাশি পড়তে অনুরোধ করলে, আমি জানি, বহু পাঠকেরই অহংবোধ আহত হবে। কিন্তু আমি নিজে এলিয়টের স্বর-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিষ্ণু দে'র কোনো মিল খুঁজে পাই নি। এই পর্যবেক্ষণ প্রমাণের জন্তে দুজনের দুটি বিখ্যাত কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

“After such knowledge, what forgiveness? Think now
History has many cunning passages, contrived corridors
And issues, deceives with whispering ambitions,
Guides us by vanities.” [‘Gerontion’]

“সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম-শিখ-সিপাহী-বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস তার উত্তেজনা—ক'ন্ পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সময়

* শ্রীযুক্ত হরকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থকে প্রধানত লক্ষ্য ক'রেই আমার আলোচ্য মন্তব্য। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, এই ধরণের কঠোক্তিপ্রধান ও স্বভাবিরোধী মতামত বে-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখছেন—“নিরপেক্ষ থাকিতে সর্বদা সতর্ক হইয়াছি।” কিন্তু হরকুমারবাবু কি জানেন স্বধীন্দ্রনাথ দত্তের সেই বিখ্যাত পংক্তি—“অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?”

অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
ঘনালো পশ্চিমে, সেই এমডেন জাহাজের মোহ।

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর.....

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পাঁচিশ বছর।” [‘আইসায়ার খেদ’]
এই দুই কবির ভাষার ব্যবধান বাদ দিলেও যে-একোয় তারতম্যের ফল
‘প্রভাব’ ও ‘অনুসরণ’ শব্দদ্বয়ের উৎপত্তির কারণ তাদের কোন্টি এক্ষেত্রে
প্রযোজ্য! ‘আতঙ্ক উল্লাস তার উদ্বেজনা—কন্ পিতামহ’—এই পংক্তিতে
‘কন্’ শব্দের মধ্যে যে অনাস্বাদিতপূর্ব ঋতির সন্ধান পাওয়া যায় তা যে
কথ্যচ্ছন্দের ধ্বনিগুণে মর্যাদাবান তার কাব্যঐতিহ্য অবশ্যই “After such
knowledge, what forgiveness?”—এলিয়টের এই জিজ্ঞাসা। এবং
আলোচ্য কবিতায় ‘বুগরসমর’-এর ঐতিহাসিক উল্লেখ বা ‘এমডেন জাহাজের’
সাময়িক প্রসঙ্গ—ইত্যাদির দ্বারা অনুভূতিকে নৈরাশ্রমর্যাদাদানের আশ্রয়ে
এলিয়ট-ই বিষ্ণু দেবের পথদ্রষ্টা। কিন্তু একথা ভুললেও অপরাধ হবে যে ‘রুচি ও
প্রগতি’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধটিকে ‘সাহিত্যের ভবিষ্যৎ’-এ পুনর্মূদ্রণ ক’রে
এই বিষ্ণু দেব অবহেলিত ও বিস্মৃতপ্রায় ঈশ্বর গুপ্তকে পাঠকের স্মরণে আনার
চেষ্টা করেছিলেন। সরাসরি আবেগের মুগ্ধপাত না ক’রে প্রাতিষ্মিক অনুভূতি
সঞ্চারের জন্তে ঘটনা-চরিত্র-বিষয়ের নানাস্থের যিনি মধ্যস্থতা মেনেছিলেন
তাঁর কৃতিত্ব নিশ্চয়ই তঁরকীতীত ঠেকে। ভেবে দেখুন, প্রাক্‌মাইকেলী যুগে
এবং ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরে যে-শব্দরূপের প্রয়োগ ঈশ্বর গুপ্ত দর্শিয়েছিলেন
তা কতখানি বিস্ময়কর।

“লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,

তারাই এখন চড়বে ঘোড়া

ঠাটঠমকে চীলাক চতুর

সভ্য হবে খোড়া খোড়া!”

এতে ক্রিয়াপদ, সর্বনাম বা অনুকারবাচক শব্দের প্রয়োগ এমনভাবে ঘটানো
হয়েছে যাতে আমাদের কথোপকথনের ভঙ্গী সম্পূর্ণ বজায় থাকে। অথচ
‘পলাতকা’-য় রবীন্দ্রনাথ একই ছন্দ আমদানি ক’রেও সে-অভিপ্রায় রক্ষা
করতে পারেন নি।* অধিকন্তু ছন্দ ও যতির বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মধুসূদন

* যে-সব পাঠক স্বধীন্দ্রনাথ-কবিতা ‘গল্প-পত্নের নির্বিরোধ’ তথা কথ্যচ্ছন্দ সম্পর্কে আরো
বেশী জানতে আগ্রহাধিত ‘সাহিত্যের ধ্বংস’-এর গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদেবভোষ
বহু’র গল্প-পত্নের ঐতিহ্য ও স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধটি পড়ে নিতে তাঁদের অনুরোধ করি।

যে-অমিত্রাক্ষরের জন্ম দেন তাতে যদিও আমাদের কথোপকথনের চংকে আয়ত্তে আনার মহৎ উদ্দেশ্যই নিহিত ছিল কিন্তু সে উদ্দেশ্যের কতটুকুই বা সার্থক হ'তে পেরেছে? পক্ষান্তরে এও সত্যি, যে-প্রবহমানতা অমিত্রাক্ষর ছন্দের মৌল অভিপ্রায় মধুসূদন তাকে কাজে লাগাতে না পারলেও এই অমিত্রাক্ষরের পরীক্ষা চোখের সামনে না থাকলে রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দ বা বিষ্ণু দে'র 'আইসায়ার খেদ' অথবা সূধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত', 'যযাতি' ইত্যাদি কাব্যরূপ ও কবিতা রচিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। অর্থাৎ আমাদের কথোপকথনের ভঙ্গীকে আয়ত্তে আনার মহৎ উদ্দেশ্যে মধুসূদন যদিও এই ছন্দের জন্ম দেন তবু এই উদ্দেশ্যসাধনে সফলকাম হয়েছেন তাঁর উত্তরসূরীরা। জানি না বলা ঠিক হবে কিনা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে যাদুঘরের সামগ্রী আখ্যা দিয়ে এই কারণেই বুদ্ধদেব বসু কাব্যবিবেচনার খুব পরিচয় দিয়ে যেতে পারেন নি। যাই হোক বাংলা কবিতার এই সাফল্য-বৈফল্যের ইতিহাস স্বরণে রেখেছিলেন ব'লেই '১৯৩৭', 'বেকারবিহঙ্গ' জাতীয় কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তকে যেমন বিষ্ণু দে পটভূমিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তেমনি 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা বা গার্হস্থ্যাশ্রম কবিতাবলী রচনার ব্যাপারে 'পলাতক'-র কবি নয়, 'ক্ষণিকা'র কবি-ই তাঁকে সবিশেষ সাহায্য করেন। পক্ষান্তরে ভাবনার ঐশ্বর্যবুদ্ধির জন্ম, The Waste Land কবিতায় এলিয়ট শুধু পবিত্র গ্রেইলের পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছিলেন তা নয় আমাদের উপনিষদ-ও তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছিল। যুরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতা পর্যন্ত বিষ্ণু দে'র কবিতা আমাদের ভাবনার এলাকাকে ষাঁদি বাড়িয়ে দিতে পারে, তবে তাতে আমাদের বিরক্তির কি আছে, তিনি ত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া উচিত। উপরন্তু, বাংলার ব্রতকথা, উপকথা, মঙ্গলকাব্যের কাহিনী, লোকসঙ্গীতকে বিষ্ণু দে যখন তাঁর কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তখন এটাই প্রমাণ হয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তিনি অনন্ত উদাহরণ যার শিল্পীস্বভাব সম্পূর্ণ ব্রাত্যধর্মী। এলিয়টের মনোযোগী পাঠক বিষ্ণু দে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ভবিষ্যৎ বাংলা কবিতার শুভমুক্তির পথনির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন। বস্তুত, কোন্ প্রাক্কবির পুনরুদ্ধার আবশ্যিক, রবীন্দ্রনাথ নামক বিশাল ঐশ্বর্য়ের ব্যবহার কিভাবে সম্ভব তার গূঢ়-ইঙ্গিত ছড়িয়ে আছে বিষ্ণু দে'র কবিতায়। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু দে'কে 'এলিয়ট-ভক্ত' ব'লে সূধীন্দ্রনাথ তাই অনেক কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। এবং রাসিন্ ও শেক্সপীয়র—এই দুই ধ্রুপদী কবির শিল্পলক্ষণের প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে শেক্সপীয়রের রচনায় হিউম যে গতিময়

নৈরাশ্র্যতার (Dynamic Classicism) সন্ধান পেয়েছিলেন তার উত্তর-
 সাধক যেমন এলিয়ট তেমনি বিষ্ণু দে।* অবশ্য এই ঐক্য এই তিন কবির
 শিল্পলক্ষণের প্রভেদ ঘোঁচায় না। অর্থাৎ এলিয়ট পড়ে যেমন মনে হবে না
 যে তিনি শেক্সপীয়রের পুনরাবৃত্তি তেমনি বিষ্ণু দে-ও এলিয়টের অলুলিপি
 মনে। কারণ ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশের সঙ্গে ঐতিহ্যের আত্মস্থতার কোনোদিন-ই
 কলহ থাকে না।

বস্তুত, মালার্জের কাব্যাদর্শের অন্বেষণে নেমে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন
 কথ্যচ্ছন্দের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছিলেন বিষ্ণু দে-র এলিয়ট-ভক্তির মধ্যেও
 উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। এবং এরই ফলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা বা
 রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’ বিষ্ণু দে’র কাছে আকর্ষণীয় ঠেকেছিল। আসলে,
 ‘বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্’ অথবা ‘আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
 গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে’—ইত্যাদি পংক্তিতে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দ ঈশ্বর
 গুপ্তের পাণ্ডিত্য জাহিরের নজির নয়—এরা আমাদের তাবাহুসঙ্গের প্রাপ্তি।
 অল্পরূপ চৈতন্যের প্রাপ্তি বিষ্ণু দে’র ‘সিল্কমশ্বপ সাদা আর ছোটো পাণ্ডুল্যাট’
 কিংবা ‘এপ্রিল তো চলে গেলো হাশুলঘু নেয়াড আমার’ অথবা ‘প্রসার্পিনা
 কুসুমে ছায়, বৈতরণী পাশে।’ অল্পভূতির আত্মস্থতা এই সব বৈদেশিক শব্দে
 স্বতোপ্রমাণ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু দে’র কৃতিত্বের সন্ধানে রোম্যান্টিসিজম
 ও ক্লাসিসিজমের অন্ততম প্রবক্তা মারিও প্রাজের প্রবচনই আমাকে বিশেষভাবে
 সাহায্য করে। ক্লাসিসিজমের প্রধান লক্ষণ ও দায়িত্ব বলতে, তিনি বুঝতেন,
 অতীতের ভাবনা ও ভঙ্গীর পুনরুদ্ধার। ফলত ঈশ্বর গুপ্তের শ্লেষ ও ব্যঙ্গ
 মিশ্রিত সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ যেমন বিষ্ণু দে’কে আকর্ষণ করেছে,
 হাঙ্কাচালে তেমনি গভীর অল্পভূতিকে ব্যক্ত করার শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি
 রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’ থেকে।

পারিপার্শ্বিকের বিরোধিতায় যদি জীবনের অর্থ ও পথ আবিষ্কৃত হ’তে
 থাকে তবে দীর্ঘ কবিতার রচনায় রবীন্দ্রনাথের বৈফল্য চোখের সামনে থাকা

* অবশ্য গত ফাস্তন সংখ্যার ‘সাহিত্যের খবর’-এ প্রকাশিত ‘জীবনানন্দ দাশের কবিতা’-র
 আলোচনায় জীবনানন্দের কবিতার ওপর এলিয়টের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোনো
 কোনো পাঠকের মনে আমি ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছি। ‘প্রভাব’কে অস্বাভাবিক ব্যাপার বলা
 আমার অভিপ্রায় ছিল না, বস্তুত ঐ আলোচনায় আমি ঐ ধরণের কথা কোথাও বলিনি।
 আমি বলতে চেয়েছিলাম যে ‘কবিতার কথা’ প্রবন্ধগ্রন্থে জীবনানন্দ নিজে এই জাতীয় বিদেশী
 প্রভাবকে খুব স্নেহেরে দেখেন নি। স্পষ্টত না হ’লেও এতদ্ব্যপারে জীবনানন্দ যে বিষ্ণু দে’র প্রতি
 ইঙ্গিত করেছিলেন, মনোযোগী পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

সঙ্গে-ও উপরন্তু ইংরেজী কবিতার নব্যরাসিকদের কাছে দীক্ষিত হ'য়েও বিষ্ণু দে কেন যে সেই দীর্ঘ কবিতার ব্যাপারেই স্নানাম বজায় রাখতে পারেন নি এবং এই বিরোধী লক্ষণের মধ্যে তাঁর কাব্যজীবনের কোন্ অর্থ যে পরিস্ফুট তার অনুসন্ধানে নামতে গিয়ে আমার, অন্তত, ম্যাথীসন সাহেবের কথা মনে আসে। বস্তুত, এলিয়টের দীর্ঘ কবিতাগুলোর সাফল্য সম্পর্কে ম্যাথীসন আমাদের যা জানিয়েছেন বিষ্ণু দে'র আলোচ্য বৈফল্যের হেতুসন্ধান তা অনাবশ্যক নয়। দীর্ঘ কবিতা ও বর্ণনাত্মক কবিতার প্রভেদ সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে অতিকথন, আবেগ সর্বোপরি দীর্ঘীকরণের প্রতি পূর্ব পরিকল্পনাগত আগ্রহ যেহেতু উনিশশতকী ইংরেজী কবিতার শোকাবহ দুর্লক্ষণ তাই দীর্ঘ কবিতা রচনায় যে-শিল্পাত্ম্য এলিয়টের কাছে আবশ্যিক ঠেকে তাতে ছিল রূপকল্পগত সংহতি, অর্থাৎ আবেগের বদলে অনুভূতির প্রতিটি স্তর সম্পর্কে সচেতনতা। এলিয়টের দীর্ঘ কবিতায় তাই দৈর্ঘ্য একমাত্র লক্ষণ নয়। বস্তুত, অনুভূতির বিচিত্র স্পন্দন ও তৎসংলগ্ন বিষয়গত নানাধ্বের আন্তরিক প্রয়োজনে 'The love song of J. Alfred Prufrock', 'The Waste Land', 'Ash Wednesday' ইত্যাদি কবিতায় কবিকে অত দীর্ঘ রূপকল্পের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ফলত যে 'Objective Co-relative'-এর অভাবে হামলেট নটক এলিয়টের প্রশংসা পায় নি, আলোচ্য কবিতাত্রয় সেই গুণেরই আশ্চর্য সন্নিপাত। এবং নাটকীয়তার অনিবার্হ উপস্থিতি এইসব কবিতার দৈর্ঘ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব আকর্ষণ এনেছে। অবশ্য আমার বিশ্বাস, যথার্থ 'Objective Corelative' 'Unified sensibility' বা অনুভূতিগুঞ্জের অখণ্ডতার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ঘটনা বা চরিত্রের নানাধ্ব তথা প্রকরণগত বৈচিত্র্য অথও অনুভূতির পারবশ্তে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে পড়ে। ফলত উক্ত সাধ্যের অভাবশতই 'ড্রামটিক মনোলগে'র আবিষ্কারক ব্রাউনিং শেষ পর্যন্ত সফলকাম হন নি বটে কিন্তু হিউম শেক্সপীয়রের মধ্যে সেই গতিময় নৈরাশ্র্যতার লক্ষণই দেখতে পেয়েছিলেন। ইংরেজী কবিতায় সে গুণের একমাত্র সফল উত্তরাধিকারী এলিয়ট। অবশ্য এ প্রসঙ্গে পুরাকালের ডান ও ড্রাইডেন এবং একালের অডেনের নাম আমাদের স্মরণে থাকা উচিত। এ আলোচনার গোড়ায় আমি বলেছি যে বিষ্ণু দে'র নৈরাশ্র্যসিদ্ধি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ প্রশংসা করলেও সে মূল্যায়ন খানিকটা বিবেচনাসাপেক্ষ। অন্তত, আমার মনে হয় যে- পাঠকের চোখ-কান-মন খোলা আছে 'জন্মাষ্টমী', 'পদধ্বনি', 'চৈতে-বৈশাখ',

‘অস্থি’ ইত্যাদি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই রসাতাসের উদাহরণ। এলিয়টের মনোযোগী পাঠক বিষ্ণু দে এসব রচনায় যে প্রসঙ্গ ও অল্পভূতির নানাত্বের সমবায় লক্ষ্য রাখেন নি তা নয় কিন্তু যে-লিরিকতার ব্যবহারে ‘ওফেলিয়া’, ‘ক্রেসিডা’, ‘মহাশ্বেতা’র বিষ্ণু দে সফলকাম তারই অসংবদ্ধ তথা শোকাবহ উপস্থিতি অহৈতুক দৈর্ঘ্যের দিকে বিষ্ণু দে’কে টেনে নিয়ে গিয়েছে। ছন্দের উত্থানপতনে আবেগ বিগ্ন এনেছে। ম্যাথীসনসাহেবের আলুকৃত্য আমরা জানতে পারি যে ‘The Waste Land’-এর বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রথম পাণ্ডুলিপির দুই-তৃতীয়াংশ। ফলে এতে যে-নাটকীয় সংঘট্টের সম্মুখীন হই তাতে সংবদ্ধ লিরিকতার ঈষৎ উপস্থিতি আমাদের রসোবোধে বাদ সাধে না। কিন্তু বিষ্ণু দে’র মানসিকতা যেহেতু পাউণ্ড-পন্থী তাই বিষ্ণু দে’র আলোচ্য বিফলতার হেতু পাউণ্ডের ‘Cantos’ কাব্যমালা’র রসাতাস স্মরণে আনে। এবং এই জাতীয় বৈফল্য যেহেতু সমগ্র কবিতার বিচারের অপেক্ষা রাখে তাই এখানে বিষ্ণু দে’র আলোচ্য কবিতাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন পংক্তির উদ্ধারে বিরত থাকা গেল। কারণ বিচ্ছিন্নভাবে ওখানে কাব্যগুণসম্পন্ন পংক্তির অভাব নেই। কিন্তু যে-বিষয়াত্মক অল্পভূতির সামগ্রিকতার পারবশ্বে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হ’য়ে যায়—বিষ্ণু দে’র এই সব কবিতায় সেই সামগ্রিকতার অভাব স্বীকার না ক’রে উপায় নেই। ফলত অন্ত্যাহুপ্রাণ ও পর্বের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভব কথ্যছন্দের ধ্বনিগুণ আবেগের কাছে এমনভাবে বিপর্যস্ত যা অন্তত ‘গার্হস্থ্যাত্মক’, ‘আইসায়ার খেদ’-এর মত কবিতার রচয়িতা বিষ্ণু দে’র পক্ষে কিছুটা অস্বাভাবিক বৈকি। পক্ষান্তরে ‘ওফেলিয়া’ ও ‘ক্রেসিডার’ মত কবিতার দৈর্ঘ্য কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে থাকলেও কেন এত সাফল্যময় তার হেতুসন্ধানে স্বধীন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যই পুনর্বীর স্মরণীয়। মাত্রাবৃত্তে বিষ্ণু দে’র স্বচ্ছন্দ্য অপূরনীয়। ফলত মাত্রাবৃত্তের মধ্যে মধ্যে অক্ষরবৃত্তের বিষমাত্মপাতিক স্তবক সমাবেশে গীতলতা ব্যবহারের তিনি যে স্বযোগ পেয়েছিলেন তা তাঁর ‘ওফেলিয়া’ কবিতার সাফল্যের অগ্রতম কারণ। উপরন্তু, বিভিন্ন পুরাণোল্লেখ অথবা চরিত্রাবতারণায় তিনি লিরিকতায় সংঘের শাসন আনতে পেয়েছিলেন। আসলে লিরিকতাকে ক্ল্যাসিসিজমের কাঠিগ্বে সংহত ক’রে বিষ্ণু দে যে আবেদন সৃষ্টি করেছেন স্বধীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার অন্তর্গত অভিপ্রায় ছিল তা থেকে একেবারেই ভিন্ন। স্বধীন্দ্রনাথে ক্ল্যাসিসিজমের দৃঢ়বন্ধনের মধ্যেই লিরিকতার আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী স্পন্দন আত্মস্থতা লাভ করতে পেয়েছিল।

এবং এ যাবৎকাল বাংলা কবিতার আলোচনায় বিবেচকেরা স্বধীন্দ্রনাথ ও

॥ বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥

তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরোগ্য নিকেতন ॥ রচনা-সংগ্রহ ॥ চৈতালি ঘূর্ণি

৭ম মুঃ ৭.৫০ ॥

১ম খণ্ড : ১০.০০ ॥

১০ম মুঃ ২.৫০ ॥

মনোজ বসুর

মানুষ গড়ার কারিগর ॥

নবীন যাত্রা

৩য় মুঃ ৫.৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৪.০০ ॥

বনফুলের

সে ও আমি ॥

দ্বৈরথ ॥

স্বপ্নসম্ভব

৪র্থ মুঃ ৩.০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৩.০০ ॥

৩য় মুঃ ৩.০০ ॥

• সতীনাথ ভাদুড়ীর

অপরিচিতা ॥ পত্রলেখার বাবা ॥ গণনাযক

২য় মুঃ ৩.০০ ॥

চার টাকা ॥

২য় মুঃ ২.৫০ ॥

সমরেশ বসুর

শ্রীমতী কাফে ॥

সওদাগর ॥

গঙ্গা

৩য় মুঃ ৬.০০ ॥

২য় মুঃ ৬.০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৫.৫০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গম্পা ॥

কদম

দুয়ার হতে অদূরে

৪র্থ মুঃ ৫.০০ ॥

২.৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩.৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

চতুরঙ্গ

॥ অবিশ্বাস্য ॥

ময়ূরকণ্ঠী

৩য় মুঃ ৪.৫০ ॥

৯ম মুঃ ৩.০০ ॥

১৪শ মুঃ ৪.০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গম্পা ॥

সূর্যসারথি ॥

একতলা

৪র্থ মুঃ ৫.০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩.৫০ ॥

৩য় মুঃ ২.৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

বিষ্ণু দে'কে প্রতিবেশী কবি হিসেবে মনে ক'রে এসেছেন বটে, তবু যে-পাঠক জনশ্রুতির ওপর বিশেষ আস্থাবান নন তিনি জানেন এই দুই কবির সাধনা ও সিদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ 'সংবর্ত' ও 'যযাতি' যদিও নৈরাশ্র্যসিদ্ধির অমূল্য উদাহরণ রেখে গিয়েছে তবু প্রায় সর্বত্রই স্বধীন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধান্ত-প্রিয় কবি পক্ষান্তরে লিরিকতার ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েও বিষ্ণু দে আজীবন সিদ্ধান্ত-বিমুখ। অবশ্য এই মন্তব্য নিশ্চয়ই বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা রাখে। আসলে লিরিকতায় কৃতিত্ব ও সিদ্ধান্ত-বিমুখতা কার্যকারণের সম্পর্কে অস্থিত। কিন্তু রোম্যান্টিকসদের প্রবক্তা ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে শুরু ক'রে আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক রোম্যান্টিক কবি লিরিকতার মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রেও অল্পবিস্তর সিদ্ধান্ত-প্রিয়। উপরন্তু, ক্লাসিক্যাল কবি হিসেবে স্বধীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত-প্রিয়তা যেহেতু সমর্থনযোগ্য বিষ্ণু দে'র লিরিকে সিদ্ধান্ত-বিমুখতা তাই স্বাভাবিক। কারণ লিরিক কবি যখন সিদ্ধান্ত ব্যাপারে ভাবিত হন তখন তাঁর পক্ষে পূর্বপরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গতান্তর থাকে না। পক্ষান্তরে 'চোরাবালি'র 'মুহাখেতা' থেকে আরম্ভ ক'রে 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখের 'বোহেনিয়া' কবিতা বিষ্ণু দে'র এই অতীতপূর্ব সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে।

বলাবাহুল্য বিষ্ণু দে'র এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে ধ্রুপদী সাধার্তের শিক্ষা। ফলত, চিত্রকল্প ব্যবহারেও বিষ্ণু দে'র যে-নৈপুণ্য তা উক্ত প্রবণতারই অংশভাক্ত। কারণ যে বাধাবন্ধহীন আবেগের চর্চা রোম্যান্টিকসদের আত্মকৃত ছিল সে কাব্যশরীরে চিত্রকল্পের সাধার্ত্য অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসংগ্রহে চিত্রকল্পের উপস্থিতি তাই এত আপাতিক। পক্ষান্তরে শেলী-কীটসের বহুপূর্বে জন্মগ্রহণ ক'রেও শেক্সপীরকে চিত্রকল্পের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কারণ চিত্রকল্প সাধার্ত্যের দান; ধ্রুপদী রূপকল্পে তার প্রয়োজনীয়তা তাই ঐকান্তিক। উপরন্তু লিরিকতার মর্জি নিয়ে এলেও লিরিকতার অন্তর্বাহী অতিকথন, আবেগোচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে বিষ্ণু দে যে কেন বরদাস্ত করতে পারেন নি তা শুধু প্রমাণ করে তিনি সর্বান্তঃকরণে ধ্রুপদী সাধার্ত্যের অল্পরাগী ছিলেন। ছিলেন বলেই কথোপকথনের ভঙ্গী-ই বলুন, গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ-ই বলুন তাঁর কাছে এত অভিপ্রেরিত প্রকরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এবং তিনিও যে শেক্সপীরীয় গতিময় নৈরাশ্র্যতার উত্তরসাধক তার চিত্রকল্পাদি সেই পরিচয়ই বহন করে।

“নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।

সুনচুড়া দিলো ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।

স্বপ্নসারথী! তোরণ কি যায় দেখা?

অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে ।

ক্রান্তিবলয় মিলায় হুমেরুলোকে ।

আজ কি আমাকে ভুলেছো মহাশ্বেতা ?”

বাণভট্টের ‘কাদম্বরী’র প্রধান পাশ্চটরিত্র মহাশ্বেতার রূপবর্ণনায় যে সৌম্যভাব বিদ্যমান ছিল সেই মহাশ্বেতার অল্পবয়স্কের সঙ্গে কবির প্রাতিম্বিক স্মৃতির সমাহুপাত ঘটেছে। শৃঙ্গারবোধের অন্তর্নিহিত এষণা এবং তৎজনিত বঞ্চনাবোধের প্রাপ্তি—‘ক্রান্তিবলয় মিলায় হুমেরুলোকে’। এখানে যে সব ভৌগোলিক পরিভাষা ব্যবহৃত তাতে সংহতি পেয়েছে অবেষণ ও বঞ্চনার মিশ্রাভুত্ব। অনেক শৃঙ্গারাবুভূতির কবিতাতেই এই অবেষণ ও বঞ্চনার যুগ্ম সমাবেশ দেখা যায় বটে, কিন্তু ভেবে দেখুন তিনটি বিষয় প্রসঙ্গের শব্দ দিয়ে শৃঙ্গারাবুভূতির চিত্রকল্প সৃষ্টিতে প্রাক্তিরিশ বাংলা কবিতায় কয়জন সার্থক হ’তে পেরেছিলেন ? অথবা ‘ক্রেসিডা’ কবিতার নিম্নোলিখিত অংশ—

“দিনগুলি তুমি তুলে নিলে অঞ্চলে

বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।

রাত্রিও চাও ? শ্রাবণের স্বারাজলে

মুখর হৃদয় তালীবনদীঘি কল্লোলে অবিরাম ।

এখানেও বিলম্বিতলয়ে শৃঙ্গারাবুভূতির অন্তর্নিহিত বিচিত্র স্পন্দন সংহত হয়েছে দু’একটি শব্দের মধ্যে । অনেক ভাবনার সঙ্গলাভ করেছে ‘অঞ্চল’ ও ‘সান্নিধ্যের ধারা’ শব্দ বা শব্দবন্ধ । এ অঞ্চল কার অথবা কিসের, নাকি এ প্রণয়েরই বার্থ অভিজ্ঞান ! উপরন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে মরুভূ ও বৃষ্টির নৈসর্গিক সম্পর্কে সংহত হয়েছে প্রণয়াল্পসঙ্গের স্মৃতি । এখানে ‘সান্নিধ্য’ শব্দ যে রূপদী যথার্থ্যের সাক্ষ্য বহন করে তার বিশ্লেষণে নামলে দেখা যাবে যে পূর্ববর্তী ‘ঝরে’ ও পরবর্তী ‘ধারা’ শব্দের প্রয়োগগত গুরুত্ব-ও কম নয় । বস্তুত, ঐ দুই শব্দের মধ্যবর্তী হওয়াতেই ‘সান্নিধ্য’ প্রেমের অল্পবয়স্কের বাহক । আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ-শেলী-কীটসের চিত্রকল্পের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না । পক্ষান্তরে ব্রাউনিং-এর সমসাময়িক মার্কিন মহিলাকবি এমিলি ডিকিন্সন—তখন চিত্রকল্প ব্যবহারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তখন না মেনে উপায় থাকে না জীবনানন্দের কবিতায় যেসব চিত্রকল্পের সন্ধান মেলে তাও আপাতিক ঘটনা । অবশ্য এও ঠিক রোমান্টিসিজম ও ক্লাসিসিজমের মধ্যবর্তী যুগসন্ধির কবি হিসেবে জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্পের অল্পপস্থিতি যতখানি স্বাভাবিক তার উপস্থিতি-ও ততদূর-ই স্বভাবসম্মত । অধিকন্তু, যেকালে ‘জন্মাষ্টমী’ বা ‘পদধ্বনি’-র মত কবিতায় বিষ্ণু দে’কে চিত্রকল্প ব্যবহারে কদাচ আগ্রহ প্রকাশ

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

রবীন্দ্র-সন্ধান

জর্মন কবি হাইনরিখ হাইনের মৃত্যু-শতাব্দী উদ্‌যাপিত হয়েছে বছর সাতেক আগে জর্মনীতে। আজও তাঁর চিঠিপত্র মুদ্রিত, প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হচ্ছে।

ইংলাণ্ডে ‘শেক্সপীয়র-সার্ভে’, ‘কীটস-শেলী মেমোরিয়েল বুলেটিন’ নিয়মিত বেরুচ্ছে : নব নব তথ্য ও জিজ্ঞাসার উপস্থাপন ও সংশয়-অপনোদনের প্রয়াস চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই ধরনের কাজ আমাদের দেশে অতি-সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে : কাজের অভাব নেই, কর্মীর অভাব, উপযুক্ত মানসিকতার অভাব।

কলকাতা থেকে এই ধরনের দুটি পত্রিকা সম্প্রতি বেরুচ্ছে : শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় রবীন্দ্র-সন্ধানী পত্রিকা বেরিয়েছে।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এতদিন বাদে স্থির করেছেন একটি ‘টেগোর-সার্ভে’ বের করবেন। নাম হবে ‘রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা’। এর জন্ম রবীন্দ্রসদনের একটি উপসমিতি, একটি উপদেষ্টা-সমিতি এবং একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে শান্তিনিকেতনে।

এই ‘রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা’য় কী থাকবে? জানা গিয়েছে এতে থাকবে (১) রবীন্দ্রনাথের সমুদয় অপ্রকাশিত ও অমুদ্রিত রচনা, (২) বিভিন্ন সাময়িকীতে ও নানা পুস্তকের ভূমিকারূপে প্রকাশিত তাঁর রচনাসমূহ, যেগুলি এখনো কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি, (৩) রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর পাণ্ডুলিপির ধারাবাহিক বিবরণ, (৪) বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সংবাদপত্রের সংবাদ সংকলন, (৫) রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজি রচনা, সেগুলির অনুবাদ, তাঁর সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধাদির তথ্যতালিকা, (৬) রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের মূল্যবান প্রবন্ধাদি, (৭) প্রতি বছর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় যে সব সূচিস্থিত রচনা প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলির মূল্যনিরূপণ ও সমালোচনামূলক বিবরণ, (৮) এক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির

সমালোচনা, (২) রবীন্দ্রবিষয়ে দুস্তাপ্য রচনার পুনঃপ্রকাশ, (১০) রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র ও তাঁর আঁকাছবি, (১১) রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি, এবং (১২) এছাড়াও অল্প কিছু প্রকাশযোগ্য সংবাদ।

এই বিষয়-তালিকাটি পেয়েছি ২০।৫।৬৩ তারিখের আনন্দবাজারে প্রকাশিত ‘শান্তিনিকেতন থেকে’ চিঠিতে। এবিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তির রবীন্দ্রসদনের প্রধান শ্রীমোহনলাল বাজপেয়ীকে (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন) চিঠি লিখতে পারেন।

এবিষয়ে আরো চিন্তার কথা আছে। ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী এ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তা প্রাধিকানযোগ্য :

“কবির তাবৎ প্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম প্রকাশের ফোটোস্টাট, তাঁর জীবিতাবস্থায় তিনি যে-সব পরিবর্তন করেছিলেন সে-সব এবং তাঁর পাণ্ডুলিপি [এগুলো সংগ্রহ করতে কতদিন লাগবে, কেউ বলতে পারে না] যেমন যেমন পাওয়া যাবে তারও ফোটোস্টাট বের করতে হবে। তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হকৈ কবির দেহত্যাগের পর যে-সব পুনর্মুদ্রণ এবং নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি পাণ্ডুলিপি-সম্পত্ত ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা। এখন এ কাজ সম্ভব নয়। ত্রিশ বৎসর পর যখন এসব পুস্তকের উপর কারো কোনো কপিরাইট থাকবে না, তখনই উৎসাহী, অগ্রণী নানা প্রকারের প্রকাশক নানা রকমের জিনিস প্রকাশ করে পণ্ডিতদের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁরা বাঙলার ভিতরে বাইরে বসে বসে যে-সব গবেষণা প্রকাশ করবেন সে সমস্ত যাচাই বাছাই করে ধীরে ধীরে তৈরী হবে প্রামাণিক সংস্করণ।” [‘ভবঘুরে ও অত্যাচার’—পৃ. ১৩০]

- রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বিশ বছরের মধ্যেই রবীন্দ্র-রচনার বিকৃতি শুরু হয়েছে বলেই আমাদের সর্বক হওয়া প্রয়োজন।

এই মন্তব্য অত্যুক্তি নয়।

“অল্প কিছুদিন আগে এই কলকাতা শহরেরই বহুলপ্রচারিত এক বাংলা দৈনিক, তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, লেখা হয়েছে ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’ গানটি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনা।

গত ডিসেম্বর মাসে আর-একটি পরিচিত বাংলা সাহিত্য সাপ্তাহিকে গীতাঞ্জলির ‘উড়িয়ে ধবজা অভভেদী রথে’ এই বিখ্যাত কবিতাটির রচয়িতা ‘অজ্ঞাত’ বলে লেখা হয়েছে।” [জনতা, সাহিত্যসংখ্যা, ২৫ বৈশাখ ১৩৭০। ‘রবিচ্ছায়া’ প্রবন্ধ—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী]

রবীন্দ্র-সম্মানে তাই সতর্কতা ও মোহমুক্ত দৃষ্টির প্রয়োজন অত্যাवश्यक।
আশাকরি ‘রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা’য় তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

*

*

*

*

জন্মশতবর্ষ পূর্তি-প্রবাহ

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দটি জন্মশতবর্ষ পূর্তি-উৎসবে ভারাক্রান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মানকুমারী বসু, রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিহারিনোদ, কেশবচন্দ্র সেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। এই সব কীর্তিমান বাঙালীকে স্মরণ করে আমরাই কৃতার্থ হব।

কলকাতার ‘সংস্কৃতি-পরিষদ’ অষ্টাহব্যাপী এক অনুষ্ঠানে (৯—১৬ জুন) শেষোক্ত চার কৃতী বাঙালীকে স্মরণ করেছেন। এঁদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক সভায় প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা হয়েছে।

*

*

*

*

অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ

ইউনেস্কো-প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অনুবাদপঞ্জী ‘ইন্ডেক্স ট্রান্সলেশনাম্’-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় জানানো হয়েছে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বহুল-অনূদিত হয়েছেন। অনূদিতদের তালিকায় তাঁর স্থান চতুর্থ। প্রথম—বাইবেল (২৪৬টি অনুবাদ), দ্বিতীয়—লেনিন (১৮৫), তৃতীয়—টলস্টয় (১১৫), চতুর্থ—রবীন্দ্রনাথ (১০১)।

ভারতবর্ষে বঙ্গের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুবাদ : বোম্বে থেকে প্রকাশিত ‘চিত্রাঙ্গদার হিন্দী অনুবাদ (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে)।

ভারতের কোন্ কোন্ ভাষায় কবে রবীন্দ্ররচনার এবং ‘গীতাঞ্জলি’র অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি তালিকা দিয়েছেন শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

সেটি এখানে দিলাম :

অনুবাদের ভাষা	রবীন্দ্র-রচনায় প্রথম অনুবাদ	গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদ
হিন্দী	১৮৯৫	১৯২৪
মরাঠী	১৯১৩	১৯১৭
উর্দু	১৯১৪	১৯১৪
গুজরাতি	১৯১৫	১৯১৮
মলয়ালাম্	১৯১৯	১৯২৬

অনুবাদের ভাষা	রবীন্দ্র-রচনায় প্রথম অনুবাদ	গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদ
তামিল	১৯২২	১৯৪৫
তেলুগু	১৯২৩	১৯৫৪
কন্নড়	১৯২৪	১৯৪৪
পঞ্জাবী	১৯৪১	১৯৪১
ওড়িয়া	১৯৫০	১৯৬১
অসমীয়া	১৯৫০	—

[সমকালীন, বৈশাখ, ১৩৭০]

তালিকা থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ভৌগোলিক অর্থে প্রতিবেশী
হলেই মানস-নৈকট্য জন্মায় না।

* * * *

কবিস্মরণ

গত ১৯ মে আসামের নগগাঁওয়ে বিখ্যাত অসমীয়া কবি ও গল্প-লেখক
রত্নকান্ত বরকাকতীর স্মরণে এক সভা নগগাঁও সাহিত্যসভা ও কালঙপোরিয়া
আলোচনাচক্রের যুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীহলধর ভূঞা সভাপতিত্ব
করেন। অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর শর্মা, শ্রীরোহিতচন্দ্র বেজবরুয়া এবং শ্রীমহিম বোরা,
শ্রী এম. সি. দেবগোস্বামী, শ্রীসর্বেশ্বর রাজগুরু প্রমুখ অধ্যাপকগণ বরকাকতীর
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন।

রত্নকান্ত বরকাকতী কলকাতা বাসকালে রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ, বাগ্মী
বিপিনচন্দ্র পাল, সম্পাদক শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে
আসেন এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর রচনায় প্রধান
স্বর জাতীয়বাদী স্বর। আলোচকরা এই দিকটির উপর জোর দেন।

* * * *

উড়িষ্যার কবিসম্রাট উপেন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণে রাউরকেল্লায় তিনদিন ব্যাপী
(১৭—২০ মে) অনুষ্ঠানে কবির জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ওড়িয়া সাহিত্য-
আকাদেমির সচিব অধ্যাপক শ্রী জি. কে. ব্রহ্ম ভট্ট-রচনাবলীর আলোচনাপ্রসঙ্গে
বলেন, কবি মানবজীবনের সকল স্তরকে স্পর্শ করেছিলেন। গভীর
সহানুভূতিবলে কবি মানবজীবনকে অখণ্ড শ্রোতোধারারূপে উপলব্ধি
করেছিলেন।

এই অস্থান উপলক্ষে পান্না, কথক ও ওড়িশী নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছিল।

উড়িয়ার অন্ত্যস্তান স্থানেও ভক্ত-জয়ন্তী পালিত হয়।

*

*

*

*

নজরুল-জয়ন্তী

এগারোই জ্যৈষ্ঠ তারিখটি বাঙালীর কাছে আনন্দবেদনাপূর্ণ বার্তা বহন করে নিয়ে আসে। প্রতি বৎসর এইদিনে কাজি নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব পালিত হয়। এই বৎসরেও হয়েছে।

মহাজাতিসদনে গত এগারোই ও বারোই জ্যৈষ্ঠ (২৬, ২৭ মে) নজরুল জয়জয়ন্তী কমিটির আহ্বানে চতুঃষষ্টিতম জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি শ্রীব্রজকান্ত গুহ। কার্যকরী সভাপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র, যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী ও শ্রীমজাহারুল ইসলাম, সংস্কৃতি-সম্পাদক শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ এস. এ. মামুদ প্রমুখের অক্লান্ত প্রয়াসে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১১ই সকালে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “১৯৬৩ সালে চীন যখন ভারত আক্রমণ করেছে তখন এই সভ্যটি নতুন করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে, কালে কালে জাতীয় সংকটে জাতির ঋণ সঞ্চিত হয় সেইসব কবির কাছে যারা কলম রেখে হাতিয়ার তুলে নেন হাতে। আজকের এই সংকট জাতিকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার জন্তে গোটা কাব্য সাহিত্য খুঁজে বোনের পাওয়া গেছে, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল। আজ এই স্বর্ণজগলের কর্তৃত্ব মনে জাগছে।”

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এক বাণীতে বলেন, “আমার রাজনৈতিক জীবনের এক পর্যায়ে কবি নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আমার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যে জলন্ত দেশপ্রেম কবির প্রাণমাতানো কাব্যসৃষ্টির উৎস ছিল তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি নানাভাবে পেয়েছিলাম; কবিতা গান ও আত্মবিলোপকারী দেশপ্রেম ছিল কাজি নজরুল ইসলামের সহজাত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য; এর কোনটিকে বোধ হয় অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।……পরাধীনতার বহু লাঞ্ছনা, নিপীড়ন ও দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি দেশপ্রেম ও মানবদরদের যে অপূর্ব কবিতা ও গানগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলির মূল্য আজো কমে নি। আজ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে আমি তাঁর প্রতি আমার অন্তরের নিবেদন করি এবং তাঁর দীর্ঘায়ু ও রোগমুক্তি কামনা করি।”

হুদিনে তিনটি অধিবেশনে নজরুল-প্রতিভার নানাদিক সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্বশ্রী নলিনীকান্ত সরকার, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী, কাজি আব্দুল ওহুদ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রেজাউল করিম। তিনটি অধিবেশন নজরুল-সংগীতের বিচিত্র রূপের নানা উদাহরণ সার্থকভাবে পরিবেশন করেন খ্যাতনামা গায়কবৃন্দ। সংগীত-পরিচালনা করেন শ্রীকমল দাসগুপ্ত ও ফিরোজা বেগম। নজরুল-কবিতা আবৃত্তি করেন সর্বশ্রী সবিতাব্রত দত্ত, আবুলকাশেম রহিমুদ্দীন, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিব্রত ঘোষ, দেবভুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ ও শংকর ঘোষ।

জয়ন্তী কমিটির সভাপতি শ্রীব্রজকান্ত গুহের বিবৃতি থেকে জানা যায়, নজরুল সংগীত শিক্ষার স্থল ও নজরুল একাডেমি খোলার প্রস্তাব কমিটির বিবেচনাধীন।

ঐদিন নজরুলের জন্মভূমি বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামেও উৎসব পালিত হয়।

গত ৮ জুন বিশ্বরূপা প্রতিষ্ঠা-উৎসবে বার্ষিক প্রথামুখায়ী নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়, নট জহর গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী নিতাননী দেবীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। বাংলা নাট্যজগতে এই তিন গুণীর সংবর্ধনায় আমরা আনন্দিত হয়েছি।

॥ একটি অনন্যসাধারণ বই ॥

পরিমল গোস্বামী

সুখের সন্ধানে

সারা পৃথিবীর সর্বজাতির মানুষের একমাত্র লক্ষ্য 'সুখ'। তাই প্রাণপণ শক্তিতে তারই পশ্চাৎধাবনে সতত নিরত মানুষ। তবু কিন্তু সুখ অ-ধরা। সুখ কি আর কি করেই বা সত্যিকার সুখ? পাওয়া যায় তারই সার্থক সন্ধান দিয়েছেন স্বনামধন্য দার্শনিক ও চিন্তানায়ক বারট্রাও রাসেল তাঁর 'The Conquest of Happiness' গ্রন্থে। প্রখ্যাত কথাসিদ্ধী পরিমল গোস্বামী-অনুদিত এই অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থটি রূপা অ্যাণ্ড কোংর সহযোগিতায় প্রকাশিত। ৫০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

অন্তরীক্ষের সঙ্গীত

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ সাত ॥

সমাজে সদভাবে জীবনযাপন করার এবং নির্জনে শিবভাবের আনন্দে জীবনাতীত মহাজীবনের অগ্রগতি লাভ করার একটি মাত্র পথ—ই আছে—
সে-পথ ‘আত্মরতির’ পথ, ‘আত্মপ্রেমের’ পথ।

‘আত্মরতি’ বা ‘আত্মপ্রেমের’ নাম শুনে আধুনিকদের অনেকেই আজ শিহরিত হয়ে উঠবেন—আমি জানি। অর্বাচীনদের অনেকেই ভাবেন বটে—
আত্মরতি বুঝি পলায়নী মনোবৃত্তির লক্ষণ, আত্মপ্রেম বুঝি স্বার্থপরতার
অর্থাস্তর। দেহবুদ্ধির দস্ত দ্বারা আত্মরতি বা প্রেমের বিজ্ঞানরহস্যটি ব্যাখ্যা
করতে গেলে এমন ব্যাখ্যাই হয় বটে!...

তা’ হক—আত্মসাধকের তাতে কিছুই এসে যাবে না। তিনি এইটুকুতেই
আজ ভুট থাকবেন, যে ‘আত্মরতি’ না হ’ক, ‘বিশ্বরতি’ আজ সমাজ-শাস্ত্রে চল
হয়েছে, ‘আত্মপ্রেম’ না হ’ক—‘বিশ্বপ্রেম’ আজ অনেকেই শ্রুতে পারছেন
বলে মনে করছেন। ‘আত্মা’ যে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত মহাবিশ্ব, এ-সত্যটি
আজও উপলব্ধিতে আসে নি বলেই ‘আত্মার বিরুদ্ধে সাধারণের বিজ্রোহ,
‘আত্মরতি’র নামে সাম্প্রতিক পণ্ডিতদের পরিহাস।

সাম্প্রতিক অর্বাচীন সমাজে আরো কিছুকাল এমনটা হবে হয়তো। কিন্তু
এমন কাল বেশীদিন থাকবে না। আত্মার স্বরূপচিন্তনে মন যাবে। যে
আত্মা দেহে আছেন, দেহাতীতেও আছেন—বিদগ্ধ সমাজ সেই আত্মাকে
চিনবেন। ক্রমশ, আগের মত, আবার বুঝবেন আত্মপ্রেম ব্রহ্মপ্রেমেরই
অপর নাম। ব্রহ্মপ্রেম, নিত্যবর্ধমান এই প্রেম, স্তবরাং এ-প্রেম তো
‘পাঁওয়ার’ নয়, ‘হওয়ার’। যতটুকু ভেতর-থেকে হয়ে উঠি, ততটুকুই পাই।
অর্থাৎ যত হই, ততই পাই। আবার মজার কথা এই; যত পাই, ততই
হওয়ার আদর্শ বড় হয়, দূরবর্তী হয়। পাওয়ার আশ্বাদে হওয়ার বেদনা যত
বলবতী হয়, ততই ষা পেয়েছি তাকে ‘অল্প’ বলে—‘তুচ্ছ’ বলে মনে হতে
থাকে। তখন ‘অল্প’ ছেড়ে আরো-কিছুর দিকে, আরো-বড়-কিছুর দিকে

মন চলে। যত চলা, ততই হওয়া, ততই পাওয়া, ততই বেদনা পাওয়া।
বেদনা কেন? না, ওই যে বললুম, জীবন-পথে চলতে-চলতে যা-কিছু পাই
না কেন, মন তাতে ভরে না।

তখন বোঝা সহজ, নিজেকে ভালোবাসি বলেই অপূর্ণতায় মন ভরে না।

পূর্ণ স্বরূপতত্ত্বে মন যায়। নিজেকে যে ভালোবাসে না সে আত্মহত্যা করে;
ভালো যে বাসে, সে নিজেকে সাজায়, ধনে ধর্মে দানে জ্ঞানে অপরূপ করে
সাজাতে চায়। যত সাজায়, ততই জানতে পারে সাজানোর মত সাজানো
যেন হ'ল না। ক্রমে বুঝতে পারে, একদিন-না-একদিন অবশ্যই বুঝতে
পারে—‘অল্প’ যা, তাতে মন ভরবে না; ‘প্রভূত’ যা, তাতে ডুব দিয়েই
শান্তি।...‘প্রভূত’-ই আত্মা। প্রভূতে রতি-ই আত্মরতি। এই রতিতেই-ই
সত্যকার শান্তি।

যেই শান্তি এখনো পাই নি—কিন্তু পাব যে, তা’ জানি। ইহজীবনে
এইটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি—দেহবুদ্ধিটা মস্ত কিছু একটা
বুদ্ধি নয়। পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জিত কর্মপ্রভাবে এই দেহ পেয়েছি। দুষ্কৃতির
দুঃখ ভুগেছি অনেক, সুকৃতির সুখও পেয়েছি অনেক। কিন্তু সুকৃতি বা
দুষ্কৃতির অতীতে যতদিন না যেতে পারছি, ততদিন দেহ থেকে দেহান্তরে
যেতেই হবে। কত দেহ পার হয়ে এলাম, কত দেহ অপেক্ষা করছে দূর
অনাগতের অন্তরালে। সবার কাছে যাব, আমি-তে আমি হয়ে আমিদের
আত্মীয়তা দেব সকল দেহকেই, কিন্তু মনে মনে জানব দেহ-তে অধিষ্ঠিত
হলেও আসলে কোনো দেহ-ই আমি না, দেহাহীন আমি মুক্তপুরুষ, আসব,
কিন্তু মুক্ত বলে এসেই থাকব না, যাব। যাব বটে, কিন্তু অপূর্ণত্ব ঘোচে
নি বলে আসব আবার। এইভাবে চলবে লীলা, যতদিন না ‘প্রভূতে’
পৌঁছাই।

আজকের দেহটা মাত্র আমি না—এটা জেনে, ভাই, বড় সুখ, বড়
আনন্দ। কত জন্মের, কত যুগের মধ্য দিয়ে আমি আসছি—কত দেহের কত
অভিজ্ঞতা পেতে পেতে অনাদি কাল থেকে আমি আসছি—এ-বোধ যখন
মর্মজীবনকে স্পর্শ করে—অপার সান্নায়ে তখন হৃদয়-মন ভরে যায়; ইহলোকে
যে দেহজীবনটা আজ পেয়েছি, সেটিকে সুন্দরভাবে চালিত করার আনন্দে পূর্ণ
জীবনের স্বাদ পেতে থাকি গোপনে।

সুন্দরভাবে চালিত করার অবশ্য প্রকারভেদ আছে। আমি যেটিকে
‘সুন্দরভাবে চালনা’ বলি—আপনি হয়তো সেটিকে সুন্দর বলে স্বীকারই

করবেন না। চালনার কথাটা যখন বাইরের দিক থেকে ওঠে, তখন আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ হতে পারে। প্রচুর ঐশ্বৰ্যের মধ্যে অপ্রমেয় ভোগবিলাসের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-চালনাকেই যদি স্বন্দরভাবে চালনা বলেন, তবে সরলভাবে সহজজীবনের আনন্দসাধনার প্রস্তাবে আপনার সমর্থন আমি নিশ্চয়ই পাব না। কিন্তু চালনার কথাটি যদি ভেতরের দিক থেকে ওঠে, যদি বিশ্বাস করেন ত্যাগে-ই সুখ, প্রেমে-ই শান্তি, দানে-ই আনন্দ— তবে আপনার মত প্রাজ্ঞ দরদী মানুষের সঙ্গে আমার কোনো প্রকার মতভেদ-ই হতে পারে না। যদি বলি ভেতর থেকে বিশ্বের বন্ধু হয়ে উঠতে চাওয়ার প্রেমে ও আনন্দে সামাজিক জীবন চালনা-ই আমার আদর্শ, তবে এ-আদর্শে আপনার সমর্থন যে মিলবে না, তা নয়। ভেতর থেকে জীবনটাকে শুদ্ধ করতে হলে আত্মরতির সাধনা চাই। জড়দেহটা আপনার সঙ্গে যাবে না, কিন্তু আত্মরতির আরাধনায় যে-শুদ্ধ জীবনটি আপনি পাবেন, সেটি যাবে। আত্মরতি, কি না ব্রহ্মরতি-ই, জীবদেহীর অধ্যাত্ম বন্ধু। একে পাই তো বিশ্বকে পাই, বিশ্বাতীতকেও পাই।...কিন্তু আমার কথাগুলি কি ঠিক মত, ঠিকমত ভাষায়, বোঝাতে পারছি? ...হয়তো পারছি না। আচ্ছা—

ঐশ্বৰ্যের মধ্যে আছেন, থাকুন। বহু মানমর্ষাদার মধ্য দিয়ে পার্থিব পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করছেন, করুন। জীবনের বহুক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে ইহলোকের বিশেষ 'নাম'টিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, বড় সুখের কথা। কিন্তু পূর্বজন্মের সৌভাগ্যে ইহজন্মে যে-জীবনটি পেয়েছেন, সেইটিই জীবনের শেষ না, যদি জেনে থাকেন, তবে আগামীর জন্মে কতটা কী করছেন, কতখানি প্রস্তুত হচ্ছেন—নির্জনে একবার ভেবে তো দেখবেন? পূর্বজন্মের সাধারণ কতকগুলি গুণাবলে যে-সুখভোগ আপনার জীবনে সমায়ত হয়েছে, ইহজন্মের ভোগাতিশষ্যের প্রবাহে প্রত্যহ ও প্রতি মুহূর্তে তা ধৌত হয়ে যাক, এটা আপনি, আমি কেউই চাই না। আত্মরত ধ্যানের স্থিতপ্রজ্ঞ আনন্দে তাই কর্ণাকর্ম, ধর্মাধর্ম স্থির করতে হয়। বুঝতে হয়, যে আত্মেন্দ্রিয় ভোগেচ্ছাকে বিশ্লেষণ করে ভোগেচ্ছা, অর্থাৎ ত্যাগে দানে ও সেবায় রূপান্তরিত করার সাধনাই পুরুষের আদর্শ।...

ভোগবিলাসে মানুষ মুষ্টিমেয় কল্লেকজন স্বার্থান্ধ মূঢ় ব্যক্তির বহুত্ব পায়। ত্যাগে ও সেবায় আনন্দে মানুষ দেশবন্ধু হয়, হয় বিশ্ববন্ধু। ভোগে আমাদের দেহাসক্ত মন যদি তৃপ্ত, ত্যাগে আমাদের মনোগত আত্মা তবে রোমাঞ্চিত। দেহযুক্ত মন নিজে কী পেয়েছি তারই হিসাব নিকাশ করে মনোগত আত্মা

দেশ ও বিশ্বস্ততার আনন্দ হিসাবে কতটুকু কী হলো, হতে পারলাম, দেখে ভেবে।...সেকালের দাতাকর্ণ কি দধীচি—বা একালের মহশী কি দেশবন্ধু একটা নয় পয়সা দিয়েও আমাকে সাহায্য করেন নি ; অল্প কথায়, ওই সব মহাত্মাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা কানাকড়ি-ও নিই নি, কিন্তু দানের মহত্বে তাঁদের ভাবসুন্দর যে মহামূর্তি আমার চিত্তলোকে আজ সমুদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে—তার সৌন্দর্য অগ্রমেয়, সেইহেতু অমৃতসন্ধানী। দু-দশ লাখ টাকা ব্যক্তিগতভাবে পাওয়ার চেয়ে-ও এর মূল্য গভীরতর। দু-দশ লাখ টাকা পেলে বস্তুবিলাসী আমার ব্যক্তিমন হয়তো তৃপ্ত হয়, কিন্তু দানময় ভাবমূর্তির প্রেরণায় বিশ্বমন আমার রোমাঙ্কিত হচ্ছে।

এতে আমার আত্মায় অধিকার বাড়ছে। দিতে পারাই যে প্রেম—এ-বোধ প্রমুদিত হচ্ছে। সংসারে দিতেই যে আসা, দিতে হয়, এবং দিতে যে জানে সে-ই পাওয়ার মত পাওয়া যায়—এ-বোধ যার যত তীক্ষ্ণ, চৈতন্যপথ তার তত প্রশস্ত। পৃথিবী নানাভাবে দিয়ে দিয়ে নানাদিক থেকে আমাদের আশ্লেষপূর্ণ বোধছে, বন্ধনে ধরা দিয়ে আমরা যদি কেবল পেতেই চাই, তবে পৃথিবীর নানা দানের তাৎপর্য আমাদের বোঝাই হ'ল না বলে' বুঝতে হবে। পৃথিবী দিচ্ছে, আমাদের দিতে হবে।

কিন্তু কী দেব ? কেমন করে দেব ? কী আছে যে দেব ? না সেবা আছে, প্রেম আছে, দেব। দেব নিকাম কর্মের আনন্দে।

কর্ম তো ইহজীবনের যা হয় একটা করছি। কর্ম না করে' তো বাঁচা-ই যায় না। 'ন. হি কশিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্মকৃৎ'। ই্যা সে-কথা বুঝছি। কিন্তু লজ্জার কথা কি এই নয়, যে—বর্তমানে অধিকাংশ কর্মকেই স্বাত্মার প্রয়োজনে করছি নিয়ন্ত্রিত ? আত্মার প্রয়োজনে যে-কর্ম—তার নাম সাকাম কর্ম। পরাআর জন্মে, বিশ্বের তথা ব্রহ্মের জন্মে, যে-কর্ম নিকাম কর্ম বলি তাকে।...কামনা থাকে থাক, তাকে বিশ্বকল্যাণ ও সেবার কামনায় রূপান্তরিত করো, পার্থিব জীবনে সেটাই নিকাম কর্ম হবে।

নিকাম কর্মের আনন্দটি বোধে এসে পৌঁছলেই অনেকটা পথ অগ্রসর হওয়া সম্ভব। বোঝা সম্ভব, যে, নিয়ে নিয়ে আমরা জড়দেহী মাত্র। তখন :

যত পাই তত পেয়ে ধ্বংস,

তত চেয়ে চেয়ে

পাওয়া মোর, চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়।

—এর থেকে মুক্তি পেতে হলে দেয়ার সাধনা প্রাসঙ্গিক। দেয়ার বেগটি

অন্তরে প্রমুদিত হলেই আমরা চৈতন্যপথের মহান অভিযাত্রী। তখন 'দাঁও'—
এ-প্রার্থনায় লজ্জা; 'নাও'—এই প্রার্থনাতেই আগ্রহ:

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে

এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে।

নিষ্কাম কর্ম-ই প্রেমাভক্তির পাথর; এবং প্রেমাভক্তির সাধনা হচ্ছে
দিব্যজ্ঞানের আনন্দ। অর্থাৎ স্পষ্ট কথায়, দিব্যজ্ঞানের সাধনা যার নেই,
প্রেম, সেবা বা ভক্তি তার কাছে কথার মাত্র। প্রেম যার হয় নি, নিষ্কাম
কর্ম তার কাছে অর্থহীন বিপ্লবাপ ছাড়া আর কিছু না।

কিন্তু তবু কি প্রশ্ন উঠবে না এই বলে, যে এ-সব তো আধ্যাত্মিক উচ্চ-
মার্গের মানুষদেরই-ই কথা হচ্ছে। সাংসারিক সাধারণ মানুষের পক্ষে এ-সব
কি সহজ, না স্বাভাবিক—সংসারে যারা পেল না কিছুই, তারা কি দুঃখ-
প্রকাশ করবে না, ব্যক্তিগত দুঃখ-কামনায় হাহাকার করবে না, বিদ্রোহী
হবে না। সুখিজনের সুশ্চিন্তায় ঈর্ষান্বিত হবে না, পরস্বাপহরণের তত্ত্বকে
দল বেঁধে সমর্থন করবে না?

কে বললে করবে না? করবে। আমি 'না' বললে-ই তামাম দুঃখী
হুনিয়া 'না' বলে বৈরাগী হয়ে যাবে—এমন নির্বোধ চিন্তা আমি করি নে।
সংসারে দুঃখী থাকবে, বিদ্রোহী থাকবে, স্বার্থপর মানুষ থাকবে, খুঁনে ডাকা
থাকবে, সাধুবেশী ভণ্ড থাকবে, সাম্যের নামে 'অসাম্য' থাকবে, ধর্মের নামে
অধর্মরা থাকবে। গতজন্মে তাম্মা ছিল, এ-জন্মে তারা আছে, এবং এদের
মত অনেকেই আগামী কাল আসবে। অর্থাৎ এ-জন্মের হৃষ্টি প্রবাহে
পরজন্মে-ও তারা ভেসে আসবে। লোভ মোহ শোষণ শাসনের একচক্রে
তারা বহুকাল ঘুরবে। পৃথিবীতে জালাবে, মারবে।

তবে গতি কোথা? কোথা শান্তি? সেই কথাই তো হচ্ছে। দুঃখী
যদি ব্যক্তিগত দুঃখে-ই হাহাকার করে, করে আফালন—তবে তার গতি
একচুল-ও সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের দুঃখের সঙ্গে অস্ত্রের কথা-ও যদি
সে ভাবতে শেখে, পাড়া-প্রতিবাসীর দুঃখ অন্তর তার কাঁদতে জানে—তবে
তার সেই দুঃখবোধ, সেই কান্না-শুধুমাত্র দুঃখই আর থাকে না, প্রেমের
বেদনার রূপ নেয় আনন্দে। আনন্দ-ই আত্মবিকাশের অপর নাম। আনন্দ
বা আত্মপ্রেম-ই মানুষের স্ফুটনশরীর শুদ্ধ হয়, ফল্গুধারার মত গতি পায়।...
বিদ্রোহী যদি ব্যক্তিস্বার্থে বিদ্রোহী, তবে তার গতি, ওই যে বললাম, একচুল-ও

সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের রহস্যের স্বার্থে স্পর্ধিত অন্বেষণের বিরুদ্ধে যে-মনুষ্যরূপী বিদ্রোহী, রক্ত-মহেশ্বরের প্রেম-চৈতন্য তাঁর অন্তরছন্দে। ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থে খুন, ডাকাতি, তঞ্চকতা, প্রবঞ্চনা—এ-সবের পরিণাম ইহজন্মে যেমন নিন্দা নাই, পরজন্মেও তেমনি।

সুতরাং বলার কথাটা আবার কী দাঁড়াল? সুখেই থাকি অথবা দুঃখে থাকি, ঐশ্বৰ্যে থাকি অথবা দারিদ্র্যে থাকি—অন্তরে-বাহিরে যেন মানুষের বন্ধু থাকি, মানবতার সেবক থাকি, ‘প্রেম’ থাকি প্রেমের সাধনায় দিন দিন যেন ‘হয়ে’ ওঠি। এই হয়ে-ওঠার আত্মরতির সাধনা। এই সাধনার জন্মই যে জীবজন্ম। জীবত্বের পশু-বিকারে পলে পলে কেবল ঘুরে মরব—জীব-জীবনের এটা তাৎপর্য নয়। যা আছে, যেমনভাবে আছে—তা থেকে ‘অভ্যাসযোগেন’ উত্তীর্ণ হয়ে মহেশ্বরের কোনো চেতনসত্তায় শিবজন্ম লাভ করব—এটাই হচ্ছে মানবজীবনের অভিপ্রায়।

এই অভিপ্রায়টি সার্থক করার জন্মই মানবতার সেবক হওয়া, মানুষের বন্ধু হওয়া।...মানুষের বন্ধু হলেই গুহাহিত সেই ‘আত্মা মিলবে—এমন কথা কিন্তু বলছি নে। কায়নমনসাবীচা মানববন্ধু তথা জীববন্ধু হতে পারলে অগম রহস্যজীবনের রুদ্ধ-দুয়ারটি খুলে যাবে, এই মাত্র। জীবপ্রেম থেকে শিবপ্রেম, মানবপ্রেম থেকে মাধব্রে—তখন অভিসার করব। অভিসারে বেরোলেই যে গন্তব্য মিলবে এমন তো কথা নয়। পথে পথে অন্ধকার ভয় দেখাবে; দস্যুভয়, সর্পভয়, শার্ঙ্গুলভয় দেবে বাধা; শ্রাবণশরবরী পথকে করবে পিচ্ছিল; গুপ্তকণ্টকে বিদ্ধ হবে চরণ, অঙ্গ হবে ক্ষত-বিক্ষত; শাড়ী ছিঁড়বে, লজ্জাবাস উড়বে প্রতিকূল বাতাসে, তবু চলব। যত জন্ম চলতে হয়, চলব; যত জীবন অতিক্রম করতে হয়, করব।

•তারপর একদিন...

(ক্রমশঃ)

যদি পড়তেই হয়।

বেঙ্গল’এর বই.....

॥ বেঙ্গলের বই মানেই মেলা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥

তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরোগ্য নিকেতন ॥ রচনা-সংগ্রহ ॥ চৈতালি ঘূর্ণি

৭ম মুঃ ৭'৫০ ॥

১ম খণ্ড : ১০'০০ ॥

১০ম মুঃ ২'৫০ ॥

মনোজ বসুর

মানুষ গড়ার কারিগর ॥

নবীন যাত্রা

৩য় মুঃ ৫'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৪'০০ ॥

বনফুলের

সে ও আমি ॥

দ্বৈরথ ॥

স্বপ্নসম্ভব

৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৩'০০ ॥

৩য় মুঃ ৩'০০ ॥

সতীনাথ ভাট্টার

অপরিচিতা ॥ পত্রলেখার দাবা ॥ গণনাযক

২য় মুঃ ৩'০০ ॥

চার টাকা ॥

২য় মুঃ ২'৫০ ॥

সমরেশ বসুর

শ্রীমতী কাফে ॥

সুওদাগর ॥

গঙ্গা

৩য় মুঃ ৬'০০ ॥

২য় মুঃ ৬'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৫'৫০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

কদম

দুরার হতে অদূরে

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

২'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

চতুরঙ্গ

॥ অবিদ্বান্দ্র ॥

ময়ূরকণ্ঠী

৩য় মুঃ ৪'৫০ ॥

৯ম মুঃ ৩'০০ ॥

১৪শ মুঃ ৪'০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

সূর্যসারথি ॥

একতলা

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

৩য় মুঃ ২'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

ত্ৰীপুলিনবিহারী সেন

১ ॥ রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীর সূচনা করেন ত্ৰীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ১৩২৮-২৯ সালে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত তাঁহার ‘রবীন্দ্র-পরিচয়’ প্রবন্ধমালায়।^১ এই প্রবন্ধগুলি সূচী-সংকলনমাত্র নহে; সূচী-সংকলনের সহিত তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় নাই— এই প্রবন্ধ-মালায় তিনি বন-ফুল, কবি-কাহিনী ও রুদ্রচণ্ড এই তিনখানি বইয়ের আলোচনা করেন; প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহু তথ্য এ গুলিতে সন্নিবিষ্ট হয়।^২

২ ॥ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহের একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করেন এডওয়ার্ড টমসন তাঁহার *Rabindranath Tagore Poet and Dramatist* (Oxford University Press, 1926) গ্রন্থে। এই গ্রন্থ-সমূহের কতকগুলি এ সময়ে বহুকাল ধরিয়া অপ্রচলিত; অনুমান হয় ত্ৰীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অনেক রবীন্দ্রানুগামীও সকল পুস্তকের সহিত তখন পরিচিত ছিলেন না। টমসন সাহেবের এই তালিকায় তাহার অনেকগুলি উল্লিখিত।^৩

১ প্রবাসী, মাঘ ফাল্গুন, চৈত্র ১৩২৮; জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩২৯

২ যেমন, কোনো-কোনো গ্রন্থের রচনাকাল তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে জানিয়া লন; স্বাক্ষরহীন কোনো-কোনো বাল্যরচনা রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইয়া প্রবন্ধে উল্লেখ করেন।

৩ এই পঞ্জী-প্রসঙ্গে টমসন সাহেব যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য—

I see no prospect of a better bibliography being produced until some scholar devotes several years of residence in Calcutta to nothing else but the tracking down of this most elvish poet's innumerable embodiments. I shall not be that scholar; *sat Priamo datum*.

৩ ॥ ইহার কয়েক বৎসর পরে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ‘রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী’ [১৯৩২] নামে রবীন্দ্রগ্রন্থনিচয়ের একটি পূর্ণতর সূচী প্রকাশ করেন— কবিকাহিনী (১৮৭৮) হইতে সঞ্চয়িতা (১৯৩১) পর্যন্ত ২৪৮ খানি পুস্তক-পুস্তিকা ইহাতে উল্লিখিত হয়। এই সূচীগ্রন্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য গ্রন্থোৎসর্গ-বিবরণ— পুরাতন গ্রন্থ অনেকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, দুস্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল ; কোনো-কোনো গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইলেও উৎসর্গপত্র বর্জিত হইয়াছিল— ফলে উৎসর্গপত্রে বিধৃত সৌন্দর্য ও প্রীতির নিদর্শনও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

বিস্মৃত কতকগুলি পুস্তিকাও এই সূচীতে উল্লিখিত হয়।

৪ ॥ ইহার আট বৎসর পরে ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠিতে ১৩৪৬ কার্তিক সংখ্যা হইতে “রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী” প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকের রচনা ও গ্রন্থের “পঞ্জী”— ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রিত গ্রন্থগুলি লইয়া ও সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বেনামী ও ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনাগুলি লইয়া কাজ করেন। ‘এই রচনা ও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের কাজ নানা কারণে শনিবারের চিঠিতে সম্পূর্ণ হয় নাই’— কিন্তু কাজ যতদূর হইয়াছিল তাহা বিস্তারিতভাবেই হইয়াছিল। এই আলোচনা-প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মুদ্রিত (স্বাক্ষরহীন) কবিতা ‘অভিলাষ’ আবিষ্কৃত হয়, আরও অনেক গণ্য গণ্য রচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়।

গ্রন্থপঞ্জীও সবিস্তারে প্রকাশিত হইতে থাকে ; গ্রন্থবর্তী রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশের সূচীও এই পঞ্জীর অন্তর্গত হয়। ১৩৪৬ কার্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত শনিবারের চিঠিতে, “কথা-চতুষ্টয়” (১৩০১) পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৮) সূচীটি সম্পূর্ণই বর্জিত হয়।

এই মন্তব্যের পর রবীন্দ্রনাথ আরও পনেরা-ষোলো বৎসর ধরিয়া বহু গ্রন্থ লেখেন, ও সাময়িকপত্রে বহু রচনা প্রকাশ করেন, সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে গত বাইশ বৎসরেও তাঁহার অনেক রচনা সাময়িকপত্রে হইতে, পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের নূতন সংস্করণে, বা নবসংকলিত গ্রন্থে, সংকলিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর ‘সংযোজনে’ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিতপূর্ব বহু রচনা সাময়িকপত্রে হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

৫ ॥ এই রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী মূদ্রণ আরম্ভের কিছুকাল পূর্বে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেন, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের আশ্বিন মাসে। প্রত্যেক খণ্ডে বিদ্যুত বিভিন্ন পুস্তকের যে ‘গ্রন্থপরিচয়’ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে ধারাবাহিক গ্রন্থপঞ্জী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর প্রাসঙ্গিক আরও বহু তথ্য সংগৃহীত বা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অতিরিক্ত যে-সকল নূতন রবীন্দ্র-গ্রন্থ বা পুরাতন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বিশ্বভারতী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিশেষেও অধিকাংশ স্থলে এই-জাতীয় উপকরণ সম্ভব হইয়াছে।

৬ ॥ গত কুড়ি বৎসরে বিভিন্ন গবেষকের রবীন্দ্রচর্চার ফলেও বহু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এইখানে কোনো-কোনো গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছি গ্রন্থপঞ্জী যাহার প্রধান বিষয় না হইলেও যাহাতে প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর তথ্যের সহিত, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে পঞ্জীতে সংকলনযোগ্য বহু প্রয়োজনীয় তথ্যেরও সমাবেশ ঘটয়াছে; যেমন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত ‘রবীন্দ্রজীবনী’ চার খণ্ড; চ্যার্লস্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ‘রবিরশ্মি’ দুই খণ্ড; শ্রীকুমার সেন প্রণীত ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ তৃতীয় খণ্ড; শ্রীকানাই সামন্ত প্রণীত ‘রবীন্দ্র-প্রতিভা’; শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’; শ্রীকানাই সামন্ত সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, ও গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড।

৭ ॥ শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত ‘রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী’তে ও অন্তত্ব সজ্ঞীকান্ত দাস যে-সকল উপকরণ আহরণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি তাহার ‘রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থে (১৩৬৭) নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবারের চিঠিতে ‘রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী’তে গ্রন্থপঞ্জী অংশ সম্পূর্ণ

৪ রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসবের প্রাক্কালে এবং উৎসব-বর্ষে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ কয়েকখানি ‘অভিধান’ বা ‘কোষ-গ্রন্থ’ প্রকাশিত হইয়াছে, যথা, শ্রীচিন্তরঞ্জন দেব ও শ্রীবাসুদেব মাইতি, ‘রবীন্দ্ররচনাকোষ’; শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ‘রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান’; শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু, ‘রবীন্দ্র-অভিধান’; শ্রীনির্মলেন্দু রায়চৌধুরী, ‘রবীন্দ্র-নির্দেশিকা’।

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী প্রণীত ‘মংগুতে রবীন্দ্রনাথ’ ও শ্রীসীতা দেবী প্রণীত ‘পুণ্যস্মৃতি’ রবীন্দ্রনাথের জীবনালেখ্যরূপেই স্বরণীয়; তবে এ দুটি পুস্তকে রবীন্দ্র-রচনা সম্বন্ধে বহু তথ্যও প্রসঙ্গক্রমে কাহিনীসূত্রে আহৃত হইয়াছে।

করেন নাই; “রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়” নামে একখানি পুস্তকে (প্রকাশ পৌষ ১৩৪২; সংস্করণ মাঘ ১৩৫০) একটি ‘কালানুক্রমিক তালিকা’ প্রকাশ করেন। ‘এই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের রচিত বাংলা পুস্তকের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রকাশিত হইল।’ তবে শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্ররচনাপঞ্জীতে তাঁহার সংকলিত গ্রন্থপঞ্জী অংশের বিবরণ যেরূপ বিশদ ছিল, ইহাতে সেরূপ নহে। বেঙ্গল লাইব্রেরি তালিকা হইতে প্রকাশ-তারিখ যোগ করিবার ফলে পুস্তকগুলির প্রকাশের ক্রমনির্ণয় হইয়াছে, ইহা এই পুস্তকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার পরিশিষ্টে বহু মূল্যবান প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপকরণ সংকলিত হয়।

১৩৫০ সালের পরে এ যাবৎ প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকাও স্বভাবতই ইহাতে নাই।

‘প্রধানতঃ পুস্তিকা ও প্রোগ্রামের নাম’ এই তালিকায় সংকলিত হয় নাই।

‘এই গ্রন্থপঞ্জীতে প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রচলিত সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থাকিলেও প্রধানতঃ তাহার কোনো উল্লেখ করা হয় নাই।’

৮ ॥ অতঃপর শ্রীজগদ্বিন্দু ভৌমিক তাঁহার সংকলিত একুটি ‘রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী’, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রজীবনকথা’ গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৬। পরিবর্ধিত সংস্করণ কা্তিক ১৩৬৮) প্রকাশ করেন। ‘বর্তমান পঞ্জীর সংক্ষিপ্ত পরিসরে রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান পুস্তকগুলিরই উল্লেখ করা সম্ভবপর হইয়াছে— রবীন্দ্রনাথ-রচিত পাঠ্যগ্রন্থ, তাঁহার রচিত গানের স্বরলিপি-সংগ্রহ, অভিনয়াদির অনুল্লানপত্র অথবা পুস্তিকা ইহার অন্তর্গত করা হয় নাই।’ কাহাকে কোন গ্রন্থ উপহৃত হইয়াছে এই তালিকায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পর, ‘রবীন্দ্রজীবনকথা’র পরিবর্ধিত সংস্করণের (কা্তিক ১৩৬৮) প্রকাশকাল পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি এই তালিকাভুক্ত। সংকলন-গ্রন্থগুলি (যথা রবীন্দ্র-রচনাবলী) স্বতন্ত্র করিয়া দেখানোতে পাঠকের সুবিধা হইয়াছে। বস্তুতঃ, বর্তমানে পূর্বোক্ত কোনো পঞ্জীই ছাপা নাই— রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত প্রধান বাংলা বইগুলির নাম প্রকাশতারিখ প্রভৃতির ইহাই এখন একমাত্র তথ্য নির্ভরযোগ্য বাংলা সূচী।^৫

৫ অতঃপর বর্তমান সংকলয়িতা ও শ্রীজগদ্বিন্দু ভৌমিক-কৃত অনুরূপ একুটি সূচী, সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত *Rabindranath Tagore : A*

৯ ॥ শ্রীজগদীন্দ্র ভৌমিক তাঁহার রূত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী'তে আমার রূত যে 'প্রস্তুতমান পূর্ণতর গ্রন্থপঞ্জী'র উল্লেখ করিয়াছেন, 'সাহিত্যের খবর'-সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্তে উহা আপাততঃ এই পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে ; ফলে, কোনো পাঠক যদি ইহার অসম্পূর্ণতা বা বিচ্যুতির কথা অনুগ্রহপূর্বক সংকলনকর্তাকে বিজ্ঞাপিত করেন তবে এই সূচী গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে তাহা সংশোধন করিবার স্বযোগ হইবে ।

সাময়িক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে, এই সূচীর জন্ত যে-সকল উপকরণ সমাহৃত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত করা অবশ্য সম্ভব নহে । গ্রন্থপ্রকাশ-কালে ব্যবহারের অপেক্ষায় তাহা রাখিতে হইল ।

এই সূচনায় যে-সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সবগুলি দ্বারাই বর্তমান সংকলয়িতা অল্পবিস্তর উপরূত হইয়াছেন ।^৬

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্তমান সূচীটি একটি বৃহত্তর রবীন্দ্রচর্চাসূচীর এক অংশ । এই পূর্ণতর সূচীটির কয়েকটি অংশ ইতিপূর্বে সাময়িকপত্র বা বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে ; কাহারও কাহারও প্রয়োজনে লাগিতে পারে মনে করিয়া নিয়ে ঐ সূচীগুলির একটি তালিকা মুদ্রিত হইল ।

ইংরেজি-বাংলা

"Rabindranath Tagore : A Bibliography of Political Writings", in Sachin Sen, *The Political Thought of Tagore*, March 1947.

"Rabindranath Tagore on Education : A Bibliography", *The Visva-Bharati Quarterly*, Education Number, May-October 1947.

Centenary Volume (November 1961)-এর অন্তর্ভুক্ত হয় ; ইহাতে ইংরেজি গ্রন্থের তালিকাও আছে ।

৬ ৪-সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত 'অভিধান' বা 'কোষ'-জাতীয় গ্রন্থের অনেকগুলির বিষয়বস্তু বহুলাংশে বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীর পরিসর-বহির্ভূত ।

"The Plays of Rabindranath Tagore and their English Translations", *Sangeet Natak Akademi Bulletin*, Tagore Centenary Number, November 1961.

"Short Stories and Novels of Rabindranath Tagore ; a Bibliography of English Translations", *Indian Literature*, Tagore Number, 1961.

এইগুলিতে বাংলা ও ইংরেজি দুইপ্রকার রচনারই স্থচী আছে।

বাংলা

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ॥ তথ্যপঞ্জী"। শ্রীপ্রমথনাথ বিনী-লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থের (১৩৬১) পরিশিষ্ট, স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত। ইহার একটি প্রধান অংশ সম্ভ্রান্তি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের (১৩৬২) অন্তর্গত হইয়াছে।

"রবীন্দ্রপরিচয়গ্রন্থপঞ্জী"। *রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলা গ্রন্থের স্থচী। দেশ, ২৩ বৈশাখ ১৩৬২, ১৯ শ্রাবণ ১৩৬৩, ২৫ শ্রাবণ ১৩৬৪; প্রবাসী আশ্বিন ১৩৬৬। ১৩৬৬ শ্রাবণ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ এই তালিকাবলীর অন্তর্গত।

"রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থ", শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৬৭।

ইংরেজি

"Books about Tagore", *The Visva-Bharati Quarterly*, Spring 1957.

"Lectures and Addresses of Rabindranath Tagore", *The Visva-Bharati Quarterly*, Spring 1958.

"Books by Rabindranath Tagore : Translations into other Languages", *Visva-Bharati News*, July, August 1960.

নিম্নলিখিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদের স্থচী এই শেষোক্ত তালিকাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে— অসমীয়া, নেপালী, সংস্কৃত, ওড়িয়া।

এতদ্ব্যতীত, ইহাতে দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত (১) বাংলা গ্রন্থের তালিকা ও (২) স্বরলিপির তালিকাও সংকলিত হইয়াছে।

৭ শ্রীশুভেন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সহযোগে প্রস্তুত।

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী সম্বন্ধে এডওয়ার্ড টমসন তাহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে (১৯২৬) লিখিয়াছেন—

His magazine contributions cover fifty years and are so incredibly many that no bibliography of them would be possible, except in a separate volume devoted to listing these alone.

বর্তমান সংকলয়িতা এ বিষয়ে যে-সকল সূচী প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল।

এই তালিকায়, প্রথমে যে-পত্রিকার সূচী করা হইয়াছে তাহার নাম, পরে ঐ সূচী যে-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নাম ও সংখ্যা উল্লেখ করা হইল।

বাংলা

ভাণ্ডার। দেশ, ২৯ বৈশাখ ১৩৫২

শান্তিনিকেতন পত্র। দেশ, ২ আষাঢ় ১৩৫২

কবিতা। কবিতা, আষাঢ় ১৩৫২

সবুজ পত্র। দেশ, ২২ ভাদ্র ৩৫২

বঙ্গদর্শন। দেশ, ৩২ শ্রাবণ ১৩৫৩

বঙ্গবাণী ॥^৮ সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৭

বিচিত্রা। সমকালীন, আষাঢ়-পৌষ ১৩৬৭

মানসী, মানসী ও মর্মবাণী। সমকালীন, মাঘ, কান্তন ১৩৬৭

ইতিহাস ও আলোচনা। সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৮

উদয়ন। সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৮

কল্লোল। সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৮

কালিকলম। সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৮

প্রবাসী ১৩৬৮-৩৩। প্রবাসী, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৮

৮ সমকালীন ও প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত সূচীনিচয় জীপার্থ বস্তু সহযোগে প্রস্তুত।

“Contributions and Translations Published in *The Modern Review*”, [1909 - 18]^৯ *The Modern Review*, June and August 1961.

“Contributions and Translations Published in *The Visva-Bharati Quarterly*” [1923 - Autumn 1960],^{১০} *The Visva-Bharati Quarterly*, Tagore Centenary Number [May 1962].

“Contributions and Translations Published in Periodical”^{১০} *Visva-Bharati News*, July 1959 - June 1960.

চুয়ান্থানি দৈনিক ও অন্তর্বিধ পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি রচনা এই শেষোক্ত তালিকাতে উল্লিখিত আছে।

এই সকল তালিকায়, প্রত্যেকটি রচনা পরে কোন্ গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; যে-সকল রচনা কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই বাংলা সূচীতে সেগুলি “অপ্রকাশিত” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য, ঐ সূচীগুলি প্রকাশিত হইবার পর, নূতন সংকলিত গ্রন্থে, বা পুরাতন গ্রন্থের নূতন সংস্করণে, “অপ্রকাশিত” অনেক রচনা গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে।

৯ শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সহযোগে প্রস্তুত।

১০ শ্রীশুভেন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সহযোগে প্রস্তুত।

কবি-কাহিনী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ।

৩

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক
প্রকাশিত ।

কলিকাতা

মেছুয়াবাজার-রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে

সুরস্বতী যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ।

সংবৎ ১৯৩৫ ।

কবি-কাহিনী গ্রন্থের আখ্যাপত্র । প্রতিলিপি মূল গ্রন্থের আকারে ।

কবি-কাহিনী । / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । / ও / শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক / প্রকাশিত । / কলিকাতা / মেচুয়াবাজার-রোডের ৪২ সংখ্যক ভবনে / সরস্বতী যন্ত্রে / শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক / মুদ্রিত । / সংবৎ ১৯৩৫ ।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্র [৮০], ৫৩ ।

প্রকাশ [৫ নভেম্বর ১৮৭৮] । মুদ্রণসংখ্যা ৫০০ । মূল্য ছয় আনা ।^১

কবি-কাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ । ইহা চারি সর্গে সমাপ্ত— গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১২৮৪ সালের ভারতী পত্রের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় ইহা মুদ্রিত হয় । রচনা স্বাক্ষরহীন ।

কবি-কাহিনীর সাহিত্যমূল্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ‘ভারতী’ অধ্যায়ে মন্তব্য করিয়াছেন—

“এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই ‘কবিকাহিনী’ নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম । ষে-বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল দ্বিজের অপরিষ্কৃততার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা । সেইজন্য ইহার নায়ক কবি । সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে— লেখক আত্মনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই । ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে— যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেকোনটি হইলে অল্প দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ, কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি । ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে^২— তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ

১ বন্ধনীভুক্ত প্রকাশ-তারিখ, এবং মুদ্রণ-সংখ্যা বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ হইতে গৃহীত । মূল্য যে ক্ষেত্রে পুস্তকে উল্লিখিত নাই সে ক্ষেত্রে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ হইতে গৃহীত ।

২ হিমালয়ের প্রতি বৃদ্ধ কবি :

“কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানব-মনে বিষ মিশাইয়া !

ইহা গুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্ণ।”

কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা-শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,...
তবুও মাহুষ বলি গর্জ করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার !...
পৃথিবী জানে না গিরি, হেরিয়া পরের জালা,
হেরিয়ে পরের মর্শ্ব-দুখের উচ্ছ্বাস,
পরের নয়নজলে, মিশাতে নয়নজল
পরের দুখের স্বাসে মিশাতে নিশ্বাস !...
কেহ বা রতনময় কনকভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে স্থখে বিলাসের কোলে,
অথচ স্মৃথ দিয়া দীন নিরালয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্ন-সন্ধান !...
সহস্র পীড়িতদের অভিষাপ লোয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন,...
এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত !...
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি !...
তবে বল কবে গিরি, হবে সেইদিন
যে দিন স্বর্গ ই হবে পৃথ্বীর আদর্শ।
সেদিন আসিবে গিরি, এখনিহ যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয় !

তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
 দেখিত ধান্যের শিষ ছলিছে পবনে ।
 দেখিত একাকী বসি গাছের ভলায়,
 স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
 উঠিছেন উবাদেবী হাসিয়া হাসিয়া ।
 নিশা তারে বিল্লীরবে পাড়াইত ঘুম,
 পূর্ণিমার চাঁদ তার মুখের উপরে
 তরল জোছনা-ধারা দিতেন ঢালিয়া,
 স্নেহময়ী মাতা যথা স্তম্ভ শিশুটির
 মুখ পানে চেয়ে চেয়ে করেন চুখন ।
 প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে
 উষা তার স্বথ-নিদ্রা দিতেন ভাঙ্গায়ে ।
 এইরূপে কি একটি সন্ধ্যাতের মত,
 তপনের স্বর্ণময়-কিরণে প্রধাবিত
 প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
 নন্দন বনের কোন অগ্নয়া-বাঁলার
 স্বথময় ঘুমঘোরে স্বপনের মত
 কবির বালক কাল হইল বিগত ।

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
 প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
 বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা ।
 প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত ।
 নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
 কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে;
 প্রভাতের-সমীরণ যথা চুপি চুপি
 কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা ।
 নীর মনের গান বালক যেমন
 বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিত না ।
 বিহঙ্গ তাহার কাছে গাইত যেমন,
 এমন কাহারো কাছে গাইত না আর ।

তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
 এমন কাহারো কাছে বহিত না আর ।
 যখনি রজনী-মুখ উজ্জলিত শশী,
 স্তম্ভ বালিকার মত যখন বসুধা
 স্তম্ভের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে ;
 বসিয়া তটিনী তীরে দেখিত সে কবি,
 স্নান করি জোছনায় উপরে হাসিছে
 স্নানীল আকাশ, হাসে নিম্নে স্রোতধিনী ;
 সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
 ছয়েকটি ডেউ কভু জাগিয়া উঠিছে;
 ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
 নিশাই কবিতা আর দিবাি বিজ্ঞান ।
 দিবসের আলোকে সকলি অনাস্থত,
 সকলি রয়েছে খোলা চখের সমুখে,
 ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে ।
 দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,
 কাঁটা খোঁচা কর্দমাক্ত বীতংস জঙ্গল
 ভোমার চখের পরে হবে প্রকাশিত ;
 দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
 নিয়মের যন্ত্র-চক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি ।
 কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
 পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে,
 সকলি দেখায় যেন রহস্য পূরিত ;
 সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন ;
 ওই শুক্ল নদী-জলে চন্দ্ৰের আলোকে
 পিছলিয়া চলিতেছে যেমন তুরনী,
 তেমনি স্নানীল ওই আকাশ সলিলে
 ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ;
 সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিম্রিত,
 একাকী গম্ভীর-কবি নিশাদেবী ধীরে
 তারকার ফুলমালা জড়িয়ে মাথায়,

কবি-কাহিনীর গ্রন্থাকারে প্রকাশ-প্রসঙ্গে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

“এই কবি-কাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু^৩ এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না, কিন্তু তখন আমার মনে যে-ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বইলেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছে হইতে। শুনা যায়, সেই বইয়ের বোবা স্মদীর্ঘকাল দোকানের শেল্ফ এবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।”

সাহিত্যসংসারে এই কাব্যের সমাদর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির একটি খসড়া^৪ উল্লেখ করিয়াছেন যে

“...বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার “বান্ধব” পত্রে এই কাব্যসমালোচন উপলক্ষ্যে লেখককে উদযোন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।”^৫ খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম।

প্রকৃতির সুব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শাস্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।...”

সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির মন্ত্র করিল পূর্ণিত !

—কবি-কাহিনী, চতুর্থ সর্গ

৩ গ্রন্থের আখ্যাপত্রে প্রকাশকরূপে উল্লিখিত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

৪ “জীবনস্মৃতির খসড়া”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

৫ ত্রিনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনস্মৃতিতে এই সমালোচনাটির প্রাসঙ্গিক অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি অল্প কোনো-কোনো গ্রন্থেও

বন - ফুল ।

কাব্যোপন্যাস ।

“অনাথাতঃ পুষ্পং কিসলয়মলুনং করকর্ষেঃ ।”

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ।

শ্রী যতিলাল মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

গুপ্তপ্রেশ ;

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রট ;—কলিকাতা ।

১২৮৬ সাল ।

বন-ফুল গ্রন্থের আখ্যাপত্র । প্রতিলিপি মূল গ্রন্থের আকারে ।

‘আমাৰ ৰচনাৰ আৱৰ্জিত অংশ অনেকদিন আমি প্ৰচ্ছন্ন ৰেখেছিলুম’—
কবি-কাহিনী, বন-ফুল প্ৰভৃতি এই অংশেৰই অন্তৰ্গত।

ৰবীন্দ্ৰ-ৰচনাবলী প্ৰকাশকালে অবশেষে ৰবীন্দ্ৰনাথ এগুলি পুনপ্ৰকাশেৰ
অনুমতি দেন— ৰবীন্দ্ৰ-ৰচনাবলী অচলিত সংগ্ৰহেৰ প্ৰথম খণ্ডেৰ (১৯৪০)
অন্তৰ্গত হইয়া কবি-কাহিনী প্ৰথম প্ৰকাশেৰ বাৰ্ষিক বৎসৰ পৰা প্ৰথম
পুনৰুদ্ভাৱিত হয়।

স্বতন্ত্ৰ গ্ৰন্থৰূপে কবি-কাহিনী আৰু মুদ্ৰিত হয় নাই।

২

‘বন-ফুল। / কাব্যোপন্যাস। / “অনাজাতঃ পুষ্পং কিসলয়মল্লনং
কররূহৈঃ।” / শ্ৰীৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ প্ৰণীত। / শ্ৰীমতিলাল মণ্ডল
কৰ্তৃক মুদ্ৰিত ও প্ৰকাশিত। / গুপ্তপ্ৰেৰা ; / ২২১, কৰ্ণওয়ালিশ
ষ্ট্ৰীট ;—কলিকাতা। / ১২৮৬ সাল।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ॥ আখ্যাপত্ৰ [১০-১০], ‘অশুদ্ধ সংশোধন’ [১০], বিজ্ঞপ্তি
‘কলেজ ষ্ট্ৰীট ক্যানিং লাইব্ৰেৰী ও চিনাবাজাৰ পদ্মচন্দ্ৰ নাথের/দোকানে
প্ৰাপ্তব্য।’ [১০], ২৩।

প্ৰকাশ [২ মাৰ্চ ১৮৮০]। মুদ্ৰণসংখ্যা ১০০০। মূল্য আট আনা।

বন-ফুল গ্ৰন্থাকাৰে কবি-কাহিনীৰ পৰে প্ৰকাশিত হইলেও, সাময়িকপত্ৰে
মুদ্ৰিত হইয়াছিল কবি-কাহিনীৰ পূৰ্বে, ৰচনাও পূৰ্ববৰ্তী বলিয়া অনুমেয়।
ইহা আট সৰ্গে সমাপ্ত— গ্ৰন্থাকাৰে প্ৰকাশেৰ পূৰ্বে জানাকুৰ ও প্ৰতিবিম্ব পত্ৰে
১২৮২-৮৩ সালে নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলিতে প্ৰকাশিত হয়—

১২৮২ ॥ অগ্ৰহায়ণ, মাৰ্ঘ, চৈত্ৰ

১২৮৩ ॥ জ্যৈষ্ঠ, শ্ৰাবণ, ভাদ্ৰ, কাৰ্ত্তিক

সংকলিত হইয়াছে। জীবনস্মৃতি-সম্পাদক ইহাও লক্ষ্য কৰিয়াছেন যে, বান্ধব
পত্ৰে ‘উদয়ানুখ কবি’ বলিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ অভিহিত হন বস্তুতঃ ৱদ্বচণ্ড গ্ৰন্থেৰ
সমালোচনা-প্ৰসঙ্গে; এই সমালোচনাটিও তিনি জীবনস্মৃতিতে মুদ্ৰিত
কৰিয়াছেন।

হৃদক এতুপ প্রয়োজনীয় পুস্তকের
দোষাভুসঙ্কান করা আমাদের উদ্দেশ্য
নহে। উক্তবিধ দোষ সমস্ত স্বত্বেও ইহা
যে এক ধানি বক্তৃতায় আদর যোগ্য

পুস্তক হইয়াছে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ
নাই। এতদ্রূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক
সংকলন জন্য কার্তিকের বারু অবশ্যই
রুতজ্ঞতা ভাজন ইহা বলা বাহুল্য।

বন কুল ।

কাব্য ।

“জনান্নাতং পুণ্যং কিসলয়মননং করুণম্ ।”

১ম সর্গ ।

চাইন! জ্ঞেয়ান, চাইন! জানিতে
সংসার, মানুস কাহারে বলে
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
অকায়ে যেতাম বনের কোলে !

“দীপ নিব্বাণ”

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাস
রজত স্নেহমায়, প্রদীপ্ত তুমার চর
হিমাজি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখর মালা বিশাল মহান্ ;
অবরে নির্বর ছুটে, শৃঙ্গ হ’তে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান !
শিরোপরি চল্লি স্বর্ঘ্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্ণের ভার করিছে বহন ;
তুমারে আবারি শির, ছেলে খেলা
পৃথিবীর
ভুকক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন •
কত নদী কত নদ, কত নিব্বাণী হুদ
পদতলে পড়ি তার করে আশ্ফালন !
মানুষ বিশ্বরে ভয়ে, দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে
অবাক হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন ।

চৌদিকে পৃথিবী ধরা নিম্নায় মগন,
ভীত শীত সমীরণে, ছালায়ে পাদপংগণে

বিহছে নির্বর-বারি করিয়া চুম্বন,
হিমাজি শিখর শৈল করি আবারিত
গভীর জনদরাশি, তুমার বিতার নাশি
স্থির ভাবে হেথা সেথা বহেছে নিম্নিত ।
পর্বতের পদতলে, ঘুরে ঘুরে নদী চলে
উপল রাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গ কুল, সিক্ত করি বক্ষ মূল
নাচিছে পাষণ-তট করিয়া প্রহত !
চারি দিকে কতশত, কল কলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা মাঝে নির্বরের ধারা ।
আজি নিশীথিনী কঁাদে, আঁধারে
ছায়ায়ে চাদে
মেঘ ঘোমটার ঢাকি কবরীর তারা ।

কম্পনে ! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র ছায়ে ছায়ে, পাদপের গায়ে •
গায়ে

তুমারে চরণ-দেশ স্রোতস্থিনী নীরে ?
চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
নাহি জন কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে সুমার !
কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে সত্যিকা-মালা প্রমারিয়া কর,
কুসুমস্তবক রাশি, ছুরার উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর !

রচনা স্বাক্ষরহীন।

ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় লিখিয়াছেন—

“১২৮২ সালে প্রথম বাহির হইলেও ‘বনফুল’ লেখা আরো আগে।

রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন— জ্ঞানাক্ষুরে বাহির হইবার “বেশ কিছুদিন আগে” ইহা লেখা হয়।^৬ যদি এক বছর পূর্বে লেখা হইয়া থাকে তবে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো বছর।”

জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে^৭ বন-ফুল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

“এমনি সময়টাতে জ্ঞানাক্ষুর বলিয়া একটি কাগজ বাহির হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমার সেই বাল্যের কবিতাগুলিও সম্পাদক মহাশয় আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলেন নাই। পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া “বনফুল” নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটি বোধকরি জ্ঞানাক্ষুরে বাহির হইয়াছিল। এবং বছর তিন চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধপক্ষপাতের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারেও ছাপাইয়াওছিলেন। মনে একান্ত আশা ছিল এই কবিতাটিও অগ্রাগ্র অনেকগুলি বাল্যকীর্তির সহিত লোপ পাইয়াছে কিন্তু দুই এক খণ্ড বনফুল এখনো কোনো কোনো সঞ্চয়বায়ুগ্রস্ত পাঠকের হাতে আছে খবর পাইয়া হতাশ হইয়াছি। ইহাকে শাস্ত্রে বলে কৰ্মফল।”

পুনর্মুদ্রণ

রবীন্দ্র-রচনাবলী অঁচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৯৪০) প্রথম পুনর্মুদ্রিত।

স্বতন্ত্র আকারে আর মুদ্রিত হয় নাই।

৬ শান্তিনিকেতনে কথাবার্তায়, ১০ই ডিসেম্বর ১৯২১। দ্রষ্টব্য “রবীন্দ্র-পুস্টিচয়”, প্রবাসী, কাল্কট ১৩২৮

৭ “জীবনস্মৃতির খসড়া”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০

(ক্রমশঃ)

বাংলায় কালিদাস-চর্চা

অমলেন্দু ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[ঋতু সংহার].

কাহিনী ও আনুশঙ্গিক তথ্যপরিচয় ॥ ঋতুসংহার কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর মনে যে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে ‘ঋতুসংহার’ কাব্যে মহাকবি কালিদাস তা স্নন্দরভাবে ও স্থূললিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কবি তাঁর কাব্যে আন্তরিকতা ও সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তবে, কাব্যখানির অধিকাংশ রচনাই আদিরসাত্মক।

অনুবাদক প্রসঙ্গ ॥ ঋতু-বৈচিত্র্যের দেশ বাংলায় ঋতুসংহার কাব্যের সমাদর আছে যথেষ্ট। কাব্যখানির অনুবাদকদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল বিজাভূষণ, মদনগোপাল গোস্বামী, যশোদানন্দন সরকার, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুভূষণ সরকার, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রসময় লাহা প্রভৃতির নাম জানা যায়।

অনুবাদ প্রসঙ্গ ॥ রাজেন্দ্রলাল বিজাভূষণ ও মদনগোপাল গোস্বামী এই দু’জনেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও বাংলা অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল বিজাভূষণের অনুবাদ চলতি বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট নিদর্শন—কালিদাসের অনুবাদে একমাত্র তিনিই পাণ্ডিত্য ও সারল্যে আশ্চর্য রকমের সার্থকতা লাভ করেছেন। মদনগোপালের অনুবাদ সাধুবাংলায় অতিরিক্ত সংস্কৃত-ষেঁষা। হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পত্নানুবাদের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। সাধু ও চলিত বাংলার কৃতিত্বপূর্ণ সামঞ্জস্যবিধানের ফলে তাঁর অনুবাদ যেন শরতের প্রসন্ন আকাশ। তাঁর অনুবাদের নমুনা হিসাবে শরৎকালের বর্ণনার অংশবিশেষ সংকলন করেছি। রসময় লাহার অনুবাদ অল্প দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ। অর্থাৎ কালিদাসের ঋতুসংহারের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে, তারই অনুসরণে আবার, একালের বাংলাদেশের ঋতু-বৈচিত্র্য নিয়েও তিনি সার্থক কাব্যরচনা করেছেন পৃথক একটি অধ্যায়ে। অজ্ঞাত অনুবাদকের কৃতিত্ব ততো উল্লেখযোগ্য নয়। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সংস্কৃতষেঁষা সাধুবাংলা, কিন্তু মূলত অন্নয়ীমুখী বাংলা অনুবাদ।

অম্ববাদ-পঞ্জী ॥

[অম্ববাদ-বিচারের স্থবিধার জন্যে ঋতুসংহার কাব্যের বসন্ত বর্ণনা থেকে সংকলন করা গেল ।]

১৮৬০ [১২৬৭]

ঋতুসংহার । মহাকবি কালিদাস প্রণীত । শ্রীমদনগোপাল গোস্বামি কর্তৃক বঙ্গভাষায় অম্ববাদিত । পৃ. ৩৬

[কলিকাতা, মথুরানাথ তর্করত্ন কর্তৃক প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত । ১৯১৬ সংবৎ ।
অম্ববাদের নমুনা :—

বিকসিত চূত খর শররূপ ।
ভৃঙ্গরাজি ধনুকেতে ছিলার স্বরূপ ॥
মদন আদেশে বসন্ত আইল ।
অখিল ভুবনে জয় করিতে ধাইল ॥
তরু ধরে ফুল জল পদ্মবন ।
অঙ্গনা সকাল হৈল সুরভি পবন ॥
প্রদোষ সুখদ রম্য দিনমান ।
সকলি সুন্দর হৈল একালে সমান ॥
মণির স্বচ্ছতা সরসী আহরে ।
শশীর স্ফটিক কান্তি অবলারা হরে ॥
কুসুমিত চূত আমোদ সংকুল ।
বসন্তে সবার করে হৃদয় ব্যাকুল ॥
কামিনী পরিল স্তনতটেহার ।
চন্দনে চর্চিত করি মরি কি বাহার ॥
বাছ পরে বালা আর বাজুখানি ।
কবিত্ব থাকিলে তুষ্ট হৈতাম বাখানি ॥
কুসুমবরণ জিনি বাসে রাগ ।
বসনে ঝাঁষিছে ধনী পর অম্বরাগ ॥
নিভম্ব উপরে মুখর রসনা ।
বর্ণিতে সে মঞ্জুরব না পারে রসনা ॥
কামিনী কাঁচুলি কুচোপরি পরে ।
সবাকার নেত্রপাত তাহার উপরে ॥

কর্ণে কণিকার অলকে অশোক ।
 হেরিয়া বিয়হিকান্তা স্মরি করে শোক ॥
 নূতন মল্লিকা শোভিত মাতায় ।
 অখিল যুবক চিত্ত বিকারে মাতায় ॥
 জন্তু সহিত বদন সরোজ ।
 মনোহর অঙ্গ পাণ্ডু করয়ে মনোজ ॥
 কোকিল মাতিল খেয়ে চূতরস ।
 প্রিয়ামুখ চুষে ঘন অন্তরে সরস ॥...

—[বসন্তবর্ণনা] ।

বিজ্ঞাপন : ইহা [ঋতুসংহার] মহাকবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে । তাহাতে যে সকল শ্লোক অঙ্গীল ছিল তাহা একেবারেই পরিত্যাগ করা গিয়াছে । আবশ্যকবোধে কোন কোন ভাব পরিবর্তিত ও কোন কোন ভাব নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে ।—সংস্কৃতজ্ঞচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি যে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদিত গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছেন । তিনি এরূপ পরিশ্রম স্বীকার না করিলে আমি কোনমতেই ইহা প্রচারিত করিতে সাহসী হইতাম না ।...২৪এ শ্রাবণ,
 কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৬৭

১৯৩৮ [১৩৪৫]

ঋতু-সম্ভার । হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অনুদিত । সচিত্র, পৃঃ ৫৬, ১২ ।
 কলিকাতা, ১৩৪৫ বুলনযাত্রা ।

[বঙ্গানুবাদ-শেষে মূল সংস্কৃত সংকলিত । শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী অঙ্কিত চিত্র] ।

অনুবাদের নমুনা :—

এলো প্রিয়ে ওই শারদলক্ষ্মী
 বিশ্ব-দুয়ারে সাজি :
 বিকচ পদে শোভিত আনন,
 কাশ বনে দোলে শুভ্র বসন,
 অপরূপ সেই রূপের পরশে,
 নয়ন জুড়াল আজি ।

মাঠে মাঠে তার সোনার বরণ

ছড়াইল শালি ধানে,

কনক-লক্ষ্মী পরিমল সম,

অঙ্গকান্তি মেকি নিকপম !

চরণে বাজিছে মঞ্জু নৃপুং

হংস-কাকলি গানে !—[শরৎ, ১]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সংস্কৃত বিভাগের আশুতোষ অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ. ডি. লিখেছেন ‘পরিচায়িকা’ অংশে : “খ্যাতিমান কবি শ্রীমান হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সহিত ঋতুসংহারের কাব্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারি না। অনুবাদে মূল কাব্যের মাধুর্য ও রসবাস্তি কোথাও ব্যাহত হয় নাই; বরং সহজবোধ্য সাবলীল প্রকাশ-ভঙ্গির ফলে অনুবাদ অতি মনোরম ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ঋতু-সংহারের বাংলা নাম “ঋতুসংহার” কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞাপনে সমধিক উপযোগী হইয়াছে। সমূহ অর্থে সংহার শব্দের প্রয়োগ বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুরূপ হয় না। সংস্কৃত শব্দের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগ পদ্ধতির অনুসারে কবির ভাব প্রকাশ করিতে অনুবাদক কবি কতদূর যত্নবান, তাহা এই নামকরণে দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। অনুবাদের সর্বাঙ্গীণ মৌষ্ঠব সহৃদয় পাঠকমাত্রের নিকট সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।”—১৩৫৬ বুলনযাত্রা।

ঋতুলীলা বা ষড়রূপা বঙ্গদেবী। ত্রীমসয় লাহা। পৃ. ৯৪। [আখ্যাপত্রে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই;] জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকার নম্বর [182. Nd. 917.31]

[কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত]।

উপহার : স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদের নমুনা :—

[‘বসন্ত’ থেকে—]

কনকোজ্জল আনন-কমলে, অলকা-তিলকা লেখা ;

উরমে, মৃতা-মালায় আকারে, শ্বেদ-রেণু দেয় দেখা ।

স্তম্ভ তরী, চপল নেত্রা, কপোলে পাটল-রাগ,
 হংস-গঞ্জিত গমনভঙ্গী, স্ববচনে কি মোহাং ॥৪
 তরুণী-অধর-বারুণী-পরশে, ব্যাকুল বকুল বারে ;
 চরণ রাতুল লভি বজুল, পুলকে মুকুল ধরে ।
 চূত-মধু-পানে রসিক কোকিল, তোষে কোকিলায় প্রাণ ;
 মোহিতে প্রিয়ায়, মত্ত মধুপ, গায় গুঞ্জরি গান ॥৫
 নব কোরকে, তাম্র প্রবালে, ঝলসে আশ্রবন,
 পবন-পরশে, নাচে কি হরষে, দরশে সরসে মন ।
 অশোকে, আমূল পল্লব-ফুল, কি অতুল লালে-লাল,
 তরুণী হৃদয়ে, দয়িত-বিরহ-শোক জ্বলে, কি করাল ॥৬
 মত্ত দ্বিরেধ-চুম্বিত চারু-প্রহ্না মাধবীলতা,
 প্রেমিক-হৃদয়ে জাগায় পীরিতি, কত কি আশার কথা ।
 সন্তোদগত নব মঞ্জরী—কুরুবকে কি মাধুরী !
 বিকাশে কাস্তা-বন্দনকাস্তি সহসা করি কি চুরি ॥৭

কাব্যপরিচয় ॥.....প্রকৃতির উৎসবে মাতিয়া মানুষ্য সেকালে যে উৎসব
 করিয়াছে, একালে যে উৎসব করিতেছে, এই দুই চিত্রই কবি রসময়ের
 তুলীনা কাব্যে দেখিতে পাই। একালের চিত্রগুলি, কাব্যখানির পূর্বভাগে,
 কবির নিজের তুলিতে আঁকা মৌলিক ছবি; আর সেকালের চিত্রগুলি, কাব্য-
 খানির উত্তরভাগে, মহাকবি কালিদাসের তুলিতে আঁকা ছবির প্রতিলিপি—
 ‘স্বতুসংহারে’র পত্নীহৃদ—যত্নাভূত। ‘উজ্জয়িনীর কবি দেড়হাজার বছর
 আগেকার সমাজের পটে যে ছবি আঁকিয়াছেন, এখনকার বাঙ্গলাদেশের পটে
 সে ছবিটির অবিকল প্রতিলিপি আঁকা চলে না; প্রকৃতির রূপের পরিবর্তন ঘটে
 নাই, তবে ওই রূপ-উপভোগে, সেকালে একালে রুচির প্রভেদ ঘটিয়াছে। সেই
 রসের বিচার করিয়াই কবি রসময় সেকালের সকল ছবির সকল অংশেরই
 অবিকল প্রতিলিপি আঁকেন নাই; কিন্তু যাহা চিরদিনের উপভোগ্য, তাহা
 একালের কবির নূতন পটে অতি স্নন্দরভাবেই ফুটিয়াছে। প্রাচীন অক্ষর-ছন্দে
 সাজান সংস্কৃত ভাষার পোষাক খুলিয়া ফেলিলে প্রাচীনতার সৌন্দর্য্য বজায়
 রাখা কঠিন হয়; কিন্তু, কৌশলী কবির মাত্রা-ছন্দে ও মধুর শব্দ-যোজনায়
 প্রাচীনতার মাধুরী নষ্ট হইতে পারে নাই। মাত্রাছন্দের তাল ঠিক রাখিয়া
 পড়িতে না পারিলে কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য, ও অল্পবাদের মাহাত্ম্য অল্পভূত
 হইবে না।...শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। কলিকাতা।

‘কালিদাস’ [নামক একটি কবিতা]

খুলে দেছ বাগ্‌থের অনন্ত ভাণ্ডাব,
হর-পার্বতীরে স্মরি তুমি দেবকবি ;
তব মায়ামন্ত্রবলে, —ভুগ্নম অটবী
ধরে যে নন্দন-কান্তি,—আনন্দ মন্দার ।
তোমার প্রতিভা-জ্যোতি—সুধা চন্দ্রমার,
অথচ, প্রতাপে তুমি, কবি-কুল-রবি ;
তব কাব্যকুঞ্জে বহে সদ্ভাব জাহ্নবী,—
মানসে মধুর প্রীতি করিয়া সঞ্চার ।

বিনয়ে অজ্ঞেয় তুমি কৃতী কালিদাস,
কবিগুরু বাল্মীকির ভক্ত মহামতি ;
বামনের চাঁদে হাত,—আমার প্রয়াস,
তোমার শরণ বিনা নাহিক যে গতি ;
স্নেহ দৃষ্টে হের যদি—এই অভিলাষ,—
‘ঋতু সংহারে’র ছায়া—ঋতু-ঋতু প্রতি ॥

[অজ্ঞাত]

ঋতুসংহার । [আখ্যাপত্র বিনষ্ট] পৃ. ২৪

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত]

অনুবাদের নমুনা :—

প্রিয়ে ! আশ্রের প্রফুল্লমুকুলরূপ তীক্ষ্ণশরধারী, ভ্রমরপংক্তিরূপ ধলুগুণ-শোভিত
বসন্তবীর বিলাসেচ্ছুগণের মন বিদারণ করিবার জন্তু সমাগত হইতেছে ।^১

এখন বৃক্ষসকল পুষ্প সুশোভিত, সরোবরসলিলে পদ্ম বিরাজিত, রমণীয়া
ভোগলোপা, বায়ু সৌরভপূর্ণ, সন্ধ্যাকাল সুখদ ও দিবসগুলি রমণীয় । প্রিয়ে !
বসন্তকালে সমস্তই শোভাময় ।^২

এই সুখ বসন্তকালে সরোবরসলিলকে, মণিমেখলাকে, চন্দ্রকিরণকে,
স্ত্রীলোকদিগকে কুসুমমত আশ্রবৃক্ষগুলিকে সৌভাগ্য দান করে, অর্থাৎ এই
সময় ইহাদের শোভা বর্ধিত হয় ।^৩

এই সময় আগত হওয়াতে বিলাসিনীরা কুসুম রঙ্গে রঞ্জিত বসন পরিধান
এবং নিত্য ও বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া শোভা বৃদ্ধি করিতেছে ।^৪

এই সময় রমণীগণের কর্ণভূষণযোগ্য নবকণিকার পুষ্পে ও কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল
অলকাকোষে অশোকপুষ্পেও বিকশিত নবমল্লিকায় শোভা আবিস্কৃত হইয়া
থাকে ।^৫

—[বসন্ত বর্ণনা] ।

(ক্রমশঃ)

পথ চলে গেছে

সমর সোম

॥ ৫ ॥

উদয়পুর

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

উদয়পুরের সৌন্দর্য খুঁজতে শুধু আসিনি। ইতিহাস ও সমাজ উভয়কে পাশাপাশি দেখতে চাই। অতীতের লাভণ্য গ্রান হয়ে আসছে। ভবিষ্যতের কি হাল? ডাঃ মোহন সিং মেহতা, স্বইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত, শুনেছিলাম এখানে এক আদর্শ শিক্ষানিকেতন গড়েছেন। শোধনাগার থেকে বেরিয়ে ছুটি শিক্ষানিকেতনের দরজায়। উনিশশো একত্রিশ সালে এর সূত্রপাত হয় বেসিক স্কুল হিসাবে। আজ গাঁন্টিপারপাস্ হায়ার সেকেণ্ডারি ধাপও পার হয়ে গেছে। শ্রী মেহতার আদর্শবাদ সাধু। চরিত্র ছাড়া শিক্ষা অর্থহীন। চরিত্র শব্দটার অর্থ যে ভয়ানক ব্যাপক, সমস্ত চিন্তা ও কৰ্মের, শৃঙ্খলা নিয়ে যে চরিত্র উঠে দাঁড়িয়েছে ডাঃ মেহতা এই কথাটিই বোঝাতে চান। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই শিক্ষাকে রূপ দেবার সংকল্প এখানে রয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল সামান্য ছাত্র নিয়ে—সন্তর-আংশীজন। বেতনের হার ছিল তিন থেকে পাঁচ টাকা। দেখা গেল ছাত্রদের অভিভাবকদের পক্ষে এ পরিমাণ বেতন দেওয়ার ক্ষমতা নেই। প্রতিষ্ঠানের আনুযায়িক খরচ কমিয়ে বেতনকে নামিয়ে আনা হোল এক টাকায়।

আজ অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে ব্যবস্থার অনেকখানি। সেদিনকার অনাড়ম্বর জীবনে আজ লেগেছে সমৃদ্ধির প্রলেপ। সারা বাড়ীর, এলাকার নক্সাখানাই আমেরিকার হাঁচে। ছাত্রদের বেতন সেখানে নির্ভর করে অভিভাবকের আয়ের ওপর। কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, কমপক্ষে আড়াই টাকা এবং সর্বাধিক পনেরো টাকা বেতন ছাত্ররা দিয়ে থাকে।

ব্রতীবালকের গ্রুপ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন শিক্ষাব্রতী ডাঃ মোহন সিং। এখনো গ্রুপ আছে। এক একটি গ্রুপের ভার নিয়ে রয়েছেন এরা একজন শিক্ষক। ছেলেদের তাঁরাই বন্ধু, তাঁরাই অগ্রজ, তাঁরাই পিতৃতুল্য। এমনি ব্যবহার। প্রতি তিনমাসে এই সব গ্রুপ-শিক্ষকরা অভিভাবকদের

সঙ্গে একত্র হন ; পরামর্শ দেন এবং পরামর্শ নেন। দুপুরের খাবার দেখলাম ছেলেরা এখানেই খায়।

এই খাওয়ার ব্যাপারটা কেমন যেন কাঁটার মত মনে বেঁধে। অভিভাবকের সঙ্গতির ভেতর বৈষম্য আছে এবং থাকবে। কিন্তু সে বৈষম্যের ছোঁয়া এখানে ঢুকতে না দেওয়াই ভালো। কোন ছাত্র কত বেতন দেয় তার হিসাব সে ছাড়া অল্প কেউ জানে না। কিন্তু কার খাবার ডিবাতে কি খাবার আসছে তা পাশাপাশি বসেই তারা লক্ষ্য করে। এ ছাড়া খাওয়া নিয়ে জড়িত আছে স্বাস্থ্যগঠনের সমস্যা। সাধারণতঃ সব পরিবারেই দেখেছি স্বাস্থ্যর চেয়ে রসনার তৃপ্তি হয় আহারের লক্ষ্য। এই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যায়সেই দুপুরের খাবার-ব্যবস্থা শিক্ষায়তনে হতে পারে। রসনার রুচি পরিবর্তন হওয়ার পথও সূক্ষ্ম হয়ে আসে অন্ততঃ একটা ইঙ্গিত তো সামনে ধরা যায়। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে—হায়ার সেকেন্ডারীর চারশো ও বেসিক বিভাগের দেড়শো ছাত্রের জন্য আয়োজন মানেই মস্ত ঝামেলা। কিন্তু ঝামেলা তো সব কাজেই আছে। ঝামেলা বইবার ক্ষমতা স্বাদের আছে তাঁরাই তো এসে থাকেন সমাজসেবায়।

এ প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন সত্যকারের গুণী রয়েছেন যেমন শ্রীশ্রীমালি ও শিল্পী গোবর্ধনলাল যোশী। শ্রীমালি লেখক হিসাবে নাম কিনিছেন, পণ্ডিত বলে খ্যাতি পেয়েছেন আর বন্ধুবর যোশী তাঁর ভীলদের উপর পেণ্টিংস-এর জন্য স্বনামধন্য। শ্রীগোবর্ধনলালের কথা আগেই আলোচনা করেছি।

মাথার ওপর সূর্যের তাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। উদরে ক্ষুধারও বটে। ভাল লাগছে না আর কোন তত্ত্ব। সব আদর্শের আদি এবং অন্ত উদর। উদর তাই সভ্যতার সহোদর। উগ্রসিংজীও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

• সেদিন দুপুর শুধু বিশ্রামের। পথে পথে বিশ্রামহীন দেহ ছুটে বেড়িয়েছে। একটানা ক্লান্তি জমেছে পেশীতে। কিন্তু ঘুম আর আসে না। আজ যে দশমী। বিজয়া-দশমী।

রোদ পড়বার আগেই পৌঁছাই স্বরূপসাগরে। এখানে গঙ্গা নেই, নেই সেই নীল যমুনা ; রয়েছে তো তবু সবুজ কাঁচের মত স্বরূপসাগর। মহারাজা স্বরূপ সিং এই বিশাল কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করে গেছেন। হ্রদ হয় উনবিংশ শতাব্দীতে আর যে ঘাটে গিয়ে দাঁড়াই তার নির্মাতা মহারাজা ভূপাল সিং ; হাল-আমলের মহারাজা তিনি, তবুও অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেছে।

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে স্বরূপসাগর। বহু মহারাজা একে

মাজিয়েছেন। স্বরূপসাগরের আগে থেকেই। হৃদযে কত সুন্দর হতে পারে, হৃদের এ অপূর্ব শোভা যে এ ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে তা তো জানতাম না। হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে ডালহুজের কথা। কিন্তু কোথায় লাগে ডাল! উত্তর কোণ থেকে ঝরঝরিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে পাহাড় চিরে প্রপাত। পাহাড়ের কোল দিয়ে ঘুরে ঘুরে মাইলের পর মাইল চলে গেছে। প্রপাতের নাম ‘চাদর-পানি’।

দীর্ঘ পাঁচ মাইল-নৌকা ভেসে চলে আমাদের। ঘাটে ঘাটে নতুন নতুন নামকরণ হয়েছে হৃদের। স্বরূপসাগর পার হয়ে নগর-প্রাচীরের কোল ঘেঁষে ছলছল করছে রঙ্গসাগর। বাঁধের গলিপথে দাঁড় তুলে নিই। মাঝি হুঁসিয়ারি দেয়। বাতাসের টানে নৌকা ভেসে যায় রঙ্গসাগরের বুক।

রাজস্থান যে এতো সুন্দর এ ধারণা ছিল না। চারণকবি আর ঐতিহাসিক মানব-চরিত্রের একটা দিক এই মাটিতে উজ্জ্বল করে ধরেছেন—কিন্তু এ বিলাসিনীর তো সন্ধান দেন নি। জলেস্থলে এর যাত্রার মেখলা যে এমনভাবে ছড়ানো—তার খোঁজ লোককে দিতে হবে। এখানে হৃদয় দিয়ে নিঃস্ব হতে হয় না। ওই তো সাগরের জল শের সূর্যের আলোয় বলমল করেছে। আরাবলী পাহাড়ের আড়ালে ডুবে যাচ্ছে সূর্যদেবতা। রক্তরাগে রঙীন হয়েছে সঙ্গিনীর মুখ...হৃদের জল...নৌকার বৈঠা...প্রাসাদের প্রাচীর। দাঁড় আর টানতে চায় না মন।

এপার ঘিরে আছে ছোট ছোট কুঞ্জ...অরণ্যের মন্ডর শ্যামলিমা, সাগরের কাছে গাগরীর আনাগোনা। ওপারে মুখ কেরাতেই চোখ ঝাঁপায়—সমারোহ। স্থাপত্যশিল্পের দীপসজ্জা! স্বেতপাথরে, রক্তপাথরে, বেলে-পাথরে তীরভূমি এলায়িত। আজ কোথায় পাব এমন কারিগর? আজ স্থপতি যে ইঞ্জিনীয়ার! কথাটা কেবলই ভুলে যাই। ভোলায় অবশ্য কারণ আছে। ছক আর ছাঁচ, চিন্তাহীন কর্মমূল্য ও অভ্যাসকে বড় বলে মানতে পারি না। আজকের ইঞ্জিনীয়ারের অন্তঃকরণের জড়ত্বই তাকে শিল্পমূল্য বর্জিত করতে বসেছে। রঙ্গসাগরে নতুনভাবে একথা উপলব্ধি করি।

রাজপুতানা প্রাসাদপুরী। অঙ্গুর স্বপ্ন পাথরে আর উত্তাপে ভাঙলেও তার জলশোভা অপূর্ব! অনেক প্রাসাদ দেখেছি, বহু ছড়ানো জলস্রোত দেখেছি কিন্তু জলের বুক চিরে ভেসে-ওঠা প্রাসাদ কোথাও পাইনি। মোহনদেবী পরিচয় করিয়ে দেন।—‘শঙ্কুনিবাস’!!...মহারাণী শঙ্কু সিং।

স্বেতমর্মরের কোল ঘেঁষে ছলছে জল-বিহারের কত তরণী। ভাসছে

উদয়পুর মহিষীদের বজরা। ইচ্ছা হয় রেশমের পর্দা সরিয়ে একবার দেখে আসি রাজপ্রাসাদের মধুমালতীদের। বৈঠা তো নিজের হাতে। একটু পাশে শুধু নৌকোটা ঠেলে দেওয়া! যাবে না?

মাঝি বাধা দেয়!

মুসাফিরকে বিপদে ফেলতে পারে না। আইন আমি জানতে না চাইলেও সে জানায়। ও-তীরের শ্বেতমর্মরের দিকে হাত বাড়াবার কোন অধিকার নেই সর্বসাধারণের। আভিজাত্যের সিংহদ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা শুধু অবাক হোক। ঘনিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য নিয়ে তো জন্মাই নি। ফিরে চলতে হয়। চোখের সামনে ভেসে আসে আর এক সারি নতুন প্রাসাদ। মহারাজ জগত সিংয়ের—জগনিবাস। গ্রীষ্মের খরদাহে এই জগনিবাস ছিল তাঁর বিশ্রামের ঠিকানা। শত্নুনিবাসের ছবি হাল্কা হয়, বজরার ঔৎসুক্য এক প্রশান্তিতে আত্মগোপন করে।

এই বোধ হয় জীবনের নিজস্ব নিয়ম। আবর্তের বাঁধন না কাটলে বাঁচার আনন্দ পাওয়া যায় না। এক আকর্ষণের বহু বাহকে হার মানিয়ে মাথা তোলে আর এক নতুন আকর্ষণ। শত্নুনিবাসের পর জগনিবাস...তারপর—আরো...আরো কত নিবাস আছে সামনে। মানসিক ক্ষতগুলি সহজ ভাবে এমনি করেই মিলিয়ে যায় এবং যাবেও।

উদয়নাগর, রঙ্গনাগর, স্বরূপনাগর হয়ে একটানা উচ্ছল জলপ্রবাহ যে পথ গড়ে তুলেছিল তার শেষ হয়। রক্তস্রবের শেষ আলোকে আমার মানস-সঙ্গিনী, স্বপ্নসঙ্গিনীরা চারিপাশে ভিড় করে আসে। আর-সব সঙ্গিনীই পাশের একটি মুখে প্রতিফলিত করে তাদের সব আঁশা-আকাজ্জা। ছোটবেলা থেকে জল আমাকে টানে, পাঁহাড় আমাকে মুগ্ধ করে, অরণ্য স্বপ্ন রচনা করে। জুনপদে বাস করে প্রথম যৌবনের বহু পূর্ণিমার রাতে স্বপ্ন দেখেছি ভেনিসের। স্বপ্ন দেখেছি গণ্ডোলায় ভাসছি। কে যেন পিছনে দাঁড়িয়ে ব্যালালাইকা বাজাচ্ছে। আকাশে নীল চাঁদ। সেই চাঁদের অলোয় জলটা ক্রমশঃ রহস্তময় হয়ে উঠছে। আর সেই রহস্তের আড়াল থেকে আমার নিঃসঙ্গ এই জলযাত্রায় কার রিণ রিণে একটা গানের সুর হাল্কা হাল্কা ভাবে ভেসে আসছে। তাকে দেখতে পাইনি। ছুঁতে পাইনি। শুধু চাইতে শিখেছি।

আজ তাই সঙ্গিনীকে একবার ভালো করে দেখি। ও গান গাইছে। ‘যদি জীবন পূরণ নাই হোল মম তব অক্লপণ করে...’।

ভাসতে ভাসতে জগনিবাসের গঠনশৈলীর দিকে আর একবার তাকিয়ে

দেখি। হঠাৎ কি যেন একটা অল্পভূতি বুকের মধ্যে ডেলা পাকায়। চিরবিরহী শাজাহান হুজ্জ দেহে আশ্রা ফোর্টের সেই বন্দীগৃহ থেকে দেওয়ালের পাথরে তাজের প্রতিমূর্তি দেখছেন। শেষ জীবনে যে তাজকে তিনি হুজ্জ দেহে দেখিলেন। সেই তাজকে জীবনে প্রথমে কি জগনিবাসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন?

সোহনদেবী আমার দৃষ্টির অর্থ দূরে বসে অনুমান করতে হয়তো পেরেছিলেন। হঠাৎ বলে ওঠেন—বাপের সঙ্গে বিবাদ করে শাজাহান এখানে এসে প্রথম যৌবনে কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন সোমজী। কি দেখছেন? জগনিবাসের সঙ্গে তাজের মিল?

জল যত ফুরায়, স্বপ্ন তত হারিয়ে যেতে থাকে। তীরের যত কাছে আসি বাস্তব জীবনের দৈন্ত তত আঘাত দেয়। সংসারের এইটাই নিয়ম বুঝি। স্বপ্নের সৌন্দর্য আর বাস্তবের রুচতার মধ্যে মানুষকে অহোরহ যন্ত্রণা পেতেই হবে। দৈন্ত মানুষকে রুচিহীন করে তোলে। কতখানি? তার উপলব্ধি আরো প্রখর হয় তীরে পৌঁছে।

ঘরে ফিরে আসি।

ঘর কোথায়! এ শুধু আশ্রয়। রাতের আশ্রয়। ঘরের নিঃসঙ্গতা এখানে নেই। নির্জনতা নেই। নিজেকে নিয়ে ভাববার সময় বড় অল্প। বিশেষ করে জনজীবনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চারিপাশে কেবল ভিড়। সব সময় একটা না একটা সমস্যা তাদের মুগ্ধ নেবেই। তারা ভাবে, কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়ে।

আমি কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভাবতে চাই। দূরে—ছাদের এককোণে পথের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। জায়গাটা বেশ উজ্জ্বল। ওখানে বসে ডায়েরিটা লিখতে থাকি। হঠাৎ মনে পড়ে সেই ছেলোটর কথা যে কয়েক বছর আগে একদিন কেমন করে যেন হারিয়ে গেল। মনে পড়ে কল্যাণীর কথা। মেয়েটি ওকে কোনোদিনই ভালবাসতো না। কিন্তু ও হারিয়ে যাবার পর সে চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করলে।

মনে পড়ে এমনি এক আলো-করা রাতে ছাদের এককোণে বসে কল্যাণী কাঁদছিল আর বলছিল, ‘মানুষ এতো কাপুরুষ কেন দাদা? সে পালিয়ে যায় কেন? সে আত্মহত্যার কথা ভাবে কি করে? আর যার জন্তে সে দোষী নয় সে এতবড় শাস্তি পাবে কেন? বাদল তো কোনদিন কিছু জানায়নি। আমাকে তো সে জানতে চায়নি। নিজের মনটাকে আমার

অজ্ঞাতে আমার উপর আরোপ করে কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকে তাতে আমার কি দোষ !’

বাদল নেই। কল্যাণী কাঁদে। এই আলো-করা রাতটা তার মনের অন্ধকারে কেমন যেন মিলিয়ে যেতে থাকে। কল্যাণীর কথা মনে পড়ছে আজ বড় বেশী করে। উদয়পুরে কি একটা কাজ নিয়ে বাদল চলে এসেছিল। এখানেই সে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর সময় সে শুধু লিখে গিয়েছিল—‘আমাকে কেউ চাইলে না! তুমিও না। উদয়পুর পালিয়ে এসেও শাস্তি পেলাম না। তোমার শহরেও ফিরে যাবার সাহস নেই। কাজেই বুঝতে পারছি না কি করব। কোথায় যাব। কিন্তু যেতে আমাকে হবেই!’

এই শহরে কোন একটা বাড়িতে, কোন একটা শয়ান শুয়ে বাদল পালাবার কথা ভেবেছিল। শুয়ে শুয়েই সে পালিয়ে গিয়েছিল।

পথের দিকে তাকাই।

এমন করে তাকাই যেন আমি দেখতে পাচ্ছি—বাদল ছুটে পালাচ্ছে। জীবনের পত্রপুষ্পের সমারোহের মধ্যে দিয়ে অন্ধের মত সে ছুটে পালাচ্ছে।

মনে মনে বলিঃ বাদল, তুমি মূর্খ। চোখ খুলে পৃথিবীটার দিকে তাকালে না কেন!

রাত্রি থম থম করে। মনটাও ভার ভার হয়ে থাকে।

পৃথিবীতে আনন্দের ভার দেওয়া যায় অল্পকৈ। দুঃখ নয়। দুঃখ লালিত হয়, রক্ষিত হয় মানুষের নুকে, গোপন কোণটিতে। ইতিহাসের স্রোতটাকে ছাপিয়ে অভাগা বাদল আর দুঃখী কল্যাণীর অতীত কাহিনীটা সে রাতে বিষাক্ত একটা সাপের মত আমাকে জড়িয়ে ধরে মোচড় দেয়।

কখন যেন ঘুম এসেছিল। কখন যেন রাত শেষ হয়ে গেছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে। বাইরে জীপটা এসে দাঁড়িয়েছে। সূর্যের আলো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে, তাসিয়ে দিচ্ছে আকাশ থেকে পৃথিবী।

সাড়ে আটটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জীপে উঠে বসি। জীপটা এগিয়ে চলে একলিঙ্গজীর মন্দিরের দিকে।

পথের দুপাশে কখনো মাথা তোলে সবুজ বাজরার ক্ষেত কখনো বা নামে পাহাড়ি বর্গা। কোথাও বা পাহাড়ের কালো ধূসর ছায়ার পাশ ঘেঁষে ছড়ানো মাঠে হাল চষে কিষান। ক্ষেতের পাশে পথের ধারে কাঁটা-মনসার বন। ভীল মেয়ে তার ঘাগরা হাঁটুর উপর তুলে ঘাস কাটে।

জীপটা এগোতে এগোতে পাহাড়ের বাক ঘোরে।

এবার একটা উপত্যকা।

নাথদ্বারা রোড এসে পৌঁছয় একলিঙ্গের রাজত্বে।

একলিঙ্গের রাজত্বে প্রবেশপথের সামনেই ঝিলের সবুজ জল। মেঘেদের ছায়াগুলো ঝিলের বুক ভাসছে। দেবতার রাজ্য-সীমানা সারা রাজস্থানে লক্ষ রাজপুতের বুক জুড়ে থাকলেও এখানে একটা ভৌগোলিক বৃত্ত দেখি। ফরাসী চন্দননগরে চোকবার মুখে যেমন এক ফটক ছিল এখানেও সেই ফটক। মহাকালের গ্রহাণু প্রবেশপথ জর্জরিত। একলিঙ্গজীকে ঘিরে বসেছে ছোটখাটো একটা মফঃস্বল গ্রাম।

মন্দির তীর্থস্থান। দেশ-দেশান্তরের যাত্রীরা আসছে। কেউ কোর্ড ক্রাইসলারে, কেউ জীপে, কেউ বা বাসে চড়ে। সাধারণ যাত্রীবাহী বাসের একটা বিরাট আড্ডা প্রবেশপথের বুক। তীর্থের মেলা আছে। পণ্য আছে। কেনাবেচাও চলেছে। সঙ্গিনী রাজপুতানীর গলার মালা কিনতে চায়। কিন্তু বুঠো মালার বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি!

ভূদান-কর্মী মোহনজী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। রাজস্থানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী হীরালাল শাস্ত্রী রাজ্যশাসন ছেড়ে ভূদান আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্তে তার সঙ্গী-সাথীরাও অধিকাংশ ভূদানে যোগ দিয়েছে। আমাদের এই পর্যটনের দিন-পঞ্জিকা তৈরী করেছেন গুঁরাই। সব দ্বায়-দায়িত্ব গুঁদের। আমরা কেবল মন মেলে চোখ খুলে দেখে চলেছি। দর্শনীদের যা কিছু অবোধ্য তার উত্তরও গুঁদের মুখে।

মোহনজীকে জিজ্ঞাসা করি—দেবতা একলিঙ্গ হলেন কেন? পাথরের এই শিবলিঙ্গ তো শিবলিঙ্গই হতে পারতেন। বাপ্পা রাণ্ডের ভাগ্যদেবতার নামের বৈচিত্র্য একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ছোটবেলায় রাজপুত শিভালরী পড়ার সময় এ প্রশ্ন একবার জেগেছিল। আমার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ক্লাশরুমের রুটিন-বাঁধা পড়ায় ইংরেজীটার বাংলা অর্থ বিশদ করে বুঝিয়ে দেবার জন্তেই বোধহয় তিনি ছিলেন। উত্তর পাইনি। আজ একলিঙ্গের সাক্ষাৎ-দর্শনে সেই পুরাতন প্রশ্নটা আবার মাথা তোলে।

মোহনজী শিক্ষকের মত মুখ ভার করে প্রশ্নটা এড়িয়ে যান না। একলিঙ্গ তাঁর কাছে জীবিকার প্রসঙ্গে আসা কোন বিষয় নয়। একলিঙ্গ তাঁর ঐতিহ্য। তাঁর রক্তের উদ্ভাদনা। বলেন—বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। একলিঙ্গ তাঁদেরই একটি।

শৈব মন্দির। কাজেই নন্দী-ভৃঙ্গী থাকবেই। তাছাড়া বৃহদাকার ছুটি পাথরের হাতিও চোখে পড়ে মন্দিরের দ্বারপথে।

এ মন্দিরের এক মাইল দূরে বাপ্পা রাওল-এর স্মৃতিস্থান। এ গ্রামের নাম কৈলাসপুরী।

মন্দিরের দিকে তাকাই।

ন'শ বছরের স্থপ্রাচীন মন্দিরে পাথরের গাঁথুনি আজো শক্তভাবে দাঁড়িয়ে। ইংরেজ একবার ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শিব-সহচর নন্দী-ভৃঙ্গীরা ইংরাজকে বাধা দেয়। ইংরেজের হাত মন্দিরগাত্রে পড়তে দেয়নি।

এই প্রতিরোধের গল্পটি গল্প কিনা, তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কিনা জানি না তবে লোক-মুখে শুনি পিতলের ওই নন্দীর মুখ থেকে নাকি অকস্মাৎ হাজারো ভোমরা ছুটে বেরিয়ে আসে। অস্ত্রযুদ্ধে অশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যকে তাদের রাইফেল-বন্দুক থাকলেও পর্যন্ত করে।

চলতে চলতে একটি পুরোনো ড্রামও দেখতে পাই। বহু কালের আলো-বাতাসে ঝড়-বৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায় মেটার উপর প্রাচীনত্বের ছাপ খুব স্পষ্ট। একলিঙ্গ মন্দিরের পূজা-পার্বণে এ বাতাসটির বৃকে গন্তীর শব্দ ওঠে। রাজপুত-চরিত্রের গাঙ্গীর্যের স্বর এ শব্দে ভরা।

একলিঙ্গজীর প্রধান মন্দির ব্লাদ দিলেও মন্দির-এলাকার মধ্যে আরো একশ' আটটি মন্দির চোখে পড়ে। আজ বাপ্পা রাওল নেই কিন্তু আছেন একলিঙ্গজী। বৃকের রক্ত দিয়ে কেউ পুজো করে কিনা জানি না, তবে শত অনাদরের মধ্যেও ভক্তরা আসে। জীবনে অনেক ছোটখাটো কামনাপূরণের জন্য একলিঙ্গের মন্দিরদ্বারে তারা দিনরাত এক করে দেয়।

মন্দির-এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসি। বাপ্পা রাওলের পুণ্যস্মৃতি-জড়ানো মন্দির পেরিয়ে আসি বিংশ শতকের মালুখ। বাপ্পার তরবারির স্থান আজ গ্রহণ করেছে এটম। আজ তরবারি দিয়ে শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে না। এ যুগ একশ' মেগাটনের, এ যুগ মিসাইল-এর। তবু চারিদিকের পর্বতমেথলার দিকে তাকিয়ে বাপ্পার অশঙ্কর-ধ্বনি শোনার জন্তে মনের আর্তি তেলে মেলায় না।

ভারতের সেই বীর যোদ্ধারা কোথায়? আমাদের মধ্যে আবার তাদের দেখার কামনা আজো কেন আসে? যুদ্ধ তো আমরা চাই না। যুদ্ধের জন্তে বাপ্পাদের খুঁজব না। খুঁজব নিজের মর্যাদা টিকিয়ে রাখবার জন্তে। খুঁজব দেশকে সব চাইতে বড় করে ভাববার জন্তে। ক্লীবতা, আত্মস্থপারায়ণতা,

লোভী সমাজজীবনে এক আদর্শ স্বার্থবিমূখ ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের জন্তেই সারা মন যেন শত শতাব্দী পিছিয়ে গিয়ে বাপ্পাকে দেখতে চায়, পেতে চায়।

একলিঙ্গকে প্রণাম করে জীপে উঠে বসি।

জীপ ছোটো।

মোহনজী বলেন—রাজস্থানে অভাব কি ! রূপো আছে, তামা আছে, সীসা, অল, কয়লা সব আছে। পাহাড়ের নীচে ঘুমিয়ে আছে যুগ যুগান্তের সম্পদ। মকরাণা পাথর কোথায় পাবে লোকে রাজস্থান ছাড়া ? তাজমহল, দিলওয়ারা, জুমা মসজিদ—রাজস্থান না থাকলে মাথা তুলতে পারতো না সোমজী।

—কিন্তু তবু তো মানুষের ক্ষুধা মেটেনি।

—ক্ষুধা ? মোহনজী ভাবতে বসেন।

ই্যা ক্ষুধার অন্ন, পরনের আচ্ছাদন, রোগে ওষুধ, শিক্ষা, উপযুক্ত জীবিকার অভাবে সব সম্পদ ক্রীহীনতায় হারিয়ে যাচ্ছে না কী ?

—ওটাকে একটা সমাজের এক যুগের বৈষম্য বলে ভাবতে হবে আপনাকে। দেশ স্বাধীন হয়েছে বহু বহুর পর। স্বাধীনতার মুখে বহু আবর্জনা শ্রোতকে ছেয়ে ফেলেছে। তাই তীরের উপর সেই আবর্জনার আধিপত্য। একটু অপেক্ষা করুন।

দীর্ঘ দিন মানুষ, যতই আশাবাদী হোক না, অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।

মোহনজীর কথা শুনে মনে পড়ে যায় কেদারনাথের পথে এক যাত্রা-সহচরের কতকগুলি কথা। গুপ্তকানী ছাড়িয়ে হাঁটা পথে চলেছি। পাহাড়ের, সংকীর্ণ পাথুরে পথ। খাড়া চড়াই। জুধারে পর্বতের আর খাদের বিস্তার।

পথ-সঙ্গী কুমায়ণী নিঃশব্দে চলেছে।

হঠাৎ দেখি একটি ঘোড়া পাশে ভূট্টার ক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছে। বুঝি অসুস্থ। ওর পেট ফুলে গেছে। মালিক অসহায়। কিছু করবার নেই। মৃত্যু পর্যন্ত ঘোড়াটা পড়েই থাকবে। একটা পশুর ডাক্তারও কি ঐ অঞ্চলে কোথাও নেই ? জানতে চাই।

কুমায়ণী সহচর বলে—ই্যা, ডাক্তার ! আমরা বোঝা তোলা জানোয়ারের মতই বাঁচি সাহেব। ওসব শুনেছি সমতলে আছে।

—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তো তোমাদের উন্নতির জন্যে সরকার লক্ষ্য দিয়েছে !

কপালের ঘাম মুছে নেয় সহচর। একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—
ওই দূরে পাহাড় দেখছ সাহেব? ওখানে গায়ে গায়ে পাইপ নজরে পড়ছে?
হ্যাঁ, ওগুলো ছ'মাস ধরে খেটে আমরা লাগিয়েছিলাম একটু ভালো জল পাবার
জন্তে।

—জল তো পেয়েছ!

—না সাহেব, বছর যেতে না যেতেই ফুটো হয়ে গেছে পাইপ। পাইপ
কি ফুটো হয়েছে! আমাদের ভাগ্যই ফুটো হয়েছে বলুন! ছ'মাস রুজি-
রোজগার ছেড়ে চাষ-বাঁস ছেড়ে বুকুর রক্ত ঢেলে পাহাড়ে ওই পাইপ আমরা
টানি।

আজ মোহনজীর কথা শুনে সেই তীক্ষ্ণ বিষাদের ছায়া ঢাকা মুখখানা তার
ঝাঁঝালো বেদনার্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

গাড়ি ছোটো।

সঙ্গিনী ক্যামেরা দিয়ে কি যেন ধরবার চেষ্টা করছে। গুণগুণ করে গান
গাইছে। তার গানের রেশটা মোহনজীর কণ্ঠায় কথায় ফিকে হয়ে যায়।
মনে হয় ওই পাহাড়ি বাবুজীর তীক্ষ্ণমুখ কাঁটাগুলোর মত জীবনকে ক্ষতবিক্ষত
করার জন্তে সমস্তার শেষ নেই।

মোহনজী আবার বলেন—ওই যে পাথরের বিরাট নন্দীটা দেখলেন না...

—কোথায়? স্বত্র ছিঁড়ে গেছে চিন্তার। নতুন করে ভাববার চেষ্টা
করি মোহনজীর কথা শুনে।

—একলিঙ্গের মন্দিরে!

—তাই বলুন।...

—ওই নন্দীকে ভাস্কর্য চেষ্টা থেকে থেকে হয়েছে। লোকে ভেবেছে ওর
মধ্যে অনেক ধন-ঐশ্বর্য নুকোনো আছে।

মোহনজী উদয়পুর থেকে ছ'মাইল দূরত্বের একলিঙ্গ মন্দিরেই পড়ে থাকেন।
সঙ্গিনীকে একলিঙ্গের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কথা বলেন। এই পুরোহিতদের
লোকে বলে গৌঁসাই। শিবের উপাসক, একটি শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গের
পুরোহিত শৈবসাধক। তিনি কি করে বিষু-উপাসকদের উপাধি পেতে
পারেন, গোস্বামী হতে পারেন সেটা ঠিক সঙ্গিনী বুঝে উঠতে পারেন না।
মোহনজী কিন্তু অত কথা ভাবতে রাজী নন। তিনি একলিঙ্গের ইতিহাস
নিয়ে ব্যস্ত। তারই স্বত্র ধরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—মেবারের রাণারা এই
একলিঙ্গের দেওয়ান। দেবস্থানের আশপাশের চব্বিশটি গ্রামের মালিক এই

দেবতা। এই চব্বিশটি গ্রামের ঐশ্বর্য ভোগ করেছেন দেবতা। হাসতে হাসতে তাকে মন্তব্য করতে শুনি—“নিজে না করলেও পুরোহিতরা তো করেছে! দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে ‘মাহুযই’ নিজে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করে বহিন্।”

জীপখানা মোহনজী নয়। ওটা শুধু এগিয়েই চলে। নাথদ্বারাও এগিয়ে আসে। মোহনজী একলিঙ্গের স্মৃতিচারণে পড়ে থাকলেও আমরা নাথদ্বারায় পৌছই। জীপ থেকে নামি।

নাথদ্বার.....

নাথের দ্বার....

রাধানাথের গৃহদ্বার।

উদয়পুর থেকে বাইশ মাইল দূরে আমরা চলে এসেছি।

বনাস নদীর দক্ষিণকূলে এই জনপদে রাণা রাজসিংহ রাধানাথকে রথ থেকে নামিয়ে ছিলেন।

চিন্তা কথা ও কাজ ভারত সেবায় আজ।

অনেক দিনের কথা। মনে হচ্ছে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দ হবে।

নাগাজী বাদশাহ ঔরঙ্গজেব ধর্মের অচ্যুতাসনই জানতেন। দীন-ইলাহীকে ধর্মাস্কতায় টেনে এনে ধর্মকে তখন ভয়াবহ করে তুলেছেন। হিন্দু মন্দির বিগ্রহ তাঁর চক্ষুশূল। কালাপাহাড়ের মত কেবল ভাঙ্গতে চাইছেন।

মথুরার কৃষ্ণমূর্তি তিনি সইতে পারেন না কোন মতে। মথুরা জেলার অসংখ্য কৃষ্ণমূর্তি কোনটাকেই প্রায় রাখবেন না ঠিক করে ফেলেছেন।

তাদেরই মধ্যে একটি বিগ্রহ ছিলেন—যাকে বলা হোত ‘শ্রীনাথ’।

উদয়পুরের রাজশয্যা গুয়ে রাজসিংহ স্বপ্ন পেলেন, শ্রীনাথের ডাক শুনলেন। দেবতা হাত বাড়িয়ে আছেন—চলো, আমাকে নিয়ে চলো রাজসিংহ! ঔরঙ্গজেবকে আমায় ছুঁতে দিও না!

স্বদেশিক রাজসিংহ ঘুম ভেঙ্গে অসময়ে জেগে উঠলেন।

আদেশ হোল শ্রীনাথের জন্তে রথ প্রস্তুত হোক। আয়োজন হোল রথযাত্রা সমারোহের।

কুম্ভমূর্তিকে রথে নিয়ে রাজসিংহ ফিরে আসেন।

কিন্তু, ফিরে সম্পূর্ণভাবে উদয়পুরে আগতে পারেন নি। পথে একটা জায়গায় (গ্রামখানির নাম সিয়ার) রথের চাকাটা হঠাৎ বসে গেল। গ্রামের লোকেরা রথের চারিপাশে হরিধ্বনি দেয়। সকলের ধারণা হয় দেবতা এখানেই নামতে চাইছেন।

দেবতার অভিপ্রায়।

মন্দির প্রস্তুত হয়। শ্রীনাথেরই মন্দির। স্থাপত্যে, প্রসারে রাণা রাজসিংহ একটা কীর্তি রেখে যান।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামের জীবনটাও যায় পাল্টে। একটা নতুন প্রাণবৃত্তায় নে উচ্ছল হয়ে ওঠে। 'সিয়ার' হয়ে দাঁড়ায় নাথদ্বার।

চারপাশের বাতাসে আজকের সকালে শাহনাই-এর সুর ভাসছে। শুধু আজ কেন রোজই এখানে শাহনাই বাজে। সুরে থাকে প্রভাতী রাগের মুহূর্ত। সহজ ভক্তির সঙ্গে এ সুরের এ পরিবেশের অত্যন্ত নিবিড় একটা সম্পর্ক।

(ক্রমশঃ)

রম্যাপদ চৌধুরীর
পিয়্যাপসন্দ্ ৫ম মুঃ ৩০০ ॥
সন্তোষকুমার দেব
বৈঠকী গল্প ২৫০ ॥

রূপদশীর
কথায় কথায় ২য় মুঃ ৩০০ ॥
রঞ্জিতকুমার সেনের
দ্বৈতসঙ্গীত ৪০০ ॥

প্রফুল্ল রায়ের

সিন্ধুপারের পার্থ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
নয় টাকা

সিন্ধুপারের দেশ কুখ্যাত আন্দামান। বিচিত্র এখানকার বাসিন্দারা। দেশার খোঁরাক পাবার জন্য স্বচ্ছন্দে নিঃশেষ বউকে তুলে দেয় অপরের হাতে। কথায় কথায় চলে চাকু। খুন-খারাপি লেগেই আছে। বঞ্চিত বৃত্তকে জীবনের রূঢ় পরিবেশের মাঝ থেকেই প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী আবিষ্কার করেছেন এই কুখ্যাত দ্বীপের হৃদয়ের আঙ্গিকে। বলিষ্ঠ চিত্রণের এক অবিস্মরণীয় আলোচ্য।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
বিগত দিন ৩০০ ॥
মৌলানা খাফি খানের
যদুষ্ঠং ২৫০ ॥

তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের
ঝড় ও বিহঙ্গ ৩৫০ ॥
সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
জাপানী বন্দী শিবিরে ২৫০ ॥

সরলাবালা সরকারের
হারানো অতীত ৩০০ ॥

শান্তিলাল রায়ের
আরাকান ফ্রণ্টে ২০০ ॥

দীপেন রাহার

কাঁচা মাটি পাকা পথ চার টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

নতুন বই

উপন্যাস

নীল আগুন	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৬'৫০
ভিলা মাধবী	সুবোধ ঘোষ	৩'০০
সাধের শারিকা	প্রফুল্ল রায়	৮'০০
মাংসমোতো	প্রতিভা বসু	৩'৫০
তারুণ্যের কাল	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২'০০
নতুন হাওয়া	বিমল কর	৪'৫০
লোহার বাসর	আশা দেবী	২'০০
রাতের গাড়ি	নবেন্দু ঘোষ	৪'০০
দ্বি নায়িকা	মৌরীন্দ্র মজুমদার	২'০০
দৃষ্টি দৃষ্টান্তর	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	৩'০০
ললিতা	নীলকণ্ঠ	২'৫০
সেতুবন্ধ	প্রতিভা বসু	৩'০০
আকাশ যেখানে মাটির কাছে	(কিশোরদের) অনিলেন্দু চক্রবর্তী	২'০০
পাঁচ নম্বর ঘরের বাসিন্দা	কৃষ্ণ চক্রবর্তী	২'৫০

গল্প

স্বথ নামে স্বথ পাখী	নবেন্দু ঘোষ	৪'০০
তোলপাখির পাকামি	শিবরাম চক্রবর্তী	২'০০
লেখিকা-মন	বাণী রায় (সম্পাদিত)	৮'০০
দ্বিবাচন	রেবন্ত বসু	৩'০০
বিদেশিনী (অহুবাদ)	মীনাঙ্গী দত্ত (সম্পাদিত)	১০'০০
মহাযুদ্ধের পরে	কৃষ্ণ চক্রবর্তী	২'৫০



সাহিত্যের খবর
বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ১১
শ্রাবণ, ১৩৭০

সত্যের কেন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ

যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি; সে এমন-কিছুকে উদ্ভাবন করতে পারে না যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সৃষ্টি। সেইজন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হতেই যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।

বস্তুত এই ঐক্যের মূল্যে মানবজাতি এমন-কিছুকে অনুভব করে যার প্রতি তার ভক্তি জাগে, যার জন্যে সে প্রাণ দেয়, যাকে সে দেবতা বলে জানে। মানুষ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন। অথচ তার অন্তরের মধ্যে পরস্পর-যোগের যে শক্তি নিয়ত কাজ করেছে তা পরম রহস্যময়, তা অনির্বচনীয়; তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশে কালে বহুদূর অতিক্রম করে চলে।

—ভারতপথিক রামমোহন রায়

ভাষায় অপপ্রয়োগ

ত্ৰীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

ইংরেজী Purist শব্দের কোনো সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। শব্দটি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাসূচক কিংবা কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গব্যঙ্গক তাহাও বলিতে পারি না। তবে একথা সত্য যে, লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই নিরঙ্কুশ হইলেও অল্পসংখ্যক purist চিরকালই বর্তমান থাকেন এবং সেইজগতই ভাষা একেবারে জঞ্জালে ভরিয়া যায় না। ভাষার বিপুলক্ষরকার জগৎ মাঝে মাঝে puristদের শাসন আবশ্যক। Puristদের সম্পর্কে অনেকের ধারণা, তাঁহারা ব্যাকরণের শুদ্ধ কচকচিতে ভাষার সাবলীল গতি রুদ্ধ করেন। কথাটি ঠিক নহে। ভাষার প্রতি দরদ না থাকিলে কেহ purist হন না। ভাষাদরদীদের ছন্দোজ্ঞান নাই, সৌন্দর্য-জ্ঞান নাই, আশা করি এমন কথা কেহ বলিবেন না। তবে রুচিভেদে রূপস্থিতিতে বৈচিত্র্য আসিবেই। বৈচিত্র্য ভাষার প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে না, ইহার গতিশক্তি বৃদ্ধিই করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প শুনিয়াছি, শিশুপাঠ্য ‘কথামালা’র পাঠও তিনি পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ভাষা এমনই জিনিস, কোনো সংশোধনেই সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করা যায় না।

পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ভাষার ব্যাকরণদোষ অনেক সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। বাংলা ভাষায় অসংখ্য ব্যাকরণদুষ্টি শব্দ আছে, আজ তাহাদের বর্জন করার কথা চিন্তাই করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শব্দের উল্লেখ করি—সততা। বাংলা ভাষায় আর-একটি শব্দ পাইনা যে এই শব্দটির সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা বহন করে। ব্যাকরণসম্মত না হইলেও এই শব্দকে এবং এই জাতীয় আরও বহু শব্দকে আজ আর উচ্ছেদ করিবার উপায় নাই। এগুলি ভাষার রক্তমাংসে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা বলি, ‘আশ্চর্য হইলাম; আমার গোপন কথাটি’—এই সমস্ত প্রয়োগেও এখন আর কেহ ব্যাকরণ-দোষ ধরেন না।

কতকগুলি শব্দে কিঞ্চিৎ সংশয় এখনও আছে। ‘নিন্দুক, ইতিপূর্বে, ইতিমধ্যে’ প্রভৃতি না লিখিয়া কেহ কেহ লেখেন ‘নিন্দক, ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে’ ইত্যাদি। কিন্তু বুঝা চেষ্টা। ‘নিন্দুক’ সম্ভ্রদায়কে আর বিতাড়িত করা সম্ভব হইবে না। ব্যাকরণসম্মত ‘সেচন’ থাকা সত্ত্বেও ব্যাকরণদুষ্টি ‘সিঞ্চন’

চলিয়া গিয়াছে। ‘বিসর্জন’ সর্বসম্মত শব্দ, কিন্তু দুই ‘স্বজন’কে সরাইয়া শিষ্ট ‘সর্জন’কে এখন আর স্থান দেওয়া সম্ভব নহে। এই জাতীয় উদাহরণ আর বাড়াইতে চাই না। তবে ‘কিসদন্তী, কিস্বা, বশমদ, বারম্বার, সম্বরণ, সম্বর্ধনা, সম্বাদ, স্বয়ম্বর’ ইত্যাদি, ‘অংক, অংগ, গংগা, ভংগ, মংগল, মংগে’ ইত্যাদি, ‘তেজেশ, তেজেন্দ্র, বক্ষোপরি, যশেচ্ছা’ ইত্যাদি; ‘সঠিক, সক্ষম, সশক্তিত, সাফল্যের সহিত, মহানুভূতির সঙ্গে, সাবধানতা সহকারে’ ইত্যাদি, ‘উষেলিত, একত্রিত, প্রকটিত, মুখরিত, আবশ্যকীয়, বাহ্যিক, বৈয়াকরণিক’ ইত্যাদি, ‘সহের, প্রস্তুতের, বাধ্যের, আয়ত্তের, তদুপে, জ্ঞাতার্থে, অধীনস্থ, আয়ত্তাধীন’ ইত্যাদি, ‘স্বকেশিনী, শ্বেতাঙ্গিনী’ ইত্যাদি, ‘কলাগবরেষু, সমীপেষু, ইত্যাদি শব্দও ভাষায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এগুলিকে কি সংস্কার করিয়া ব্যাকরণের শাসনে আনিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে? লেখকদের চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যুগের প্রয়োজনে নূতন নূতন শব্দসৃষ্টি অনিবার্য। ‘অনিবার্য’ না বলিয়া ‘অত্যাৱশ্যক’ বলিলেই বোধ হয় বাক্যটির সঙ্গতি রক্ষা হয়। কিন্তু নূতন শব্দসৃষ্টির সময়ে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যাকরণের বিধান তো লক্ষ্য করিতে হইবেই, অপ্রয়োজনে অতিভার, অতিলঘু, কিংবা ধাতু উপসর্গের সঙ্গে সম্পর্কহীন শব্দ রচিত না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। বাংলা দেশের এক প্রবীণ পণ্ডিত অধ্যাপক একটি মাথাভারী নবাগত শব্দ দেখিয়া কখনই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না—শব্দটি ‘অনস্বীকার্য’। আর-একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ‘আপ্রাণ চেষ্টা’র কথা শুনিলেই হাসিতে থাকেন। ‘অ-বি-স্মরণীয়’র দৃষ্টান্তে ‘অন্-অ-স্বীকার্য’ অনস্বীকার্য হইলেও ‘আপ্রাণ’ অচল। ‘আজীবন, আমরণ, প্রাণপণ’ এর নজিরে ‘আপ্রাণ’ আসে না।

• নবজাত কয়েকটি অত্যন্ত ভদ্র চেহারার শব্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম বিরক্তির কথা অনেকেরই জানা আছে। বলিয়া-লিখিয়া যখন তিনি লেখকগণকে এই শব্দগুলির ব্যবহারে বিরত করিতে পারিলেন না, তখন কবি ‘তাসের দেশ’ নাটিকাটি রচনা করিলেন। ‘অবদান, ক্লষ্টি, বাধ্যতামূলক, সম্পাদকীয় স্তম্ভ’ প্রভৃতি শব্দকে তিনি অভিনেতাদের দিয়া এমনভাবে উচ্চারণ করাইতেন যে শ্রবণমাত্র শব্দগুলির প্রতি শ্রোতাদের জুগুপ্সা আসে। কিন্তু রবীন্দ্রভক্ত আমরা কি শব্দগুলির একটাকেও অজ্ঞাবধি বর্জন করিতে পারিয়াছি? অথচ কবিগুরু উল্লিখিত প্রত্যেকটি শব্দের বিকল্প সুখশ্রাব্য শব্দ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে এই অবাঞ্ছিত শব্দগুলি

কবিগুরুর স্নেহভরা প্রামাণিক (প্রামাণ্য নহে) অভিধান চলন্তিকাতেও স্থান পাইয়াছে। শব্দগুলি যে কবির কী পরিমাণ হাশ্বোদ্রেক করিত, ‘তাসের দেশ’-এ বিভিন্ন দৃশ্যে একই কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে তাহা বুঝা যাইবে।

তাসের দেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৫

(১)

গোলাম। আমি তামদ্বীপ প্রদীপের সম্পাদক। আমি তামদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস? মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন। নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা। তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম। ছুটো বড় বড় স্তম্ভ।

রাজা। সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সহ্য না।

গোলাম। বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা। ওটা আবার কী বললে! বাধ্যতামূলক আইন!

গোলাম। কানমলা আইনের নব্যভাষা। এ-ও নবতম অবদান।

(২)

গোলাম। টেক্সিকুমারী, বিবিস্তন্দরী, মনে রেখো, আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, তামদ্বীপের কৃষ্টি! বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

গোলাম। জারি করো বাধ্যতামূলক আইন।

রাজা। অর্থাৎ?

গোলাম। কানমলা মোচড়ের আইন।

রাজা। বুঝছি। রানীবিবি, তোমার কী মত? বাধ্যতামূলক আইন এবার তবে চালাই?

রানী। বাধ্যতামূলক আইন অন্তরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি—
দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন।

টেকাকুমারীরা। (সকলে) আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।
গোলাম। এ কী হল? হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি।

(৩)

হরতনী। দেখো, সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, স্তম্ভে চড়াবে।

(৪)

দহলা। ছী ছী ছী ছী, এমন কথা তোমার মুখে বেরোল। তুমি নারী,
রক্ষা করবে শান্তি; আমরা পুরুষ, রক্ষা করব কৃষ্টি।

(৫)

গোলাম।.....সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভরাতে গিয়ে দেখি, লেখনী দিয়ে ছন্দ
ঝরেছে।.....

যে দেশে বায়ু না মানে

বাধ্যতামূলক বিধি,

সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি

কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি—

সে দেশে নিশ্চিত অনাস্থি ॥

(৬)

রাজা। বাধ্যতামূলক আইন?

দহলা। আর চলবে না।

সকলে। চলবে না, চলবে না।

‘তাসের দেশ’ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩৪০ সালে ভাদ্রমাসে।
তখন নাটিকাটি আয়তনে ছিল অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু এই কথাগুলি সমস্তই ছিল।
শেষ দৃশ্যে বরং একটু বেশিও ছিল :.

সম্পাদক। আমারও দুই সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে।

তবে প্রথম সংস্করণে ‘অবদান’ কথাটি ছিল না। ওটা বোধ হয়
১৩৪০-এর পরের আবিষ্কার। আমরা বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত সারা বৎসর
প্রতি পাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু রবীন্দ্রধিকৃত শব্দগুলি
বর্জন করার কথা একবারও চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই।

Puristদের ভাষাদরদের কথা বলিতেছিলাম। বহুদিন পূর্বে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলাম। প্রবন্ধে একটি শব্দ ছিল ‘বইখানা’। সুনীতিকুমার করুণনেত্রে লেখকের দিকে চাহিলেন। খতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভুল কী?” সুনীতিকুমার বলিলেন, “আর একটু দরদ দিন।” ‘বইখানা’ কাটিয়া ‘বইখানি’ করিয়া দিলেন। ইহাকেই বলে সংবেদনশীল মন। আমাদের চক্ষে ‘মনোকষ্ট, মনোতোষ, বহিঃকৃতি, লজ্জাস্বর, কুংসিং, রঞ্জিং’ কোনো কিছুতেই পীড়া দেয় না, সুনীতিবাবু ‘বইখানা’-ও সহ্য করিতে পারিলেন না। আরেকদিনের ঘটনা। এক সাক্ষ্য মজলিসে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় গান গাহিতেছিলেন। কী কথায় দিলীপকুমার বলিয়া ফেলিলেন ‘গান গেতে’। সুনীতিবাবুর কানে লাগিল— “দিলীপবাবু, কী বললেন? পশ্চিমবঙ্গের ছেলে হয়ে বলছেন ‘গেতে’!” আর যায় কোথায়? শ্রোতার ক্ষিপ্ত হইয়া সুনীতিবাবুকে আক্রমণ করিলেন, “মশায়, ভেবেছেন কী? সঙ্গীতের আসরেও আপনার ভাষাতত্ত্ব!”

প্রয়োজনে হউক, পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্ত হউক বিদেশী ভাষার idiom (এই ইংরেজী শব্দটির উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ জানি না—‘বাক্শৈলী’ শব্দটি কেমন লাগে?) আমরা ক্ষণে ক্ষণেই মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া লইতেছি। বহু বিদেশী বাগবৈশিষ্ট্যের শুধু শাব্দিক অনুবাদ বাংলাভাষায় যত্রতত্র দেখিতেছি। এই অনূদিত বাক্শৈলীর কিছুকিছু বহুব্যবহারে ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। কিছুকিছু ভাষায় ‘ন যধো ন তস্থো’ অবস্থায় আছে। আর কিছুকিছু ‘বিশুদ্ধ হাঙ্গরসের সৃষ্টি’ করিতেছে। একজন যশস্বী সাহিত্যিকের লেখায় দেখিয়াছিলাম ‘কুমারী বক্তৃতা’; আরেক জন লিখিয়াছিলেন ‘উলঙ্গ সত্য’। সৌভাগ্যক্রমে এই জাতীয় বক্তৃতা ও সত্য ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করে নাই। কিন্তু যখন দেখি নব্য সাহিত্যিকেরা সকলেই তাঁহাদের রচনায় ‘প্রতিভার স্বাক্ষর’ রাখিয়া একে একে ভবিষ্যতের ‘প্রতিশ্রুতি’ বা ‘অঙ্গীকার’ হইয়া দাঁড়াইতেছেন, তখন আশঙ্কা হয় বাংলাভাষা যে অদূর ভবিষ্যতে জনগণের সংযোগ হারাইবে তাহাতে ‘সন্দেহের ছায়া’ মাত্র নাই। আরেকটা নূতন প্রয়োগ দেখিতেছি ‘রাখা’ শব্দের। আজকাল আমরা সভাসমিতিতে প্রস্তাব রাখি, বক্তব্য রাখি, নিবেদন রাখি, প্রশ্ন রাখি, অভিযোগ রাখি, মায় আলোচনা রাখি, উল্লেখ রাখি। এইভাবে বক্তারা সবই যদি মাঠেঘাটে ‘রাখিতে’ শুরু করেন, তবে তাঁহাদের নিজস্ব আর কী থাকিবে? লেখকদের কাছে সসঙ্কোচে একটি নিবেদন জানাই। ‘যাহা আসে,

আসিতে দাঁও’—ভাষায় বা সাহিত্যে এই উদারতা সর্বদা ক্ষেমঙ্কর নয়, একটু বাধারও প্রয়োজন আছে। এই বাধার অভাবেই আমরা ‘অনুগ্রহে বাধিত’ হই, ‘ভীষণ আনন্দ’ পাই এবং ‘যথেষ্ট ক্ষতি’ স্বীকার করি। তথাপি আমরা লজ্জাবোধ করি না।

একটি বিশেষ বাগ্মীতির উল্লেখ করিব। প্রধানত এই বাগ্মীতির যৌক্তিকতা আলোচনার্থেই এতক্ষণ ভূমিকা করিলাম। আমরা সকলেই আজ নির্বিচারে এখানে-সেখানে একাজে-সেকাজে ‘যোগদান করিতেছি’। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, বাগ্মীতি হইতেছে ‘যোগ দেওয়া’—‘যোগদান করা’ নয়। তোমরা যদি ‘যোগদান করিতে’ পার, তবে ‘মারিয়া নিক্ষেপ করো’ না কেন? ‘মারিয়া ফেলা, হাসিয়া ফেলা’-ই বাঞ্ছিত—‘হাস্ত নিক্ষেপ করিতে’ গেলে বিপত্তি হইবে। লজ্জার মাথা খাইয়া ‘লাফ’ না ‘দিয়া’ আজকাল আমরা ‘লক্ষ্যপ্রদান’ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

Idiom-এর শব্দ পরিবর্তনযোগ্য নহে। Idiom-এর শব্দ বদলাইলে, হয় স্নেহ ভিন্নার্থ ধারণ করে, নয়তো অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হয়। ‘মাথা ধরিলে’ স্মারিডন খাও কিংবা কাহাকেও দিয়া মাথা টেপাও, কিন্তু কেহ মস্তক ধারণ করিলে স্মারিডন অ্যানাসিনের প্রশ্ন অবান্তর। আমরা গাড়ি ধরি, শকট ধারণ করি না। আমরা পদক্ষেপ-ও করি, পা-ও ফেলি, কিন্তু হস্তক্ষেপ-ই করি, হাত ফেলি না। দেখিয়া যাই, শুনিয়া যাই, কিন্তু দেখিয়া-শুনিয়া বা দর্শন করিয়া শ্রবণ করিয়া ‘গমন করি’ না। সাঁতার কাটি, সম্ভরণ ‘কর্তন করি’ না। বুঝিয়া দেখি, বুঝিয়া দর্শন করি না। বুঝিয়া লই, বুঝিয়া গ্রহণ করি না। উঠিয়া পড়ি, উঠিয়া বা উত্থান করিয়া ‘পতিত হই’ না। মার খাই, আছাড় খাই, হৌচট খাই—মার, আছাড়, হৌচট ‘আহার’ বা ‘ভক্ষণ করি’ না।

• অধিকতর দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

‘যোগদান’-এর কথায় কিরিয়া আসি। প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা যদি অন্নদান, বস্ত্রদান, অর্থদান, সম্পত্তিদান, বাক্যদান, প্রাণদান, দণ্ডদান, শাস্তি-দান, এমন কি ভোটদান পর্যন্ত করিতে পারি—তবে যোগদান, মনোযোগদান, লক্ষ্যদান করিতে বাধা কী? বাধা আছে কিনা দেখা যাক। আমরা কাজে হাত দিই, হস্তদান করি না। কথায় কান দিই, কর্ণদান করি না। লুপ্ত হইয়া বা ঈর্ষান্বিত হইয়া বস্ত্রতে চোখ দিই, চক্ষুদান (চক্ষুদান তো নহেই) করি না। মাথা দিই, বুক দিই, দরজা দিই, সাঁতার দিই, চম্পট দিই, সরাইয়া

দিই, ভাগাইয়া দিই, ভাসাইয়া দিই, ফেলিয়া দিই— কিন্তু অর্থান্তর বা অর্থহীন না করিয়া মাথা বা মস্তক দান করি না, বুক বা বক্ষ দান করি না, দ্বার দান করি না, সত্ত্বরণ দান করি না, চম্পট দান করি না, সরাইয়া দান করি না, ভাগাইয়া দান করি না, ভাসাইয়া দান করি না, নিক্ষেপ করিয়া দান করি না।

একটা সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করি। ‘দান’ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ ‘গ্রহণ’। যেখানে ‘গ্রহণ’ করা সম্ভব, সেখানে ‘দান’ করা—ও চলে। কিন্তু যেখানে গ্রহণ সম্ভব নয়, সেখানে ‘দান’—ও সম্ভব নয়, সেখানে শুধু ‘দেওয়া’-ই চলে। যোগগ্রহণ, লক্ষগ্রহণ, দ্বারগ্রহণ, চক্ষুগ্রহণ, কর্ণগ্রহণ, চম্পটগ্রহণ অর্থহীন প্রলাপ; অতএব যোগ দেওয়া, লাফ দেওয়া, দরজা দেওয়া, চোখ দেওয়া, কান দেওয়া, চম্পট দেওয়া— এইগুলিই বাক্‌শৈলী। এসমস্ত স্থলে ‘দেওয়া’-র পরিবর্তে ‘দান’ করা বসাইলে হাস্যকর ভাষা হয়। কিন্তু বলিয়া লাভ আছে কি? ‘যোগদান’ যেভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, আর কি ইহাকে উৎখাত করা যাইবে?

ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ৮.০০

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ ৬.০০

বাংলা গদ্যের শিল্পসমাজ ৩.২৫

রবীন্দ্র-মনীষা ৫.০০

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য ৪.০০

রবীন্দ্র-সমীক্ষা ৩.০০

রবীন্দ্র-বিতান ৫.০০

কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা ৬.০০

লেখকের মুখোমুখি

[ষষ্ঠঃ]

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

রঞ্জিত গিংহ

কবির পক্ষে সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণে নানা অস্ববিধে থাকে। কারণ আত্মবিশ্লেষণ, এলিয়ট যা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে গিয়েছেন, কবিকৃত সমালোচনার তা আবশ্যিক ধর্ম। বস্তুত এর অন্বেষণে কবির পক্ষে অসম্ভব। সাহিত্যজিজ্ঞাসা মানেই তাঁর কাছে আত্মজিজ্ঞাসা। সমস্ত রোমান্টিক্স তাই অপাংক্তেয় ঠেকেছিল এলিয়টের কাছে, গ্রহণীয় হলেন তাৎকাল্য সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় যারা ছিলেন অস্পৃশ্য সেই ডান, ড্রাইডেন ও পোপ। অর্থাৎ সাহিত্যোতিহাসের কোন্ অংশ গ্রহণীয় আর কোন্ অংশই বা বর্জনীয় নিজের রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কবি তার জবাব পান।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পর যে দুজন সর্বতোমুখী লেখকের নাম স্বভাবতই আমাদের স্মরণে আসে তাঁদের একজন প্রেমেন্দ্র মিত্র অগ্রজন বুদ্ধদেব বসু। দেবসাহিত্যকুটিরের গ্রন্থমালায় গ্রন্থপ্রকাশ করা থেকে আরম্ভ করে সাতশ-আটশ পৃষ্ঠার স্থূলকায় উপন্যাস—ততুপরি কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণ-কাহিনী কিছুই লিখতে বাকি রাখেন নি বুদ্ধদেব বসু। এ যাবৎকাল তিনি এত গ্রন্থের প্রণেতা যে তাঁর এক ছাত্রস্থানীয়ের কাছে শুনেছি—তিনি নিজেও সেসব রচনার সব নাম*মনে রাখতে পারেন নি। কোনো কবির পক্ষে—অন্তত যিনি বিশ বৎসরের অধিককাল*বাংলাদেশে একান্তভাবে কবিতার পত্রিকার সম্পাদনা করে গিয়েছেন—একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন ত বটেই, কবিতার সম্পর্কে ঔৎসুক্য-উদ্দীপক নানা প্রবন্ধ লিখে বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন—তাঁর কাব্যস্বভাবকে পরিণতিদানের পক্ষে তাঁর এই সর্বতোমুখী হওয়ার দুর্মদ প্রয়াস যে কতখানি সহায়ক তা নিশ্চয়ই বিতর্কসাপেক্ষ। অবশ্য এও জানি এক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত সমস্ত বিভর্কের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু সত্যেন্দ্র-প্রমুখদের কাব্য-বৈফল্য সম্পর্কে স্বয়ং বুদ্ধদেব যেকালে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের “অনুকরণ যেমন দুঃসাধ্য, তার প্রলোভনও তেমনি দুর্দমনীয়। ‘মনে হচ্ছে আমিও অমন লিখতে পারি ঝুঁড়ি-ঝুঁড়ি—’ এই সর্বনাশী ধারণাটিকে সব দিক থেকেই প্রত্নর দেয় তাঁর ধ্বংস, যাতে আপাতদৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যের কোনো প্রয়োজনই নেই, যেন কোনো প্রস্তুতিরও না * এত সহজে ব’য়ে যায়, হ’য়ে

* এই প্রসঙ্গে সম্ভ্রতি অবশ্য বুদ্ধদেববাবুর আরো গবেষণামূলক মতামত পাওয়া গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে সারাজীবনে আধাডঙ্কনের বেশী বই পড়ে ফেলেছিলেন—বুদ্ধদেববাবু যখন বলেছেন—তখন এ তথ্যের আর্টিকেল কোথায়—এ নিয়ে তর্ক করাও অস্বাভাবিক।

যায়, মলে হয় যেন ও-রকম লেখা ইচ্ছে করলেই লেখা যায়— একটুখানি ‘ভাব’ আসার শুধু অপেক্ষা।”— তখন পুনর্বীর এই কথাই প্রমাণিত হয় কবির পক্ষে সমালোচনার কাজে হস্তক্ষেপ অস্ববিধের ব্যাপার। কারণ কবির প্রত্যেক সাহিত্যজিজ্ঞাসায় আত্মজিজ্ঞাসা তথা আত্মসংশ্লিষ্ট সমর্থনের তাগিদ নিহিত থাকে। কলত সত্যেন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত বুদ্ধদেবের মন্তব্যে কেউ যেন মনে না করেন যে তাঁর নিজের রচনার ওপর ঐ বিশেষ মন্তব্যের উপযুক্ততায় সতর্ক না থেকেই তিনি অমন ভাষণে অগ্রসর হয়েছেন। অন্তত, যেকালে আমাদের অজানা নেই যে অপরের স্বন্ধ নিজেদের দোষারোপের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত স্থান। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের যে সব বর্জনীয় প্রভাব তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় দেখেছিলেন তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের জন্মস্থল সেই প্রভাবের মধ্যেই। আত্মজীবনীর তথ্য আমার সংগ্রহাধীন না হলেও অনুমান করা শক্ত নয় যে দীর্ঘ গ্রন্থতালিকার বর্জনীয় স্বীতি বুদ্ধদেবাবুর মনেও আত্মগ্লানির পীড়া আনে। ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থভুক্ত ‘লেখার ইস্কুল’ প্রবন্ধটি যিনি এখনও পড়েন নি তাঁর পক্ষে আমার মন্তব্যের উপযুক্ততা বিচার একটু আয়াসসাধ্য হবে সন্দেহ নেই।

আসলে বুদ্ধদেব বঙ্গ’র আধুনিকতা তাঁর কাব্যস্বভাবের মধ্যে কোনেদিনই সীমাবদ্ধ হয় নি যদিও রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার আন্দোলনে তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ‘কবিতা’ পত্রিকা প্রকাশ ক’রে আজকের দিনের বহু লব্ধ-প্রতিষ্ঠকে পাঠকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রথম সুযোগ ক’রে দিয়েছিলেন তিনি। অধিকন্তু, অরূপণ করে এঁদের কবিতার ওপর প্রবন্ধ লিখে এঁদের প্রতি পাঠকদের উৎসাহী করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্ব ও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সংকলন-গ্রন্থ তাঁরই সম্পাদিত। এই সমস্ত মনোভাব বা ক্রিয়াকলাপে তাঁর কাব্যপ্রীতিই প্রমাণ পায়। কিন্তু যে-যথোচিত সাধনা কাব্যপ্রীতিকে কাব্যস্বভাবে পরিণতি দেয়, রুচির সংকরতাকে রুচির বৈশিষ্ট্যে সংহতি দেয় তা বিস্তর পরিশ্রমের অপেক্ষা রাখে। উপরন্তু যিনি বাংলা দেশে মমের জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা করেন এবং শেলীর বোহেমিয়ানিজমের যিনি প্রত্যাশী তাঁর কাছে শিল্পের ভবিষ্যৎ চিরদিনই অনুদার। আমি ধীরসম্পর্কে এইসব কথা বলছি তিনি বাংলা কবিতার অগ্রতম চিন্তানায়ক— ধীর সামগ্র্যতম অপারদৃষ্টিতে আমি বেশন্ ছার, বাংলা দেশের যে কোনো বড় বড় কবির ভবিষ্যৎ চিরদিনের জগৎ রম্যতলে যেতে পারে, বহু বিদ্বন্ধের দ্বিজত্বহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে। অবশ্য বুদ্ধদেব বঙ্গ’ই বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রথম (মধুসূদনের ওপর রবীন্দ্রনাথের কৈশোরিক প্রবন্ধটি বাদ দিলে) যিনি তাঁর

অগ্রণীদের বিরুদ্ধে অপ্রিয় সত্য বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আমার এই দুঃসাহস বুঝি বা তাঁরই দৃষ্টান্তের ফলশ্রুতি।

আলোচনার গোড়ায় যে-কথা বলে শুরু করেছিলাম তারই সিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে সমালোচকের ভূমিকায় বুদ্ধদেব যে-রুটির অস্থিরতা দেখিয়েছেন তার ফলে তাঁর কবিতাও দ্বিধাগ্রস্ত। যে সব গুণের জন্ত জীবনানন্দ তাঁর কাছে আকর্ষণীয় ঠেকেছিল, সেই সব গুণের অভাবে স্বধীন্দ্রনাথ তিনি মুগ্ধ না হ'লেই পারতেন। বস্তুত ডান্ বা ড্রাইডেন অপেক্ষা শেলী-কীটস্ ইত্যাদি যে এলিয়টের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠতে পারেন নি তার কারণ এই নয় যে শেলী-কীটস্ স্বরগীয় পংক্তি বা কাব্যমাধুর্যের অভাব আছে বা ড্রাইডেন ও ডানে দুর্বল পংক্তি দুর্লভ্য। অথবা মাইকেলের অপেক্ষা বিহারীলাল যে-রবীন্দ্রনাথের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল তার দ্বারাও এ কথা প্রমাণ পায়নি যে বিহারীলাল মধুসূদনের চেয়ে বড় কবি কিংবা বিহারীলালের চাইতে মধুসূদন। আসলে কবির স্বষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে স্বভাবতই তিনি উত্তর পান কোন্ কবি তাঁর পক্ষে গ্রহণীয় আর কোন্ কবিই বা বর্জনীয়। তাই আলোচনায় গোড়ায় এ কথা বলেছি যে কবির সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ও আত্মজিজ্ঞাসা সমার্থক। এবং এই কারণে-ই বলছিলাম যে যে জীবনানন্দ ও স্বধীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন আদর্শের কবি। এই দুই কবিকেই ষাঁর ভালো লাগে, তিনি যদি নিজেকে কবি হন, তবে তাঁর বিপদের সম্ভাবনা প্রতুল। ফলত 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার চরিত্র বুদ্ধদেব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি।

উপরন্তু এলিয়টের কবিতা বা কাব্যজিজ্ঞাসায় বুদ্ধদেব যে-অনীহা দেখিয়ে আসছেন সে-সাহিত্যচিন্তা তাঁর ভবিষ্যৎ পাঠকদের কতখানি উপকারে লাগবে তা বলতে পারি না, তবে মনোবিকলনের পণ্ডিতের কাছে তা কথঞ্চিৎ উপাদেয় মনে হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। কেউ যদি বলেন কৃতির সম্ভ্রমহানি আত্মগরিমা প্রতিষ্ঠার পথকে সহজ ক'রে তোলে বুদ্ধদেবাবু সম্পর্কে সেসব মতামত তবে গ্রাহ্য নয়। পক্ষান্তরে এও ঠিক এলিয়ট-কথিত অনুভূতিগুঞ্জের ঐক্যবোধ বা কথ্যচ্ছন্দ—এই দুই শব্দের ব্যঙ্গার্থে যিনি অবহিত রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকবিতার সামান্যলক্ষণের সন্ধান তাঁর কাছে স্বদূরপর্যন্ত নয়। স্বধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত' ও 'যযাতি', জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' বা 'লোকেন বোসের জর্ণাল', বিষ্ণু দেবের 'গার্হস্থ্যশ্রম', 'আইসায়ার খেদ', অমিয় চক্রবর্তীর '১৬০৭ যুনিভার্সিটি ড্রাইভ', 'এপারে,' 'পর্দা', 'বে-স্টেট রোড'

ইত্যাদি কবিতা যে-কারণে আধুনিক তথা ভবিষ্যৎ কাব্যমুক্তির আদর্শস্বরূপ তা অল্পভূতির নানাত্বের ঐক্যবোধে, কথ্যচ্ছন্দের প্রতি শৈল্পিক অন্তরঙ্গতায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে ‘আলাদা’ হ’লেই (‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’ প্রবন্ধে বুদ্ধদেব কর্তৃক পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত শব্দ) নতুন হওয়া যায় না, আধুনিক হওয়াও সম্ভব হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের ‘পাকীর গান’ বা নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাদ্বয়কে কবিতার অনভ্যন্ত পাঠকও রবীন্দ্রনাথের লেখা ব’লে ভুল করবেন না। তবু সত্যেন্দ্রনাথ বা নজরুল নতুন নন, আধুনিকও নন। বস্তুত আধুনিকতা কোনদিনই মরণশীল নয়।

বুদ্ধদেব ‘বহু’র কবিতাপাঠের পটভূমিকা হিসেবে যিনি উপরিউক্ত আলোচনাকে গ্রহণ করবেন তাঁর কাছে আলোচ্যকবির আধুনিকতা বিতর্ক-সাপেক্ষ ত বটেই, উপরন্তু এই কবিসত্তাকে সময় সময় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল মনে হবে। বস্তুত, ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যে রামকে রাবণের চেয়ে হীনবল করার অক্ষম আধুনিকতা বুদ্ধদেবকে যে-রকম বিচলিত করেছিল এবং মধুসূদনের-শব্দপ্রয়োগে ঋতির অভাব অল্পভব ক’রে তিনি যেমন নিরতিশয় পীড়িত হয়েছিলেন তাতে অন্তত ভাবা একটু কঠিন যে সেই ব্যক্তিই ‘নিজে ‘মৃতিভরা ছোটো ছুটি স্তন’ বা ‘মুঞ্জরেছে’-র মত প্রসঙ্গ বা শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ রেখে যেতে পারেন! আসলে বুদ্ধদেববাবুর কাব্যজিজ্ঞাসা অতিশয় বিপ্রলাপিত। ফলত কবিতা লেখার ব্যাপারে এক-এক সময় এক-একজন কবি তাঁকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছেন যে তাকে আর ‘প্রভাব’ বলা চলে না, অবশ্য বলার উপায়ও নেই। বস্তুত, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের আকর্ষণকেই উপেক্ষা করতে পারেন নি। উপরন্তু, অভিধার্য যাই হোক না কেন ‘প্রভাব’ শব্দের ব্যঙ্গার্থ ঐতিহ্যবাহী। তাই যারা সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা জানেন পূর্বসূরী ‘প্রভাব’ ফেলে এবং সমসাময়িক কবি সাধারণত যোগায় অনুকরণের স্পৃহা। হপকিন্স ব্রীজেসকে যা যুগিয়েছিলেন তা অনুকরণের স্পৃহা, রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে, যুগিয়েছিলেন, আর বুদ্ধদেববাবুকে এই অনুচ্চার্য স্পৃহা যুগিয়ে-ছিলেন জীবনানন্দ, সূর্য্যকান্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে’র কোনো কোনো কবিতা বা তাঁদের বিশেষ বিশেষ কাব্যপংক্তি; কখনো বা তাঁদের বিশেষভাবে ব্যবহৃত শব্দাবলী অথবা তাঁদের বহু ‘বিন্দ্র রজনীর পরিশ্রমপ্রাপ্ত উচ্চারণ-পদ্ধতি। যেমন ‘কল্লবতী ও অন্ত্যাত্ম কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের ‘একখানা হাত’ কবিতাটির অন্তিমস্তবকে জীবনানন্দের ‘পাখীরা’ কবিতার কয়েকটি পংক্তির হুবহু প্রতিধ্বনি লক্ষ্য ক’রে আশ্চর্য হ’তে হয়। বুদ্ধদেববাবু দেখেছেন—

“বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারিয়েছে
না জানি এখন কত রাত।”

আর জীবনানন্দে আছে—

“বিছানায় শুয়ে আছি,
—এখন সে কত রাত।”

এই ধরণের প্রতিধ্বনি কী ধরণের মনোভাবের প্রাপ্তি তা আমি বিবেকী পাঠকের বিবেচনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। আবার ‘আমন্ত্রণ—রমাকে’ কবিতার নিম্নলিখিত অংশে আছে—

“আমি বসাবো তোমাকে মোর ইজিচেয়ারে
আমি বসবো পাশে
ঘরে জলবে মোমের আলো এক কিনারে
আর জলবে সন্ধ্যাতারা আকাশ পারে।”

অবশ্য আমি জানি ‘ইজিচেয়ার’ ও ‘সন্ধ্যাতারা’—এই দুটি শব্দের কোনোটিই অসাধারণ শব্দ নয়—বরং ব্রহ্মত শব্দ—কোনো কবিরই এগুলো পৈতৃক সম্পত্তি হতে পারে না। কিন্তু বিষ্ণু-দে’র ‘গার্হস্থ্যশ্রম’ কাব্যমালায় যে বিশেষ অলুপ্তের সঙ্গলাভ করেছে ঐ দুটি শব্দ, সেই অলুপ্তজড়িত শব্দদ্বয়কে পুনর্বার বুদ্ধদেবাবুর কবিতার মধ্যে দেখে একটু অবাক হ’তে হয়।

“তৃতীয়ার ক্ষীণ করুণ আলোয় দখিন হাওয়ায়
• কাঁধে কাঁধ দিয়ে ইজিচেয়ারেই বসবো দৌহে।.....
স্তব্ধ শহরে করুণ আলোয় নিরাল কোনায়.....

• আঁধার মাঝে সন্ধ্যাতারা সঙ্গহারা জলে।”

(‘গার্হস্থ্যশ্রম’—বিষ্ণু দে)

কোনো শব্দ কোনো কবিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি হ’তে পারে না বটে, কিন্তু শব্দের অলুপ্ত কবিরা নিজেরা তৈরী করেন। বিষ্ণু দে’র উপরিউক্ত কবিতায় ‘ইজিচেয়ার’ ও ‘সন্ধ্যাতারা’ প্রেমের বিদ্রূপ ও বেদনাকে যে ভাবে সন্নিহিত করেছে তাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে কবির প্রাতিম্বিক অলুপ্তের পারবশ্বে অভিধানের সার্বজনীনতাকে অতিক্রম ক’রে শব্দ বিশিষ্ট ব্যাঙ্গ্যার্থে বলীয়ান হ’য়ে ওঠে। আবার ‘বর্ধার দিন’ কবিতার নিম্নোক্ত কাব্যংশের বিশেষ ভাবে শেষ দুই পংক্তি লক্ষণীয়

“চিরন্তনীর অলক্ষ্য অভিসার
 পার হ’য়ে এসে তুচ্ছের বঞ্চনা
 বলে কানে কানে,—আমার অঙ্গীকার
 ভুলিব না আমি, ‘কোনোদিন ভুলিব না।”

সত্যেন্দ্রনাথ যেমন, বুদ্ধদেবের মতে, রবীন্দ্রনাথের তরলিত সংস্করণ তেমনি
 বুদ্ধদেবের উপরিউক্ত পংক্তি চতুষ্টয় (আগাগোড়া কবিতাটি বললেও অত্যাক্তি
 করা হয় না) স্বধীন্দ্রনাথের ‘শাস্ত্রী’ কবিতার তরলিত সংস্করণ।

“স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
 আমার রক্তে মৃতমাধুরীর কণা,
 সে ভুলে ভুলুক, কোটি মঘন্তরে
 আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।”

কিংবা ‘কবিমশাই অনেক ত ধান ভানলেন’ বা ‘সোনাপিসি, কানাবেড়াল,
 টেবিলচেয়ার ইত্যাদি সব টুকিটাকি’—এই সব পংক্তির রচনায় বোঝা যায়
 অমিয় চক্রবর্তী বিশেষভাবে বুদ্ধদেববাবুকে সাহায্য করেছেন। •

বস্তুত, এই অল্পকরণ-স্পৃহা বিবেকীপাঠককে যে-সিদ্ধান্তে এগিয়ে দেয় তাতে
 বুদ্ধদেব বস্তু তিরিশের যুগের সাম্প্রতিক কবি হিসেবেই বিবেচিত হবেন।
 সেই যুগে কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তিগত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ’য়েছিল তার
 বহিরঙ্গিন ইতিহাস বুদ্ধদেব বস্তু’র কবিতা। জীবনানন্দ, স্বধীন্দ্রনাথের কাছে
 যে সব শব্দ বা শব্দবন্ধ আন্তরিক প্রয়োজনের খাতিরে অনিবার্য ঠেকেছিল এবং
 পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্থগ্ন ছিল ভবিষ্যৎ কাব্যমুক্তির যে-বীজ, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ
 অবধানই বুদ্ধদেববাবুর বিপর্যয়ের এই কারণ। সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেব
 একদা যে-মন্তব্য করেছিলেন “যে-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথে দিব্যদৃষ্টি, কিংবা স্বপ্ন মানেই
 স্বপ্নভঙ্গ, সত্যেন্দ্রনাথে তা পর্যবসিত হ’লো দিব্যস্বপ্নে, যে ফুল ছিল বিশ্বসত্তার
 প্রতীক, তা হ’য়ে উঠলো শৌখিন খেলনা, ভাবুকতা হ’লো ভাবালুতা, সাধনা
 হ’লো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পুষ্কিম হ’লো লালপরি নীলপরি আমোদ-
 প্রমোদ।”—সে-মন্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্য যে কোনো ‘সাম্প্রতিক’ কবির
 অভিপ্রায়ের মধ্যেই অবস্থান করে। কবিতার দেহসংস্থানে কাব্যাত্মার চরিত্র
 যে প্রকাশ পায় ‘সাম্প্রতিক’ কবির তা কোনোদিনই বোধগম্য হয় না।
 ‘ইজিচেয়ার’ শব্দের প্রয়োগ-কৌশল বুদ্ধদেববাবুকে চমক লাগিয়েছে কিন্তু
 সে-প্রয়োগের অন্তর্গত উদ্দেশ্য তাঁর কাছে ধরা পড়েনি বলেই বেদনা ও
 বিজ্ঞপের যে-সমাহার বিষ্ণু দে’তে পাই এখানে সেই শব্দ শুধু অভিধারের

ধারণা ছাড়া আর কিছুই জাগায় না। উপরন্তু, এলিয়ট-রচিত ‘Milton 1’ এবং মাইকেল সম্পর্কে স্বেদীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্ন ও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ মধুসূদনের ওপর প্রবন্ধ রচনায় বুদ্ধদেবকে প্রেরণা যোগালেও এ আলোচনা ঐ প্রবন্ধাবলীর ভ্রান্ত অন্তরাখ্যান। বুদ্ধদেববাবুর এই প্রবন্ধ অপরিণতবুদ্ধি শুল্ক-কলেজের ছাত্রছাত্রীর যতই মুখরোচক লাগুক না কেন, যে কারণে কবিতারচনার ব্যাপারে তিনি সাম্প্রতিক সেই কারণেই এলিয়ট ও স্বেদীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মর্মোদ্ধারে তিনি খুব সচেষ্ট হননি। আসলে চোখ, কান ও মনের দ্বন্দ্ব যিনি মেটাতে পারেন না তিনিই সাম্প্রতিক। এঁদের মানসিক গঠন যে-ধাতুতে গড়া তার খবরাখবর নেওয়ায় এঁরা যতখানি যত্ববান তদপেক্ষা এঁদের আকর্ষণ থাকে সমসাময়িক কৃতিকবির বৈশিষ্ট্যের দিকে, সেই কবি তাঁদের মনের যদি অপরপ্রান্তবাসীও হন তাতেও তাঁরা পিছু-পা হন না। লিরিকতার মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নবীন সেন মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ আয়ত্তে আনায় যত্ববান হয়েছিলেন। ‘ইল্শে গুঁড়ি’ কবিতার মর্জি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর বেদনা অনুভব করতে ছুটেছিলেন। রোম্যান্টিকসদের বাধাবন্ধহীন আবেগের মন নিয়ে বুদ্ধদেব বস্তু মজলেন স্বেদীন্দ্রনাথ-বিশ্ব দে-অমিয় চক্রবর্তীর ঐক্যদী যাবার্থের আপাত সম্মোহনীতে। কিন্তু এক মন নিয়ে অন্তর্মনের ক্রতিশক্তি লাভ করা যায় না। তাই—

“মোরা কাঁছাকাছি থাকি, রাস্তাটির এপার ওপার।

তুমি মোর নাম জানো; আমিও জেনেছি তব নাম।

তুমি মোর নাম শোনো, শুনেছি তোমার ডাক নাম...”

এই ধরণের কথোপকথন তৈরী করেও কথ্যছন্দ বা ঐক্যদী যাবার্থ দূরে থাকুক, একেবারে অর্থহীন প্রলাপের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, কয়েক বছর আগে মধুসূদনের শব্দপ্রয়োগে শ্রুতির অভাব লক্ষ্য করে এই কবিই বাংলাদেশের নিজারসেভরা অলমতমুতে চাঞ্চল্য এনেছিলেন। ‘মঘনাদবধ’ কাব্যে ‘হর্যক্ষ’ শব্দটি মধুসূদন যেখানে ব্যবহার করেছেন, বুদ্ধদেববাবুর মতে, শব্দটি সেখানে নিতান্ত অল্পযুক্ত এই কারণে যে সিংহের হলুদ চোখের ছবি পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে না। তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করে নিলাম যে মধুসূদন নিকৃষ্ট কবি—তিনি বানর গড়তেই পারেন এবং বানরই গড়েছেন। বুদ্ধদেবের ভাষায় তিনি একটা বড় রকমের আওয়াজ চেয়েছিলেন, ‘হর্যক্ষ’ শব্দের ব্যবহারে তাঁর সে অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেব যেখানে বিখ্যাত—“স্বর্ষাস্তের জাহ্নকর আলোর আয়না হাতে নিয়ে

সন্ধ্যা নামে”—সেখানে এটা সত্যি তিনি শিবই গড়তে চেয়েছিলেন অর্থাৎ বিষ্ণু দে’র ‘নামে সন্ধ্যা তজ্জালসা সোনার কবরীখসা’—পংক্তির মত রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার ক’রে একটি চিত্রকল্প তিনি তৈরী করতে চেষ্টা করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিবেকী পাঠকই বলুন বুদ্ধদেবের আলোচ্য পংক্তিতে শিব গড়ে উঠেছেন না বানর গড়ে উঠেছে? ‘হর্ষক্ষ’ শব্দে মধুসূদন ধ্বনি চেয়েছিলেন, চিত্র চান নি এবং পাঠক ধ্বনিই শুনেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব আলোচ্য পংক্তিতে চিত্র ফোঁটাতে চেয়েছিলেন, হয়েছে ইংরেজিতে যাকে বলে ‘nonsensical verse’ বা নিরর্থক পদ্য। এই রকম নিরর্থক পদ্যের উদাহরণ বুদ্ধদেবের কবিতায় কম নয়; যেমন আরেকটি কবিতায় লিখছেন—“লঘু সবুজ বিহুনি থেকে যেই খ’সে পড়ে রোদ্দুরের সোনার চিকুনি”—এই সব নিরর্থক পদ্য তৈরীর একমাত্র জন্মহেতু এই যে পারিপার্শ্বিকের প্রলোভনের ওপরে কবি তাঁর মনের দাবীকে স্থান দিতে পারেন নি। এইজন্তই কবির পক্ষে সমালোচনায় কোমরবাঁধা বিপদজনক। অশ্লের ছিদ্রাঘেষণে নাগার আগে নিজের ছিদ্ররোধের ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যিক। মিল্টনের ভাষায় কথ্যচ্ছন্দে’র নির্বাসন লক্ষ্য ক’রে এলিয়ট যে-পীড়াবোধ করেছিলেন তাঁর নিজের কাব্যভাষায় সেই কথ্যচ্ছন্দ আদর্শের পর্যায়ে আসীন। অধিকন্তু, বুদ্ধদেববাবুর কবিতার তঙ্গী বা প্রসঙ্গ নির্বাচন পৃথকভাবে তিরিশের যুগের পক্ষে যথেষ্ট সাম্প্রতিক কিন্তু এর মধ্যে কোথায় তাঁর ছদ্মবেশ আর কোথায় বা তাঁর নিজবেশ—এই ধারণার দ্বন্দ্ব থেকে বিবেকী পাঠকের মুক্তি নেই।*

বুদ্ধদেববাবু যাই বলুন না কেন, কাশীরামদাসী পয়্যারের প্রথাল্লমোদিত ছন্দ ও যতির সম্পর্কে বিচ্ছেদ আনার পিছনে কথ্যচ্ছন্দকে আত্মস্থ করার মহৎ উদ্দেশ্য

বস্তুত, কাব্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে বুদ্ধদেববাবুর এই পরকীয়বৃত্তি লক্ষ্য ক’রে Mario Fraze-
এর একটি পর্যবেক্ষণ আমার মনে আসে—“It happens only too often that the unsuccessful artist which lurks repressed in the soul of the critic seeks an outlet in the composition of a critical novel, or in projecting on to same author or other a light which is quite alien to him, which alters his appearance and brings it up to date, greatly to the detriment of the correct interpretation. For such purposes are these approximate terms used capriciously by critics, just as a clever cook uses sauces and seasonings to disguise the food. So Petrarch is found to be baroque, Tasso a Romantic, Marino to resemble D’Annunzio,...” (‘The Romantic Agony’).

মাইকেলের ছিল। কিন্তু ঐ ছন্দকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি এমন শব্দসজ্জার মধ্যস্থতা মেনেছিলেন যাতে শ্রুতির আইন সর্বত্র অব্যাহত থাকে নি। উপরন্তু, এ ধারণা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, অভিধানপ্রাপ্ত শব্দপ্রীতি দেখিয়েছেন। ব'লেই, যিনি বলবেন, মধুসূদনের বাংলাভাষার জ্ঞান ছিল না। অথবা 'হর্ষক্ষ' শব্দের ব্যবহারে সিংহের হৃদ চোখের চিত্র ফুটে ওঠে নি ব'লেই তিনি নিকৃষ্ট কবিপদবাচ্য। আসলে অনুভূতির যে-ঐক্যবোধে বিভিন্ন জাতের শব্দ অথও সম্বন্ধে সংযুক্ত হয় সেই শ্রুতিবোধ মধুসূদন আয়ত্তে আনতে পারেন নি।

“হয়তো তখন-ই

উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশণি

লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিল।”

স্বধীন্দ্রনাথের আলোচ্য কাব্যপংক্তিতে ‘উপশয়ী’, ‘সংবর্ত’, ‘অশণি’, ‘করবালে’ ইত্যাদি একাধিক শব্দ রয়েছে যা তৎসম এবং আমাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিচিত। কিন্তু, ‘হয়তো’, ‘তখন-ই’ ইত্যাদি সংযোগ বা প্রাতিপাক্ষিক অব্যয় বা ‘শুরু করেছিল’-র মত অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে মধ্যে এই তৎসম শব্দগুলোকে কবি এমনভাবে ছুড়িয়ে দিয়েছেন যার ফলে আমাদের কথ্যচ্ছন্দের ধারণা সম্পূর্ণ মর্ষাদা পেয়েছে। বস্তুত, এই ব্যাপারেই মধুসূদন তাঁর প্রতিভা দর্শাতে পারেন নি, যদিও এই ত্রুটি বুদ্ধদেবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে মধুসূদনকে খুব দোষ দেওয়া সঙ্গত নয়। অধিকন্তু, প্রথম কবি হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় কারণ বাংলাছন্দের ক্ষেত্রে তিনি-ই প্রথম প্রবহমানতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বস্তু যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন মাইকেলের এই সাফল্য-বৈফল্যের ইতিহাস তাঁর চোখের সামনে ছিল, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থ-ও প্রকাশিত হ’য়ে গিয়েছে। বুদ্ধদেবাবু লিখছেন—

“ক্লান্ত আজি স্বেচ্ছাচারী অজ্ঞান বৈশাখী

একদিন উন্মাদ নৃত্যের তালে তালে,

পঞ্জরে যে যুগ্মরেছে, সংকীর্ণ কঙ্কাল

করেছে সকাম।”

প্রথমত, লেখকের নাম না জানা থাকলে কবিতাটি যে কোন যুগে লেখা হয়েছে তাই স্থির করা কঠিন হবে। কারণ নবীন সেন, হেমচন্দ্র এমন কি রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতার মধ্যে এই কবিতার অনুরূপ প্রতিধ্বনি মিলবে। বস্তুত বাক্যগঠনে বিপরীত ঘটনায় কথ্যচ্ছন্দ থেকে বুদ্ধদেবাবু অনেক দূরে সরে

বাঙালীর বহুমুখী জাতীয় জীবনের পবিত্র দলিল

বিনয় ঘোষ-কৃত

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১ম খণ্ড ॥ ১২'৫০ ॥

বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য আকরগ্রন্থ
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রাজনীতি,
অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৮৪০
থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিষয়ানুক্রমিক সন্নিবেশ, বিস্তারিত ভূমিকা, সম্পাদকীয় ও
প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত।

উনিশ শতকের অস্বাভাবিক বাংলা পত্রিকা থেকে অনুরূপ সংকলন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে।
বর্তমান গ্রন্থ প্রথম খণ্ড। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অমুরাণী ঝাঁরা এ-বই
ঠানদের কাছে চিরন্তন সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আন্তোয় অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
মহাশয়ের ভূমিকা সন্নিবেশিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার রয়াল অষ্ট্রাভো সাইজের বই, আর্ট প্লেট ও
গোর্ড বান্ডাইসহ, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যের জন্ত মূল্য মাত্র ১২ টা. ৫০ ন. প.।

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥ •

বিজ্ঞানাগর ও বাঙালী সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

[নতুন করে ছাপা হচ্ছে প্রথম খণ্ড]

আনন্দকিশোর মুন্সীর

ডাক্তারের ডায়েরী

ভেলকি থেকে ভেষজ

৩য় মু: ৪'০০ ॥

২য় মু: ৬'৫০ ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

যোগেশচন্দ্র বাগলের

ব্যান ও বন্যা ৩'০০ ॥

• বিদ্রোহ ও বৈরিভা ২'০০ ॥

• অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব বসুর

ভারতের চিত্রকলা

• স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১টি আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মু:) ৪'০০ ॥

তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ও

প্রথমনাথ বিনী সম্পাদিত

প্রথমনাথ বিনী

কাব্যবিতান ১০'০০ ॥

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ৪র্থ মু: ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

গিয়েছেন ত বটেই, ‘মুঞ্জরেছে’-এর মত ক্রিয়াপদ ব্যবহারে-ও তাঁর কলম অশঙ্ক। যে সব প্রমাদের জন্ত মধুসূদন ও সত্যেন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ বুদ্ধদেববাবুকে বিচলিত করেছেন সেই সব প্রমাদের তিনিও অধিকারী বটেই, নবীনদেনী আবেগের থেকেও তিনি আজ পর্যন্ত রেহাই পেলেন না। আকল্পনাপ্রভব আবেগে কথ্যচ্ছন্দ শতধা হয়ে পড়েছে। আসলে, বুদ্ধদেববাবুর শ্রতিবোধ খুব তীক্ষ্ণ না হওয়ায়, ‘কোনো মেয়ের প্রতি’ কবিতার সাধুক্রিয়াপদের প্রাচুর্য রচনাটিকে একেবারে হাস্যকর করে তুলেছে। কিংবা তাঁর অন্য একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধার করা গেল।—

“রোদ্দুরের আঙুলে আঁকা

মেঘের চেরা সিঁথি

হঠাৎ খুলে দিলো স্মৃতির

অন্তহীন ফিতে।”

‘হর্ষক্ষ’ শব্দের ব্যবহারে মধুসূদন যতখানি শ্রতিবোধের অভাব দেখিয়েছেন ‘অন্তহীন ফিতে’—এই শব্দবন্ধ ব্যবহারে বুদ্ধদেব কি তার দ্বিগুণ শ্রতিহীনতার পরিচয় দেন নি? বলাবাহুল্য কথ্যচ্ছন্দ কি, তার দ্বারা কোন্ অভিপ্রায় সাধিত হয়, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় নিরিকতার সম্ভাবনা কতখানি অবশিষ্ট আছে, শেলী-কীটস আমাদের কাছে কী ভাবে গ্রহণীয় পক্ষান্তরে ভানু, ড্রাইডেন, ঈশ্বর গুপ্তকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় কী ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে—এই সব ভাবনার অবকাশ বুদ্ধদেববাবুর ছিল না। আবার ‘সংবর্ত’ কবিতা কেন সার্থক, বা ‘গার্হস্থ্যশ্রম’ কাব্যমালার কোন্ গুণ বাংলা কবিতার ভবিষ্যতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিংবা ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটির কাছে ভবিষ্যৎ বাংলা কবিতা কতটুকু গ্রহণ করতে পারে—সেসব চিন্তার-ও সময় ছিল না তাঁর। কারণ মনে রাখতে হবে, মমের জনপ্রিয়তা ও শেলীর বোহেমিয়ানিজম-এর প্রত্যাশায় তাঁর সাহিত্যজীবনের অর্ধেক কেটে গেছে।

উপরন্তু, ‘সাহিত্যচর্চা’-র অন্তর্ভুক্ত ‘বাংলা ছন্দ’ প্রবন্ধটিতে মুক্তবন্ধ মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিষ্ণু দে’র ‘মন-দেওয়া-নেওয়া’ এবং তাঁর নিজের ‘কঙ্কাবতী’ কবিতাটির কিয়দংশ তিনি উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এ কাব্যদ্বয়ের উদ্ধারে ছন্দ সম্পর্কে তাঁর অস্বচ্ছ ধারণাই প্রমাণ পায়। বস্তুত, বিষ্ণু দে’র আলোচ্য কবিতায় মুক্তবন্ধ যে প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছিল বুদ্ধদেব বসু’র ‘কঙ্কাবতী’-র ক্ষেত্রে সেই প্রযুক্তি এসেছিল অন্য প্রয়োজনীয়তায়?

“ইতিমধ্যে যে গোল পার্কিয়েছি

ডলু—মানে এই মৈত্রেরী ঘোষ নাস্ত্রী মেয়ের

প্রেমে প’ড়ে গিয়ে।” (বিশ্বু দে)

“গড়ায়, ছড়ায় স্বপ্তির পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত

তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে

বাজে দিনরাত, বাজে সারারাত, বাজে সারাদিন আমার প্রাণে

চেউএর মতন ইতস্তত ; (বুদ্ধদেব বসু)

প্রথম কবিতার পর্বগত হাস্যবুদ্ধি কথোপকথনের যে-ভঙ্গীকে আত্মস্থ করেছে দ্বিতীয় কবিতার হাস্যবুদ্ধি অর্গলমুক্ত আবেগে অবগাহনের উপায়মাত্র। ফলত, এই দুই মাত্রাবৃত্ত মুক্তবন্ধ দুইগোত্রের। বরং রবীন্দ্রনাথের ‘সাগরিকা’ বুদ্ধদেবের আলোচ্য কবিতার সমগোত্রীয়। এবং এই প্রসঙ্গে ‘Free Verse’ সম্পর্কে এলিয়ট যেকালে বলেছিলেন, যে-কবি টিকে থাকতে চায় তাঁর কাছে মুক্তবন্ধ কখনই বাধাবন্ধহীন আবেগোচ্ছ্বাস নয় তখন বুদ্ধদেব বসু’র এই কবিতা শুধু যে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবেরই পরিচয় দেয় তাই,—তার থেকেও যা মারাত্মক, —তিনি বিশেষ কাব্যপ্রযুক্তির বিশিষ্ট জুড়িপ্রায় সম্পর্কে কৌনোদিন সচেতন হন নি। অতথায় বিশ্বু দে’র কবিতার পাশে নিজের এই কবিতাটি উদ্ধার ক’রে তিনি কখনোই এ কবিতাগুলির তুলনামূলক বিচারে মণীন্দ্র রায়ের একটি মুক্তবন্ধ মাত্রাবৃত্তের কবিতার ভ্রান্তসংস্কারে নিন্দে করতেন না। অবশ্য স্বধীন্দ্রনাথকৃত হাইনের কবিতার অনুবাদ স্পষ্ট প্রভাব রেখে গেলেও ‘যে আধার আলোর অধিক’ কাব্যগ্রন্থের ‘গ্যেটের অষ্টম প্রণয়’ কবিতাটি তাঁদেরই ভালো লাগবে যারা হিউম-কথিত ক্ল্যাসিসিজমের আবশ্যিকতা অনুভব করেন। এই কবিতায় সেই দুর্লভ কাব্যপ্রযুক্তির সন্ধান মেলে, সারাজীবন ত বটেই—এমন কি ঐ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার মধ্যেও এর যোগ্য প্রতিনিধি পাওয়া কঠিন। ‘কুঞ্জবনে মরণ বটে তাজা’—এখানে ‘কুঞ্জবন’-এর রোম্যান্টিক তথা বৈষ্ণবপদাবলীর হৃদয় অনুষঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল যার্থ্য এনেছে ‘রটে’ এই ক্রিয়াপদ ও ‘তাজা’—এই বিশেষণ। এতে কুঞ্জবনের স্বাভাবিক পেলবতা নির্বাসিত হ’য়ে স্বপ্ন ব্যঙ্গের ঋজুতা স্থান অধিকার করেছে। অবশ্য এই জাতীয় কবিতা বুদ্ধদেব কেন লিখেছিলেন তা যেমন জানি না, এধরণের কাব্যাদর্শ বরাবর তিনি কেন অনুসরণ করলেন না তাও আমাদের পক্ষে বলা কঠিন।

ফলত বুদ্ধদেব বসু’র কবিতা বলতে কবিতার অভ্যস্ত পাঠকের কাছে যে-

চিত্র ফুটে ওঠে তাতে তাঁকে তিরিশের যুগের সাম্প্রতিক কবি বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এ কথা বললেও তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িকদের প্রবর্তিত যে-রোম্যান্টিক আবেগে প্রায় শতাব্দীব্যাপী বাঙালী পাঠক অভ্যস্ত ছিল বুদ্ধদেববাবু সেই অভ্যস্ত চৈতন্যকেই তৃপ্তি দিয়ে গিয়েছেন। এই ধরনের তৃপ্তিদানের ব্যাপারকে এলিয়ট খুব স্ননজরে না দেখলেও পাঠকের অভ্যস্ত কলাকৌশলে বা ভাষায় কথা বলার মস্ত সুবিধে হচ্ছে এই যে লেখকের ভাগ্যে নগদ পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটে। ভাবতে অবাক লাগে,

প্রতিরক্ষা বণ্ডে
লগ্নী করার অর্থ
নিরাপত্তার জন্যে লগ্নী

বাংলাদেশের মত নিগ্রহ মননের জায়গায় আট বৎসরের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার দুইটি সংস্করণ বেরিয়ে গিয়েছে। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবি নেই সেদেশে অন্ধকবির বই বিক্রী হওয়াই ত একটা আশ্চর্য ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে জীবনানন্দের এই সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু জীবদ্দশায় বুদ্ধদেববাবুর এই সাফল্য অচিস্তনীয়। এইসব কথা বুদ্ধদেব বহু'র ভবিষ্যৎ পাঠক হিসেবে আমার বলা তত কৃতিত্বের দাবী করতে পারে না যতখানি কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছিল তাঁর সমসাময়িক সুবীন্দ্রনাথের পক্ষে। বহুবছর আগেই বন্ধুবান্ধবের সমস্ত সাফল্য বর্তমান রেখেও সুবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বহু' সম্পর্কে প্রায় শেষ কথা বলে গিয়েছিলেন—“...প্রসাদগুণের সংজ্ঞা-নিরূপণে তাঁকেই (বুদ্ধদেব বহু'কে) প্রতিমানরূপে ব্যবহার করলুম এই কারণে যে তিনি আমার বিপরীত; ...তাঁর একাধিক ক্রটি—যথা, উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন, গল্প-পত্নের বিরোধভঞ্জে ওদাস্ত, অথবা ইংরাজী বাচনিক পদ্ধতির হুবহু অনুবাদ—আমাকে যেমন পীড়া দেয়, তেমনি বিশ্বয় জাগায় তাঁর অবাধ, অনায়াস, ও সমান্তরাল ভাবনা-বেদনা।”

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ

জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধরাজির সূচীপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল : কাব্য ও কলাবিজ্ঞান, মানবসমাজ ও গৃহস্থজীবন, আর মানবচিন্তা ও মানবজীবন। এই বিচিত্র বিষয়-সমূহের মধ্যে তাঁর রসগ্রাহিতা চিন্তাশীলতা এবং অন্তর্দৃষ্টির একটা সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের কাব্য ; কণারক, খণ্ডগিরি, বারাগমী, রবিবর্ণা প্রভৃতি শিল্প ও শিল্পীর সৌন্দর্য ; শুভউৎসব, নিমন্ত্রণসভা প্রভৃতি সামাজিক অস্থিতির সামাজিক মূল্য এবং অশ্রুজল, গান, কাহিনী প্রভৃতি প্রবন্ধে মানুষের জীবন-গত সত্যউপলব্ধির যে সব আলোচনা বলেন্দ্রনাথ করেছেন, তারই মধ্যে তাঁর মনের এই সামগ্রিক পরিচয়টি নিহিত।

কাব্য ও কলাবিজ্ঞানের আলোচনায় বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে কোথায় কি দেখবার ও বুঝবার, আশ্বাদনের ও উপভোগ্যের আছে, তা তিনি দেখেছেন এবং অপরকে দেখিয়েছেন। অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি যেমন প্রতিপাত্ত বিষয়কে বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি আবার বাইরে থেকে সমস্ত বিষয়টির আকৃতিগত রূপটুকু দেখতেও ভোলেননি। এই বিচারে, কখনও কোনকিছু যদি তাঁর সামঞ্জস্য ও ঐচ্ছিক্যবোধকে আহত করে থাকে, তবে মুহূর্ত্তে তিনি সেই ত্রুটি দেখিয়ে দিতেও পরাঙ্মুখ হননি। কিন্তু বিশ্লেষকের মত কেবল দোষদর্শন এবং হীনতার-আবিষ্কারই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—সৌন্দর্য-আবিষ্কারই ছিল তাঁর প্রধান কাজ এবং সেইজন্তই যে সৌন্দর্য অপরের চোখে প্রকাশ পাত না, তাকে যেমন তিনি সকলের সম্মুখে প্রকাশ করে তুলেছেন, তেমনি যে অসৌন্দর্য সৌন্দর্যের নামে ঐতকাল অভিনন্দন লাভ করে এসেছে, তার প্রকৃত স্বরূপকেও তিনি প্রকাশে তুলে ধরেছেন।

কণারকের মন্দির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ কণারকের দেবতা এবং তদসম্পর্কিত মানুষের জীবন ও বিশ্বাসের প্রসঙ্গও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা হয়তো তাঁর বিশেষ প্রবন্ধ-প্রবণতার দিক থেকে প্রয়োজনীয়। কিন্তু মন্দির-সম্পর্কিত এই তত্ত্ব-আলোচনার প্রবেশ করবার পূর্বে তিনি অভিনিবেশ সহকারে মন্দির-গাত্রের শিল্পকার্য পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন দেখে যে, “পাষণে প্রাচীন ভারতবর্ষ আপনাকে কি সুন্দর ভাবেই

মুদ্রিত করিয়াছে।” কিন্তু “মন্দিরের সমস্ত ভিত্তি পূর্ণ করিয়া (যে) নগ্ন নারী মূর্তি,”—তার শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করলেও রুচির দিক থেকে তার গৌরবকে তিনি স্বীকৃতি দিতে পারেননি। বলেছেন, “অধিকাংশ স্থলেও অত্যন্ত কুৎসিত কল্পনায় শিল্প-গৌরব সমুচিত।”

বলেন্দ্রনাথের রসগ্রাহিতা ছিল একরূপ বিচারনির্ভর। সৌন্দর্যকে কেবল সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে তিনি বিচার করতেন না, তার সঙ্গে মানুষের প্রেয় ও শ্রেয় বোধকেও তিনি বিজড়িত করে দেখতেন। এবং যে শিল্পের শিল্পীর এই প্রেয়বোধ স্থলিত, সেই শিল্প ব্যাকরণের বিচারে উন্নত হলেও, তার গৌরবকে তিনি স্বীকার করতে পারেননি। এ সম্পর্কে ‘জয়দেব’ প্রবন্ধে তিনি যেকথা বলেছেন, তার মধ্যেই তাঁর শিল্পরস-গ্রাহিতার সমগ্র পরিচয়টি নিহিত : “গ্রীষ্মীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্নগঠন যেন স্বভাবতঃই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিশ্চয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না।”

এখানেই বোঝা যায় বলেন্দ্রনাথের শিল্পরসবোধের স্বরূপ। তাঁর এই রসবোধের মধ্যে কোনপ্রকার গোঁড়ামি নেই, কোনপ্রকার পূর্বসংস্কারও নেই। সম্পূর্ণ খোলা মন এবং শাস্ত্রত মানবিক কল্যাণের আদর্শ নিয়ে তিনি শিল্প-বিচার করেন। এবং সেই বিচারে মানবিক দিক থেকে কুৎসিত কল্পনার সঙ্গে তিনি আপোসহীন।

কাব্য ও শিল্পের সমালোচনা ছাড়াও বলেন্দ্রনাথ শুভউৎসব, প্রাচ্য প্রসাধনকলা, নিমন্ত্রণসভা প্রভৃতি প্রবন্ধে মাঝে মাঝে ভিন্নধরনের চিন্তাশীলতার পরিচয় রেখে গেছেন, তা যেমন আকস্মিক, তেমনি বিস্ময়কর। ‘নিমন্ত্রণসভা’ প্রবন্ধটির মধ্যে এক নতুন চিন্তারাশির পরিচয় রয়েছে, যে সম্পর্কে রামেন্দ্রচন্দ্র ক্রিবেদী মহাশয় বলেছেন, “প্রবন্ধটির মধ্যে আমাদের বাঙালী হিন্দুগৃহস্থের অন্তঃপুরের ‘শ্রীহস্ত’ ও ‘শুভদৃষ্টি’ ; গৃহিণীর ‘লক্ষ্মীশ্রী’ ও ‘কল্যাণীমূর্তি’ ; আমাদের সামাজিক অস্থিচ্যূতের মূলে ‘শুভসংকল্প’ প্রভৃতি কয়েকটি নতুন কথা পাইলাম, যাহা ইতঃপূর্বে আর কোন শিক্ষিত স্বদেশীর মুখে এমনভাবে শুনি নাই।…… বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথায ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা অবিকৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।”

বাস্তবিক আমাদের আচার-অস্থিচ্যূত এবং ক্রিয়াকর্মাদির সঙ্গে একটি সামাজিক কল্যাণবোধ এবং সম্প্রীতির ব্যাপার যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে,

তা সহসা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। এবং অনেক সময় এই না-বোঝার গরিমাতেই ঐ সব আচার-অনুষ্ঠানকে আমরা পরিত্যাগ করি। কিন্তু বলেন্দনাথ একটি প্রবল আন্তিক্য-বোধ নিয়ে এই সব ক্রিয়াকর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং সুগভীর চিন্তাশক্তির সাহায্যে, এই সব ক্রিয়াকর্মের পিছনে যে লোকায়ত ধ্যান-ধারণার অবদান রয়েছে, তাকে উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন; “কথায় কথায় যাহাদের শর্তাধিক লোক জমিয়া যায়, এবং দফায় দফায় যাহাদের প্রাক্ষণ নিকাইয়া আসন বিছাইতে হয়,”—তাদের পক্ষে পাস্চাত্য ভোজনভার মত আড়ম্বর করা অসম্ভব ও অসঙ্গত। তাই হৃদয়তা এবং আত্মীয়তাই তাদের একমাত্র প্রশস্ত পথ।

এইজন্যই “আমাদের নিমন্ত্রণ ব্যাপারে গৃহস্থের বড় একটি মনোহর বিনয় প্রকাশ পায়। এবং তাহাতেই তিনি সর্বজনের সহায়তা ও সহায়ত্ব লাভ করেন।” অর্থাৎ একদিকে গৃহস্থের প্রীতি-প্রযত্ন, আরেকদিকে অতিথির শুভ-কামনা; একদিকে গৃহস্থের সংযত নিষ্ঠা, আর একদিকে নিমন্ত্রিতজনের অক্ষুণ্ণ সম্ভাব—এর মধ্য থেকে গড়ে ওঠে একটা সর্বাঙ্গীণ হৃদয়তা এবং পুরিতোষ,—এই হচ্ছে নিমন্ত্রণসভার প্রাণবস্ত। “এখানে পাত প্লাতিয়া বসিয়া খাইতেও স্ব্থ এবং দৃঢ়রূপে কটি বাঁধিয়া পরিবেশন করিতেও আনন্দ।”

আমরা যেসব শুভ উৎসব উদ্‌যাপন করি, বলেন্দনাথ দেখিয়েছেন,—সেখানেও একটি সামাজিক সম্প্রতি ও কল্যাণবোধই আসলে শ্রদ্ধা পেয়েছে। তিনি বলেছেন, “আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহ-সহকারে আমোদ প্রমোদ করায় আমাদের উৎসব কলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসব প্রাক্ষণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি স্নানমুখে কিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়।”

বলেন্দনাথের এই সমস্ত ব্যাখ্যা থেকেই তাঁর সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সুগভীর চিন্তাশীলতার কেবল মানব-সমাজ ও গৃহস্থজীবন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তা সঞ্চারিত। তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ব্যাখ্যা-সমন্বিত, মন-গড়া কল্পনাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। পূর্বপুরুষেরা যা করে এসেছেন, তা আমাদেরও করা উচিত,—এই ধরনের চিন্তাবিহীন বশতা তাঁর ছিল না।

রসগ্রাহিতা, চিন্তাশীলতা ছাড়া বলেন্দনাথের প্রবন্ধে আর একটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটি বলেন্দনাথের অন্তর্দৃষ্টি। অবশ্য প্রকৃত পক্ষে

অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর রসগ্রাহিতা এবং চিন্তাশীলতার মূলভিত্তি। এবং এই তিনটির কোনটিই পৃথকভাবে খুববেশী স্মৃতিলাভ করতে পারে না,—এই তিনটির সমবায়েই এককটির সম্পূর্ণতা কিন্তু তথাপি এককক শ্রেণীর প্রবন্ধে তাঁর এক-একটি দিক স্পষ্ট হয়েছে বেশী। যেমন, কাব্য ও কলাবিজ্ঞা বিষয়ক প্রবন্ধে বিষয়বস্তু রসতত্ত্বের; তাই সেখানে লেখকের রসগ্রাহিতার পরিচয়ই মুখ্য। আবার মানব-সমাজ ও গৃহস্থজীবন বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বিষয়বস্তু সমাজ-তত্ত্বের; তাই সেখানে লেখকের স্ননিপুণ অভিনিবেশ ও স্নগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয়ই মুখ্য। তেমনি কতকগুলি প্রবন্ধ আছে, যেমন, অশ্রুজল, কাহিনী, গান, প্রভৃতি যেমন বিষয়বস্তু নিছক উপলব্ধির, জ্ঞানের বা বোধের নয়। তাই সেখানে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়টিই ভালোভাবে পাওয়া সম্ভব।

“পৃথিবীর মহাকোলাহলের একপ্রান্তে একটি ভগ্নকুটীর”—এবং সেই কুটীরটিকে উপলক্ষ্য করে লেখক মানবজীবনের স্বচ্ছতা, হাসিকান্না, জন্মমৃত্যুর কাহিনীকে স্তবকে স্তবকে স্মরণ করেছেন। কুটীরটি যেন একটি রূপক, মানুষের কথাই যেমন তাঁর আসল বক্তব্য। কুটীরটিকে উপলক্ষ্য করে তিনি যে সব কথা বলেছেন, তার মধ্যেই জীবন-সম্পর্কে লেখকের এই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে : “তাহার জীর্ণ-শীর্ণ দেহখানি জড়াইয়া প্রতিদিন শত সহস্র আশালতা বদ্ধিত হইয়াছে—তাহার মুমূর্ষু প্রাণের শেষ কামনাগুলিকে মরণের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার যৌবনের বিলাসিতা, এখন শুধু স্মৃতির কোমল বাঁশীর স্বরে আধো আধো জাগিয়া রহিয়াছে।—শেষাবস্থার পারমার্থিক ভাবের খানিকটা ছায়া তাহার মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। তাহার দেওয়ালে একটু সেওলা কবিত্বের মাধুরীর মত একটুখানি ঘুমন্ত স্বপ্নের ছায়া। আর তাহার স্রিয়মাণ মুখখানির উপরে মরণের চির আনন্দময়ী প্রতিমার একটুকু স্নানবসি।”

অন্তর্দৃষ্টি স্নগভীর না হলে একটি ভগ্নকুটীরকে অবলম্বন করে এই গূঢ় উপলব্ধির সৃষ্টি হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ‘ঘাটের কথা’, ‘রাজপথের কথা’—তেও এই ভাবে চাক্ষুষ বিষয়কে উপলক্ষ্য করে মানুষের জীবনের কথাই বক্তব্য করা হয়েছে। অন্তর্দৃষ্টি অবসময়েই এইভাবে বস্তুকে অতিক্রম করে তত্ত্বের দিকে এগিয়ে যায়। এবং এই অবস্থায় বস্তু আর বিশেষ থাকে না, নির্বিশেষ সর্বজনীনতা লাভ করে। ‘কুটীর’কে অবলম্বন করে ‘জীবন-মৃত্যুর কাহিনী’র অবতারণা এইজন্মই সম্ভব। চর্যচক্ষুর এই দৃষ্টিশক্তি নেই, এ শক্তি অন্তরের, অন্তরই উপলব্ধির মাধ্যমে এই দৃষ্টিলাভে সক্ষম। এই

জগুই অস্তদৃষ্টির সঙ্গে উপলব্ধির সম্পর্ক এত নিবিড়। বলেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন,—“সকল মনুষ্যেরই হৃদয়তন্ত্রীতে একখানি স্বর কেমন লাগিয়া থাকে। সেই স্বরে যেদিন আঘাত পড়ে, সেইদিন মহা যেন তাহার জীবনে কি পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহার হৃদয়ের মর্মে মর্মে কি যেন তড়িৎ শ্রোত বহিয়া যায়; আপনাকে কোথায় যেন ধরিতে পাইয়া সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, তাহার নয়ন ভরিয়া ‘অশ্রুজল’ বারিতে থাকে।” তাই বলেন্দ্রনাথ বলেছেন, “অশ্রুজল ত’ আর কিছু নহে, হৃদয়ের নীরব ভাষা হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর ধরিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে।”

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যে রসগ্রাহিতা, চিন্তাশীলতা এবং অস্তদৃষ্টি ফুটে উঠেছে, তার মধ্যেই তাঁর বাঙালী-ভদ্রকচির একটি পরিচয় পাওয়া যায়। রুচি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর কোন সংস্কার বা পিউরিটান মনোভাব ছিল না। কিন্তু এই না-থাকার অর্থ এই যে, রুচিবোধ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একজন বাঙালী ভদ্রব্যক্তির পক্ষে পাশ্চাত্য-বিলাসিতার উগ্রতা এবং তার ঠিক বিপরীত ‘সংস্কৃত গোঁড়ামি’ উভয়কেই পুরিহার করে যে বাস্তবতা-সম্মত রুচি ও মূল্যবোধ রক্ষা করা সম্ভব ও সম্ভত, বলেন্দ্রনাথের সেটুকুই ছিল। তিনি ফরাসী চিত্রকলার অশ্লীলতা এবং ‘জয়দেবের’ কাব্যের “জঘন্মতার”—উভয়েরই নিন্দা করেছেন, কিন্তু নরনারীর মধ্যকার যে স্বাভাবিক জৈব আকর্ষণ, তাকে স্বীকার করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। এইজগুই খুলনার রূপে মুগ্ধ ধনপতিকে তিনি সমর্থন করেছেন।

সেকালের বাঙালী-ভদ্রকচিতে অস্তঃপুরচারিণীদের প্রকাশ্যে আগমন যে অস্তঃপুরের মর্যাদার পক্ষে হানিকর, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে তা বোঝা যায়। তিনি নারীজাতিকে অস্তঃপুরের কাজকর্মের মধ্যেই গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্যে মগ্নিত দেখতে চেয়েছেন। তাই তাঁদের পক্ষে কোনরকম লঘুতার প্রদ্বয় দেওয়া তিনি সমর্থন করেননি : “আমাদের কুলকল্যাণের এতদূর অবনতি ত’ বিশ্বাসই হয় না।” কিন্তু তিনি যে নারীর স্বাভাবিক স্বীকার করেন না তা নয়, অস্তঃপুরের মধ্যে যে স্বাভাবিক তাঁদের স্বাভাবিক অধিকার, তাকে তিনি শ্রদ্ধাই করেন। তাই তিনি নিমন্ত্ৰণসভায় উপলব্ধি করেন, “অস্তঃপুরিকাজনের কুতূহলী কুবলয় দৃষ্টি সমস্তপ্রস্তুত অনব্যাঞ্জন ও নানাবিধ অভিনব গিষ্ঠানাদিতে একটি মনোহারিণী শ্রীতি সঞ্চারিত করিয়া দেয়”—এইখানেই বলেন্দ্রনাথের যথার্থ রসবোধ; এর মধ্যে পাশ্চাত্য ‘গ্যালারি’ নেই, এবং ভণ্ডের গোঁড়ামিও নেই, কেবল যথার্থ কৌতুক প্রবণতা।

তিন সংগীর রবিবার

গৌতম গুপ্ত

“তিন সংগী” রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাঙ্কে বিশ্বমহাকাশ যখন “মহা-আশংকা জপিছে মৌন মন্তরে,” “তিন সংগী” সেই সময়কার ফসল। ক্ষুদ্র-বিষণ্ণ কবি-মানসের সেই সময়কার প্রতিফলনের স্রোতায় গাঁথা পাশাপাশি তিনটি হীরকখণ্ড “তিন সংগীর” তিনটি গল্প : ‘রবিবার’ ‘শেষকন্দ’, ‘ল্যাবরেটরী’।

প্রথমেই আসা যাক “রবিবার” প্রসঙ্গে। এবং এ আলোচনা শুধু এই একটি গল্পের মধ্যেই সীমিত থাকবে। গল্পটির নামকরণ সম্বন্ধে জীনা রায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক জায়গায় বলেছেন—“সমস্ত কর্মচেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্য ব্যতিরিক্ত ছুটির দিনের একটি শান্ত মাধুর্য দিয়ে গল্পটি গড়া।”

কোন এক ইংরাজ-লেখকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বার বার মনে আসছে। উক্তিতে এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না বলে উদ্ধৃত করছি : “Well, was it ordained that the day of devotion should be a day of rest.”

এবারে “রবিবার” নামকরণ সম্বন্ধে নারায়ণবাবুর বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই লক্ষণীয় গল্পটির শুরু ও সমাপ্তি দুটোই সংঘটিত হয়েছে রবিবারের ছুটির দিনের শান্ত মাধুর্যের আবহাওয়ায়। উপরে-উদ্ধৃত ইংরাজ লেখকের উক্তির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে কোন কিছুর প্রতি একাগ্র মনোনিবেশের বা সামগ্রিক ঐকান্তিকতার জন্মে প্রয়োজন অত্যন্তব কিছুর থেকে ছুটি। কর্মমুখরতা সর্বাঙ্গীণ ঐকান্তিকতাকে থর্ব করে। “রবিবার” গল্পেও সেই সর্বাঙ্গীণ ঐকান্তিকতা—সেই আত্মসমর্পণের ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি।

আর একটু স্পষ্টতায় নামা যাক। প্রচণ্ড আধুনিক, চঞ্চলচিত্ত অভীকের বিভার কাছে ছুটে আসা কি শুধুই তাকে জয় করবার উদগ্র কামনায়? বিভা তার ছবি বুঝতে পারেনি, তাকে আর্টিষ্ট বলে স্বীকৃতিও দিতে পারেনি তবু সে তারই কাছে ছুটে এসেছে বার বার—সে কি শুধুই নিজের ব্যক্তিত্বের আর স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি আদায়ের অজুহাতে?

একথা মনে জাগ্রা কি একান্তই অযৌক্তিক যে সর্বসমক্ষে নিজেকে জাহির করবার সদর্প চেষ্টায় তার যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির আর উদ্দীপনার অপচয়

ঘটছিল, বিভার প্রশান্ত অচঞ্চল মহিমার সান্নিধ্যে ছুটে আসা সেই অপচয় পুতিরই আকুলতার? যদি বলা যায় এর পশ্চাতে কিছুটা আত্মপ্রচারের প্রয়াস থাকলেও অনেকখানিই চিন্তাশুদ্ধির আকৃতি?

আর এই চিন্তাশুদ্ধির কারণেই প্রয়োজন হয়েছিল ছুটির দিনের শান্ত মাদুর্য। যুক্তিতর্কের ধ্বজাবাহী চঞ্চল অভীক জানতেই পারেনি বিভার স্তব্ধতার গভীরতা কখন তার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি ক্লাস্তিটুকু শোষণ করে নিচ্ছে।

প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক এবার। “রবিবার” গল্পের মূল চরিত্র অভীক। অভীক নাস্তিক, অভীক অদ্ভুত—অভীক “সৃষ্টিকর্তার অট্টহাসি”। অভীককে হঠাৎ “অমিত রায়” মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু দুজনের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকলেও অমিলেরও অভাব নেই। দুজনেই প্রচণ্ড আধুনিক। অনিয়মই এদের কাছে নিয়ম। দুটি চরিত্রই গতিপ্রবণতার অজস্রতায় স্পন্দিত।

অভীক নাস্তিক। কিন্তু মনে হয় এ নাস্তিকতা তার ক্যাশান। আর পাঁচজনে যা আমি তা নই—আমি তার থেকে স্বতন্ত্র। এই বার্তাটুকু প্রচার করার উদগ্র কামনায় অভীক নাস্তিক। নাস্তিকতা তার শুধুই ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের বিরুদ্ধে নয়, যা কিছু স্বাভাবিক তারি বিরুদ্ধে।

করির নিজস্ব বর্ণনাকেই এখানে সাক্ষ্য হিসাবে ডাকা যাক : “ওর নামটা ভিড়ের নামের সংগে হাটে-বাজারে ঘেঁসা-ঘেঁসি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।”

অতএব অভীক অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিকতা প্রথমে ক্যাশান এবং পরে বিকারে পর্যবসিত। বিভার কাছে তার সমস্ত যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য-বিশ্বাস ব্যর্থ নিশ্চেষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই ফোভই তাকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছে। বিভার ঈর্ষাকে খুঁচিয়ে তোলার জন্মে অভীক নানা ছলকলার আশ্রয় নিয়েছে। বিভার সঙ্গে শীলা সংক্রান্ত আলোচনাও তাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলার উপায় হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বিভা কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেও বিচলিত হয়নি। তাই সে বলতে পেরেছে, “তোমার ছুটুমি কতক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে—তোমার পক্ষে একটুও না!”... বিভার মুখের শুধু এই কথাটুকুতেই অভীক চরিত্রের অনেকখানি বিদ্যুত।

আবার যখন বিভাকে বলতে শুনি : “হয়তো তুমি কিছু পেয়ে চাও—কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পারো না” তখন অভীক-চরিত্রের আর এক দিক বাহ্যিক হয়ে ওঠে। বিভার মুখনিঃসৃত এই সংলাপ বিন্দুতে সিদ্ধ এনেছে।

অভীকের সমস্ত ছলকলা যুক্তিতর্কের লক্ষ্য ছিল বিভাকে পাওয়া। তাকে নিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করা। নিঃসন্দেহে এ চাওয়া তার অত্যন্ত স্বস্থ চাওয়া। আর এইখানেই অস্বাভাবিক বিকারগ্রস্ত অভীকের জীবনযুক্তিকায় পদচালনা। গল্পের শেষে দেখা যায় বিভাকে না-পাওয়ার বেদনায় অভীক দেশত্যাগী। দেশত্যাগের পর তার বিকারমুক্তি ঘটেছিল এর সাক্ষ্যবহন করছে তার ষ্টিমারের ছাপমারা চিঠিটি। এ চিঠিতে অভীকের আত্মপ্রতীতির যে নতুন স্তর ধ্বনিত তা একান্তই রাবীন্দ্রিক। একে চিঠি না বলে কবিতা বলাই উচিত। মনে হয় গীতিকবির হৃদয়াবেগের স্পর্শে এ চিঠি কখন যে কবিতা হয়ে উঠেছে তা কবি নিজের জানতে পারেননি।

মনে রাখা দরকার এ গল্পে অতীক চলমান জীবনের—উদ্যম যৌবনের প্রতীক। কিন্তু সে সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন—খণ্ডিত। প্রচণ্ড আধুনিকতার বিকারে সে জীবনের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকেই অস্বীকার করবার চেষ্টায় ব্যস্ত। এ বিকার আধুনিক সভ্যতার অন্ততম সমস্যা। যে সময়ে এ গল্প লেখা তখন সমগ্র ইউরোপ তথা সমগ্র পৃথিবী খুঁই বিকারে আচ্ছন্ন। যুদ্ধপূর্ব সেই বিকার কবিমানসে যন্ত্রণার ছায়া ফেলেছে। অতীকের চরিত্রেও সেই যন্ত্রণার সম্বল। এই যন্ত্রণার কারণেই অতীককে মাঝে মাঝে ক্লান্ত বোধ হয়।

উচ্চুল যৌবনের প্রতীক অভীক বারে-বারে ডাক পাঠিয়েছে বিভার

হৃদয়কন্দরে। বিভাও রোমাঞ্চিত। লোভে কম্পমান। কিন্তু তবু সে পারেনি সংস্কারের বাধ ভেঙে ফেলতে। এর মূলে যদিও রয়েছে বিভার চারিত্রিক দুর্বলতা, অতীকও কম দায়ী নয়। বিভার পরিপূর্ণ মহিমা অতীকের কাছে অনাবিস্কৃত। নিজস্ব সৌন্দর্যবোধের ধ্যান-ধারণার মূল্যায়নের মাপকাঠিতে অতীক তাকে খণ্ডিত করে দেখেছে। বিভার মাঝে শিল্পী যেন খুঁজে পেয়েছে শুধুই তার inspiration।

আরো আছে। মনীষা সংক্রান্ত আলোচনায় অতীকের নির্বিকার উক্তি,... “তার ভালবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয়—তার চেয়ে আর কী হতে পারে” বিভাকে বিভ্রান্ত করেছে, পীড়িত করেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অতীকের যৌবনদীপ্ত আকর্ষণ বিভার অভ্যাসিকতা মন্থর পরিবেশকে অসহনীয় করে তুলেছে। তার ডাকে সাড়া দিতে না পারায় বিভার হৃদয় স্তনিত হয়েছে—রক্তাক্ত হয়েছে। তবু সে পারেনি জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে। প্রশ্ন জাগে একি শুধুই তার পিতার ইচ্ছার মর্যাদাহানির আশঙ্কায়। পিতার ইচ্ছা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হলেও মানবিক উচ্চতার অতীককে স্বীকার করায় তার বাধা ছিল কোথায়? কিন্তু বাধা এসেছে। এবং এসেছে অতীকের দিক থেকেই। উগ্র আধুনিকতার আবর্তে পড়ে অতীক নিজ মূল্যকেও খর্ব করেছে। শুধুমাত্র মনীষার নিজের টেনেই বলা যায় অতীক স্বহস্তেই বিভাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

বিভার আশঙ্কা জেগেছে তাকে অতীকের প্রয়োজন। বিভার নিজের সাক্ষ্যই তুলে ধরা যাক.....“মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে ঝড়া সখ্য, এই অসম্ভব অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভাল লাগে না।”

গভীরভাবে না দেখলে বিভাকে সংস্কারাচ্ছন্ন বলে মনে হওয়া ~~থাক~~ স্বাভাবিক। কিন্তু এটাই সব নয়। তার চরিত্রের অল্প দিকও রয়েছে। এবং সেটাই তার সত্যকার রূপ। বিভা শান্ত গভীর। আপন মহিমার অচঞ্চল বিভা তন্ময়তায় লীন। ওর এই স্থিতিমুখীনতা যেন নিঃসীম ঘননীল আকাশের প্রতীক। অতীককে নিজের জীবনের অংশীদার করে নেওয়ায় সংস্কারগত বাধা থাকলেও অতীকের প্রতি তার ভালবাসার অভাব ছিল না। তাই সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে, কবে তার বিকারমুক্তি ঘটবে। কবে সে স্বাভাবিকতায় অবগাহন করবে।

অতীকের ছেলেমানুষী—তার উগ্র আধুনিকতা বিভার হৃদয়াকাশে ক্ষণে

ক্ষেণে জনভরা মেঘের আবির্ভাব ঘটলেও তার অসীম ব্যাপ্তির কাছে সেটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সামান্য একটু সংস্কারের ক্রটি ছাড়া বিভা-চরিত্র অসীম অপার। অতীক তাকে খণ্ডিত করে দেখেছে তাই তার নাগাল পায়নি। বিভার অন্তর-বেদনার খোঁজ সে কোনকালেই পায়নি।

হয়তো আরো কিছুকাল এমনি চলতো। এমনি মান-অভিমান—এমনি হাসিকান্না। কিন্তু হঠাৎ মাঝে এসে দাঁড়ালেন গাণিতিক অমরবাবু। তাঁর কোপেনহেগেন যাত্রার পাথেয় সংগ্রহের আগ্রহে বিভা তার মার অলংকার বিক্রয় করতে উত্তম মাত্র—এই সমাচারটুকু অতীকের জীবনে আণবিক শক্তির কাজ করেছে। এর ধাক্কায় অতীক ছিটকে পড়েছে আপন কেন্দ্রবিন্দু থেকে। তারপরেই সে নিরুদ্দেশ। এটা ঈর্ষা নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ ঈর্ষা গৌরববহ। এখানে অতীকের পৌরুষ বলকিত।

তারপরেই এল ষ্টিমারের ছাপমারা চিঠি। সেই সতাকে পাওয়ার বেদনার বারিসিঞ্জে সিন্ত আশ্চর্যসুন্দর নিটোল কবিতাটি। ষ্টিমারের ছাপমারা এই চিঠিকে রবীন্দ্রনাথ দ্বৈত ভূমিকায় নামিয়েছেন। এর দর্পণে একই কালে পাশাপাশি দুটি চরিত্রই প্রতিফলিত। ভালবাসার অভাবনীয়তায় উজ্জল অতীক আর স্নিগ্ধ অচঞ্চল বেদনাবিধুর বিভা। মূল গল্পে অতীক অনেক কথা বলেছে, অনেক হৃৎসাহসিকতার নিদর্শন রেখেছে। তবু সে অস্পষ্ট—অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই চিঠিতে তার জীবনচৈতন্যের যে ছায়া পড়েছে তাতে মনে হতে বাধা নেই যে সে সম্পূর্ণতার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

এ গল্পে বিভা-অতীকের প্রেম কি পরিমাণে জীবনসিদ্ধ এ তর্ক নিস্প্রয়োজন। কারণ এর স্রষ্টা রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ। এদের মিলন না ঘটিলে কবি অতীককে দেশত্যাগী করিয়েছেন। এবং আশ্চর্য সুন্দরভাবে এটা সংঘটিত হয়েছে। আর একটা কথা। বিভার স্তব্ধতার গভীরতা আর অমরবাবুর কোপেনহেগেন যাত্রা দুটো বস্তুই অতীকের বিদেশযাত্রার পটভূমি রচনা করেছে। এর জগ্নে শুধুমাত্র অমরবাবুই দায়ী নন। পরিশেষে বল্য যায় বিভার প্রেম সম্বন্ধে অতীকের কোন সংশয়ই ছিল না। এবং তাকে স্বীকার করে না নিতে পারার দুঃখ যে বিভাকে কতখানি বাজে এও অতীকের অজানা ছিল না। তা সত্ত্বেও বিভা যে শান্ত মহিমায় সমাহিত এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাই অতীককে অত্যাশ্চর্যভাবে চকিত করেছে।

অতীকের মুখে যখন শুনি : “বিশ্বস্থিতির সমস্ত ছেলেখেলা ধরবার জগ্নে আকাশ শূন্য হয়ে আছে”, তখন মনে এই প্রশ্নেরই কানাকানি জাগে যে এ কোন আকাশ? একি সত্যই নীল অসীম আকাশ! না অতীকের সকল ক্রটি-বিচ্যুতিকে অসীম ক্ষমায় শোষণ-করা বিভার হৃদয়াকাশ।

পথ চলে গেছে

সমর সোম

[পূর্বাত্মবৃত্তি]

জীপ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি এক প্রোট এগিয়ে আসছেন। মোহনজীকে দেখে আরো দ্রুত হয় তাঁর পদক্ষেপ। তিনি এই মন্দির-ব্যবস্থাপকদেরই একজন।

কাছাকাছি আরো একটি ভিড় জমা হয়ে উঠছে।

সবল রাজপুত যুবকের হাতে ফুলমালা। হয়তো কোন ক্লাবের উৎসাহী সভারা কিম্বা ভাড়াকরা ব্যাণ্ডপাটী অপেক্ষা করছে ভারতীয় জনসংঘের সেক্রেটারী দানদয়াল শর্মার অভ্যর্থনায়।

মন্দিরচত্বরে ঢুকি।

মনে পড়ে আফগান-সন্তান মহম্মদের কথা। তাঁর সময় থেকেই ভারতের কৃষ্ণ-মন্দিরগুলোর ওপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। আজ নাথদ্বার-মন্দিরের হাজারো হাজারো ভক্তের ভিড়ের মধ্যে আর-একটা ইঁবি ফুটে উঠতে চায় যখন শাহনাই থেমে যাচ্ছে, পুরোহিত ও ভক্ত উভয়েই বিগ্রহ নিয়ে, মন্দির নিয়ে স্তম্ভস্ত। দেববিগ্রহ বারবার শুধু ঠাইনাড়া হচ্ছেন।

মনে পড়ে আবার সেই সন্ন্যাসী মোঘল সম্রাটদের কথা—যাদের সহিষ্ণু মনোবৃত্তি, উদারতায় দেবতা আবার মন্দিরে ফিরে আসছেন।

মনে পড়ে মোঘল সম্রাটদের দুটি দলের কথা। একপক্ষ পছন্দ করতেন শৈবদের, অন্যপক্ষ চাইতেন বৈষ্ণবদের। আকবর ছিলেন কৃষ্ণ-রাধার অনুরাগী, জাহাঙ্গীর ছিলেন কৃষ্ণশ্ৰেণিক, কিন্তু শাহজাহান ছিলেন শিবঅনুরাগী।

অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা ও যুদ্ধের মধ্যে সভ্যতা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার অসংখ্য নিদর্শন সারা ভারত জুড়ে ছড়ানো। ভারতের মাটিতে ধ্বংস আর রক্তপাত কিছু কম হয়নি। মৃত্যু আর বিভীষিকাও এর ইতিহাসে কিছু কম নেই। তবু জীবন এখানে শুধু ছড়াতে চেয়েছে, সভ্যতা এখানে মাথা উঁচু করে থাকতে সংগ্রাম করেছে। শাহনাই-এর স্মরণ থেমে যাননি।

আজকের সকালের নরম রোদে, সোনা আলোয় মন্দিরের মাথার দিকে তাকিয়ে দেখি মৃত ইতিহাসের মুখে জীবন্ত হাসি। সে যেন শাহনাই-এর

স্বরে রোজই এখানে এমনি করে প্রহরে প্রহরে জেগে ওঠে, জীবন্ত হয়। সে বলে—‘দেখো একলক্ষ রাজপুত্রের শির উৎসর্গ দেবার জন্তে প্রস্তুত হয়েছিলেন রাজসিং শুধু শ্রীনাথের জন্তে। আর তোমরা? কোটি কোটি ভারতবাসী নিজেদের রক্ষা করার জন্তে নিঃস্বার্থভাবে আজ কত শির উৎসর্গ দেবার জন্তে প্রস্তুত বল তো?’

প্রাচীরে সোপানে অসংখ্য পাথর যেন অকস্মাৎ কথা বলতে শুরু করে। স্পষ্ট শুনতে পাই ওরা বলছে—“ভারত অনেক কিছু করতে পারে। এত বড় দেশ, এত সম্পদ, এত আশা, বিরাট ঐতিহ্য থাকতে কেন শুধু অস্ত্রের মুখ চেয়ে থাকবে? নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো, নিজেকে চিনতে চেষ্টা করো। হাজারো যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে হাজারো হাজারো বছরের এতবড় একটা ইতিহাস ভারত বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও যদি তৈরী করতে পারে তবে আজ সে পারবে না কেন? সহজ আগ্রহ, সেই সহজ ভক্তি, সেই নিঃস্বার্থ উন্মাদনা কেন ফিরিয়ে আনতে পারছ না?...”

শাহনাইয়ের সুর থামে।

প্রাচীরে সোপানে যে সব পাথর কথা বলছিল তারা চুপ করে। আমিও কিছুটা শান্তি পাই। এ তাদের আক্ষেপ নয়। এ যেন প্রচণ্ড তিরস্কার। জানি না কবে এ তিরস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাব। দেশ ও সমাজ না পেলে তো ব্যক্তি হিসাবে আমিও পাব না!—কথাটা ভাবতেই মনটা ভার হয়ে ওঠে। সকালের সোনারোদে আগুনের জ্বালা ধরে।

মন্দিরে ঢুকতেই গিরধর মোহনের ছবি চোখে পড়ে। দর্শনার্থীরা কেউ সাক্ষরিত্রে তাকিয়ে দেখে, কেউ না-দেখেই ভেতরে ঢোকে, কেউ আবার শুধু আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিক্ষেপ করেই পা চালায়।

কৈশরী সম্পদ সমারোহ একদিন হয়তো এখানে অনেক বেশী ছিল। আজ সামান্যই হয়তো রয়ে গেছে। তবু চোখে পড়ে কেশরী ও কস্তুরী পিষবার জন্তে সোনা ও রূপের জাঁতা। প্রায় তুলসী চাঁকার প্রসাদ দৈনিক এই মন্দিরে দেবতার কাছ থেকে আসে।

একটু এগিয়ে আসতেই পিকচার-গ্যালারীতে পৌঁছই। মন্দির, মোহন্ত ও দেবতার ছবির সারি পেরিয়ে যাই দেখতে দেখতে। আসে অন্ধকার গলিপথ। তারপর জ্বাঝঝ দেখি উন্মুক্ত আকাশ, আলোর মেলা। ডানদিকে একটা বিরাট কূপ। মন্দিরে দেবতার ভোগের জল এই কূপ থেকেই প্রত্যাহা যায়।

সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই এবার আসে আর-একটা গ্যালারী।
দু'পাশে অসংখ্য ছবি সাজানো। সবই রাণাদের ছবি। শ্রীনাথজীর ছবিও
আছে। এখানে তিনি শৃঙ্গারের মাজে সেজে আছেন।

এই গ্যালারীর বাইরে আসতেই এয়ুগের আর-একটি বিশেষ ছবি চোখে
পড়ে। সেটি হোল রাজনৈতিক লোক কেমনভাবে সবকিছু আড়াল করে
দিতে চান এবং পানেনও। দেবস্থানে এসেও রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিত্ব
দেবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়।

দেখি দেবতাকে ফেলে রাজনীতির খেলোয়াড় নিয়েই মাহুষ মেতে
উঠেছে।

পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সৈনিক।

দেবস্থানে সকলে ভক্তি নিয়ে তো আসে না। নানা উদ্দেশ্যে লোকের
আনাগোনা। তাই শাস্তির জন্তে, স্বরক্ষার জন্তে এখানেও সৈনিক এবং অস্ত্র
ছুটোরই প্রয়োজন।

সামনে নবনীতলালের মন্দির।

দেখি আরতির দীপ জ্বলেছেন নবযুগের বৈষ্ণব। সজ্জার পারিপাট্য
আছে। মন্দিরের দিকে আর-একবার ভালো করে তাকাই। মনে মনে।
স্মরণে আসে চারশ বছর ধরে এ মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। চারশ বছরের
প্রবীণতায় নবীন মোহন্ত পঞ্চপ্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে একটা সংকেত করছেন।

মন্দিরের চত্বর বেয়ে বেয়ে উঠে আসছিলাম। ঠিক উঠে আসা নয়। ভেসে
আসছিলাম। ভক্তের শ্রোতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এবার চত্বর পেরিয়ে থাস-
মন্দিরে ঢুকব।

ঢুকতে যাচ্ছি। ভিড়ে আমার সঙ্গীরা এগিয়ে গেছেন। শুধু আছেন একজন
ভূদানকর্মী। বাধা পেলাম।

আমার অঙ্গে পায়জামা। মন্দিরে এ পোষাকে ঢুকতে পাব না। ওরা
কিছুতেই ঢুকতে দেবে না আমায়।

বচসা বাড়ে। পাঁচগজ কাপড় না হয়ে অঙ্গে আড়াইগজ কাপড় থাকার
এতো দোষের হতে পারে এটা ভাবতে কষ্ট হয়। দশহাত কাপড় সব সময়ে
অঙ্গে জড়ানোয় অসুবিধা, ধুতে অসুবিধা, শুকোতে অসুবিধা। কেনার
অসুবিধার হিসাবটা মুখ্য হলেও এখন জুড়ছি না। তবু কে কার কথা শোনে।

সংস্কারের দাসত্ব করতেও মন চায় না। ভাবতে কষ্ট হয় দেবতাকে এই সংস্কারের মধ্যে বন্দী থাকতে দেখে। এতক্ষণের স্মরণে তারটা হঠাৎ বন্বান্ করে ছিঁড়ে যায়।

শুনতে পাই—এই নাথদ্বার মন্দিরে হরিজনের প্রবেশ নিষেধ।

প্রসঙ্গক্রমে মোরারজী দেশাই-এর কথা ওঠে। তিনি এখন ভারতের শুধু অর্থমন্ত্রী নন। একজন দেশপ্রেমিকও। দেশনেতাও বটে। এ মন্দিরে ঢুকতে চাননি। পা দেওয়া মাত্র যখনই শোনে এখানে হরিজনের প্রবেশ নিষেধ, সঙ্গে সঙ্গে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে যান।

হীরানন্দজীর কথা শুনে মুহূর্তের জন্ত অগ্নমনস্ক হয়ে যাই। শ্রীমনোহর কোঠারীও কি যেন বলেন। সব কথা কানে যায় না। কেবল শুনতে পাই—বোম্বাই হাইকোর্টে এ নিয়ে মামলা চলেছিল। হাইকোর্ট রুলিং দেয় যে এটা মহারাণার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কাজেই নিয়মকানুন তাঁর মতেই চলবে। কোঠারীজী এডভোকেট।

মোরারজীর ফিরে যাওয়ার দৃশ্যটা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপের বলিষ্ঠতা আমাকে মুহূর্তের জন্তে অভিভূত করে। আমি দেখতেই থাকি।

হঠাৎ দেখি ভিড় ঠেলে মন্দিরের একজন ব্যবস্থাপক দৌড়ে আসছেন। কে যেন তাঁকে আমার পরিচয়টা দিয়ে বসেছে।

তিনি এসে সংকোচে আমার হাতখানা ধরে ফেলেন।

হাত ছাড়িয়ে নিতে চাই। বলি—“যেখানে মাত্র সামান্য পোষাকের জন্তে ভক্ত দেবতার দর্শন পায় না সে মন্দিরে নাইবা ঢুকলাম। যে দেবতা ভক্তির চেয়ে পোষাককে বড় বলে মনে করে তিনি অন্ততঃ আমার দেবতা নন।”

কে কার কথা শোনে। সজোরে হাত ধরে ভিড় ঠেলে তিনি আমায় টেনে নিয়ে চলেন। কোথা দিয়ে কোন পুথে কেমন করে যে আমায় বিগ্রহের আসনে যান কিছু বোঝার অবকাশ পাই না। তবে বুঝি এ পথ সাধারণের পথ নয়। এ পথ আইন এড়ানোর, আইন ফাঁকি দেবার পথ।

এ স্থানকে এঁরা বলেন মণিকোঠা।

পাশে ঋগ্বাড়ি, কুমল চৌক, রতন চৌক, ধূলি পটিয়া। ওপাশে আবার প্রসাদভাণ্ডার। মন্দিরের পাশেই সাজানো আছে স্বদর্শনচক্র। এখানে মীরা নতুন নাম পেয়েছেন—অজবকুমার বাদি।

নাথদ্বার মন্দিরে দেবতার ভোগের জন্তে কি না আসে! ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণক্ষ, মশালা। আসে পারস্তের পেস্তা, কাশ্মীরের শাল, বাংলার দুধ, মথুরার পেঁড়া, বেনারসের কাপড়, গুজরাতির ত্রোকেড—সবকিছু এসে পৌঁছায়। ভোগ ও বিলাসের প্রাচুর্য এ মন্দিরে অতুলনীয়।

পুরোহিত এখানে দেবতা হয়ে উঠেছেন। তাঁর মুখধোয়া জল নিয়ে অনেকে নিজেকে পুণ্যাত্মা মনে করতে রাজি। নাথদ্বারা মন্দিরের পুরোহিত একদিন শুধু নিজস্ব খরচের জন্তে মন্দির থেকে বছরে বিশহাজার টাকা নিতেন। মেবারের দশ হাজার গ্রাম একদিন এই অর্থ তাঁকে অকাতরে পৌঁছে দিয়েছে।

যত দেখি যত শুনি—ততই কেমন যেন কষ্ট পাই।

বেরিয়ে আসার পথে আর-এক দৃশ্য। মেয়ে-যাত্রীরা ছুটেছে দেবদর্শনে, আর পাণ্ডার দল কাপড়ের দড়ি তৈরী করে তাদের মারছে। সমস্ত ব্যাপারটা এত অশোভন যে চুপ থাকতে পারি না। একটি মেয়েকে মনে হয় লেথাপড়া জানা। সাহস করে বলি—‘পাণ্ডার হাতের এই মার মুখ বুজে খাচ্ছেন?’

মেয়েটি দাঁড়িয়ে যায়।

একবার ভালো করে আমাকে দেখে।

মনে হয় তার চোখে আমি যেন একটা অবাস্তিত জানোয়ার। অরণ্য ছেড়ে মন্দিরে ঢুকে পড়েছি।

উত্তর পাই—‘আপনি এসব কথা বলবার কে? পাণ্ডারা যদি মেয়ে থাকে আমাদেরই মেরেছে। আপনাকে তো নয়! ওই মারের এক এক ঘায়ে আমরা জন্ম-জন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছি যে!!’

এরপর আর মেয়েটির দিকে তাকাতে পারি না। তার অভিজাত চেহারা, তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী, তার শিক্ষিত চালচলন সব কেমন যেন হারিয়ে যায়।

তাবি—মোরারজীদের এই একক সংগ্রামের অনেক এখনো বাকি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গায়ে আমরা বিশ শতকের পালিশ চড়াতে চাইছি। আধার না পান্টাতে পারেন চলবে না। যুগের তাপ সহ করার মত শক্তি মনকে না দিতে পারলে সংস্কারের উত্তাপে এমন এইভাবেই গলে যাবে। ভারতে সত্যকারের যুগশিক্ষার দরকার।

সকাল গড়িয়ে কখন যেন দুপুর এসে গেছে।

উগ্রসিংজী, হারানন্দজী, মনোহরজী এবং তাদের সঙ্গীসাথীরা আমাদের ঘিরে একটা বেশ ছোটখাটো মিছিল তৈরী করে নিয়েছে। মন্দির ছেড়ে

বেরিয়ে আসি। সাহিত্যমণ্ডলে পৌঁছে দেখি মন্দিরের সেই রাজকীয় ভোগ
আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছে।

বেশীক্ষণ আর এখানে থাকা চলবে না।

আজই হলদিঘাট যেতে হবে। দিন থাকতে থাকতেই আবার সেখান
থেকে বেরিয়ে আসাও দরকার। পথ প্রায় নেই। যা আছে তাও ভয়ের
এবং বিপদের।

নাথদ্বার ছেড়ে রওনা হবার জন্তে জীপে আবার উঠে বসি। সঙ্গী হন
উগ্রসিংজী, হীরানন্দজী। বানস নদীর পাশ দিয়ে, বানস নদী টপকে জীপটা
শুধু ছোটো। ঝলমল করে পাহাড়। অরণ্য বাতাসে দোলে। হুপুরের
নিঃস্কর আকাশের নীচে মাঝে মাঝে এক-একটা ঘুমু ডেকে ওঠে।

দাঁড়িয়ে শোনার সময় নেই। জীপের চাকায় চাকায় পথ শুধু চলেই যায়।
সামনে। (ক্রমশঃ)

বেঙ্গল'এর রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনী

নীহাররঞ্জন গুপ্তের	কাল্পনিক মুখোপাধ্যায়ের
অদৃশ্য শত্রু ৪র্থ মুঃ	২'০০ ॥ পাতালের পাকচক্র ৩য় মুঃ ১'২৫ ॥
ড্রাগন ৩য় মুঃ	২'০০ ॥ ওঙ্কারের টঙ্কার ২য় মুঃ ১'২৫ ॥
রাত্রি যখন গভীর হয় ৫ম মুঃ ১'২৫ ॥	ব্লাড ব্যাঙ্কার ৩য় মুঃ ১'২৫ ॥
মুজুবাস ২য় খণ্ড ২য় মুঃ	২'০০ ॥ লালবাবুর লাশ ২য় মুঃ ১'২৫ ॥

বিমল দত্তের

কাল্পনিক প্রিন্সেস (৩য় মুঃ) ২'০০ ॥

জীবন-মৃত্যুর এক
অভিবিচিত্র কাহিনী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-বারো

॥ বেঙ্গলের বই মানেই সেবা লেখকের সার্বক সৃষ্টি ॥

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরোগ্য নিকেতন ॥ রচনা-সংগ্রহ ॥ চৈতালি ঘূর্ণি

৭ম মুঃ ৭'৫০ ॥

১ম খণ্ড : ১০'০০ ॥

১০ম মুঃ ২'৫০ ॥

মনোজ বসুর

মানুষ গড়ার কারিগর ॥

নবীন যাত্রা

৩য় মুঃ ৫'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৪'০০ ॥

বনফুলের

সে ও আমি ॥

দ্বৈরথ ॥

স্বপ্নসম্ভব

৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৩'০০ ॥

৩য় মুঃ ৩'০০ ॥

সতীনাথ ভাট্টার

অপরিচিতা ॥ পত্রলেখার বাবা ॥ গণনায়ক

২য় মুঃ ৩'০০ ॥

চার টাকা ॥

২য় মুঃ ২'৫০ ॥

সমরেশ বসুর

শ্রীমতী কাফে ॥

সওদাগর ॥

গঙ্গা

৩য় মুঃ ৬'০০ ॥

২য় মুঃ ৬'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৫'৫০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গম্পা ॥

কদম

দুয়ার হতে অদূরে

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

২'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

চতুরঙ্গ

॥

অবিশ্বাস্য

॥

ময়ূরকণ্ঠী

৩য় মুঃ ৪'৫০ ॥

৯ম মুঃ ৩'০০ ॥

১৪শ মুঃ ৪'০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গম্পা ॥

সূর্যসারথি ॥

একতলা

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

৩য় মুঃ ২'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

শেকস্পীঅর-জন্মচতুশতবার্ষিকী :

আগামী ২৩ এপ্রিল, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়ম শেকস্পীঅরের জন্মের চার শ বছর পূর্ণ হবে। তাঁর জন্মভূমি স্ট্রাটফোর্ড-অন-অভন গ্রামে একটি নোতুন “শেকস্পীঅর সেন্টার” তৈরী হবে। আনুমানিক খরচ হবে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা। এখন থেকে তার উত্তোগ চলছে।

এই গ্রামে শেকস্পীঅর-এর বাসভূমি রয়েছে। সেই ষোড়শ শতকের পুরনো ধাঁচের বাড়িটি সম্বন্ধে রক্ষা করা হয়েছে। বাড়ির আসবাবপত্র সেকালের। বর্তমানে তাঁর বাড়িটি মুজিয়মে পরিণত হয়েছে। এছাড়া আভন নদীর তীরে এক বিশাল প্রাসাদে জগদ্বিখ্যাত “শেকস্পীঅর থিয়েটার” রয়েছে। এখানে প্রতি বছর শেকস্পীঅর-নাট্যকাভিনয়-উৎসব হয়ে থাকে।

আগামী বছর বাংলাদেশেও এই উৎসব হবে বলে জানা যায়। বঙ্গীয় শেকস্পীঅর-পরিষদ এই উৎসবের উদ্বোধন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ১২৫ তম জন্মদিবস

গত তেরোই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মদিবস উপলক্ষে নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় এক সভার আয়োজন হয়। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীচন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) এই সভায় ভাষণ দেন। সভার উদ্বোধন শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন বঙ্কিম সংগ্রহশালা ও বঙ্কিম-বাসভবনকে কেন্দ্র করে বঙ্কিম-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেশবাসীর কাছে পেশ করেছেন।

ঐদিন কলকাতায় মহাজাতি সদনে কংগ্রেসের উদ্বোধনে এক সভায় ভাষণ দেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

শরৎ-স্মৃতিভবন

আগামী ৩১ ভাদ্র কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। বালিগঞ্জ ত্রিকোণ (শরৎ-উদ্যানে) ঐদিন একটি ত্রিতল স্মৃতিভবনের শিলাস্তাপ আয়োজন হবে। শরৎ সমিতি ও শিল্পী সংস্থা এই স্মৃতিভবন-পরিচালনার যুগ্ম-উদ্বোধন।

এই দুই সংস্থার যৌথ কমিটির সভাপতি ডক্টর হুমায়ূন কবির এক সংবাদিক-
বৈঠকে জানিয়েছেন—

স্মৃতিভবন নির্মাণের জন্য কলকাতা কর্পোরেশন স্মৃতিরক্ষা সমিতির দশ
কাঠা জমি ঐ পার্কে দিয়েছেন। প্রস্তাবিত শরৎ-স্মৃতিভবনের নীচতলায় একটি
প্রেক্ষাগৃহ, দ্বিতলে গ্রন্থাগার ও ম্যুজিয়ম এবং ত্রিতলে বহিরাগত লেখকদের
বাসস্থান থাকবে। এর জন্য ব্যয় হবে পাঁচ লক্ষ টাকা।

অর্থসংগ্রহের জন্য যে-সব পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার অন্যতম হল একটি
বারোয়ারী উপন্যাস রচনা। প্রথ্যাত লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রস্তাবক্রমে এই উপন্যাস-রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বিভিন্ন নাট্যসংস্থা,
চলচ্চিত্র-প্রযোজক, পরিবেশক ও চিত্রগৃহগুলি এই মহৎ প্রয়াসে সাহায্যদানে
স্বীকৃত হয়েছেন।

স্মৃতিরক্ষা সমিতিতে আছেন সর্বশ্রী নরেন্দ্র দেব, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়,
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, সুধীরচন্দ্র সরকার,
কে ডি রায়, কেশব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ভারতীয় চিন্তাবিদ সম্মেলন : আলোচনা-আসর

ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের উদ্বোধনে জুলাই মাসের। গোড়ায় মহাজাতি
সদনে সম্ভাব্যাপী ভারতীয় চিন্তাবিদ সম্মেলন অস্থিত হয়। সম্মেলনের
উদ্বোধক প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু, ভারতীয় চিন্তাজগতের সাম্প্রতিক
সংকট ও সংকটমুক্তির কথা আলোচনা করেন। গত ৬ জুলাই-এর একটি
অধিবেশনে “সাহিত্য ও জাতীয়তাবাদ” প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। আলোচনা-
আসরের সভাপতি ডক্টর হুমায়ূন কবির বলেন, “টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস
শেকসপীয়ার—সকলেই স্ব স্ব দেশের ও যুগের প্রতিভূ ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও
তারা বিশ্ববীক্ষার অধিকারী ছিলেন। এই বিশ্ববীক্ষা এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর
সম্মিলনেই প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর। সাহিত্যরচনায় এই সম্মিলনে আমাদের
অবশিষ্ট হওয়া উচিত।”

শ্রীআর. আর. দিবাকর বলেন, “সাহিত্যের সঙ্গে একটি দেশের জাগরণ ও
জাতীয়তাবোধের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সাহিত্যসাধকরাই জনমনে
জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করেন। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যরক্ষায় সাহিত্যিকদের
দায়িত্ব এখানেই—জাতীয়তাবোধের মধ্য দিয়েই আমরা ঐক্যচেতনায়
উপনীত হতে পারি।”

শ্রীবিনোদানন্দ বা বলেন, “ভারতের রাষ্ট্রীয় জাগরণের মূলে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের নামে অবশ্যগতব্য। সাহিত্যের সাধনা দেশের সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সাহিত্য মানবসমাজের দর্পণ; তা কখনো স্থাণু নয়, জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে তা এগিয়ে চলে।”

শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী বলেন, “জাতীয় জাগরণে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য। ভারতের জাতীয়তাবাদ দেশচেতনা ও ধর্মচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তা পাশ্চাত্যের মত বিকৃত দেশপ্রেম বা সম্প্রসারণকাামী নয়। ভারতের সাহিত্য আমাদের মনের মুক্তিদাতা।”

শ্রীবিজু পট্টনায়ক, শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ বক্তৃতা করেন।

লাখ টাকা পুরস্কার

ভারতীয় জ্ঞানপীঠ (স্থাপনা : ১৯৪৪ খৃঃ) লাখ টাকার বার্ষিক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। চোদ্দটি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ১৯২০ থেকে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্য থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার দেওয়া হবে ‘স্বজনশীল রচনার জন্য’। প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর জন্য একটি করে উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হয়েছে। এই বোর্ড পুস্তকায়ের জন্য নাম সুপারিশ করবেন। পুরস্কারযোগ্য বইটি অন্ততঃ পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

আগ্রহী ব্যক্তির শ্রীএস. পি. জৈনের কাছে (৯, আলিপুর পার্ক প্লেনে) সন্ধান দিতে পারেন।

লেখক-শিবির : অনুবাদচর্চা

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে হায়দ্রাবাদে গত ১৯ জুন থেকে ২ জুলাই পক্ষকালব্যাপী লেখক-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি দ্বিতীয় শিবির।

প্রথম শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত বছর মহীশূরে। ঐ শিবিরে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন শ্রীমোজ বসু।

এই বছরের শিবিরে বাংলা থেকে যোগ দেন শ্রীযুক্তা লীলা রায় (শান্তিনিকেতন)। এই বছর প্রতি আঞ্চলিক ভাষা থেকে দুজন করে প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এইবার আলোচনার বিষয় ছিল—অনুবাদ-সাহিত্য।

এই শিবিরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমন্ত্রণলিপিতে বলা হয়েছে যোগদানকারী লেখকরা “will live together at one place, attend discussions and

lectures in the morning and devote the afternoons to reading of papers and to group-discussions. Every participant will contribute at least one paper on any topic of interest.”

অর্থাৎ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে আলোচনা শুনবেন ও করবেন, এবং প্রবন্ধ পাঠ করবেন। নিজের লেখা ও পরের লেখা পাঠ ও আলোচনা করবেন। তাছাড়া প্রতিদিন দর্শনীয় স্থান দেখবেন ও শিবির-জীবনের সকল বিষয়ে যোগ দেবেন।

অনুবাদচর্চা সম্পর্কে পক্ষকালব্যাপী আলাপ-আলোচনায় যোগদানকারীরা জ্ঞানলাভ করবেন বলে আশা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ল, বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে ‘দেশ’ পত্রের বর্তমান বর্ষের ৩৫ এবং ৩৬ সংখ্যায় ‘ভ্রূণাক্ষরে’ শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ চুটি স্থপাঠ্য নিবন্ধ লিখেছেন। এ বিষয়ে শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের দু-একটি নিবন্ধ পূর্বে পড়েছি।

কিছুকাল পূর্বে কলকাতায় মাকিন সংস্কৃতি কেন্দ্রে পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাবিদ সাহিত্যিকদের তিনদিনব্যাপী ‘অনুবাদ-চক্র’ বৈঠক বসেছিল। বঙ্গ-উৎকল-আসাম রাজ্যের অনুবাদক-সাহিত্যিকরা যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (বাংলা), শ্রীশচীরাউত রায় (উৎকল), শ্রীপদ্ম বরকাকতী (আসাম) প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন।

রত্নকান্ত বরকাকতি

আসামের বিশিষ্ট কবি শ্রীরত্নকান্ত বরকাকতি ছেষটি বছর বয়সে গত ২০ এপ্রিল লোকান্তরিত হয়েছেন, এ-সংবাদ গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার জানিয়েছিলাম।

তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ এখানে দেওয়া গেল।

নওগাঁও জেলার আঠ গাঁও গ্রামে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০ জুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নওগাঁওয়ে স্থল-জীবন ও কলকাতার রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়, ১৯১৯ সালে নলবাড়ী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে ঐ চাকরি পরিত্যাগ করে পুনরায় কলকাতায় চলে আসেন। সংস্কৃত কলেজে ও হুগলী কলেজে লেখাপড়া করেন। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তাঁর পাঠ্যজীবন বাহত হয়, তিনি কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি গান্ধী-রচিত “হিন্দ স্বরাজ” গ্রন্থটি অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। ‘বস্তী’, ‘আলোচনী’, ‘বহি’ প্রমুখ অসমীয়া পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।

তঁার শ্রেষ্ঠ কাব্য ‘সেওলী’ (১৯৩২)। তিনি ‘সেওলী কবি’ রূপে খ্যাতিলাভ করেন। ‘তর্পণ’ (১৯৫৯) তঁার অপর কাব্যগ্রন্থ। ‘আর্যনায়ক’, ‘সৌন্দর্য’, ‘লিপিপ্রসঙ্গ’ প্রভৃতি দার্শনিক ও ভাষালিপি সংক্রান্ত গ্রন্থে তঁার মনীষার স্বাক্ষর রয়েছে। তঁার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে প্রকাশিত হয় ‘চন্দ্রহোর’।

আসাম সাহিত্যসভার ত্রিংশৎ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাজিরায় ১৯ থেকে ২১ এপ্রিল। রত্নকান্ত বরকাকতি ১৯ তারিখের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং সভাপতির ভাষণ দেন। পরদিন রাতে তঁার মৃত্যু হয়। আটান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী ভাষণ পাঠকালে তিনি অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতা অগ্রাহ্য করেই তিনি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

এই অন্তিম ভাষণে বরকাকতি বলেছিলেন, “যে লেখক জনমনকে স্পর্শ করে নি, স্পর্শ করে নি চলিষু মানবসমাজের হৃদস্পন্দন, সে মহৎ লেখক হতে পারে না। মানবসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, এই বিশ্বাস পোষণ করা অপরাধ। মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিচার অধীন নয়, সর্বগ্রাসী ধ্বংসের সামনে মানুষ অসহায় দুর্বল,—এই বিশ্বাস পোষণই পাপ।” কবি বরকাকতি জাগ্রত ভারতের হৃদস্পন্দন শুনেছিলেন, মানুষের সামনে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার বাণী এনেছিলেন। তারপরই কবির হৃদস্পন্দন চিরকালের মতো স্তব্ধ হ’ল।

আসাম সাহিত্যসভা : ত্রিংশৎ অধিবেশন

নাজিরাতে ১৯ থেকে ২১ এপ্রিল ‘আসাম সাহিত্যসভা’র ত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ’ল। চারশ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সভার প্রাক্তন সভাপতি শ্রীনীলমণি ফুকন সম্মেলনের উদ্বোধন করে বলেন, চীন আক্রমণের পটভূমিতে আজ লেখকদের প্রেরণাদায়ী রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সভার সাধারণ সম্পাদক ডক্টর মহেশ্বর নাগ প্রাপ্ত শুভেচ্ছা-বাণীগুলি পাঠ করেন ও সভার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—সভা এ বছর শোহিত অঞ্চলে চার-সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল, ছয়টি দুপ্রাপ্য গ্রন্থ ও চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনটি পুস্তক প্রকাশ করেছে; জাতীয় ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দিয়েছে; গোঁহাটিতে সভার প্রস্তাবিত ভবনে শিলাস্তাস করা হয়েছে—এই ভবন সরকারী ও বেসরকারী অর্থায়নকূল্যে শীঘ্রই নির্মিত হবে।

তারপর জনপ্রিয় কবি শ্রীরত্নকান্ত বরকাকতি সভাপতির ভাষণ দেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ‘জাতীয় সংহতি ও অসমীয়া সাহিত্য’ সম্পর্কে

আলোচনা-আসর বসে। আলোচনায় যোগ দেন সর্বশ্রী বীরেনকুমার ভট্টাচার্য, যোগেশ দাস, জি. পি. সাইকিয়া, লীলা গগই, হেম শর্মা, ইংরেজ মহিলা শ্রীমতী ডি. কে. ম্যাকপার্টেন (ইনি অসমিয়া ভাষার ভাষণ দেন)। আলোচনা আসরে সভানেত্রীত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীমতী ইন্দিরা মিরি।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। ডঃ মহেশ্বর নাগ পুনরায় সম্পাদক নির্বাচিত হন। অধ্যাপক প্রাণধর চলিহা সহকারী সভাপতি-পদে বৃত্ত হন। পরবর্তী অধিবেশন শিলচরে হবে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়।

সম্মেলনের শেষ-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী। অসমীয়া সাহিত্যের বর্তমান গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী পদ্মধর চলিহা, নীলমণি ফুকন, মহেশচন্দ্র দেব গোস্বামী, মহাদেব শর্মা, আনন্দ বরুয়া, লীলা কাকতি।

শেষ অধিবেশনে দশ সহস্র লোক যোগ দেয়। ডঃ ভূপেন হাজারিকার গানে সকলে মুগ্ধ হয়। এই সম্মেলনে অসমীয়া ও পার্বত্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগ দেয়।

মরাঠী নাট্য সম্মেলন : পঞ্চচত্বারিংশৎ অধিবেশন

মারাঠী নাট্যসম্মেলনের পঞ্চচত্বারিংশৎ অধিবেশনে বোম্বাই নগরে গত ২২, ২৩, ২৪, ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকান্নামওয়ার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, “গ্রামীণ জনতাই নাট্যাভিনয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাদের অগ্রাহ্য করবেন না। আমি বলতে চাই। তাদের জন্তাই আপনারা লিখুন, অভিনয় করুন। চীনা-আক্রমণের পটভূমিতে দেশবাসীকে অভিনয়ের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করে তুলুন।”

সভাপতি শ্রীঅনন্ত কানেকর নাট্যআন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা আলোচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ব্রিটেনে SEMA নামে একটি সংগঠন বৃটিশ জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত যে ধরনের কাজ করেছিল, আজ মহারাষ্ট্রে ললিতকলা আকাদেমি সেধরণের কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ক্ষেত্রদার ও অপেশাদার নাট্যকর্মী ও অভিনেতার প্রসঙ্গের বিরোধী নয়, পরিপূরক—এই বিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করেন। রক্ষমঞ্চে নব নব পরীক্ষাকে তিনি স্বাগত জানান।

সম্মেলনে দুটি আলোচনা-আসর বসে। প্রথমটির বিষয়বস্তু—“মরাঠী নাট্য পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা”। সুপরিচিত মঞ্চ-অভিনেতা শ্রীকেশব রাও

দাতে ২৩ ফেব্রুয়ারি এই আসরের সভাপতিত্ব করেন। সর্বশ্রী আর ভি রানে, রাজারাম সিঙ্গে, মধুসূদন কর্মকার, যশবন্ত কেলকার, বামনাও পুরোহিত, জি দেওকার ও শ্রীমতী শশীকলা কিলোসকার।

দ্বিতীয় আলোচনা-আসরের বিষয়বস্তু ছিল—“মরাঠী রঙ্গমঞ্চে নব নব বৈশিষ্ট্য”। সর্বশ্রী ভাল্বা কেলকার, আআরাম ভেন্দে, ডি. সি. গোসকালে, দামু কেন্কে।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহার

গত বৈশাখ সংখ্যায় আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবিত নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে আলোচনায় অশংকা প্রকাশ করেছিলাম যে, এই বিল নাট্যা-ন্দোলনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করবে। গত তিন মাস ধরে এই বিলের বিরুদ্ধে নাট্যজগতে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। আমরা আনন্দিত যে, কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবাদের যোগ্য সমাদর করেছেন এবং বিলটি প্রত্যাহার করেছেন। গত ৮ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানিয়েছেন যে এই বিলটি বর্তমানে প্রত্যাহার করা হল। এই জ্ঞতাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইনসভার কংগ্রেসী দলের এক বিশেষ কমিটির উপর এই বিল বিবেচনার ভার দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সম্মতিক্রমে এটি প্রত্যাহৃত হল। এই কমিটিতে ছিলেন—সর্বশ্রী মন্ত্রী জগন্নাথ কোলে, অশোককৃষ্ণ দত্ত, নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র, প্রমথনাথ বিশী, অবনী বসু, বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, নরেন সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা বিভা মিত্র। সংবাদে প্রকাশ, বিলটি পরে নোতুনরূপে উপস্থিত করা হবে।

বাঙালি পণ্ডিতের সমাদর

সংস্কৃত কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীহর্গুমোহন ভট্টাচার্য বৈদিক সাহিত্য গবেষণায় এক নোতুন আলোকপাত করেছেন। উড়িষ্যা, বিহার ও বঙ্গে কোনো কোনো অংশে আজও বহু ব্যক্তি অর্থব্বেদের পৈপ্ললাদ শাখার অনুসরণ করে চলেছেন। এই বেদশাখার প্রাচীনতম সংস্কৃতি বর্তমান শতকে জীবিত আছে, তা তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি এই শাখার সংহিতা, কুল্ল ও নানারূপ পদ্ধতিগ্রন্থ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন ও সেগুলি সম্পাদনা করেছেন। এই অসামান্য গবেষণার পুরস্কার স্বরূপ এই বছর বোম্বাই এমিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে পি. ভি. কাণে স্বর্ণপদক দিয়েছেন। গত ৭ মার্চ বোম্বাইএ সোসাইটি-ভবনে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছেন।

গীতিকার কবি শৈলেন রায়ের মৃত্যু

বাংলা কাব্যসংগীতের জনপ্রিয় রচয়িতা কবি শৈলেন রায় গত ৮ জুলাই তিপ্রান বহর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর লেখা বহু গান সিনেমা-সংগীতরূপে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কাব্যসংগীতের বর্তমান নিয়গামিতার দিনে তাঁর মৃত্যু শোচনীয়, তাতে সন্দেহ নেই।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু

কল্লোল গোষ্ঠীর অগ্রতম নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩ জুলাই ১৯৬৩ ভোর চারটেয় কলকাতায় হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একষষ্ঠি বৎসর। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বেলেঘাটা অঞ্চলে তাঁর জন্ম। একালের বাঙালি তাঁকে সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার ও চিত্রকাহিনীকার বলে মনে রাখবে।

গৌরী “মাদার” ও আদ্রে মরোরায় “এরিয়েল” [শেলীর জীবনী, “শেলী” নামে] অল্পবাদ করে তিরিশের দশকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

‘যুগান্তর’-এ “অবিস্মরণীয় মুহূর্ত” রচনা করে তিনি ইদানীং সাহিত্যখ্যাতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ‘গল্পভারতী’ মাসিকপত্রের সম্পাদক ও কলকাতা বেতার কেন্দ্রের গল্পদাহর আসরের পরিচালক ‘দাহুমাণি’ রূপে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ‘বিদ্যার্থীমণ্ডল’ ও ‘পল্লীমঙ্গল আসর’-এর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ‘কাশীনাথ’, ‘ভগিনী নিবেদিতা’, ‘দাদাঠাকুর’, ‘সাতপাকে বাঁধা’ প্রভৃতি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। বহু চিত্রকাহিনীও লিখেছেন।

বিজলীতে মঞ্চ-সমালোচকরূপে, ‘ধূমকেতু’কে ‘ত্রিশূল’ ছদ্মনামে, ‘লাঙলে’ ‘দেবব্রত বসু’ ছদ্মনামে, ‘কল্লোলে’ স্বনামে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বহু লেখাই লিখেছেন। শিশুসাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। শ্রীঅচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত-রচিত ‘কল্লোলযুগ’ গ্রন্থে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের যে রেখাচিত্রটি আছে তা অপূর্ব।—“মাথাভরা উষ্ণ-খুসু চুল, পারিপাট্যহীন বেশবাস। এক চোখে গাঢ় ভাবুকতা, অল্প চোখে আদর্শবাদের আগুন। এই আমাদের নৃপেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সে যুগের যন্ত্রণাহত যৌবনের রমণীয় প্রতিচ্ছবি।”

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী, আবৃত্তিকার। শেলী, কীটস, বায়রণ, কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথ থেকে অনর্গল আবৃত্তি করতেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। আজ সেই সুরেলা কণ্ঠ চিরকালের জন্য নীরব হয়ে গেছে।

তাঁর স্মৃতিতে আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অন্তরীক্ষের সঙ্গীত

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ আট ॥

স্বস্তি হ'ক সকল মানুষের, 'স্বস্তিমানুষেভাঃ'। সকল লোক হ'ক স্থখী 'সবের লোকা স্থখিনো হোজু'। ভবিষ্যজীবনের জন্ত স্কৃতি অর্জন করতে হলে এই 'স্বস্তি ভাবে' পূর্ণ করতে হয় মন—এই 'কল্যাণ ভাবে' শুদ্ধ করতে হয় চরিত্র।

যারা আজ সংসারে এল, যারা নবজাতক আমার আশীর্বাদ যেন তাদের ঘিরে থাকে। যারা আজ সংসার থেকে চলে গেল, সন্ত মরণপথযাত্রী, আমার শুভেচ্ছা তাদের যাত্রাপথকে যেন স্পর্শ করে।

সংসারে যে যেখানে আছে, এল, ছিল, আসবে—সকলের শুভাকাজক্ষী হওয়ার অভিলাষে যে রসোন্মাস, সেটি যদি হৃদয়কে স্পর্শ করল তবে তো জীবনের চলার পথে বেশ কয়েকটা জন্ম অতিক্রম ক'রে যাওয়া গেল।

পথ দিয়ে কেন শব্দেই নিরে যাওয়া হচ্ছে দেখলে বিনয় প্রদায় মাথা নীচু করুন। 'আত্মার সদগতি হ'ক' বলুন মনে মনে, আমি বলি।

সকাল বেলায় 'ষ্টেটসম্যান পত্রিকা'খানি মন হাতে পাই সর্বাগ্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভের বাম-কলামটার একবার দৃষ্টিপাত করি। শাস্ত প্রসন্ন মন নিয়ে নবজাতক-জাতিকাদের আশীর্বাদ করি, সন্তমৃতদের নামস্মরণে বলি, 'আত্মার সদগতি হ'ক'। স্মরণিকার স্তম্ভে যাদের নাম দেখি—তাদের উদ্দেশেও মনে মনে প্রদ্বাজলি অর্পণ করতে করতে বলি : 'শান্তি রহ'।

প্রাতঃকালীন পূজার্চনা, গায়ত্রীধ্যান ও স্তোত্রাদি পাঠের সঙ্গে এটি-ও একটি নিত্যকারের ধর্মধ্যান বলে জানি। যারা সংসারে এল, যারা এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে থেকে চলে গেলেন, যারা বহুদিন গেছেন বলে, তাঁদের সকলের সঙ্গে আমার ভাব-শরীরের যে-অখণ্ড যোগ রয়েছে স্বস্তিভাব ও কল্যাণভাবের মাহাত্ম্যে ও তা আশ্বাদ করা সম্ভব।

বেশ অনুভব করে দেখেছি—স্থূলজীবনে যাদের চিনি না জানি না—শুভ কামনার ছন্দোময় সূক্ষ্মশরীরে মূর্ত্তের স্রবণে তারা অনন্ত রোমাঞ্চ তোলে।

যদি বলেন এটা আমার কু-সংস্কার, তবে এ-সংস্কার আমারই থাক। তর্ক করে আমার গোপনজীবনের গভীর এই আনন্দটি আমি নষ্ট করব না। শুধু বিনীতভাবে একটুকুই বলব, সংসারে সব দেশের সবজাতির নবজাতকদের আশীর্বাদ করে এবং স্বর্গতদের আত্মার মুক্তি কামনা করে' মনে মনে যদি নিবিড় একটি অনন্তত্ব প্রসন্নতা অনুভব করি—এবং সেই অনুভব যদি আমার দৈনন্দিন গৃহকর্ম, সমাজকর্ম, দেশকর্ম, শিক্ষাসাহিত্য ও অধ্যাত্মকর্মকে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে বেগবান করে রাখে, তবে তাতে আমার-ই শুধু নয়—প্রত্যক্ষভাবে আমার গৃহ ও পাড়া-প্রতিবাসীর এবং পরোক্ষভাবে আমার মাতৃভূমির ও বিশ্ব পৃথিবীর (বলব কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরো?) তাতে কল্যাণ সম্পাদিত হবে। সে-কামনা ও প্রার্থনায় আপনার স্থলজীবনের কোনো স্বার্থ বিজড়িত নেই—সেই কামনা ও প্রার্থনাই জীবনগতির নিয়ামক। সংসারে অনেকের অনেক ভালো কাজ করতে যাই, কিছু কিছু উপকার করি, তার মধ্যে কিন্তু প্রাপ্তি ও বস্তু-বাসনা থেকে যায়। যদি না থাকে তবে খুবই ভালো কথা। কিন্তু স্থল জীবনের সংসারটা দেয়ানেশ্বর সংসার। কিছু পাই তো কিছু দিই। কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য আছে তাই দেয়ার তত্ত্বে বিশ্বাস করি। আসলে ব্যক্তিস্বার্থ, দলস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধ হবে বলে। গোষ্ঠীস্বার্থ সমর্থনে যুক্তি দিই ব্যক্তিস্বার্থ পরোক্ষভাবে জয়ী হবে বলে। আজকাল আবার কথায় কবিতায় বক্তৃতায় ম্যানিফেস্টো রচনায় আমরা বিশ্বস্বার্থকে বড় ক'রে দেখছি। আন্তর্জাতিক হচ্ছে। এই হওয়ার পথে জাতীয়তা নাকি প্রবল বাধা, তাই জাতীয়তাকে মানছি না। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে—এই মানার পেছনে ব্যক্তিস্বার্থ টাই প্রচ্ছন্ন, যুগের প্রয়োজনে অস্ত্র জনসাধারণকে আন্তর্জাতিকতার সৌন্দর্য দেখিয়ে এবং জাতীয়তার তুচ্ছতা ও অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিয়ে যদি ব্যক্তিগত নৈতৃত্ব ও দলগত প্রভুত্ব অর্জন করা সম্ভব হয়, তবে আন্তর্জাতিক হওয়ায় লাভ আছে। কিন্তু যুগের হাওয়া যদি ভিন্ন দিকে বয়, তবে রাতারাতি জাতীয়তার গৌরব গাওয়া যেতে পারে। আসলে আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাও নয়, বিশ্ব নয়, দেশও নয়—আমি-ই—হলেন বলেন কোশলেন একচ্ছত্র আমি মহানায়ক—দশবন্ধ মহারাবণ—লুণ্ঠ করতে চাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। স্বযুগ্ত এই বস্তু-আদর্শটাকে যুগায়ুসারে ওলটাই-পালটাই। কখনো সামরিক পথ, কখনো রাজনৈতিক পথ, কখনো অর্থনৈতিক পথ, কখনো বাণিজ্যিক পথ অবলম্বন করি—অভিনব এই বস্তু-আদর্শটাকে সিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে। যখন সামরিক, তখন এই বাণী : 'To have peace we must be prepared for war.' যখন

রাজনৈতিক, তখন ‘Peoples’ War’. যখন অর্থনৈতিক, তখন ‘Two systems can work together’. যখন বাণিজ্যিক, তখন ‘message of disarmament to wage a newer war—a trade war’.

স্থলশরীরে জগতে আমরা চিরকাল এমনটা করব। স্বতরাং নিষ্কাম কর্ম বা কামনা স্থল শরীরটির পক্ষে নয়। স্থলের মূলে যে স্বপ্নটি আছে—তার সাক্ষাৎ যদি কেউ পায়, সবার আড়ালে সেই কেবল জগতের স্বস্তি কামনা করতে পারে। এই কামনায় পার্থিব কোনো চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার নেই বলে তা জীবজীবনকে উন্নততর পথের সন্ধান দেবে।

সকালবেলা উঠে যখন ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকদের আশীর্বাদ করি—তখন বলাই বাহুল্য পার্থিব কোনো কামনাই আমাকে বিড়ম্বিত করতে পারে না। আমি বলি : নূতন যারা পৃথিবীতে এলে, নূতন জীবন-ধান যেন তোমাদের জাগে। ব্যক্তি বা দলকে প্রবল করার কোনো দুর্ভিক্ষি তোমাদের যেন পেয়ে না বসে। দীর্ঘায়ু জীবন নিয়ে যারা এসেছে—শুভেচ্ছার তরঙ্গ-স্পন্দনে তারা যেন নিখিল ভুবনকে অভিস্রাত করে যাও। যারা বড় হতে এসেছে—এ-জন্মে, যারা হয়েও হবে না, যারা হতে হতেই যাবে চলে, যারা হওয়ার পথ করবার জন্তই হয়েছে আবিস্কৃত—সবাইকে মৌনের গোপনে বলে যাই : অনেককালের পুরাতনী এই পৃথিবী—সূর্যপথে পরিক্রমাই শুধু করছে, সূর্য হতে পারছে না কিছুতেই। তোমরা এসো, বাঁচাও আমার জীবধাত্রী এই মৃন্ময়ী-মাকে।

মনে মনে করুন এই চিন্তা। এই চিন্তা পৃথিবীর কারোর যদি কোন উপকারে না আসে আপনার নিজের পক্ষে অন্তত আসবে। অননুভূত এক গভীর প্রেমাবেশে বিশ্বমৈত্রীর কারুণ্য করবেন অনুভব।

ঠিক এই ভাবে যারা চলে গেল—তাদের প্রতি শুভেচ্ছা অনুভবেও আপনি শাস্তি পাবেন।

সংসার ছেড়ে যারা গেলেন—মরণলোকে তাঁরা আপনার অগ্রজ, একদিন আপনিও যাবেন তাঁদের কাছে। চিনুন না—ই চিনুন, জাহ্নন না—ই জাহ্নন তাঁদের সকলের জন্তে শ্রদ্ধাভাবে করুন প্রার্থনা। ‘ভস্মীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং হতঃ’—এ-তঙ্গে বিশ্বাস করে’ তাঁদের প্রতি উদাসীন হবেন না। আমি নিঃসংশয় ভাবে বলছি—নিজের অন্তহীন সত্যায় অবিশ্বাসী হবেন না। মৃত্যুর পর আমার এই দেহ ভস্মীভূত হওয়ার পর ফিরে আর আসবে না বটে—স্বপ্ন-শরীরে আমি থাকব, আমি আসব। সেই সময় আমার জন্তে আপনি যদি

শুভেচ্ছা করেন— ইথার কম্পনে প্রবাহিত হয়ে সেইসব চেতনাময় শুভেচ্ছার কণাগুলি আমাদের অধিকতর চেতনশক্তিতে উদ্দীপ্ত করে তুলবে।

পরিবর্তনশীল সেই মৃত্যুলোকে নবতর শক্তিসাধনায় আমি দেবদান গতি লাভ করব। যত গতিলাভ করব ততই আমার স্মৃতিজীবন শান্ত অমৃতভব করবে। সেই অমৃতভবের চেতন-বীজ অদৃশ্য বেগে আপনার ওপর বর্ষিত হবে। আমার জন্ম আপনার শুভেচ্ছা—পরিণামে সহস্রগুণ চেতনায় বর্ষিত হয়ে আপনার আধ্যাত্মজীবনে সঞ্চারিত হবে।

উর্ধ্বলোকে যারা আছেন তাঁদের মুক্তিকামনায় যত আমরা চিন্তা করি, ততই পরোক্ষ ভাবে আমাদেরই অনাগত জীবন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এই প্রসন্নতার সাধনা প্রত্যহ করতে হয়। জগৎ ও জীবনের মুক্তি যারা চান, সবার আড়ালে বসে তাঁরা ছ'-চার সেকেণ্ডও অন্ততঃ করবেন। সেই ছ'-চার সেকেণ্ডের নিষ্কাম শুভেচ্ছা, আমি নিশ্চিত ভাবে জানি, একদিন আমাদের পৃথিবীকে চিন্ময়ীর সৌন্দর্য দান করবে।

রমাপদ চৌধুরী
পিয়ামসন্দ, মে মু: ৩'০০ ॥
সন্তোষকুমার দেব
বৈঠকী গল্প ২'৫০ ॥

রূপদর্শী
কথায় কথায় ২য় মু: ৩'০০ ॥
রণজিৎকুমার সেনের
দ্বৈতসঙ্গীত ৪'০০ ॥

প্রফুল্ল রায়ের

সিন্ধুপারের পাখি

দ্বিতীয় মুদ্রণ
নয় টাকা

সিন্ধুপারের দেশ কুখ্যাত আন্দামান। বিচিত্র এখানকার বাসিন্দারা। নেশার ধোঁরাক পাখার জন্ত স্বচ্ছন্দে নিজের বউকে তুলে দেয় অপরের হাতে। কথায় কথায় চলে চাখ। খুন-ধারাপি লেগেই আছে। বঞ্চিত বৃদ্ধ জীবনের রুঢ় পরিবেশের মাঝ থেকেই প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী আবিষ্কার করেছেন এই কুখ্যাত দ্বীপের স্থলর আস্রাকে। বলিষ্ঠ চিত্রণের এক অবিস্মরণীয় আলেখ্য।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
বিগতদিন ৩'০০ ॥
মৌলানা খাফি খানের
যন্দুট্ট ২'৫০ ॥

তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের
ঝড় ও বিহঙ্গ ৩'৫০ ॥
সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
জাপানী বন্দী শিবিরে ২'৫০ ॥

সরলাবালা সরকারের
হাল্লানো অভীত ৩'০০ ॥

শান্তিলাল রায়ের
আরাকান্ন ক্রণ্টে ২'০০ ॥

দীপেন রাহার

কাঁচা মাটি পাকা পথ চার টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

আবার সংখ্যার অনুলিপি

৩

বাল্মীকি প্রতিভা ।। গীতি-নাট্য ।। বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে ।।
রচিত ও অভিনীত ।। কলিকাতা ।। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে ।।
শ্রী কালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা ।। মুদ্রিত ।। ফাল্গুন ১৮০২ শক ।।
মূল্য ১০ চারি আনা ।।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩ । প্রকাশ [১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১] । মুদ্রণসংখ্যা ১০০০
বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে প্রসন্নকুমার বিশ্বাস প্রকাশকরূপে উল্লিখিত,
পুস্তকে প্রকাশকের নাম-ঠিকানা মুদ্রিত নাই ।

বাল্মীকি-প্রতিভা রচনা ও অভিনয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

“জ্যোতিদাদার শিয়ানো যন্ত্র যখন খুব চলিতেছে-সেই সময়ে সেই উৎসাহেই
কতক তাঁহার সুরে, কতক হিন্দি গানের সুরে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য

৮ এই পুস্তিকার আখ্যাপত্র নাই, বিবরণ মলাট হইতে গৃহীত । লেখকের
নামও কোথাও মুদ্রিত নাই—“সরকারী দলিলে” (বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে)
গ্রন্থকার ও স্বত্বাধিকারীরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল,
বোধ হয় তাহার ফলেই “চন্দ্রনাথ বসুর মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন তরুণ লেখক
রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’
প্রকাশ ও অভিনয়ের বছরখানেক পরেও” বাংলা বইয়ের প্রতিবেদনে ইহাকে
দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মাঘ-
চৈত্র ১৩৬২ সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাঁহার “সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য
সমালোচনা” প্রবন্ধে এ সকল দেখাইয়াছেন ।

১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত সংস্করণেও মলাটে যে বিবরণ আছে
তাহাতে বা গ্রন্থের অত্মজ, গ্রন্থকারের নাম নাই । বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে
অবশ্য এই সংস্করণের বিবরণে লেখকরূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ আছে,
শ্রীপার্থ বসু জানাইয়াছেন ।

রচনা করিয়াছিলাম। তখন এই নাটক লিখিবার একটা উপলক্ষ্য ঘটিয়াছিল।

“বৎসরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিকগণকে একত্র করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের বাড়িতে বিদ্বজ্জনসমাগম”^১ নামক এক সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সম্মিলন উপলক্ষ্যে গানবাজনা আবৃত্তি ও আহাৰাদি হইত।

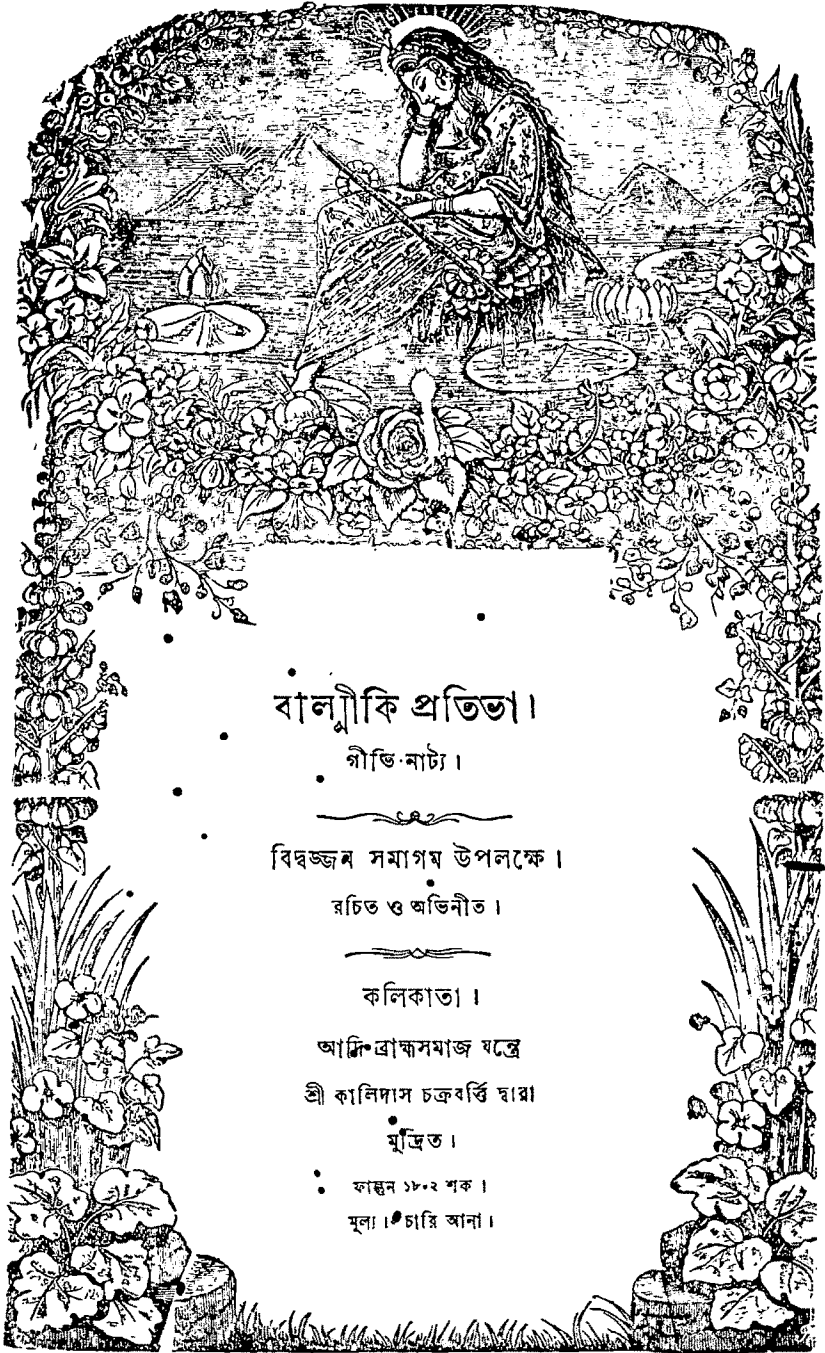
“দ্বিতীয় বৎসর দাদারা এই সম্মিলনে একটি নাট্যাভিনয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিলে এই সভার উপযুক্ত হইবে তাহারই আলোচনাকালে দক্ষ্যরত্নাকরের কবি হইবার কাহিনীই সকলের চেয়ে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। ইহার কিছু পূর্বেই আর্ধ্যদর্শনে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীত বাহির হইয়া আমাদের সকলকেই মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এই কাব্যে বান্মীকির কাহিনী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহারই সঙ্গে দক্ষ্য রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল। তাহার পর জ্যোতিদাদা বাজাইতে লাগিলেন, আমি গান তৈরি করিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়কানুও মাঝে মাঝে যোগ দিলেন। অক্ষয়বাবুর রচিত দুই-তিনটা গান বান্মীকিপ্রতিভার মধ্যে আছে।

“তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া ষ্টেজ বাঁধিয়া বান্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সাজিয়াছিলাম বান্মীকি। আমার ভাতৃপুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল। বান্মীকিপ্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়াছে। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন—অভিনয়রম্য হইতে আমি তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলাম না কিন্তু শুনিতে পাইলাম তিনি খুসি হইয়া গিয়াছিলেন।”^২

জীবনস্মৃতির ‘বান্মীকিপ্রতিভা’ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এই নাট্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

২. ‘বিদ্বজ্জন-সমাগম’ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র হইতে সংগৃহীত তথ্য জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয়ে সমাহৃত আছে। বিদ্বজ্জন-সমাগম সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনা ত্রিবিধ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘রবীন্দ্র-সাগরসংগমে’ গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

১০. জীবনস্মৃতি, প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৩১২। “গ্রন্থপ্রকাশের সময় এই অংশ রজিত হয় এবং ‘বান্মীকিপ্রতিভা’ নামে স্বতন্ত্র অধ্যায়টি সংযোজিত হয়।”—জীবনস্মৃতি, গ্রন্থপরিচয়



বাংলায়ীকি প্রতিভা।

গীতি-নাট্য।

বিদ্বজ্জন সমাগয় উপলক্ষে।

রচিত ও অভিনীত।

কলিকাতা।

আন্ধ্রপ্রাঙ্কসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা

মুদ্রিত।

ফাল্গুন ১৮৭২ শক।

মূল্য ১০ চারি আনা।

‘বাংলায়ীকি প্রতিভা’ প্রথম সংস্করণের মলাট
ইহাতে ব্যবহৃত সরস্বতী-চিত্র ‘ভারতী’ ত্রৈর মলাট হইতে গৃহীত
রবীন্দ্র-ভারতী সমিতি দোজগ্ছে

‘সারদামঙ্গল’ ও ‘বান্ধীকিপ্রতিভা’

জীবনশ্রুতির একটি পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—“সারদামঙ্গলের আরম্ভ-সর্গ হইতেই বান্ধীকিপ্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বান্ধীকিপ্রতিভার গানরূপে স্থান পাইয়াছে।” এই প্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত উক্তিভেদেও অল্পরূপ মন্তব্য আছে। জীবনশ্রুতিতে লিখিয়াছেন—“ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।”

ইহার পূর্বেও একাধিকবার অল্পরূপ স্বীকৃতি করিয়াছেন—

‘গানের বহি ও বান্ধীকি-প্রতিভা’ (১৩০০) গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ॥ “ইহার সহিত বান্ধীকি-প্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল। কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল নামক কাব্য পাঠ করিয়া উক্ত গীতিনাট্যের ভাব আমার মনে উদয় হয়। এমন কি দুই একটি গানে সারদামঙ্গলের অনেকগুলি পদ প্রায় অবিকৃতভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। এজন্য বিহারীবাবুর নিকট আমি ঋণী আছি।…… ১০ই চৈত্র ১২৯৯।”

‘বিহারীলাল’ প্রবন্ধ, সাধনা আষাঢ় ১৩০১। আধুনিক সাহিত্য ॥ “এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুরুর নিকট আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে বান্ধীকি-প্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া বিদ্যজ্ঞান-সমাগম নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র ও অগ্রাণ্য রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।^{১১} সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদা-মঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।”

‘কাব্য গ্রন্থাবলী’র (১৩০৩) ভূমিকা ॥ “বান্ধীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য লেখকের বাল্যরচনা। বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল কাব্য হইতে ইহার কতক কতক ভাব এমন কি, ভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলাম—সেজন্য কবির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।…… ১৫ আশ্বিন ১৩০৩।”

১১ এই প্রসঙ্গে জীবনশ্রুতির গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য। অভিনয়স্থলে উপস্থিত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রাণ্য মনীষীদের মনে এই অভিনয় যে রেখাপাত করিয়াছিল তাহার বিবরণ ইহাতে সংকলিত আছে।

সারদামঙ্গল । সর্গ ১ স্তবক ২০

এস মা করুণারাগী

ও বিধু-বদন-থানি

হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার ;....

এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার ।

বান্ধীকি-প্রতিভা, বান্ধীকি-কর্তৃক সরস্বতী বন্দনা,

‘হৃদয়ে রাখ’, গো দেবি, চরণ তোমার ।’

এস, মা করুণারাগী, ও বিধুবদন থানি

হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার ।

এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার ।

সারদামঙ্গল । পূর্বোদ্ধৃত স্তবক

যাও লক্ষ্মী অলকায়

যাও লক্ষ্মী অমরায়

এস না এ যোগী-জন-তপোবন-স্থলে !

বান্ধীকি-প্রতিভা, বান্ধীকি-কর্তৃক লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যানি,

‘কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা’

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,

এ বনে এসনা এসনা, এসনা এ দীন জন কুটীরে ।

সারদামঙ্গল । সর্গ ১ স্তবক ৩৩

অদর্শন হ’লে তুমি, .

তোজি লোকালয় তুমি,

অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;

হেরে মোরে তরু লতা :

বিষাদে কবে না কদা,

বিষম কুসুম কুল বন-ফুল-বনে ।

‘হা দেবী, হা দেবী’, বলি

গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;

নীলবে হরিণীরালা ভাসিবে নয়নজলে ॥

বান্ধাকি-প্রতিভা, পূর্বোল্লিখিত সরস্বতী-বন্দনা
 অদর্শন হ'লে তুমি, ত্যেজি লোকালয় ভূমি
 অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে,
 হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবে না কথা
 বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল-বনে ।
 “হা দেবী, হা দেবী” বলি, গুঞ্জরি কাঁদবে অলি ;
 বারিবে ফুলের চোখে শিশির আসার,...”^{১২}

বান্ধাকি-প্রতিভায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “বান্ধাকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে।” পূর্বোদ্ধৃত তাঁহার মন্তব্যও আছে—“অক্ষয়বাবুর রচিত দুই-তিনটা গান বান্ধাকিপ্রতিভার মধ্যে আছে।” ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ‘এই প্রসঙ্গে’ লিখিয়াছেন^{১৩}—

“সপরিবার অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।^{১৪} তাঁর রচিত কতকগুলি গান শরীরে রবিকাকার

১২ শ্রীহরকুমার সেন লিখিয়াছেন, “আরও দুইটি গানে সারদামঙ্গলের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।” দ্রষ্টব্য ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ২৩১

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, “হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার” পরবর্তী-কালে বান্ধাকি-প্রতিভা হইতে বর্জিত হয়। বর্তমানে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে “নাট্যগীতি” বিভাগে গানটি ও স্বরবিতান ৫১ খণ্ডে তাহার স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

১৩ ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’, ১৩৬৭, পৃ ২৩-২৪। গান দুটি বান্ধাকি-প্রতিভার দ্বিতীয় তথা বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের অন্তর্গত।

১৪ এই ঘনিষ্ঠতার বিবরণ নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে—

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি’;

শরৎকুমারী চৌধুরাণী, ‘রচনাবলী’, “ভারতীর ভিটা” প্রবন্ধ;

রবীন্দ্রনাথ, ‘জীবনস্মৃতি’, “অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী” অধ্যায় ও অন্তর্ভুক্ত।

জীবনস্মৃতি-সম্পাদক লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থের ‘ভগ্নহৃদয়’ অধ্যায়ে ‘তখনকার কালের ইংরেজি-সাহিত্যশিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদের কাছে মূর্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন...’ এই বর্ণনার উদ্দিষ্ট অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

গীতিনাট্যে স্থান পেয়েছে, যেমন ‘রাঙা পদপদ্মযুগে’ ও ‘এত রঙ্গ শিখেছ কোথায়’।^{১৫}

স্বপ্নপ্রয়াণ ও বাস্তবিকপ্রতিভা

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন—

“আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে—

“তখন [কিশোরবয়সে] আমার কাব্যলেখার আর একটি আদর্শ ছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী...ইহার সত্ত্ব রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া গুলিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অনলক্ষ্যে ইহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।”—“জীবনস্মৃতির খসড়া”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০।

রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝর’ের ‘স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতা ভারতী পত্রের ১২০৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম রচনা, “তাহারই প্রসঙ্গক্রমে” ঐ সংখ্যার শেষ রচনা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর “অভিমানিনী নির্ঝরিনী” কবিতা। প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম সংস্করণেও দুইটি কবিতাই মুদ্রিত হইয়াছিল—“উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম।”—গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন, প্রভাতসঙ্গীত, প্রথম সংস্করণ

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, ‘পূরবীর’ সঙ্কিতা অংশে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের “পত্র” (“সৃষ্টিপ্রলয়ের তত্ত্ব লয়ে তুমি আছ মত্ত”) কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদ্দেশ্যে লিখিত।—‘রবীন্দ্রকথা’, পৃ ১২৭। কবিতাটি পূর্বে ভারতী ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—রচনা-স্থান ও কাল দেওয়া আছে বনক্ষেত্র [“Woodlands”], শিমুলশৈল, শনিবার ১৮৯৮। পূরবীতে রচনা-কাল জ্যৈষ্ঠমাস অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

১৫ শ্রীস্বকুমার সেন লিখিয়াছেন—

“রচনাভঙ্গি অল্পসারে ‘এখন কর্ব কি বল।’ ‘তবে আয় সবে আয়!...’ এবং ‘কালী কালী বলো রে আজ’—এই তিনটি গান অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা বলিয়া মনে করি।”—‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃ ২৩১।

[স্বপ্নপ্রয়াণ] শুনিবার চেষ্টা করিতাম।...স্বপ্নপ্রয়াণ বারম্বার শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল...।” ১৬

‘বাল্মীকি-প্রতিভা’র ‘এই যে হেরি গো দেবী আমারি’ গানে “দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ (অক্টোবর ১৮৭৫) কাব্যের ‘জয় জয় পরব্রহ্ম’ গানটির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।” ১৭

স্বপ্নপ্রয়াণ

মহা কবি! আদি কবি!

ছন্দে উঠে শশি-রবি,

ছন্দে পুন’ অস্তাচলে যায় ॥

তারকা কনক-রুচি,

জলদ-অক্ষর-রুচি

গীত-লেখা নীলাক্ষর-পাতে।

বাল্মীকি-প্রতিভা •

ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,

ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে,

জলন্ত কবিতা তারকা সবে ;

প্রথম অভিনয়ের তারিখ

শ্রীকুমার সেন লিখিয়াছেন—

“জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যেদিন বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম অভিনয় হয় সেদিন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ও ছিলেন। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইনি একটি কবিতা লিখেন ‘বালিকা-প্রতিভা’ নাম। ইহা রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘অবসর-সরোজিনী’তে সঙ্কলিত আছে। কবিতাটিতে যে পাদটীকা আছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে ১৬ই ফাল্গুন ১২৮৭

১৬ “জীবনস্মৃতির খসড়া”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ ১১৮। ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখিয়াছেন, “তথাপি আমার লেখায় তাহার নকল ওঠে নাই।”

১৭ গীতবিতান, তৃতীয় খণ্ড, শ্রীকানাই সামন্ত লিখিত গ্রন্থপরিচয়

[২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১] শনিবার দিবসে বান্মীকি-প্রতিভা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ” ১৮

১৭ ফাল্গুন ১২৮৭, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ সংখ্যা সাধারণী পত্রে এই ‘সংবাদ’টি প্রকাশিত হইয়াছিল—

“কল্যা শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতার জোঁড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে “বিদ্বজ্জন সমাগম” হইয়াছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্যারীমোহন মিত্র, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাধর মুখোপাধ্যায়, বাবু শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার বি. এল. গুপ্ত, মিষ্টার টি. এন. পালিত, আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাজা শ্রীশেীরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার কানাইলাল দে, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঞায়রত্ন, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বহুতর আহত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর ছোট ছোট গুটিকত বালক বালিকা, সঙ্গীত-যন্ত্রের স্বরের সঙ্গে বেশ স্বস্বরে গান করিয়াছিলেন। তাহার পর “বান্মীকি প্রতিভা” নামে একখানি অভিনব গীতিকাব্য অভিনীত হয়। বান্মীকি সরস্বতী রূপায় দস্যুবৃত্তি ভাগ করিয়া কিরূপে অমর কবিত্ব লাভ করেন, তাহা প্রদর্শন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বান্মীকি হন, আর “প্রতিভা” নামী, প্রতিভা-সম্পন্ন, তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্ট্র ভাগদেবী রূপে অভিনয় করেন। বঙ্গ কুল-কুমারী কর্তৃক রঙ্গ-বেদী এই প্রথম উজ্জলীকৃত হইল। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির নব কলেবরের এই অভিষেক ক্রিয়ার প্রতিভা উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বটেন। তিনি স্বকণ্ঠা, গীতি নিপুণা, মতেজ্জ-নয়না এবং ধীর-পদ বিক্ষেপ-কারিণী। তাঁহার গীতাভিনয়ে, দর্শক বৃন্দের অনেকে বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিলেন। ” ১৯

অভিনয়স্থিতি

নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে রবীন্দ্রনাথ-অম্মুষ্টিত বান্মীকি-প্রতিভা অভিনয়ের স্থিতি ২০ লিপিবদ্ধ আছে—

১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ ১৬৩। রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতাটি পাদটীকাসহ প্রথমে ১২৮৮ বৈশাখ সংখ্যা আখ্যাদর্শনে প্রকাশিত হয়।

১৯ ‘বহুরূপী’ পত্রের রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যাতেও উদ্ভূত।

২০ রাজকৃষ্ণ রায়ের “বালিকা-প্রতিভা” কবিতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে ‘বালিকা’-বেশিনী প্রতিভা দেবীর প্রশস্তি।

‘অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ঘরোয়া’

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রনাথের কথা’

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, ‘রবীন্দ্র-স্মৃতি’

স্বরলিপি

‘বাল্মীকি-প্রতিভা’র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত স্বরলিপি ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পুনর্মুদ্রণ / সংস্করণ ২১

১২২২ সালে বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মলাট হইতে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল—

বাল্মীকি-প্রতিভা । / গীতি-নাট্য । / দ্বিতীয় সংস্করণ । / কলিকাতা / ৫৫ নং চিংপুররোড । / আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে / শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত / ও প্রকাশিত । / ফাল্গুন ১২২২ সাল । / মূল্য ১০ চারি আনা । ২২

পৃষ্ঠাসংখ্যা ৥ ২২ । প্রকাশ [২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬] । মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ ।

‘ফাল্গুন ১২২২’ তারিখে প্রকাশিত কতকগুলি কপিতে ‘দ্বিতীয় সংস্করণ’ শব্দ দুইটি নাই, তাহা ছাড়া মলাট, পৃষ্ঠাসংখ্যাাদি অমূল্য ৥ ২৩

প্রথম সংস্করণের ত্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণও অভিনয়ের প্রাক্কালে মুদ্রিত, এইরূপ অন্তর্নিহিত হইয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভার এই দ্বিতীয় সংস্করণ ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা বহুপরিবর্ধিত, দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (পৃ ২, পাদটীকা) উল্লিখিত আছে যে, “অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিস্তৃত আকারে ‘কাল যুগয়া’ গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।” জীবনস্মৃতিতেও লিখিয়াছেন—“পরে, এই [কাল যুগয়া] গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া ছিলাম...” বনদেবীদের চরিত্রও কালযুগয়া হইতে নূতন লওয়া হইয়াছে।

২১ এই পঞ্জীতে বিভিন্ন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণের যে বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ নহে ; গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইবে। আপাততঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে।

২২ এই সংস্করণের এক কপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে আছে।

২৩ রবীন্দ্রভারতী-সমিতির গ্রন্থাগারে ইহার এক কপি আছে।

অতঃপর বান্মীকি-প্রতিভা সাধারণতঃ গ্রন্থাবলী বা গীতসংগ্রহের অন্তর্গত হইয়াই প্রকাশিত হইতে থাকে, যথা—‘গানের বহি ও বান্মীকি-প্রতিভা’ (১৮৯৩); ‘কাব্য গ্রন্থাবলী’ (১৮৯৬)^{২৪} কাব্যগ্রন্থ, ৮ম ভাগ (১৯০৩), ‘গান’ অংশে; ‘রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী’ (১৯০৪), “গান” অংশে; ‘গান’ (১৯০৮); ‘গান’ (১৯০৯); ‘কাব্যগ্রন্থ’, দশম খণ্ড (১৯১৬), ‘গান’ অংশে; গীতবিতান প্রথম খণ্ড (১৩৩৮)। বর্তমানে বান্মীকি-প্রতিভা গীতবিতান তৃতীয়খণ্ডভুক্ত; রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডেও বান্মীকি-প্রতিভা মুদ্রিত আছে। এ সকল দ্বিতীয় সংস্করণেরই অনুবৃত্তি; তবে পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ ‘গান’ (১৯০৮) পুস্তকে ও তদবধি, ‘হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার’ বর্ণিত হইয়াছে তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; বর্তমানেও উহা বর্ণিত।

এই সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ ব্যতীত, সম্ভবতঃ অভিনয়পত্ররূপে, বান্মীকি-প্রতিভা একাধিকবার স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত ইহার একখানির প্রকাশকাল ১৬ মার্চ ১৯১২; মুদ্রণসংখ্যা ৫০০।^{২৫}

২৪ এই গ্রন্থে বান্মীকি-প্রতিভার সৃচনায় লিখিত হইয়াছে—“এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুর লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শন যোগ্য। গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা দোষ নিবারণের জন্ত ইহাকে স্থান দেওয়া গেল।”

২৫ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার *On the Edges of Time* (1958) গ্রন্থে এইবারের অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; ১৯১২ সালে মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথের যে বিলাতযাত্রার কথা ছিল তাহার পূর্বরাত্রে এই অভিনয় হয়—

“The evening before the boat sailed there was a party at Sir Ashutosh Chaudhuri’s palatial residence, where a performance of father’s operatic play *Balmiki Pratibha* was given. Preparations had been going on for a long time and Dinendranath had been chosen to play the part of Balmiki, Father, of course, had to be present. We came back late at night. Instead of going to bed Father sat down to write letters for the remainder of the night. In the early hours of the morning we found him to our dismay on the verge of collapse...”। বিলাতযাত্রা স্থগিত হয়।

অভিনয়-উপলক্ষ্যে ব্যবহারার্থ পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র মুদ্রিত 'বান্মীকি-প্রতিভা'র একটি সংস্করণে অবনীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হয়, এজ্ঞা ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।^{২৬}

কোন কোন গান কালমুগয়া হইতে গৃহীত, কোন কোন গান দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন যুক্ত তাহার একটি তালিকা পরিশেষে মুদ্রিত হইল।^{২৭}

বান্মীকি-প্রতিভা প্রথম সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

কালমুগয়া হইতে বিগুহ বা পরিবর্তিত আকারে গৃহীত গান

আঃ বেঁচেছি এখন

এনেছি মোরা এনেছি মোরা

রিম রিম ঘন ঘন রে বরষে

এই বেলা সব মিলে চল হো, চল হো

গহনে গহনে যা রে তোরা

• চল চল ভাই

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে

প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে

সদায় মশায় দেয়ি না সয়

২৬ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত ইংরেজি প্রোগ্রাম দর্শনে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, প্রথম মহামুদ্রের সাহায্যার্থে সংগীতসংঘের উদ্যোগে ১৯১৪ সালে ৮ ডিসেম্বর কলিকাতায় থিয়েটার রয়ালে এই অভিনয় হয়। শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরও (তিনি অভিনয়ে 'দম্ভা'দলভুক্ত ছিলেন) অল্পরূপ বিবরণ দিয়াছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁহার 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' গ্রন্থে "নাট্যস্মৃতি" বিভাগে এই অভিনয়ের স্মৃতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯১২ সালের অভিনয়ের ত্রায় এইবারেও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বান্মীকির অভিনয় করিয়াছিলেন।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৯১২ ও ১৯১৪ উভয় বারের অভিনয়েই তিনি 'দম্ভা'দলভুক্ত ছিলেন) এই সচিত্র বান্মীকি-প্রতিভা বর্তমান সংকলনিতাকে দেখিতে দিয়াছেন।

২৭ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস-লিখিত 'রবীন্দ্রসংগীত-গ্রন্থ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৬৯) বান্মীকি-প্রতিভা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন গান

সহে না সহে না কাঁদে পরাণ

ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে

মরি ও কাহার বাছা

রাঙা পদপদ্মযুগে

কি দোষে বাধিলে আমায়

ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই

রাজা মহারাজা কে জানে

আছে তোমার বিচ্ছেদাধি জানা

আঃ কাজ কি গোলমালে

এত রঙ্গ শিখেছ কোথায় মুণ্ডমালিনী

অহো আশ্পর্শা একি তোদের নরাদম

আয় মু আমার সাথে

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই

কেন রাজা ডাকিস কেন

বলব কি আর বলব খুড়ো

রাখ রাখ ফেল ধন

দেখ দেখ দুটো পাখী বসেছে গাছে

নমি নমি ভারতী

শ্রামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা

বাণী, বীণাপাণি করুণাময়ী

প্রথম সংস্করণের গান দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত

নিশুন্ত-মদ্দিনী অশ্বে

এই গানটির স্থলে 'রাঙা পদপদ্মযুগে' গানটি বসানো হইয়াছে।

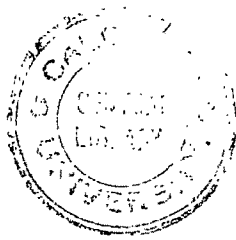
বর্জিত গানটি এখানে মুদ্রিত হইল—

নিশুন্ত-মদ্দিনী অশ্বে,

মহা-সমর-প্রমত্ত মাতঙ্গিনী, কস্পে রণাঙ্গন পদভরে একি ?

থরহর মহী সমুদ্র, পর্বত ব্যোম,

সুরনর শঙ্কাকুল কে এ অঙ্গনা !



মাহিত্যের খবর
বর্ষ ১০ ॥ সংখ্যা ১২
ভাদ্র, ১৩৭০

ভাষাশিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ

আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে; যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই যুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকটসংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে যুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্তর্দিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দূতসম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, ‘বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।’ প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

—শিক্ষার হেরফের।

পৌষ ১২২২ ॥ শিক্ষা

বাক্শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

বিনায়ক সান্নাথ

পদপ্রয়োগ সম্বন্ধে একটা শিথিলতা আজকাল প্রকট হ'য়ে উঠছে চারদিকে। বিদ্যার্থীদের উত্তরপত্রে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, কথাসাহিত্যে, কাব্যে—সর্বত্রই একটা গা-ঢালা ঢিলা ভাব ছড়িয়ে পড়েছে বিষাক্ত বীজাণুর মত। বাঙলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা এই অজুহাতে আধুনিক লেখকরা পদ-রচনায় বে-পরোয়া ব্যবহারের পক্ষপাতী। বাঙলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে অধিকাংশই 'তৎসম'। কাজেই ঐ সব শব্দকে ইচ্ছামত বানান ও অর্থে প্রয়োগ করার অধিকার কারো নেই। অবশ্য, অনেক শব্দ দীর্ঘকালের শিষ্ট-প্রয়োগের ফলে বাঙলায় তাদের অর্থ-পরিবর্তন ক'রেছে এবং সেগুলি সেই সেই অর্থে প্রয়োগ ক'রতেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু তাই বলে যে কোনো সংস্কৃত শব্দকে মনগড়া রূপে ও অর্থে ব্যবহার করা হ'তে থাকলে ভাষার পক্ষে সেটা মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়াবে।

সংবাদপত্রে অনেক সময় অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ গঠন ক'রতে হয়। কোন কোন স্থলে গঠিত শব্দগুলি যথার্থ মূল্যবান ও মনোজ্ঞ। কিন্তু এর বৈপরীত্যটাই চোখে পড়ে বেশী করে। প্রথমটা সাধু ও অসাধু ভাষার মিশ্রণ-সম্পর্কিত নয়, ভাষার গণতন্ত্রে বর্ণাশ্রম বলে কিছু নেই, —বিদেশী, দেশজ ও খাঁটি সংস্কৃত সবই বাঙলা এবং তারা সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। ভাব-প্রকাশের অতুল শব্দটি—যে কোনো বর্ণেরই হোক—সমান কোলীয়া দাবী ক'রতে পারে। গুরুগম্ভীর দার্শনিক প্রবন্ধে যে শব্দটি অচল, হালকা রচনায় সেটি অবলীলাক্রমে চ'লে যেতে পারে। আসল কথা এই যে ঔচিত্যই হ'লো প্রবন্ধের প্রাণ। অবশ্য কতকগুলি 'অবর' শব্দ সব ভাষাতেই আছে যেগুলি অপভ্রংশে এবং শিষ্ট-প্রয়োগে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পণ্ডিতী শব্দও আছে কতকগুলি যেগুলির তাৎপর্য শুধু বিশেষজ্ঞেরই বোধগম্য; এদের নাম দেওয়া যেতে পারে 'প্রবর'। বাঙলায় বিদ্যাত্তর বদলে 'শম্পা'-শব্দের প্রয়োগ (বিশেষস্থল ব্যতীত) সমর্থনযোগ্য কি? এই দুই শ্রেণীর শব্দ ছাড়া আর সমস্ত শব্দই জল-চল এবং সাহিত্যের ভোজে পংক্তি-ভোজনের তুল্য

অধিকারী। আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র বর্তমানে এতোই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে অমিশ্র সংস্কৃত, দেশজ বা অপভ্রংশ শব্দ দিয়ে ভাবপ্রকাশ এয়ুগে আর সম্ভব নয়। কাজেই গুরুচণ্ডালীর মামুলী মামলা আপাতত মূলতুবী রাখা যেতে পারে। শব্দ-সংকর হয়নি এমন ভাষা আজ আর কোনো দেশেই নেই। আমাদের পরিচয়ের পরিধি দিন দিন যতোই প্রসারিত হবে, নব নব শব্দসম্ভারে আমাদের ভাষাভাণ্ডারও ততোই সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠবে—ভাবপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যও ততোই যাবে বেড়ে।

যুরোপে সাহিত্য-সমালোচক-মহলে একটি ফরাসী বচন প্রচলিত আছে—
—‘mot juste’ (মো জুস্ত) অর্থাৎ সেই বাক্যাংশ যা সবচেয়ে বিশিষ্টরূপে উদ্দিষ্ট সূক্ষ্মার্থটি প্রকাশে সক্ষম,—সংক্ষেপে শব্দ-সৌষ্ঠব। এই সূষ্ঠতা ব্যতীত ভাবের উৎসেক কখনই সম্ভব নয়। আধুনিক শ্রুতকীর্তি সাহিত্যিকদের রচনাতেও পদ-বিচ্ছাদের এই সূষ্ঠতার অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য এমন কবি-সাহিত্যিক এখনো আছেন যাদের রচনায় পদবন্ধ এমন সুসংবদ্ধ ও সুসংহত যে লেশমাত্র শিথিলতা কোথাও চোখে পড়ে না। কিন্তু শব্দের অভিপ্রায় তো কেবলমাত্র প্রকৃতি-প্রত্যয়গত আভিধানিক অর্থের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, প্রয়োগ-কৌশলে সে প্রকাশের অতীত এক অভিনব অর্থ বহন করে। কীটম্-এর ‘Nightingale’ কবিতা থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক “Now more than ever seems it rich to die”—এই পংক্তির ‘rich to die’ এই গর্ভিত উক্তিটির মধ্যে যে কী যাত্ন আছে তা বুঝিয়ে বলা যায় না। নিহিত ভাবটিকে কি অত্র কোনো ভাষায় আভাসিত করা সম্ভব? কিন্তু উচ্চকোটির কবি-শিল্পীদের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি একটু নীচের স্তরে নামি তা হ'লে দেখবো সেখানে পদ-বন্ধের এই বাধুনির একান্ত অভাবে, শব্দের অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্বনি-সৌষ্ঠবের কথাও অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। বাক্য এবং অর্থ পার্বতী-পরমেশ্বরের মত পরস্পর-সম্পৃক্ত। ধ্বনিবদ্ধ বাক্যের মাধ্যমেই অর্থের উদ্গতি ও পরিব্যাপ্তি সম্ভব হয়, ছিলার টানে যেমন তীর ছোটো, ধ্বনির টানে শব্দার্থও তেমনি লোক থেকে লোকান্তরে ধাবিত হয়। কাব্য বা সঙ্গীত প্রসঙ্গে শুধু অর্থের বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই। যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য তাই সূষ্ঠ আবৃত্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রুতি বলেছেন, “একঃ শব্দঃ সূত্রযুক্তঃ সমাগজাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি।” এখানে সূত্রযুক্ত শব্দের অর্থ সু-উচ্চারিত সার্থক শব্দ। ইন্দ্রবধের জন্ত ব্রজাসুরের অল্পজ্ঞিত যজ্ঞ আবৃত্তির জন্তই বিপরীত ফল

প্রসব ক'রেছিল। মস্তের মধ্যে 'ইন্দ্রশক্তি' শব্দটি স্ফুট স্বরাঘাতসহ আবৃত না হওয়ায় 'ইন্দ্ররূপ শক্তি' না বুঝিয়ে বুঝিয়েছিল 'ইন্দ্রের শক্তি' বস্তুতঃ, স্প্রযুক্ত শব্দ ভাবের নীবি-স্বরূপ, কামধেনু থেকে চুন্ধের মত বাগ্ধেনু দোহন ক'রেই অভিরূপ ও অভিনব অর্থ উদ্ধার করা যায়।

সর্বযুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি; তাঁর কবি-প্রতিভার আওতায় পড়ে গল্প-লেখক হিসাবে তাঁর রচনার উৎকর্ষও যেন কতকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রসজ্ঞ শিল্প-সমীক্ষকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে এঁদের স্বল্প কারুকর্ম—এঁদের রচনা-বৈচিত্রী। শব্দার্থের এমন গুন্মকন * কদাচিৎ চোখে পড়ে। অতি-পরিচিত কথাকেও তিনি এমন মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন যে মনে হয় যেন কথাটি গল্প শ্রুতিগোচর হ'লো। কোনো কোনো সময় আবার শব্দ-সমাবেশের বিচিত্রতায় এমন একটি আশ্চর্য আবহ সৃষ্টি হয় যে সহৃদয় শ্রোতার চিত্ত চিন্তার যুক্তিজটিল পথ কাটিয়ে কল্পনার অসীমতায় মুক্তি পায়। অলঙ্কার তাঁর লেখায় আছে প্রচুর, কিন্তু তা কোথাও ভার হয়ে ভাব-দেহকে আচ্ছন্ন করেনি। কবিদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হলো ছোটকে বড় করে তোলা, এককে বহুর সঙ্গে মিশিয়ে দেখা, বিবিধ উপচারে পূজার ডালি সাজিয়ে সুন্দরের বন্দনা করা। সৃষ্টির মুহূর্তে ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তার সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যায়; তাই একের বাণী অনেকের হ'য়ে ওঠে, কবির স্বরে আমরা নিজেদের সুরটিই খুঁজে পাই। শুদ্ধ যুক্তিবাদের দিক থেকে দেখলে বহুর সঙ্গে আত্মীয়তার এই বন্ধনকেই বাহ্যিক বলেই মনে হবে, কিন্তু কবির অলঙ্কার তো প্রক্ষিপ্ত কোনো বাইরের জিনিস নয়, আবেগ থেকে আক্ষিপ্ত অন্তরের বর্ণরাগ, রূপজীবির আকল্প এ নয়, বাগ্ধেবীর রাগ-শৃঙ্গার। রূপকের আধারে অরূপের রূপ-কল্পনা, শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, প্রত্যেক রূপশিল্পীরই একান্ত স্বভাবগত—উপমার পর উপমার সম্পাতে তিনি সহৃদয় জনের হৃদয়ে স্বহৃদয়ের অল্পভূতিকে সঞ্চারিত করেন। এই সঞ্চার (communication)—এই সাধারণীকরণই শিল্পের মুখ্য লক্ষ্য। ফ্লোবেরার-এর সূত্র "C'est une maniere de voir" অর্থাৎ 'রীতি বা ঠাইল হলো শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি'—একথা মেনে নিয়েও বলা চলে যে সৃষ্টিটি অসঙ্গত না হ'লেও অসম্পূর্ণ; কারণ, শিল্পের কাজ তো কেবল নিজে দেখা নয়, অপরকে নিজের মত করে দেখানো, আত্মনীর অল্পভূতিকে বিশ্বজনীন ক'রে তোলা। রসসিদ্ধি

* বাক্যে শব্দার্থগোঃ সম্যগ্ রচনা গুন্মকনা মতা।

নির্ভর করে এরই ওপর। দৃষ্টির বিশিষ্টতা না থাকলে সৃষ্টি সার্থক হয় না সত্য, কিন্তু উচিত ও ললিত বচন-বিশ্বাস ছাড়া ভাবের পরিবহণ কিছুতেই সম্ভব নয়। রস শব্দের তাৎপর্যই হলো ‘রস্তুমান’ বা ‘আস্বাস্তুমান’ ভাবটিকে অপরের আস্বাস্তুরূপে আরোপ করা। যে পরিমাণে যে সাহিত্য এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে সেই পরিমাণে তা সার্থক সৃষ্টির কোঠার পড়ে।

কিন্তু লেখকের হাতে তো রঙের তুলি নেই, তাই ভাবের ছবি তাঁকে আঁকতে হয় শব্দের সমাহারে, চিন্ময়কে চিন্তা করতে হয় বাউন্সরূপে। কাজেই বাক্যই হলো সাহিত্যিকের উপজীব্য উপাদান; কিন্তু সঙ্গীত-শ্রুতির মত কেবল অর্থ-নিরপেক্ষ সুরতরঙ্গের মাধ্যমে শ্রোতৃ-হৃদয়ের আবেগকে উদ্দীপ্ত করা সাহিত্যিকের কাজ নয়, তাঁর কারবার অর্থনৈতিক শব্দের সূচ সমন্বয় নিয়ে; তাই বাক্য এবং অর্থ দু’দিকেই লক্ষ্য রেখে তাঁকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়—অর্থের পরিমিত সীমার মধ্যে থেকেও ব্যঞ্জনার সাহায্যে অপরিমিত ভাবের ত্রোতনা করতে হয়। প্রাচীন অলঙ্কার মতে গন্ত এবং পন্ত দুইই কাব্যের পর্কায় পড়ে। ব্যঞ্জনা না থাকলে চিন্তা-বিস্তার ঘটে না, কাজেই কাব্যের কাব্যত্বও হয় ক্ষুণ্ণ। শিল্পশ্রষ্টাকে তাই অশেষ যত্নে শব্দরত্নের সন্ধান করতে হয়, ভাস, কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে যেমন একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধেও তেমন সত্য। ভাব-ব্যঞ্জনার অহুরোধে রবীন্দ্রনাথকে কখনো নতুন নতুন শব্দ গঠন করে নিতে হয়েছে, কখনো বা পুরাতন শব্দকে নতুন অর্থে প্রয়োগ করতে হয়েছে; ‘হু’এক স্থলে আবার কোনো কোনো শব্দকে সম্পূর্ণ মনগড়া অর্থেও ব্যবহার করতে হয়েছে। আমরা জানি, মধুসূদন, দাশরথি প্রভৃতি বিশিষ্ট শব্দ-শিল্পীরাও অনেক শব্দকে অনভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছেন; ‘রজঃ’ শব্দকে ‘রজত’ অর্থে, ‘নিকষ’ শব্দকে ‘কোষ’ অর্থে যুক্তোভয়ে ব্যবহার করেছেন মধুসূদন; দাশরথি ‘কোদন্ত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন ‘কোদাল’ অর্থে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃষ্টির মধ্যেও অহুরূপ শব্দ হুঁচারণি পাওয়া যাবে, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রমমাত্র, নিয়ম নয়; প্রসঙ্গত—‘হু’একটির উল্লেখ আমরা এখানে করবো।

প্রথম ধরা যাক ‘উর্বশী’ কবিতার ক্রন্দসী শব্দটি—“ওই গুন দিশে দিশে তামা লাগি কাঁদছে ক্রন্দসী।” শব্দটি এখানে ঠিক কি অর্থে কবি প্রয়োগ করেছেন বলা শক্ত। সম্ভবত ‘আকাশ’ বা ‘অন্তরীক্ষ’ অর্থেই তিনি শব্দটিকে নিয়েছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে সাহিত্যের পথের এবং

‘শান্তিনিকেতন’র দুটি প্রবন্ধের মধ্যে : “অসীম একের আকৃতিই তো সেই বেদনা যা, বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত করে রয়েছে। সে রোদসী, ক্রন্দসী ; সে কাঁদছে।”—সাহিত্যের পথে (তথ্য ও সত্য), “যে প্রার্থনার যুগ-যুগান্তরব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই-অন্তরীক্ষকে রোদসী, ক্রন্দসী বলেছে।” শান্তিনিকেতন (১৪।৩৮৬।১২) ১১

সায়ণাচার্য কিন্তু শব্দটিকে ছোঁ: এবং পৃথিবীর সম্মিলিত অর্থেই গ্রহণ করেছেন (শব্দ ২ ; ১২ ; ৮ ; ৬ ; ২৫ ; ৪ ; ১০ ; ১২১ ; ৬) :—

ক্রন্দসী সংযতী বিশ্বয়তে পরেহবর উভয়া অমিত্রাঃ ।

সমানং চিত্রধমাতস্থিবাংসা নানা হবতে সজনাং ইন্দ্রঃ ।

(শব্দ ২, ১২, ৮)

শব্দবেদের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়ণ এর অর্থ করেছেন—‘শব্দং’ কুর্বাণে মাহুযী দৈবী চ হে সেনে ।’ শ্লোকটি অথর্ব বেদেও আছে ; সেখানে তিনি শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন ‘জ্বাপৃথিব্যো’ অর্থে। সায়ণের অর্থে নিলেই ‘উর্বশী’ উদ্ধৃত পংক্তিটির অর্থ আরো মনোগ্রাহী হয়। পুরুষবা অর্থাৎ সমগ্র মর্তলোকে তোমাকে হারিয়ে কাঁদছে, স্বর্গের দেবতারাও তোমার বিরহে কাতর, মরামরের তুমি কামনার ধন, তুমি তাদের ‘স্বপ্ন-সঙ্গিনী’ । কেউ কেউ আবার বর্তমান প্রসঙ্গে ‘ক্রন্দসী’ শব্দটিকে ‘দিগঙ্গনা’ অর্থে গ্রহণ করার পক্ষপাতী । শব্দ দুটি ‘রোদস্’ ‘ক্রন্দস্’ শব্দের দ্বিবিচন থেকে নিম্পন্ন ; সুতরাং স্বর্গমর্ত্যের যুগ্ম অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন মনে হয়। কালিদাস ভট্টনারায়ণও দ্বৈত-অর্থেই ব্যবহার করেছেন ‘রোদসী’ শব্দটি :

“বেদান্তেষু যমাহরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী ।” (বিক্রমোর্বশী ১।১)

“রবঃ শ্রবণ-ভৈরবঃ স্থগিত-রোদসী-কন্দরঃ ।” (বেগীসংহার ৩।২)

আগেই বলেছি সময় সময় রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনানুরোধে অনেক নতুন নতুন শব্দ তৈরী করে নিয়েছেন। এইসব শব্দের মধ্যে যেগুলি ধ্বনি এবং অর্থ দু’দিক থেকেই হৃদয় ও ভ্রূি বিশেষ ক’রে সেইগুলিরই উল্লেখ এখানে করবো। নাট্যাভিনয়-প্রসঙ্গে ‘রূপদক্ষ’ শব্দটি একদা বহুল প্রচলিত ছিলে (রূপ-ধাতুর-রূপয়তি অর্থই হ’লো অভিনয় করা), কিন্তু বাঙলায় এর ব্যবহার ছিলো না বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই শ্রুতি-রম্য শব্দটিকে প্রাচীনের পুঁথির থেকে উদ্ধার করে এবং এর জ্ঞাতার্থকে প্রসারিত করে সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ‘নীতি-নিপুণ’, ‘স্বয়ংব্রতী’ শব্দ দুটিও সম্ভবত তাঁরই তৈরী। আগে ঐ দুটির স্থলে ‘নীতিজ্ঞ’ ২

‘নীতি-বাগীশ’ এবং ‘স্বৈচ্ছাসেবক’ ব্যবহার করা হ’তো। ‘চতুপথ’ শব্দটি কবির অত্যন্ত প্রিয় অর্থ চার মাথার মোড় : নানাপথের সঙ্গমকে তিনি ঐ নামে অভিহিত করেছেন। কাজেই এক্ষেত্রেও অর্থের অতিদেশ ঘটেছে। ‘অবজনন’ শব্দটি অভিধানে নেই, জনন-শব্দের সঙ্গে অবজ্ঞা বা অগৌরব-সূচক ‘অব’ উপসর্গ যোগ ক’রে তিনি শব্দটি গঠন করেছেন,—“যে সকল অবজননকর শক্তি লোক ধ্বংস করিবে তাহাদেরই প্রভাবে এখন বার্ধক্যের প্রভাব অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল দেখা যাইতেছে।” বাক্যটি থেকে বোঝা যায় ‘ধ্বংসকর’ বা ‘ক্ষয়কর’ অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। ‘ভাষার অহুস্তরণীয় বিচ্ছেদ’ বর্তমান—এখানে ‘অহুস্তরণীয়’ শব্দটি কবি ব্যবহার করেছেন ‘অলঙ্ঘনীয়’ শব্দের পরিবর্তে, দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি যে শ্রুতিস্বথাবহ তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া mausoleum অর্থে ‘চিরস্মরণগৃহ’ শব্দটিও খুবই যথাযথ হয়েছে। দৃষ্টান্ত : “মৃতদেহের উপর চিরস্মরণ-গৃহ নির্মাণ করে”, ‘লিপিবদ্ধ’ না লিখে স্থলবিশেষে কবি ‘লিপীকৃত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন ; প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি যে স্থলশ্রাব্য তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কেবল শ্রুতিরম্যতা নয়, অর্থের দিক থেকেও এই প্রয়োগের একটু বিশিষ্টতা আছে। দৃষ্টান্ত দেখুন : “সোনালি অক্ষরে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ থাকত লিপীকৃত।” এখানে লিখনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যতাই বড়ো হয়ে উঠেছে, লিখিত বিষয়টি নয়। ‘ইহাই জীবনের প্রতি কীটের আকৃষ্টিপরতা সপ্রমাণ করে।’—আকর্ষণের স্থলে ‘আকৃষ্টিপরতা’ শব্দটি ব্যবহার ক’রে উদ্দিষ্ট অর্থটিকে কবি আরও উন্মীলিত করেছেন। ‘Depression’ অর্থে ব্যবহার করেছেন, ‘অধঃসরণ’, গঠনটি যে স্পষ্ট হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ‘বিবাহিত’ শব্দটি কবি ব্যবহার করেছেন একটি বিশেষ স্থানে একটি বিশেষ অর্থে অ. স. ২. ২২. ২২. : “আমার স্ত্রীর ও আমার মুখ ও গঠন তোর মুখ ও গঠনের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিবাহিত হ’য়েছে।” প্রভাবটা এখানে স্পষ্টতই ইংরেজি রীতির, ‘সংযুক্ত’ সংপৃক্ত অর্থে ‘wed’ শব্দের প্রয়োগ ইংরেজিতে বিরল নয়। Tennyson-এর AEnone কবিতার “the gharm of married brows” বাক্যাংশে married শব্দটি পাওয়া যায় অবিকল অহুরূপ অর্থে। ‘কিন্তু উত্তরগুলি আমার সহাধ্যায়ী গর্ভভঙ্গির বুদ্ধির পক্ষে কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম ছিল’ (অধ্যাপক)। ‘কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম’ প্রয়োগটি ইংরেজি ‘a little too fine-এর অসন্দ্বিগ্ন অহুরূপ। ‘কার্লাইল প্রভৃতি বাক্য-রচকেরা’ এই উক্তি ‘বাক্যরচক’ শব্দটি কবি ব্যবহার করেছেন ঠিক কি অর্থে তা

বলা শব্দ; তবে শব্দটির কল্পনায় চারু-কলার চেয়ে কারু-কলার দিকটাই যে প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই এবং সেই কারণেই উপাধিটিকে ‘কার্লাইল প্রভৃতি’র স্তুতিসূচক বলে গ্রহণ করা কঠিন হয়। ‘স্বেচ্ছায়ত কৰ্মশীলতায় তিনি বিশ্বয়জনক’—এই বাক্যের প্রয়োগ-পদ্ধতিটি যে পুরোপুরি ইংরেজি ছাচে ঢালাই তা বুঝতে দেবী হয় না। ‘পরশিত কীট’ এই বাক্যাংশে ‘পরশিত’ শব্দটি ইংরেজি parasite-এর প্রায় আক্ষরিক অনুলিখন; শব্দ দুটির ধ্বনিসাম্যও লক্ষণীয়। প্রচলিত প্রতিশব্দ পরাশী বা পরজীবী। এছাড়া, তিনি তনিমা শোণিমা প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রচলিত বা অল্প-প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে যা যোগ্যপ্রসঙ্গে বিশ্বয়কর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। তনুতার স্থলে তনিমা, আলতা অর্থে শোণিমার প্রয়োগে ‘উর্বশী’ কবিতার ‘জগতের অশ্রুধারে’ ইত্যাদি পংক্তি দুটির ব্যঞ্জনা যে বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ‘দীর্ঘ বিরহের শেষে মোক্ষস্থানে যাইবার জন্ত মানসোৎক হংসের তায় উৎসুক হইয়া উঠে’—‘মানসোৎক’ শব্দটি কবি ‘মেঘদূত’ কাব্য থেকে সরাসরি গ্রহণ করেছেন। অমরকোষ মতে ‘উৎক’ শব্দের অর্থ “উন্মূনাঃ অল্পমনস্কঃ,” মেঘদূতের ‘পুষ্পলাবী’ শব্দটিও অবিকৃতরূপে তাঁর ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। ‘নবতন’ শব্দটি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হ’লেও কবি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন, অথচ ব্যাকরণ-সিদ্ধ নূতন শব্দটিকে তিনি আমল দেননি, বলাকা শব্দের অর্থ বক, কিন্তু কেন জানি না, শব্দটিকে তিনি প্রয়োগ করেছেন যথ অথবা শ্রেণী অর্থে প্রায় সর্বত্র, যথা : ‘রাজহংসদল আকাশে বলাকা বাধি সত্তর চঞ্চল’ ‘হংসবলাকা উড়ে যায় দূরের তীরে তারার আলোয়।’ (বিচিত্রা: ৫০৫) শুধু হাঁস অর্থেও প্রয়োগ আছে; যেমন—‘আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে’ (বিচিত্রা ৫০৫)। এছাড়া, স্থানে স্থানে বলাকার শ্রেণী, বলাকাদল, বলাকাপাতি প্রভৃতি প্রয়োগও পাওয়া যায়, অর্থ স্পষ্টতই হংস। পরকর্তী লেখকদের অনুকরণের কলে শব্দটির এই অভিনব অর্থ ভাষায় বেশ কয়েক হয়ে গিয়েছে। “জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয় এই গুণগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে।” (পোস্টমাস্টার)। এখানে ‘গুণগ্রাম’ শব্দটি কবি ব্যবহার করেছেন “ক্ষুদ্র গ্রাম”, অর্থে কারণ ঠিক আগেই বলাই হয়েছে—“গ্রামটি অতি সামান্য; ওর আসল অর্থ কিন্তু এর বিপরীত, অর্থাৎ “বৃহৎ গ্রাম”।

‘অভূয়’ শব্দটি কবি ব্যবহার করেছেন এই বাক্যে—‘বিশীর্ণ গোলকচাঁপা

গাছে পাতাশূন্য জ্ঞান অভূষণে ক্রিষ্ট ইশারার মতো',—অসন্দিক্ত অর্থ অভুক্ত, রুগ্ণ। কিন্তু 'ভুগ্ন' গানেই তো রুগ্ণ, বক্র; স্তবরাং নঞর্থক 'অ' অব্যয়টি শুধু অনাবশ্যক নয়, বিপরীতার্থকও বটে। সম্ভবত কবির ধারণা ছিলো তুদাদিগণীয় 'ভুজ' ধাতুর (অর্থ বক্রকরা) উত্তর 'জ' প্রত্যয় করে যেমন 'ভুগ্ন' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, রুদাদিগণীয় 'ভুজ' ধাতুর (অর্থ ভোজন করা, রক্ষা করা) উত্তর 'জ' প্রত্যয় করে তেমনি 'ভুক্ত' ছাড়া 'ভুগ্ন' রূপও হ'তে পারে। কাজেই উল্লিখিত প্রয়োগে 'অভুগ্ন'—শব্দের অভিপ্রেত অর্থ অভুক্ত, অতএব শীর্ণ এবং শুষ্ক।

'নিছনি' এবং এর ক্রিয়ারূপ 'নিছিয়া' প্রভৃতি কবি ব্যবহার করেছেন নানাস্থানে নানা অর্থে। বৈষ্ণব-পদ-কাব্যেও এদের ছড়াছড়ি। 'নিছনি' শব্দটি এসেছে নির পূর্বক মঞ্চ ধাতু থেকে (রূপ—মঞ্চতে, অর্থ-পূজা করা, দীপ্তি পাওয়া, উচু হওয়া)। 'নির্মঞ্চনে' বিবর্তনের বিভিন্ন সোপান বেয়ে 'নিছনি'তে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থঃ—আরতি, আরতিদ্রব্য, বরণ, পূজা, সমাদর, উপহার, ভূষণ; আপদ, বলাই। ('চরণ) নিছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে' (চৈ. ভা)। 'নিছিয়া' এখানে ক্রিয়া-বিশেষণ, অর্থ—ভক্তিভরে, সমাদরে। 'দুই সজল-পল্লব' নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারম্বার নিছিয়া লইলাম।' 'অধ্যাপক' গল্পের এই বাক্যে রবীন্দ্রনাথও শব্দটি ব্যবহার করেছেন অবিকল ঐ অর্থে। 'নীরব নিশি তব চরণ নিছিয়ে আধার-কেশভার দিয়েছ কিছয়ে' অর্থ,—প্রণতিচ্ছলে চরণ ছেয়ে, ঢেকে। 'জাতি-যৌবন-ধন নিছি ফেলিব খাম-পায়' (জা)। 'নিছনি তহু' আগনার '(গো), —এই দুই স্থলে অর্থ-উৎসর্গ করে আপদ বা বলাই অর্থে শব্দটির প্রয়োগ রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল।

'বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না'—অর্থ নাড়া দিতে পারে না; 'যে-ভাষা দেশে সর্বত্র সমীরিত'—অর্থ, উচ্চারিত। ঈর ধাতুর অর্থ কস্পিত করা, চালিত করা, উচ্চারিত করা। স্তবরাং উভয়ত্রই রবীন্দ্রনাথ মৌল অর্থেরই অল্পবর্তন করেছেন।

'বিলোচন' শব্দের অর্থ লোচন; কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে উক্ত অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন 'বিলোচন' অর্থায় শিব অর্থে; যথা—'যবে বিবাহ চলিলা বিলোচন।' অর্থটি কবির কপোল-কল্পিত।

'প্রদোষ' শব্দের অর্থ—সায়ংসন্ধ্যা, রাত্রির প্রথম ভাগ। প্রাতঃসন্ধ্যা অর্থে প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, ইংরেজী 'twilight' শব্দে কিন্তু দুই সন্ধিই বোঝায়।

‘স্বর্গের উদয়কালে মূর্তিমতী তুমি, হে উষসী,’—উর্বশী কবিতার এই পংক্তিতে ‘উষসী’—শব্দটিও প্রযুক্ত হয়েছে প্রাতঃসন্ধ্যা অর্থেই, কিন্তু ওর আসল অর্থ ‘সায়ংসন্ধ্যা’। উষা শব্দের সঙ্গে ধ্বনিসাম্যই সম্ভবত এই জাতির কারণ।

‘তোমার বই-পড়া প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মাল আছে। কিন্তু তারা এমন ভান করছে যেন তাদের কোন গৌরব নেই।’ এই বাক্যে গৌরবের অর্থ স্পষ্টতই তার বা বস্তুগত গুরুত্ব। এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগ সংস্কৃত-সাহিত্যেও বিরল নয় : যথা—স্বরেন্দ্র-মাত্রাপ্রিতগর্ভগৌরবাং (রঘু ৩।১১)

‘তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদবেগে বালিশে মূখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠলাম।’ (দৃষ্টিদান)। উদবেগ-শব্দটি বাঙলায় সাধারণত ‘দুশ্চিন্তা’ অর্থেই প্রযুক্ত হয়; আবেগ, কম্পন, উত্তেজনা, প্রভৃতি অর্থ বাঙলায় কচিং পাওয়া যায়।

‘লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার’ ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহা স্বজিত হইয়া উঠে নাই,’ (অধ্যাপক)। ‘সৃষ্ট’ স্থলে ‘স্বজিতে’র এই প্রয়োগ ব্যাকরণের দিক থেকে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আর বেশী দৃষ্টান্ত দিতে গেলে প্রবন্ধটি অযথা দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে; অতএব নিরন্তর হলাম।

কিন্তু শুধু শব্দ নিয়েই তো কবি-সাহিত্যিকের কারবার নয়; শব্দভাষিত বাক্যই হলো ভাবের পরিবাহক। তাই বাগ্‌বৈদ্য বা রচনা-নৈপুণ্যের ওপরই ভাবের প্রভাব বহুলাংশে নির্ভর করে।* বাক্যগঠনে প্রধান প্রয়োজন হলো সৌম্য ও স্মৃতি—চলতি কথায় যাকে বলা হয় মাত্রাজ্ঞান। রচনা যদি অযথা-স্ফীত অথবা গ্লানবদ্ধ হয়, শব্দ সম্বন্ধে ধ্বনি ও অর্থগত মূল্যবোধের যদি অভাব থাকে তাহলে রূপকল্পটি কখনই রোচক হ’তে পারে না। শব্দের ভিড়ে ভাব পথ হারায়, স্তোকবাক্যের অবকাশ-পথেই তার উৎসরণ সম্ভব হয়। শিল্প তো শুধু উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়, তদতিরিক্ত কিছু। অলঙ্কারের ভাষায় এই ‘অতিরিক্ত কিছু’র নামই ‘স্টোন্ট’ *—ইংরেজি পরিভাষায় ‘gestalt’।* ভাবের যে ইমারতটা গড়ে তোলা হ’লো তার আত্যন্তিক কোনো নিজস্ব মূল্য নেই। প্রেক্ষকের দৃষ্টি যদি তার ভিতরে প্রবেশ করে দেওয়ালে মাথা ঠুকে ফিরে আসে, যদি মানস-মুক্তির ক্রোড়-রক্ত খুঁজে না পায়, তাহলে সেই কারাগারে পিঞ্জরের পাখীর মত বাস করা হয়তো চলে, পাখা মেলে উড়ে

* ব্যঙ্গব্যঞ্জক শব্দসমূহ ধ্বনি:। * An arrangement of separate units in a form or pattern so integrated as to appear and function as a unit that is more than a simple summation of its parts.

বেড়ানো যায় না। শিল্পীর পরিকল্পনা ও পরিকর্মে তাই এমন কিছু থাকা চাই যাতে মানুষের মন বন্ধনের মধ্যে থেকেও তার বেদনাকে অতিক্রম করার পথ খুঁজে পায়।

রবীন্দ্রনাথের গুণ রচনা থেকে কতকগুলি বচন নীচে উদ্ধৃত করা গেলো :

১। ‘যেখানে জীবনের উৎসর্গ হইতেছে সেইখানকার প্রবল স্থখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্ত একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।’ (জীবন-স্মৃতি)

২। ‘এই ব্যঙ্গনা ব্যক্ত ও অব্যক্তের’ মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঙ্গনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গীর দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।’ (ছবির অঙ্গ)

৩। ‘কিশোর আঘাট যদি আপন আলোর কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরাইবার ভার লইয়া থাকে’ ইত্যাদি। (আঘাট)

৪। ‘কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই, কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে।’ (পনেরো-আনা)

৫। ‘একটি ছেলে আসিয়া পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যার ছেলে নাই তাঁর কাছে অনন্ত স্বর্গের একটি দ্বার রুদ্ধ; ছেলেটি আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়।’ (পথপ্রান্তে)

উদাহৃত বাক্যগুলি একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে শব্দগুচ্ছ যেন একটি ‘অলক্ষ্য-ভাব-সূত্রে’ অল্পসূত হয়ে নানা-ফুল-দিয়ে-সাধা মালার মত শোভা পাচ্ছে। শব্দ-সম্ভার যেমন ভাবোচিত, তেমনি প্রতি-ললিত এবং ঔচিত্যের সঙ্গে লালিত্যের এই পরিণয়ের ফলে প্রসূত হয়েছে এমন একটি দিব্যশ্রী যা কল্প-কায়াকে ছাপিয়ে পড়ে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে হৃদয়ে। একেই বলা’চলে বাক্শিল্লের চতুর্থ মাত্রা (fourth dimension)। শব্দের ঠাসবুনানি কোথাও নেই, শব্দের জন্তই শব্দের ব্যবহার বিরল—প্রত্যেকটি শব্দকে যোগ্যতার নিরিখে যাচাই করে তবে বাক্যের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাগভঙ্গীর এই যে বিশিষ্টতা, উক্তির অবকাশে অল্পসূত্রে এই যে সঙ্কেত, শব্দ-সন্দর্ভের এই স্থিতিস্থাপকতা—এমন আর কোথাও আবদ্ধ কিনা জানি না! ব্যঙ্গনাকে যখন বর্ণনা করা হলো ‘ব্যক্ত ও অব্যক্তের মাঝখানকার মীড়’ বলে, তখন বলার চেয়ে না-বলাটাই বড়ো হয়ে রইলো, উপমান উপমেয়ের সামান্য ধর্মটা উইই’ রয়ে গেলো, বুঝে নেবার বরাত পড়লো

বাঙালীর বহুমুখী জাতীয় জীবনের পবিত্র দলিল

বিনয় ঘোষ-কৃত

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১ম খণ্ড ॥ ১২'৫০ ॥

বাঙালীর নবজাগরণ-ইতিহাসের অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য আকরগ্রন্থ

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে নির্বাচিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৮৪০ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিষয়ানুক্রমিক সন্নিবেশ, বিস্তারিত ভূমিকা, সম্পাদকীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত।

উনিশ শতকের অতীত বাংলার পত্রিকা থেকে অমূল্য সংকলন খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বর্তমান গ্রন্থ প্রথম খণ্ড। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অমূল্যগী বঁারা এ-বই তাঁদের কাছে চিরন্তন সম্পদ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আন্তোনিও অধ্যাপক শ্রীনিবাসকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় রয়াল অস্ট্রাভো সাইজের বই, আর্ট প্লেট ও বোর্ড বান্ধাইসহ, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যের জস্ত মূল্য মাত্র ১২ টা. ৫০ ন. প.।

॥ এই লেখকের আরো একটি বই ॥

বিজ্ঞানাগর ও বাংলার সমাজ

১ম খণ্ড : ৩'০০ ॥ ২য় খণ্ড : ৭'০০ ॥ ৩য় খণ্ড : ১২'০০ ॥

[নতুন করে ছাপা হচ্ছে প্রথম খণ্ড]

আনন্দকিশোর মুন্সীর

ডাক্তারের ডায়েরী

ভেলকি থেকে ভৈষজ্য

৩য় মু: ৪'০০ ॥

২য় মু: ৬'৫০ ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

যোগেশচন্দ্র বাগলের

ব্যান ও বস্ত্র ৩'০০ ॥

বিজ্ঞান ও বৈরিভা ২'০০ ॥

অশোক মিত্রের

বুদ্ধদেব রত্নর

ভারতের-চিত্রকলা

স্বদেশ ও সংস্কৃতি

৪১টি আর্ট প্লেট সংযোজিত ১৫'০০ ॥

(২য় মু:) ৪'০০ ॥

ভারাক্ষর মুখোপাধ্যায় ও

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

প্রমথনাথ বিশীর

কাব্যবিভান ১০'০০ ॥

বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ৪র্থ মু: ৪'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

পাঠকের কল্পনার ওপর। ‘একটি ছেলে আসিয়া সকল ছেলের মা করিয়া দেয়—এই গতিত উক্তিটির মধ্যে দিয়ে ভাবের যে নিভৃত রূপটি আভাসিত হয়েছে, স্মৃতি শব্দ-সংযোগে যে অমিত ভাব-ব্যঞ্জনা সম্ভব হয়েছে হাজার কথাতোও তা হতো না। উপমা—রূপক, বক্রোক্তি-সমাসোক্তি, শ্লেষধ্বমকাদি অলঙ্কারের সুপ্রযুক্ত সৌষ্ঠবে যে অপূর্ব আবহ কবি সৃষ্টি করেছেন বাঙলা সাহিত্যে অন্তত তার তুলনা নেই। আশ্চর্য এই যে সচেতনভাবে এই রাগ-শৃঙ্গার তিনি করেন নি, প্রেরণার মুহূর্তে অলঙ্কারগুলি আপনা থেকেই এসে গিয়েছে। এরই নাম রসবদ্ অলঙ্কার। জীবনস্মৃতির উদ্ধৃতিটি থেকে দেখা যাবে কতো অল্প কথায় কবি কতো বড়ো এটি ভাবের ইঙ্গিত করেছেন। কারুনৈপুণ্যের এমনি অনন্ত দৃষ্টান্ত তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে। বস্তুত, বাঙলা-গল্পের তিনি উষরতায় করেছেন অজস্র-রসবর্ণ— চিন্তার ক্লান্ততাকে দূর করেছেন ভাবের পুষ্টি দিয়ে। ‘লিপিকা’র প্রত্যেকটি রচনা এর সাক্ষ্য দেবে। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেলো :

“যখন ঝিল্লির বাকারে বেণুবনের অন্ধকার থরথর ক’রছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কঁপে কঁপে নিভে গেলো তখন সে অতি-কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে আসুক, ভিজ্জে ঘাসের গন্ধে-ভরা বন-পথ দিয়ে, আমার প্রাণের নিশীথরাতে।”

কলকথা, রবীন্দ্র-রচনার বিশেষত গদ্য-রচনার—প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো তাঁর সৌধম্য ও স্মৃতি। সর্বত্রই রিক্ততা ও অভিরিক্ততার মধ্যবর্তী পথটি তিনি অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় গুণ—রঞ্জনা, অর্থাৎ রেখা ও রঙের অঙ্গাঙ্গি মিলন এবং তার থেকে উদ্ভূত একটি অপরূপ রূপ-বীজি পরিভাষায় যার নাম দেওয়া যায় ‘বাবীবর্ণ’ বা ইংরেজিতে tone-colour। বর্ণের কাজ শব্দরেখাকে চিত্রায়িত করা অর্থাৎ রেখা-রূপটিকে বিচিত্র ও অপরূপ করে তোলে। প্রত্যেক শব্দেরই নিহিত একটি শক্তি আছে যা রেখায়ণ ও বর্ণবিজ্ঞাসের কৌশলে অব্যক্ত থেকে ব্যক্তরূপে অভিব্যক্ত হয়, এই কারণেই রীতিবাদী বামন ‘বিশিষ্ট-পদ-রচনাকে’ রীতি আখ্যা দিয়েছেন। কাষ্ঠের দাহিকা-শক্তি অথবা তিলের তৈল্লাধানশক্তির প্রকাশ যেমন সহকারী নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে অব্যক্ত শব্দ-শক্তিও তেমনি কবি-প্রতিভার রসায়ন ভিন্ন উদ্ভিন্ন হয় না। নানা-পর্যায়-শব্দের মধ্যে কবি বেছে নেন এমন একটিকে ভাব-ব্যঞ্জনার দিক থেকে যেটি যোগ্যতম। তৃতীয় গুণ—অনুধ্বনি বা overtone : মূলতন্ত্রের আশেপাশে কতকগুলি শাখাতন্ত্র যোজনা ক’রে

শব্দার্থকে কবি প্রলম্বিত ও প্রচারিত করে দেন। বাস্তবিক অর্থ যদি বাচ্যের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, কথার শেষে তার অবশেষ যদি আর না থাকে তা'হলে সেই অব্যক্ত 'বাক্' বাক্যা ; স্রুতি একেই চিহ্নিত করেছেন 'অপুষ্পা এবং অফলা' বলে। ধ্বনিবাদীরা কাব্যধ্বনিকে উপমিত করেছেন ঘটাধ্বনির সঙ্গে, কারণ পাঠ শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ মিলায় না, সহৃদয়-হৃদয়ে তার অনুরণন চলতে থাকে। বাকশিল্প সম্পর্ক চতুর্থ এবং শেষ কথা—তার ছন্দঃস্পন্দ, তার ধ্বনিসজ্জা। ভাব-প্রসারণের পক্ষে এর চেয়ে অব্যর্থ উপায় আর নেই। স্বরগ্রামের আরোহ-অবরোহের মধ্য দিয়ে সহজেই অর্থের বন্ধনমুক্তি ঘটে, বাচ্যবদ্ধ অর্থ শব্দ-ধ্বনির পথে—মল্লিনাথের ভাষায় 'ধ্বনের-ধ্বনি'* রসধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। এই কারণেই প্রতিশাত্যের স্বর-প্রকরণে ঔদাত্ত, অলুদত্ত ও স্বরিত স্বরের সাহায্যে বেদমন্ত্র উচ্চারণের বিধান আছে। ছন্দের কাজ স্বরাঘাতের দ্বারা শব্দ-শক্তির উন্মোচন ও উন্মীলন, স্বরধ্বত গায়ত্র্যাদি বিবিধ ছন্দে শ্রোতমন্ত্রগুলি রচিত হয়েছে সম্ভবত এই কারণেই। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তো কথাই নেই, তাঁর গদ্য-রচনাগুলিও আত্মক ছন্দঃস্বয়মায় নিশ্চিন্দিত। 'লিপিকা' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধ সমাপ্ত করব :

অন্ধকারে এখানে। কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা,

বাসর ঘরের কাছে। অবগুপ্তিতা নববধুর মতো ;

কোনখানে ফুটলো। ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ?

—কিছুছের প্রতিসাম্য এবং ধ্বনিপুঞ্জের পারস্পর্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। শব্দ-বিভাগগুলি লক্ষ্য করলে প্রথমেই চোখে পড়বে এদের পারস্পরিক সৌষম্য, ধ্বনিস্পন্দগুলি যেন কবির স্বস্পন্দনের সঙ্গে এক তালে বাঁধা, তাই ধ্বনির উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চিত্তও ওঠে-পড়ে এবং নিহিত ভাবটি মনের নেপথ্য থেকে একেবারে দৃষ্টির দিগন্তে এসে দাঁড়ায়। শব্দ-প্রবাহ স্বতোবৃত্ত হ'লেও শব্দনির্বাচন যত্নকৃত। শব্দগুলি ধ্বনি এবং অর্থ দু'দিকেই লক্ষ্য রেখে যত্নের সঙ্গে সংকলিত এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে গ্রথিত ; প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখে একটি শব্দকেও অত্র কোনো শব্দ দিয়ে পুনঃস্থাপিত করা যায় না। শব্দমন্ত্রে সিদ্ধ, বিদগ্ধ কবি স্রুতি ও স্রমিত শব্দসম্ভারে যে অপরূপ রূপসৌধ নির্মাণ করেছেন, সাহিত্যের শাস্ত্রত সম্পদ বলেই তা গণ্য হবে।

* শিশুপাল-বধের 'সর্বকথা' টীকা দ্রষ্টব্য।

পথ চলে গেছে

সমর সোম

॥ ৬ ॥

হলদিঘাট—রাজসমুজ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হুপুরের রোদ আরাবলী পর্বতের বুক ধরে গড়িয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট এক-আধখানা গ্রাম। হু'একটা কুকুরের ছুটে আসা, এক-আধজন ভীলবালার লাল লাহাঙ্গা, যাকে আমরা ঘাঘরা বলি, চোখে পড়ে। ওদের সংকীর্ণ বকের কাঁচুলি বক্ষবন্ধনকে দৃঢ় করে রেখেছে। নাভিদেশের সংকেতে বলিষ্ঠ হুই উরজের ছন্দ রচনা করেছে। দূর থেকে দেখি। পাশে আসে। এক ছিটে বিন্ময়, কখনো বা হাসি চোখেমুখে ছিটিয়ে দিয়ে চলে যায়।

এইটাই সংসারে সত্য। যে মুহূর্তে যা পাই তাই বড়। ধরে রাখার সামর্থ্য কোথায়। আজ ওই সামনের আসনে যে আছে—তাকেও কি ধরে রাখতে পারব? ধরে রেখে লাভ কি? প্রবাহের মুখ বন্ধ করলেই তো স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায়।

এই অদ্ভুত একটা জীবনদর্শন আমাকে কিছুই নিজের বলে চিরদিনের মত আঁকড়ে থাকতে দেয় না। কেবলই দৃশ্যান্তর খুঁজি। আর সেই দৃশ্যের পর দৃশ্যে অভিনীত হয়, জমা হয় এক-একটি জীবন এক-একটি কাহিনী। কখনো তাই আমি কলম নিয়ে বসি, কখনো রাজনীতি কখনো সমাজসেবা, কখনো ব্যবসাদার, কখনো হাটতলায় যারা বসে গাঁমছাঁ বেচে তাদের সঙ্গী। কখনো আবার ওপরতলার ড্রইংরুমে আমার অঙ্গর। কখনো মাঠে লাঙল ঠেলি, ধান তুলি, ধরন কাটি আবার কখনো নীততাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে ডানলোপিলোর ওপর হাত পা ছড়িয়ে কামু সার্ভে পড়ি।

জীপটা যত ছোটে ততই সারা মনে এইসব ভাবনা ঘুরপাক খায়।

সামনের লক্ষ্য হলদিঘাট। টাডের রাজস্থানী গঙ্গে হলদিঘাটের কথা পড়েছি। রাণা প্রতাপের যুদ্ধের কাহিনী কণ্ঠস্থ করেছি বহু বছর আগে।

সেই হলদিঘাটে আজ পৌঁছব। সতিাই পৌঁছব। কথাটা ভাবতে কেমন রোমাঞ্চ জাগে। রাণা প্রতাপ নেই, তাঁর সাম্রাজ্য নেই, চৈতক নেই, সেই মোঘল বাদশারাও নেই—কিন্তু হলদিঘাট যা ছিল এবং আজও আছে—তার মধ্যে সেই ইতিহাস সেই মুহূর্তটাই রয়ে গেছে। মুহূর্ত বিশেষেই সংসারে মহত্ত্ব দাবী করে।

দুর্গম পথ ক্রমান্বয়ে দুর্গম হয়ে ওঠে। পাহাড়ের বুক চিরে হলদিঘাট ছাড়িয়ে বিষ্ণুক মহানাগের মত পথ শুধু ছুটছে। পাহাড়ের পাথর ধরে খাড়া পথে গাড়ি ওঠা দায়। ইঞ্জিন গর্জন করে। কুলতে কুলতে ওঠে। ওঠে আবার নামে।

সামনে অরণ্য। কিছুটা সমতল—ছোট ছোট টিলায় সমতল তরঙ্গ তুলেছে।

গাড়ি থামে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে নামি। একটা শব্দ করতে পর্যন্ত সাহস হয় না। ভয় হয় এ মাটির শান্তি যদি ব্যাহত হয়।

দূরে ঘুঘু ডাকে। পড়ন্ত ছুপূরের আলো অরণ্যের শাখা-প্রশাখায় মধ্যে দিয়ে নেমে এসেছে। কেমন একটা ঘুম-ঘুম ভাব। ঘুঘুর স্বরটা কেমন উদাস গান্ধীর্ষভরা।

ঘুঘুটার কণ্ঠে মনে হয় ভারত-আত্মার বেদনা জমাট বেঁধে উঠছে। এ দেশের অসংখ্য নর-নারীর হতাশ দীর্ঘশ্বাস জমাট বেঁধে গেছে। সেই আত্ম-মর্ঘাদাবোধ, সেই স্বাধীনতার স্পৃহা, সেই তেজস্বিতা আজ কোথায়—
—কেন? আজ অস্ত্রের কাছে হাত পেতে বাঁচার প্লানি রাণা প্রতাপের দেশে কেমন করে এলো?

স্বার্থ ও অহমিকার অন্ধকার আবর্তে যারা অন্ধভাবে একদিন আত্মহত্যার জন্তে পা বাড়িয়েছিল তাদের বাধা দেবার জন্তে, তাদের বাঁচাবার জন্তে রাণা প্রতাপ জন্মেছিলেন এ মাটিতে।

এ মাটি তাই মুক নয়। এ মাটি অঞ্জলি নিয়েছে প্রতাপের কবিরবিন্দু। সে কাহিনী কালজয়ী। সে কাহিনী তরিত্রের দিক নির্ণয় করবেই।

কাছেই বারনার ক্ষীণ স্রোত চোখে পড়ে।

• ছোট ছোট ঝড়িপাথর ঠেলে হলদিঘাট জল গড়িয়ে চলেছে। প্রতাপের রণক্লান্ত দেহকে এই বারনাই একদিন অবগাহনের মুহূর্ত দিয়েছে। গান তুলিয়েছে। আজো সে আছে। বইছে।

সঙ্গিনী মুখ তেজায় সে প্রবাহ থেকে অঞ্জলি তুলে।

ভিড় নেই। ভিড় অনেক দূরে অরণ্য-পর্বতের কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বাতাসের ঝিরঝির শব্দ, ঝরনার কলশ্রোত, রাঙাপাথরের আসন আর ঐ সঙ্গিনী। যখন সবই আছে, বসতে বাধা কি?

সামনে একদল যাযাবর কোথা থেকে এগিয়ে আসতে থাকে। দেখি আমাদের অল্পদূরে শ্রোতের গা ঘেঁষে ওরা ওদের তাঁবু ফেলছে। সঙ্গে আছে কুকুর, উট, ঠেলাগাড়ি। মাথার পাগড়ি পুরুষদের লাল, পরণে শাদা ধুতি খাটো করে পরা। কি একটা জংলী জানোয়ার পথে মেঝে এনেছে বাঁশের লাঠিতে। সেটা ছুঁজনের কাঁধে ঝুলছে।

ওদের তাঁবু টাঙানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলাবলি করছে সবাই। একটি কিশোর আমাদের দেখছে। সাহস করে এগিয়ে আসে।

সঙ্গিনী সকলকেই ভীল ভাবে।

জিজ্ঞাসা করে—তোরা তো ভীল, না?

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মাথা নুড়ে। ছলে ওঠে ওর গলার পুঁথির মালা, হাতের বালা, লম্বা লম্বা চুলের রাশ, কানের গয়না। বলে—আমরা কালবেলিয়া।

—তোদের ঘর কোথায়?

ছেলেটি হাসে। ছুটে পালায়। আমাদের অনভিজ্ঞতায় সে অবাক হয়েছে।

সঙ্গিনী বলে—এমন তাঁবুর জীবনে আনন্দ আছে বলে তোমার মনে হয়? আমি কিন্তু ঘর চাই। যে ঘর আমার কোনদিন পড়বে না। আর...

ও আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চাইছে। বাধা দিয়ে বলি—কিন্তু আমার কেমন যেন ঘর নয় না মিষ্টি! আমার উপর আকাশটা তো ছাদ, তৃণওই তো শয্যা...

—ওসব কাব্য।

—তোমার আমার ভালবাসার সম্বন্ধটাও তো কাব্য। সেটা গল্প হবে সংসারের চাকায় আটকে দিলে। তুমি ফরমাশমাকিক বেবীফুড না পেলে আমাকে আদর করতে পারবে না। আর আমিও...

কথায় বাধা পড়ে। ছেলেটি আবার ছুটে এসেছে। ওর সঙ্গে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের গিরিনন্দিনী। রোদে পুড়ে চামড়াটা কালো দেখালেও

তার চমক আছে। চোখে জ্যোতি আছে। প্রাণের উত্তাপে ঝলমল করছে।

মেয়েটি সোজা জিজ্ঞাসা করে—তোদের গাড়ি ?

ঘাড় নাড়ে।

—চড়ানা!

পরিহাস করি—চড়াব, কিন্তু গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে যদি তোকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

মেয়েটি খুব সপ্রতিভ হলেও একটু লজ্জা পায়। অত্যন্ত সরলভাবে বলে—আমায় বাপু কিন্তু ধরে ফেলবেই।

কুকুর ছটোকে ‘তু’ করে ডাকে। তারা দৌড়ে আসে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে সে বলে—এই হোনা, বোনা ও তোর গাড়ীকে তাড়া করে ধরবে বাবু। আমি ফিরে যেতে না বললে ওরা কিছুতেই যাবে না।

ছেলেটি কান খাড়া করে কথাবার্তা শুনছিল। তার বোনকে নিয়ে পালিয়ে যাবার কথাটা সে ঠিক ধাতস্থ করতে পারছে না। হাত ধরে বোনকে টানে। মেয়েটি প্রথমে বিরক্তি প্রকাশ করে, তারপর কি যেন বোঝায়। ছেলেটি হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসে।

জিজ্ঞাসা করি—কোথা থেকে এলি ?

পাহাড়ের উল্টোপিঠটা দেখিয়ে দেয়।

—এ জায়গা চিনিস ?

—চিনব না ? ওই গোটা পাহাড়টা আমার এর মধ্যে কবার ঘোরা হয়ে গেছে জানিস ?

—জ্ঞানে ?

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। প্রায় পাঁচবার।

সঙ্গিনীর তবু সন্দেহ। বলে—এ জায়গার নাম বল।

—হলদিঘাটা।

ওরা বলে হলদিঘাটা।

প্রবাহের তীর ছেড়ে উঠতে হয়। ওরা সঙ্গ নেয়। কুকুর ছটোও শিছু পিছু চলে।

মেয়েটি আবার বলে—আসলে এটা হলদিঘাটা নয় বাবু। আমার বাপু বলে এটা একটা গ্রাম ছিল। নাম কি ? সামনোর। লোক সব ভুলে গেছে।

আমার বাপুও বুড়ো হয়েছে। সেও মরে যাবে। আমাকে বলে গেছে, আমার মনে থাকবে। বড় বুড়ো হয়ে গেছে না, শুয়ে শুয়ে কেবল এই সব কথা বকবক করে। পাহাড়ের, জঙ্গলের গল্প শোনায়।

চলতে চলতে কুণিয়া একটা তেঁতুলগাছের কাছে গিয়ে থামে। বলে—এটার নাম জানিস তোরা? ল্যাংড়া ইমলি (তেঁতুল)। চৈতক ছিল না, সেই প্রতাপের ষোড়া, তার একথানা পা এখানে কাটা গেল তো গাছটার নামই ‘ল্যাংড়া’ করে দিলে লোকে। কি জালা বল তো! এখান থেকে তিন পায়ে ছুটেই চৈতক আমার রাজাকে নিয়ে পালিয়েছিল।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। ‘আমার রাজা’ শব্দটা এত শ্রদ্ধার সঙ্গে জোর দিয়ে বললে যে অবাক না হয়ে কোন উপায় নেই।

—এখন তোর ‘রাজা’ কে জানিস? এদেশ এখন কার হাতে বল তো?

—বিদেশীর...

—দূর, বিদেশী কেন হবে! এদেশের রাজা এখন তোরা। দেশের লোকের হাতেই দেশ এসেছে। বিদেশীরা কেউ মেই। দেশের লোক মিলে এখন রাজা করেছে জহরলালকে।

মেয়েটি কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বলে—তোরা শহর থেকে আসিস, শহরের লোক বড় মিথ্যে কথা বলে। আমার রাজা তার রাজত্ব হারিয়েছে। তাইতো আমরা ঘর বাঁধি না। রাজত্ব না ফিরে পেলে ঘর বনাবো না কোথাও।

—একটু কি যেন সে ভেবে নেয়। তারপর আবার বলে—হ্যাঁ, মনে পড়ছে, একদিন বাপু বলছিল, কারা যেন খবর পাঠিয়েছিল যে আমরা স্বাধীন হয়েছি। বাপু তা বিশ্বাস করেনি।

চলতে চলতে আমরা এক টুকরো মৃত্তিকার সামনে এসে দাঁড়াই। জংলী কাঁটা গাছ, পাহাড়ী বাবুলের হরিৎ সমীরোহ নিয়ে সে মাটি ছড়িয়ে আছে।

মেয়েটি বলে—আওয়াজ শুনছিস? ষ্ণোড়া ছোট্ট শব্দ, যুদ্ধের বাজনা?

ছেলেটা মুখে শব্দ করে ডুগডুগির। জিভ দিয়ে টকটক আওয়াজ করে।

মেয়েটি বলে—এ জায়গার নাম শাহীবাগ। আগে লোকে বলতো বাদশাহী বাগ। আমার রাজা আসল যুদ্ধ এখানেই করে।

মনে পড়ে ইতিহাস।

আকাশের পেঁজা পেঁজা টুকরো মেঘের গায়ে একটা ছবি দেখি।... এই গ্রাম...এই গ্রামের সীমা পেরিয়ে ছোট খাটো সংঘাত চলেছে প্রতাপ ও

মোঘল সৈন্তে। তারপরে যুদ্ধ। প্রতাপের পতন। সামান্যের উপর মোঘল
অধিকারের জয়পতাকা।

চৈতকের সমাধি তৈরী হয়েছে। চৈতক না থাকলেও স্মৃতি আছে।
সমাধির সমুন্নত শীর্ষদেশ আকাশের দিকে উঠে গেছে। একটা কোঁটন
বুলবুল তার মাথায় বসে ডানা কাঁপাচ্ছে। ওর বকের কয়েকটা লাল
পালক রাঙা- জবার অর্ধের মত মনে হয়। কণিয়া বুলবুলটার দিকে তাকিয়ে
থাকে।

ফিসফিস করে বলে—আমার একটা বুলবুল ছিল। উড়ে গেছে। জ্যান্ত
বুলবুল আর কেউ ধরে দিতে পারেনি।

ছেলেটি বলে—বাপুকে ও কি বলে জানিস বাবু? বলে, আমায় যে
জ্যান্ত বুলবুল ধরে দেবে তাকে আমি শাদী করব।

কণিয়ার দিকে তাকাই। হেসে বলি—ধরে দেব না কি?

কণিয়া বলে—তুই ধরে দিলেও কিন্তু একটা শর্ত তোকে মানতে হবে।

—কি?

—তোরা শহরের লোক, তোদের আমার ভয় করে। ঠিক তোদের নয়,
শহরকে। তাই শহর ছেড়ে তোকে জঙ্গলে চলে আসতে হবে। আমার
এই তাঁবু, উট, কুকুর, লোকজনের ভার নিতে হবে।

কণিয়া কথাগুলো খুব সহজ স্বরেই বলে যায়। এতটুকু জড়তা নেই।
জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুনতেও আমার খুব খারাপ লাগে না। আমি ওর
রোদে পোড়া মুখখানাকে দেখি। কণিয়া লজ্জা পায়। বলে—এ তোর কে?
সঙ্গিনীকে সে দেখায়।

পান্টা প্রশ্ন করি—তোর কি মনে হয়?

কণিয়া হাসে। হাসতে হাসতে বলে—বুঝি বুঝি, আমাকে অত বোকা
মনে করছিস কেন? ও তোর ভালবাসার মেয়ে। ওর চোখছুটো কি
ঢাকা আছে নাকি? পুরুষগুলো বড় লোভী!

সঙ্গিনী হাসতে হাসতে বলে—ঠিক বলেছিস তুই।

কণিয়া জবাব দেয়—ওরা 'দিল' বলে কিছু মানে না। জঙ্গলেও দেখছি।
রঘু না দিলে বুলবুল, না দিলে কিছু তবু ভেবেছিলাম বাপুকে বলি...। কিন্তু
ওটা ওই উটওয়ালার মেয়ে প্যারীর কাছে ও ঘুরঘুর করে। আমাকে
খরগোস মেয়ে এনে দেয় আর ওর জন্তে সাজারকর কাঁটা কুড়িয়ে আনে। যা
যা বাবু, তোর গাড়ি-টাড়ি আর চড়ব না।

হাসতে হাসতে কণিয়া ছুটে পালায়। কুকুরগুলো ওর পিছনে দৌড়ায়।
ছেলেটা শিশু দেয়। পাহাড়ী বাতাসে ঘাগরা উড়তে থাকে।

সঙ্গিনী খোঁচা দেয়—কি দেখছ?

—পর্বতনন্দিনীকে।

—য়েয়েটার সঙ্গে ওই তাঁবুতে গিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে? বাওনা ওকে
একটা বুলবুল ধরে দিয়ে এসো।

সঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকাই।

দৃষ্টি নামাই আবার।

মাটির উপর লম্বমান একটা ছায়া পড়েছে। নিজের ছায়া নিজেই দেখি।
হঠাৎ নিজের মুখখানার উপর একটা মুখোশ চোখে পড়ে। নিজের মুখটা কি
করে নগর-সভ্যতার সারা মানুষের মুখ হয়ে দাঁড়ায়।

কণিয়াকে সামনে পাই না। ও চলে গেছে। বাতাসে ওর দেহের গন্ধটা
ভাসছে শুধু। হয়তো সে বাতাস আর নেই। গন্ধটা নিছক ভ্রম।

তবু কণিয়াকে বলতে ইচ্ছা করে—জানিস কণিয়া, বুলবুল ধরে দেবার
ক্ষমতা আমার নেই। সে চাতুর্ঘ্য আমি কবে হারিয়ে বসে আছি। তবে হ্যাঁ,
তোকে বুলবুল এনে দিতে পারি। তোকে প্রতারণা করতে পারি। ওটা
খুব সহজ একটা আর্ট আমাদের কাছে। জঙ্গলের মানুষ তুই, সভ্যতার
মুখোশ না পরলে আমাদের এ প্রতারণা ধরা যায় না। শিয়ালদার রথের
মেলায় বুলবুল কিনতে পাওয়া যায়। মাত্র ছুটো টাকা দিলেই একটা জীবন্ত
বুলবুল লোকে কিনতে পারে। তোর দেহ মন প্রাণ—সব কিছুই শূন্য এখন
ছুটো টাকা হয়ে গেছে।

কিন্তু না, কিছুই বলতে পারি না।

এই অরণ্যে দাঁড়িয়ে, হলদিঘাটার পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রতারক
পৃথিবীটাকে নগ্ন করে ধরার সাহস কেন আমার নেই। ভাবি জীবন একটা
জায়গায় থাক না লীলায়িত। অরণ্যের সোনার স্বপ্ন যতদিন পারে
টিকে থাক।

সঙ্গিনী কি ভাবছে জানি না।

তবে ও চুপ করে আছে।

ওর চোখে কোন শর্ত নেই।

জানে শর্ত দিয়ে জীবনকে ঠিক বাঁধা যায় না। হয়তো বা ও নিজেও
চাইছে কণিয়ার মত একটা বুলবুল কিনা কিছু চাইতে যদি সে পারতো!

দূরে দলের লোকদের চিৎকার ভেসে আসে। ওরা জানতে চাইছে
আমরা কোথায়।

অরণ্যের মধ্যে পাহাড় টপকে একটা ময়ূরের ডাক ভেসে আসে। বহু
বর্ষের একঝাঁক বড় বড় প্রজাপতি বাবলার হলুদফুলের উপর উড়ে আসে।
উড়ে যায়।

ড্রাইভার জীপে উঠে বসেছে।

গাড়ি স্টার্ট নেয়। ময়ূরের ডাক থেমে যায়। কণিয়ারা দূরে দাঁড়িয়ে
থাকে। হোনা-মোনা একবার ডেকে ওঠে।

গাড়ি ছোটো। এবার লক্ষ্য কঁাকরোলি।

পাহাড়ি পথটা নামতে নামতে বানস নদীর তীরে এসে থামে। অজস্র
ছড়িপাথরের বৃকে ফুলে ফুলে উঠছে জলশ্রোত। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে
নদী বাঁক নিচ্ছে। চঞ্চল পাহাড়ী নদী।

অসহায়ভাবে আমরা গাড়িতে বসে থাকি।

চোখে পড়ে একটা গরুর গাড়ি নদীর বৃক দিয়ে পার হচ্ছে। গাড়ির
রাখাল আমাদের, অসহায়-অবস্থা দেখে দূর থেকে হাসে। শক্তিম্যান জীপ-
গাড়িকে টেকা দিয়ে গরুর গাড়ি চলে যাচ্ছে—এ আনন্দে সে মশগুল
হয়ে ওঠে।

নিজেকে অত্যন্ত নির্ভরশীল মনে হয়। অন্তপথের খোঁজে, নদীকে
এড়াবার জন্তে গাড়ি পিছু ফেরে।

পাহাড়ী নদী ফুলে ওঠায় সোজা পথ ছেড়ে আরো চার মাইল ঘুরে আসতে
হয় আমাদের, এ চার মাইল আরো জুগ্ম। পাথরের উপর লাফায় গাড়িটা।
পথে আবার শুরু হয় মনসার বেড়া। মাঠ, পাহাড়, জঙ্গল পেরোতে
পেরোতে আবার এসে পড়ি আর একটি নদীর সামনে। পাহাড়ী নদী
—কারী। এখানে তবে এখনো চল নাঁমেনি। শীর্ণ, শুষ্ক প্রায় বিবরঝিরে
একটা শ্রোত। কোনরকমে ছড়ির উপর দিয়ে শান্ত সরীসৃপের মত হেঁটে
চলেছে। তবু ওর বৃক দিয়ে গাড়ি নিতে ভয় হয়। যদি সাইকেলস্বারে
জল ঢোকে!

কঁাকরোলি পৌঁছতে আমাদের প্রায় হয়ে যায় সাড়ে পাঁচটা। আজ
কঁাকরোলি আর একটা নামেও পরিচিত—রাজসমুদ্র বা রাজসমুদ্র।

আসলে রাজসমুদ্র একটা বিরাট বিল। নীল বিস্তারে জলরাশি ছড়িয়ে
আছে এক অপার্থিব সুস্বাদু।

গান্ধী সেবাসদনের অধ্যক্ষের সঙ্গে ঝিলের কিনারায় পৌঁছই। বিকেলের
পড়ন্ত রোদে রঙ মেখে চলছিল করছে নীল জল। আকাশের রঙও পালটায়।

মহারাণা রাজ সিং এই রাজসমুদ্রের সৃষ্টি করেন। সঙ্গিনীর অজস্র প্রশ্ন
—কবে হলো, কবে শেষ হলো, কত টাকা খরচ হোল?

সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে উত্তরগুলো আমার কানেও আসে।
অধ্যক্ষ মহোদয় পুরানো দিনের গান্ধীবাদী কর্মী। ধৈর্য স্থৈর্যের অভাব নেই।
বলেন—শুধু রাজসমুদ্র নয়, এই শহরেরও পত্তন করেছিলেন মহারাণা রাজ
সিং। সেকালে রাজারা শুধু প্রজার কাজ থেকে করই নিতেন না, শাসনই
করতেন না, হাজারো যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও—রাজকীয় সমস্তার
ঘূর্ণির মধ্যেও অনেক কিছু করে গেছেন বহু নগর...বহু কীর্তি! তাবুন
রাজসমুদ্র তারই একটা ছোটখাট নিদর্শন। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিরাট
ঝিল সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করেন, শেষ হয় ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে। খরচ? এক
কোড় টাকা!!

আমি দেখি ঝিলের চারপাশের বাঁধন, ন্যাতের ছতরী, প্রবেশদ্বার।
ছতরী থেকে সোপানগুলি জলের দিকে নেমে গেছে। ইট নয়, সাদা পাথর।
তিনটি করে স্তর সোপানের। এক একটি স্তরে নাট করে সিঁড়ি।

অধ্যক্ষ বলেন—নয় সিঁড়ির নক্সা দেখেছেন? এরও একটা নাম আছে।
আমরা বলি নওচৌকি। মজা কি জানেন, মাপুন—দেখবেন প্রত্যেকটা সিঁড়ির
উচ্চতাও ন' ইঞ্চি। ন-এর একটা ছন্দ দিয়ে গড়া।

তিন ধাপের পর ছ' ভাগে জলের মধ্যে কিছু সিঁড়ি নেমে গেছে দুপাশ
দিয়ে। এ সিঁড়িগুলি খুবই ছোট ছোট। দুই ছতরীর মাঝামাঝি জায়গায়
এক এক জোড়া স্তম্ভ।

জলুবাশির দিকে তাকাই। দৃষ্টির দোড় পেরিয়ে জল চলছিল করছে।

সঙ্গিনী বলে—এটাকে একবার প্রদক্ষিণ করা যায় না?

অধ্যক্ষ হাসেন—বারো মাইল লম্বা এই ঝিল। একে প্রদক্ষিণ করা কি
মোজা? তার চেয়ে দেখুন—স্বেতপাথরের ওপর কারিগরের কবিতা। ঝিল্লি
আর লতাপাতার ছন্দ।

অবাক বিষয়ে তাকিয়ে দেখি।

স্বেতপাথরের বৃকে হাজারো পদ্ম ফুটে উঠেছে।

পাশেই সিংহদ্বার মহারাণার প্রাসাদের। একটা বিশ্বতপ্রায় অতীতের
ইতিহাস বৃকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছায়া ফেলেছে ঝিলের জলে। প্রাসাদ

আজ জনহীন, শূন্য। পারাবতের ডাকে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। অতীতের সেই রাজসিকতার। ছিঁটেফোঁটাও কোথাও নেই। আজ সে কঙ্কাল। পারাবতের ক্লান্ত কোলাহল তার শূন্যতার বেদনাকে বাড়িয়েই তোলে। মনকে আঘাত করে।

জলোচ্ছ্বাসে কল্লোল জাগে। কিন্তু প্রাসাদের নটিনীর নৃপূর এ সন্ধ্যায় স্তব্ধ। কোন ভাষা নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে মেবারের সেই রূপমুগ্ধ ভাবমুগ্ধ রাজকুমার। রাজপুতানীর হাতের দর্পণ কোথায় হারিয়ে গেছে। রাজা গেছে, রাজত্ব গেছে, বৈভব গেছে, রূপ গেছে, শিল্পী গেছে। আর কোনদিন ভারতবর্ষ এই প্রাসাদ, এই বিল স্বপ্নের রঙ দিয়ে গড়তে পারবে না।

মনে পড়ছে মিঃ হুইটল সীর কথা।

আমেরিকার একজন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট। কলকাতায় এসেছিলেন। একদিন এক সন্ধ্যায় চায়ের আসরে তাঁর সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় আজকের ভারতের সৌধ-পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। মিঃ হুইটল সী তাঁর গায়ের খাদি জামায় আশ্রিত গুটিয়ে বলেন—লম্বা লম্বা এই বাস্তব মত বাড়ির নক্সার কি সৌন্দর্য থাকতে পারে? এদের কোন গভীরতা নেই নক্সায়। বিনা গভীরতায় শিল্পী সৌন্দর্যকে বসাবে কোথায়?

ওঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাই। বয়সের চাপে সাদা হয়ে এসেছে মুখ। বুঝি অনেক দিনের অনেক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি মিশিয়ে তিনি কথা বলছেন। হাসি।

হেসে বলি—আপনি তো কবির মত কথা বলছেন!

জবাব দেন—ভুল করবেন না, একজন আর্কিটেক্টও কবি।

রাজস্থানের রাজসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সেই প্রাসাদ, সেই বিলের গাঁথুনি, তার ছতরী, সোপান—সব দেখে মনে হয়েছিল—এটা যেন কবিতা। শিল্পীকে সত্যিই কবি বলে মনে হয়েছিল।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারের তাল তালু বারে পড়ে বিলের জলে। দেখতে দেখতে ওই নীল জল কালো হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। শুধু কানে ভাসে শাস্ত কল্লোল। অতীতের সেই সব স্মৃষ্ক কারিগরের স্মৃতি যেমন আজ জেগে আছে তেমনি দিনের শেষ মুহূর্তে দেখা বিলের রূপটাকে মনের ক্যামেরায় বন্দী করে ফিরে আসি।

ফেরার পথে অধ্যক্ষ শোনান গল্প—এখানকার মাটিতে এই বিল নিয়ে গল্পটা আজো বেঁচে আছে। লোকে বলে এই বিলের বাঁধের ভিত গাঁথার

সময় বার বার বিভ্রান্ত হতো কারিগররা। জল ফূলে উঠে ভিত ভাসিয়ে দিতো। পণ্ডিতেরা সব শুনে একটা পরামর্শ দিলেন।

কয়েক মিনিট চুপ করে যান অধ্যক্ষ। সঙ্গিনীর অসীম কৌতুহল—
কিসের পরামর্শ?

—একজন সতী-নারী খুঁজে বার করতে হবে। সতীলক্ষ্মী যদি নিজের হাতে ভিত গাঁথে তাহলে আর তা ভেসে যাবে না।

টিপ্পনী করি—আবার সতীত্বের মহিমা?

অধ্যক্ষ বোধহয় ক্ষুণ্ণ হন। গম্ভীর মুখে বলেন—বিশেষ বিশেষ যুগের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ থাকে। আমরা যুদ্ধের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে বেঁচে উঠেছি কাজেই সতীত্ব সততা সম্বন্ধে এ যুগের কোন ডগ্মা (dogma) নেই সোমজী। সে যুগে ছিল। ব্যভিচারী পুরুষও সতীত্বের সম্মান দিতো।

সঙ্গিনী বলে—ওর কথায় কান দেবেন না। আপনি বলুন তো।

অধ্যক্ষ বলেন—খোঁজ পড়ল সতীনারীর। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাকে। লোকে খুঁজে শেষ পর্যন্ত বার করলে এক জৈন পরিবারের মেয়েকে। ভিত সে গাঁথলে। কিন্তু গাঁথা শেষ হলে, তার কর্তব্য সম্পূর্ণ হলে বলে—আমি তো ফিরে যেতে পারব না। সতী হিসাবে বাছাই করে আমাকে যখন লোকে এখানে নিয়ে আসে তখন স্বামী দিয়েছিলেন আমার অনুমতি, ফিরে যাবার নয়। সে চিরদিনের জুড়ে রয়ে গেছে এই রাজসমুদ্রে।

বাতাস হঠাৎ যেন জোরে বইতে থাকে। অন্ধকার পথ। টর্চের আলোয় কোনমতে আমরা এগিয়ে চলেছি। একবার থমকে দাঁড়াই। রাজসমুদ্রের দিক থেকে কেমন একটা শব্দ ভেসে আসছে। স্বামীর আশ্রয়ভ্রষ্টা কোন নারীর দীর্ঘশ্বাস কি? লোককল্যাণের যে ভিত গাঁথে আত্মহননের কাহিনী রচনা করে গেছে? দূরে বিলের জলে আবার আলো ঝাঁপছে। ঠিক যেন কোন মেয়ের ওড়না ষাটাসে তুলছে। দেখতে সাঁহস হয় না।

অধ্যক্ষ বলেন—থামলেন কেন? চলুন। আপনাদের সঙ্গীরা অনেক এগিয়ে গেছেন।

শ্রদ্ধের তাঁর ভক্তবৃন্দ নিয়ে আগেভাগে চলেছেন। ওঁদের টর্চের আলো দূর থেকে চোখে পড়ে। একটু আশস্ত হই।

সঙ্গিনী প্রশ্ন করে—সেই সতীর কি হোল?

—সমাধি! শেষ ছতরীর পাশে একটা মন্দির দেখলেন না? সেখানে আছেন দেবী অম্বিকা। তার পাশেই আছে রাজসমুদ্রের ভাগ্যলক্ষ্মীর সমাধি।

ভেবেছিলাম শ্রুতির শেষ হয়েছে। কিন্তু না। কিছুক্ষণ পর আবার অধ্যক্ষ বলেন দ্বিতীয় কাহিনী। চলতে চলতে আমরা শুনি মহারাণা রাজসিং হুবার হু কন্ঠার মাল্য গ্রহণ করেন। তুই রাণী। কিন্তু সংসারে যা হয়, দ্বিতীয় রাণীরই প্রতি আকর্ষণ বেশী। তারই বেশী বশব্দ। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দ্বিতীয় রাণীর প্ররোচনায় প্রথম স্ত্রীর সম্মান পর্যন্ত হত্যা করছেন তিনি। এ সংসারে আর একটা নিয়ম আছে—পরিণতি। সেই চরম পরিণতি বা ক্লাইমাক্সে পৌঁছলে মানুষ চোর থেকে ভাবতে চেষ্টা করে। অন্ধ আকাজক্ষার বাঁধনটা টিলে করে খোলা চোখে ছুনিয়াকে দেখতে চায়। ‘রাজসিংও তাই করলেন। অল্পশোচনা হল। বাপ হয়ে পুত্র হত্যা! চাইলেন প্রায়শ্চিত্ত করতে। পণ্ডিতরা বিধান দিলেন—হয় জলে মরো, না হয় বিরাট জলাশয় সৃষ্টি করে মানুষেরা জ্বালা মেটাও। জলে মরতে পারেননি রাজসিং। সৃষ্টি করে গেছেন রাজসমুদ্র।

গাড়ির কাছে পৌঁছই, গল্পও শেষ হয়। কঠিন অন্ধকারের মধ্যে রাস্তার দু একটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে। আবার ফিরে যাব উদয়পুর। যে দুর্গম পথ দিনের আলোর পিছনে ফেলে এসেছি সেই দুর্গম পথে আরম্ভ হয় রাতের অন্ধকারে পাড়ি। মাঝে মাঝে বগুজঙ্গর আর্তনাদে বুক কাঁপে। আলোর মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভার মাঝে মাঝে এক-আধটা নেকড়ে দেখায়। শিকারের লোভে ওদের জিভ বেরিয়ে আছে। নির্জন নিঃশব্দ পথ। মানুষের কোন সাড়া দীর্ঘক্ষণ আর পাই না। অধ্যক্ষের গল্পের শেষ লাইনটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়—‘হয় জলে মরো, নয় মানুষের জ্বালা মেটাও!’

অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। মনে মনে কথার বহু আল্পনা। বাইরেটা মুক।

সারাদিনের ক্লাস্তিতে সবাই ঢুলছে। শুধু সজাগ সতর্ক ওই ব্রাজপুত ড্রাইভার। সংসারের সব চালককে এই কষ্ট স্বীকার করে নিতে হয়। পাশের লোক স্কুমোলেও সে ঘুমোতে পারে না।

সুদ্বিনীরও ঘুম নেমেছিল। ঢুলতে ঢুলতে ঘুমন্ত গাড়িটার মধ্যে কখন যেন আমার কাঁধে মাথাটা রেখেছিল, অসংকোচে। পিছনের দিকে আমরা হুজন।

• হঠাৎ আমার চিবুকে উষ্ণনিঃশ্বাসের শব্দে চোখভট্টো ওর মুখের দিকে ফিরে আসে। দেখি ও জেগেছে। তাকিয়ে আছে।

জানতে চায়—কি ভাবছ ?

আমি হাসি।

—বলনা, কি ভাবছ ?

গুনগুন করে আবৃত্তি করি। এতক্ষণে ভাবনাটা ছন্দে গাঁথা পড়েছে।
অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে বলি—মাঝে মাঝে মনে হয়,

কেন বাঁচা কেন আসে ক্লান্তির সকাল :

মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি আবার সে হারানো প্রত্যয়

খুঁজে পাই একে একে যত আশা পড়েছে আড়াল :

আবার সে একই মনে—

অবিশ্বাস হিংসা লোভ শাপিত নথরে

জীবন যুগল নিয়ে গ্রহরে গ্রহরে

দাঁতে কেটে ছড়ায় ধুলায় :

তোমার আমার সব সঙ্গস্বধা—সব ভালবাসা

দেওয়া নেওয়া প্রতিশ্রুতি আশা

ফাল্গুনের মত এক মহা শূন্যে গুণু জলে যায়।

শিঙ্গিনী শোনে। ওর চোখের দুকোণ থেকে দুটি ফোঁটা ছ'গাল বয়ে
আমার কাঁধে গড়ায়। ধরা ধরা গলায় বলে—তারপর ?

আবার ওই অন্ধকারের দিকে চেয়ে আবৃত্তি করি—

এই মন এই প্রশ্ন—কতদিন আর কতকাল

ছঁড়াবে নিজেকে ঘিরে অন্তহীন এ বিষাদ-জাল !

ও আর কিছু বলে না।

দূর অন্ধকারের মধ্যেই আমি ওর মুখখানা দেখতে পাই। দুটো চোখের
ভাষা পড়ি।

ও জানতে চাইছে—সংসারে কোথায়, কেমন করে আমি সুখী হতে পারি।

কি উত্তর দোব। জীবন স্বপ্নের চাবিটা হারিয়ে বসে আছে। একে নিয়ে
ওকে নিয়ে অসুখী হতে হতে আজকের মানুষ নিজেকে নিয়েই অসুখী। সে
জলে মরছে নিজেই। অন্তের জ্বালা বুঝি এর দ্বারা আর মেটানো গেল না।
মহারাজা রাজসিং-এর কাল আর একালের ব্যবধানই এই দুঃখের আবর্ত সৃষ্টি
করেছে। তাই তিনি মরেও বেঁচে আছেন আর আমরা বেঁচে থেকেও মরে
আছি।

এসব কথার কিছুই বলি না ওকে। শুধু মুখে বলি—তুমি ঘুমিয়ে নাও।
কাল তো আবার ষোড়শপুর রওনা হতে হবে। [ক্রমশঃ

॥ বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি ॥

তারানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরোগ্য নিকেতন ॥ রচনা-সংগ্রহ ॥ চৈতালি ঘূর্ণি

৭ম মুঃ ৭'৫০ ॥

১ম খণ্ড : ১০'০০ ॥

১০ম মুঃ ২'৫০ ॥

মনোজ বসুর

মানুষ গড়ার কারিগর ॥

নবীন যাত্রা

৩য় মুঃ ৫'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৪'০০ ॥

বনফুলের

সে ও আমি ॥

দ্বৈরথ ॥

স্বপ্নসম্ভব

৪র্থ মুঃ ৩'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৩'০০ ॥

৩য় মুঃ ৩'০০ ॥

সতীনাথ ভাট্টার

অপরিচিতা ॥ পত্রলেখার বাবা ॥ গণনাযক

২য় মুঃ ৩'০০ ॥

চার টাকা ॥

২য় মুঃ ২'৫০ ॥

সমরেশ বসুর

শ্রীমতী কাফে ॥

সওদাগর ॥

গঙ্গা

৩য় মুঃ ৬'০০ ॥

২য় মুঃ ৬'০০ ॥

৬ষ্ঠ মুঃ ৫'৫০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

কদম

দুয়ার হতে অদূরে

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

২'৫০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

চতুরঙ্গ

॥

অবিহ্বাস

॥

ময়ূরকণ্ঠী

৩য় মুঃ ৪'৫০ ॥

৯ম মুঃ ৩'০০ ॥

১৪শ মুঃ ৪'০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

॥

সূর্যসারথি ॥

॥

একতলা

৪র্থ মুঃ ৫'০০ ॥

৪র্থ মুঃ ৩'৫০ ॥

৩য় মুঃ ২'৫০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

অন্তরীক্ষের সঙ্গীত

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

[পূর্বাহ্নরুতি]

[নয়]

ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম—এই পঞ্চপদার্থে বা শরীরে প্রস্তুত আমাদের জীবদেহ। ক্ষিতিতে আছি, তাই বর্তমানে দেহের ওপর ক্ষিতির প্রাধান্য। কিন্তু দেহের মধ্যে অগ্ন্যাগ্ন পদার্থেরো সে বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্য রয়েছে—সে-কথা না বললেও চলে। ‘ভস্মীভূতস্ত দেহস্ত’ গতি কোথায়? না, পঞ্চবিধা জগতে। পঞ্চবিধা জগৎকে চৈতন্যশক্তি এক করে’ রাখে—ইহলৌকিক কার্য যখন ফুরিয়ে যায়, তখন, অর্থাৎ মরণের পর, পঞ্চবিধা জগৎ সাময়িক ভাবে পৃথক হয়ে সে যার সন্তায় গিয়ে মেলে : ক্ষিতি অংশ মাটিতে, অপ্ অংশ জলে, তেজ অংশ সূর্যে, মরুৎ অংশ বায়ু-মণ্ডলে এবং ব্যোম-অংশ আকাশে।

পঞ্চবিধপদার্থে গঠিত পঞ্চশরীরের পঞ্চপ্রকারের সূক্ষ্ম শরীরও আছে, স্থূল শরীরে যেমন কীম-কামনা, সূক্ষ্ম শরীরেও তেমনি প্রচ্ছন্ন আছে নানা কামনা-বাসনার বিচিত্র প্রাণ, প্রারদ্ধ কর্মের শুভাশুভ বিচিত্র সত্তাবলী। সূক্ষ্ম শরীরে যদি ক্ষিতি-সংস্কার প্রবল—তবে ক্ষিতিকে প্রাধান্য দিয়ে একদা জীবলোকে পুনর্বীর নামব। এই নামার পথে প্রারদ্ধ কর্মানুসারে চৈতন্যকণার স্নাহাঘ্য পাব। তারি সাহায্যে প্রয়োজন-মত বাকি চারিটি পদার্থের বীজ আহরণ করে’ জীবগর্ভে ভ্রূণাকারে জন্ম নেব। ক্ষিতিপ্রধান জীবনে সাধারণতঃ ভোগ করতেই চাইব।

সূক্ষ্ম শরীরে যদি অপ্-সত্তা প্রবল অথচ জীবজগতে জন্মাবাসো আছে বাসনা, তবে ক্ষিতি-অংশের সহায়তা চাই-ই চাই। জগতে জন্ম নিতে গেলে ক্ষিতির সহায়তা অপরিহার্য। প্রয়োজনমত বাকি সত্তাগুলির সম্মেলনে জীবলোকে জন্মগ্রহণ করে—মানব সমাজকে নূতন ভাবের জোয়ারে ভাসাব। নিজের দেহের দিকে ভোগের দিকে তখন এত দৃষ্টি থাকবে না। স্থূলত্ব শোভ করার বেদনা বেগে দেশ থেকে দেশান্তরে বৃহত্তর জন্তে কান্না করব সঞ্চার। এইভাবে তেজকে প্রধান করে’ যখন জন্মাব—তখন উদ্বর্তিতা ব্রহ্মচারীর

শিবসাধনায় হব সিদ্ধ। মরুৎকে প্রাধান্য দিয়ে আবিভূত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে করব সাধনা। বিশ্বসমাজের অন্তরালে থেকে বায়ুভরে বিকিরণ করব মঙ্গলেচ্ছা, ব্যোমাংশকে প্রাধান্য দিয়ে সংসারে জন্মগ্রহণ করব, এইমাত্র। 'একপর্ণা'-ও নয়, 'অপর্ণা'র মত যোগসাধনায় নির্বেগ নিস্তরঙ্গ থেকে সিদ্ধকাম হব সবার আড়ালে। অর্থাৎ শিবে মিলিত হব অচিরাতঃ।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চবিধা শক্তির সমাহার এই দেহ। দেহের আড়ালে বিশেষ সে-সত্তাটির ভোগের প্রয়োজনে আমার জন্ম—সেই সত্তাটির স্বস্থ দেহ-ই ইহজন্মে আমার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভোগ-ত্যাগ প্রভৃতি শুভাশুভের নিয়ন্তা। সংসার-লোকে যেমন ক্ষিতিপ্রধান, অপ্-প্রধান, তেজ-প্রধান, মরুৎ-প্রধান, ব্যোম-প্রধান জীবাশ্মার জন্ম হয়, সংসারাতীতে-ও তেমন হয়। মৃত্যুর পর আমরা সটাং সে যমমন্দিরের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মলোকে যাই—এটা কথাই নয়। মৃত্যুর পর আমরা সাধনা ও বাসনার দ্বারা সে জগৎ দৃশ্যমান ইহলোকে সৃষ্টি করি, অদৃশ্য ইহলোকে সেই জগৎ-ই আমাদের মানসভূমি হয়। সেই মানসভূমি থেকে প্রারম্ভকর্ম ও ভাবানুসারে যথাকালে আমরা ঈঙ্গিত লোকে 'নামি' কিংবা 'উঠি'। 'নামা' মানে মানব শরীর থেকে পঙ্ক-শরীরে, পক্ষী-শরীরে, কীটপতঙ্গ-শরীরে এবং লতা বৃক্ষাদির-শরীরেও নামি। সে এক বিচিত্র অবতরণ-রহস্য, আমাদের শাস্ত্রে, উপনিষদে ও পুরাণশাস্ত্রে, সংহিতা ও স্মৃতিগ্রন্থে এ-রহস্যের কথা নানা আখ্যানে উপাখ্যানে ও তত্ত্বকথায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'ওঠার' সাধনাও প্রাকৃতলীলা। যমলোক, দেবলোক, ইন্দ্রলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোক কি বৈকুণ্ঠলোক সব-ই প্রকৃতিলীলার অন্তর্গত। একমাত্র মহান সেই অনন্ত পুরুষ ছাড়া জীবলোক থেকে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত প্রকৃতি-বিধানে নিরন্তরিত। যেখানেই যাই, কেবল গতি আর গতি। হয় পশ্চাৎ-গতি, নয় সম্মুখ-গতি।

খুব গভীর অল্পভূতি-প্রবণ দিব্যজ্ঞানী-মাহুষ ইহজীবনেই এ-তত্ত্বটি জানেন। ইহলোকেই জীবলোক, যমলোক দেবলোক, ইন্দ্রলোক প্রভৃতি রহস্যধাম মাহুষের চরিত্রে-ই প্রকটিত হতে পারে। তবে যত গভীর ওদ্যেই তা' প্রকাশিত হ'ক না কেন, তা' আংশিক প্রকাশমাত্র। অংশটুকু লক্ষ্য করে' পূর্ণের ধারণা প্রাপ্তরা করতে পারেন এই যা।...

এক এক সময় আমার মনে হয় সে ধ্যান ও একাগ্রতার সাধনার দ্বারা ক্ষিতির সর্বত্র এই পূজার ঘরটায় বসেই পরিক্রমা করা যায়;—অন্তহীন স্নিগ্ধতা

ও মহত্ব আত্মস্থ করা যায় ; তেজের উৎসভূমিতে, যেমন সূর্যশরীরে, অল্পপ্রবিষ্ট হওয়া যায়। মরুতের সর্বব্যাপী, মহিমা আত্মস্থ করে বিশ্বভূমণ্ডলে মুহূর্তের মধ্যে গভীরতায় করা যায় ; ব্যোমের আনন্দে বিশ্বকালের খুঁটিনাটি সমস্ত রহস্য—সৌরমণ্ডলের গ্রহাদির রহস্য তো বটেই, দূরতম নক্ষত্ররহস্য-ও জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। জ্ঞানের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, কর্মফল-ত্যাগের দ্বারা, শাস্তির অপ্রাকৃত তত্ত্বাধাসের দ্বারা, এক কথায়, যোগসাধনার দ্বারা, এ-সব সম্ভব। ক্ষিতিপ্রধান জীবজগতের ক্ষিতিজ্ঞাত ভাবাবেগে বস্তুচিন্তা, কামক্ৰোধাদি বৃত্তি প্রভৃতি জীবমানবকে এতই আকৃষ্ট করে রাখে যে, অথও জগৎ পরিক্রমার অধ্যাত্মশক্তি সাধনায় মন-ই যায় না। জীবমানবের সাধারণ জগতে তাই এসবের মূল্য বা মর্যাদা তেমন কিছু নেই। কবি বা দার্শনিকেরা জ্ঞান ও ধ্যানের দ্বারা এ-সব জগতের ইঙ্গিত দেন, কিন্তু তাঁরা-ও কর্মফল-ত্যাগের তত্ত্বটি অন্তর্জীবনে প্রতিভাত করতে পারেন না বলে চরম শাস্তিলাভে সচেতন হতে পারেন না বলে তাঁদের রচনায় সুস্পষ্ট ‘প্রাপ্তির’ স্বচ্ছতা নয়—‘প্রাপ্তির’ ধ্বনিটুকুই আচ্ছাদিত হয়। তৈলঙ্গস্বামীর মত দিব্যতান্ত্রিক কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের মত সিদ্ধপুরুষ অথবা শ্রীঅরবিন্দের মত যোগি মহাত্মা এ-কালেও বিশ্বপ্রকৃতির সর্বলীলা দেখেছেন। এঁদের লৌকিক আচরণে, সাধারণ কথায়বার্তায়, লোকায়ত রচনাপ্রকাশে, সমাধিস্থ চেতনার প্রকটনে এ-সত্য খানিকটা প্রমুদিত হয়েছে। আমি যখন এঁদের কথা ভাবি, রচনা পড়ি, কি জীবনবাণী অধ্যয়ন করি, নিতান্ত নগণ্য গৃহী হয়েও অল্পভব করতে পারি দিব্যজীবনের রহস্য। অনেক সময় আবেগের রোমাঞ্চে স্পষ্টত-ই কত কী যেন পাই। হৃদয় ভরে ওঠে, মন ছুটে যায়, ভাবশরীর থেকে চৈতন্য-শরীর আকাশের আলোর মত মনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। জীবশরীর ও সংসারটাকে তখন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

তবু আমি বেশ ক’রে ভেবে দেখেছি যে, আমার মধ্যে ক্ষিতিঅংশ বড়-ই প্রবল—এইজগৎ উদ্ভাদনার দিব্যমুহূর্তে-ও আত্মহারা হয়ে যেতে চাইনে। মানবিকতার সঙ্গে ভাবগত চেতনার সামঞ্জস্য করে-ই নিতে চাই। এতে আমার স্বরূপ উপলব্ধির সহায়তা হয়। আমি যতটুকু, ততটুকুর বেশি চাইতে যাওয়ার বিড়ম্বনা সাধনপথের অন্তরায় মাত্র। এইজগৎ ইষ্টদেবীকে প্রণাম করে বলি :—মা, জীবজগতের অনেক কর্ম রয়েছে বাকি। বাকি যা আছে, সাধনার দ্বারা সংগোপনে তা শেষ করতে দাও। আমি জানি—এ-ও এক প্রকার পার্থিব প্রার্থনা। আমি জানি এ-প্রার্থনা আমাকে আরো অনেক জীব-জন্মে

আনবে টেনে। এ-জীবনে পরম-চৈতন্য লাভ করা সম্ভব না। শুধু তাই ভাবের ঘোরে অকর্মণ্য বিলাসে আত্মছলনা আমি করব না। সংসারে সাধারণ সংসারীর মতই থেকে কায়েনমনসাবাচা ক্ষিতির সর্বোচ্চ ধর্মের সাধনা যদি করি, তবে সেই ধর্মসাধনার প্রভাবে নূতন থেকে নূতনতর জীবনের অধিকারী হয়ে জীবজগতে আমি আরো অনেক যুগ আসব। যুগে যুগে আসব যে, 'জাতিস্মর' হয়ে একদা জগৎকে তা' বুঝিয়ে দেব।

আজ শুধু এইটুকুই প্রার্থনা : বিচিত্র জীবন-জন্মের চলার পথে মরীচিকা দেখে যেন না ভুলি ; এবং একদিন যেন সকল তৃষ্ণার শেষে তোমার চরম আশীর্বাদ লাভে চরিতার্থ হই।

[দশ]

জাতিস্মর বালক বা বালিকার কথা আজকাল সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সব সংবাদ পাঠ করতে আমার খুবই উৎসাহ জাগে। অল্প-বয়সে একেবারে কচি বয়সে, ভাগ্যবান কোনো বালক বা বালিকা অবিখ্যাত ধী ও ধারণ শক্তির পরিচয় দিচ্ছে—এ সংবাদও আমার চেতনায় নূতন কাব্যভাবের রোমাঞ্চ তোলে। এদের সব কথা পড়তে পড়তে এবং নির্জনে ভাবতে ভাবতে মনে হয় আমি-ও একদিন জাতিস্মর হয়ে যাবো। পূর্বজন্মে কী ছিলুম, কোথায় ছিলুম, কী কষ্টতুম, কারা ছিল আমার আত্মীয়বন্ধু—একদিনের আলোর মত আমার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

— কিন্তু কী হবে তাতে ? না, ইহলৌকিক জীবনেরই পরম কল্যাণ তাতে হবে! কেমন করে হবে ?

সেই কথাই বলতে বসেছি।

আজ পৃথিবীতে মানুষে মানুষে ভেদ। সাদা-কালোয় ভেদ। জাতিতে-জাতিতে ভেদ। দেশে-দেশে, প্রদেশে-প্রদেশে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ভেদ।

এই ভেদ যখন আমাদের নীচতা স্বার্থপরতা শেখায়, তখন এর মত লজ্জাকর বিকার আর নেই। কোনো মানুষকে, কোনো সম্প্রদায়কে কোন দেশ বা প্রদেশ বা জাতিকে ঠকাতে যাওয়া, পদানত রাখা, শোষণ করতে থাকা, উপেক্ষা বা ঘৃণা করতে চাওয়া—মানবিক ধর্ম-বিরোধী। অথচ ধর্মের

নায়ে, দেশের নামে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রগতির নামে, হামেশাই আত্মসা-
ধর্ম-বিরোধী কাজ করছি। আজ আমি বাংলাদেশে হিন্দুর ঘরে প্রাক্ষণ হয়ে
জন্মেছি—দেশ জাতি ও বর্নবিচারে অন্ধ দেশকে যদি উদ্দেশ্য করি, তবে
জাতিকে যদি ঠকতে চাই, ত্রিবার্ষিকের মাহুদের যদি ঘৃণা করি—তবে স্বভায়ে
জানার ইহলৌকিক জীবনের আধ্যাত্মিক অধঃপতন হবে, কল-অন্যগতকাল
এর ফল ভোগ করার ক্ষেত্রে অহংবোধে অন্ধ তুচ্ছ-জীবাজ্ঞা হয়ে জন্মাব।

জাতিস্মর হলে নিজের পূর্বজন্মের দোষগুণগুলি জানতে পারব। ইহ-
জীবনটাকে সর্বতোভাবে ক্রটিহীন করে চালনা করার বাসনা তখন হবে।
তুচ্ছ তাই নয়, জাতিস্মর হয়ে যদি জানি—গতজন্মে আমি বিহার-প্রদেশে
কোন এক গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলুম—তাহলে হঠাৎ বিহারের প্রতি
আমার মমতা ও শ্রদ্ধা বাড়ে। যদি জানি একটা জন্মে আমি আমেরিকার
ছিলুম; একটা জন্ম রাশিয়ায়,—তবে আমেরিকা যেমন, রাশিয়া তেমনি,
আমার কাছে মাতৃভূমির শ্রদ্ধা পাবে। এইভাবে ইউরোপ, আমেরিকা,
আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া কি এশিয়া—সকল মহাদেশের সকল দেশ, প্রদেশ, গ্রাম,
শহরের সঙ্গে আমার সখ্য হবে। তখন ‘পলিন’র খাতিরে আন্তর্জাতিক হব
না, বাস্তব জীবন দিয়েই অখণ্ড পৃথিবীকে জানব বলেই আন্তর্জাতিক হব।
অধ্যাত্মচেতনায় ‘অখণ্ড’কে জানা মানেই ‘জানা’। সেই জানাতেই স্বল্প-
ধ্যানের জন্ম, তা থেকেই কল্যাণ ও শান্তি। প্রেম ও মৌহাদ্য।

এক অখণ্ড পৃথিবীর চিন্তা মনোবীর্য করছেন। একদিন ‘এক পৃথিবী’
অবস্থাই হবে। ধনবল কি অল্পবল, কি রাজনৈতিক কৌশলবলে পৃথিবীর সব
দেশ ও জাতি এক অখণ্ড মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হবে—এটা আমি মনে করি
না। অধ্যাত্মচিন্তায় মানুষেরা এক হবে এই চিন্তাই স্বার্থ চিন্তা।

অধ্যাত্মনাথনায় অন্তরাচার স্বার্থ বিকাশ হলে পৃথিবীর সর্বত্র যে আমি
ছিলুম—এ সত্য স্পষ্ট হয়। ভারতের সর্বত্র আমি ছিলুম, এশিয়া, আফ্রিকা,
ইউরোপ, আমেরিকায় এককালে খেলাধুলা করেছি, পৃথিবীর সর্বত্রই বন্ধুবান্ধব
রেখে এসেছি, এ বিশ্বাস যত ঘনীভূত হয়, ততই চিন্তের রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়।
জাতিস্মর নই বলে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কারোর প্রতি আমরা ভেদন এগুটি
ভালবাসা অহুত্ব করি না। বুদ্ধি দিয়ে, কর্তব্যবোধে আমি হয়তো ভারতের
এবং ভারতের বাইরের সর্বদেশকে আগুন দেশ বলে মনে করতে পারি, করে-ও
থাকি, কিন্তু এটা কি মিথ্যা, যে বাংলাদেশকেই আমি এর্বাপেক্ষা প্রিয়ভূতি
বলে ভূগু থাকি, অহংকারও করি?

জীবদেহে মানুষ স্বাদেশিক ও জাতীয়তাবাদীও হতে পারে কিন্তু শিব চেতনায় মানুষ বিশ্বদেশিক ও আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ শিবচেতনায় যদি জীবদেহটিকে সাধনা করাই তবে বাক্যে, ব্যবহারে, ধর্মে, কর্মে, ধ্যানে, জানে, স্বাদেশিক হওয়া সহ্যেও সর্বদেশিক ঔদার্য ও মনোভাব আমি লাভ করব।

পলিনির জন্তে, কূটনৈতিক অভিসন্ধির প্রভাবে, মানুষ হাল আমলে স্বদেশে থেকে ও সর্বদেশিক হওয়ার ভাণ করে, দেশদ্রোহী হওয়ার মনোভাব প্রকাশেও লজ্জাবোধ করে না। আমি এমনতর আন্তর্জাতিকতা ও সর্বদেশিকতার কথা বলছি, তা সহজেই পাঠক অনুভব করছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তারা আন্তর্জাতিক, তাঁরা আন্তর্জাতিক-ও নয়, জাতীয়তাবাদীও নয়— তাঁরা ব্যক্তিগত বা দলগত গোপন-প্রভুত্ব লিপ্সায় আচ্ছন্ন পার্টি-প্রেমিক দেশদ্রোহী। আধ্যাত্মিক চেতনার কথা দূরে থাক, সাধারণ মানবিক ঔদার্য-ও তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। জগৎ ও জীবনকে তারা দিন দিন পেছিয়ে দেবার জন্তেই আসেন, নিজেরাও নিজের অজান্তে দিন দিন পেছিয়ে পড়েন। পূর্বজন্ম তাঁদের কাছে অলীক কল্পনা, অনাগত জন্ম তাঁদের কাছে অসার চিন্তা। ইহজীবনের ভোগ, বিবয়চিন্তা, মানমর্ষণা, প্রভুত্ব,—হুটবুদ্ধিই তাঁদের চলার পথের পাথর। এই বোধ নিয়ে তাঁরা জন্মেছেন, এই নিয়েই তাঁরা যাচ্ছেন। যুগে যুগে তাই সংসারে শাস্তিবিরোধী, প্রেমবিরোধী, বৈরাগ্য-বিরোধী সমস্তা নিত্য নূতন বেগে প্রমুদিত হচ্ছে, আরো হবে। এরা মুখে বলবে শাস্তি, কর্মে শাস্তিপথে চালাবে মানুষকে। যে-সব মানুষ এঁদেরই মত অহংকার নিয়ে জন্মাবে, সে-সব মানুষেরা এঁদেরই কথাকে বেদবাক্য বলে মনে করবে—এরা যা বলবে তারা তাই করবে। জগৎ থেকে জিগীষা, জিঘাংসা, শ্রদ্ধা, প্রবর্ণনা হুঁচার লক্ষ বৎসর বেশ অব্যাহত গতি বেগেই চলবে।

তবু ভয়ের কারণ নেই এইজন্ত যে, শাস্তিকামী শাস্তিক সংস্কার নিয়ে-ও মানুষ জন্মাবে। মানুষের কানে দেবে উত্তর জীবনের মহামন্ত্র। রচনা করবে ধর্ম-দর্শন-কাব্য-শিল্প যে সব মানুষ এই সব সংস্কার নিয়ে জন্মাবে তারা তাদের বাণীর মহত্ত্ব বুঝবে। সেইভাবে জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করবে।

মন্দের মন্দে ভালের লড়াই তাই দু-চার লক্ষ বৎসর চলবে। একই জীবনের মধ্যেও ভালো মন্দের লড়াই চলবে। এ-জীবনে ভালো যা' করেছে তার ফল, এবং মন্দ যা' করেছে তার ফল—দুই ফলের মধ্যবর্তী আমার অনাগত জীবন মো-টানার দ্বন্দ্ব পড়ে চলবে, চলবে আর চলবে।...

স্বাধীনতার গুণে 'জাতিবির' হবার জমানে পূর্বপ্রয়ের কোন গুণে 'বদ' ...
তবু বারংবার আনতে পারিলি, জানব। কোন দোষে এ ক্ষেত্রে নিত্যকর্ম সীমিত
শক্তি, সীমিত বুদ্ধি, সীমিত সামর্থ্য ও সীমিত বাস্তবতার নিচেও ফেলি, তাও
জানব। আব জানব বলেই সচেতনভাবে আত্মীয় বৈবনটাকে বেতন ...
স্বাধীনতার গন্তাবান হয়। বদে বক্ষে যে-যে দেশে ছিলুম, তাদের আত্মীয় বলে
গভীর প্রেম অনুভব করব। বুঝব, সংসারে যে যেখানে আছে, সেউ আমার
পর নম্র, অনাত্মীয় নম্র। বাস্তবভাবে-ই জীবনেই নিয়ে-আবার ধরে আনি
ছিলুম, আরো অনেকের ধরে আমি থাকব।

ধর্মবোধের এই চেতনায় সে আত্মজাতিকতা—ভারতের পশ্চিম। এই আত্মজাতিকতা গভীরভাবেই অহুতব ও উপনদ্বি করেছিলেন।—সদ্যে সীম জগৎ শু শিবজগৎকে তারা ধ্যানে আনতেন, প্রেম নিতেন, মানবসেবার আনন্দে কৃতজ্ঞদি হতেন। তারার্যের এই বাণী বিশ্বদেশে হতদিন না নগ্নরিত হচ্ছে ততদিন বিখের নুজি নেই। ততদিন যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি—ই কব, অপ্রত্যগের গুস্তাব আনো আর প্রতিভে প্রতিভে মৈত্রীবন্ধনের কথা বলে—হাতের একটুতেই 'হু-হু' বলে চোঁচাবে, পান থেকে চুপ পানলৈই পত্রভাচরণে বজ পদিকর হবে, ভিন্নদেশের সীমানা লঙ্ঘনে প্রিয়বোধে প্রহরীনের বন্দীকরণে, নিরস্ত্রদের হত্য, ধরণে, বহুবান হবে।

বিশ্বান-মূঢ় এই অধমশিক্ষিত ন্যাশ্টিক পুণিবীতে এমনটা বহুকাণ হতে
 থাকবে বলেই প্রেমবাদীদের প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সত্য সত্যই কি
 প্রেমবাদী? নামকরণ জহ, লোকঠকানোর জন্তে 'প্রেম' বলছি বা তো?
 প্রেমের সাধনা সত্যই কি আছে বামার চরিত্রে? আমরা বামনা সমাজ
 এই সাধনা বহন করেই কি ইহলোকে আছি?

মনের মেনে অবগাহন করে গভীরভাবে এটি জানতে চাই। জামস খেনে
যানে, ধান থেকে কর্ষক ত্যাগে পৌঁছতে পারলেই আত্মোপলব্ধি সম্পূর্ণ
হবে। এট হলই বিগত লক্ষ ক্রমের প্রত্যক্ষ ফলের মত উদ্ভাসিত মনে
অন্তর্জ্ঞান।

জ্ঞাতনারে অথবা অজ্ঞাতনারে এই চেতনার পথে আমরা নবাই যাচ্ছি।
 কেউ জড়, কেউ মনুষ্যগতি। কিন্তু যাচ্ছি। [অবশ্য:]

দেশে-বিদেশে

চারু দত্ত

বুদ্ধ দার্শনিক রাসেল ও ভারতবর্ষ

একনবতিতম বৎসরে উপনীত দার্শনিক লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ “আনআর্মড্ ভিক্টরী”। বইটির ছাটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে : “সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন পেঙ্গুইন-কর্ডপক্ষ, শোভন সংস্করণটি প্রকাশ করেছেন জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন (লণ্ডন)।

এই গ্রন্থে রাসেল চীন-ভারত সংঘর্ষের আলোচনা করে চীনকে নির্দোষ বলেছেন। ভারত সরকার এই বই বাজেয়াপ্ত করেন নি। কিন্তু ভারতের প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সংস্থার সম্পাদক শ্রীমীর চান্দানী এক সাক্ষাৎকারে এই গ্রন্থ বয়কট করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সংস্থার সভাপতি শ্রীমধীরচন্দ্র সরকার এই নির্দেশ অগণতান্ত্রিক বলে এর বিরোধিতা করেছেন।

ভারতে বইয়ের বাজার : আন্দোলন যুগে ?

এপ্রিল মাসে পেঙ্গুইন বুকস্ লিমিটেডের সেলস্-ম্যানেজার মিঃ সি ডোল্লী ব্যবসায়িক কারণে ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন। এক প্রমোক্তরে তিনি জানান যে গত তিন বছরে পেঙ্গুইন বইয়ের চাহিদা ভারতে দ্বিগুণ হয়েছে, এবং উপস্থান নয়, ভারতের চাহিদা হলো পেঙ্গুইন-প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানের বই। মিঃ ডোল্লীর মতে এই চাহিদার মূলে আছে ভারতের কর্মবর্ধমান ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা। অনেক সময় রেকর্ডে বই হিসাবে পেঙ্গুইন বই উচ্চশ্রেণীতে পাঠ্যও হচ্ছে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে পেঙ্গুইন রেকর্ডে বই প্রভৃতি প্রকাশ করবে। শীঘ্রই ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ দুখণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে, একটি ইংরেজি অভিধান, তিনখণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া, এবং অনেক সংখ্যক বিজ্ঞানভিত্তিক উপগ্রন্থ ও সেইসঙ্গে বিদেশীদের জন্ম ইংরেজী শিক্ষার বইও তাঁরা প্রকাশ করছেন। তিনি বলেন যে প্রতিদিন একখানা করে নতুন বই আর দুখানি করে পুনর্মুদ্রণ—এইভাবে পেঙ্গুইনের কাজ চলেছে। পঞ্চাশ হাজারের কম কোনো বইয়ের মুদ্রণ হয় না। ১৯৬০ সনে ১ কোটি ৭০ লক্ষ সংখ্যক বই বিক্রি হয়েছে।

একজন বড় ইংরেজ নব খেতাব পেয়ে ফেলেছে। অসমের 'জেনারেল' জাটাবার 'সেকেন্ড' উপাধি—এ পাখি কণি। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে পেদুইন মোখা বলেছে এ নব এ জাটার পাউণ্ডের উপর। এ পর্যন্ত ৭২০০ খানা বই পেদুইন প্রকাশ করেছে এ বই কোটি বই বিক্রি হয়েছে। এক প্রকার উদয়ে গি: ভোল: থানি, ভারতে কাগজ, মুদ্রণ ও গ্রন্থন ব্যবস্থা এখনো প্রাচীন যুগে, তাই মতো বই ছাপতে ভারতে সমর্থ নয়। তিনি আশা করেন যে আগামী পাঁচ বছরে থেটাইনটেন ও ইন্স 'ইন্স' স্ট্রিটস-এর পড়েই ভারতবর্ষ হবে পেদুইনের নববৃহৎ বাজার।

(বই :

দল ট্রাটির খুজু

ভারত প্রদর্শন করেছিলেন, ভারতের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক যোগ দেখেছিলেন, ভারতের রাষ্ট্রনীতি আন্দোলনের সমর্থক, অসমিত দেশের নিমিত্ত সমস্ত ও প্রাক্তন মন্ত্রী ভাস্করবাবু জন ট্রাটি ৩১ বৎসর বয়সে গত ১৯ই জুন বিলেতে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে স্মারকভিত্তিক কয়েক বিশেষ উল্লেখযোগ্য The End of Empire বইটি। তাঁর প্রচলিত বই Theory and Practice of Socialism, Coming Struggle for Power. তাঁর মৃত্যুতে ভারত হারান তাঁর এক সার্থককে, ইংরেজি ভাষা হারান এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ-লেখককে। সমগ্র 'The End of Empire' বইটি নগাঁওয়ের জাণাল বুক ট্রাষ্ট স্কলত সংস্করণে প্রকাশ করেছেন। বইটি ভারতীয়মাত্রেরই চমৎকার।

সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর কল্যাণপাধ্যায়ের মৃত্যু

পবিত্র বয়সে সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর কল্যাণপাধ্যায় মিলুটার মহেশ্বর করেছেন। সঙ্গীতজগতে তাঁর সঙ্গে একটি যুগের অবসান হলো। সঙ্গীতের ব্যবহারে ও উপপদ্ধিতে তাঁর সমান জ্ঞান ও দক্ষতা ছিল, না অংশ বিবরণ। প্রদর্শনীর বিপুল গণনা গোপেশ্বর খোজাল, টপ্পা, প্রবন্ধি সবই সাহসেন। তাঁর ধারণা হুগু প্রদর্শন-চর্চায় অবহেলার করেই অধর। প্রদর্শনীর অধিকার হয়েছে। গোপেশ্বরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি দুইখণ্ডে প্রকাশিত 'সঙ্গীতচর্চিকা'। এটি বৃহৎ সংকলনে বিগত দশচরিত্রের বহু তাঁর বহু দিকের বর্ণনাদি প্রসিদ্ধ হয়েছে। এছাড়া অগ্রসর রাষ্ট্রপ্রদর্শন কল্যাণপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত চর্চিকা' সম্পাদনা গোপেশ্বরের অত্যন্ত কীর্তি। 'বহুভাষাগীত' গ্রন্থে গোপেশ্বরের নানা প্রদর্শনীর বর্ণনাদি প্রণয়ন করেছেন। গোপেশ্বর কল্যাণপাধ্যায় মিলুটার মহেশ্বর সঙ্গীতনায়ক।

মার্কিন দেশে-এশীয় লোকশ্রুতি-গবেষণা

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে মার্কিন দেশের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নোমাইটি ফর এশিয়ান কোকলোর' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এই সংস্থার কার্যকরী সমিতিতে ভারত থেকে যে চারজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছেন, 'সাহিত্যের খবর'এর লেখক সুপরিচিত অধ্যাপক "লোকসাহিত্য"-প্রণেতা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। ভারতের বাকি তিন প্রতিনিধি হলেন—ডঃ কৃষ্ণদেব উপাধ্যায় (এলাহাবাদ), ডঃ কুঞ্জবিহারী দাস (উড়িষ্যা), ডঃ বিরিকি কুমার বড়ুয়া (গৌহাটি)।

এই সমিতিতে ভারতবর্ষ ব্যতীত জাপান, কোরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আছেন। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোকলোর বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ রিচার্ড ডসন এই সমিতির সভাপতি। এশীয় লোকশ্রুতি-গবেষণা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

পঃ বঙ্গ লোক সংস্কৃতি পরিষদ : নব অন্তঃসন্ধান-কেন্দ্র

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমপ্রান্তে মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ঝিলিমিলি-তে পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি পরিষদের একটি নোতুন অন্তঃসন্ধান-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় সমাজকল্যাণমূলক কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীশচীনন্দন মহান্তী পরিষদকে দশ বিঘা ভূমি বিনা মূল্যে দান করেছেন। এই জমির উপর আবশ্যকীয় গৃহাদি নির্মাণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে শীঘ্রই অন্তঃসন্ধান ও গবেষণার কাজ আরম্ভ হবে। এই বিষয়ে ধারা উৎসাহী, তাঁরা পরিষদের সভাপতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে (বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) যোগাযোগ করতে পারেন।

নাট্য-প্রযোজনা ও রচনার পুরস্কার

সঙ্গীত নাটক আকাদেমি বাংলায় নাট্য-প্রযোজনা ও নাট্যরচনার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এই পুরস্কারের প্রতিটির সম্মান-মূল্য তিন হাজার টাকা। শ্রীউৎপল দত্ত রচিত 'ফেরারী কোঁজ' ও শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার-রচিত ছোটদের নাটক 'বকবধপালা' শ্রেষ্ঠ বাংলা নাটক বলে বিবেচিত হয়েছে। নাট্যপ্রযোজনায় পুরস্কার পেয়েছেন রূপকার গোষ্ঠী। তাঁরা রসরাজ অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'ব্যাপিকাবিদায়'-এর প্রযোজক। শ্রীসবিতারত দত্ত এর পরিচালক। মণিমেলা মহাকেন্দ্র-প্রযোজিত ছোটদের নাটক 'অরুণ বরণ

কিরণমালা' এই পুরস্কার লাভ করেছে। এর রচয়িতা ও নিবন্ধক ক্রীশ্ণলেন ঘোষ।

পরলোকে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় প্রবীণ সাহিত্যদেবী মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। আজ থেকে পঁচিশ-তিনিশ বৎসর আগে বাংলার সাহিত্যপত্র তাঁর লেখন্য সন্মুখ হতো। ১৮৮৬ সালের ১২ই আগষ্ট চব্বিশ পরণবার মণিখালি-কুব্বনগর গ্রামে তাঁর জন্ম। আঠারো বৎসর বয়সে সাহিত্যরচনা শুরু করেন। কিছুকাল 'নাট্যমন্দির' সম্পাদনা করেছিলেন। জীবনের শেষভাগে বারানসী-প্রবাসী হয়েছিলেন। তাঁর শেষ জন্মভূমি কলকাতায় কিরে আসেন, পাঁচদিন রাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মন্দিরাঙ্গের সর্বাঙ্গের জনপ্রিয় উপন্যাস 'স্বয়ংসিকা', এর চিত্ররূপ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর উপন্যাস—স্বয়ংসিকা, অপরাজিতা, রাগিণী, কতাপীঠ, অদৃষ্ট ইতিহাস, জাগ্রতা ভগবতী, হুংথের পাঁচালী। নাটক—সুখারী সংঘ, বাদীরাও অহল্যাবাহি, মহামানব বাহুদেব। শেষজীবনে মহাভারতের সংক্ষিপ্তসার লিখছিলেন। তা সম্পূর্ণ হবার পূর্ব মুহূর্তে মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

অচিন্ত্যকুমার-সংবর্ধনা

গত ১৮ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস প্রখ্যাত সাহিত্যিক ক্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে দেশের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে অশোককুমার ও গরদের জোড় উপহার দেওয়া হয়। এই অলুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জনপ্রিয় কথাসিঙ্গী ক্রীচাকচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাদ্দ)। তিনি অচিন্ত্যকুমারকে কল্লোলগোষ্ঠীর প্রথম মারির লেখক বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রতিভাবে ক্রীসেনগুপ্ত বলেন, এই সংবর্ধনা সাহিত্যিক-বো-মহ, সাহিত্যিকে। তিনি বলেন, জাতীয় সংকটলগ্নে সাহিত্যিকের লেখনী আবরণ-রূপে ব্যবহৃত হবে। চৈনিক আগমনে বিরুদ্ধে লেখকরা আজ প্রতিরোধ-উজ্জ্বল বলে তিনি মনে করেন। ক্রীসেনগুপ্তকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সমর সেনের কবিতা

রঞ্জিত সিংহ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা চিরদিনই কিছুটা স্বতঃবিরোধী এবং বিপ্রলাপিত। বেশী লেখার ফলশ্রুতি কিনা জানি না, গগনচন্দের অভিপ্রায় সম্পর্কে তাঁর বিচ্ছিন্ন মন্তব্যগুলোর সামঞ্জস্য খোঁজা বিড়ম্বনা। অবশ্য মনোযোগী পাঠক বুঝবেন যে গগনচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ-ও মর্মে মর্মে অহুভব করেছিলেন—গগন ও পত্নের প্রকৃতিগত ভেদাভেদ যৎসামান্য। আসলে ভালো কবিতার ভালো গগনের লক্ষণাদি সর্বদা উপস্থিত থাকে। ফলত অমিত্রাক্ষর চন্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গগনচন্দের আদি উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন। যে-প্রবাহমানতার উদ্দেশ্য সাধনে অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি তাতে আমাদের কখনরীতি তথা ভালো গগনের লক্ষণ মর্যাদাবান। পরবর্তীকালে গগন-পত্নের এই বর্ণাশ্রম ঘোচানোর জন্মেই কবিরা গগনচন্দের আবশ্যিকতা অহুভব করেছিলেন। বস্তুত, অমিত্রাক্ষর চন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ববেক্ষণ অসাধারণ। এই পূর্ববেক্ষণের মধ্যে গগনচন্দ্র সম্পর্কে যে-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাঁর রচনায় অহুভব থেকে গিয়েছে, এলিয়টের তৎসম্পর্কিত প্রতিপাত্তে সেই অহুভব বিষয়েরই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। চন্দ্র তথা প্রাকরণিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্মেই গগনচন্দের উদ্ভব ঘটে নি। বরং গগনের পরিমাণবোধ, বাক্যগঠনরীতিকে কবিতার অন্তর্নিহিত ছান্দনিক রূপকল্পের আত্মীয় করে নেওয়ার মধ্যেই গগনচন্দের মৌল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। বহুকালপূর্বে 'Lyrical Ballads'-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে গ্রে'র একটি কবিতা উদ্ধৃত করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেইসব পংক্তির প্রশংসা করেন দাঁড়ে গগন ও পত্ন একই পংক্তিভোজনে রসার অধিকার পেয়েছিল। উপরন্তু, 'I fruitless mourn to him that cannot hear'-পংক্তিতে 'fruitless' শব্দপ্রয়োগে গগনের গঠনপদ্ধতি যে-সম্মানিত হয় নি তাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর মতে চন্দ্র বাদ দিলে ভালো কবিতা ও ভালো গগে পাণ্ডক্য অভ্যঙ্গ। এ বিশ্বাস-ও তাঁর মনে দৃঢ়মূল ছিল যে সেইসব কবিতাই আমাদের স্মরণে স্থান পায় যাতে ভালো গগনের সমস্ত লক্ষণ বর্তমান। পক্ষান্তরে গগনচন্দের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই বোধকরি গগনচন্দের আশ্রয় স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন গ্রহণ করেন নি। এবং গগনকবিতা

রচনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজে খুব কৃতিত্ব দর্শাতে না পারলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন এই তিনজন কবির গল্পবিতার তুলনামূলক বিচারে নেমে সমর সেনের কবিতা ‘ট্যাকসই’ হবে বলে তিনি তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন। অধিকন্তু, সমর সেনের গল্পকবিতা ছইটম্যান বা নরসম্মার্গী নয়, তা যে পাউণ্ড-পদ্বী—বিদ্ দে’র এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের মধ্যেও গল্পছন্দের অন্তর্গত পরিমিতিবোধ ও কথাছন্দের প্রতি আগ্রহের কথাই নিহিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পকবিতার নমুনা বিশ্লেষণ করলেই গল্পছন্দের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

“ছেলেটার বয়স হবে বছর-দশেক,

পরের ঘরে মালুষ,

যেমন ভাঙ্গা বেড়ার ধারে আপাছা—

আছে আলোক বাতাস ঝুটি

পোকামাকড় ধুলোবালি—

কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে

কখনো মাড়িয়ে দেয় গরুতে,

তবু মরতে চায় না, শক্ত হ’য়ে ওঠে,

ডাঁটা হয় ঘোটা,

পাতা হয় চিকন সবুজ।”

এই কাব্যংশের প্রতিটি পংক্তিতে গল্পের বাক্যগঠনপদ্ধতি বিপর্যস্ত। ‘যেমন ভাঙ্গা বেড়ার’ থেকে এই শব্দের শেষ পংক্তি পর্যন্ত নিকট গল্পের ভাষায় লেখা হয়েছে। ‘যেমন’ এই শব্দের দ্বারা ছেলেটির নিকটপায় জীবনের সঙ্গে অযত্ন-লালিত প্রকৃতির নাদৃশ্য টানা হয়েছে বটে কিন্তু যে-কাব্যশরীরের মধ্যস্থতা কবি মেনেছেন তাতে গল্পছন্দের উদ্দেশ্য ব্যাহত হ’য়ে গিয়েছে। ‘তবু’—এই প্রাতিপক্ষিক অব্যয় যে কার্য-কারণকে যুক্ত করেছে তার গল্পধর্মী চাল অল্পপছিত। ক্রিয়াপদকে মধ্যবর্তী ক’রে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ গল্পছন্দ গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রমাণে ব্যর্থতা দেখিয়েছেন। ধনুত ভালো গল্পছন্দের কবিতাতেও ছান্দসিক রূপকল্প (musical-pattern) থাকবে এবং তার সঙ্গে মধীকরণ ঘটবে ভালো গল্পের সমস্ত লক্ষণ। ‘আলোচ্য’ শব্দকে গল্প ও গল্পের নিবিরোধ ত ঘটবে—ই নি, তেল ও জলের মত গল্প ও গল্প বিচ্ছিন্ন হ’য়ে পড়ে আছে। আমলে নৈরাশ্র্যপদ্বী কবি ব্যতিরেকে গল্পছন্দে তথা গল্প-গল্পের নিবিরোধে কৃতিত্ব দর্শানো কঠিন। গল্প-গল্পের বর্ণাশ্রম ঘোচাতে গিয়ে এই কারণেই ওয়ার্ডগুণার্থ,

তাঁর ছন্দপ্রধান কবিতাতে, নিরুপ্ত গানের সমস্ত লক্ষণ এনে হাজির করেছিলেন।
 ছইটম্যানের নিঃশ্বাস-নিরোধক দীর্ঘ কাব্যপংক্তির মধ্যে আর যে উদ্দেশ্যই
 সকল হোক না কেন, কথ্যছন্দ বা গল্প-গানের সমীকরণ শতহস্তের দূরে পড়ে
 রয়েছে। গল্পছন্দ লিরিক কবির হাতে হয় নিরুপ্ত গানের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে,
 আর তা না হলে অসংবদ্ধ আবেগের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায়। একটি সাধারণ
 লক্ষণ আছে যা এই মন্তব্যকে সমর্থন করবে। রবীন্দ্রনাথ ও ছইটম্যানের
 অধিকাংশ গল্পকবিতা অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ। মনে হয় যেন গল্পছন্দের এই
 আপাত ছন্দোমুক্তি তাঁদের কাছে আবেগে অবগাহনের উপায়-মাত্র হয়ে
 দাঁড়িয়েছিল। ‘শিশুতীর্থ’ কবিতার অনেক গুরুত্ব থাকলেও যে-কারণে
 এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় হবেন না তা হচ্ছে এতে নাট্যগুণের একান্ত
 অভাব। পুনরায় এলিয়ট কথিত ‘Objective co-relative’ ও ‘Unified
 sensibility’-র কতখানি মূল্য তা মনেপ্রাণে বুঝি। অর্থাৎ যে-বিবরাহের অল্প-
 তুলিত সামগ্রিকতার পারবস্ত্রে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যায় গল্পছন্দের তথাকথিত
 স্ফুটনময়তার অবশ্যে তা বিশেষভাবে নাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ ছইটম্যানের
 মত অভ্যাসি অসমর্থ কবি ছিলেন না বলেই ‘সাধারণ মেরে’ বা ‘ক্যামেলিয়া’-র
 মত কবিতা তাঁকে লিখতে হয়েছিল। বুঝেছিলেন, তাঁর মানসিকগঠন যে-
 যাতের, তাতে তাঁর পক্ষে আখ্যানমূলক গল্পকবিতা লেখা অনেকখানি নিষাপদ।
 কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথের কবিত্যাত্তি কিয়দংশে নিরাপত্তালাভ করলেও দেখালে
 আখ্যানমূলক কবিতা ভালো কবিতার একাধানে বনার অধিকার পায় না তাই
 এগুলিকে রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট গল্পকবিতার দৃষ্টান্ত কেউ বলবেন না। আসলে
 যে-নাট্যগুণদর্শী কবিরা লিখে আসে ইউরোপে এলিয়টের একচ্ছত্র প্রভাব তার
 প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কথোপকথনের ভঙ্গীর পুনরুদ্ধার ও তাকে পরিণতিদান।
 করণ ইংরেজী সাহিত্যে বেক্সপীরের নাম বাদ দিলেও ড্যান্স, ড্রাইডেন,
 ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ট্রাউনিং, হপকিন্স ও এজরা পাউণ্ড পর্যন্ত একটি সূদীর্ঘ ঐতিহ্যব
 মন্ডান মেনে থাকা প্রভোকেই স্বভাবভাবে গল্পগানের নির্বিরোধ তথা কবিতায়
 কথোপকথনের ভঙ্গীর উপযুক্ততা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। জীবনের চতুর্দিকের
 বিচ্ছিন্ন নানা ঘটনার উল্লেখ এবং তৎজনিত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক নানা প্রতিক্রিয়া
 সংকবির পর্যবেক্ষণের মধ্যে স্থান পেয়ে কারো একটি অবিমিশ্র রূপপরিগ্রহ করে।
 কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখি, যেখানে তিনি ঘটনার আশ্রয় নেবেন বলে ঠিক
 করেছিলেন সেখানে তাঁর কবিতা আখ্যানধর্মী আর যেখানে কবিতাকে পর্যবেক্ষণ
 প্রধান বা বিবরাহশ্রয়ী করবেন ভেবেছিলেন সেখানে তা আবেগধর্মী হয়ে

দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আখ্যানের অন্তর্নিহিত নাট্যওয়ের সঙ্গে কবির সংযোগ
যদি একাত্মগোচর করতে পারত তবে তাতে তাঁর গদ্যকবিতা কবিতামরতার
হাত থেকে অব্যাহতি লাভ পেতই, নাট্যওয়ের অভ্যর্থনা কথোপকথনের অন্তরঙ্গতা
গদ্য-পদের সমীক্ষণ-প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক করতে।

অসিদ্ধ সংকলনের কবিতা পূর্বসূরীর সাফল্য-বৈফল্যের প্রত্যক্ষ ফল।
সমর সেন অদেখী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসু'র বৈফল্য
এবং বিফল দে'র 'টম্বা-টুংরী' কবিতার সাফল্য অদেখী রেখেছিলেন। এ দুটি
ছোট্টগানের বিফলতার সাদে যেমন তাঁর পরিচয় ছিল, পাউণ্ড-প্রদীপের
কুচিস্থেও তিনি নিশ্চয়ই সজাগ ছিলেন। ফলত রবীন্দ্রনাথের বাণী ছিল
অথচ সাধো কল্যাণ নি তাই যখন তিনি সমর সেনের মধ্যে দেখলেন তখন এই
অল্প কথটির প্রতি মহাকবির প্রাণসাবাক্য বত-স্বর্জিতাই উজ্জ্বল
হয়েছিল। তাই সমর সেন গদ্যছন্দে কবিতা লিখেও অন্যদিকের চেষ্টা
দিকে কোনোদিন তিনি যোঁকেন নি। গদ্যকবিতার আবাসিকতা এ-কারণে
সেই কথোপকথনের ভঙ্গীয় প্রতি তিনি সর্বাঙ্গ সজাগ ছিলেন। উপাস্ত,
গদ্যছন্দে লিখেও রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা বুদ্ধদেব বসু'র কবিতার
অভিপ্রেরিত গুণাবলী অর্শ্য'নি, আগাগোড়া অক্ষবর'ও লিখে স্থগীতনা। সন্তো
'সংবর্ত' ও 'সংবর্তি' কাব্যদ্বয় সেইসব গুণেরই সাফল্যের উদাহরণ।
রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিসেবে সমর সেন এ বিষয়ে যে যথেষ্ট সন্তো ছিলেন
তার প্রমাণ নিম্নোক্ত কাব্যংশ।—

“যদি বা পাঠালে পৃথিবীতে
তবে কেন দিলে এত ব্যর্থতা ঠাকুর !
শুনেছি পঞ্জিকা বতে
শুভক্ষণে জন্ম অভাগার,
সে লগ্নে গৃধ্রিনী যুখে বাজে নি অশুভ চিৎকার,
কিংবা অদৃষ্টের বাজে,
অতিশূর্ত কাক সহসা কর্কশ ডাকে
ভান্দেনিকো জননীর প্রসব আবেশ !
সপ্তম সন্তান আমি
কিছু সন্তানের জন্ম'সার সর্বনাশ
সমার্থক ভখনো হয় নি।

আমাদের বংশে

গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম শহরে আসেন।

রক্তে তার কিছু ছিল পদ্মার উদ্দাম বেগ,

সাক্ষী তার ষোড়শ সন্তান!

গুজব আছে যে গৃহত্যাগ কালে

দেবী তাঁকে স্বপ্নে বর দেন,

হৃদে ভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।”

অবশ্য আলোচ্য কাব্যংশে ক্রিয়াপদের কয়েকটি ক্রটিপূর্ণ ব্যবহার যে চোখে পড়ে না তা নয়। “শুভক্ষণে ‘জন্ম’ অভাগার”—এখানে ‘জন্ম’ শব্দটি ‘অভাগার’ পরবর্তী হ’লে আমাদের ক্রটি আরো তৃপ্তিবোধ করত। অথবা আমাদের কান আরো উৎসাহিত হত যদি তিনি বলতেন “রক্তে তার কিছু পদ্মার উদ্দাম বেগ ‘ছিল’।” এইসব ছোটখাটো ক্রটিবিচ্যুতি বাদ দিলে এই কবিতার স্বরসঙ্গতি লক্ষ্য করবার যত। এখানে ঘটনা এসেছে আখ্যান ফাঁদানোর তাগিদে নয়, নাট্যগুণকে মর্যাদা দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে ঘটনার বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে কবির মানসিক প্রতিক্রিয়া স্থান পেয়েছে। এবং এরই ফলে এখানে কথ্যচ্ছন্দ বহুগুণে সমৃদ্ধ। অন্নদামঙ্গলের দেবীর বিখ্যাত স্বপ্নবাণী ও তৎজনিত কবির ব্যঙ্গপ্রভব প্রতিক্রিয়ায় নিরস সামাজিক সমস্যা রসস্থ হ’তে পেরেছে। আবার বাংলা-কবিতার তথাকথিত বিকলাঙ্গ ভাষাকে রক্ষা ক’রেই আমাদের বাচনিক পদ্ধতিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আলোচ্য কবিতারই নিম্নোক্ত অংশে।—

“অনেক ফিরেছি ধনীর পিছনে,

দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।

বড়লোকে আস্থা নেই আর

দেখেছি দেশের দুর্ভোগে

কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়দত্তকরে।”

এখানে মুকুলরায়ের উজ্জলচরিত্র ভাঁড়দত্তকে হৃদয়ভাবে কাজে লাগিয়েছেন সমর সেন। ‘দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে’—যদিও এই ভাষা আমাদের বাচনিক-পদ্ধতির মধ্যে নেই, এ একান্তভাবেই কবিতার ভাষা তবু এখানে কবিতা ক’রেই জীবনকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্য থাকার আমাদের কখনভঙ্গীর চং সম্পূর্ণ রক্ষা পেয়েছে। সমর সেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যবর্তী কবি। অর্থাৎ ‘বিষ্ণু দে’র অনেক কাব্যকৌশলকে যেমন একদিকে তিনি পরিণতি দিয়েছিলেন তেমনি সমর সেনের যে সব ভঙ্গী অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে গিয়েছে অথবা যার

মধ্যে আরও সম্ভাবনার ইঙ্গিত নির্ভিত ছিল স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ে 'ম' পূর্বতা পেয়েছে। বসন্ত স্থানবর্ণনা (Local Colour) সম্পর্কে সুবীজনাথের এইচ-৩ বিষ্ণু দে অনেক বেশী সচেতন ছিলেন। যখন সময় সেনের কবিতার 'নাগরিকতা' আজকালকার কবিতাপাঠকের প্রায় মুখে মুখে যেতে গিয়ে নাগরিকতার সূচনা বিষ্ণু দে'র মধ্যে। ব্যঙ্গ, ঘৃণা, বক্রোক্তি'র রস বিষ্ণু দে'র 'গার্হস্থ্যশ্রম', 'নির্ঝর'ের স্বপ্নভঙ্গ', '১৯৩৭' কবিতায় কণ্যচ্ছন্দে যে মর্মানকে মর্মান দিগেছিল, উপরন্তু 'চোরাবাগি' কাব্যগ্রন্থের গদ্যকবিতা 'টোলা-ঠুংঠুং'তে গদ্য-পদ্যের নির্বিঘ্নে যেভাবে সংঘটিত হয়েছে তাতে সময় সেনের কবিতার পূর্বাভাস স্পষ্ট। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'পংক্তি' সমসাময়িক ঘটনার গুণপোষক হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়ে দে-ব্যঙ্গার্থের নির্দেশ দিয়েছে বিষ্ণু দে'র কবিতায়, সেইপথে এগিয়ে এসে সময় সেন চণ্ডীদাসের গদ্য কবিতাও ব্যবহার করতে এতটুকু বিচলিতবোধ করেন নি।

“শোনো গণিকার গান হাওরায় ওঠে ;

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা

কী কীরে আগবে বাট

মূদবার্ণিনে ধূয়া ভিত্তিছে

বেতার শুনে পরান দাটে।”

এ ধরনের কলাকৌশল ছাড়াও আমাদের মত প্রবাদ প্রবচন যেমন 'বিবি হলে বাম আপনি বাঁচিলে বাপের নাম সেদিন নেই।' কিংবা 'ব্রাহ্ম-বারে পাকস্থানে মই দিল, চোখ বেঁধে আজ ভবের খেলায় তাঁসা'—এই ধরনের পংক্তি ব্যবহার ক'রে কবিতায় কথোপকথনের ভঙ্গীর যেমন উন্নতি সাধিত হয়েছে—তেমনি 'শোচ্-কিঙ্গিয়ে, আংরেজ তো বানেশয়ানো'—এই ধরনের হিন্দী বাক্যবদ্ধ ও বা আমাদের কথোপকথনের মধ্যে অনবরত প্রবেশাধিকার পায় তারও পূর্বসূরীরা। প্রয়োগ আছে সময় সেনে। বীরা স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন সময় সেনের এই সব-কিছু কিছু ভঙ্গীর মধ্যে আবার মতোস মুখোপাধ্যায়ের পূর্বাভাস র'য়ে গিয়েছে।

সময় সেন তিরিশের যুগের অত্যন্ত শক্তিশালী কবি হ'লেও অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীন। গদ্যছন্দে প্রকরণগত বৈচিত্র্য মতটুকু আনা সম্ভব সময় সেন তার চর্চার আলস্ত দেখান নি। আমাদের বহু প্রবাদপ্রবচন ও বাচনিক বৈশিষ্ট্যকে কবিতায় তিনি যেমন কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন—সুধীতনো-বিষ্ণুদে'স্তো তা দুর্লভ। অবশ্য গদ্যছন্দের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা সময় সেনে

এইসব প্রকরণগত সিদ্ধির ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করে নি—তা বলা উচিত হবে না। আবার গতছন্দ ছাড়া অন্তর্হদে না লেখার দরুণ তাঁর কবিতায় যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিয়েছে তাকে স্বীকার না করেও পাঠকের উদ্যম নেই। বিষয় ও বিষয়ীর যোগফল যেহেতু ভালো কবিতার অন্তর্গত হওয়া উচিত তাই বিষয়ের পরিবর্তন বিনা বিষয়ীর বৈচিত্র্য অসম্ভব থেকে যায়। পরিণত কবি হ'লেই সময় সেন সাহিত্যের অঙ্গরে প্রবেশ করেছিলেন; তাই তাঁর কাব্যধারা পরিণতির মুখোপেক্ষী ছিল না। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬—তাঁর এই কাব্যকালে কোনোরকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি অগ্রসর হন নি। ফলত এখন তিনি প্রায় রুদ্ধলেখনী। কারণ যে ভঙ্গীতে এ যাবৎ তিনি কাব্যরচনা করেছেন তা যেহেতু পরিণত কাব্যরূপ পেয়েছে তাই সেই ভঙ্গীতে অগ্রসর হওয়া মানেই তাঁর নিজের অতীতের পুনরাবৃত্তি। এ বিষয়ে শ্রবণ্য এলিয়ট সাহেবের উপদেশ। কবিদের ধন ঘন মতিপরিবর্তনকে যেমন তিনি নিন্দেয় চোখে দেখেছিলেন, তেমন একথাও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যে-কাব্যরীতির চর্চায় কবি পার্থক্য জোটার সেই রীতির একটানা পুনরাবৃত্তিতে হিতে বিপরীতের সম্ভাবনাও থেকে যায়। অর্থাৎ পাঠকের সংখ্যা না বেড়ে হ্রাস পেয়েও যেতে পারে। ফলত সময় সেন অত্যন্ত আত্মসচেতন কবি বলেই এখন আর লেখেন না এবং স্থানীয় বজায় রাখতে এই সংযম নিশ্চরই তাঁকে সাহায্য করবে।*

যেমন বিষয় দে'র ভেতন দৈবগুণের ও উত্তরসূরী সময় সেন। যে কাব্যগুণের অভাব ঈশ্বরগুণের খ্যাতিকে ব্যঙ্গ, শ্লেষ আর সাংবাদিকতার সর্কারী গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করে রেখেছিল সময় সেনে সেইসব গুণ কাব্যের উপাঙ্গ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। আসলে অল্পভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধের পারবশ্তে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এবং তৎসংলগ্ন নানা মানসিক প্রতিক্রিয়াকে পরস্পর সহস্কমুক্ত করতে সময় সেন নমর্থ হয়েছিলেন। উদাহরণত 'স্বর্গ হ'তে বিনায়ু' কবিতা। জানিনা অভিশারোক্তির মত পোনাবে কিনা কিন্তু কবিতাটি পাঠের পর এলিয়টের সেই বিখ্যাত প্রবচনটি-ই মনে পড়ে যেখানে অল্পভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধ বোঝাতে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—রামায় স্বপ্নাণ, শ্বিনোজার দর্শনপাঠ, টাইপরাইটারের হুইচ—এমন সব বিষয় প্রসঙ্গের অখণ্ড রূপরসুতে পরিণতি চিরদিন-ই ভালো কবিতার সামান্য লক্ষণ। সামাজিক রুদ্ধতা, বার্থ প্রেমের দুঃখ, ব্রহ্মজ্ঞির উদ্যম—কবির অল্পভূতির এই সব বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া অশ্রুনাশ হ'তে পেরেছে

* অবশ্য নন্দ্রতি তাঁর দু'একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা পত্র-পত্রিকায় একবার পেতে দেখেছি। কিন্তু সে সব কবিতা না প্রকাশ করলেই বা কবি হিসেবে সময় সেনের দতি কি ছিল?

এই কবিতাতে। বস্তুত সংকবিতা অনুলুপ্তির নানাবিধ দান। তাই কে-
 কবিতায় এই জিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে ‘কানিঘাট ব্রিজের উপরে কখন’ কি-
 শুনতে পাও লম্পটের পদধ্বনি’ অথবা যেখানে সেইনব লুন্ড ঘাসহারী চিত্তে
 কণা বলা হয়েছে যারা ছুটেছে ‘দশটাকায় কেনা কয়েক প্রহরের’ উর্বরীর
 আকর্ষণে, সেই কবিতার প্রথম পদনিকা গুঠে শৃঙ্গার বেদনার মধ্যে “বাব নীল
 চোখে এখনো মনুজের গভীরতা কাঁপে”। আসলে মালুহে: অনুলুপ্তির যেকোনো
 অবিস্মিত রূপ থাকে না তাই সংকবিতা বিশাখুলুপ্তির ঘটনা ঘটন। ‘মৃত্যু’
 কবিতায় শৃঙ্গুরের বনি ও গাতালের অনিভ সীংকার নাগরিক জীবনের কে-
 যানিকে ডেকে আনে, যে-অগাধ ক্লাস্তির চাপে চীনে গণিকা বিকশার হৃদে
 চোখ বোজে—সেই যাবমান নাগরিক জীবনের ক্লাস্তির গতির মধ্যেই বেন-
 মহনা হৃদগের বিধাম “তুমি আজ কি আসবে? নীল নীল চোখে শরীরের
 শেষহীন প্রশ্ন।” বর্তমান জীবনের যেটা প্রধান বিষয় তা হচ্ছে মোহ মনোহ
 মোহভঙ্গ। যে-শৃঙ্গারের অমোঘ আকর্ষণে নারীকে অতিশ্রুত মনে হয় সেই
 শৃঙ্গার আমাদের শুধু দেহসন্তোগের যন্ত্রণাকেই ফিরিয়ে দেয়। তাই আলোচ্য
 জিজ্ঞাসার পর পক্ষমগ্নভিত্তে এসে দেখি এই মোহ ও মোহভঙ্গভিত্তি ওভ-
 নাস্তিকতার বিষাদ কবির একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে। “বিদে প্রেম
 মৃত্যুহীন, তাছাড়া একমঙ্গে রাতে শোবার তুর্লভ স্থলংগ।” মানসিকতার
 আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে এই পংক্তির প্রকরণগত সৌম্য। “বিদে
 প্রেম মৃত্যুহীন”—এই উক্তির মধ্যে যে অভিরঙনের আভাস আছে, পনের
 বাক্যাংশে রাতে একমঙ্গে শোবার অত্যন্ত স্থল দেহজ বাসনার অভিযান্ত্রিক নিয়ে
 এই পংক্তির স্বরসঙ্গতি বা ভারসাম্য বক্ষায় রাখা হয়েছে। ফলে বিদে প্রেম
 মৃত্যুহীন—এই উল্লেখ বড়ো কথার শূন্যগর্ততা কেটে গিয়ে বক্রোক্তির চীৎসা
 তাতে জনা হয়েছে। দীর্ঘ কবিতায় ক্লাস্তিময়তা হরণের জন্তে এই বিশেষ
 প্রাকরণিক কৌশলটি আরও আনার উপদেশ দিয়েছিলেন এলিয়ট। বড় কথাকে
 হালকা কথা দিয়ে, বড় কথা হালকা চাপে বলে কিংবা হালকা কথা গভীরতাসার বলে
 কবিতার নাট্যগুণ বহুপরিমাণে বাড়ানো যায়। তাই ঈশ্বরগুপ্তের কাছে বাফ
 প্রধান লক্ষ্যবস্তু হ’লো শুধু দে বা মনর মেনে তা উপলক্ষ্যমাত্র।

এবং যেহেতু চিত্রকল্প রূপদী বাথার্থের দান তাই চিত্রকল্পে সময়-সেনের শিকি
 স্বভাবমন্দত। যে-নাগরিক জীবনের উপক্রতিভে বর্তমান জীবনের বিরোধাত্ত
 পক্ষমাংকের সমাধান ঘটে তারি মোহ এবং মোহভঙ্গে আয়না সর্বদা মুক্ত
 বিচলিত—অনুলুপ্তির এই নানাবিধ নিমোনিষিদ্ধ চিত্রকল্পটি দানো দেখেছে।

“খনায়মান অন্ধকারে

করণ আর্তনাদে আমাদের সহসা অতিক্রম করল

দীর্ঘ, দ্রুতবান

বিদ্যুতের মতো

কঠিন আর ভারি চাকা, আম মূখর—

অন্ধকারের মত স্বন্দর

অন্ধকারের মত ভারি।”

নগরজীবনের দ্রুতি ও উপদ্রুতির প্রতীকরূপে সময় সেনের কবিতায় ট্রেন, মোটর ইত্যাদির চিত্র তাই বার বার ফিরে এসেছে। এমন কি উদ্ভিদ প্রকৃতিও, তাঁর কবিতায়, নগরজীবনের ক্রোড়ে মলিন।

“শুভ্রমাঠে কোটরহীন চোখের মত গ্যাসের আলো বোলে।

কার্নিভাল গুরু হল, রেসখেলা শেষ,

কঙ্কালবর্ণ কুয়াশায় দেখে ছেয়েছে নগর।”

নগর জীবনের অভিযান যেন প্রকৃতির মধ্যে প্রেতলোকের বীভৎসতা এনেছে।

আমলে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা যেকালে খানিকটা দিক্‌ভ্রষ্ট সময় সেনের সাফল্য তাই স্বাভাবিক। কারণ পূর্বসূরীর দ্রুতিবিচ্যুতি, উত্তরসূরীর কাব্য-সংস্কারে বিশেষভাবে সাহায্য করে। উপরন্তু, সময় সেনের গদ্যকবিতা হুইটম্যান বা লরেন্সমাগী নয়, পাউণ্ডপন্থী—এই মন্তব্য করে বিষ্ণু দে সময় সেনের পাঠকদের অনেক উপকার করেছিলেন। আগেই বলেছি, সময় সেন পরিণত কবিতা দিয়েই কাব্যলেখা শুরু করেন। স্মৃতির পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়ার তাঁর প্রথম ওঠে নি। উপরন্তু, সারাজীবন একই ছন্দে ও মোটামুটি একই প্রসঙ্গে যেহেতু তিনি কবিতা লিখেছিলেন তাই টুকরো টুকরো অনেক কবিতা লিখলেও মূলত তিনি একটি-ই কবিতা রচনা করেছেন। ‘অন্তত, সিগনেট প্রকাশিত ‘সময় সেনের কবিতা’ (‘যদিও প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর ‘এ বই-এর আর ছাপা হয় নি এবং যদিও এর পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা সময় সেনের অমরগী পাঠক হিসেবে আমরা মনেপ্রাণে অনুভব করি) —এই কাব্যসংগ্রহ পাঠে, আমার বিশ্বাস, আমরা মতো আরো অনেকেই হয়ত উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। এযাবৎ সময় সেনের সমস্ত কবিতায় তাঁর যে-পর্ববেষ্ণ স্থান পেয়েছে তাতে আছে বর্তমান মাহুকের মোহ ও মোহভঙ্গের রূপ। গ্রন্থের শেষ কবিতা ‘জন্মদিনে’র শেষ দুই পংক্তিতে প্রথম কাশীরাঘদাসী পর্যায়ে তিনি যেন সেই অমৃতভূতির অস্তিম ছন্দ টেনেছেন। প্রেম, কাম, মোক্ষ

—সবই একই চৈতন্তের যেন বিভিন্ন ছন্দবেশ—এই অভ্যন্তরীণ বৈকল্যবোধে তাঁর কাব্যসংগ্রহের সমাপ্তি। উল্লেখ্য হচ্ছে, এই কাব্যসংগ্রহের প্রথম কবিতা ‘নিঃশব্দতার ছন্দ’ বিপ্লবের অধীরতা দিয়ে শুরু হয়েছিল। ‘জন্মদিনে’-তে এসে তাঁর যে স্বীকারোক্তি শোনা গেল তাতে ‘ভূনি না আর সবুজের গান’ এবং ‘রোম্যান্টিক ব্যাধি’ আধ রূপান্তরিত হয় না কবিতায়’। এবং সমগ্র সেনের কাব্যজীবনের শেষ ইচ্ছায় মোহভঙ্গের শুভনাত্তিকতা সমস্ত বিরোধী বাগনার মধ্যে যেন একটি সামান্য লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিল। বস্তুত, তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রথমার্ধেই বিয়োগান্ত পরিণামের যে-বীজ উন্মূল ছিল নানা কবিতার নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে এইখানে যেন সেই পরিণামের যবনিকাপতন। সমাপ্তির রসকে ঘনীভূত ও স্থায়ী করার জগেই শেষ পংক্তিঘরের প্রকরণেও বুঝি বা তাই জগে সমমাত্রিক অভ্যাসপ্রাসের এই অনিবার্য উপস্থিতি।—

“যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে।

বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে ॥”

ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

উন্মূলিত মতাকীর বাংলা নীতিকাব্য	৮'০০
রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ	৬'০০
বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ	৩'২৫
রবীন্দ্র-মনীষা	৫'০০
বীরবল ও বাংলা সাহিত্য	৪'০০
রবীন্দ্র-সমীক্ষা	৩'০০
রবীন্দ্র-বিশ্লেষণ	৫'০০
কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা	৬'০০
লেখকের মুখোমুখি	[বহুস্থ]

‘জীবনের অত্যাচার সুরভি’

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

গত শারদীয় পূজার পরে (অক্টোবর ১৯৬২) স্বাধীন ভারতবর্ষ এক নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। চীনা আক্রমণের পটভূমিকাতে ভারতের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে আমাদের মানসজীবন ও চিন্তাক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। এক কথায় আমরা এক নতুন যুগে উপনীত হয়েছি। স্বাধীনতার আশ্বাদন ও তার যোগ্য মূল্যাদান এতদিন কথার কথা ছিল, আজ তা বাস্তবে মূল্য আদায়ে উদ্ভূত। দুই হাজার মাইল দীর্ঘ উত্তর সীমান্ত সম্পর্কে আগামী বছ বছর আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, দেশের উৎপাদন, অর্থসম্পদ ও যুবশক্তির একটা বড়ো-অংশ এই সীমান্তরক্ষায় নিয়োজিত করতেই হবে। বস্তুতঃ পক্ষে চীনা আক্রমণের পর ভারতের জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও হিসাবের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেই সার্বিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সমষ্টিগত উৎসাহ, আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা ও উদ্দীপনা একান্তই প্রয়োজন। রাষ্ট্র-কর্ণধারবৃন্দ সে পথের নির্দেশ দেবেন, তা যথেষ্ট নয়, সেইসঙ্গে দেশের সাহিত্যসেবিতারা কলমকে আয়ুধে পরিণত করবেন, এটাও প্রত্যাশিত।

গত বৎসর দেশান্তরাগের শু ঐক্যভাবের যে উন্মাদনা আনন্দ হিমালয় ভারতবর্ষকে চঞ্চল করেছিল, তার চেউ আজ নেমে গিয়েছে। তবু আগামী বছবৎসর ধরে এই প্রতিজ্ঞা আমাদের পথ দেখাবে, একথাও অবশ্যস্বীকার্য। স্বদেশী আন্দোলনের গান, কবিতা ও নাটক এই উদ্দীপনার সহায়করূপে বিবেচিত হয়েছে এবং পথে সভায় মাঝে বেতারে তার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কবিকুলের কি কিছুই দেবার নেই?

এই প্রশ্নের সার্থক উত্তর পেয়েছি ‘আমার দেশ’ সংকলনে।* সম্ভ্রতি যে ক’টি দেশোদ্ভোধক কবিতাসংকলন বেরিয়েছে, সেগুলির মধ্যে এ’টি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিত্বান্বিত সংকলন।

* আমার দেশ। সম্পাদক—ঈশাবিত্তীপ্রদত্ত চট্টোপাধ্যায় ॥ মূল্য তিন টাকা ॥ প্রকাশক—শ্রীমতী আশা নাইতি ॥ পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমিতি। জনসংযোগ ও সহযোগন উপসমিতি ॥ পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ, কলিকাতা ৬ ॥

এই সংকলনে নবীন-প্রবীণ কবিদের কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিদের

নাম : কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, নজরুল ইসলাম, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, রাধারাণী দেবী, হরপ্রসাদ মিত্র, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিবথায় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাকর মাকি, জগন্নাথ চক্রবর্তী, মৈত্রেয়ী দেবী, গোপাল ভৌমিক, বটকৃষ্ণ দাস, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার ভট্টাচার্য, রাম বসু, সন্তোষকুমার অধিকারী, শান্তশীল দাশ, বনফুল, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মনুথনাথ সাত্তাল, দিনেশ দাশ, বাণী রায়, কমলাকান্ত শর্মা, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, অপরূপক ভট্টাচার্য, মনোজিৎ বসু, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, হাসিরাশি দেবী, চিত্রিতা দেবী, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্র মল্লিক, হুমীশ ঘটক, কৃষ্ণধন দে, অজিত দত্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, শুক্লমুখ বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ

প্রতিরক্ষা বণ্ডে

লগ্নী করার অর্থ

নিরাপত্তার জন্যে লগ্নী

চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, চিত্তরঞ্জন মাইতি, বিভা সরকার, বীরেন্দ্র মল্লিক, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, ক্ষণপ্রভা ভাছড়ী, রণজিৎকুমার সেন, তুর্গাদাস সরকার, উমা দেবী, মণীন্দ্র রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, দীপক গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গনা রায়, অনীতা সেনগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, শোভনা চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন্দ্র মজুমদার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোজ বসু, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অমিত রায়, নিপিকান্ত মজুমদার, তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা ভাছড়ী, কবিতা সিংহ, নিখিলকুমার নন্দী।

এই তালিকা থেকে দেখা যায়, একালের সকল কবি 'মায়ের ডাকে' মিলেছেন। সংকলন-সম্পাদক কবিতাগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যদুচ্ছা সাজালে কোনো ধারণা গড়ে ওঠে না। এই শ্রেণীবিভাসের ফলে একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। বন্দনা, বদেশ, জাগরণ, অতন্ত্র, মীমাস্ত—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত কবিতাগুলি দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা ও মাতৃঅন্তর্যগকে ভাবারূপ দান করেছে।

গ্রন্থচর্চনার রবীন্দ্রনাথের 'ভারতভাগ্যবিধাতা'-রাষ্ট্রসংগীতটি যুক্ত হওয়ায় সংকলনের মর্যাদা বেড়েছে। প্রতিটি অংশের সূচনায় পর পর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম', রবীন্দ্রনাথের 'ভান হাতে তোর খড়গ জলে' গীতাংশ, ক্রীষ্ণবিনোদ বসী, রবীন্দ্রনাথের 'জানি জানি তুমি মম রইবে না আর চক্ষে' কবিতাংশ এবং দেবব্রত বসুর (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) 'গুরু গুরু দূরে ওই রণবাণ্ড বাজিছে' কবিতাংশ মুখপাতরূপে উৎকলিত হয়েছে। তার ফলে প্রতি অংশের তাৎপৰ্য ও কবিতাগুচ্ছের মূল সুরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থশেষে 'শাস্ত্রভাবানী' অংশে বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধী, ক্রীষ্ণবিনোদ ও সুভাষচন্দ্রের সম্মোচিত বাণী সংকলিত হওয়ায় গ্রন্থের আন্তরমূল্য বেড়েছে।

এই ধরনের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ সংকলন প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমিতিতে ও সূর্য সম্পাদনার জন্য শ্রীমাবিত্তীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। প্রতি ঘরে সংগ্রহ করার মতো এই সংকলন নির্বিধায় পাঠকের কাছে উপাধি করছি।

রম্যাপদ চৌধুরী
পিয়াজসন্দ, মে মঃ ৩'০০ ॥
সান্তোষকুমার দেব
বৈঠকী গল্প ২'৫০ ॥

রূপদর্শন
কথায় কথায় ২য় মঃ ৩'০০ ॥
রঞ্জিতকুমার সেনের
দৈত্যসঙ্গীত ৪'০০ ॥

প্রফুল্ল রায়ের

সিন্ধুপারের পাখি

দ্বিতীয় মুদ্রণ
১ম টাকা

সিন্ধুপারের দেশ কথ্যাত আনন্দামান। বিচিত্র এপানকার বাসিন্দারা। নেশার বোরা কপার জন্ত স্বচ্ছন্দ নিজের নটকে তুলে দেয় অপরের হাতে। কপার কথার চলে চাকু। খুন-খারাপি লেগেই আছে। বজ্রিত বৃক্ষ জীবনের রূঢ় পরিবেশের মাঝ থেকেই প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী আধিকার করেছেন এই কথ্যাত ছাপের সুন্দর আদ্যাক। বলিষ্ঠ চিত্রণের এক-অবিস্মরণীয় আপেক্ষ।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
নিগড় বিন ৩'০০ ॥
মৌলানা খাফি খানের
হৃদয় ২'৫০ ॥

ভারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের
বাড় ও বিহঙ্গ ৩'৫০ ॥
সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
জাপানী বন্দী শিবিরে ২'৫০ ॥

পরলালানা সরকারের
হারানো অতীত ৩'০০ ॥

শান্তিলাল রায়ের
জারাকান ক্রান্তে ২'০০ ॥

দীপেন রাহার

কাঁচা মাটি পাকা পথ চার টাকা ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

পুষ্পবাণবিলাস

অনন্তেন্দু ঘোষ

[বাংলায় কালিদাস-চর্চা]

পুষ্পবাণবিলাস—খণ্ড কাব্য, মোট ২৬ শ্লোক মনোপূর্ণ। বিবরণ—সম্বন্ধিত
এ গোপিনীদম্পতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার।

আলোচনা। পুষ্পবাণবিলাস কতকগুলি মনোমগ্ন-মহাভারতীয় আধুনিক
কবিতার সংগ্রহ,—এবং একাধি মহাকবি কালিদাসের রচনা হিসাবে স্বাক্ষর-
স্বীকৃতি লাভ করে নি। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাত্বষণ প্রমুখ কালিদাস
সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক এই অভিযতই প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদক-প্রসঙ্গ ॥

পুষ্পবাণবিলাস কাব্যের বাংলা অনুবাদক হিসাবে—বিধুভূষণ সরকার ১৯১৮
[১৩২১], রাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাত্বষণ ১৯২৯ [১৩৩৬], ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
[প্রকাশকাল অজ্ঞাত] মহাশয়ের নাম পাওয়া যায়।

অনুবাদ-প্রসঙ্গ ॥

পুষ্পবাণবিলাস কাব্যের আলোচ্য অনুবাদ তিনখানির কোন খানার স্বাক্ষর
অনুবাদ নয়—মূল সংস্কৃতানুসারী অসমর্থ বাংলা অনুবাদ। তদুদ্দেশ্যে যাচ্ছে,
বিধুভূষণ সরকার-কৃত পদ্মভূবাদ ভগ্নগদ্য রাজেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ-কৃত
গজানুবাদই সৌকর্য্য হয়েছে। এইরূপে রাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাত্বষণের অনুবাদেই
স্বাধীন সাহিত্যরমের বাদ পাওয়া যায়।

অনুবাদপঞ্জী ॥

[বিধুভূষণ সরকার ও রাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাত্বষণ কৃত ৩য় শ্লোকের অনুবাদ ;
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত ১ম—৩য় শ্লোকের অনুবাদ সহ।]

১৯১৪ [১৩১২]

পুষ্পবাণবিলাসম্। [মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্।] বিধুভূষণ সরকার-
কৃত পদ্মভূবাদ সমেতম্। পৃ. ২৬

[গদ্যপতি সরকারের প্রকাশিতম্। ১৩২১ সাল।]

অনুবাদেব নমুনা ॥

কাস্তে দৃষ্টি পথং গতে নরনয়োরাসীদ বিকাসো মহান্
প্রাপ্তে নির্জমদালয়ং পূজ্যবিতা ভাতা তত্। হৃৎকথং।

বকোজঃ গ্রন্থোৎসর্গকে সম্ভবৎ সর্বদ্ব কল্পোদয়ঃ

কণ্ঠালিঙ্গমতংগণে বিপালিতা নীরী রত্নপি স্বঃ ৯৩

[গাভাষ] কার্য উপলক্ষে পতির স্থানান্তরে অবস্থান সময়ে উভয়েই নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। পরে একদিন বানী প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া কামিনীর সহিত বিজনপ্রদেশে হঠাৎ মিলিত হইলে কবি তাহাদের তাত্ক্ষণিক চেষ্টা দেখাইয়া বর্ণনা করিতেছেন :—

নাথে দৃষ্টিপথে হেরি সুন্দরী নারীর মরি
নয়ন যুগল কিবা বিকাশিয়া উঠিছে,
পরে জনশূন্য ঘরে প্রাণকান্ত এলে পরে
পুলকে কাস্তার তলু রোমাঞ্চিত করিছে,
কুচ যুগ স্পর্শিবারে বায় যবে নাগভরে
অল্পরাগে প্রিয়া অঙ্গ কিবা মরি কাঁপিছে,
কণ্ঠ আলিঙ্গন আশে পুন যবে ধার পাশে,
সুদৃঢ় যে নীবিবন্ধ বিপালিয়া পড়িছে ॥

অল্পবাদটির প্রশংসা করেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জঘ সারস্বতচরণ শিখ, জঘ আশুতোষ চৌধুরী এবং ‘দেবুলী’ Rays & Riots পত্রিকা প্রভৃতি।

প্রকাশকের ‘বিশোধন’ : “পুষ্পবাণবিলাস”...মহাকবির একখানি আদি-এসাত্তক কৃত কাব্য। ভগবদাবতার শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মনোহর চরিত্র লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত। ইহাতে কবির অলংকার প্রয়োগের কিছু বিশেষত্ব আছে। কাব্যখানি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সরস ও সুন্দর।—পুষ্পবাণ-বিলাস আমাদের দেশে আদৌ প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে বাহাতে মহাকবির এই হুম্বুর রচনাবলী সম্যকরূপে প্রচারিত হয় তদুদ্দেশ্যেই এই পুস্তকখানির মুদ্রণ-কার্য্যে, ব্রতী হইয়াছি। বাহুরা সং-ত জানেন না তাঁহারা বাহাতে অমর কবি কালিদাসের কবিতা-সুধাগানে বঞ্চিত না হন সেইজন্ত সরস ও সরল পদ্যাবলি সম্রিবিষ্ট হইল। গ্রন্থখানি সুধীষুন্দের করকমলে সমর্পিত হইল। এখন ইহা তাঁহাদের প্রীতিবর্ধন করিলেই সফলযত্ন হইব। ইতি ১৯ই আষাঢ়, ১৩২১

১৯২২ [১৩৩৬]

পুষ্পবাণবিলাসম্। মহাকবি কালিদাস বিরচিত। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ সম্পাদিত কালিদাসের গ্রন্থাবলী। প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত।

মু., ৪৬২-১৬।

[কলিকাতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, অনন্ত চতুর্দশী ১৯৩৬ সাল।]

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীশুশিনবিহারী সেন

আবদ নংখান জহুরী

৪

ভগ্নহৃদয়। (গীতিকাব্য) / শ্রীশুশিনবিহারী সেন।
কলিকাতা : বাণেশ্বরীক যন্ত্রে / শ্রীবালালী সেন চন্দ্রবর্তী দ্বারা প্রণীত
ও প্রকাশিত। / শকাব্দা ১৮০৩।

পৃষ্ঠাসংখ্যা। আখ্যাপত্র, ভূমিকা [৩], উপহার ৮০, ১২৩।

প্রকাশ [২০ জুন ১৮৮১]। মুদ্রাসংখ্যা ১০০০। মূল্য এক টাকা।

১৯৬ পৃষ্ঠার পান্দদেশে মুদ্রিত আছে—PRINTED BY
CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS, / ৫৫, ANANDS STREET,
CALCUTTA.

গ্রন্থখানি চৌদ্দিশ বর্গে বিভক্ত; প্রত্যেক ছয় বর্গ ভারতীয় পত্রের ১২৮ নং
কাগজে, অগ্রহাষণ, পৌষ, মাঘ ও কাশ্বিন নংখান প্রকাশিত হয়। (১৯৬
বাক্যবহীন)।

গ্রন্থের 'ভূমিকা' এই—

"নিম্নলিখিত কাব্যটিকে কাহারো যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। ছন্দে
কুন্দের গাছের বৃত্ত; সাহায্যে ফুল-ফুটে, কিন্তু সে কুন্দের মধ্যে শিল্পের
শাখা, পত্র কাটাটি পর্যন্ত বাক্য আবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি কুন্দের
গাছের আশ্রয় সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা
পাছনা যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই কুন্দের কথা উল্লেখ করা হইল।" ২৮

পুস্তকখানি পান্দপাত্রীর সংলাপরূপে প্রণীত, সেইহেতু নাটকরূপে মুদ্রিত
হইতে পারে, এই নমুনাধার এই ভূমিকা।

২৮ গ্রন্থকারের প্রকাশকালে এই ভূমিকার ভাষা যিকিৎ পরিবর্তিত হয়।

‘ভারতী’তে এই ‘উপহার’ মুদ্রিত হয়—

উপহার

রাগিণী—ছায়ানট

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক’ পথহারী ।
যেথা আমি যাইনাকো, তুনি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আশিপরে ঢাল’ গো আলোক ধারা ।
ও মুখানি সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আধারে হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা ।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সন্মুখে সে হয় সারা ।
চরণে দিহুগো আনি — এ ভগ্নহৃদয় খানি
চরণ রঞ্জিবে তন এ হৃদি-শোণিত ধারা ।

এই ‘উপহার’ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে [আদি] ব্রাহ্মসমাজ গৃহে
‘একপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে’ ১১ মার্চ প্রাতঃকালীন উপাসনাস্তে
ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হয় ; ২৯ তদবধি বিভিন্ন ব্রহ্মসংগীত-সংগ্রহে স্থান লাভ
করিয়াছে ।—

ব্রহ্মসংগীত-রূপটি এই—

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথ হারা ।
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণ ধারা ।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে

২৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কাঙ্ক্ষন ১৮০২ শক, পৃ. ২১১ । শ্রীপ্রভাতকুমার
মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড ১৩৬৭ সংস্করণ, পৃ ১১১। গানটি মূলতঃ
আরও পূর্বে রচিত, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুরাতন পাণ্ডুলিপি
দৃষ্টে এইরূপ অস্বাভাবিক করেন ; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৮০

ডিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কুল-কিনারা ।

কখন বিপথে বচি লমিতে চাহে এ হৃদি

অমনি ও মুখ হেরি সরমে দে হয় দারা ।

ভগ্নহৃদয় শিখাকারে প্রকাশকালে নূতন 'উপহার' সমিধিষ্ট হয়, 'নিগে তাহা
মূলিত হইল—

উপহার

ক্রীমতী হে—

১

হৃদয়ের বনে বনে বনে হৃদ্যমুখী শত শত
ওই মুখ পানে ঢেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত ।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক, শুকায় শুকায় থাক,
ওই মুখ পানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়,
বেলা অবসান হবে, মুদিরা আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে বরিয়া যায় !

২

জীবন-সমুদ্রে তব জীবন ভাটনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইরে ভোর ;
সন্ধ্যার বাতাস লাগি উন্নি বত উঠে জাগি,
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝাটকায় আবুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি তেউ
মিশিবে — বিরাম পাবে — তোমার চরণে গিয়া ।

৩

হয়ত জান না, দেবি, অদৃষ্ট বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া ।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
'পথভ্রষ্ট হইনাক' তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় অম ছিন্ন ধুমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ তলে ।

শ্যাম সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে ;

পর পানে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে ;

দিবস কুয়াবে হবে নে দেশে যাইতে হবে,

এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শনি,

ফুরাইবে গীত গান, স্ববন্দে গিয়মান,

স্থ শান্তি অবলান কাঁদিব আঁধারে বসি !

নেহের অকণালোকে খুলিয়া জন্ম প্রাণ,

এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিছ যে শেষ গান,

তোমারি মনের ছার সে গান আঁশ্রয় চায়,

একটি নয়ন জল তাহায়ে করিও দান ।

আজিকে বিদায় ওবে, আবার কি দেখা হবে,

পাইয়া নেহের আলো জায় গাহিবে গান ?

দুইটি উপহার-কবিতাই জ্যোতিষিঙ্গ্রনামের সহধর্মিণী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে রচিত বলিয়া অনুমান হইয়াছে ।

‘শ্রীমতী হে’-র পরিচয়-গ্রন্থে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

“আমরা জানিযাহি ‘হে’—কাদম্বরী দেবীর কোনো ছদ্মনামের ‘অ’অক্ষর । কেহ কেহ বলেন তাঁহার ডাকনাম ছিল ‘হেকেটি’।— ইনি প্রাচীন গ্রীকদের ভিনুস্ত্রী দেবী । অন্তরদেরা রহস্যচ্ছলে এই নামটিতে ডাকিতেন । এই নারীর মোহ ও শাসন রবীন্দ্রনাথের যৌবনকে সুন্দরের পথে চালিত করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁহারই পবিত্র স্মৃতি ছিল তাঁহার জীবনের প্রবর্তনা ।” ৩০

৩০ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭, পৃ ১১২ । শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এক পত্রে লিখিয়াছেন—

“‘হেকেটি’ শোনা ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে । ‘মান্তী পুণ্ডি’ বা ওই ধরণের পুণ্ডিতেও ‘হেকেটি’ শব্দটি আছে । collect করবার জন্য ‘হেমাঙ্গিনী’ স্মৃতি বলেই মনে হয় । ১১৭/১৩৬০ ।”

—শ্রীকানাই সামন্ত, ‘রবীন্দ্রপ্রতিভা’ (১৩৬০), পৃ ৩৮৯, পাদটীকা

সফলীকৃত দাম বর্তমান এসেছে লিখিয়েছেন—

“‘হে’ কে, কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়েছিলাম। তিনি খসি গল্প বলিলেন।
তোমার কি মনে হয়? বলিলাম, হেমাঙ্গিনী। অলীকবানুভূত আশায়
অলীকবানু ও কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনী বর্ণিত হয়েছিল। তিনি সীকার
করিলেন, ইয়াই মত।...”^{৩১}

“আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সঙ্কে আমার দ্বিশ বছর বয়সে
একটি পত্রে” রবীন্দ্রনাথ তাহা লিখিয়েছিলেন জীবনস্মৃতির “ভগ্নদূর” অধ্যায়ে।
তিনি তাহা উদ্ধৃত করিয়েছেন; জীবনস্মৃতিতে একটি পাণ্ডুলিপিতে চিঠিখানের
পূর্বতর পাঠ আছে, নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

“ভগ্নদূর মন লিখিতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো ;
বাল্য ও নয় ঘোঁষনও নয়। বয়সটা এমন একটা বন্ধিস্থলে দেখান থেকে মনে
আলোক স্রষ্টা পাবার সুবিধে নেই। একটু একটু অভ্যাস পাওয়া যায় এবং
একটু খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ের সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ায় এক
কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিষ্কৃত হয়ে থাকে — নত্যকার পৃথিবী নৃত্য
আজ পৃথিবী হয়ে ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স যে আঠারো
ছিল তা নয়, আমার আশেপাশের সকলেরই বয়স যেন আঠারো ছিল।^{৩২}
আমরা সকলে যিনেই একটা বহুতর ভিত্তিহীন কল্পনারাজ্য বাস করতাম।
সেই কল্পনারাজ্যের খুব তীব্র স্বপ্নসংস্পর্শও স্বপ্নের স্বপ্নসংস্পর্শ মত। অর্থাৎ ভাষা
পরিমাণ ওজ্জ্বল কল্পনার কোনো নতাপদার্থ ছিল না। কেবল নিজেরই মনটা

৩১ “রবীন্দ্রচরিত্রাঙ্গী” ‘রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য’ গ্রন্থ, ১৩৬৭,
পৃ ২৪৬

৩২ “উক্ত চিঠির সবচেয়ে চমকদেওয়া পঙ্ক্তিটি গম্ভীর উক্তি। একটি
ছত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যে আশ্চর্য রচনা মিলে যায়। আমাদের মনে হয় নব্য পাঠ
করা গম্ভীর রূপকটি অবগত হওয়া যুক্তি প্রকাশ করেছে কবি নিজের দেশের।”

“Als ich achtzehn war, war Deutschland auch erst
achtzehn: When I was eighteen, all my country was
eighteen too. (February, 15, 1824).—Goethe's Conversations
with Eckermann.”—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, “গম্ভীর ও রবীন্দ্রনাথ”
বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৫৭

ছিল—তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত। তিল তাল হয়ে না উঠলেও মনের সন্তোষ হত না—মনে হত ঠিক উপযুক্ত হচ্ছে না।... যা হোক সেই আঠারো বৎসর বয়সের দিকে চেয়ে দেখলে রাশি রাশি কুয়াশা দেখতে পাই। সেই অনির্দিষ্ট কুয়াশায় আমার তখনকার জীবন একটা অশ্রময় ভাবে আর্দ্র করে রেখেছিল। আমার যে একটা অস্থির বিষাদের ভাব ছিল তার নির্দিষ্ট কোনো সত্য কারণ ছিল না—বরঞ্চ অনির্দিষ্টতাই তার যথার্থ কারণ। মন কি চায় তা ঠিক ঠাওরাতে পারত না—কারণ চারিদিকের আকাশ আচ্ছন্ন ছিল, উপভাস এবং কাব্য থেকে যা জানতে পেত সেইটেকেই আপনার মনে করত। অনেক সময় রোগের একটা নাম দিতে পারলেও আরাম পাওয়া যায়—আমার সে সময়কার মানসিক ভাবটা নিজের একটা নামকরণ করবার চেষ্টা করত। তার নিজের মধ্যে অবশ্যই একটা সত্য ছিল কিন্তু সে সত্যটা যে কি তা সে কিছুতেই ঠাওরাতে পারত না বলে আপনাকে পুঁথিসম্মত অল্প পাঁচ নামে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা করে তুলত। কেবল যে মিথ্যা পরিচয় তা নয় তদনুসারে তাকে মিথ্যা অভিনয়ও করতে হত।”

“আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবহার কাল ছিল।”—জীবনস্মৃতির “ভগ্নহৃদয়” অধ্যায়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত লিখিয়াছেন।—এই অংশের পূর্বতন পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখনকালে বর্জিত একটি অঙ্কচ্ছেদ—

“আমার হৃদয়ের আবেগ আমার কল্পনারূপে পরিণত শক্তি লইয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে জীবনের মধ্যে যে অভূত প্রেতের কীর্তন করিয়াছিল তাহার কোনো চিহ্ন আমার কাছে আজ প্রীতিকর নহে এবং কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কাছে তাহা উপাদেয় হইতে পারে না।”—এই ‘চিহ্ন’স্বরূপ পুস্তকও তাই তিনি পুনরুদ্ভাষণ বা গ্রন্থাবলীভুক্ত করেন নাই।

ভগ্নহৃদয়ের সন্নিদর্শ

ভগ্নহৃদয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—“বিলাতে আর একটি কাব্যের পতন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ‘ভগ্নহৃদয়’ নামে ইহা ছাপানো হইয়াছিল, তখন মনে হইয়াছিল, লেখাটা খুব ভালো হইয়াছিল।”^{৩৩} লেখকের পক্ষে

৩৩ জীবনস্মৃতির একটি পাণ্ডুলিপিতে এই স্থলে আছে—“তখন এই কাব্যটির প্রতি আমার বিশেষ একটা মগ্ন মনস্তত্ত্ব জন্মিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ

এরূপ মনে হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু, ভাষাকার পাঠকদের কাছেও এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে, এই লেখা বাছির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতার ত্রিপুরার বর্গীয় মহারাজ নীরচন্দ্রমহাশয় কাব্য মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের এতটা লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমূল্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ৩৪

নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করি নাই এবং গ্রন্থাবলীতেও ইহা স্থান পায় নাই।”

ইহা “সংস্কৃত মনস্বী” অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; গ্রন্থপ্রকাশের দশ বৎসর পরের (১২৯৮, ১৮৯১) একখানি চিঠিতে আছে—

“মল্লিক [সরলা দেবীর] একখানা চিঠি পেয়েছি। সে আমার ভগ্নহৃদয় এবং রক্তচণ্ড সমালোচনা করে লিখেছে। পূর্ব ভগ্নহৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করে সে আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করত—এবার আমার সঙ্গে তুমি মতের ঐক্য হয়েছে। অর্থাৎ ভগ্নহৃদয়ের অনেক নিষেধ করেছে। বলেছে ‘এই কাছে মুরগী চন্দ্রা প্রভৃতিরা একটা কলসাকাননের লোক……’”

—ছিন্নপত্রাবলী, ৩৬ সংখ্যক পত্র। সম্পূর্ণ চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই।

কেন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই, বা গ্রন্থাবলীতে স্থান দেন নাই সে বিষয়ে পরে প্রিয়নাথ সেন-প্রসঙ্গ প্রযোজ্য।

৩৪ এই অভিনন্দনের কথা রবীন্দ্রনাথ পরেও বারংবার স্মরণ করিয়াছেন; সে-সকল রচনা ‘রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা’ (১৩৬৮) গ্রন্থে ব্রীমভারতেন এবং ‘ব্রীহিজেতচ্চন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্বন্ধে সংকলিত হইয়াছে। ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মী আর্লোচ্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—“প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুতে [১২৮৯] প্রৌঢ় বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়-নিরহ-শোকাবল হইয়া পড়ে। তখন তিনি বিরহীর মর্দবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিয়াছিলেন।……কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত ‘ভগ্ন হৃদয়ে’র কবিতাগুলি সার দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তখনকার এই কাঁচা লেখার মধ্যেও তাঁহার অগ্নিকার বিশ্ববিমোহন কাব্যপ্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইরা, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় রাধারমণ চৌবকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন, ‘ভগ্ন হৃদয়’ কাব্য গ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্ত তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে।

‘রবীন্দ্রনাথের নিকট ‘আত্মীয়’ ভগ্নেজনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে
নিখিয়াছেন—

“এই পুস্তক প্রকাশের পর যুবক মহলে, ছাত্র মহলে, রবীন্দ্রনাথের নাম
পড়িয়া গেল। তিনি বাংলায় “শেলী” হইলেন—তঁাহার বেশ, তঁাহার কেশ,
তঁাহার চন্দ্রা সবই অনুরক্ত হইতে লাগিল। তাহাই ফাগুন হইয়া দাঁড়াইল।
আকাশে বাতাসে তখন ‘রবিবাহু’, কাব্যে এলো নূতন ছন্দ, উদাস ভাব।”

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

“ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্য রবীন্দ্রনাথকে সে যুগের যুবমহলে যশস্বী করিয়াছিল;
অনেকে এই কাব্যের অংশ বিশেষ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এইরূপ
একজন সমসাময়িক যুবককে তঁাহার বক্তব্যসনে দেখিয়াছি, তিনি কাব্যের
এক অংশ আবৃত্তি করিয়া গেলেন।”

প্রিয়নাথ ‘ন. ও. ভগ্নহৃদয়’

“সাহিত্যের মাত সগুহের নাবিক” প্রিয়নাথ সেন, “সাঁহার উৎসাহ
অস্বল্প হালোকেব মত আমার কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণনক্ষার
করিয়া দিয়াছিল”, তিনি কিন্তু ভগ্নহৃদয় পড়িয়া উৎসাহিত হন নাই—
রবীন্দ্রনাথ জীবনকৃতিতে লিখিয়াছেন, “ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা
দাগ করিয়াছিলেন”। বইটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই, তাহা নস্তুবৎ
অনেকাংশে ইহাৱই অনাশ্রয়ের ফলে; রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের স্মরণ
নগ্নেজনাথ ওঁও লিখিয়াছেন—

“It was in deference to his [Preo Nath Sen's] unfavourable opinion that Rabindranath Tagore withdrew one of his early works from circulation and it has never been repinted.”^{৩৫}

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার প্রিয়তারের কাহিনী সহিত মহাত্মা
বীরচন্দ্রের নাক্ষত্র পরিচয় ছিল না।—“জিগ্মূস দরবারে রবীন্দ্রনাথ”, ‘দেশীয়
রাজ্য’ গ্রন্থ।

৩৫ ১৯২৭ খ্রিঃ সংখ্যা *The Modern Review* হইতে প্রিয়নাথ সেনের
বক্তব্যগ্রন্থ ‘জিগ্মূসপঞ্জলি’র পরিণেমে উদ্ধৃত।

সমসাময়িক পত্রিকার সমালোচনা।

সাময়িক পত্রের একটি সমালোচনাও এখানে উদ্ধৃত হইল। অসংখ্য সমসাময়িক সম্পাদিত ‘সাধারণী’ (১০ আশ্বিন ১২৮৮-২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১) লিখিয়াছেন—

“সমালোচন।

‘ভগ্ন হৃদয়। গীতি কাব্য। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তর কাব্য রূপে সমালোচনার আশ্রয় বলিয়াছিলাম যে, ‘ইহার কোন কোন কবিতার কল্প নদীর মত, কোন এক গানী বীরবাহিনী, নির্মলা, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী থাকে, তবে কি না বালি খুঁড়িয়া, কোথাও পাথর তেলিয়া, কোথাও দলদায় সরাইয়া, স্রোত বাহির করিতে হয়।’ এ কাব্য নহন্ধেও আমরা তাহাই বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কবি। কিন্তু তাহার ভাষা মকল স্থানে প্রাজ্ঞ নহে। অল্প ভগ্ন-হৃদয় হইতে দুই একটি উদাহরণ দিব।

“২৮ পৃষ্ঠায়—

বিষয় অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ।

“৩৬ পৃষ্ঠায়—

অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,

“অপরোষ্ঠের যোগ ভঙ্গ করাকে অধর টুটা—বা অপরোষ্ঠের শাসন টুটা—
বলা ভাষার উপর একরূপ অবরুদ্ধি করা।

“২০ পৃষ্ঠায়—

মেঘের ছঃষপ্রে নয় দিনের মতন
কাঁদিয়া কাটিবে কিরে সারাটি ঘোঁষন ?

নাট্যিকার হৃদয়ের কুহেলিকা বর্ণন করিতে গিয়া কবি প্রথম পংক্তির ভাষা সম্পূর্ণ প্রাহেলিকায়রী করিয়াছেন। শেলী প্রভৃতি ইংরাজ কবির ঐরূপ কুহেলিকা কোথাও কোথাও প্রশংসনীয় হয় বলিয়া—বাক্সালা ভাষায় ঐরূপ আবছায়া যে আদরের বস্তু তাহা নহে। কবি রবীন্দ্র স্বভাবের এই আধ ফুটন্ত ভাব বড় ভাল বাসেন। তাহার কাব্যের গৃষ্ঠায় গৃষ্ঠায় বে “তোছনা” আছে—তাহা ফুটফুটে জোৎস্না নহে ; মিটি মিটি ঘুমন্ত জোৎস্না—তাহা কবি বড় ভাল বাসেন। কবির এই প্রকৃতি হইতে তাহার কাব্যের ভাষাও স্থানে

স্থানে কুহেলিকাময়ী হইয়া থাকে। তাহার পর, ৩১ পৃষ্ঠার “অন্ত্যমান যামিনীর” মত হুমাহসের উদ্যমীনতা আছে। “জ্যেষ্ঠ যামিনী অন্ত যামিনী : তাহার উপর “অন্ত্যমান যামিনী”—ভাষার উপর আর একরূপ জবরদস্তি।

“ভাষা সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে বলিয়া আঁমরা মাতৃভাষার উপর যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত না হই—ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা। কবি রবীন্দ্রের কাছেও আমাদের সেই একমাত্র ভিক্ষা।”

—সাধারণী, ১০ আশ্বিন ১২৮৮ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

পরবৎসর ‘সাধারণী’তে (১১ বৈশাখ ১২৮৯) লিখিত হয়—

“সাহিত্য-সমালোচন।

“কবিতাপুস্তক।

“শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তচণ্ড, ভগ্নহৃদয় প্রভৃতি এবং বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত আমি-রয়ণী, আর বৎসরের কবিতাকলাপ মধ্যে সর্ব প্রথমে উল্লেখ করিতে হয়। রবীন্দ্রের কবিতা ছায়াময়ী, তাহার স্বর ভাল্কা ভাল্কা, হৃদ স্বাধীন এবং তাহার হৃদয় আবেগপূর্ণ। কিন্তু তিনি নূতন পথে বাইতে বিশেষ প্রয়াসী বলিয়া তাহার কবিত্ব বঙ্গ সাহিত্যে বন্ধমূল হইতে পারিতেছে না।”

পুনরুদ্ভব

রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৩৪৭) ভগ্নহৃদয় পুনরুদ্ভূত হইয়াছে; স্বতন্ত্র আকারে আর মুদ্রিত হয় নাই। “ভগ্নহৃদয়ের কিছু কিছু অংশ মুক্ত কবিতারূপে ‘কাব্যগ্রন্থাবলী’র (৩৩০০) কৈশোরক ভাগে গৃহীত হইয়াছিল”—শ্রীহরকুমার সেন বাদলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৮; পৃ ৪০, পাদটীকা) তাহার তালিকা দিয়াছেন।

রক্তচণ্ড / (নাটিকা) / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রণীত। /
কলিকাতা / বাঙ্গালীকি যন্ত্রে / শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত। / শকাব্দা ১৮০৩।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ৥ আখ্যাপত্র, উপহার ১০, ৫০

প্রকাশ [২৫ জুন ১৮৮১]। মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। মূল্য আট আনা।

৫৩ পৃষ্ঠার পাদদেশে মুদ্রিত আছে—PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI
AT THE VALMIKI PRESS, / 55, AMHERST STREET, CALCUTTA.

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা' নহে ভাই !
কোথাও পাইনে খুঁজে যা' তোমারে দিতে চাই !
আগ্রহে অধীর হ'য়ে, ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমা'রি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হতে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অহুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথে।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন কোরে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-বান্ধব ত্যজি যেতে হবে পরবানে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই,
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই !

শ্রীপ্রভাতচন্দ্রমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—“আগাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুর আসিয়া ‘পৃথ্বীরাজের পর্বাজয়’^{৩৬} নামে যে

৩৬ “বোলপুর ২০ অক্টোবর। ১৮৯৪।...মনে পড়ছে, আমি তখন প্রথম বাবাংশুরের সঙ্গে বোলপুরে আসি তখন আমার বয়স ন-দশ বৎসর হবে।...নেই প্রথম বোলপুর দৃশ্যের কত কথাই মনে পড়ে। তখনো কবিতা লিখতুম। মনে ধারণা ছিল—খোলা আকাশে গাছের তলায় বসে কবিতা লিখে ঠিক দস্তরমত কবিত্ব করা হয়। তাই ভোরে উঠেই একগুণা পুরোনো Lett's Diary এবং পেন্সিল হাতে বাগানের প্রান্তে একটি ছোট নারকোল গাছের তলায় বসে ‘পৃথ্বীরাজের পর্বাজয়’ বলে একটা বীরযশস্বক কাব্য লিখেছিলুম। নেটা লিখতে দিন সাতেক নেগেছিল। কোথায় দে খাতা এবং সে কবিতা! তার একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন।...নেই Lett's

বাবা রচনা করেন (১৮৭৩-মার্চ) এই কব্জচণ্ড তাহারই ন্যাট্যরূপ ।^{৩৭}
 শ্রীমঙ্গল সেন লিখিয়াছেন ইহা “লুপ্ত বালা-রচনা পৃথীরাঙ্গের-পরাজয়ের
 কৈশোর সংস্করণ ।”^{৩৮}

পৃথীরাঙ্গের পরাজয় প্রসঙ্গ কব্জচণ্ড গ্রন্থেরও উপজীব্য, এই সকল মন্তব্যের
 ইহাই কারণ ।

সমসাময়িক সমালোচনা

কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত ‘বাঁহুব’ পত্রের ১২৮৮ নম্বরে তৃতীয় সংখ্যায়
 লিখিত হয়—

“কব্জচণ্ড । নাটিকা । শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । বাবু রবীন্দ্রনাথ
 এ দেশের একজন উদীয়মান কবি । বোধ হয় তাঁহার জ্যোতির নূতন
 দাভা অরিরেই সমস্ত বসে ছাইয়া পড়িলে । তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই
 একটুকু অপূর্ণ ও অনন্তসাধারণ নূতনত্ব আছে । কব্জচণ্ডের রচনাতেও
 সেই নূতনত্ব-পট্টের পরিলাকিত হইতেছে । কবিতাগুলি যেন আধ আধ
 ভাষা গলায় নিরবচ্ছিন্ন যধু ঢালিতেছে । কিন্তু নাটক্যাংশে ইহা অসম্পূর্ণ ।
 আমরা নিজে এই কাব্যের কতিপয় পংক্তি তুলিয়া দিলাম । আমাদের
 কোন ছন্দ বাঙ্গালার কেহই এখন জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা
 রচনা করিতে পারে না ।”^{৩৯}

‘হিন্দু স্টেটিস্ট’ পত্রের ১৮৮১ সালের ২৩ মে সংখ্যায় এই সমালোচনা
 প্রকাশিত হইয়াছিল—

“This is the Title of a melo-drama from the pen of a
 writer, who belongs to a nest of singing birds, and to whose
 Dramatic যদি বুঁদে পাই তাহলে আবার একবার ভোরের বেলায় সেই
 নারকেদ-তলায় বসে সেই ‘পৃথীরাঙ্গের পরাজয়’টা পড়ে দেখতে ইচ্ছে
 করে ।”—ছাপ্তাংশবলী

জীবনস্মৃতিতেও ‘হিমালয়যাত্রা’ অধ্যায়ে এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ।

৩৭ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৭ সংস্করণ, পৃ ১০৩.

৩৮ বাদলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৮ সংস্করণ, পৃ ৩৮

৩৯ ঐনির্ণয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থপরিচয়ে উদ্ধৃত ।
 সমালোচক যে ছত্রগুলি ‘তুলিয়া’ ছিলেন তাহা শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
 ‘রবীন্দ্র-নাগরসংগমে’ গ্রন্থে [১৩৬৩] উদ্ধৃত আছে ।

credit it may be said that amid great temptation they have made literature and poetry the vocation of their life. The sons and daughters of the venerable Babu Debendranath Tagore have set an example which the scions of our noble families might follow with advantage and credit. As regards the performance under notice we need scarcely say it is not a drama properly so-called nor an opera. Of course the writer would not stoop to the composition of farces, and his performance is not a farce. It is a sort of interlocutory poem—short but sweet.

“The writer we may add not long ago visited Europe, and though fond of English scenes and the English people,⁸⁰ his Anglican partiality has not made him so unpatriotic as to abjure his maternal language and the habits and customs of the country of his birth. He is culling honey from foreign flowers to enrich his home, but is quite national in his tone and feeling.”⁸¹

পূনরুদ্ভব

এই গ্রন্থও প্রথম প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘকাল আর মুদ্রিত হয় নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ প্রথম খণ্ডে (১৩৪৭) রূপচন্দ্র পুনরুদ্ভিত হইয়াছে। অল্প সংকলন বা গীতসংগ্রহে ইহার কোনো কোনো অংশ অবশ্য গৃহীত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের পরিচয়দানকালে তাহা উল্লিখিত হইবে।

স্বাক্ষতি

শ্রীপার্শ্ব বসু ‘সাধারণী’ ও ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট’ হইতে উদ্ধৃত রচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ হইতে তথ্য সংগ্রহও তাঁহার সাহায্য পাইয়াছি।

৪০ ইতিপূর্বে যুরোপ-প্রবাসীয়া গল্প ভাষ্যতী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এই মন্তব্য সেই প্রসঙ্গে।

৪১ শনিবারের চিঠি কার্তিক ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জীতে এই সমালোচনাটি উল্লিখিত।

পরিশিষ্ট

ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ডের প্রকাশ-পারস্পর্য

দুখানি বইই ১৮০৩ শকাব্দে প্রকাশিত বলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত, গ্রন্থে ইহার অপেক্ষা অধিক-সংবাদ জানা যায় না। ‘উগাহার’র ভাষ্য হইতে অনুমান হয় দুখানিই রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার—সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার (২ বৈশাখ ১২৮৮। এপ্রিল ১৮৮১। এই তারিখ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড হইতে গৃহীত) তারিখ—পূর্বে মুদ্রিত বা মুদ্রাক্ষরের ভিত্তি প্রেরিত। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশ-খবরক্রমে ২৩ ও ২৫ জুন ১৮৮১। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের তারিখ অত্যন্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনো কারণ নাই। বস্তুতঃ ইহার একমাস পূর্বে (২৩ মে-১৮৮১) *The Hindoo Patriot* পত্রে রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা প্রকাশিত হয়, এবং তাহারও দুই সপ্তাহ পূর্বে (২ মে) ঐ পত্রে উক্ত গ্রন্থের প্রাপ্তিস্বীকৃত হয়। অত্য় নির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে আপাততঃ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে উল্লিখিত পারস্পর্য অনুসৃত হইল।

ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচণ্ডের রচনাকাল

ভগ্নহৃদয় ॥ ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, “[প্রথমবার] বিলাতে আর একটি কাব্যের পুস্তক হইয়াছিল। কতকটা কিরিবার পথে, কতকটা দেশে কিরিয়া আনিয়া ইহা সমাধা করি।” রবীন্দ্রকল্যাণদী (বিশ্বভারতী) প্রথম খণ্ডে ভগ্নহৃদয়ের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার যে প্রতিলিপি (“১৮৮০ সালের রচনার পাণ্ডুলিপি”) মুদ্রিত হয় তাহাতে বিত্তীয় সর্গের শিরোদেশে S. S. Oxus, February 1880 লিখিত আছে।

রুদ্রচণ্ড ॥ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন, “[উপহার-কবিতার] প্রত্যয়ে যাইবার কথা উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে ইহা বিলাত যাত্রা কিরিবার পূর্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর, তাহার পূর্বে লেখা হইয়া থাকিলে, ‘রুদ্রচণ্ড’ নাটিকাটিকে ষোল সতেরো বৎসর বয়সের লেখা বলা যায়।”—“রবীন্দ্র-পরিচয়”, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯।

শ্রীহরকুমার সেন এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “ইহা [রুদ্রচণ্ড] রবীন্দ্রনাথের আর্মেনিয়ায় থাকার কালে প্রথমবার বিলাতযাত্রার আগে লেখা এমন অনুমান অপরিহার্য নয়। দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার প্রাপ্তিতে ইহা রচিত ও মুদ্রিত

অলুবাঁদের নমুনা ॥

অকস্মাৎ সেই জিহ্বনকান্ত কাস্তকে দেখিতে পাইয়া প্রাণবলানির্ভর এক সুন্দরীর আকর্ষণবিশ্রান্ত নয়নকমল সম্যকভাবে বিকশিত, বিস্তারিত হইয়া উঠিল, পরে সেই প্রাণকাস্তকে নির্জন স্থানে পাইয়া আপাদমস্তক কলেবরে ঘোষণা দেখা দিল, রসময় স্তনকমল-গ্রহণের নিমিত্ত গেমর কর-পেশারম করিলেন, অমনি আবার সেই স্তনয়নার সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল, ক্রমে প্রাণবল্লভ কর্তৃক কণ্ঠদেগে আলিঙ্গিত হইয়া সুন্দরী এতই অবশ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার নাভিমূল-স্থিত পরিধেয়-গ্রন্থিত খুলিয়া গেল। যুবতি প্রায় বিবশ হইয়া পড়িলেন ॥৩

[তারিখবিহীন]

পুষ্পবাণবিলাস—কাব্য । উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত [কালিদাসের গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ; পৃ. ৬০২-২০ ; মূল ও অলুবাদ] । আখ্যাপন দিনটো প্রকাশকাল অন্ত্যাত ।

অলুবাঁদের নমুনা ॥

মনোরমাদ্রী পরমাসুন্দরী নবযৌবনসম্পন্ন গোপাদনাগণ স্বয়ং কণ্ঠগ্রহণ পূর্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলে ভাষাদের অতুল স্তনমণ্ডলের বিন্দুবিশে জন্ম চন্দনরেণু বিগলিত হইলেও বাহার অঙ্গে সেই সৌরভ প্রস্ফুটিত হইতেছিল, বামিনীর জাগরণে বাহার লোচনবুগল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এইরূপে প্রভাতসময়ে যিনি অনির্বচনীয় অঙ্গলক্ষ্মীসম্পন্ন হইয়া বেণুবাদনে নিমগ্ন হইয়াছেন, সেই গোপিকাগণের প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাহাদুর আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥১॥ বাহার বিচিত্র চরিত্র ভুবনমণ্ডে স্থিতি ও, যিনি মহত্ব মহত্ব যুবতীর সহিত ক্রৌড়া করিয়াছেন, সেই সমস্ত অবলম্বন পূর্বক আমি এই শৃঙ্গারসাত্ত্বিক কাব্য রচনা করিতে মানস করিয়াছি, এক্ষণে সংকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবী আমার প্রতি প্রসাদা হউন ॥২॥ মনোহর ক্রয়গঙ্গালিনী বুগলোচনার প্রাণবল্লভ যখন নয়নপথে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নিতম্বিনীর নয়নদ্বয় অতিশয়িতরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল, আবার প্রিয়তম যখন নির্জনস্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই অবলার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, যখন উত্তম স্তনদ্বয় ধারণে উৎসুক হইলেন, তখন সর্বাঙ্গে কম্পোদয় হইল, যখন কণ্ঠস্থল আলিঙ্গন করিলেন, তখন সেই স্তন্যময় মধ্যদেশে নবী-বন্ধন দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহা আপনিই শিথিল হইয়া পড়িল ॥৩

জন্মকাল থেকেই 'সাহিত্যের খবর' কিছু বিশিষ্ট পথে চলতে
 চেয়েছে। লোকপ্রিয় করবার চেষ্টায় আদর্শ বিসর্জন দেওয়া হয়নি।
 আনন্দের প্রধানত প্রবন্ধ ছেপে থাকি। সাহিত্য-প্রবন্ধের সম্পর্কে
 প্রত্যাশা, সেগুলি সুস্থ ও সুন্দর সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক হবে।
 কবিতা ও গল্প-উপন্যাস ছাপা নিয়ম নয়; তবু যে গল্প-উপন্যাস
 একেবারে ছাপা হয়নি, এমন নয়। অনিবার্য কারণে ছাপতে
 হয়েছে, সেটা নিয়মের ব্যতিক্রম। অন্তের সম্পর্কে ব্যঙ্গ ও কটুভি
 আমাদের আদর্শের পরিগন্য। কিন্তু অতি-সম্প্রতি এই ধরনের
 কয়েকটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। আমাদেরই অনবধানতা—
 আগ্নেয় বোম্বা দিতে পারিনি। বে সন্মত সন্মানিত
 সাহিত্যস্রীদেবীর বিরুদ্ধে উক্তিগুলি প্রযুক্ত হয়েছে, তাঁদের এ
 ব্যাপারে কিছুই যায় আসে না, সম্ভবত তাঁদের দৃষ্টিপথেও পড়েনি।
 কিন্তু আমাদের বেদনার অবধি নেই। এ জন্য ক্রটি স্বীকার করি।
 ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এজন্য আমরা সতর্ক থাকব।

সম্পাদক

১১ ছোট্টদের কই ১১

দেবতোস দাশগুপ্তের

জাকাল ও পৃথিবী	পরাভূত প্রকৃতি	প্রাণের কথা
৪র্থ মুঃ ১'৭৫ ॥	৩য় মুঃ ১'১০ ॥	১'০০ ॥
(রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয়)		

চাকচাক চক্রবর্তীর	বিক্রমাদিত্যের	
৮৭ চক্ৰ এক টাকা	ধুমী সন্ন্যাসীজী (২য় মুঃ)	১'৭৫ ॥

বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের	বনভট্টের	
শ্রীমতী ও প্রকৃতি	১'৫০ ॥	নীলমুখ (৩য় মুঃ) ৩০০ ॥

তারাপদ সাহা	গোপাল ভৌমিকের	
রক্তমুনির পথে বিশেষে	১'২৫ ॥	মুদ্রিয়া ও প্রকৃত চাকী (২য় মুঃ) ১'২৫ ॥

ননীগোপাল গোস্বামীর

শ্রীমতী গাড়া এই ময়লী	জবে মিলি করি কাজ	আলাদের উৎসব
২য় মুঃ ১'০০ ॥	১'০০ ॥	১'০০ ॥

নমিণে বন্দন	জ্যোতিপ্রসাদ বসুর	
শিকমিক	৫ টাকা ॥	বিপ্লবী কানাইলাল ১'৫০ ॥

ভেজেনচন্দ্র সেনের	শিল্পী রবীন্দ্রচন্দ্রের	
হার্যমো ছেলে	১'২৫ ॥	অনুজ টিলা ০'৭৫ ॥

ইন্দনীল চট্টোপাধ্যায়ের	কাতিক চট্টোপাধ্যায়ের	
এবংপূরের টিকটিকি	১'০০ ॥	টানের মোল ১'০০ ॥

অমরেন্দ্রকুমার সেনের	শৈল চক্রবর্তীর	
ভাকটিকিট	১'২৫ ॥	অ্যাও গ্যাও ৩য় মুঃ ০'৭৫ ॥

ননীগোপাল চক্রবর্তীর	জানন্দ ঘোষের	
চানড়ার কাজ	১'০০ ॥	লোহার কথা ০'৬২ ॥

আশা দেবীর	দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের	
মুখতি নদীর তেউ ৪র্থ মুঃ	১'০০ ॥	পৃথিবীর ইতিহাস ১ম খণ্ড ৮'০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বাতায়

সাহিত্যের খবর

বর্ষ ১০ ॥

সংখ্যা ১০ ॥

আব্দ ১৩৭০

দুই যুগ	প্রমথনাথ বিনী	১
প্রমথ চৌধুরীর কবিতা	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	২
কাদম্বরী	সুধীর করণ	৬
বিষ্ণু দে'র কবিতা	রঞ্জিত সিংহ	১১
দেশে-বিদেশে	চারু দত্ত	২৬
অন্তরীক্ষের সঙ্গীত	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	৩২
রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী	গুণিনবিহারী সেন	৩২
বাংলায় কালিদাস-চর্চা	অমলেন্দু ঘোষ	৫৩
পথ চলে গেছে	সমর সোম	৫৯
নতুন বই		৭১

বিষয়বস্তু

সাহিত্যের খবর-এর বর্ষায়ত্ত আখ্যন হইতে। তবে যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক টাকা সভাক বার্ষিক ৬.০০ ন. প. বার্ষিক ৩.০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫.০ ন. প.। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—বঙ্কিম চৌধুরী স্ট্রীট কলিকাতা—১২।

সম্পাদক—মনোজ বসু

শতাব্দীয়া মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৪০ বঙ্কিম চৌধুরী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
১। ভীম ঘোষ লেন, নবীন সরস্বতী প্রেস, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

সভাপতি : তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

অবৈতনিক সম্পাদক : নাগরনগর ঘোষ

১ম পুরস্কার : ৫০০ টাকা

২য় পুরস্কার : ২৫০ টাকা

৩য় পুরস্কার : ১০০ টাকা

এতদ্ব্যতীত যোগ্যতানুযায়ী প্রত্যেককে ২৫০ টাকা করিয়া ২২টি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিয়মাবলী :

- ১। গল্প বাংলা ভাষায় লিখিতে হইবে।
- ২। যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।
- ৩। রচনা পূর্বে কোন প্রতিযোগিতায় দেওয়া বা প্রকাশিত না হওয়া চাই এবং রচনা মৌলিক হওয়া চাই।
- ৪। নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইতে হইবে কারণ লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
- ৫। লেখা এক পৃষ্ঠার একদিকে লিখিয়া রেজিস্ট্রি ডাকবোকে বা ব্যক্তিগতভাবে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।
- ৬। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত গল্পের প্রথম প্রকাশনের অধিকার সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের থাকিবে।
- ৭। কমিটির বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
- ৮। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের শেষ তারিখ ৯ই জুলাই, ১৯৬৩।
- ৯। সুলেখা ছোটগল্প প্রতিযোগিতা কমিটি প্রয়োজনবোধে নিয়মাবলীর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পারিবেন।

সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা কমিটি

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

সাহিত্যের খবর

দৃষ্টকাব্য সংখ্যা ১১

বর্ষ ১০ ॥

সংখ্যা ৮ ॥

বৈশাখ ১৩

বাংলা নাটক ও সংস্কৃত দৃষ্টকাব্য	চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	
বাংলা নাটকের যুক্তি সন্ধান	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	
নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দ	সুধাংশুমোহন-বন্দ্যোপাধ্যায়	
নাটক-বিচার প্রসঙ্গে	রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়	
নাট্যসমালোচকের দায়িত্ব	শ্রীমাধব রায়	
নাটকে কল্পনার স্থান	ফণিভূষণ বিশ্বাস	৬
কাব্যনাট্য ও মালিনী	রমেন্দ্রনাথ রায়	৭
দেশে-বিদেশে	চাক্র দত্ত	৮
ষট্ঠিকা কম্পান : নতুন ভাবনা	ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	৯
নাটক নিয়ে নতুন চিন্তা	রমেন লাহিড়ী	১০
নাটক বিচার : নতুন দৃষ্ট	মনোরঞ্জন বিশ্বাস	
রাজনীতি নয়, নতুন অঙ্গ	গিরিশংকর	১১
নাটক ও রাজনীতি	বীক মুখোপাধ্যায়	১২
রাজনীতি ও নাট্যশিল্প	দেবব্রত সুরচৌধুরী	১৩
নাটক ও জীবনবোধের বিবর্তন	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	১৪
নাটক আর মাহুষ	কিরণ মৈত্র	১৫
নতুন বই		

নিয়মাবলী

সাহিত্যের খবর-এর বর্ষাবৃত্ত আশ্বিন হইতে। তবে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক টাকা সভাক বার্ষিক ৬.০০ ন. প. বা মাসিক ৩.০০ ন. প. প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—বঙ্গিম চার্টার্ড প্রিন্ট কলিকাতা—১২।

মশাবদ—অন্যান্য সংস্ক

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০, বঙ্গিম চ্যাম্বার্স প্রিন্ট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
১১, ডীম ঘোষ লেন, নবীন সরস্বতী প্রেস, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

দেখাছিল, এই অস্থানই বন্দুতের।" — শালিল, বাইবেল ইতিহাস, ১. দ্বিতীয়
খণ্ড, ১৩৬৮ সংস্করণ, পৃ. ৩৮, পাদটীকা।

ঐ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "অশ্বমেধ মনে হর [বিত্ত] বংশে,
নাত বাইবল পূর্বে ভাড়াভাড়াতে নূতন কিছু নহি পেরবার অভাবে গা-ভন
বাটাকে ['খৃষ্টীয়াজের পবিত্র'] নূতন কলমেয় বাড়াইয় 'কল্যাণভিত্তিক' হইয়া
হাব দিলেন।" — রবীন্দ্রজীদেবী, প্রথম খণ্ড, ১৯৩৭ সংস্করণ, পৃ. ১১৩

একটি অনল্যস্যাবারন আই।

পরিমল গোস্বামী

স্বখের সন্ধানে

মাত্রা গুণিবীর সবজ্ঞতির
মাহুষের একমাত্র লক্ষ্য 'স্বখ'।
তাই গ্রামপদ দ্বিত্বের ভাষায়

পশ্চাৎ-ধাবনে মাতত নিরন্ত মাহুষ। তবু কিছ স্বখ আ-ধরা। স্বখ নিঃ স্রি
করেই বা সত্যিকার স্বখ পাওয়া যায় তারই দ্বারকি সন্ধান দিগেছেন
কন্যামত দার্শনিক ও চিন্তানায়ক বারট্রাও রাসেল তাঁর 'The Conquest
of Happiness' গ্রন্থে। প্রখ্যাত কথাশিল্পী পরিমল গোস্বামী-অনুলিপি এই
অবগুণ্টি গ্রন্থটি রূপা অ্যান্ড কোং সহযোগিতায় প্রকাশিত। ৫০০।

বেঙ্গল পাবলিশার্স অ্যান্ড ইন্সটিটিউট লিমিটেড, কলিকাতা ২৩২

নতুন বই

উপাখ্যান

দৈনন্দিন	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩০
অনিমিত্তা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩০
পারাবার	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩০
বধু মচাও	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩০
শাহানী একটি মেয়ের নাম	আব্দুল আজীজ আল-আমান	২০
রাত্রির সীমানা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৫০
এক বেগম এক স্থলতান	বাদীউল্লাহ দাশ	১০
খোবন সরগী নীরে	হেম চট্টোপাধ্যায়	১০

গল্প

আলোর বৃক্ষে	সমরেশ বসু	৫
-------------	-----------	---

কবিতা

ফিরে ফিরে	গৌর পাল	১০
অদূরে জলের দশ	প্রেমশ মণ্ডল	১০
অর্থবরবেদে ভারতীয় সংস্কৃতি	নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	১০

প্রবন্ধ

বিশ্বনাহিত্যের লেখক	ভবানী মুখোপাধ্যায়	৫০
বসন্তের রাজেশ্বর	নিতাই বসু	১০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৩০

মল্লপাঠনা

পারম্পরিকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়) বিনয় ঘোষ		১০
Old Bengali Language and Text	ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়	১০

বিচিত্র

প্রাচীন বাংলার	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩০
----------------	-------------------	----